মু হূ র্ত ক থা

বাণী বসুর নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

পা রু ল

পারুল প্রকাশনী, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN 978-93-80034-57-7

বর্ণ সংস্থাপন পারুল প্রকাশনী
আই প্রেস ৩০এ ক্যানাল ইস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১১ থেকে মুদ্রিত

আমার পাঠকদের

প্রা ক্ ক থ ন

পারুল প্রকাশনীর অনুরোধে *মুহূর্তকথা* সিরিজের জন্য ৬০টি গল্প মোটামুটি নির্বাচন করে দিলাম। নির্বাচনে আমি বিশ্বাস করি না। প্রথমত, প্রত্যেকটি গল্পের ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আছে। সেগুলি যদি রসোত্তীর্ণ হয়, তাহলে কোনোটা কোনোটার চেয়ে খাটো হয় না। হয়তো বিষয়গৌরবের জন্য বা অনেক সময় নতুন ধরনের পরীক্ষামূলক কারুকৃতির জন্য কোনোটাকে উচ্চস্তরের বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই মোহ ত্যাগ করলে সার্থক গল্পগুলি সবই এক মূল্যের। আবার, কোনো গল্প লেখকের কাছে ব্যক্তিগত কারণে বিশেষ প্রিয়ও হতে পারে, কিন্তু সেটাও নির্বাচনের মানদণ্ড হওয়া উচিত নয়। কাজেই গল্প নির্বাচন করতে গিয়ে আমাকে ধন্দে পড়তে হয়েছে।

যথাসম্ভব নানা স্বাদের, নানা মাত্রার এবং নানান বাগ্‌ভঙ্গির গল্প বেছেছি। বৈচিত্র্যই এই গল্পগুলির একত্রিত হওয়ার মূল কারণ। অর্থাৎ, পাঠক এই গ্রন্থটি হাতে করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও রসের স্বাদ নিতে নিতে এগোতে পারবেন। 'মর্তুকাম', 'ক্যালভেরি', বা 'পিঁপড়ে'-র মতন সমকালীন বিষয়ের উপর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির গল্প যেমন আছে, তেমন আছে 'কাঁটাচুয়া' বা 'ক্যালক্যাটা মকটেল'-এর মতো ফ্যান্টাসি-ছোঁয়া বর্তমানের গল্প। আবার চিরকালীন ভালবাসা, আশ্রয়, প্রার্থনা, নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের দ্বন্দ্বের চিত্রও আছে 'বারান্দা', 'পিসিমা', 'স্বৈরিণী' ইত্যাদি গল্পে। আশা করব, পাঠক বিচিত্র রস ও রীতির এই গল্পগুলি উপভোগ করবেন।

বাণী বসু

সূচি

বেহুলার ভেলা

দীর্ঘ পনেরো বছর পর এক কৃতজ্ঞ মক্কেলের নির্বন্ধাতিশয্যে বিখ্যাত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার দেখতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সংহিতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যাত্রা-থিয়েটার গানের আসর ইত্যাদি সাংস্কৃতিক চিত্তবিনোদনের অবসর বা সুযোগ কোনোটাই আমার আজকাল আর হয়ে ওঠে না। প্রত্যেকটি অনুপল বিপল ব্রিফ দিয়ে ঠাসা। কারণ শুধু অন্নচিন্তা নয়, অর্থলালসাকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। আসলে, সব দায়িত্বশীল বৃত্তিরই আমিষাশী উদ্ভিদের মতো কতকগুলো আঠালো আকর্ষ থাকে যাদের সাহায্যে বৃত্তিজীবীকে ধীরে ধীরে তারা নিজস্ব পরিপাকযন্ত্রের কেন্দ্রে টেনে নেয়। উদ্ধারের আশা কম। কোর্ট অর্থাৎ মক্কেল অর্থাৎ কেস অর্থাৎ সাফল্য অর্থাৎ আরও মক্কেল—কর্মের চক্রবৎ আবর্তন এই ছাঁচে চলতে থাকে। কাজেই নেহাত ভালো ছবি-টবি এলে একে-ওকে-তাকে ধরে টিকিটের ব্যবস্থা যদি বা করে উঠতে পারি, থিয়েটার দেখা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। তাই ক্লায়েন্ট ভদ্রলোক যখন অযাচিতভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে একেবারে রথ এবং সারথি নিয়ে উপস্থিত হলেন, না করিনি। থিয়েটার তো এককালে আমারও মগজে ঘুরঘুরে পোকার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে।

ইদানীং যে সমস্ত পেশাদার নাটক চারদিকে হচ্ছে তাদের মধ্যে এটাই নাকি শ্রেষ্ঠ। কলকাতা রঙ্গমঞ্চের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। নবযৌবন হলে রেকর্ড করা বা রেকর্ড ভাঙা উৎকর্ষের মাপকাঠি নয় জাতীয় ক্লিশে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতাম। কিন্তু এখন বহুজননন্দিত বস্তু মাত্রই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগায়। কী সেই সংজ্ঞাতীত রহস্যময় উপাদান যা জনগণেশ নামক অস্থিরমতি পাঁচমিশালি ব্যাপারটিকে দীর্ঘমেয়াদি সম্মোহনে রাখবার ক্ষমতা ধরে!

বিদেশি গাড়ির বিলাস-আসনে সাদরে বসিয়ে কিং সাইজ বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে মি. মান্না অর্থাৎ আমার মক্কেলটি বললেন, 'এ আপনার সো-কল্ড এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের আঁতলামো নয়, খাঁটি বনেদি জিনিস। শিশির ভাদুড়ি, ছবি বিশ্বেস ঘরানার। সহস্র রজনি তো কবেই পার হয়েছে। আরও কত রজনি রান করবে তার ঠিক নেই। দুর্দান্ত অভিনয় শুনছি।'

থিয়েটার হলের সামনে পৌঁছে জনপ্রিয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হল। প্রাগৈতিহাসিক মেরুদণ্ডী প্রাণীর কশেরুকা-শ্রেণির মতো গাড়ির সারি। হাউসফুল-বোর্ড টাঙানো হয়ে গেছে। অ্যাডভান্স বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন। টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। দেয়ালের গায়ে অতিকায় প্রাচীরচিত্র। তবে দামি নামের প্রধান কুশীলবদের নয়, এক ক্যাবারে নর্তকীর। খুব কসরতের ছবি। মুখের ডিটেল বাদ দিয়ে শুধু অবয়বহীন, লোভনীয় লাস্য-ভঙ্গি। মিস শর্বরী। তৎক্ষণাৎ সহস্র রজনি, শিশির ভাদুড়ি ঘরানা, দুর্দান্ত অভিনয় এই সমস্ত সম্প্রসারিত ভাবের সারমর্ম নির্ভুল উপলব্ধ হল। মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিয়ে সামনের সারিতে মি. মান্নার মেদলগ্ন হয়ে বসা গেল। আসলে আইনের আড়াই চালে ভদ্রলোককে অনিবার্য ব্যাবসায়িক ভরাডুবি থেকে বাঁচানো গেছে, ভবিষ্যতের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তের ভরসাও করছেন, তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ভদ্রলোক রৌপ্য রেকাবিতে সোনালি

তবক মোড়া যৌন উত্তেজনার নির্দোষ সুড়সুড়ি যখন-তখন উপহার দিতে চাইছেন। বিচক্ষণ লোক। কোন্ ক্ষেত্রে কোথায় থামতে হয় জানেন। শুধু ফি-তে কি আর এসব কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হয়?

কাহিনিটাই একটা হোটেল নিয়ে। ক্যাবারে-পর্ব প্রায় সমস্ত নাটক জুড়ে। তবে এ নটী নায়িকা, উপনায়িকা এমনকি ভ্যাম্পও নয়, এর কাজ শুধু কারুকাজ। আবহসংগীতের মতো আবহনৃত্য। পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে মৌলিক এবং সাহসী। সর্বোপরি, মেয়েটির ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স অবাক করবার মতো। একেবারে মন্দিরগাত্র থেকে কেটে তুলে আনা। ওই সাইজের ক্ষীণ কটিদেশ যে কি কায়দায় দু-প্রান্তের চমকপ্রদ পৃথুলত্ব ব্যালান্স করে রেখেছে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এ রমণীর স্রষ্টাকে নির্ঘাৎ ফিজিক্সের অঙ্ক কষতে হয়েছে। মি. মান্নাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন, সংক্ষেপে বললেন, 'ফাটাফাটি'। আড়চোখে দেখলুম. নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তবে অভিনয় সম্পর্কে উনি খুব একটা অতিশয়োক্তি করেননি। কাহিনিবিন্যাস, সংলাপ, অভিনয়, আলোকসম্পাত এবং আধুনিক মঞ্চের টেকনিক্যাল স্টান্ট সহযোগে সামগ্রিক যোগফল প্রশংসনীয়। পাকা হাতের কাজ। মঞ্চে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগকে যাঁরা অনাটকীয় মনে করেন এবং অভিনয়শিল্পকে পূর্ণ সুযোগ দেবার জন্য মঞ্চকে শেকসপিয়রীয় যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, যখন 'অরণ্য' লেখা নোটিশ ঝুলিয়েই দৃশ্য-পরিকল্পনার দায় চুকিয়ে দেওয়া হত আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। ইনটেলেকচুয়ালরা যা-ই-ই বলুন আমার ভালো লাগল।

শেষ অঙ্কের আগে যবনিকাপাত হয়েছে। মি. মান্না আমার হাতে ঠান্ডা পানীয়ের বোতল দ্বিতীয় দফা ধরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়েছেন এমন সময় জনৈক মঞ্চকর্মী আমার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। সাজঘরের মধ্যে থেকে কেউ আমাকে সমাপ্তির পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বলছেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ। যদি একলা এসে না থাকি সঙ্গী-টি অথবা-দের বিদায় করে যেন অবশ্যই এই কর্মীর সঙ্গে ভেতরে যাই।

নাটক শেষ হলে মি. মান্নাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। উনি বললেন, 'হুম্। নাটকের মধ্যে নাটক। ডাকছে যখন, যাবেন বইকি! তা কিছু গেস করতে পারলেন না কি লেডিস না জেন্টস?' আমি হেসে বললাম, 'না।'

'কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু স্যার যাই বলুন, গাড়ি রেখে যাচ্ছি, নইলে ফেরবার সময় আপনি বিপদে পড়বেন। শোফারকে বলে যাচ্ছি, যখন যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেবে।' বাঁ চোখটা সামান্য টিপলেন মান্না, 'আমি একটা ট্যাকসি ধরে চলে যাচ্ছি।' প্রচুর আপত্তিতেও ফল হল না। মি. মান্না আমাকে বাধিত করবেনই।

আইনজীবীর বৃত্তিতে মন্দ দিন কাটল না। এখন কৌতূহল উদগ্রতার স্ফুটনাঙ্ক স্পর্শ করে না। মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলবার শিক্ষা আরও কয়েকটি স্বাধীন বৃত্তির মতো এ-বৃত্তিরও অন্যতম শর্ত। খেলার মধ্যে যে-কোনো রকম আবেগকে প্রশ্রয় দিলে ভরাডুবির শঙ্কা জেনে স্থির মস্তিষ্কে খেলা শুরু এবং শেষ করতে হয়। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে সাজঘর কমপ্লেক্সের একটি একান্ত উইং-এ যখন পৃথিবীতে এত ব্যক্তি থাকতে সংহিতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল তখন বিস্মিত হলাম বললে কমিয়ে বলা হবে। হতভম্ব হয়ে গেলাম।

সযত্নে মেক-আপ তুলে ফেলেছে। ক্রিমমাখা তেলতেলে মুখ। খোলা চুল। গেরুয়া রঙের শাড়ি আর লাল ব্লাউজ। সংহিতা আমায় দেখে উঠে এল। কপালে সিঁদুরের তিলক আর হাতে একটা ত্রিশূল ধরিয়ে দিলে উপন্যাসে পড়া সুন্দরী ভৈরবীর বাস্তব সংস্করণ মনে হতে পারত। বিশাল বিশাল চোখ মেলে সত্যিকারের অবাক দৃষ্টিতে দারুভূত আমার দিকে তাকিয়ে সংহিতা বলল, 'স্যার, আপনি এখানে?'

সামান্য রাগ হল। এটা শুঁড়িখানা না বেশ্যালয়? যে আমাকে এখানে দেখে এমন বড়ো বড়ো চোখ করবে সংহিতা! পরক্ষণেই অবশ্য বুঝলাম এখানে উপস্থিত থাকাটা গর্হিত এমন ইঙ্গিত করে আমাকে লজ্জা দিতে বেচারা চাইছে না। বহুদিন পর দেখা হলে পরিচিতজনকে তো আমরা প্রথম প্রশ্ন এই-ই করে থাকি! তুমি এখানে? কাজেই ইংরেজি হাউ ডু য়ু ডু-র মতো ওর প্রশ্নটা ওকে ফিরিয়ে দিয়েই আমি জবাব দিই। উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম না। প্রশ্নটা নেহ্যত করার জন্যই করা। কারণ এতক্ষণে আমি বুঝেই গেছি নাটকের আবহরচনাকারী সেই কারুকুশলিনী ক্যাবারে নর্তকীটি সংহিতাই। বুঝেছি এবং বুঝে মর্মাহত হয়েছি।

সংহিতা বলল, 'কফি বলি?' মান্নাসাহেবকে বাধিত করতে দু-বার চা দু-বার ঠান্ডা পানীয় হয়েছে, আবার কফি? সামাজিকতা দেখছি আজ আমার স্বাস্থ্য শিকার না করেই ছাড়বে না। কিন্তু সামনে কোনো গরম পানীয় না থাকলে আলাপ জমা তো দূরের কথা, আরম্ভই যে হতে চায় না! অগত্যা বললাম, 'বলো।'

আপনার কী খবর সার?

ভালো।

বউদি আছেন?

হ্যাঁ।

ছেলে-মেয়ে?

হ্যাঁ।

ক-জন?

একা।

প্রোফেশন চেঞ্জ করলেন যে?

এমনি।

ভালো লাগছে?

হ্যাঁ।

আমায় কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবেন না?

অবশেষে সংহিতা হতাশ গলায় বলল, 'আমায় কি ঘেন্না করছেন সার?'

না।

ঘেন্না করবার মতো কিছু কি আমি করেছি?

সংহিতা কারণ ছাড়াই উত্তপ্ত। বলে ওঠে,

'সকলেই তো কিছু না কিছু বিক্রি করে। আপনারা বিদ্যা বিক্রি করেন না? বুদ্ধি বিক্রি করেন না? ঈশ্বর যদি আমাকে শো-বিজনেসের মূলধন ছাড়া আর কিছু না দিয়ে থাকেন তাই দিয়েই তো সম্মানের অন্ন আমায় জোগাড় করতে হবে?'

সংহিতা তার পেশার সপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা ভাঙা ভাঙা বাক্যে দিতে থাকল যেমন করে একদিন ও যুক্তিজালে ওথেলোর মহত্ত্ব ধূলিসাৎ করত, *দ্বিতীয় এডোয়ার্ড*-এ রানি ইসাবেলার সমস্ত দুষ্কৃতি পরিস্থিতির বিচারে ক্ষমার যোগ্য বলে ঘোষণা করত। অবিকল সেই ভঙ্গিতে। কিন্তু আমি তখন বহুদূর মনস্ক। স্মৃতি ট্রেকিং করছে আরোহ, অবরোহ, হিমবাহ সংকুল অতীতবর্ষে, সেই সময়ে যখন আদর্শের জন্য মানবিক ক্ষুধা, সৃজনের রাসায়নিক তাগিদ, দিবারাত্রের জাগর স্বপ্ন প্রায়শই ঘনীভূত হয় নারীবিগ্রহে। যখন অন্বিষ্ট ছিল সংহিতা।

হ্যাঁ, সংহিতা আমার ছাত্রীই ছিল। উজ্জ্বল ছাত্রী। উজ্জ্বল বুদ্ধিতে। উজ্জ্বল ব্যবহারে। আর

আকৃতি? এখন যে কোনারকের দেবনর্তকী, খাজুরাহোর যক্ষিণী তখন সে তার নবীন বয়সে অধ্যাপকের নবীন চোখে কী ছিল? অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, ক্লাসে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সংহিতা সম্মোহন চৌম্বক-স্পর্শে আমায় গ্রাস করত, আমার সকল গান তখন শুধু তাকেই লক্ষ করে, আবিষ্টের মতো শেষ করতাম বক্তৃতা, স্বপ্নচালিতের মতো স্টাফরুমে ফিরতাম। হাইড্রোজেন পরমাণুর একমেব ইলেকট্রনের মতো সংহিতা নিউক্লিয়াসের চারদিকে অমোঘ আকর্ষণে পরিক্রমা করত মন। আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে সোচ্চার সেই সংহিতা-যুগ। গোপন, কারণ স্পর্শভীরু, মর্যাদাসচেতন অধ্যাপক ঘুণাক্ষরেও এ কথা কারও কাছে হাবে-ভাবে, বাক্যে-ব্যবহারে প্রকাশ করেনি, সোচ্চার কারণ নিজের কাছে ওই আকর্ষণের চেয়ে স্পষ্ট এবং জোরালো তার আর কিচ্ছু ছিল না। এইসব অনুভূতির কথা স্বীকার করতে ত্রাস হয় যখন বুঝি হিসেবি জজিয়তির পুরোনো অধ্যায়ের ব্যক্তিগত ছেঁড়া পাতা কত অর্থহীন দেখায়, কিন্তু যতই ওরা এসব দিয়ে মুদির দোকানের মুড়ির ঠোঙা বানাক, এই ছেঁড়া পাতাই যে আমাদের সাধারণ জীবনের অসাধারণ ছিন্নপত্র!

যাক, গোপন করার শত চেষ্টাও কিন্তু মহিলাদের প্রতিভার কাছে বিফল হয়ে যেতে বাধ্য। বিফল হয়ে যায় এটাই সুখ। সংহিতা বুঝতে পারত বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ না করে আমায় বাঁচিয়েছিল, নইলে ক্লাসে নির্ঘাত প্রতিক্রিয়া দেখতাম। সংহিতার সঙ্গে আমার এই অপ্রকাশিত গোপন চুক্তি ছিল বড়ো আরামের। এ যেন একটা সুখের বল দিয়ে গৃহকোণে দ্বিপাক্ষিক খেলা। দুজনে দুজনের দিকে নিঃশব্দে বল গড়িয়ে দিই। বল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে আসে। এটুকুকেই আমি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ভূমিকা মনে করতাম এবং করে নিশ্চিন্ত থাকতাম। কারণ অধ্যাপক-ছাত্রীর সম্পর্কটাকে চট করে রোমিও-জুলিয়েট পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমার মানসিক বাধা ছিল। অধ্যাপক মহলে, ছাত্র মহলে বেশ একটা দীর্ঘস্থায়ী, মুখরোচক কেচ্ছায় পরিণত হবার কোনো সাধ আমার ছিল না।

কানে আসত মেয়েটির গোপন নাম না কি ভ্যাট-সিক্সটি নাইন। সার্থকনাম্নী বটে। কিন্তু সে মত্ততা সংহিতা অমন অবলীলায় সঞ্চারিত করত তার দায়িত্ব তার স্বভাবে আদৌ ছিল না। বড়ো সৎ, আন্তরিক প্রকৃতির মেয়ে বলে মনে হত। সপ্রতিভ, প্রাণোচ্ছল, সচেতন কিন্তু প্রগল্‌ভ নয়। রূপের জন্য জীবনের কাছ থেকে বিশেষ কোনো অধিকার দাবি করত বলেও মনে হত না। ফস্টিনস্টির পাত্রীই নয়। ফস্টিনস্টিকারী কোনো এক এক যুবককে পায়ের চটি খুলে মারার অপরাধে একবার ছাত্র ইউনিয়নের দাবিতে তাকে এক মাস সাসপেন্ড করা হয়। এক মাস পরে কলেজে যোগ দিয়ে সংহিতা প্রথমে প্রিন্সিপ্যালকে তারপর ক্লাসরুমের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সহপাঠীদের জানায় যে শাস্তি সে গ্রহণ করেছে এবং আবার যদি কেউ তার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করতে আসে সে ওই একই দাওয়াই-এর পুনরাবৃত্তি করবে।

সততা, সাহস ও চারিত্রিক গভীরতা এই তিনটি গুণের জন্যই আমি সংহিতার প্রতি আমার দুর্বলতাকে আরও বাড়তে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। নইলে মোহকে বিচারবুদ্ধি দিয়ে শাসন করবার বয়স এবং মনোবৃত্তিতে তখন পৌঁছে গেছি। বিশ্বাস করতাম সংহিতার মধ্যে সেই উপাদান আছে যাতে ও নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। নারী পরগাছা হিসেবে নয়। তার জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি চাই। সেই প্রস্তুতি কীভাবে গড়ব, স্বমহিমায় পুরোপুরি ফুটে ওঠবার জন্যে ওর যা প্রয়োজন সে উপকরণ আমি কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করে আনব, ব্যক্তিগত গবেষণার চেয়েও জরুরি ছিল তখন এইসব অন্বেষণ।

বি. এ ফাইনাল আসন্ন। ভাবলাম পরীক্ষার সময় বিরক্ত করা ঠিক হবে না। পরীক্ষাটা হয়ে

গেলে ও আর আমার ছাত্রী থাকছে না। তখনই প্রস্তাবটা পেশ করব। তারপর শুভস্য শীঘ্রম্। কিন্তু কানাঘুষোয় শুনলাম সংহিতা না কি এবার পরীক্ষায় বসছেই না। ওর বাড়ির ঠিকানাটা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। পরীক্ষা না দেবার খবর শুনে আত্মগ্লানির সঙ্গে মনে হল এর আংশিক দায়িত্ব কি আমারও? একটা চিঠি দিলাম। কোনও একটা দিন বিকেল তিনটে নাগাদ পার্কস্ট্রিটের চিনে রেস্তোরাঁয় বৈকালিক নিমন্ত্রণ। তিনটের সময় ওই রেস্তোয়াঁ একেবারে ফাঁকা থাকে। আলাপ এবং দরকার হলে প্রলাপেরও অসুবিধে নেই। নিশ্চিত হবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আমার প্রিয় অল-হোয়াইট-লুক অর্থাৎ সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজার্স, সাদা স্লিপ-ওভারে সেজে রেস্তোরাঁর টেবল বুক করে বসে রইলাম। কাঁটায় কাঁটায় তিনটেয় সংহিতা এল। অঙ্গে চোখ ধাঁধানো ক্যার্ডিগ্যান, নরম রঙের সিল্কের শাড়ি, কানে জ্বলজ্বলে লাল পাথর এবং পেছনে ইউনিভার্সিটির তৎকালীন ছাত্র নেতা—অমিতেশ বারিক।

সংহিতাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। দুঃখ, আশাভঙ্গ, অপমান এমনকি প্রতারণাও বোধহয় কালক্রমে ক্ষমা করা যায় কিন্তু উপহাস কদাচ নয়। উপহাসাস্পদ হবার লজ্জা ভোলার জিনিস নয়। তাই আজ পনেরো বছর পরেও ওর কাছে আমার কিচ্ছু জিজ্ঞাস্য নেই। ওর সব প্রশ্নের জবাবে আমার সব উত্তর একাক্ষরী।

কুজ্ঝটিজাল সরে গেল। দেখলাম ওর চোখের কুয়াশা আর্দ্রতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সংহিতা কি আমায় আরও কিছু জিজ্ঞেস করেছিল? উত্তর পায়নি? নরম গলায় বললাম, 'কেমন আছো বলো সংহিতা।' চিবুকের টোলের ওপর শিশির জমল। ধরা গলায় সংহিতা চোখ নীচু করে বলল, 'আপনি আমার কথা, অমিতেশের কথা কিছু জানেন না, না সার?'

চমকিত হলাম! সংহিতার কথা আমি সত্যিই জানতাম না। কিন্তু সংহিতাদের খবর তো মোটামুটি এক ধরনেরই হয়! বাল্যপ্রেম, কৈশোরপ্রেম, ধাপে ধাপে। তারপর প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে...। ইলোপমেন্টের পরিকল্পনা। প্ল্যান কেঁচে যাওয়া। অভিভাবক নির্বাচিত তিন হাজারি মনসবদারের দামি গলায় নিরাপদ বরমাল্য অর্পণ অতঃপর, সম্ভবত কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে করতে। এবং সুরক্ষা, সংহিতার যা ক্যাপিটাল তাতে করে তিন হাজারি কেন দশ হাজারিও অবলীলায় জুটে যেত। ও কি তবে এখনও অমিতেশের সঙ্গে যুক্ত আছে? অমিতেশের খবর সামান্য কিছু রাখতাম। সে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে, সে আনডারগ্রাউন্ডে—এমনি ছাড়া ছাড়া খবর কানে এসেছে। এর বেশি সংবাদ তো এসব ক্ষেত্রে মেলেও না। তবে অমিতেশ ছিল বেআইনি দেশি কারখানায় তৈরি হ্যান্ডগ্রেনেডের মতো অগ্নিবর্ষী। সে বোমা কাছাকাছির মধ্যে ফাটলে স্প্লিনটারের আগুনে কুচি ছুটতে দেখতাম—এ বিশ্বাস আমার ছিল। যেটুকু জানি গোপন করে বললাম, 'আমি তো ভিন্ন পথের পথিক। কিছু জানি না। বলো সংহিতা, তোমাদের খবর বলো।'

সংহিতা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে যা বলে গেল তার সারমর্ম হল অমিতেশ বারিকের মতো চাষির ছেলেকে বিয়ে করার সংকল্প করায় স্বগৃহ থেকে সে বহুদিন বিতাড়িত। অমিতেশের পিতৃকুল পৃথিবীর থেকে মুছে গেছে। প্রতিভাবান ছেলেকে দশজনের একজন দেখবার মানসে সর্বস্ব পণ করেছিলেন কৃষক পিতা। সংসারে আর কেউ ছিল না। সর্ব অর্থে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে তিনি মারা গেছে। বহুদিন আত্মগোপন করে থাকবার পর অমিতেশ অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সে খবর, তার ক্রিয়াকলাপ, অজ্ঞাতবাস কিছুর সঙ্গেই সংহিতার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবুও পুলিশ তাকে ছাড়েনি, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সে ধরে পড়ে, অত্যাচারে তার গর্ভপাত হয়, পরে তার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না নিশ্চিত বুঝে দয়া করে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। দু-তিন বছর

হল অমিতেশ ছাড়া পেয়েছে। অমানুষিক অত্যাচারে পঙ্গু। তাকে বাঁচাতে সংহিতা শেষ পর্যন্ত এই বৃত্তির দ্বারস্থ হয়েছে।

গল্পটা নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের রোম্যান্টিক উপন্যাসের কথাসার। অগ্নিযুগের পর, বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভের পর যে জাতের উপন্যাস বাতিলের খাতায় নাম লিখিয়েছে। কিন্তু গল্প যখন নিছক সত্য হয় এবং তার পাত্রপাত্রী যখন একেবারে রক্তমাংসের চেনা মানুষ হয় তখন তার আঘাত কী দুঃসহ! অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর আমি সংহিতাকে কথা দিলাম অমিতেশকে দেখতে আমি তাদের ডেরায় অবশ্যই যাব। সেই মর্মে স্থান এবং কালও ঠিক করা গেল।

যখন শিক্ষক ছিলাম ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করার অভ্যাস ছিল। ছাত্রপ্রিয়তার সস্তা লোভ হয়তো ভেতরে ভেতরে কাজ করে থাকবে, জানি না। তবে ওদের সঙ্গে ব্যবধানটা সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবধানের চেয়ে কম দুস্তর মনে হত। সদ্য পাস করে বেরিয়েছি। নীচেকার বেঞ্চ থেকে প্ল্যাটফর্মের চেয়ারে প্রমোশনটা যেন নেহাত আপতিক। চোখে তখনও নতুন কিছু করার স্বপ্ন, জিভে নতুন ভাষা. টাটকা ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসবার রোমাঞ্চ তখনও আমায় ছেড়ে যায়নি। ছাত্ররা আমায় দেখে সিগারেট লুকোত না, বারণ করে দিয়েছিলাম। ক্লাসে, করিডরে, কফিহাউসে যখনতখন যে-কোনও বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ত, তার অনেকগুলোতে আমি গো-হারান হেরে যেতাম এবং কোণঠাসা হয়ে সগর্বে হার স্বীকার করতাম। যে বিষয়ের ওপর বিতর্কে আমার পরাজয় অবধারিত ছিল তা হল পলিটিকস।

সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া আমার মতে ছিল যৌবশক্তির মারাত্মক অপচয়। অপ্রস্তুত, অর্ধপ্রস্তুত, মন-বুদ্ধি-হৃদয়বৃত্তির উপকরণ নিয়ে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অসম টক্করে লড়তে যাওয়া এবং তার ফলশ্রুতি আত্মহত্যার শামিল বলে মনে করতাম। গবেষকের মেজাজ নিয়ে তথ্য তোমরা জোগাড় করো, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, সাধ্যমতো সমাজকল্যাণের কাজে হাত পাকাও, প্রত্যেকটি মানুষই তো সেই একক যাদের পর পর গেঁথে তৈরি হয় সমাজের পাকা গাঁথনি! প্রত্যেকটি ইঁটের গুণগত উৎকর্ষের ওপর কি ইমারতের সামগ্রিক উৎকর্ষ নির্ভর করে না? একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের ছদ্মবেশী লড়াই চলছে। তার ভেতরের ছবি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়ে স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের মোহে রাজনীতির নোংরা দাবার ছকে বড়ের চালে পর্যবসিত হওয়া টিন-এজার ভ্রষ্টতরী ছাড়া কি! মহাকুজ্ঝটিকায় যার ছেঁড়া পাল ভাঙা হাল, একূল-ওকূল যার চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে!

আমার সমস্ত বাগ্‌বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ছিল—

জানি রজতদা, বিপ্লবকে, রক্তপাতকে আপনি ভয় করেন।

করি।

অথচ আপনার প্রিয় নেতা স্বাধীনতার জন্য রক্তের মূল্য চেয়েছিলেন!

স্বাধীনতা? সে তো তোরা পেয়ে গেছিস? পাসনি?

ফুঃ। এ জারজ স্বাধীনতা কে চেয়েছিল?

ইতিহাসকে তো উলটে দিতে পারিস না! যা পেয়েছিস তাকেই প্রাণপণে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে দোষ কি?

আমরা স্পার্টান আদর্শে বিশ্বাসী। আঠাশে শিশু প্রতিপালন করবার চেয়ে বরং ইতিহাসের ছক উল্টে দেব। দেওয়া যায়। আপনিও জানেন, আমরাও জানি।

ক্রমিক অসহযোগ কিংবা হঠকারী ক্যু দিয়ে শাসনযন্ত্রের উৎসাদনের যে প্রচেষ্টা তাকে সার্থক

করতে হলে প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, পৌরুষ এবং সর্বোপরি শুভবুদ্ধি থাকা দরকার। তার পুঁজি, তোদের কুষ্ঠগ্রস্ত নেতৃত্বে নেই, বিশ্বাস কর। এখনকার সব লড়াই শেষ পর্যন্ত গদির লড়াই। দল ভেঙে উপদলও আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, আদর্শের চুলচেরা পার্থক্যের খাতিরে নয়, স্বার্থের চুলচেরা হিসেবের জন্যে। যদি ভেবে থাকিস তোরা সেতুবন্ধের কাঠবেড়ালি, ভুল করবি, তোদের ভবিতব্য সেই হতভাগ্য মূষিকগুলোর মতো বাঁশিওলার মারণসুরের তালে তালে যারা নদীতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল।

ওদের তর্ক আবার উত্তাল হয়ে উঠত। সার বিশ্ব খুঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে আসত উদাহরণ। বিপ্লব এবং বিপ্লব। এবং আশ্চর্য একই উদাহরণ থেকে আমরা কীরকম ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি! অবশেষে ওরা ফিরে আসত স্বদেশের অগ্নিযুগে। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল। অবোধ-কৈশোরের আনাড়ি হাতে মারণাস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসিমঞ্চে পাঠাবার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে গর্ব করার এই জাতীয় প্রবণতা স্মরণ করলে এক দুর্জয় আর্তক্রোধে আমার অন্তরাত্মা জ্বলে যেত। স্বরাজপূর্ব বালকবলির ট্র্যাডিশন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে-সব মাস-হিপনটিস্ট আজও চালিয়ে যেতে চায় আমি তাদের সর্বান্তঃকরণে অভিশাপ দিই। কিন্তু ওদের সামনে এতটা উষ্মা প্রকাশ করা কি সমীচীন?

বিপ্লব না হলে আপনাদের পচা সমাজের কাঠামো পালটাবে না।

ভবিষ্যৎ সমাজের ছকটা তোদের কাছে তা হলে পরিষ্কার!

ইয়েস, ব্লু-প্রিন্ট তৈরি।

তাই বুঝি? আমার ধারণা ছিল থিয়োরি একটা সেড়া করে দেয় মাত্র। তারপর দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে তার অদলবদল না হওয়াটা অস্বাস্থ্যকর। জীবন যখন চলিষ্ণু, তত্ত্বকে তখন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নইলে আবার তৈরি হবে অচলায়তন যাকে ভাঙতে আবার তোদের শাবল, গাঁইতি, গ্রেনেড, ডিনামাইটের দরকার হবে।

উপহাস করছেন রজতদা?

উঁহু। তোরা আমাদের বংশধর। তোদের হাতে সাধের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাব বলেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা। তোদের ক্যানন ফডার হতে দেখে ভেতরটা জ্বলে যায়। যা মহাকাশযান হতে পারত তা আতশবাজিতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোরা হলি ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সেই হতভাগা রেজিমেন্ট যারা ভুল কম্যান্ডে চোরাবালির অতলে গিয়েছিল।

তারা বীর ছিল রজতদা। আপনাদের মতো কাপুরুষ নয়। নিজেদের পিঠ বাঁচাতেই আপনাদের এই সমস্ত পুথিগত যুক্তির ভণ্ডামো!

নিঃশ্বাস ফেলে ব্রেখটের গ্যালিলিয়োর সেই উক্তি স্মরণ করতাম—হতভাগ্য সেই দেশ যে দেশে শুধু বীরপুরুষেরই প্রয়োজন হয়। সোল্লাস স্লোগান ভেসে আসত, 'চলছে, চলবে, লড়াকু ছাত্র লড়ছে, লড়বে।' মনে মনে বললাম, লড়ছে, লড়বে, মরছে মরবে, আস্তিনের পেছনে যারা হাসবার তারাও হাসছে হাসবে। কত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজতাত্ত্বিক, চিকিৎসক, কত প্রতিভাধর এমনি করে বোকা বনে অপঘাত লুঠছে তার হিসেব তো তোরা চাস না! এইজন্য, এরই জন্য কি সৃষ্টির সূর্য জ্বলেছিল!

উনিশ'শো বাহাত্তর। তিন বিখ্যাত ছাত্র নির্মলেন্দু লাল, প্রদীপ জানা আর মনোজিৎ বাগচি বেপাত্তা হল। নির্মল, যার পেপার মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিখ্যাত জার্মান জার্নালে প্রকাশিত হয়ে বিশ্ববন্দিত হয়েছিল সে আমার চোখের সামনে বৃদ্ধ প্রিন্সিপালকে রিঅ্যাকশনারি বাস্টার্ড বলে ঠাশ করে এক চড় কশাল। পাইপগান তাক করে মনোজিৎ বলল, রেজিগনেশন লেটারটা পাঁচ

সেকেন্ডের মধ্যে সই করে না দিলে গরম সিসেগুলো নাকি সোজা ওঁর বস্তাপচা ব্রেনের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। তখনকার মতো সমবেত প্রচেষ্টায় তাদের নিরস্ত্র করা গেল। কিন্তু পরে কলেজ ক্যাম্পাসে যখন তিনি খুন হলেন সকলেই অনুমান করল এ ওই ত্রয়ীর কাজ। আমি অনুমান করতে চাইনি। মনোজিৎ আমার সবচেয়ে গর্বের ছাত্র ছিল। মহাশক্তিধর কলম ছিল তার। অধ্যাপক মহলে, প্রদীপের নাম ছিল হিউম্যান কম্পিউটার। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষাগুরুদের শেষ প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিহত হল বিজ্ঞানী শিল্পী গণিতবিদের প্রতিভাধর নব প্রজন্ম। বিপ্লবের হাতে।

সেই আমি চাকরি ছাড়লাম। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি তখন থেকেই। সিভিল প্র্যাকটিস করি। আদালত আমার বিবেককে মোটামুটি একটা সহনীয় আশ্রয় দিয়েছে। সুখী নই। সন্ত এবং মূঢ় ছাড়া এ পৃথিবীতে সুখী কে? কিন্তু ন্যূনতম শান্তির জন্য জীবনের সঙ্গে একটা রফায় পৌঁছোনো দরকার। হাজার হাজার বছরে পুঞ্জিত সভ্যতার সম্পদকে লাথি মেরে ওরা নখদন্তে বর্বর আরণ্যক আইনের কাছে ফিরে যাবে, নপুংসকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব—এ মর্মদাহ থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম।

গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম গ্র্যান্ডের তলায়। সংহিতা এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ও একটু একটু ভিজেছে। চুলে বৃষ্টির কুচি। চোখের বড়ো বড়ো পাপড়িতেও দু-একটা পোখরাজের দানার মতো আটকে আছে। আঁচলে মুখটা মুছে নিল সংহিতা। থিয়েটারের চড়া মেক-আপ ব্যবহারে ওর মুখের চামড়ার খয়েরি খয়েরি মেছেতার মতো দাগ। আগের বার বিজলিবাতির তলায় বুঝতে পারিনি। শ্রমসাধ্য জীবিকার কালি চোখে মুখে। সব রূপসি নারীই তা হলে ইন্দ্রাণীর সিংহাসনে সখীপরিবৃতা হয়ে বিরাজ করে না! ভুবনজুড়ে অলক্ষ্য ফাঁদ বিসর্পিত, মহাকবির ভাষায় কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে। যে যেখানে যাবে বলে বেরিয়েছিল, যাওয়া হয় না। ভুল স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে ট্রেন চলে যায়। মুখ যেমন মনের আয়না নয়, সকাল যেমন নয় পরিণত দিনের অভিজ্ঞান তেমনি কার কর্মফল কাকে কোন্ চক্রনেমিতে বেঁধে মহাকালের পথ পরিক্রমা করবে কারও জানা নেই।

ঠিকানা পূর্ব কলকাতার। সংহিতার নির্দেশে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাচ্ছি। চোখ উইন্ডস্ক্রিনে। রক্ষণশীল মেজাজের লোক। পরকীয়াতত্ত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না। একদম অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সংহিতা বলে উঠল—আমি কিন্তু অন্য চাকরি খুঁজেছিলাম, সার।

বুঝলাম গতদিনের সাক্ষাৎকার এখনও ওর বুকে হুল ফুটিয়ে রেখেছে। বড়ো কষ্ট হল, বললাম—কি হল, পেলে না?

আমার তো সেই থেকে বি. এ-টা কমপ্লিটই হল না! ও যখন নিরুদ্দেশ চেষ্টাচরিত্র করে স্টেনোগ্রাফি শিখে নিয়েছিলাম। ও চাকরি করেওছিলাম কিছুদিন। কিন্তু অত সামান্য টাকায় এখনকার খরচ আর চালাতে পারি না।

কত টাকার দরকার তোমার, সংহিতা!

অনেক অনেক সার। সে আপনি না-ই শুনলেন। ডাক্তারদের ফি-এর কথা তো আপনি জানেনই। সব্বাইকে নিয়মিত বাড়িতে ডাকতে হয়। প্যাথলজিক্যাল টেস্ট রেগুলার। শুশ্রূষা এবং আনুষঙ্গিক আরও। শরীরে ওর কিচ্ছু নেই। সাইকিয়াট্রির কী প্রচণ্ড খরচা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না সার, প্রতি সপ্তাহে অ্যানালিসিস, এক একটা সিটিং পঞ্চাশ। পুরো দেড় বছর এই জিনিসও চালাতে হয়েছে।

'তোমার পেশাটা বিপজ্জনক, সংহিতা'—সন্তর্পণে উচ্চারণ করি।

যতটা ভাবছেন ততটা নয় সার, স্টেনোগ্রাফারের চাকরিটা এর চেয়ে হাজারগুণ বিপজ্জনক

ছিল। সেখানে বিপদ কোনদিক থেকে কীভাবে আসবে বোঝা যেত না। এখানে বুঝি। আওয়াজ কম। টাকা বেশি। অমিতেশকে সময় দিতে পারি।

এদিকে যখন এলেই ফিল্মে-টিলমে গেলেও তো পারতে। তোমার টাকার ব্যাপারটা ফর গুড্ সলভ্‌ড হয়ে যেত!

অত সোজা ভাববেন না সার, তেমন যোগাযোগও আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। তা ছাড়া আপনি বোধহয় সিনেমা দেখেন না, আমার চেহারায় একজন নামকরা স্টারের ভীষণ সাদৃশ্য আছে। ওই জন্যেই ও লাইনে আমার কোনোদিন কিছু হওয়া শক্ত। তৃতীয় সারিতে থেকে যাওয়ারই কপাল!

নাচই যখন বেছে নিলে, সত্যিকার নৃত্যশিল্পীও তো হতে পারতে!

আপনি এখনও আগের মতোই ছেলেমানুষ আছেন সার, সংহিতা বলল,

আমি কি কোনোদিন নাচের জন্যে তৈরি হয়েছি, নাকি? তা ছাড়া উপযুক্ত গুরু শিক্ষার সুযোগ, প্রতিভা কিছুই কি আমার ছিল? পড়ে গেলাম তো ঘূর্ণিঝড়ে! আমার ফিগারে ক্যাসিক্যাল ডান্স হওয়াও শক্ত। আপনার মনে নেই 'উওম্যান অফ রোম'-এ আদ্রিয়ানাকে ব্যালে-স্কুল থেকে কেন ফিরিয়ে দিয়েছিল?

বলেই সংহিতা অপ্রস্তুত হয়ে ঠোঁট কামড়াল। ওর মনে হয়ে থাকবে তুলনাটা বেফাঁশ হয়ে গেল। বাকি সময়টা ও কাঠ হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল, আর একবারও মুখ ফেরাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারল না।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম অমিতেশকে সংহিতা খুব সুখে রেখেছে। আমি বেলেঘাটার বস্তি-টস্তি আশঙ্কা করেছিলাম। মোটেই না। দু-কামরার ছোটো ফ্ল্যাট! দোতলায়। নতুন চুনকাম। আসবাব কম কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন। প্রচুর আলো হাওয়া, বাতাসে চন্দন ধূপের গন্ধ। কিন্তু অমিতেশকে চেনা যে কোনও লোকের পক্ষে শক্ত ছিল। ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ সেই বীরভূম ঘরানার কৃষক সন্তান, যার পিতৃপুরুষ শুধু কাঁধের জোরে জোড়া বলদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শ্বেতির তাপ্পি। স্বাভাবিক গ্রামবাংলার নির্ভেজাল কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে শ্বেতির এই বৈপরীত্য এক কথায় বীভৎস। লোহার ফ্রেমের মধ্যে শরীরটা আটকানো। পাঁজরা বাঁকা। অনেক রকম রোগ, অনেক রকম চিকিৎসা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সব সেরে যাতে এসে দাঁড়িয়েছে তার নাম স্পাইন্যাল টিউবারকুলোসিস। সংহিতা আশ্বস্ত করল রোগটা ছোঁয়াচে নয়। হাতের আঙুলগুলো ব্যবহার করতে পারে না। প্রত্যেকটি আঙুলের গাঁটে পুলিশ কি কায়দা করেছে যার জন্য আঙুলগুলো অকেজো হয়ে গেছে। ফিজিওথেরাপি চলছে। দূর ভবিষ্যতে নিজের হাতে খাওয়া-দাওয়া করার ক্ষমতা ফিরে পেলেও পেতে পারে। অন্তত সংহিতার তাই আশা।

অমিতেশ ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। 'যাতে আর কোনোদিন ছুরি-ছোরা-রিভলভার ধরতে না পারি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, রজতদা। জানে না আঙুলের গ্রন্থি আসল রিভলভারটা ধরে না।'

সতেজ কণ্ঠ। সজীব চোখ। সজীব মস্তিষ্ক। বিধাতার কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই বীরপুরুষেরা!

ধবধবে বিছানার প্রান্তে একটা অয়েল ক্লথ ভাঁজ করে পেতে দিল সংহিতা। বড়ো ট্রেতে খাবার নিয়ে এল। মুরগির স্টু, কাঁচা স্যালাড, সুগন্ধ ভাত, ছানার সন্দেশ। চামচ করে খাইয়ে দিল। তারপর সযত্নে ধুইয়ে মুছিয়ে অয়েল ক্লথ ট্রে তুলে নিয়ে গেল। আমাকে বলল, 'রোগীর ঘরে আপনাকে দোব না সার, আপনি বাইরে আসুন।'

আমার তো খাওয়ার কথা ছিল না! লাঞ্চ সেরে বেরিয়েছি সংহিতা।

সে কী! আমরা খাব, আর আপনি খাবেন না, তাই কি হয়? খেতেই হবে।

বললাম, 'শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের যুগ চলে গেছে। জোর করে খাওয়ালে আজকালকার বাঙালি

পুরুষ কিন্তু মোটেই খুশি হয় না। আমার খাওয়া-দাওয়ার সময়, পরিমাণ সব বাঁধা। যাব'ব সময় চা খেয়ে যাব, তুমি ব্যস্ত হয়ো না সংহিতা।'

মুখটা ওর ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু আর জোর করল না।

আমি অমিতেশের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। অন্তরালে সংহিতা তার গৃহস্থালির লক্ষ কাজ সারতে লাগল। সম্ভবত রান্নাবান্না, ঝাড়পোছ, ধোয়াপাকলা, বাজারহাট, সর্বোপরি শয্যাগত পঙ্গু রোগীর সেবা, যে জলটা পর্যন্ত নিজে খেতে পারে না—এসবের জন্য ওর কোনো সাহায্যকারী নেই।

অনেকদিন পর কথা বলার লোক পেয়ে অমিতেশ খুব খুশি। সমাজ পরিত্যক্ত, নির্বান্ধব, রাহুগ্রস্ত এই যুগলের কাছে কে-ই বা আসে! কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই বুঝলাম পনেরো বছরেও অমিতেশ একটুও বাড়েনি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ত্রিমাত্রায় গড়া মানুষ সে নয়। সে একমাত্রিক। শুধু ভবিষ্যতের আয়তনে বিশ্বাসী। তার অনতি-অতীত জীবনের কথা আমি জানি না, অনুমান করতে পারি । কিন্তু অমিতেশ সে-ধার দিয়েই গেল না। সে যেন আরব্য উপন্যাসের সেই ধীবর। অতীতের দৈত্যটাকে কলশির মধ্যে পুরে কোনো মহাসমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে এসেছে। বলল, 'খুব ভালো আছি রজতদা, নেভার ফেল্ট বেটার। এই খাঁচাটা দেখছেন? বছরখানেক পর মনে হয় এটার আর দরকার হবে না। উঠে দাঁড়াতে পারব। আঙুলগুলোর কথা ভাবি না। শরীরটা আর বিপ্লবের কাজে লাগবে না। কিন্তু অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সংগঠন তৈরির কাজে শিগগিরই হাত দেব। ফুল প্রুফ। বুলেট প্রুফ।'

আমার হয়তো অনধিকার চর্চা। তবু কীসের তাগিদে বলে ফেললাম জানি না, 'বিপ্লবের প্রতি কর্তব্য ছাড়া আর কিছুর প্রতি কোনো কর্তব্যের কথা তোমার কখনও মনে হয় না অমিতেশ?'

আপনি কি সংহিতার কথা বলছেন?—অমিতেশ একদেশদর্শী হতে পারে, বোকা নয়।

খানিকটা।

একটা মহৎ স্বপ্ন সত্য করতে গেলে ওরকম অনেক মেয়েব আত্মত্যাগের দরকার হয় রজতদা। যারা কোম্পানি এগজিকিউটিভের বউ হয়ে শেষ দুপুরের কফি পার্টিতে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে যায় সেরকম শৌখিন মজদুরির ধাত সংহিতার নয়।

এ কথা আমি খুব জানি! তুলা রাশি, ধনু লগ্ন। জ্যোতিষে বিশ্বাস করি আব না ই করি, শুনেছি মানিয়ে নেবার অমানুষিক ক্ষমতা থাকে এসব জাতক-জাতিকাব। বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা তুলনাহীন। সংহিতার ভবিতব্যই তাকে হাত ধরে বিপ্লবের এই নাভিকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ-ও নিশ্চিত জানি সে ভবিতব্যের অন্য নাম ভালোবাসা, সেই পুরাণ কথিত বস্তু, যার জোরে মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। সংহিতার মুখে আমি সন্ত্রাসী বিপ্লব সম্পর্কে কোনো বিশ্বাসেব কথা কোনোদিন শুনিনি। বিপ্লবের প্রয়োজনে সে সামান্য দৌত্যের কাজও কখনও করেছে বলে জানি না। দরজার দিকে সভয়ে তাকালাম। ধারে কাছে নেই তো? না থাকলেই ভালো। অমিতেশের ভাষায় তার দেওয়া-নেওয়ার হিসেব-নিকেশ সংহিতার পছন্দ হবে কি?

অমিতেশ আলাপে আগ্রহী। তার পরিকল্পনার রূপরেখা আমার মতো অবিশ্বাসী কাফেরকে সে বলবে কেন? কিন্তু স্বপ্নসৌধের সম্ভাব্যতার কথা আলোচনা করতে তো দোষ নেই। জ্বলজ্বলে চোখে, গমগমে গলায়। কিন্তু আমি এই আলোচনায় এই বিতর্কে একদিন এত বেশি যোগ দিয়েছি এবং শুধু প্রাণশক্তির প্রবল জোয়ারি চাপে বুদ্ধির সমস্ত শক্তিকে পরাভূত হতে দেখেছি যে এই নিষ্ফল বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করতে আমার এখন বড়ো ক্লান্তি! আমি শুধু মানবিক, বৌদ্ধিক আলাপচারিতে রাজি অমিতেশ!

বহুক্ষণ একতরফা উত্তেজিত বক্তৃতার পর তাই শ্লিষ্ট হাসি হেসে ও বলল, 'আসলে কী জানেন রজতদা, ব্রিটিশের তৈরি সাহিত্যগুলো আর ওই অপসংস্কৃতিতে ভরতি স্যান্‌স্‌ক্রিট লিটারেচার-টারগুলো আপনারা বড্ড বেশি পড়েছেন। আপনাদের ধাতটা হয়ে গেছে কন্‌স্‌টিট্যুশন্যাল। ছকের বাইরে কিছুর কথা আপনারা কল্পনা করতে পারেন না। নীচ প্রবৃত্তিগুলোর সাবলিমেশনকে শিল্পের নামে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আপনারা বোধহয় স্বপ্নও দেখেন বানান করে করে। ফ্রয়েড সাহেবের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে অ্যাভারেজ বাঙালির চিত্তবৃত্তি থেকে সাপ্রেশ্‌ড্‌ লিবিডো ছাড়া কিছুই বেরোবে না। আসলে আপনি চিরকাল সেই আদি অকৃত্রিম শোধনকারী বুর্জোয়াই রয়ে গেলেন।'

সংহিতা বাইরের পোশাকে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে গভীর ক্লান্তির কাজল। ওর মঞ্চে যাবার সময় হল। আমিও এবার উঠি, সৈনিকের তিরস্কার শিরোধার্য করে। বলার কিছু আছে কি? দৃষ্টিহীন সংকল্পে বেঁকে আছে বিদ্রোহীর কঠিন করতল। ওদিকে ঘাটে ঘাটে সাধ্বীত্বের কঠিনতর পরীক্ষা দিতে দিতে নাগিনীদষ্ট পূতিগন্ধময় শবদেহ নিয়ে ভেলা চলেছে। লম্পট সভায় ছিন্ন খঞ্জনার মতো নেচে নেচে বেহুলা নাচনি একদিন না একদিন আদায় করে আনবেই মুক্তিপণ। বিপ্লব জানতে চাইবে না কীসের মূল্যে মুক্তি খরিদ হল।

পরমা

কর্মস্থল পুনে। কলকাতায় জন্ম হলেও কর্ম নয়। পনেরো বছরেরও ওপর প্রবাসে কেটে গেল। এখানে আর আমার শেকড় থাকার কথা না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক বৃক্ষের মতো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বুঝি ভিন্ন মাটিতে রোপণ করা যায় না। নিজস্ব মাটির গন্ধ তাকে ভেতরে ভেতরে পিছু হাঁটাবেই। বুকের মধ্যে আনচান ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে। কোনো মহাজলধির অন্ধকার গর্ভগৃহ থেকে পাতালশঙ্খের ধ্বনি আবর্তিত হতে হতে উঠে আসে ; জলকল্লোলের মধ্যে পিষ্ট হতে থাকে অস্তিত্ব। আঁকুপাঁকু করে জেগে উঠি। প্রাণপণে বর্তমানের, সচেতনের ভাঙা পাড় আঁকড়ে ধরি, যা নাকি অবচেতনের অনুপাতে আইসবার্গের দৃশ্যমান এক অষ্টমাংশের মতোই অকিঞ্চিৎকর। নিজের পায়ের ছাপ ধরে ধরে মাঝে মাঝেই তাই ফিরে আসি বর্তমানের অব্যর্থ শরসন্ধানে, যদি অতীতের বিক্ষিপ্ত হারানো তিরের ফলাটা বিদ্ধ করে আনতে পারি। কিন্তু পারি না। যা নিজেরই হৃৎপিণ্ডের গভীরে প্রোথিত তাকে কি নিজ হাতে তোলা যায়? কেউ কি পেরেছে?

এবার আসাও বিশেষ করে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মূলের সঙ্গে যোগ সর্বস্তরে হওয়া চাই। নইলে বৃক্ষ বাঁচে না। প্রত্যেকবারই অনেক ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের তলায় এই জরুরি আসল উদ্দেশ্যটা চাপা থাকে। কোনোবারই কাজটা হয়ে ওঠে না। এবার আমার সেই প্রয়োজন আমার সমস্ত অস্তিত্বের টুঁটি টিপে ধরেছে। আর সবুর সইছে না। ভালো করে নিশ্বাস নিতে পারি না। ফাউন্ড্রির গরমের মধ্যে বসে অন্য এক গূঢ়তর তাপ আমায় দগ্ধায়, থেকে থেকে দম আটকে আসে।

খবর দেওয়া ছিল না। নইলে দুই দাদার কেউ না কেউ নিশ্চয়ই স্টেশনে যেতেন। যেন আমি অথর্ব কি পঙ্গু। কতবার বলেছি এসব কোরো না। এক চিলতে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে মিনি কি স্পেশ্যাল কি একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়া স্টেশন থেকে মাইল চারেক পথ চলে আসা সমর্থ পুরুষমানুষের কাছে কিছু না। মাধবী কিংবা পিকলু থাকলেও বা কথা ছিল। কিন্তু দাদারা শোনবার পাত্র নন। মুখে কিছু বলেন না,. শুধু ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মের গলিতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দার কাঁচাপাকা চাপ-দাড়ি-অলা শেল-ফ্রেমের চশমায় তপস্ক তপস্বী চেহারাখানা, কিংবা ছোড়দার ভারি শরীরের ওপর রদ্যাঁর ভাস্কর্যের মতো বসানো ভারি মাথাটা আমাকে যুগপৎ অপরাধী এবং তৃপ্ত করতে থাকে। সত্যিকারের ভদ্রতা এবং আন্তরিকতার মধ্যে অর্থের কোনও তফাত বোধ হয় নেই। এবারে খবর দিইনি। ঠিকও করলাম হঠাৎ। খবর দেবার সময় ছিল না।

ট্যাক্সি থেমেছে কি না থেমেছে বড়দার ছেলে সৌম্য দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে ধরল। চিনে চিনে মুখে ঠোঁটজোড়া হাসিতে সরলরেখা হয়ে গেছে। কী করে বুঝল কে জানে! পেছন পেছন ছোড়দা। হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'কী রে, আরও কোনো মাল নেই তো?'

হেসে বললাম, 'আসল মাল রেখে এসেছি। হালকা হয়েই ট্রাভল করা ভালো।'

গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস!

সদর ঘরের জানলা দিয়ে দুই বউদির হাসি-হাসি মুখ উঁকি মারছে। মধ্যিখানে মুনিয়ার কোঁকড়া চুলে ভরা ছোট্ট মাথাটা। দেরিতে উদয় হয়ে মুনিয়াটা মা আর জেঠিমাকে অতিরিক্ত স্নেহের

মাখনে সেঁটে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রেখেছে। এইজন্যেই বোধহয় আমি আনন্দ লেনের বাড়িতে ঘুরে ফিরে আসি। এই হাসি মুখ, উৎসুক চোখের আদর-চাউনি দেখতে, আমন্ত্রণের উদ্যত হাত ধরে এতগুলো মানুষের বুকের মাঝখানে অনায়াসে পৌঁছে যেতে। এইজন্যেই এখানে এলে মনে হয় পৃথিবীর এই এক জায়গায় আমার মতো হতভাগার জন্যেও ঠাঁই চিরকালের মতো কায়েম হয়ে আছে।

বড়ো বউদি চা নিয়ে এল। ছোটো বউদি খাবার। বললাম, 'আমাকে মুখ হাত ধোবার অবসরও বোধহয় তোমরা দেবে না। পিসিমার ভাষায় এই অ্যাড়াব্যাড়া কাপড়ে, ট্রেনের, ছত্তিশ জাতের নোংরা মেখে...'

খুব হয়েছে, তাড়াতাড়ি করো তো। লেকচার দিতে হবে না। লুচিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বা বা বা! অ্যাদ্দিন পর এলুম আর ঠান্ডা ঠান্ডা চামড়া-চামড়া লুচি দিয়ে অভ্যর্থনা? নাঃ, কদম্নে পুণ্ডরীকাক্ষ করে ছাড়বে দেখছি!

তা কী করব? খবর না দিয়ে এলে আমাদেব দোষ! তাও কদিন ধরে তোমার দাদার মনটা সুকু-সুকু করছিল বলেই না রোজ এ সময়টা খাবার-দাবার রাখি। নইলে হরিমটর। তা তোমার ট্রেন লেট করলে আমরা কী করব?

বউদিদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এইরকমই। নিজের ভাইবোন নেই। এই জ্যাঠতুতো দাদাদের সুখী পরিবারের জন্য কোনোদিন বুঝতে পারিনি। জ্যাঠাইমার কোলে-পিঠে মানুষ। কোনোদিন বুঝিওনি এঁরা আমার সহোদর নন!

ট্রেনের কাপড় ওরা ছাড়তে দিল না। শুধু মুখ হাত পা ধুয়ে আসবার ছুটিটুকু দিল। আমার মুখচোখ নাকি বলছে আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আসলে এক সময়ে দারুণ শরীরচর্চা করতুম। তখন আমার শরীরের যত্ন, খাওয়া-দাওয়াব নানান খুঁটিনাটির হাঙ্গামা দুই বউদি পুইয়েছে। ওরা মনে করে এখনও আমি সেই হেভিওয়েট লিফটার সুকুমারই রয়ে গেছি যে গব্যদুগ্ধের বরাদ্দ ছাড়াও সয়াবিনেব প্রোটিনের জন্য বউদিদের নিত্য জ্বালিয়েছে।

সবে লুচিতে বেগুনভাজা মুড়ে একটা কামড দিয়েছি কি দিইনি, বড়ো বউদি দ্বিতীয়বার চা আনবার জন্যে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, ছটকুন অর্থাৎ ছোটো বউদি হঠাৎ চুপিচুপি গলায় বলল, 'জানো সুকু, রঞ্জুটার না এমন বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে!'

এমন চমকে দিয়েছে যে জিভ কামড়ে ফেলেছি। ছটকুন অপ্রস্তুত। ঢোঁক গিলে বলল, 'খারাপ বলতে অসুখ-বিসুখ কিছু মনে করো না। বিশ্রী মোটা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বাচ্চাটা হবার পর থেকেই বেঢপ একেবারে। চুলগুলোও যে কী করে অমন পাতলা হয়ে গেল! সে রঞ্জু বলে চিনতে পারবে না, মাইরি বলছি।'

এই ছটকুনের একটা মস্ত দোষ। কথায় কথায় এই মাইরি বলা। ছোড়দা থাকলে ধমক দেন। আমার কিন্তু খুব মজার লাগে, মেয়েলি মুখে গুরুগম্ভীর চালে ওই মাইরি বলা। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লুম। ছটকুন কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'রান্না রেডি হতে বেশ দেরি, রোববারের বেলা সুকু, আর দুখানা লুচি নিলে না? যাও, তবে, এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোওগে যাও!'

ঘুমোব। শুধু কদিন পর। কতদিনের নির্ঘুম রাত উশুল করা ঘুম। এখন ঘুম জানি না, জাগাও জানি না। পর্দা ফেলে দিয়ে এখন চুপচাপ্ বসে থাকব। জানলার ধারে, বারান্দার দিকে মুখ করে। এই বারান্দার পাড়ে ইয়ো-ইয়োর মতো পাক খেতে খেতে কেটেছে আমার বাল্য। এই বারান্দা চিরে দুরন্ত কৌতূহলী পায়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কৈশোর। এখন আমার পরিণত যৌবন এই বারান্দায় কুমির-পিঠ পেতে কিছুক্ষণ ক্ষান্তির রোদ পোহাক। ছোটো ছোটো তীক্ষ্ণ চঞ্চুপাখিরা

আসুক সব, মস্তিষ্কের ফাঁক-ফোকর থেকে টেনে বার করে ফেলে দিক স্মৃতির ভুক্তাবশেষ। যা পুষ্ট করেছে, লালিত করেছে, অতীতের সেই স্বাস্থ্যকর স্মৃতি গভীর সুখে পরিপাক করি। যা ভেতরে প্রবিষ্ট হতে চাইল না, সেই উঞ্ছ-উদ্বৃত্ত নিয়ে কী করব?

এই ঘরে ডন দিতুম। মুগুর ভাঁজতুম। সে মুগুরগুলো সৌম্য ব্যবহার করলে অমন পলকা চেহারা হত না ছেলেটার। ওই টেবিলে লক্ষ করলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে জটিল অঙ্ক ভাবতে ভাবতে কত অন্যমনস্ক কাটাকুটি করেছি। পৈতৃক বাড়ির অংশ আমি নিইনি। দাদারা বদলে আমাকে টাকা দিয়েছেন। সেই নগদ টাকা দিয়ে নামি কোম্পানির নিরাপদ শেয়ার কিনে আমি আমাদের তিনজনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছি। কিন্তু আমার সাবেক ঘরটা বউদিরা সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে। এটা এখনও 'সুকুর ঘর'। এতো মায়া! বলে, 'ঘরটুকু না থাকলে তুই আর আসবি না সুকু।' অন্য সময় সৌম্য থাকে বোধহয়। ওর ডাক্তারির বই-টই টেবিলের ওপর দেখেছি। অ্যানাটমি, মেটিরিয়া মেডিকো। কিন্তু আমি এলে কেউ বিরক্ত করে না। নিজের সমস্ত বসবাসের চিহ্ন সৌম্য বেচারি নিঃশেষে তুলে নিয়ে যায়।

এ ঘরের গোপনীয়তা আমার নিজের সংসারেও কোথাও নেই। সেখানে মাধবীর সঙ্গে ভাগের কারবার। বারোয়ারি বৈঠক, অংশীদারির শোবার ঘর। এমন নির্জন বারান্দা সেখানে নেই, নেই এমন পূর্ণকুম্ভ শূন্যতা। জানলার প্রত্যেকটা গরাদ এখানে নীরবে আমার সঙ্গে কথা বলে, ঘরের প্রত্যেকটি কোণে হারানো দিনের কণ্ঠ গমগম করে। সওয়াল জবাব চলতে থাকে মেঝের সঙ্গে, ছাদের সঙ্গে। স্বল্প আসবাবকটা আলাপচারিতে যোগ দেয়।

কেন তুমি চলে গেলে?

নদীর স্রোত আর সময় তো চলেই যায়!

সময় যাক, তুমি কেন গেলে?

সময় দিয়েই যে তৈরি জীবন, সময় দিয়েই তৈরি শরীর।

কিন্তু তুমি তো গিয়েও পুরোপুরি যাওনি?

কেন? কেন? কেন, সুকু?

কিন্তু ছটকুন আচমকা কী যেন একটা বলে গেল! রঞ্জু মোটা হয়ে গেছে? সেই কঞ্চির মতো ফিনফিনে রঞ্জু মোটা! ভাবতে পারছি না। স্থূলত্ব অনেকের অঙ্গে, অনেক প্রসঙ্গে সয়ে যায়, মীনামাসিমা এক সময় ডিগডিগে রোগা ছিলেন। কণ্ঠার হাড়ের গর্তে টেনিস বল ঢুকে যেত, এখন মীনামাসিমার ঘাড় নেই, কণ্ঠা নেই, বুক-পেট-পিঠ আলাদা করে চেনা যায় না। রঞ্জুর বেলা স্থূলত্ব সইবে না। স্থূলত্ব রঞ্জুর বেলা অশ্লীল। চুল নাকি পাতলা হয়ে গেছে! বাহান্ন বিঘের চওড়া কালো রাস্তাটা যুগল শিরীষের তলা দিয়ে যেখানে লাল কাঁকরের পায়ে চলা মেঠো পথটার সঙ্গে মিশেছে সেখানে অব্যবহৃত কুয়োর পরিত্যক্ত চাতালে ওই তো রঞ্জু প্রাণপণে স্কিপিং করে যাচ্ছে, যেমন ওকে প্রথমে দেখেছিলুম মোটা বেণীটা সপাং সপাং করে পিঠের ওপর চাবুক মারছে! লাল আকাশে কালো বিদ্যুৎ, নীলের কোলে কিশোরী বিজলি চমকে যাচ্ছে। তির্যক. নিটোল। আদিম পৃথিবীর বুকে প্রথম বৃক্ষের জন্মের মতো বিস্ময়কর।

গতবারেও ছটকুন বলেছিল, 'জানো সুকু, রঞ্জুটা যে কী কালো, শ্রীহীন হয়ে গেছে, তুমি ধারণাই করতে পারবে না। তেমনি বুড়োটে। এখন দেখলে তোমার পিসিমা মনে হবে।'

আমার চোখের সামনে রঞ্জুকে কে থাবড়া থাবড়া কালি মাখিয়ে দিতে লাগল! এ যেন শুধু বাঁদুরে রঙের বীভৎস এক হোরিখেলা। রঞ্জুর দাঁতগুলো, তাই থাকে কেন? খসে পড়তে লাগল ঝরঝর করে, মাথা থেকে চুলগুলো কোনো অদৃশ্য চুম্বকের টানে লোহার তারের মতো ছিটকে

ছিটকে যেতে লাগল। আমার চারপাশে যেন রাক্ষসীর চুলের স্তূপ। রঞ্জু, কেশহীনা দন্তহীনা কদর্য রঞ্জু বেলুনের মতো ফুলতে লাগল। ফুলতে ফুলতে ফটাশ। মনে মনে বলতে চাইলুম—সুরঞ্জনা, সুরঞ্জনা, তুমি আজ মৃত। তারপরেই দেখলুম সমস্ত ঘরে বিদেহী রঞ্জুর শব্দহীন রূপদ্যুতিময় হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে। রঞ্জনার হাতের অশরীরী মুদ্রা বঙ্কিম বিভঙ্গে ঘরের কোণে কোণে মঙ্গলঘটের মতো স্থিত। যতই মারি সুরঞ্জনাকে আমি মেরে ফেলতে পারি না। ও আবার বেঁচে ওঠে। নতুন শক্তি নিয়ে নবোদ্‌গত যৌবন নিয়ে। ওর এই অনন্ত যৌবন নিয়ে বেঁচে ওঠা অহোরাত্র আমায় মারছে, আবার এই মৃত্যু না থাকলে আমি যে কেমন বাঁচা বাঁচতুম, তাও জানি না। সুরঞ্জনার স্মৃতিভারহীন সে কেমন লঘু, নিরর্থ জীবন?

হাতের কাজ সেরে দুপুরবেলায় দুই বউদি উলটুল নিয়ে আমার ঘরে এসে গুছিয়ে বসল। দাদাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সৌম্য রবিবাসরীয় আড্ডায়। মহিলামহলে আমিই একমাত্র হংসমধ্যে বক। বউদিদের মতে অবশ্য নিছক মেয়েলি আড্ডা খুব ক্লান্তিকর। একজনও অন্তত পুরুষ থাকা চাই, নইলে ভারসাম্য থাকে না।

কী সুকু, টোয়েন্টি-নাইন হবে?

খুকিদের খেলা ছেড়ে এবার একটু সাবালক হও বউদি।

এ জন্মে আর হল না রে।

শিখিয়ে দিচ্ছি ব্রিজ, তাস দাও।

শেখাতে চাইলেই শিখছে কে রে?

নাঃ বউদি, হোপলেস তোমরা। ইনকরিজিবল্‌। তিনজনে তবে আর গোলামচোর ছাড়া হবেটা কি?

মুনিয়াটা অনেকক্ষণ জেঠিমার কোল ঘেঁষটে বসেছিল, নতুন গল্পের বই হাতের মুঠোয়, নতুন পুতুল কোলের ভেতর আঁকড়ে ধরে। খেলা দেখতে দেখতে চোখে ঘুমের ঢল নামল। ছটকুন বলল, 'আচ্ছা দিদিভাই, আমি বললে সুকুটা বিশ্বাস করতে চায় না, তুমিই বলো তো রঞ্জু কীরকম খিটখিটে খটখটে মতো হয়ে গেছে না আজকাল?'

বড়ো বউদি বলল, 'কিছু মনে করিসনি মিতু, মায়ের পেটের না হলেও হাজার হোক তোর বোনই তো, শ্যামলীর বিয়েতে দেখলুম যেন জয়ঢাক। তার ওপর সবসময় গলা বাড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে।'

আমি আস্তে বললুম, 'তোমরা থামবে?'

বড়ো বউদি বলল, 'থামব বইকি। মিতু কথাটা তুলল তাই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই রে সুকু। কে যে পরে কী দাঁড়াবে সে গোড়ার রকমসকম দেখে খানিকটা বোঝা যায় বইকি। রাখ তো ওসব। তোদের খবরাখবর এখনও ভালো করে শোনাই হল না। এই মিতু, রাখ্‌ তো তাস। মাধবীকে কতদিন দেখিনি। পিকলুর ছবি এবারেও আনিসনি তো?'

কেন যে ছটকুন এভাবে বারবার রঞ্জুর প্রসঙ্গ তোলে! প্রথম প্রথম তুলত না। বহু বহু দিন এ বাড়িতে রঞ্জু কবরস্থ ছিল। মাধবী এসেছে। পিকলু এসেছে। পুনের সংসার স্থায়ী হয়েছে। কোনোদিন এ বাড়িতে মৃতের পুনরুত্থান হবে ভাবিনি। সে জীবিত ছিল একটিমাত্র মানুষের নিদ্রাহীন রাত্রির গূঢ়েষায়। বছর তিন আগে ছটকুন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এলোমেলো খানিকটা রঞ্জুর নিন্দে করে গেল। খুব নাকি গুমুরে হয়েছে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। আমি যতই লুকোতে চাই, এইসব করুণ হৃদয় মহিলা জেমস্‌ বন্ড কেমন করে নির্ভুল জেনে গেছে রঞ্জু আমার হর্ষ, রঞ্জু আমার বিষাদ, রঞ্জু আমার চোখের তারায়, রঞ্জু আমার হাতের পাতায়, নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, এখনও, এখনও। ওরই জন্যে আমি অফিসের কাজের নাম করে একা একা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে আসি। অবোধ

বালক যেমন মায়ের পরিত্যক্ত শাড়ির মাতৃগন্ধে সান্ত্বনা পায়, কলকাতার হাওয়ায় তেমনি আমি সুরঞ্জনার দেহগন্ধ পাই। শুধু একবার দেখব। দেখা হয় না। বড়ো ভয় করে। রঞ্জু যে আমার ছিন্ন অঙ্গ, আমি অন্ধ। রঞ্জু আমার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে হারিয়ে গেছে। হে ঈশ্বর, বিমূর্ত আলো দাও। আমি আর একবার রঞ্জুকে প্রত্যক্ষ করি। এত বড়ো জীবনের পরিসরে আর কেউই যে আমার পরিপূর্ণ আপন হল না। বড়ো ভয়! রঞ্জু মোটা হয়ে গেছে। কণ্ঠে আর সুরবাহার বাজে না। তার চাইতে ও সেখানে থাক যেখানে আছে। ভেতরে এবং বাইরে। রঞ্জুর ছবি গোপন অ্যালবামের পাতায় সেঁটে বহুনক্রান্ত, রাহুগ্রস্ত আমি আবার কি ফিরেই যাব?

সন্ধের দিকে বেরোলুম। একটু ঝিরঝিরে মতো বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাগুলো অশ্রুময়। গাছের ডগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দু-ধারে পসরা। পলিথিনের ঢাকা সরিয়ে ফেলছে হকাররা। মানুষ হাঁটার জায়গা নেই। কম্বুলিটোলা দিয়ে বেরিয়ে শোভাবাজারের দিকে হাঁটা দিলুম। আবার মুখ ফিরিয়ে জোড়াবাগান। পার্কের পূর্বকোণে রায়চৌধুরীদের রঙিন কাচওয়ালা বারান্দায় ইলেকট্রিকের আলো পড়ে রঙ চলকাচ্ছে। কোথাও যাব না। সর্বত্র যাব।

লোডশেডিং হয়ে গেল। সমস্ত উত্তর কলকাতা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে অন্ধকারেই জেগে উঠল আবার। প্রত্যেকটি বাড়ির, পার্কের, রাস্তার, যানবাহনের প্রেত তাদের দ্বিতীয় অস্তিত্বের জানান দিয়ে আমার দ্বিতীয় অস্তিত্বকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। 'ভয় কি? বেরিয়ে আয়। কতকাল আর চোখ ধাঁধানো আলোর অন্ধকারে চাপা থাকবি?' আমি খুব প্রাণবন্ত এক আত্মবিশ্বাসী, তরতাজা, টগবগে যুবককে আমার ভেতর থেকে সবেগে বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথ ধরে দক্ষিণমুখো ছুটে যেতে দেখলুম। খুব ঝকমকে দাঁতে সে প্রাণখোলা হাসি হাসছিল। হাতে একটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। চৌরঙ্গির অন্ধকার চিরে তন্বী আলোর রেখা জেগে উঠছে। এতো ক্ষীণ যে ভয় হয় হারিয়ে যাবে। রঞ্জনাকে পাশে নিয়ে আমার অতীত হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। চিবুক উঠছে, নামছে। বেলকুঁড়ি থেকে শব্দের সৌরভ।

তারপরেই সেই অতীত, যা এখনকার আমার থেকে বহুগুণে সত্য এবং জীবন্ত, একটা ডবলডেকার থেকে ভীষণ রুষ্ট মুখে রঞ্জনাকে হাত ধরে নামাল।

লোকটা কী রকম বিশ্রীভাবে তোমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, রঞ্জু, তুমি তো কিছু বললে না?

কই আমি তো বুঝতে পারিনি। অত ভিড়ের মধ্যে বোঝা যায় না কি?

বেশ বোঝা যায়। ভালোই বুঝতে পারছিলে।

'মানে?'—রঞ্জনার চোখে আহত বিস্ময়।

আকাশের মেঘ মিলিয়ে এসেছে। মেঘ ফুঁড়ে রোদ্দুরের তির। গোধূলির আকাশে হেলান দিয়ে সুরঞ্জনা গান গাইছে। গোধূলি-লগ্নে কার আগমনির গান।

রঞ্জু তোমার কলেজ গেটে কাল ওটা কে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল?

মনে করার চেষ্টায় রঞ্জুর ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'কে বলো তো?'

ওই তো ঝাঁকড়াচুলো, মোটা ঝুলপিঅলা...

ওঃ, ও তো রীমার দাদা। আমার স্কুলের বন্ধু রীমা, চেনো তো? ওর সেই ফোটোগ্রাফার দাদা! লাইফ ম্যাগাজিনের ফোটোগ্রাফি কম্পিটিশনে প্রাইজ পেল।

কী চায়?

কিছু তো না! রীমাকে নিতে এসেছিল, কাকে যেন এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে যাবে।

তোমার সঙ্গে অত কীসের কথা?

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, 'বা রে, রীমা আমার পুতুলখেলার বয়সের বন্ধু, এইটুকু বয়স থেকে ওদের বাড়ি যাচ্ছি। ওর দাদা আমার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলবে না?'

নিঃশব্দে চা খেয়ে যাচ্ছি। সুরঞ্জনা আরও গান গাইছে। সন্ধ্যার আকাশ সুরে ভাসিয়ে। কিন্তু কানে আর মধু ঢালছে না। রসহীন, শুষ্ক, নিরর্থক গান সব।

যাবার সময় আড়ালে ডেকে বলে গেলুম, 'কলেজ গেটে কি আর কোথাও কোনো ঝুলপি-মোচঅলা ফন্দিবাজকে আমি যেন আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে না দেখি। আর কাল থেকে তোমায় ট্যাকসিতে নিয়ে বেরোব।'

ট্যাকসি কেন, সুকুদা? পালকি নয়? ওপরে দু পরত ঘেরাটোপ, দু-পাশে দুই আসাসোঁটাধারী বরকন্দাজ। আর তুমি চলবে রাঙা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে আমার পাশে পাশে...

সারা শরীরে রঞ্জু নাচের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

রঞ্জু তোমার আঁচল ঠিক করো।

কী ঠিক করব? ঠিকই তো আছে।

উড়ছে, উড়ছে, এক্ষুনি উড়ে যাবে।

বাঃ, দমকা হাওয়ায় ওড়বাব জন্যেই তো আঁচল। তখনই তো একমাত্র নিজেকে পাখি পাখি লাগে।

হুঁ। আর রাস্তাসুদ্ধ লোক তোমার পাখি-ওড়ানো দেখুক ।

রঞ্জু হাসতে থাকে—'সত্যি, পাখি দেখার চোখ যাদের আছে তারা ছাড়া আর কেউই পাখি দেখতে পায় না, জানো না? আলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকলেও দেখে, অন্ধকারের আড়ালে থাকলেও দেখে।... আর তা ছাড়া এই ভরদুপুরবেলা এখানে দেখার লোক কই?'

তুমি অত্যন্ত অশালীন হয়ে যাচ্ছ রঞ্জনা।

উলটো দিক থেকে একটা নিম্নশ্রেণির লোক মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে কীসের তাড়ায় কে জানে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। রঞ্জুকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি বাঘের মতো গিয়ে তাকে ধরলুম, তারপর ব্যায়াম-করা চওড়া হাতের পাঞ্জায় একটা ঘুসির বোমা ফাটালুম তার রগে—'উল্লুক, বেতমিজ, বেয়াদব।' লোকটা অবাক হয়ে এক পলক তাকিয়ে পালটা গালাগাল আরম্ভ করল। তখন লাগালুম কষে চড়, থাপ্পড়, লাথি। লোক জমে গেল। ভদ্রমহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টার দায়ে অবশেষে তাকে এক বাইকধারী সার্জেন্টের হাতে সমর্পণ করে গনগনে মুখে বিবর্ণ রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এখনই দেখছ কি? তোমাকে আমি ঘরে বন্ধ করে রাখব। ছাদের দরজায় তালা লাগাব। জানলায় লোহার জালি।' প্রচণ্ড রাগের মাথায় খেয়াল করিনি রঞ্জুর মুখে জোঁক লাগছে, কণ্ঠনলিতে দাঁত বসিয়েছে রক্তচোষা বাদুড়।

পরদিন ওকে নির্দিষ্ট জায়গায় পাইনি। পরদিনও না। তারপর সোজা ওর বাড়ি। ছটকুনের মেসোমশাই বললেন, 'সে কি সুকুমার, রঞ্জু যে ওর বন্ধুদের সঙ্গে রাজগিরে এক্সকারশনে গেল। তোমায় বলে যায়নি? ওখান থেকে বেনারস যাবে, চুনার যাবে, লম্বা প্রোগ্রাম যে ওদের এবার!

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো ছটফট করছি ক্রোধে। বেনারস থেকে ছোট্ট চিঠি। সম্বোধন নেই। সই নেই।

> এতদিনের সম্পর্ক ভাঙতে কী হয়, যে ভাঙে সেই জানে। ছেড়ে দাও আমায়। নিজেও শেষ হবে, আমাকেও শেষ করবে। কোনো কিছুর খাতিরেই আমি সন্দেহভাজন আসামিনি হয়ে অমূল্য জীবন লোহার গারদে আটক কাটাতে পারব না।

বহু ক্ষমাভিক্ষা, অনুনয়-বিনয়, প্রতিশ্রুতি। টলাতে পারলুম কই? আর একবারও সে দেখাই করল না। আত্মীয়স্বজন কারও মতামত গ্রাহ্য করেনি। কারণ বলেনি কাউকে। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নয়। খালি বলেছে ব্যথার গলায় 'ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না।' ছোটো বউদি আজও জানে না ঠিক কী ধরনের মনান্তরের ফলে আমাদের সম্পর্ক ছিঁড়ে গেল। আমার প্রতি মমতায়, বোনের প্রতি বিতৃষ্ণায় কত কী-ই যে বলে যায় বেচারি ছটকুন। বোধহয় ভাবে ওর বিরুদ্ধে আমার মনটাকে তেতো করে দিতে পারলে সেই তিক্ততায় আমার এ বিষক্ষত সেরে যাবে। সবই বুঝি। শুধু বুঝি না কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা এই সব রটনা।

কতগুলো দীর্ঘ বছর কেটে গেছে। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। মাঝরাত তো নয় যেন মাঝগাঙ। হাবুডুবু খেতে খেতে জেগে উঠি। রঞ্জু! রঞ্জু! ডুবন্ত মানুষের আর্ত চিৎকার কেউ শোনে না, ডুবন্ত মানুষের উদ্যত হাত ধরে টেনে কেউ ডাঙায় তোলে না। মাঝ নদীতে ভরাডুবি। অপঘাত। বকুল ঝরছে। তারা খসছে। উল্কাপিণ্ড ফেটে গেল। রঙের ফানুস পুড়ে যায়। রজনি তামসী। দেবী পশ্চিমাস্যা। অমাবস্যার কালো আকাশে কালো বরফের চাদরের মতো সুরঞ্জনা বিছিয়ে আছে।

শ্রীহীনা, রুক্ষভাষিণী, স্থূলাঙ্গিনী রঞ্জুকে একবার দেখতে পেলেই কি মহাকালের ধ্যানভঙ্গ হবে? এ ধ্যান কি রূপের ধ্যান? অপঘাত ঠেলে ফিরতে পারব ডাঙায়? ফিরতে পারব ভাঁটির প্রবল টান এড়িয়ে জীবনের কাছে?

শ্যামবাজারের মোড় থেকে শহুরতলির বাস নিলুম। অভিজ্ঞ দুপুর এখন শান্তিপর্বের শরশয্যায়। তাকে ঘিরে সমস্ত প্রশ্ন চুপ। পশ্চিম দিগন্তে শেষকৃত্যের মহাপ্রস্তুতি আরম্ভ হচ্ছে। দক্ষিণ শহুরতলিব সুদূরতম প্রান্তে যখন পৌঁছলুম কামনারঙের শিখাগুলি তখন ভস্ম উদ্‌গার করছে। লাল মাটির রাস্তায় আবিরের মতো ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি। ঝিরিঝিরি পাতার কাঁপনেব মধ্যে দিযে অস্থির দিঘির মতো চাপ চাপ আকাশ। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বাগানঘেরা ছোট্ট বাড়িটা। আটলান্টিকের মাঝ-মধ্যিখানে যেন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একলা জাহাজ। এখুনি ভোঁ বেজে উঠবে, বোগেনভিলিয়ার বেগুনি মাস্তুল উঁচিয়ে পালতোলা মাটির জাহাজ চলতে আরম্ভ কববে। শুনেছি ওই বাড়ির দোতলাটা পুরোই স্টুডিয়ো। রঞ্জুর স্বামী শিল্পী। উত্তর দিকের দেয়ালে কাচের ওপর অস্তরাগ প্রতিফলিত হয়ে আকাশের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আমি কি ওঁর সামনে গিয়ে এমনি উদভ্রান্তের মতো দাঁড়াব? দাঁড়াব সিকন্দবের সামনে শৃঙ্খলিত পুরুর মতো মাথা উঁচু করে? ভিক্ষুকের মতো দাঁড়াব গিয়ে কাঙাল চোখে? শিল্পীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। উনি কি বুঝতে পারবেন আমি কে? উনি আমাকে কীভাবে নেবেন? আমিই বা ওঁকে, আমার ওই মেঘলোকবাসী প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনোদিনই যাঁকে সম্মুখ সমরে চূড়ান্ত দ্বৈরথে পেলুম না, তাঁকে কীভাবে নেব? ভাবতে ভাবতে বাগানের গেটে হাত বেধে গেল। খুলতে গিয়েও খুলতে পারলুম না। দূরদূরান্ত শব্দে কাঁপিয়ে ট্রেন চলে গেল। পেছু ফিরে দাঁড়ালুম এসে এক জোড়া অশ্বত্থের তলায়। কোলের কাছে মাতৃগর্ভেব মতো কোমল অন্ধকার। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। যেন আমি জন্মের জন্য অনন্তকাল প্রতীক্ষারত অজাত ভ্রূণ।

গোধূলি গিয়ে সাঁঝ। সাঁঝ পেরিয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। শহুরতলি কাঁপিয়ে ঝিঁঝির তানকর্তব শুরু হয়ে গেল। মুক্তাঙ্গনে লক্ষ নর্তকীর নূপুরশিঞ্জিনী। বেগবান হাওয়ার সমর্থ সঙ্গত। ঘড়ি দেখতে ভুলে গেছি। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু তারার আলোয় জেগে আছে অলৌকিক জাহাজ বাড়ি, তারার আলোয় দাঁড়িয়ে আছে ত্রিকাল-সাক্ষী অশ্বত্থ। কতক্ষণ পর জানি না, কাঁকর-ভাঙার মৃদু আওয়াজে চমক ভেঙে গেল। তারার জ্যোৎস্নায় দেখলুম—কী আশ্চর্য। কী পরমাশ্চর্য! সুরঞ্জনা আসছে! ছটকুন কী যেন বলেছিল? বড়ো বউদি কী যেন দেখেছিল? সুরঞ্জনা তো অবিকল

তেমনি আছে! মাথার ওপর কালপুরুষ, পায়ের তলায় দিবারাত্রির গতিভঙ্গে ঘূর্ণিত হচ্ছে পৃথিবী, আলোকলতার আকর্ষের মতো বাহু দুলছে, ফুলন্ত ডালের মতো বঙ্কিম ঠামের বাঙ্ময় চলনভঙ্গি, সর্পিল বেণি সেই বহু বছর আগেকার কুমারী নদীর ভঙ্গিতে গ্রীবার পাশ দিয়ে পথ কেটে বুকের কমনীয় অববাহিকায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখলুম উনিশ বছরের তরুণী সুরঞ্জনা অর্বুদার্বুদ আলোকবর্ষ দূরের কোন্ ছায়াপথ থেকে ম্যারাথন যাত্রা করে অর্বুদার্বুদ আলোকবর্ষ দূরের কোন্ জ্যোতির্লোকের দিকে অন্তহীন চলেছে। ত্বরাহীন। আত্মমগ্ন। প্রেক্ষাপটের প্রান্তে আমাকে ও দেখতে পাচ্ছে না। আমি যে স্থাবর। আর এই মহাস্থবির ও ওই চিরপ্রচলার মাঝখানে শুধু আপূর্যমাণ, অচলপ্রতিষ্ঠ মহাশূন্য, মহাকাল।

সবর্ণ

সবেমাত্র আলোটা জ্বেলে দিয়ে সারাদিনের পর একটা পত্রিকা হাতে একটু গা এলিয়েছেন সুমিত্রা, ঝপ করে বিদ্যুৎ পিঠটান দিল। সদর দরজার কড়াটাও সঙ্গে সঙ্গে যেন ষড়যন্ত্র করেই খটাখট নড়ে উঠল। বাইরের ধোঁয়াশার পিঠে ভর দিয়ে উঁচিয়ে আছে মধ্য পৌষের দমচাপা হিমেল সন্ধে। কাজের লোক, মুনমুনের বাবা কেউ এ সময়টা বাড়ি থাকেন না, শুধু তিনি আর মেয়ে। এই পরিস্থিতিতে দরজার কড়া নড়া-টড়া একেবারেই মনঃপূত নয় তাঁর। বহুবার শিবনাথকে বলেছেন একটা ম্যাজিক-আইয়ের ব্যবস্থা করতে। সন্ধে হোক আর যাইহোক, কড়া-নাড়া মানুষটার আবছা আদলও তো বোঝা যায়! তা এসব তুচ্ছ বৈষয়িক কথাবার্তায় সে ভদ্রলোক কান দিলে তো! মাইক্রো অথবা ম্যাক্রো এই দুই চরম জগতেই তাঁর ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ। মধ্যবিত্ত ব্যাপার চট করে শ্রুতিগোচর হয় না।

অগত্যা জানলা দিয়ে মুখ বাড়লেন সুমিত্রা। 'কে?' গলার আওয়াজে যদি জানান দেয়।

'আমি!' নীচ থেকে উত্তর এল।

কোন আমি রে?

আমি পার্থ, কাকিমা।

গলা শুনে বুঝতেই পেরেছিলেন। তবু নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। বাইরে এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সাবধানের মার নেই।

আজ সন্ধেতেই পার্থ এমন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়বে ভাবেননি সুমিত্রা। সকালবেলা কলেজ যাবার মুখে কাগজটা দিয়ে গিয়েছিল। গুণাবলির বিস্তৃত বিবরণ। ওর নিজের। একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দরকার। দেবেন ওর কোনো মাস্টারমশাই। লিখে, টাইপ করে নিয়ে যেতে বলেছেন, দস্তখত করে স্ট্যাম্প বসিয়ে দেবেন। তাই সুমিত্রার দ্বারস্থ হয়েছিল। ভালো করে গুছিয়ে লিখে দিতে হবে জিনিসটা। তা এখনও কাগজটা ভালো করে দেখবার সুযোগই পাননি তিনি। চারটে ক্লাস ছিল পরপর। তারপর মাঝখানে একটা মাত্র অফ দিয়ে আরও একটা। ডিপার্টমেন্টে লোক কম। এ সময়টা বিদায়ি সেকেন্ড ইয়ার আর প্লাস টু নিয়ে তাঁরা নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। মুনমুনকে চেঁচিয়ে বললেন দরজাটা খুলে দিতে, তারপর হারিকেনের আলোয় খুব ক্লান্ত চোখে কাগজটা মেলে ধরলেন।

হায়ার সেকেন্ডারিতে স্টার মার্কস। অঙ্ক এবং দুটো বিজ্ঞানে লেটার। এম টেক-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এদিকে আবার মাউন্টেনিয়রিং-এ ট্রেনিং নিয়েছে। সাঁতারে সার্টিফিকেট আছে। বাব্বাঃ, এত সব এরা করে কখন? ছেলে ভালো জানতেন, ডিবেটে স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছে বহুবার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে আরও এত গুণ তো সত্যিই জানা ছিল না। এতটা চৌখশ দেখলে মনেও হয় না। লম্বায় বেশ ছাড়ালো হলেও ছেলেটার মুখে চোখে একটা মেয়েলি লাবণ্য, কর্কশকান্তি হয়নি এখনও। যুবক নয়, বরং যেন সেইসব কাকপক্ষধর কিশোর স্নাতকের মতোই দেখায় ওকে—ডিগ্রিলাভের আগে আচার্যের প্রসাদ-লাভের আশায় যারা গুরুগৃহের

সবরকম আবদার-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করত। অথচ ফাইনাল পরীক্ষা পাস করেছে তাও আজ বছরখানেকের ওপর হয়ে গেল। নিজের ছেলে নেই বলেই কি এ ছেলেটার ওপর কেমন একটা ঝোঁক সুমিত্রার?

মুনমুনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল পার্থ। এশিয়ান গেমসের ফলাফল নিয়ে খুব উত্তেজিত দুজনেই। সুমিত্রা বললেন, 'তোর কাজটা এখনও হয়নি রে! দেখবার সময়ই পাইনি সারাদিন। পাঁচ-পাঁচটা ক্লাস ছিল।'

'তাতে কি হয়েছে?' অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল পার্থ। 'আমি আপনাকে তাড়া দিতে আসিনি কাকিমা, কাল কিংবা পরশু হলেও চলবে।'

'কী কাজ রে?' মুনমুন জিজ্ঞেস করল। এবং শুনেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল কাগজটা। পরক্ষণেই চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'আরিস্ সাবাস। তোর নম্বর দেখে যে আমার মাথা ঘুরছে? লেটারই মেরেছিস তিন-তিনটে? অঙ্কেতেও? নাঃ গুরুদেব লোক তুই, পায়ের ধুলো দে।'

'আঃ মুনমুন!' আজকালকার মেয়েদের এইসব চ্যাংড়া-চ্যাংড়া পুরুষালি বুলি একদম পছন্দ হয় না সুমিত্রার।

পার্থ বলল, 'কেন, তুই কত পেয়েছিলি?'

শুনলে তোরও মাথা ঘুরবে, তবে উলটো বাগে।

বল না কত?

সুমিত্রাই বললেন, 'কত আবার পাবে, পঞ্চান্ন না ছাপ্পান্ন।

পার্থ বলল, 'বাঃ বাঃ। চমৎকার পেয়েছিস তো! মেয়েরা অঙ্কে একটু কাঁচাই হয়, বাংলা - টাংলা হিস্ট্রি-টিস্ট্রি পড়বে, ক্ষতি কী?'

মুনমুন রেগে বলল, 'আর আমাদের ফার্স্ট গার্ল যে বিরানব্বই পেয়েছে, তার বেলা? আমি কাঁচা বলেই অমনি সমস্ত মেয়ে-জাতটাই অঙ্কে কাঁচা হয়ে গেল? সাধে কি তোকে হাঁদা বলি!'

পার্থ বলল, 'রাগ করছিস কেন! কথাটা আমার না, সমাজবিজ্ঞানীদের। রীতিমতো স্ট্যাটিস্‌টিক্স নিয়ে দেখা গেছে। আমি শুধু কোট করছি, বুঝলি বুদ্ধু!'

ঝগড়া করতে করতেই বেরিয়ে গেল দুজনে। মুখে একটু অন্যমনস্ক হাসি নিয়ে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন সুমিত্রা। এ তো ভালো! ছেলেবেলায় ওরা রীতিমতো চুলোচুলি করত। এখন আর পার্থর মাথায় মুনমুনের হাত পৌঁছোয় না। অন্তত এক হাত উঁচু। তাই-ই বোধহয় সম্পর্কটা খুনসুটিতে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রারা ছিলেন চার ভাই বোন। চুলোচুলি করবার লোকের অভাব ছিল না বাড়িতে। ছোটোবেলায় মারামারির চিহ্ন এখনও তাঁর হাতে আর পিঠোপিঠি ভাইয়ের গালে রয়ে গেছে। ভাইবোনের এইসব বাল্যকালীন চুলোচুলির স্মৃতিও যে কত গুপ্তসুখের বন্ধ দরজা মন্ত্রবলে খুলে দিতে পারে তা তাঁর অজানা নেই। চেষ্টা-চরিত্র করেও মুনমুনের একটা সঙ্গী জোটাতে পারেননি তিনি। প্রথম সন্তানই বহু কষ্টের। ডাক্তার বলেই দিয়েছিলেন আর আশা নেই। তা নয়তো গড়পড়তা মায়ের মতো একটি পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল বইকি! মুনমুনের বাবা অবশ্য বলেন, 'ভালোই হয়েছে। বিয়ে দিয়ে দোব, চুকে যাবে। বদসঙ্গে পড়ল কি-না, পলিটিক্সের খপ্পরে পড়ল কি-না দেখতে হবে না।' যেন মেয়েরা আর বদসঙ্গে পড়ে না, রাজনীতি করে না।

কতই আর বয়স হবে পার্থর। মুনমুনের চেয়ে জোর বছর তিনেকের বড়ো। শক্ত হাত পা। চ্যাটালো বুক। কিন্তু মুখটা বড়ো সুকুমার। র‍্যাফেলের দেবদূতদের মতো অপাপবিদ্ধ। পরদিন অফ পিরিয়ডে বসে যত্ন করে সার্টিফিকেটটা লিখে ফেললেন সুমিত্রা। ছেলেটা বড়ো হবে মনে হয়,

হোক। ক্ষমতা আছে, উচ্চাশা আছে, চেষ্টাও আছে। ওর উত্তরোত্তর উন্নতির নাটকে তাঁর এইটুকু পরোক্ষ ভূমিকা থাক। কাকিমা কাকিমা করে। সেই এতটুকুনি বয়স থেকে দেখছেন। মাঝে হস্টেলে থাকতে কিছুটা চোখ-আড়াল হয়েছিল। কিন্তু এখন যেন সেই ফাঁকিটুকু উশুল করে নিতেই এ বাড়িতে দিবারাত্র গতায়াত। সবকিছু শলাপরামর্শ, আলাপ-আলোচনা—হয় কাকাবাবু, নয় কাকিমা। নিজের বাড়িতে মানসিক রসদের জোগান পায় না, এ সন্দেহও নেহাত অমূলক নয়।

মুনমুনকেই বললেন বিকেলবেলা, 'দিয়ে আসবি এটা?' এক ঝটকা দিল মেয়ে, 'আমি পারব না।'

কেন গানের স্কুলে তো যাবিই?

সে তো উলটো দিকে! তা ছাড়া আমার ভালো লাগে না। নিজে এসে নিয়ে যাক না।

সুমিত্রাকেই উঠতে হল অগত্যা। মুনমুন আছে আছে বেশ আছে। কিন্তু ও মেয়ের 'না'কে 'হ্যাঁ' করা কোনো যন্ত্রের কর্ম নয়। তা নয়তো তাঁর সংসার মাথায় করে রাখে মেয়ে। ঘরদোর গুছোনো, সব টিপটাপ। কাজের লোক না এলে অর্ধেকের ওপর কাজ ও একাই করে দেয়। স্বভাবটাই সুগৃহিণীর। কিন্তু এই এক দোষ। বড্ড জেদি। কিন্তু মুখে না বললেও পার্থর দরকারটা জরুরিই। প্রতিদিন তাড়া দিতে আসতে ওর সংকোচ হতেই পারে। বাইরে যাবার খুব চেষ্টা করছে বলছিলেন শিবনাথ। দুটো তিনটে ভালো চাকরির অফার ছেড়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক। এ বয়সে ভালো কেরিয়ারের ছেলে সবাই বাইরে যেতে চায়। ইন্টারভিউও বোধহয় দিয়েছে দু একটা।

পার্থর মায়ের সঙ্গে ভালোই আলাপ আছে তাঁর। সঙ্গী না হলেও প্রতিবেশিনী। ছেলেবেলায় যখন পার্থ সারাক্ষণ সুমিত্রাদের বাড়িতেই পড়ে থাকত এবং অনেক সময় রাত্তিরেও বাড়ি যেতে চাইত না, তখন উনি এসে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতেন। সেই সূত্রেই আলাপ। তা নয়তো দুজনের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। সুমিত্রার থেকে বয়সেও বেশ বড়ো। বড়ো তিন মেয়ের বিয়েই হয়ে গেছে। পার্থ সবার ছোটো।

গেলে খুব খাতিরযত্ন করেন পার্থর মা। এত বেশি যে সময়ে সময়ে অস্বস্তির কারণ হয়। আজকেও যেতে যেন হাতে চাঁদ পেলেন ভদ্রমহিলা, 'আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য, কার মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ?'

আপ্যায়নের ধ্রুপদি ধরনে হেসে ফেলে সুমিত্রা বললেন, 'আমি তো মাঝে মাঝে আসিই! আপনিই বরং...'

কোথায় আসেন দরকার ছাড়া? সে ভাগ্যি কি আর করেছি! আর আমি! আমার কথা বাদ দিন। সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে যাচ্ছি। জ্ঞাতি-গুষ্টি নিয়ে সংসারটি তো নেহাত ছোটো নয়। সময় কোথায়? অভ্যাসও নেই। উনি তো আবার ওই একরকম। জানেনই তো! পছন্দ-অপছন্দ সব সেই একশো বছর আগে গিয়ে বসে আছে।

এঁর এই [illegible]টিকে দেখলে সত্যিই বড়ো আশ্চর্য লাগে। পার্থ, শুধু পার্থ কেন, তার দিদিদেরও জনক বলে মনে হয় না। ছেলেমেয়েরা বোধহয় সব মাতুলক্রম হয়েছে। একতাল ভুঁড়িসুদ্ধ চলন্ত পানতুয়া[illegible] মতো আকৃতি। ঠোঁটের কোণ দিয়ে সদাসর্বদা পানের কষ গড়াচ্ছে। পড়াশোনা খুব সম্ভব এ-পাশ [illegible]পাশ। কাজকর্মও কিছু করেন না। তিন ভাই মিলে দিদিমার বিষয় পেয়েছেন, তারই আয়ে চিরকাল চলে এসেছে। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা নিত্যগোপাল নাম বদলে রেখেছে নাড়ুগোপাল। জনান্তিকে এই নামই চালু।

কাগজটা পার্থর মা-র হাতে দিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'আপনার সন্তানভাগ্য কিন্তু সত্যিই ঈর্ষা করবার মতো!'

মুখটা মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত হয়ে গেল ভদ্রমহিলার। 'এ কথা সত্যি। আমি হাজার মুখে স্বীকার করছি ভাই। আমার ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত বাপ-মা আমরা নই।'

ছি, ছি, এসব কি বলছেন।

সবাই বলে। না বললেও আমরা জানি কিন্তু আপনারই বা সন্তানভাগ্য খারাপ কীসে? অমন ঢলঢলে ঢোলকলমি ফুলের মতো মেয়ে আপনার? গলা কী, যেন মধু ঝরছে! যার বাড়ি যাবে, আলো করবে।

তবেই হয়েছে। কথাবার্তা যদি শুনতেন! যে শুনবে আর ওপথ মাড়াবে না।

'বিনয়ী বাপ-মায়ে এটুকু বলেই থাকে ভাই।' পার্থর মা হাসলেন।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না উনি। গুচ্ছের দুধ এবং চিনি দেওয়া প্রায় বড়োবাজারি চা। সঙ্গে কচুরি, রসগোল্লা। খাবার জন্য এমন ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন যেন ব্যাপারটার ওপর ওঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

বাড়িতে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই আশপাশ থেকে শাঁখের ফুঁ শুনতে পেলেন সুমিত্রা। মধ্য-কলকাতার এ অঞ্চলে এখনও লোকে সন্ধ্যার মঙ্গলশঙ্খ ভোলেনি। তাঁদের বাড়িতে শাশুড়ি যাবার পর থেকে বেকার পড়ে আছে শাঁখটা। তার মনে থাকে না। ঠাকুরদেবতার সাবেক ছবিও সব তুলে ফেলেছেন। ভেতরের কোনো তাগিদ নেই। শুভাশুভের ধর্মাধর্মের সাবেক ধারণাগুলো পুরোনো পাঁজির মতো ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু শুনলে ভালোই লাগে। ঠাকুরদালানের কোলে দাঁড়িয়ে ভটচাযিয় বাড়ির এমনি কত শত সন্ধ্যার মুখ শঙ্খ বাজিয়ে গেছে। চৌকাঠে পড়েছে স্বপ্ন-সাধের মাঙ্গলিক জলছড়া। অনুসঙ্গ সবই সুখবহ নয়। তবু ভালো লাগে। ব্যথামিশ্রিত কেমন এক ধরনের শান্ত ভালো লাগা। অভিজ্ঞতার রসায়নে ভালোমন্দ সব সংহত হয়ে যাওয়ার ভালো-লাগা।

সদর দরজা ভেজানো ছিল। ঢুকতে ঢুকতে বাইরের ঘরে পার্থর গলা শুনে চমকালেন সুমিত্রা। গলায় ঝাঁঝ।

কীসের এতো ডাঁট তোর?

কীসের, তুই-ই বল না, মুনমুনের ধারালো গলা।

তবে শুনে রাখ, তোর ও ডাঁট আমি আইডেনটিফাই করতে পেরেছি, ওটা জাতের ডাঁট। তুই মধ্য ভাবতের ঠাকুরসাহেবদের সগোত্র। এখনও যে মেন্টালিটি থেকে এদেশে মানুষ হরিজন পোড়ায় তোর মধ্যেও সেই একই মেন্টালিটি।

তাই নাকি? সবই তো জেনে গেছিস তা হলে। যা ভাবিস ভাব। ডাঁট তো আমি ইচ্ছে করে কাউকে দেখাতে যাইনি। তুই কেন খোঁচাচ্ছিস?

শিবকাকার থেকে আমি কম কীসে রে?

'বাবার কথা তুলছিস?' মুনমুনের গলায় সক্রোধ বিস্ময়। 'তুললি ভালোই করলি। আমার বাবার মতো বাবা, আমার মায়ের মতো মা আর কটা আছে এ পাড়ায়?'

দ্যাখ মুনমুন, শিক্ষাদীক্ষা, স্ট্যাটাস দিয়ে বাবা-মার বিচার করতে নেই। বাবা-মা আমাদের সবারই শ্রদ্ধা ভালোবাসার জিনিস।

কর গে না শ্রদ্ধা। আমি কি তোকে বারণ করেছি?

তোর ওই ডাঁট আমি ভাঙব।

সুমিত্রা যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকেই নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। যেন পরের বাড়ির দোরগোড়া থেকে। এদের এতো বাগ্‌বিতণ্ডা কীসের? কীসের লড়াই। বাবা-মা এসব কী? যাই-ই হোক, ব্যাপারটা যে একান্ত ব্যক্তিগত এটা তিনি বুঝেছেন। এবং বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

আর, ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারের ওপর চড়াও হতে তাঁর রুচিতে বাধে। সে নিজের মেয়ে হলেও। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স তো হল। ও-ও তো এখন একটা পরিপূর্ণ মানুষ!

একটু বাদে বাড়ি না ফিরলে উভয় পক্ষই অপ্রস্তুতে পড়বে। কী দরকার! মোড়ের দোকান থেকে বেশ সময় নিয়ে কয়েকটা মশলা-দেওয়া মিঠে পান সাজালেন তিনি। সেগুলো সংগ্রহ করে খুব বিলম্বিত লয়ে বাড়ি ফিরে দেখলেন সদর খোলা। পার্থর গলা আর শোনা যাচ্ছে না। মুনমুন বসবার ঘরের সোফায়, হাতে একটা বই। বললেন, 'সন্ধের মুখে দরজা খুলে রেখেছিস যে বড়ো? কতবার বারণ করেছি না?'

জবাব দিল না। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। আড়চোখে দেখলেন মুখটা থমথম করছে। বইটা আদৌ পড়ছে বলে মনে হল না। একটু পরে সেটাকে র‍্যাকে যথাস্থানে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে ওপরে চলে যেতে দেখলেন। সম্ভবত নিজের ঘরে। একটু পরে শিবনাথ যখন ফিরলেন তখন বাড়িটা এত অস্বাভাবিক ঠান্ডা যে ভদ্রলোক জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, 'আজ এত চুপচাপ যে!' সুমিত্রাই উত্তর দিলেন, 'হইহই করবার কে আছে বলো।' কথাটায় একটা আলতো খোঁচা। যেন হইহই করে সন্ধের ঝোঁকে বাড়ি জমিয়ে রাখবার ভারটা শিবনাথই নিত্য নিয়ে থাকেন। হইহই করবার কেউ না থাকবার জন্যে তিনিই দায়ী। কিন্তু বাবার ঠিকই নজরে পড়েছে মেয়ের মুড ভালো না। এক সন্তানের বাবা-মার অনুভবশক্তি আর পাঁচজনের চেয়ে প্রখর হবেই।

'বকাঝকা করেছ নাকি?'—রাত্রে শুতে এসে বললেন সুমিত্রাকে। নীল আলোর বালবটার দিকে চেয়ে জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বলে গেলেন একটানা, 'বকাঝকা করে কোনো লাভ হয় না, বুঝলে? এক জিনিস নিয়ে খিটখিট করাটা ঠিক না। আরও বিতৃষ্ণা এসে যাবে। আর ছেলে মেয়ে যে বাবা-মার প্রোটোটাইপই হবে এমন কোনো কথা নেই, বুঝলে?'

সুমিত্রা শুধু ঘাড় হেলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বুঝেছেন। এ ভদ্রলোক ধরেই নিয়েছেন পড়াশোনা নিয়ে মায়েতে-মেয়েতে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। মেয়ে বকুনি খেয়েছে। সুতরাং...কথা বাড়িয়ে আর লাভ কী! এ ভদ্রলোক সারা জীবন ধরেই অনেক কিছু ধরে নিচ্ছেন। এভাবেই চলে আসছে। চলুক। ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে ইয়ুঙের মত কী বিড়বিড় করে সেইসব আওড়াতে আওড়াতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন শিবনাথ। অনেক সাংসারিক কর্তব্য করা হয়েছে আজ। একটি নিটোল নিদ্রাসুখ উপার্জন করে ফেলেছেন।

এভাবেই ঘর-বার, ভিতর-বাহির, জটিল-সরল সব অঙ্ক মেলাবার দায় সুমিত্রারই। সংশয়, উদ্বেগ, দ্বিধা, বেদনা কোনো কিছুর কথাই বলার কেউ নেই। নিষ্প্রদীপ মঞ্চে, শূন্য প্রেক্ষাগৃহে নির্জন সংলাপ।

কাজেকর্মে সচেতন মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল ঘটনাটা। মুনমুনও মোটামুটি স্বাভাবিক। কলেজ যাচ্ছে, গানের পরীক্ষা দিয়ে এল। পার্থর মা আর বড়দি হঠাৎ এসে উপস্থিত। এ কথা সে কথার পর পার্থর মা বললেন, 'ছেলের বিদেশ যাওয়া তো প্রায় ঠিক। যাওয়ার আগে মুনমুনের সঙ্গে বিয়েটা চুকিয়ে দিতে চাই আমরা। তারপর ও বউকে সঙ্গেই নিয়ে যাক। কি পড়াশোনা শেষ করবার জন্য এখানেই রেখে যাক, সে ওদের অভিরুচি।'

একেবারে চমকে উঠলেন সুমিত্রা। এ সম্ভাবনাটার কথা তো কখনও মনে হয়নি! প্রস্তাবটা তো খারাপ না। কিন্তু ইনি এমনভাবে কথাটা বলছেন যেন বিবাহ ব্যাপারের লক্ষ কথার নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বইটা কথা হয়েই গেছে। শেষ কথাটা আজ এইমাত্র হল। তাঁকে নীরব দেখে পার্থর বড়দি বলল, 'আজকাল তো জাতপাত কেউ তত মানে না, বিশেষ করে আপনাদের মতো

উচ্চশিক্ষিত পরিবারে, না কি বলুন কাকিমা! পার্থিব ওকে বড্ড পছন্দ। আর আপনি তো জানেনেই ও আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতো নয়।'

সুমিত্রার এবার মনে হল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট-টিকেট সব বাজে। আসলে পার্থ নিজের গুণপণার কথা কাকিমাকে কৌশলে জানাবার জন্যেই দিয়ে গিয়েছিল কাগজটা। বা রে ছেলে! ভারী চালাক তো! দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, কিন্তু কার্যসিদ্ধির উপায়-টুপায়গুলো ভালোই জানা মনে হচ্ছে। মনে মনে ঈষৎ প্রশ্রয় এবং তারিফের হাসিই হাসছিলেন, সহসা আগের দিনেই সংলাপটা মনে পড়ে গেল। ঠিক ধরতে পারেননি, কিন্তু কোথাও যেন একটা চড়া বেসুর বেজেছিল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'পার্থকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু মেয়ের তো নিজস্ব মতামত হয়েছে ; জিজ্ঞাসাবাদ করি। ওর বাবাকেও বলা দরকার।' উত্তরে পালগিন্নি তাঁর বড়ো মেয়ের দিকে চেয়ে যেন কী এক গোপন রসিকতায় হাসলেন, মুখে বললেন, 'তা করবেন বইকি। আমিও তো কর্তাকে বলিনি এখনও।'

মুনমুন ফিরল ওঁরা চলে যাবার বেশ খানিকটা পরে। সুমিত্রা তখনই কিছু বললেন না। এখন মেয়ে অন্য মুডে আছে। গুনগুন করে তিল্ঙ-ঠুংবি ভাঁজছে। এইভাবেই গুনগুন করতে করতে এঘর-ওঘর করবে খানিক, বাবার টেবিল গোছাবে, ধূপ জ্বালাবে গোছা গোছা, ফুলদানির জল পালটাবে, এটা নাড়বে, ওটা টানবে। এখন থাক। ঘণ্টাখানেক পর জিজ্ঞেস করলেন কথাটা, 'তোর সঙ্গে পার্থর কোনো কথা হয়েছে?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মুনমুন। কানের সোনার মাকড়ি দুটো দুলে উঠল। কপালের ওপর কোঁকড়া চুলের গুচ্ছি বিদ্রোহের ভঙ্গিতে উড়ছে। 'কেন?'

ওর মা আর দিদি মানে সীমা আজ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।

ইস্স্স্স্।

তোরা যদি ঠিক করে থাকিস, আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি হবে না।

তুমি কি পাগল হয়েছ মা?

'কেন বল তো? পাগলের কি হল?'—বিমূঢ় হয়ে বললেন সুমিত্রা, 'ছেলে তো ভালোই, খুবই ভালো।'

তিনি আশা করেছিলেন অশ্রু, লজ্জা, স্বস্তি। কিন্তু মেয়ে বলল, 'তুমি ভাবতে পারো ওদের ওই তিন শরিকের বাহান্ন ডালপালার বাড়িতে আমি ঘোমটা মাথায় সবার বউমা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি!'

না ভাবার কী আছে? পরিবেশ তো জীবনে বারবার বদল হয়ই, আর হওয়াটাই স্বাস্থ্যকর, কার চরিত্রের কোথায় জোর, পরিবেশ না পালটালে তো বোঝা যায় না মুনমুন। মানুষ তো আর সাজিয়ে রাখার কাচের পুতুল নয় যে এক আলমারি থেকে আর একটা আলমারিতে যাওয়াই তার ভালো!

তাই বলে নাড়ুগোপাল শ্বশুর?

ছি! এভাবে ভাবা ঠিক নয় মুনমুন!

আর কি ভাবে ভাবব তাহলে?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'এতো ভালো ছেলে কিন্তু পাওয়া মুশকিল। শুধু কেরিয়ারের জন্য নয়, যুগ পালটে যাচ্ছে, ছেলেরা আজকাল বিশ্বাসের যোগ্য প্রায়ই হয় না। আর তা ছাড়া ও তো বাইরেই চলে যাচ্ছে, যদিও কারও জন্যেই মা-বাবাকে ত্যাগ করার কথা আমি ভাবতে পারি না।'

নাড়ুগোপাল পালের ছেলেকে বিয়ে করলে আমার বাবার মানটা কোথায় থাকবে শুনি?

মেয়ের কথার ধরন শুনে অবাক হলেন সুমিত্রা। মেয়ে তো নয় যেন মেয়ের ঠাকুমা। কোত্থেকে এতো জাত্যভিমান হল এর এই যুগে, এই বয়সে! খুব সম্ভব পিতামহীর প্রভাব। নিষ্ঠাবতী, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণঘরের বিধবা ছিলেন শাশুড়ি। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্মঠ। কিন্তু বংশ আর বিদ্যার অভিমান ছিল বড্ড। মুনমুনকে কি তিনিই এমনি করে ভাবতে শিখিয়ে গেছেন? স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তো বেরিয়ে যেতেন। নাতনিকে তো ঠাকুমাই এক রকম মানুষ করেছেন।

দু-দিন পর একটু লাজুক লাজুক মুখে এল পার্থ। মুনমুন অদৃশ্য। সুমিত্রাই গল্পগাছা করলেন, চা দিলেন, যেন মাঝখানে অন্যরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। একটু হতাশের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে শুকনো মুখে ছেলেটা চলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই সুমিত্রার কাছে রহস্যময়। এই এত ভাব! এত ঘনিষ্ঠতা। এই বয়স! পরিবার, সমাজ তাদের রক্তচক্ষুর শাসন উঠিয়ে নিয়েছে। বিচারে-ব্যবহারে প্রায় সিকি শতাব্দী আগে যখন ওঁকে জোর করে পিঁড়িতে তোলা হয়েছিল তখনকার সঙ্গে কত তফাত! মুনমুনকে বললেন, 'পরিবার, জাত ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু আপত্তি আছে তোর?'

ক্যাবলা।

তাই বুঝি ডিবেটে প্রাইজ পায়, পাহাড়ে চড়ে!

মাকুন্দ।

তোদের দুজনে তো বেশ ভাব ছিল!

বন্ধু হিসেবে মেশা এক, বিয়ে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস মা।

আমি ভালো বুঝি না, আর একটু বুঝিয়ে বল মুনমুন।

বড়দির ছেলের পইতে হবে, মিন্টুর ছেলের পইতে হবে, আমার ছেলের হবে না, না? বাপের বাড়ির কাজে-কর্মে কী পরিচয় হবে আমার? পালেদের বাড়ির ছোটো বউ? তোমার কি এতটুকুও প্র্যাকটিক্যাল সেন্স থাকতে নেই মা? আর এত কথা বলছই বা কেন? পার্থ কি তোমাকে তার উকিল রেখেছে?

কথাগুলো ঝড়ের মতো বলে মুনমুন চোখ-মুখ লাল করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যেসব কথা একদিন অভিভাবকদের মুখ থেকে নিরুপায় শুনেছেন, সেইসব হতাশাজনক, মনুষ্যত্বের সত্য মূল্য নিরূপণে পরাঙ্মুখ, মানবতাবিরোধী কথাবার্তা আজ এক যুগ পরে আত্মজার মুখে পুনরাবৃত্ত হতে দেখে কেমন আতঙ্কিত, বিহ্বল হয়ে মুখ ঢাকলেন সুমিত্রা। কোন্ মন্ত্রে এক প্রজন্মে ভূমিকা এমন পালটে যায়! মুনমুন তবে কার মেয়ে হল? আচারান্ধ পিতৃপুরুষের? তাঁর নয়?

যাক, যারই হোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন তিনি, ভালোবাসলে কখনও এমন কাটা কাটা, হিসেবি কথাবার্তা বলতে পারত না। কথাটা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা যায়নি। যতই আধুনিক মা হন। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত প্রশ্ন করা। যাক আচরণেই বোঝা যাচ্ছে। প্রশ্ন বাহুল্য। ব্যাপারটা একতরফাই।

নিজমুখে কোনো কথা জানাতে খারাপ লাগল। মুনমুনের মত নেই জানিয়ে একটা চিঠি ছেড়ে দিলেন। শিবনাথকে কিছু বলবার দরকার মনে করলেন না।

পার্থর সঙ্গে দেখা হল দুদিন পরই। একই পাড়ার এ-মোড় ও-মোড়ে থাকা, দেখা না হওয়াই আশ্চর্য। তাঁকে দেখেই উলটোদিকের ফুটপাথে চলে গেল। সুমিত্রা তা সত্ত্বেও রাস্তা পার হলেন, কাছাকাছি দিয়ে খুব কোমল গলায় বললেন, 'কী রে পার্থ, কাকিমাকে কি ভুল বুঝলি?' মাটির দিকে চোখ রেখে শুকনো ঠোঁট দুটোকে শুধু প্রসারিত করল পার্থ। উত্তর দিল না। গালে ওর র‍্যাফেল-তুলির সে টোল যেন ভেঙে গেছে। মাথার উড়ো চুলের বাবুই-বাসায় একবার হাতটা

ছোঁয়াবার প্রচণ্ড পিপাসা পেল সুমিত্রার। কিন্তু সব পিপাসাই কি মেটে? কোনো পিপাসাই কি মেটে?

আজ সীমার অর্থাৎ পার্থর বড়দির চিঠি এসেছে। লিখেছে :

> আমার ভাই মুনমুনের চেয়ে অনেক চৌখশ মেয়ে পেতে পারত কাকিমা। কিন্তু ভালোলাগার ওপর তো কারও হাত নেই। পার্থ তো বোকা নয়! কারও ওপর জোর করার ছেলেও ও নয়! মুনমুনকে ও কি এতই ভুল বুঝল? ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো? অনেকেই অনেক কিছুর সাক্ষী আছে, কাকিমা। আর, এই সিদ্ধান্তই যদি ও নেবে, আর একটু সংযত আচরণ করলেই কি ঠিক হত না? পার্থ চাকরি নিয়ে কানাডা চলে যাচ্ছে। আঠাশে জানুয়ারি। বড়ো সিরিয়াস ছেলে। জানি না আর ফিরবে কি-না। ভায়ের এই খামখা কষ্টটা আমাদের বুকে বড়ো বেজেছে। মুনমুন কি ভালো করল? আপনারা কি ভালো করলেন?

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সুমিত্রা। কেন এত মন খারাপ লাগছে তিনি জানেন না। তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকায় ওরা বিশ্বাস করেনি, তাই কি? মুনমুনকে তিনি কতটুকু চেনেন? জননী বলেই হয়তো সবার চেয়ে কম। ওকি তবে পার্থকে ডাক দিয়ে মুখ ফেরাল? না না তা নয়। অন্তত তা নিশ্চয়ই নয়। যৌবনই যৌবনকে এমন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ভুলিয়ে নিয়ে যায় মিথ্যে আশার আলেয়া দেখিয়ে—কাদা জলায়, জল-ঝাঁঝির দামে। তারপর দপ করে নিবে যায়। কারণটা প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক। আর কিছু নয়। মুনমুন কিছু করেনি, জ্ঞাতসারে কিছু করেনি।

মাথার ওপর একটা জেট প্লেনের আওয়াজ পেয়ে ছেলেমানুষের মতো জানলার কাছে ছুটে গেলেন সুমিত্রা। যেন তিনি ফিরে গেছেন বহুকাল আগেকার সেই ব্যাকুল কৈশোরে। আজই যে সেই তারিখ! আঠাশে জানুয়ারি। খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছে প্লেনটা। ওতেই কি পার্থ আছে? চলে যাচ্ছে। অভিমান করে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে?

পার্থ কি তাঁর জীবন থেকে এই দ্বিতীয়বার বিদায় নিল?

মড়া

বড়ো কৌটোর মধ্যে মেজো কৌটো, তার মধ্যে সেজো কৌটো, তার মধ্যে ন, তারও মধ্যে কোণে সেই একরকমের এক ম্যাজিক চিনে-কৌটো আছে না? খুলতে খুলতে খুলতে খুলতে শেষমেশ এক ফোঁটা এক কৌটো বেরোয় তার ঢাকনি খোলে কি খোলে না, যদি বা খোলে তার মধ্যে কিছু আছে কি নেই, শুধু চোখে ঠাহর হয় না। ঠিক তেমনি কাসুন্দের মাঠ, মাঠের মধ্যে বাগান, বাগানের মধ্যে বাড়ি, বাড়ির মধ্যে ঘর, ঘরের মধ্যে লাবণ্য, লাবণ্যর বুকের মধ্যে কুঠরি। কুঠরির মধ্যে সত্যিকার লাবণ্য থাকে কি থাকে না লাবণ্য নিজেই জানে না। দরকার মতো ভেতর থেকে মরা সোনার জোড়াচুড়ি পরা নীল শিরা ওঠা সাদা সাদা দু-খানা হাত বেরিয়ে আসে। কাজ সারা হলে হাত দু-খানি গুটিয়ে-সুটিয়ে আবার কুঠরি-সই হয়।

বাইরের দিক দিয়ে একটি ছেলে একটি বউ আর এতখানিক এক বাচ্চা আসা-যাওয়া যাওয়া-আসা করে। ছেলেটিকে আপিসের ভাত দেয় বউ, দিয়ে নিজে খায়, বাচ্চাটিকে খাওয়ায়। তারপর ওইদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাইকেল রিকশায় বাচ্চাকে স্কুলে নামিয়ে উভয়ে ইস্টিশানের পথ ধরে, অনেকখানি রাস্তা।

দিনমান শুনসান। মাঠের মধ্যে কত্তকালের বাগানবাড়ি। জন নেই, মনিষ্যি নেই, কে ই বা আসবে আর কেনই বা আসবে? কারোই তো এদানি দরকার পড়ে না বিয়েতে ছিরি গড়বার কি পিঁড়ে আলপনা দেবার, মচ্ছবের লাফরা রাঁধবার কি ষোড়শের দান সাজাবার! নেই কাজ তো খই ভাজ এহেন লোকই বা কই যে কেউ একজন যে কেউ একমুখ আহ্লাদে হাসি হেসে ভেতর দালানে এসে উঠবে, লৌকিকতার সন্দেশটি খেয়ে গেলাসের জল নিজ হাতে গড়িয়ে নিতে হবে, এঁটো রেকাবি গেলাস দাওয়ার তলায় নিজ হাতে নামিয়ে রাখতে হবে একথা জেনেও? লাবণ্য তো এঁটোকাঁটা কুঁজোয় হাত দেবে না, লৌকিকতার থালা গেলাসগুলি ছুঁলেও অবেলায় চান করে মরতে হবে। সুতরাং দিনমান শনশনে হাওয়ায় দরজা নড়ে, জানলা নড়ে, পুরোনো কবজায় তেল না দেওয়া গোরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ ওঠে। গরমের দিনে মাঠের বুক থেকে ভাপ ওঠে, ধুলোর ঝড় ওঠে, কুঠরির চারপাশে পেতনির কান্নার মতো শব্দ করে করে ঘোরে। শীতের দিনে রুখুরুখু উত্তুরে বাতাস দেয়। বাড়ির ঝনকাঠটার সুদ্ধু চোখ শুকোয়, মুখ শুকোয়, ঠোঁট ফাটে, বুক ফাটে। আওয়াজে ভয় পেয়ে কোণের ঘর থেকে একটি রুগিমানুষ জড়ানো গলায় ডাক পাড়তে থাকে, ডাকতে ডাকতে গাল পাড়ে। গালিগালাজে জীবনভর অভ্যেস, গালিতে এযাত্রা আর কুলুবে না বুঝে শেষে গুডিয়ে গুডিয়ে কাঁদে। ঘরের মধ্যে থেকে একচোখ ঠান্ডা চাউনি দিয়ে লাবণ্য রুগির শয্যাটুকু দেখে। হাত বাড়িয়ে উত্তুরে জানলাগুলি বন্ধ করে দেয়। দেওয়া হলে হাত দুটি গুটিয়ে-সুটিয়ে আবার যেখানকার জিনিস সেখানে।

মাঠের এপারে যদি বাড়ি তো ওপারে পেছন বাগে দেখো এক পড়ো পাঁচিল। পাঁচিলের ওধারে কাদের জমি। দেখেও না, শোনেও না, আসা-আসির তত্ত্বতালাশির বালাই নেই। জমি ভরে শনশনিয়ে চিরণ গাছ, গাব গাছ, মহানিম, কদম্ব, পুটুস ঝাড়। শেয়ালকাঁটা, পাথরকুচি। গাছে গাছে,

লতায় পাতায় গাছে আগাছায় জড়াজড়ি। রাজ্যির আবর্জনা সাতখানা পাড়ার লোক এইখানে বেওয়ারিশ জমি পেয়ে ফেলে যায়। ফুটো হাঁড়ি, মেটে কলশি, ডেও-ঢাকনা, ল্যাজামুড়ো ভাঙা কল। উলুরিধুলুরি কাঁথা মাদুর, কহতব্য নয় এত জঞ্জাল। সব জঞ্জালই শেষে মাটিতে টেনে নেয়। নিয়ে তার ওপরে এটা ওটা সেটার চারা বানায়। কীসের চারা? দেশঘরের লোকজন দু-বেলা তাদের নিয়ে ঘর করলেও নামধাম জানে না, ধার ধারে না। উদ্ভিদবিদ্যার লোক পাতা দেখে, ফুল ছিঁড়ে, ফল চিরে, বিদঘুটে এক বিদেশি নামের নামতা হাঁকতে পারে, তাতে কার দরকার? ভাঙা পাঁচিলের একধারে রিকশা ভাগাড়, আর একদিকে গুটিকয় গোটা রিকশার আস্তাবল। খান দু-চার হোগলার ঘর গেরস্তি। নি-মালিক ভাঙা পাঁচিলে বছরভর ঘুঁটে ভট্‌ভট্ করে। গোবরের সঙ্গে মাটি, তার সঙ্গে বিচালি মিশিয়ে খাস্তা খাস্তা নানখাটাই সদৃশ ঘুঁটে গড়ে পাঁচ আঙুলের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া থাবায় রামধনিয়ার বউ জানকি বাই। আপাতত জানকিও নেই। বাইও নেই। ঘুঁটেউলি। এক পা গোবর, এক হাত খাড়ু, লাল-নীল-বেগুনি-সবুজ ছাপের কাপড় খালি গায়ে জড়িয়ে, গলায় ইয়া মোটা রুপোর হাঁসুলি, বহু সেই ডাকেই বহুত খুশ আছে। হাঁ! তার রুখুসুখু লাল চুলের খাঁজে খাঁজে ধুলো, মোটাসোটা মুখের ভাঁজে হাসি ধরে না।

খুব ভোরে বরফ-ঠান্ডা পাতকোর জলে চান সেরে নেয় লাবণ্য। ধোপাবাড়ির কাচা কস্তাপেড়ে শাড়িখানা ঘরের কলে জলকাচা করে কুঁচিয়ে আলনায় রাখা থাকে। ভিজে কাপড়ে শানের মেঝেতে গোটা গোটা পায়ের জলছাপ ফেলতে ফেলতে ঘরে গিয়ে সেই শাড়িখান আদুল গায়ে জড়ায়, পুব আকাশে রঙছোপ লাগাবার আগেই ফুলতোলাটি সারতে হবে নইলে ফুলের ওপর শিশির শুকিয়ে যাবে, আকাশের জলে ধোয়া ফুল ব্যাভার না করা মানে আধোয়া, অশুদ্ধ ফুলে পুজো করা। অমন পুজো কি না কল্লেই নয়? তা ছাড়া মোটাসোটা লাটিমের মতো এক ন্যাদশ বাচ্চা আছে। উঠলেই খলখলিয়ে গাছ ছোঁবে, ফুল ছোঁবে। লাবণ্যর কাপড়চোপড় হাত-পা, হাড়-চামড়া, বাগানের মাটি, ঘরের শান, সবসুদ্ধ এড়া বাসি হয়ে যাবে। তাই এই পাখ ডাকার আগে উষা ভোরে ফুল ক-টি পেতলের সাজিতে তুলে ফেলা। লাবণ্যর পুজোর সময় ঠাকুরঘরের আগল দেওয়া থাকে। সারা বাড়ি তোলপাড় করে এই সময়ে জাম্বো, এত্তখানি বাচ্চাটা। করে-টরে ঠাকুরঘরের দরজায় কান পেতে হাসে। এত শয়তান! 'মা শোনো, বাবা শোনো, ঠাকুমা পুজো করছে না হাতি করছে। কার সঙ্গে ঝগড়া করছে দ্যাখো।' বউটি বকে। বকে-টকে কুল না পেলে শেষে কুতূহলী হয়, দরজায় কান পেতে সেও দাঁড়িয়ে পড়ে। বাস্তবিক! কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু যে লাবণ্যর সারাদিন মুখে রা থাকে না ঠাকুরঘরের মাঝ-মধ্যিখানে সে যেন কার-না-কার সঙ্গে ধুন্ধুমার ঝগড়া লাগিয়েছে। এ তো আর সেকাল নয় যে, বউ বিশ্বাস করে বসবে যে ঠাকুরঘরের বালগোপাল কি রক্ষেকালী জ্যান্ত হয়েছেন, আর তাঁরই সঙ্গে মানুষটির ভাবের বচসা!

'পরন্তপ! পরন্তপ!' ফল-বাতাসা নিতে সরু গলায় ডাক দেয় লাবণ্য সারাদিনের মধ্যে এই একটিবার। ভেতরবাড়ি থেকে বারবাড়িতে সে ডাক পৌঁছুতে সময় লাগে। রাঁধতে রাঁধতে বউটি এসে দাঁড়ায়। জাম্বো এসে চট করে পা ছুঁতে যায়। 'ছুঁসনে, ছুঁসনে, যাঃ। ছুঁলি তো? কি বেয়াড়া ছেলের রীত বাবা, বাসি হেগো মানবে না, চোপর দিন আগাড়ে-ভাগাড়ে ঘুরছে।' গজগজানি ক্রমে বেড়ে যেতে থাকলে বউটি বলবে, 'আপনার পুজো তো সারাই মা, চান করে ছুঁয়েছে বই তো নয়, আর ছোঁয়াও তো নয়, পেসাদ খেয়ে পেন্নাম। ওরও তো সাধ যায়!'

লাবণ্য রাগের গলায় বলে, 'চান করা তো কি! বাসি কাপড়ে আলনা থেকে জামা-কাপড় নিয়ে কলঘরে যায়নি?'

বউ বলে, 'না তো মা, আমিই তো কাচা-কাপড়ে দিয়ে এলুম।'

'তোমার ঘরে বিছানা পাতা আছে না? যে ঘরে চোপর দিন বাসি বিছানা, ছাড়া-কাপড়, সিগ্রেটের এঁটো ছাইদান সে ঘরের কাচা কাপড় কি আদপেই কাচা কাপড় বউমা! সে যাক। ছুঁয়েছে তো ছুঁয়েছে এখন আর পেসাদ খাব না।'

বউটি বলে, 'কোন ভোরে উঠেছেন মা, এখুনি তো আবার রুগি নিয়ে পড়তে হবে। কিছু মুখে দেবেন না? ছি, ছি জাম্বো, কি করলি বলতো?'

উদাস গলায় লাবণ্য বলে, 'বকো না, ছেলেমানুষ। একটা দিন একটু বেলা করে খেলে আমার পেট ক্ষয়ে যাবে না। যাও, কাজে যাও।'

বললে পেত্যয় যাবে না। রোগা হাড়ে ওই অতখানি রুগীটিকে লাবণ্য একলা সামলায়। মানুষটি রোগে ভোগে এখন ঝরে গেছে, সেকথা ঠিক। কিন্তু হাড়ের কাঠামোখানা যাবে কোথায়? আড়েদিঘে সে তো পেল্লাই? তার ওপর অঙ্গ পড়ে গিয়ে কবজায় কবজায় জং ধরে গেছে। অঙ্গগুলির মধ্যে সাড় যেমন নেই তেমন প্রাণটিও তো নেই! মরা হাত-পায়ের ওজন কি কম? লোকটির মা এই ক-বছর আগেও বেঁচেছিল। ডাক্তারের ঘরের মেয়ে, লাবণ্যকে বুঝ দিত, 'ভয় কি বউ? বাঁ অঙ্গ গেলে বাঁচে না, পইতে কাটার মতো বাঁয়ে ডাইনে পড়লে ক ঘণ্টাতেই রুগি সাবাড়, কিন্তু ডান অঙ্গ পড়লে তোমার রুগি টিকবে বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। কত পুণ্যি করবে, করো না।'

তা সেই পুণ্যিই আজ এগারো বচ্ছর করছে লাবণ্য। পুজোটি সেরে রুগির ঘরে ঢোকে। এককালের তাপের দাপের মানুষটি তখন হাঁ করে বাঁ কাতে ঘুমোচ্ছে, মুখের দু কষ বেয়ে লাল গড়িয়ে গড়িয়ে বালিশ আধভিজে। তার ওপর ভিন ভিন করছে পুঁয়ো মাছি। বেড্‌প্যান, চান করার গামলা, গরম জলের বালতি, বোরিকের পাউডার, ফতুয়া, লুঙ্গি—সব জোগাড়-যন্তর সারা হলে লাবণ্য গলা খাঁকারি দেয়। তারপর মানুষটিকে চাগিয়ে ধরে কাজকর্ম সারে। এ সময়ে তার মুখের ভাব পাথরের ঠাকুরের মতো হয়ে যায়।

সাতকোশ আটকোশ রিক্‌শা চালিয়ে এসে গরমের দিনে গামছাখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে রামধনিয়া।

বহু, এ বহু, রুটি গড়্‌বি নাই? ডাল পাকাবি নাই?

জান্‌কি তখন মনের সুখে ঘুঁটে দেওয়া শেষ করে গুল দিচ্ছে। আশপাশের বাড়ির অর্ডারি গুল। কয়লার ঘেঁস, পড়ো জমির মাটি, ঘন থকথকে ফ্যান, মেখে মেখে ছোট্ট ছোট্ট গুল। ধাঁই ধাঁই করে আঁচ উঠবে, শাঁইশাঁই করে রুটি ফুলবে। হাজার গুলে পাঁচ টাকা রেট। জান্‌কির খানা-পাকানোয় মন নেই। যত গুল দেবে তত টাকা, যত ঘুঁটে দেবে তত টাকা, তত খাড়ু, তত ছাপের কাপড়, তত কাচের চুড়ি। দেশে ঘরে জোওয়ার আছে, ড়হর আছে, মকাই আছে, খাও না। রামধনিয়া বেশি গালিগালাজ করলে এক সময় জান্‌কি বোম্বাই ফজলির মতো মুখখানা ঘুরিয়ে হাতের কয়লা, গোবর পাছু-কাপড়ে মুছে টিউকলে হাত ধোয়, মুখ ধোয়, চুলের খাঁজ থেকে চারটি উকুন বার করে টিপ করে ধরে মারে। তারপর কানা-উঁচু কলাইয়ের সানকিতে ছাতু মাখতে বসে।

ঠিক দুপুরবেলা লাবণ্যর তিনবারের চান সারা। সকালে পুজোর আগে একবার, রুগি চান করানোর পর গু-মুতের ছোঁয়া দেহখানিকে ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে দু-বার, ভাত খাওয়া সকড়ি কাপড়টি ছাড়ার পর তিনবার। সেরে লাবণ্য যখন ঘরে ওঠে তখন মাথার ওপর তিনটি-চারটি চিল ঘোরে, ঘুরে ঘুরে কীসের নেশায় অনেক ওপরে উঠে যায়, লাবণ্যর লম্বা গরাদের জানলার ফ্রেমে কাটাকুটি খেলতে থাকে, চিলের হ্রেষা অনেক মিটার উঁচু শূন্যের পাহাড় থেকে ঝাঁপ খায়, ভাসতে ভাসতে সোজা পৌঁছে যায়, লাবণ্যর বুকের কুঠরিখানিতে। লাবণ্য একখানা রাক্কুসে-ঢেউ

সুমুদ্দুরে কলার ডোঙার মতো ওলট-পালট খায়। ভাসতে ভাসতে কোত্থেকে কোথায় চলে যায়, সে কি জন্মের আগের দেশ? না মরণের পরের? অ্যাত্তো বড়ো সমুদ্দুরে হায় এইটুকুনি প্রাণ! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল? সাদার ওপর হলুদ টিপ টিপ খুকু-ফ্রক, পাঁকের মতো নরম, ঠান্ডা, আস্তে আস্তে শক্ত কাঠ হয়ে যায়, ভাসতে ভাসতে অকূল সমুদ্দুরে কোথায় যে চলে যায় এলোচুল আধপোড়া শিশুর মড়া এক! শীতদুপুরের ঘুমের চটকা মাছির ভ্যানভ্যানানিতে ভেঙে যায়। লাবণ্যর শুকনো চোয়ালে চোখের জলের নুনটুকু শুকিয়ে আছে, তারই ওপব মাছির লালচ। তারই জন্য লাবণ্যর সমুদ্দুরের শেষটুকু দেখা হয় না। উঁচু হাড়ে চাপড় মেরে ভুরু কুঁচকে লাবণ্য বলে, 'মর মর, শুয়োর বেটা মর।' পরক্ষণেই আকাশমুখো হয়ে বলে ওঠে, 'ষাট, ষাট, ষাটের বাছা-ষাট!'

যে ছেলেটিব ঘরে বিছানা থাকায়, ছাঁইদানি থাকায় ঘরটি চিরজন্মের মতো বাসি এঁটো হয়ে গেছে সেটি লাবণ্যরই সন্তান। তবে অভ্যাসের সন্তান। সন্তান বস্তুত অনেক প্রকার। বিস্ময়ের, আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার, আগ্রহ ও বাঞ্ছার, তারপর অভ্যাসের, উদাসীনতার। পরন্তপ তাই তার বাপ-মা'র অভ্যাসের সন্তান। কিন্তু যতই হোক পুরুষ ছেলে তাই সাতটির পর আটটিতেও পরন্তপের ঠাকুমা পুজো দিয়ে ঘটাপটার অন্নপ্রাশন করলে। মা-ঠাকুমার দু তিন আলমারি কাপড়চোপড়, তিন চারখানা বিছানা বালিশ ওইটুকু ছেলে তার দাদাদেবই মতো হুলুট থুলুট করতে থাকায় লাবণ্য--- তখন উত্তরতিরিশ---ধমকালে, ছেলের বাবার কাছ থেকে চোপ্, ঠাকুরমার কাছ থেকে চোখরাঙানি খেয়ে-টেয়ে ভুরু কুঁচকে ঘর ঝাড় দিতে চলে গেল।

চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে উড়ো খইয়ের মতো দেশবিদেশে ছড়িয়ে আছে, কে কোথায়, কমনে অতশত লাবণ্যর আজকাল হুঁশ থাকে না। তাদের বাপের, তাদের ঠাকুমার থাকুক গিয়ে। ঠিকুজি, কুলুজি, জ্ঞাত-গোত্তর, আর পারি না বাবা! মাঝে মাঝে এসে সব হাঁকডাক করে নিজেদেরই গবজে। ছেলে কটিব হাঁকডাকে লাবণ্য আজকাল ঘাবড়ায় না, বাড়িটি তার স্ত্রীধন এবং সে কাগজ আলমারির ভেতর খোপে ভেলভেট বাক্সয় তোলা আছে এইটুকু বুঝে। মেয়েগুলি বলে, 'মা আমাদের দেখতে পাবে না।' আরও বলে তাদের দারুণ জামাইরা, বউরাও 'অমন মা জন্মে দেখিনি।' লাবণ্যর কানে এসব কথা যায় কি না যায় বলা যায় না। কারণ তার ভেতর বাড়ির নিরমিষ্যি হেঁসেলে সে প্রাণ গেলেও কারুকে ঢুকতে দেবে না। এসো, থাকো, খাও, মাখো। সব ওদিকে। এদিক পানে ঘেঁষতে এসো না। মেজো মেয়ে অন্নপূর্ণা বলে, 'মা আমি চান করে, খেঁটের কাপড় পরে আজ তোমার রান্নাটা করে দিই?' মা শুধু ভুরু কুঁচকে তাকায়। মনে মনে বলে, মরি মরি! এতো ভাগ্যি আমার কোথায় ছিল মা এতগুলি দিন। বলি খেঁটের কাপড় যে পরবে, তোমার শরীরেব কাঠামোখানি শুদ্ধু যে অশুদ্ধ ম্লেচ্ছসঙ্গ করে কবে সে কথা কি মনে রেখেছ মা? মেজো জামাই, যার সুটপরা গায়ে গোবরগোলা গঙ্গাজল ঢেলে দিয়েছিল লাবণ্য মুরগি খেয়ে আসায়, সে আসে না যদিও।

বর্ষার বিকেলে কাসুন্দের মাঠ যখন জটাইবুড়ি হচ্ছে ধীরে, সন্ধে যেন ঘোলা জল, বাতাস যেন ধোঁয়া, মাটি থেকে আঁশ গন্ধ, যখন জানকি হাঁকে, 'মায়ি, হে মায়ি। ঘুঁটে লিবি নাই? সুখা ঘুঁটে।' কুঠার থেকে লাবণ্য কচ্ছপের মতন মুখ বাড়িয়ে দেখল পরন্তপের বউ এখনও আপিস করে ফেরেনি। ঘুঁটেউলি ঘুঁটে সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে, 'গিনতি করে লিন মা। দো .. চাব ... ছে ... আঠ ...।'

জানকির কোমরের কাছে এক কনে।

অ বউ, তোর কোমরের কাছে ঘুনশির মতো ওটা কে রে?

হমার নাৎনি আছে মা

তোর আবার মেয়ে কবে হল যে নাতনি?

হাঁ মা। দেহাতে থাকে, ঢোলিসাকারা, মন্হরপট্টিয়া, মায়ি। খরা হল, হাঁতিয়া হল না, ঘঁনুয়া ধান ভি উঠল না-ই। গরমেন্টের ডোল ভি মিলল নাই। পাঁচটা, ছোটা আন্ডা বাচ্চা, ইটাকে হমার পাস ভেজ দিয়েছে। হাঁ!

কী নাম রে?

হাঁরে, নাম বোল্ না তেরি। এ মায়ি বহুত্ দোয়া আছে।

কন্যেটি ক্রমশই জান্‌কির বিশাল কোমরের পেছনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে।

ও নুকুচ্ছে কেন রে বউ? থাক বাবা, নাম জিজ্ঞেস করব না আর, নুকুসনি।

জান্‌কির কোমরের পেছন থেকে মিহি গলায় আওয়াজ আসে, 'সোনবত্তিয়া।'

কী বললি? কী পাতিয়া?

'সোনবত্তিয়া, সোনাবাতি হুজুর,' জান্‌কির হাসি রুপোর হাঁসুলি অব্দি ছড়িয়ে যাচ্ছে, 'বাপে কালো, মায়ে কালো, বিটিয়া গোরি মায়ি, ইসলিয়ে সোনাবাত্তি।'

দুপুর দুটোর সময় খিড়কির দুয়ারে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বাঁকারির মতো পলকা পিঠখানা উঁচু করে অতঃপর লাবণ্য ডাকে, 'সোনাবাতি! এই সোনাবাতি!' ...'সোনবত্তিয়া রে-এ-এ!' জান্‌কির বাজখাঁই গলার ডাক লাবণ্যর মিহি ডাকের সঙ্গে মিলেমিশে যায়, ঠিক যেন মাঝদুপুরে নি হাওয়ার দেশ থেকে চিলের ডাক ঝাঁপ খেয়ে পড়ছে কাসুন্দের মাঠে। ক্রমেই জোরালো হচ্ছে, গাছপালায় ধাক্কা খেতে খেতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে-দূরান্তরে। আনাচকানাচ সব ভরে যাচ্ছে। 'সোনবত্তিয়া ... সোনাবাত্তি রে-এ-এ-।' হাওয়ার সমুদ্র থেকে জলের সমুদ্র, বহু দুঃখের জল বা স্বপ্নের ফেরে বারংবার দেখা যায়, সেই জলের উথাল ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে একখানি ছোট্ট ডিঙি শেষ পর্যন্ত ডাঙায় এসে লাগে। ছোট্ট লাফ লাফিয়ে নামে একটি এক বুক আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার সন্তান।

ঘুঁটেউলির গোরি নাতনি ফণীমনসার বিপজ্জনক ঝোপের আড়াল থেকে মুখটা একবার বাড়ায় একবার লুকোয়, একবার বাড়ায় একবার লুকোয়। তারপর খিলখিল হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। কলাইয়ের থালায় লাবণ্য তার নিরমিষ্যি হেঁসেলের যাবতীয় রান্না ধরে দিয়েছে। ডালের সঙ্গে চচ্চড়ি তার সঙ্গে ঘণ্ট তার সঙ্গে তেঁতুলের টক মেখে তাগাড় করে ফেলে সোনাবাতি, ছোটো ছোটো মুঠিতে তুলে কবজির কাছ থেকে খায়। কিছুক্ষণ হাঁ করে দেখে লাবণ্য। মাথার ওপর মাটিমাখা চুল দেখে। ময়লা মাখা টিকটিকে মুখখানি দেখে, পিঠ-ছেঁড়া ফ্রকটি দেখে আগাগোড়া। তারপর কী জানি কী মনে করে খিড়কির কপাট তুলে দিয়ে ফিরে যায়। মানুষটি বোধহয় হাতের কাছে ঘণ্টি টিপে ডাকছে।

ছুটি কাটাতে এসে বড়ো তিনটি ছেলে বউ, দুটি মেয়ে, একটি জামাই, তাদের ছেলেমেয়েরা দূর থেকে গড় করল, কারণ লাবণ্যর পা গাড়ির কাপড়ে ছুঁতে মানা। চিবুক ছুঁয়ে লাবণ্য বলল, 'আহা থাক, থাক ভালো আছ তো সব? তোমাদেরই ঘর, তোমাদেরই বাড়ি, তোমরাই দেখেশুনে করে কম্মে নাও গে।' ছেলে-মেয়ে-বউরা এ ওর মুখে চায়, ও এর মুখে চায়। লাবণ্যর গালের হাড়ে এবার মাস লেগেছে, কণ্ঠা ঢাকে ঢাকে। মেয়ে বউদের করে-কম্মে নিতে বললেও লাবণ্য বড়ি দেয়, আচার মাখে, পিঠেপুলির নারকেল কোরে, কীসের সঙ্গে কি মিশিয়ে অদ্ভুত সোয়াদের সব দিশি রান্না রাঁধে, তার গন্ধে নাতি-নাতনিদের লাল ঝরে, কাসুন্দের মাঠ দিয়ে পথচলতি লোক চমকে চমকে বাতাস শোঁকে, হাত পাখার হাওয়া দিয়ে দিয়ে রুগি মানুষের বিছানা থেকে লাবণ্য মাছি তাড়ায়। মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, ছেলেগুলি নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা দিয়ে কেউ পান চিবোতে চিবোতে, কেউ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, যার যে রকম নেশা, দুপুরঘুম ঘুমোয়।

ধাক্কা দেওয়া শান্তিপুরি শাড়ি পরেছে লাবণ্য অনেকদিন পর। মুখে জর্দাপান দিয়ে দুপুরের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটো ছোটো ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে মাঠে, পাঁচিলের ঘুঁটের ওপর ধুলোর সর, তিড়িংবিড়িং বিড়িং নাচছে শালিখ, একটা দুটো তিনটে চারটে। নোদল গোদল হেঁটে বেড়াচ্ছে গোলা পায়রা। কী খুঁটে খাচ্ছে তা সে-ই জানে, গাছের ডালে ঘুঘুর গলায় রামধনু চিকমিক করছে, ওপর ডালে দুপুব কাক, সহসা ডাকছে না, মাঝে মধ্যে আকাশপানে গলা তুলে হাঁ-এর মধ্যের টুকটুকে লাল রং বার করে বলে উঠছে খ্যাঁ, খ্যাঁ, খ্যা-অ্যা। গলা দিব্বি সুরে বলছে। ধুলোর মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ি দুলিয়ে, ছেঁড়া ফ্রক ঘুরিয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে সোনাবাতি। পিঠে বোতাম নেই। সোনারঙেব পিঠের ওপর অনেকদিনের নোংবার জালি। সোনারঙের জট পাকানো চুলগুলি কিলবিল করছে মাথাময়। পান চিবোতে চিবোতে জর্দার রসে নেশা ধরে। ডলপুতুল নিয়ে লাবণ্য কখনও বুকে আঁকড়ায়, কখনও বালিশে শোয়ায়, রান্নাবাটি নিয়ে সারা দুপুর খেলে, আবার মাথার চুল সামনে ঝুলিয়ে হাতের ওপর চাবির গোছা নিয়ে এতোল বেতোল, তামাক তে-তোল করে। লাবণ্যর চারপাশে খেলে বেড়ায় সাদা ফ্রক, হলুদ টিপ-ছাপ, ছোটো ছোটো চুলে হলুদ কিলিপ, খিলখিলিয়ে হাসে। লাবণ্য ঘুমচোখে আলমারি খুলে সেই ফ্রকটি বাব করে, সেই পুতুলটি বার করে, করে ঘুরিয়ে ফিবিয়ে দেখে। সোনাবাতি প্রথম হেমন্তের দিনে সে বছর গোটাগুটি একটি ফ্রক পায়। একটি পুতুল পায়। একটি নীল গলাবন্ধ সোয়েটারসুদ্ধু পেযে যায়।

কাসুন্দেব মাঠেব দিন এ শীতে অন্য রকম। রাতও তেমন বাত নয়। গভীর রাত পর্যন্ত তাসখেলা চলে। এই সেদিন সত্যনাবাযণের শিন্নি হল। চরণামিত্তির খেয়ে, শান্তির জল নিয়ে লাবণ্য নিজের হাতে কাঠেব হাতায় শিন্নি ঘুঁটল। দুপুরবেলা বাপের ঘরে বসে গপ্প করছে বউ-ঝি'রা। মানুষটি কথা বলতে পারে না, চেয়ে চেযে দেখে। চোখের কোলে খুশি। লাবণ্য কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে কাজ, নাতিনাতনিদের গপ্প বলা ... 'দত্যি ছিল সত্যি সত্যি!'

রাক্ষসে আর দৈত্যে কি তফাত দিদুম?

বাপরে! কী একটা তফাত? রাক্ষসের দাঁত দু-পাশ থেকে হাতির মতন বেরিয়ে থাকে। দত্যির দাঁত মুখের মধ্যে লুকুনো। রাক্ষসের মাথায় দুটো শিং। দত্যির মাথায় একটা। শিং ঢাকতে দত্যি কান মাথা ঢাকা টুপি করে, মানুষের মধ্যে বড়োসড়ো মানুষটা সেজে ঘুবে বেড়ায়।

ও ঠাকুম, রাক্কসের গায়ে বেশি জোর না খোক্কসের?

বলা কঠিন বাপু, তবে খোক্কসের পা ছিনে-পড়া, রাক্ষসের পা গোদা গোদা, ভীমের গদার মতো, এখন বুঝে দ্যাখো।

বহুদিন আগেকার হাওয়া-খাওয়া পোর্সিলেনের মেমপুতুল, কুকুর নিযে বেড়াতে যাওয়া সাহেবপুতুল, ক্রুশের ওপর যিশুপুতুল, কাচেব টাঙাগাড়ি, পুতুলের জুতো, যক্ষির ধন সব লাবণ্য বার কবে দেয়। মায়েবা বলে, 'সাবধানে খেলো, মায়ের যত্নকের জিনিস সব।' কোনো কোনো মা আবার ছেলেমেয়ের অনেক আপত্তি ও কান্নাকাটি সত্ত্বেও সেসব পুতুল তোযালে মুড়ে সুটকেসে তুলে রাখে। এসব জিনিস আর আজকাল পাওয়া যায় না। অ্যান্টিক হয়ে গেছে। জামাইরা বোদ্ধার গলায় বলাবলি করে। কে কী বলল, কার জিনিস কম্নে রাখল, লাবণ্যর আর হুঁশ নেই। কদ্দিন আর জিনিস তাংড়াবে? জিনিস বলতে এক আলমারি দুর্মূল্য সেকালের কাচ পাথরের পুতুল, কাঠের, লোহাব খেলনা সব, ন্যাপথলিন কালো জিরে-শুকনো লংকা দিয়ে জিইয়ে রাখা ছোটো ছোটো কাপড়জামা। লেপ কাঁথা, তা ছাড়া আলমারির গুপ্ত খোপে ছোটো ছোটো চুড়ি-বালা মটরমালা-আংটি মাদুলি। যার জিনিস তার ছাড়া কারও অঙ্গে ওঠেনি। খাওয়া দাওয়ার পর সকড়ি

কাপড় ছাড়ার হাঙ্গামা লাবণ্য এদানি করছে না। দুপুরঘুমের স্বপ্নটুকু লেপে পুঁছে একাকার। দরজার হুড়কো তুলে দিয়েই জানালার কপাট খুলে দেয়। ছিট ছিট ফ্রক। নীল সোয়েটার ভাঙা রিক্‌শার খোঁদলে পুতুলের সংসার পেতেছে। রামধনিয়া ডাকে, 'এ সোনাবাত্তি, পানি দিবি না?' জান্‌কি হাঁকে, 'সোনাবাত্তিয়া-আ আটা ডল্‌বি নাই?' সাড়া মেলে না। কেমন নিবিড় নিশ্চিন্দি খেলা দেখো! খাওয়া নেই দাওয়া নেই। সারাদিন গুলি খেলা, ঘুড়ি খেলা ... পুতুল খেলা। পুতুলের বালিশবিছানা, তোশক মশারি সুদ্ধু মায়ির সাবেকি আলমারির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ মায়ি বহুত্ দোয়া আছে। হাঁ! টইটই করে শীতের মাঠ চষে বেড়ায় দুখানি পাতলা পাতলা খালি পা। খালিপায়ে ঘুণ্টি দেওয়া লাল জুতুয়া দেখতে সাধ যায়। গোলাপি মোজা। গোলাপি টুপি, কান-ঢাকা, ডগা উঁচু, কানাঅলা, কতরকম, কত্তরকম দেখতে সাধ যায়। লাবণ্য জানলার গরাদ ধরে সারা দুপুর একবার পরায়, একবার খোলে। একবার খোলে, একবার পরায়। তার গলা ধরে মিষ্টি মিষ্টি দুটি হাত সারা দুপুর দোল খায়, শুকনো গালে, কপালে, চিবুকে মিটি দেয়। লাবণ্য স্বপ্নহীন অঘোর ঘুমে ঢলে পড়ে, ঠোঁটের কোনা চিকমিক করে।

হিম ক্রমেই জমাট হচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে জমাট হিমের হিমপাহাড়। অনেক বেলা করে রোদ উঠছে। বড়ি শুকোতে চায় না, আচার ভটভট করে, জামাকাপড়ে স্যাঁতা লেগে যায়, বর্ষার দিনের মতো জুতোয় ছাতা ধরে যায়, এত আঠা হাওয়ায়। ঘরের মধ্যে মালসা-আগুন, তবু রুগি নাকের জলে চোখের জলে। রুগির আর দোষ কী। তার ধাইটিই তো জ্বরে কাবু। জবুথবু। ভোরের চানে ঠান্ডা লেগে বুকে সর্দি। ঘঙ্ ঘঙ্ খক্ খক্। রুগিটি বুঝি দেখাশোনার অভাবে বুড়ো গাছের শেষ পাতাটির মতো ঝরে খসে গেল। ডাক্তার এসে লাবণ্যর বুকে নল বসাচ্ছে। লাব্ ডুপ্ লাব্ ডুপ্ দিব্যি উঠছিল। উঠতে উঠতে হঠাৎ হঠাৎ ফ্যাঁস্ করে কেমনতরো একটা বেখাপ্পা আওয়াজ উঠছে। মুড়িসুড়ি দিয়ে কড়া কড়া ওষুধ গিলে কাঠের মতো পড়ে থাকে লাবণ্য। দুবেলা গরম গরম সুরুয়া খায় চুপচাপ। জামাই চলে গেছে। ছেলেগুলিও গেছে। মেয়ে বউগুলি সব যায়নি। বাড়িতে দুটি রুগি। পরন্তপের বউ একলা ক-দিক সামলায়? তার ওপর আবার চাকুরে মানুষ!

তা শীতের বুড়ির মাথার খেয়াল! মাথার পোকা নড়ল তো ঝপ্ করে কাঁথা কম্বল নামিয়ে দেবে, আবার পোকা ঘুমোল তো মিঠে আঁচে সেঁকে তুলবে মাটির তাওয়ায় মাঠের মাটি। তাই একদিন বাদুলে কাঁদুনে ঠান্ডার জোলো পর্দাখান টান মেরে সরিয়ে ঝকঝকে নীল আকাশ লম্ফ দিয়ে নামে। ঘাসের শিশিরে ফুরফুরে সব হালকা মেঘের ছায়া পড়ে। গায়ের ব্যথা মরেছে, কাশি ধরেছে। জ্বর নেমেছে। লাবণ্য বুঝি এবারের ধাক্কা সামলে নিল।

পায়ের দিকের জানলাটুকু খুলে দাও তো মা ...

উত্তুরে জানলা যে মা, হাড়অব্দি হিম হয়ে যাবে ...।

তা হোক দাও গে একবার, ঘরে কদ্দিনের স্যাঁতা ...।

জানলার কপাট খুলতেই ভলকে ভলকে রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, হাউ-হাউ আওয়াজ ঢোকে পিছু পিছু। কিন্তু রোদের তেজে তার বঁটিতে আর শান নেই। টলর্ টলর্ পায়ে লাবণ্য গরাদ ধরে দাঁড়ায়। চিরণ গাছের মাথায় একটা বাদামি চিল, গোদা লোমশ পায়ের থাবা থেকে সদ্য-মারা মেঠে ইঁদুর ঝুলছে। ফেলে-যাওয়া কাকের বাসাখান দোল খাচ্ছে পাতাঝরা নিমের শুকনোশাকনা ডালে। পোড়ো পাঁচিলের গায়ে জান্‌কি দেখো একমনে থাবড়া থাবড়া গোবর মেরে যাচ্ছে। রামধনিয়ার মুখে চুট্টা। কাঁধে গামছা। জাড়ের দিনে ধুপে বসে আয়েস করছে দুপুরবেলা। এখন সোয়ারি লিবে নাই। আপিস-টাইমে ঠিকঠাক টিশনে হাজিরা দিবে। ওই তো জান্‌কি উঠল, মাথায় বিঁড়ে, তার ওপর ঝাঁকা, তার ওপর থাক থাক ঘুঁটে। চালির ওপর টাল করে রাখবে

আপাতত। আষ্টেপিষ্টে শুখা হোক এখন। ধাঁইধাঁই করে আঁচ উঠবে, শাঁইশাঁই করে রটি হোবে। ইদিক-উদিক তাকিয়ে অসুখে ভাঙা সরু গলায় লাবণ্য ডাকে, 'সোনাবাতি, সোনাবাতি রে-এ-এ।' জান্‌কির মাকড়ি-পরা চওড়া-চওড়া কানে মায়ির ডাক ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে। ঝাঁকা সামনে দোতলার জানলার দিকে এক চোখ তুলছে দ্যাখো। 'সোনাবাত্তি চলি গেলো হুজুব। ই মওশুম মকাই হঁলো, বুঁট হঁলো, খেতিতে কাম করবে মায়ি। ইস্তাসে টেঁকুলে পানি ঢালবে, মকাই কাটবে, মসুরি কাটবে, সাঁড়ি হোবে, চুঁড়ি হোবে। বাপে এলো, চলি গেলো ... ঘুঁটিয়া লিবি মায়ি? হেই মা আ!'

জানলাব গরাদ থেকে মরাসোনাপরা নীলশির-ওঠা রোগা রোগা হাত দুখানি শীতের শেষ পাতার মতো ঝরে যায়। টলর-টলর পায়ের বিছানায় এসে বসে লাবণ্য।

আটা ভাজাসমেত চায়ের বাটিটি বিকেলে পরন্তপের বউ নিয়ে এলে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়---

চায়ের বাটি মাজল কে?

ঝি!

সেই বাগ্‌দি বেটি? ক'মাস আগে যে বাউনের ছেলেব সঙ্গে বেরিয়ে গিছল?

সেই তো আছে মা এখনও!

বাগ্‌দি-বেটির মাজা বাটি কি আদপেই মাজা বাটি বউমা? তাতে কি শুদ্ধ জল দিয়ে হেঁসেলে তুলতে মনে ছিল?

বউ চুপ।

রোগে মানুষ অদড় হলে তবে তাকে ছত্তিশ জাতের ছোঁয়া-ন্যাপা নিয়ে জয়-জয় কবতে হবে? এ কি অসৈরন কাণ্ড মা!

আওয়াজ পেয়ে মেয়ে, দুটি বউ এসে দাঁড়ায়, দুপুর-শো-এ তারা কাছের হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

রাস্তার কাপড়েই সব ভেতরে এসে দাঁড়ালে? কেন, দোরে দাঁড়াতে কী হয়েছিল?

গনগনে মুখে লাবণ্য কুলুঙ্গিতে গঙ্গাজলের ঘটি খোঁজে, গোবরমেশানো শুদ্ধির জল খোঁজে, কোশার মধ্যে বিল্বপত্র ডোবায়। শীতের আসন্ন সন্ধ্যায় সমস্ত মানুষজন, বিছানা বালিশ, চালিতে তোলা অতিরিক্ত লেপ-কম্বল, চেয়ার-টেবিল, আলমারি-খাট, মায় বাড়ির দরজা-জানালা, দেয়াল-মেঝে, কড়ি-বরগা সব কিছুর ওপর সে ডিঙি মেরে মেরে গঙ্গাজল ছিটোতে থাকে। 'নমঃ শিবায়, এ কি অসৈরন কাণ্ড মা?' ছিটিয়ে-টিটিয়ে লাবণ্য হাত গুটোয়, পা গুটোয়, মাথাটি শুদ্ধু কাছিমের মতো গুটিয়ে নেয়, তারপর হাত-পা, মুণ্ডহীন একখানা সৃষ্টিছাড়া ধড় অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে তার বুকের ভেতরেব, ভেতরের ভেতরের কুঠুরিখানিতে যেখানেও আবার সত্যিকার লাবণ্য থাকবে কি থাকবে না সে কথা স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।

আত্মজন

বাড়িতে আদ্যিকালের দেয়ালঘড়িখানায় ট্যাং ট্যাট্যাং ট্যাং করতে করতে বেলা তিনটেও বাজল, ডাক্তারবাবুরাও সব একত্তরে যেন সাঁট করে রুগির ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুখগুলোয় সব থম ধরেছে। কেউ কারও পানে চাইতে পারছেন না সোজাসুজি। মোটা টাকার ফি গ্যাঁটস্থ হয়েছে, সারাদিন এলাহি খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু সুরাহা কিচ্ছুটি হল না। তা ছাড়াও, মানুষগুলির বিদ্যে-সিদ্যে সব যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বড়োবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। শুধু মেজোবাবু এখনও ভেতরে। মুখময় খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, পালঙ্কের ইদিক উদিক দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ঘুরে ঘুরে মরছেন।

শহর থেকে গলা-কাটা দাম দিয়ে আনা ডাক্তারগুলি সব যে যার গাড়ি করে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। বাড়ির বদ্যি গুহ ডাক্তারই শুধু জালে আটকা পড়ে ধাড়ি কাতলার মতো খাবি খাচ্ছেন। বড়োবাবু তাঁর কনুইয়ের কাছটা ক্যাঁক করে ধরে আছেন। কোনোমতেই ছাড়ছেন না। নজর মাটির পানে রেখে গুহ বদ্যি মাথাটা নাড়লেন, ডাইনে বাঁয়ে। বড়োবাবু বললেন, 'সে কি?' কথার ভাবে মনে হল অত বড়ো মানুষটি এক্ষুনি ভ্যাঁ করে ফেলবেন। গুহ নীচু গলায় বললেন, 'ব্যাপার তো ভুতুড়ে কিনা বড়োবাবু! রক্তে চিনি নেইকো, হার্ট প্রেশার সব ঠিক ঠাক, ইনফেকশন নেই! আঘাত টাঘাত কিছু না। খামোখা মানুষটার এমনিধারা অবস্থা যাকে কিনা আমাদের শাস্তরে বলে 'কোমা'। আপনি তো দেখতেই পেলেন বড়োবাবু ওনারা সব বলছেন হাসপাতালে নিলেও সুবিধে বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর, হাসপাতালের ব্যবস্থা তো এখানেই সব করেছি---গ্যাসকে গ্যাস। স্যালাইন কে স্যালাইন। চব্বিশ ঘণ্টা নার্স মোতায়েন। ত্রুটি তো কিচ্ছুটি রাখেননি বড়োবাবু!'

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। মেজোমণিকে শহরের বড়ো ডাক্তারেও জবাব দিয়ে গেছে। কবরেজ, হাকিম, হোমিওপ্যাথিক, জড়িবুটি সবরকমই হচ্ছিল। এখন শেষমেশ ভারী শহরের ভারী ডাক্তার, বুকের ছবি, পেটের ছবি, হ্যান একজামিন, ত্যান একজামিন, এক কাঁড়ি করে টাকা খর্চা, তা তেনারাও সব যে যার মতো মাথা নেড়ে নেড়ে জবাব দিয়ে গেলেন।

ছোটো গ্রাম। গঞ্জর কাছেই। টাউন-শহরও দূর-দূরান্তে। তা সেই গাঁয়ের যে যেখানে আছে আজ এতোগুলিন দিন একবার করে অন্তত বড়োবাড়িতে হাজরে দিয়ে আসছে। জমিদারবাড়ি নয়, হাকিম না হুকুম না, তবু বড়োবাড়ি বড়োবাড়িই। গাঁয়ের ছেলে ছোকরার, ঝি বউয়ের বিয়ে-বউভাতে ওই বড়োবাড়ির উঠোনেই শামিয়ানা পড়ে, পালাগান, যাত্রা, অষ্টপ্রহর সব ওইখানেই। •

কিছুর মধ্যে কিছু না বড়োবাড়ির মেজোমণি অজ্ঞান হয়ে আছেন আজ মাস ফুরুতে চলল। অমন লম্বা চওড়া জগদ্ধাত্রীর মতো শরীরটি ছোট্ট হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। সোনাহেন বর্ণ কালিঢালা। চোখমুখ সব যেন গর্তে ঢুকে আছে।

ঘটনাটা যে রোববার ঘটল, তখন দুপুরবেলা। সিরাজুলের মা অন্দরে বসা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণখানা সে ইতিমধ্যেই যেখানে পেরেছে চাউর করে ফেলেছে। বাড়িটিতে মানুষ তো আর কম নয়! শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে যেটের বাছা এই এতগুলি। সব যে যার তালে। বড়োমণি পুজোর

ঘরে। বেরোতেই কোন্ না একটা দুটো বেজে যাবে। তিরিশ রকম ঠাকুর-দেবতাকে ফুল-জল দেওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! বড়ো ভক্তিমানী মানুষটি বড়োমণি। এতটি বেলা পর্যন্ত সুদ্ধু এক ঘটি চা খেয়ে ঠাকুর দেবতাদের সব জলপান দিচ্ছেন, ছোটোমণি তখন টেবিল ঢাকায় ফুল কাটছেন ফুটফুট। সূচ ঢুকছে, সূচ বেরুচ্ছে, আর কত রঙবেরঙের কারুকাজ—দোপাটি ফুল, বেড়ালছানা, শিবলিঙ্গ জড়িয়ে কালসাপ— সব সিলসিল সিলসিল করতে করতে ঢাকার ওপর আঁকা হয়ে যাচ্ছে। ছোটোবাবু তখন আড্ডাঘরে, তাস পিটছেন, ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে গুলতান খুব জমেছে। ওদিকে বড়োবাবুতে মেজোবাবুতে তক্কো চলেছে। ইনি বলছেন সাংখ্য হলেন গিয়ে আদি সংখ্যার আখ্যান-বাখ্যান, সাংখ্যই সবচেয়ে বড়ো, উনি বলছেন, 'বেদান্ত হচ্ছেন সব বিদ্যের অন্ত বাপধন! কে বড়ো কে ছোটো এখন আপনি বোঝ।'

পেল্লাই ভাতের হাঁড়িখানি নামিয়ে মেজোমণি বললেন, আর একটু সবুর কর সিরাজুলের মা, বেলাবেলি দুধটুকু জ্বাল দিয়ে নিই। একরাশ কচুর ডাঁটা কাটতে আমার সৈরভীর দুধটুকু জ্বাল দেওয়া হয়নিকো এখনও।

'বসতেই তো এয়েচি তোমার ঠেয়ে', সিরাজুলের মা গাছের আম-জাম কোঁচড়ে নিয়ে অপেক্ষা করে। দুধ জ্বাল দিয়ে, উনুনে রাশ রাশ কয়লা ঢাললেন মেজোমণি। উনুন দুখানা কী! খাই খাই না রাবণ খাই। কয়লা দিয়ে-টিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে দাওয়ায় এসে বসলেন মেজোমণি। মেজোমণিও বসলেন সিরাজুলের মাও নিষ্পলকে দেখতে থাকল। দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো এই টানা টানা চোখ, ভুরু কান ছুঁয়েছে, এই থাক দোয়া দোয়া চুল! এতক্ষণ হাতখোঁপা করে বেঁধে রেখেছিলেন রসুইঘরে ছিলেন বলে, এখন খুলে দিতেই শাঁত করে পিঠময় ছড়িয়ে দাওয়ার ওপর বিলি কাটতে লাগল। কী রাশ! বাব্বাঃ! ডিবিসি বাঁধের বন্যের মতন।

হাত দিয়ে চুলের গোড়ার কাছটি খেলাতে খেলাতে মেজোমণি বললেন, 'আম ক-খানি তুই নিয়ে যা দিকিনি। তোর সিরাজুল খাবে। বচ্ছরকার জিনিস। একটি তো মোটে তোর গাছ, তা থেকে বিকোবি, বিলোবি, তবে আর খাবি কি বাছা। চাল তোর থলিতে আমি ভরে দিয়েছি। দেখিস কাগজের ঠোঙায় মুড়ে আলাদা করে একটুখানি কামিনী দিলুম, পায়েস করে মায়ে-পোয়ে খাস।'

বেশ গল্প করছিল সিরাজুলের মা গেজেটবুড়ি, গাঁয়ের গল্প, গঞ্জের গল্প, টাউন-শহর থেকে যা-যা তথ্য-সংবাদ কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনতে পেরেছে তা-ও। গল্প করছিল আর ভেবে মরছিল, 'এই মানুষের আবার অংখার! লোকে দেখেই বা কি আর বলেই বা কি! পাড়া বেড়াবে কি মানুষটা, মরবার সময়টুকু থাকলে তো!'

হঠাৎ মেজোমণি কেমন অস্থির হয়ে বললেন, 'মা, শরীরটা আমার কেমন আনচান করছে, আমি একটুক ঘরে যাই।'

যেতে যেতেই মেজোমণি টলতে লাগলেন, সিরাজুলের মা না ধরলে বোধ করি পড়েই যেতেন। পালঙ্কে কোনোমতে কাত করে দিয়ে সিরাজুলের মা অন্দরের অন্য দিকে ছুটল, 'ও বড়োমণি গো, ও ছোটোমণি গো দেখে যাও তোমাদের মেজোমণি কেমন করতেছে।' বড়োমণি ঠাকুরঘরে, শুনতে পেল না। ছোটোমণি সিলোতে সিলোতে সুতোটুকু দাঁত দিয়ে কাটছিল, তা দাঁতের সুতো দাঁতেই রয়ে গেল, ছোটোমণি দৌড়ে এসে বললে—'মেজদি-ই-ই।' আর মেজদি ; মেজদি তখন ঘোরে কি বেঘোরে।

বড়োবাবু এল ধমধম করে, মেজোবাবু এল কাছা কোঁচা সামলাতে সামলাতে, ছোটোবাবু এল বাঁটা তাস কটা হাতে ধরে, শেষকালে গুহবদ্যি এল তার চামড়ার থসথসে ব্যাগটি নিয়ে, গলায় ইস্টেথো ঝুলিয়ে। ক্রমে গাঁ গঞ্জের মানুষগুলি আড়ালে-আবডালে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে

বড়োবাড়ির পেল্লাই বার-উঠোনে, ভেতরবাড়ির দরদালানে, দোলমঞ্চের ফাটা ফোটা থামগুলির আশেপাশে ভেঙে পড়ল। কী হয়েছে গো মেজোমণির? কী হল হঠাৎ মেজোমণির? আগে তো কখনও কিছু শুনিনিকো বাতিকের ব্যামো আছে বলে? কী হয়েছে না কী হয়েছে! সেই যে মেজোমণি চোখ বুজেছেন আজ নিয়ে পুরো সাতাশটি দিন কাবার হয়ে গেল, সে মানুষের আর চোখ মেলবার নামটি নেই।

জমিদারি কবেই উঠে গেছে। তারও আগে থেকে গেছে বড়োবাড়ির ঝাড়বাতি, বোলবোলাও, লোকলশকর। বলতে লাগে না, পাঁচিলের গায়ে বড়ো বড়ো বট অশ্বত্থ ডুমুরের বাড়বাড়ন্ত দেখলে কথাটি আপনি বোঝে যে জন বুঝদার। যে ক-বিঘে ধানজমি, পুকুর, বাগান, গোধন আছে, তল্লাটের সব মানুষ জানে তা দিয়ে বড়োবাড়ির জলখাবার টুকুনিও হয় কি না হয়। বড়োবাবু দেবভক্ত সাত্ত্বিক মানুষ, জীবনে কখনও রোজগারের টাকা ছুঁয়ে দেখেননি। ভাত পাতে তেতো থেকে মিষ্টান্ন অব্দি কুটি কুটি সবরকম না পেলে রোচে না। ক্ষীর কদ্দূর ঘন হল ঢালা-উপুড় করে দেখতে হয় রোজ। কোঁচা লুটুবে একহাত। ঝাড়া বাহান্ন ইঞ্চি, কলকাপাড়ের দিশি কাপড় নিবারণের কুঁচিয়ে দেওয়া নইলে বড়োবাবু পরেন না। মেজোকর্তার তক্কো বাতিক। যেখানেই চাকরি করতে যান তক্কো করে সেসব খুইয়ে-টুইয়ে দুদিন পরেই বাড়ি এসে বসেন। আপিসে লোক রাখে কাজের জন্যে, খামোখা তক্কো করলে তারা শুনবে কেন বাপু? ছোট কত্তার অতসব ভাববার চিন্তোবার সময় নেই। ছেলেবেলা থেকেই নানান শখ। তাসের শখ, যাত্রা-থিয়েটারের শখ, মেডেলের শখ। কিছুর মধ্যে কিছু না ছোটো কত্তা হঠাৎ মেডেল হেঁকে বসেন। তালদিঘি, পাড়ুইপুর, কন্নাটি এই তিনখানা গ্রাম যে সবচেয়ে আগে বড়ো বেড় দিয়ে আসতে পারবে সে সোনার মেডেল পাবে। ছোটো কত্তার মুখ থেকে কথা বেরুনো আর রামচন্দ্রের ধনুক থেকে তির বেরুনো মোটের ওপর একই কথা। ওরে এই বাজারে সোনার মেডেল কোথায় পাব রে? পাত দিয়ে মুড়ে দিতে হলেও হাজার দু হাজারের ধাক্কা! ওরে অমন হাঁকা হাঁকলি কেন? আর কেন। ছোটো কত্তা মাথায় নতুন গামছা চাপিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকে। ভাত খাবে না, ঘুমোবে না, কথা কও তার জবাব দেবে না। চোখের জলে নাকের জলে হয়ে সদর-অন্দর করতে করতে অবশেষে ছোটোমণি রসুইঘরে গিয়ে দড়াম করে আছড়ায়, 'অ মেজদি, কী হবে গো, মানুষটা যে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হতে চলেছে।'

মেজোমণি হেসে বলে, 'আচ্ছা সে আমি দেখছি'খন।' মেজোমণি দেখছি বলল তো হিল্লে হয়ে গেল। আর ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। এখন যে যার ঘরে বসে শিবের মাথায় বিল্ব-চন্দনই দাও, কি কাঁথাই সিলোও, তাসই পেটো কি বিদ্যের জাহাজ ভাসিয়ে তক্কাতক্কিই করো। যা করো বাপু নিশ্চিন্দে করো গে। মেজোমণি বলে দিয়েছে, 'সে আমি দেখছি'খন।'

বড়োবাড়ির এই হল গিয়ে বৃত্তান্ত। ননদিনিরা আসেন, যান। শহর-বাজারের মস্ত মস্ত সব জামাই। গো-গাড়ি, সাইকেল রিকশা, কি জগঝম্প মটর গাড়ির ভেঁপু বাজাতে বাজাতে এসে পড়েন। তখন বড়োবাড়িতে যেন রসুনচৌকি বসে। জামাই শালা ভাজ ননদাই নিয়ে সে বড়ো আদিখ্যেতার রোশনাই। বড়োবউয়ের ঘরে বসে হাত পা ছড়িয়ে গালগল্প করতে করতে বড়ো ননদ বলেন, 'পানে বেশ করে কেয়ার খয়ের দিয়ে সেজো গো মেজোবউ।' মেজমণি বলে, 'আচ্ছা!'

মেজোননদ বলে, 'ছেলে দুটো আমার কেন যে অমন খ্যাংরা কাঠির জ্ঞাত গোত্তর বুঝি না ভাই মেজোবউদি।'

মেজোমণি বলে, 'ওষুধ আছে। মেজদি তুমি ঘুম যাও।'

মেজদি গিয়ে ছোটোমণির ঘরে এ কেলেচ্ছা ও কেলেচ্ছা করতে করতে ঘুমিয়ে যায়।

সেজোননদ বলে, 'তোমার ননদাই বলছে কষে জলসা বসাও গিয়ে একদিন গাঁয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ে বাজাবার দায় তাঁর, রাখবার দায় তোমার। উনি সারারাত ঠায় তবলায় বসে থাকবেন।

মেজোমণি বলে, ' বেশ তো।'

ছোটো ননদ বলে, 'পুজোর কাপড়-চোপড়গুলি দেখে শুনে নাও গো বউদিরা। ফুল কাটাটি ছোটো বউর, দাঁত দেওয়া মেট্রোপাড়খানা বড়ো বউর, ছেয়ে-রঙটি নয় মেজো বউদি নিও।'

নিজে নিজেই উলটেপালটে দেখে ননদ তেমন সরেস হল না এটি। না-ই হোক। অনেক আছে মেজোর। অনেক, অনেক।

ছেলে-পিলেরা সারাটা দিন মেজোমণির পায়ে বাজছে। মেজোমণি না খাওয়ালে ভাতের পাত শুধু ঠোকরাবে। মেজোমণি রূপকথা না বললে—দুপুর রাত পর্যন্ত চোখ সব টেনে টেনে খুলে রাখবে, বলবে, 'ঘুম আমাদের পায়নি গো। ঘুম পায় না।' এমনি বজ্জাত সব।

ছোটো কত্তার ছেলের মুখে-ভাত হবে। কত্তারা সব মেজোর ঘরে শলা নিতে গেছেন। কোথা থেকে দই আসবে? মেজোমণি বললেন, 'অনন্ত ঘোষেরটাই ভালো।' কোন্ পুকুরের মাছ উঠবে? মেজোমণি বললেন, 'কেন? তেলি পুকুরের! থই থই করছে এখন রুই কাতলায়! ' নেমন্তন্নের লিস্টি মেলাও, গুষ্টি জ্ঞাতিবর্গের কেউ যেন আবার বাদ না যায়। তদারক করো, তদবির করো।

মেজোমণি শশব্যস্তে বলেন, 'বড়দি, তোমার পুজো হয়েচে তো ভাতের হাঁড়িটা একটু নামিয়ো, নবাই এয়েচে, মাছের কথাটা ঠিকঠাক করে আসি গে।'

বড়োমণি চোখ কপালে তুলে বলেন, 'এই সেদিন যে বুকের ব্যামো ধরা পড়ল রে মেজো, ভুলে গেলি? ওমা! আমি যাব কোথা।'

মেজোমণি বলেন, 'কী সব্বোনাশ, তাই তো! ছোটো কোথায় গেলি? ছোটোকে ডাকো, নবাই বড্ড ব্যস্ত হচ্চে।'

ছোটো ফিসফিস করে বলে, 'খোকার আমার ঘুমটা সবে ধরেছে গো মেজদি! চাঁদের কপালে চাঁদ আহা! নইলে তোমার ভাতের হাঁড়ি কেন গোটা হেঁসেলখানাই নামিয়ে দিয়ে আসতুম গিয়ে।'

গভীর রাত্তিরে সব ঘুমিয়ে-জুমিয়ে পড়লে মেজোকত্তা আড়ে আড়ে দেখে মেজোমণি গদির তলা থেকে চাবি বার করল, ঘরের কোণে আঁধার বরন সিন্দুকের চাবি ঘোরাল ঝনাৎ করে, সিন্দুকের ভেতর রুমঝুম, টাকায় মোহরে গাঁদি লেগেছে, সব মেজোমণির ইস্ত্রীধন। তা থেকে মেজোমণি সংসারের সার খরচ-খর্চা যেটুকু যা দরকার, অন্নপ্রাশনের মোচ্ছবের টাকা গুনে গেঁথে সব তুলে নিল। মেজোকত্তা পাশ ফিরে নিশ্চিন্দে ঘুম গেল।

এইভাবে বড়োবাড়ির বড়ো সংসার—তার দৈনন্দিন, তার পালপার্বণ, তার মোচ্ছব সব চলে। সেই মেজোমণির আজ সাতাশটা দিন জ্ঞান নেই, ঘোরের মধ্যে পড়ে। চলে?

কী করবে! বড়োকত্তা গোবিন্দ বসাক গদিওয়ালার কাছে কর্জ করে আসেন। মেজো বউ উঠলে পরে শোধা যাবে। মেজোকত্তা গদিটদি হাতড়ে চাবিটাবি কই কিচ্ছু পায় না। সিন্দুকের ডালা যেমন ভারী হয়ে বসে থাকে তেমনি। দেয়ালের তাক হাতড়ে আলমারির খোপ হাতড়ে অবিশ্যি টাকাকড়ির পুঁজি মন্দ মেলে না। মেজোকত্তা সেইগুলি দিয়ে বড়োদাদার সঙ্গে শলা করে বড়ো শহর থেকে ভারী ডাক্তার আনায়। গোটা সংসারের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ছেলে-পিলেগুলি সময়ে আহার না পেয়ে খিদেয় কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, রসুইঘর ছমছম করছে, কোনোমতে দুটি ভাতে-ভাত নামিয়ে বড়োমণি ছোটোমণি এ-ওর মুখে চায়। কী হবে গো? কী হবে? কত্তাদের মুখে খাবার রুচছে

না। বড়ো মেজোর তো হুঁশই নেই। এদিকে তিন তিরিক্ষে তেত্রিশ রকম পরীক্ষার পর বড়ো শহরের ভারী ডাক্তার কিনা বড়ো আশায় ছাই দিয়ে জবাব দিয়ে গেল?

তে-তল্লাটে মেজোমণির বাপের বাড়ির কেউ নেই। খবর দেবে কাকে? একটি মাত্তর মেয়েকে টাকার পুঁটুলি সুদ্ধ শ্বশুরঘর সই করে দিয়ে বাপ-মা চোখ বুজে নিশ্চিন্দি হয়েছেন। ননদিনিরা সব আসেন। চোখে আঁচল দিয়ে বড়োর ঘরে, ছোটোর ঘরে থানা দিয়ে বসে থাকেন। যদি কোনো সুখবর হয়। তা বসে থাকাই সার হয়। মন কারুর ভালো নেইকো। মেজোকত্তা একবার বলেছিল শহরের নার্সিংহোমে নিলে কি হয়? বড়োকত্তা জবাব দেন, 'বড়োবাড়ির ইজ্জতটুকুও তালে বড়ো শহরে রেখে এসো গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে। ছোটোকত্তা জবাব দেয়, 'তা ছাড়া ঠাঁই নাড়া করতে তো ডাক্তার মানাই করে গেল মেজদা, কান পেতে শোননিকো?' মেজোকত্তা কাঁচুমাচু মুখে সরে যায়। আঁদাড়েপাঁদাড়ে ঘোরে, ফকিরদরবেশ, সাধুসন্ত কেউ যদি কিছু সুলুকসন্ধান দিতে পারে। আশা ছাড়তে পারছে কই?

এমন দিনে ভোর রাতে স্বপন দেখে উঠে বসল মেজোকত্তা। ঘুমের ঘোরেই জড়িত গলায় বলল, 'দাদা, সন্নিসি ঠাকুর এয়েচেন, দোলতলায় দাঁড়িয়ে।' বড়োকত্তা কোমরে লুঙ্গি কষতে কষতে আসছিলেন, দোরগোড়া থেকে বললেন, 'আমিও তাই বলছিলুম।'

ওদিক থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে ছোটোকত্তা এসে বলল, 'শেষ রাতে মাঠ সারতে গিয়ে দেখি পেল্লায় এক চিমটেধারী ব্রহ্মচারী দাদা, ওই যে দোলতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

সারা বাড়ি দেখতে দেখতে জেগে উঠল। বড়োমণি যে বড়োমণি ধুলিশয্যায় ছিলেন, বুকে বড়ো ব্যথা মা। সারা রাত জপ করেছেন মেজোমণির জন্যে, এখনও কুঁড়োজালির মধ্যে আঙুল নড়চে, উঠে বসে আঁচল সামলে মুখে চোখে জল দিলেন। ছোটোমণি ঘুম ভেঙে খুক খুঁক করে কাঁদছিলেন—চোখ মুছে বাইরে এলেন। কপাট খুলে ওঁরাও সব দাঁড়িয়ে গেছেন—ননদিনি, ননদাই। ছেলেপিলেগুলি দলবদ্ধ হয়ে গোঁজ দাঁড়িয়ে সন্নিসিঠাকুর দেখছে।

দোলতলায় প্রায় কার্নিশ সমান উঁচু এক পাহাড়ের মতো সন্ন্যাসী। জটাজুট গোড়ালি ঢেকে লুটুচ্ছে একেবারে। গোঁফসুদ্ধু দাঁড়ি বুক অব্দি নেমে পড়েছে। হাতে ইয়া কমণ্ডলু, চিমটে। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় বড়ো বড়ো রুদ্রাক্ষের মালা, একটার পর একটা ভুঁড়ির কাছে দুলছে। ভস্মলিপ্ত। দারুণ, করুণ সুন্দর, ভরাট ভরসা-জাগানো মুখখানি।

সন্নিসির পায়ের তলায় সব এক-একখানা কাটা মাছের মতো শুয়ে পড়লেন। বড়ো, মেজো, ছোটোকর্তা, বড়োমণি, ছোটোমণি, ননদিনিরা চারজনা। তিনটি ননদাই, একজন এখনও এসে উঠতে পারেননি। ছেলেরা সব খাড়া দাঁড়িয়েছিল। সর্দার ছেলেটি যেমনি বড়োদের দেখাদেখি উপুড় হল বাকি ছেলেগুলিও অমনি তার দেখাদেখি সব মাজা ঘটিবাটির মতন উপুড় হয়ে পড়ল।

দয়া করো বাবা।

রক্ষা করো।

বিপদভঞ্জন মধুসূদন, রাখো ঠাকুর রাখো।

শেষরাত্তিরে ঝিমঝিম করে আঁধার বৃষ্টি হচ্ছে, জনপ্রাণীর সাড়া নেই, শব্দগুলি ভারী-ভরতি হয়ে যেন রাতের চাতালে বিঁড়ে পেতে সব মাটির কলশ, পেতলের কলশ যে যার ঠাঁই বসে গেল। জল চলকাতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ। গমগম করছে শেষ রাত্তিরের বড়োবাড়ি মেজোবউটির জন্য প্রার্থনায়, 'দয়া করো বাবা, রক্ষা করো, বিপদভঞ্জন মধুসূদন হে, রাখো ঠাকুর, রাখো।'

রেশটুকু যেন ধূপের ধোঁয়া, মিলিয়ে গেল ক্রমে। সন্নিসি বললেন, 'কীসের দয়া? কার রক্ষা? কাকে রাখবেন, ঠাকুর?'

গলা নয়কো মৃদঙ্গ। ভাষা নয়কো সুর।

মেজোমণির ঘরে দীপ জ্বলছে, সেদিকে তাকিয়ে সন্নিসি বললেন, 'শিখাটি ক্ষীণ'। কিন্তু আলোটি তো দেখছি দিব্যি পরিষ্কার। তোরা এতগুলি প্রাণী তার জন্যে আহার নিদ্রা ছেড়েচিস আর আলোটি নিভে যাবে? তাও কী হয়? আধারখানি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করো গে যাও বাছারা। আর হোমের জোগাড় দেখো গে। শুদ্ধ কাপড় অত চাই না মা। শুদ্ধ মনে করো, এখুনি। মহাপ্রাণী কী বলেন, দেখছি।'

ভাণ্ডার থেকে মাসের জমা গব্যঘৃত বার করে দিলেন বড়োমণি। চন্দন কাঠ নিয়ে এলেন ছোটোকত্তা, দিঘির মাটি নতুন সরায় করে এনে হাজির করলেন মেজোকর্তা। ছেলেরা সব নদীর পাড় থেকে হোমের বালি বের করল। বড়কর্তা দোলতলায় গিয়ে আসন করে বসলেন, দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা ভক্তি কত্তার। যজ্ঞস্থলে নাম করবেন। সন্নিসি বললেন, 'আর কিছু চাই না। কাউকে চাই না। নির্জন ঘরে একলা হোম করব বাবারা। না হলে আদেশ পাওয়া শক্ত।'

তা—তাই হল। ঠাকুরঘরে ঠাঁই করে দেওয়া হল। ঘরের দরজায় কড়া পাহারা, বন্ধ ঘরে তিন প্রহর নির্জনে হোম করলেন সন্ন্যাসী। দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে সারাটা সকাল হু হু করে চন্দনের গন্ধ, গব্যঘৃতের গন্ধ। দুগ্ধ, মধু ... সন্ন্যাসী হোম করছেন। হোম করছেন। গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে শব্দ আসছে—আহুতি দেবার চড়বড় শব্দ, অং বং মন্ত্র পড়ার শব্দ। তারপর সব চুপ। সারা দুপুর, সারা বিকেল নিঃশব্দ রইল হোমঘর, ঠাকুরঘর।

২

সন্ধ্যা আসন্ন হইলে সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল। কবাটবক্ষ বিরাট সন্ন্যাসী হোমগৃহের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'উপায় মিলিয়াছে। বধূমাতার প্রিয়জন যে স্থানে এতগুলি, সে স্থানে তাঁহার প্রাণরক্ষা এমন কঠিন কর্ম কিছু না। স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া, পবিত্র ও পরিতুষ্ট হইয়া একে একে এ ঘরে আইস, রক্ষার উপায় আমি করিয়া দিই।'

প্রথম প্রবেশ করিলেন বড়োবাবু। গরদের ধুতি ও পিরান পরনে, দিনান্তে মার্জনার ফলে গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তাভ, যুক্ত করে জোড়াসনে বসিয়া বড়োবাবু ভক্তিভরে বলিলেন, 'আদেশ করুন প্রভু।'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'বৎস বধূমাতার রক্ষার একমাত্র উপায় কিঞ্চিৎ প্রতিদান। দান সাতিশয় পুণ্যকর্ম ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারী ব্যক্তি বিশেষত রমণীর অন্তরাত্মার গঠন বড়ো বিচিত্র। ডান হস্ত দান করিল, বামহস্ত জানিতে পারিল না এই শাস্ত্রোক্ত বিধান উহাদের ক্ষেত্রে খাটে না। উহারা স্বীকৃতি চায়। অবিশ্রান্ত দান করিয়া করিয়া মাতার মহাপ্রাণী বড়ো ক্লান্ত দেখিতেছি। অঞ্জলি পাতিয়া করুণ নয়নে চাহিয়া আছেন। আমি যাহা বলি তাহা যদি উহাকে সমর্পণ করিতে পারো তো রক্ষা হইবে, অন্যথায় ...'

বড়োকর্তা বলিলেন, 'আমি ত্রিদিবশরণ দেবশর্মা বলিতেছি প্রভু। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ব্যতীত জল পান করি না, ত্রিলোকে এমন দেবদেবী নাই যিনি আমার হস্তের তুলসী-চন্দন নিত্যসেবা গ্রহণ করেন না। মোক্ষ ব্যতীত আমার নিজের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই। আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়, মেজোবধূমাতাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।'

সন্ন্যাসী শান্তকণ্ঠে বলিলেন, 'বাস। এই অহংকারটুকু ওই নির্বাপিত হোমকুণ্ডে আহুতি দিয়া চলিয়া যাও। দেবতায় তোমার ভক্তির অহংকার। সাত্ত্বিক জীবনযাপনের অহংকার। এইমাত্র।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া দিবে, ঘর মন্ত্রসিদ্ধ। দিলাম বলিলেই দেওয়া হইবে না। দান পূর্ণ হইলে হোমকুণ্ড আবার জ্বলিবে।'

বলিয়া সন্ন্যাসী একমনে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। দণ্ডকাল পরে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখের আসন শূন্য। হোমকুণ্ড জ্বলে নাই।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন বড়োবধূ। লাল পাড় শুদ্ধ বস্ত্রের প্রান্ত কণ্ঠে জড়াইয়া অবগুণ্ঠনবতী ভক্তি ভরে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'অধিক সময় লইব না মা, দক্ষিণ হস্তে কোশা হইতে বিল্বপত্র তুলিয়া বাম হস্তের মুষ্টিতে স্থাপন করো। ঈর্ষার বিষে মেজোবধূর দেহ নীলবর্ণ হইয়াছে। কেহ জানিবে না মা, তোমার এই গোপন ঈর্ষাটুকু হোমকুণ্ডে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই উনি আরাম হইবেন। বিল্বপত্রে ঈর্ষা আকর্ষণ করো। দেখিও মা, মন্ত্রসিদ্ধ ঘর, দিব বলিলেই দেওয়া না-ও হইতে পারে।'

সন্ন্যাসী জানিতেও পারিলেন না, কখন বড়োবধূ নির্গত হইয়া গিয়াছেন। আসনে মেজোকর্তা, যজ্ঞকুণ্ডে সামান্যতম ধূমও আর নেই। মেজোকর্তা গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, 'আদেশ করুন প্রভো'।

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিলেন, 'দারাপুত্র পরিবারসম্পন্ন গৃহস্থ মানুষের কোনো দায়িত্ব অস্বীকার করিলে চলে না বৎস। আচমন করিয়া বসো। উদাসীনতা হোমকুণ্ডে বিসর্জন দিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড দায়িত্ব স্বীকারের প্রতীক স্বরূপ যজ্ঞকুণ্ড হইতে তুলিয়া লইয়া পীড়িতা পত্নীর বক্ষে স্থাপন করো গে। উনি রক্ষা পাইবেন।'

মেজোকর্তা কিছুক্ষণ প্রাণপণে কাষ্ঠখণ্ড তুলিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে শুষ্ক মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল এইবার সন্ন্যাসীর ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে। মুখমণ্ডলে প্রশান্ত শিবভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, ধীরে ধীরে যেন চক্ষে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠাধরে রুদ্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। সেই মেঘগম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া ভয়ে ছোটোকর্তা ও ছোটোবধূর প্রাণ উড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীর আদেশে তাঁহারা একত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বজ্রকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে পারিবে?' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় দুলিতে দুলিতে দম্পতি বলিল, 'না।' দীপ্ত চক্ষে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তবে দূর হইয়া যাও।'

আসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হোমঘরের কপাট খুলিয়া দাঁড়াইলেন। যেন মূর্তিধারী কালভৈরব। দীপ্ত চক্ষু, কণ্ঠে বজ্র—বলিলেন, 'আর তিন দণ্ড কালমাত্র বাকি আছে ইহার মধ্যে মাতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে তোরা কেউ শীঘ্র কিছু দে।' ননদিনিদের কাহাকেও বলিলেন, 'লোভ দে', কাহাকেও বলিলেন, 'মিথ্যায় মুগ্ধ হইয়া আছিস, মোহটুকু দে', কাহাকেও বলিলেন, 'একদেশদর্শিতা বিসর্জন দে' সন্ন্যাসীর মন্ত্রের ক্রিয়ায় সকলে সত্যবদ্ধ। কেহই প্রার্থিত বস্তু দিতে পারিল না।

অবশেষে সন্ন্যাসী বালক-বালিকাদিগের প্রতি চাহিয়া মৃদু, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, 'ওঁ তৎসৎ। বৎস, তোরা শুচি নিষ্কলঙ্ক অকপট, তোরাই তাঁহার শেষ আশ্রয়। বল, বাছারা মেজোমাতাকে ভালোবাসিস?'

'হ্যাঁ।' সমবেত কণ্ঠে উত্তর আসিল।

কেন?

মেজোমণি পুতুল কিনিয়া দেয়, লাটিম কিনিয়া দেয়?

বল কিনিয়া দেয়, মেজোমণি খাবার করে, গল্প বলে।

যদি তিনি আর কিছু কিনিয়া না দেন, আহার্য প্রস্তুত না করেন, যদি রূপকথা আর না বলিতে পারেন?

বালক-বালিকার দল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী খড়মের শব্দ তুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রথমে দরদালান, তাহার পর বাহির প্রাঙ্গণ, তাহার পর বিরাট মানুষটিকে আর দেখা গেল না।

৩

হোমঘরে চন্দন কাঠ, গব্যঘৃত, ধুনো গুগগুলের গন্ধ কেমন তীব্র কটু হয়ে উঠেছে। বড়োবাবু রোষকষায়িত লোচনে বললেন, 'ভণ্ডামিগুলো টান মেরে ফেলে দে। নিবারণ, বিশু কে কোথায় আছিস।'

সিরাজুলের মা বুক চাপড়াতে এসে বলল, 'সব্বোনাশ হয়ে গেল গো। মেজোমণিমা আমার আর নেই যে গো! টিমটিম করে পিদ্দিমটি জ্বলছিল, আগলে-বাগলে রেখেছিনু, তা মাকে আর ধরে রাখা গেলনি।'

মেজোমণির ঘরে দীপ জ্বলেনি। বড়োকর্তা বললেন, 'মেজো, চাবি দে।'

মেজো বললেন, চাবি নেই।

ছোটোকর্তা বললে, ইয়ার্কি মেরো না দাদা। চাবিটা দিয়ে ফেলো। চাবি হলে সব হবে।

বড়োমণি বললেন, চাবি হলে সব হবে?

ছোটোমণি বললেন, সব হবে।

ননদিনিরা বললেন, হবে, হবে, সব হবে।

গদির তলায় হাত দিয়ে মেজোকর্তা অবাক হয়ে দেখলেন—ওমা এই তো চাবি। শেষ-সম্বলটুকু দাদার হাতে তুলে দিতে দিতে মেজোকর্তা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

চাবি একবার ঘোরাতেই সিন্দুকের ডালা ফাঁক হয়ে গেল। অভ্যন্তর শূন্য। মেজোমণির স্ত্রীধন মেজোমণির দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করেছে।

মোহানা

সুরম্য ঘোষাল এবার বড়োদিনের পর বহু নববর্ষের চিঠির মধ্যে একটা চিঠি পেলেন সেটা একটু অন্যরকম। গতানুগতিক কার্ড নয়, প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার ইত্যাদিও নেই। আছে আই আই টি খড়্গপুরের কনভোকেশন উপলক্ষ্যে একটি ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র। সেইসঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি লাইন বাংলায়, 'সুরম্য, এলে স্বভাবতই তুই আমার এখানেই থাকবি।' ঠিকানা রয়েছে একটি এ-টাইপ কোয়ার্টার্সের, সই ডক্টর কান্তিময় উপাধ্যায়ের। চিনতে খুব দেরি হল না। দেরি হবার কথা নয়। কারণ আই আই টি জীবনে কান্তি বা কান্তিময়ই ছিল সুরম্য ঘোষালের সবচেয়ে সহৃদয়, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। যদিও আই আই টি ছাড়ার বছরখানেকের মধ্যেই দুজনের কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলেন তার ঠিক নেই। বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা, দেখাশোনা তো দূরের কথা, সামান্যতম যোগাযোগ পর্যন্ত ছিল না।

এতদিন পর এই নিমন্ত্রণপত্র এবং এক লাইনের চিঠি সুরম্যকে খুবই বিধুর এবং বিব্রত করল। বিধুর কেননা, মনে পড়ে যায়, সব মনে পড়ে যায়। বিব্রত কেননা, জানুয়ারি মাসের যে সময়ে কান্তি তার নিমন্ত্রণটা পাঠিয়েছে সে সময়ে তাঁর বম্বে যাওয়ার কথা। ডিরেক্টার্স-মিটিং। তাঁকে কাগজপত্র নিয়ে হাজির থাকতে হবে। তিনি যদি না যান বোসকে পাঠাতে হবে, তার জন্য বোসকে এখন থেকেই ব্রিফিং করা দরকার। কান্তি যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে, অভিজ্ঞতা এবং কাণ্ডজ্ঞান আছে তাই বেশ খানিকটা সময় হাতে রেখে নিমন্ত্রণটা পাঠিয়েছে। কিন্তু ঠিকানাটা পেল কী করে? গত তিরিশ বছরে তো স্থানবদল মন্দ হয়নি। তেত্রিশের এক কম্পাস রোড কলকাতা থেকে, মহাত্মা গান্ধি রোড ব্যাঙ্গালোর, চিন্তামননগর পুনা, জওহরলাল নেহরু মার্গ ভুবনেশ্বর হয়ে এখন কোশি রোড জামশেদপুর।

সত্যি, দিনগুলো কীভাবে উড়ে যায়! না উবে যায়! সামান্য একটু গন্ধ রেখে। সুরম্য চিঠিটা পেয়েছিলেন দুপুরে খাওয়াব সময়ে বাড়ি এসে, স্ত্রী-ই ধরিয়ে দিয়েছিলেন খামটা। তখন লনের ছায়া-পড়া দিকটায় কাঁটালগাছের তলায়, স্টিল ফ্রেমের ইজিচেয়ার পেতে সুরম্য দু মিনিটের জন্য চোখ বুজেছেন কি বোজেননি। এই সময়টা আজকাল বড়ো ঘুম পায়। ঘুমটা দশ মিনিটের মধ্যে বন্দি থাকলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তা থাকছে না। দশ ছাড়িয়ে পনেরো, পনেরো ছাড়িয়ে কুড়ি মিনিট। আধ ঘণ্টার দিকে ঝুঁকছে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্নর মতো যা আধ ঘণ্টা তাই এক ঘণ্টা হয়ে যাবেই একটু সাবধান না হলে। মাঝে মাঝে নিজের নাক-ডাকা নিজেই শুনে চমকে জেগে ওঠেন সুরম্য। আজ মনে করলেন স্ত্রীকে বলবেন দুপুরেও রুটিই দিতে। এই ভাত-ঘুম বন্ধ করতেই হবে। কল্যাণী এসে চিঠিটা হাতে দিতে অর্ধ-নিমীলিত চোখ পুরো খুলে মনের বাসনাটা ব্যক্ত করলেন সুরম্য।

ভুরু কুঁচকে উল বোনা থামিয়ে কল্যাণী বললেন, 'কেন? ভাত-ঘুম বন্ধ করবে কেন?'

সে কী! ভাত-ঘুম ভালো? চালিয়ে যাব?

পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছ, সারাদিন কোম্পানি অস্থি মজ্জা শুষছে। দুপুরে এক ঘণ্টা ঘুমোলে কি বড়োসাহেব খুবই রাগ করবেন?

ওঃ তুমি যে একেক সময়ে কী বলো। বড়োসাহেবের রাগ-অনুরাগের ওপর আমার জীবনযাত্রা নির্ভর করছে নাকি?

তা ছাড়া আর কী? আজ তোমার ঘুম নির্ভর করছে, কাল তোমার খাওয়া-দাওয়া শোওয়া-বসাগুলোও করবে। অমন চাকরি আর এ বয়সে না-ই করলে?

ভুঁড়ি হয়ে যাবে কল্যাণী, বোঝো না?

স্ত্রী যেমন স্বামীর দুর্বল স্থানে আঘাত করতে জানেন, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর দুর্বল স্থানটির খোঁজ রাখতে ভোলেন না। এবং সে স্থান হল ভুঁড়ি। কল্যাণী নিজে যোগ-ব্যায়াম করে চেহারাটি মোটের ওপর একহারা রাখতে পেরেছেন। ভুঁড়িয়াল স্বামী তাঁর দু-চক্ষের বিষ। কিন্তু সুরম্যকে অবাক করে দিয়ে কল্যাণী বললেন, 'এমন করছ যেন ভুঁড়ি হতে আর বাকি আছে! আর এই বয়সে একটু-আধটু ভুঁড়ি ভালোই দেখায়। যে সময়ের যা। প্রধানমন্ত্রীকে আজকাল টাকে কেমন সুন্দর মানিয়ে যাচ্ছে দেখছ না?'

সুরম্য অবাক হতে হতে চিঠিটা পড়ছিলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে অবাক হচ্ছিলেন। আই আই টি খড়্গপুর। কোথায় সে? কখন? দেশকালের কোন্ বিন্দুতে? ছেলেকে শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্য শিখতে পাঠানো হয়েছিল। বাবা-মার অনেক ইচ্ছা সত্ত্বেও সে মহাজন পন্থা অনুসরণ করেনি। এখন কাঁথা-সেলাইয়ের পাঞ্জাবি পরে ললিতকলা আকাদমি ও কলাভবনের মধ্যে যাতায়াত করে। তার সঙ্গেই সম্পর্ক কমে আসছে, আর আই আই টি খড়্গপুর! তারপরে আবার ক্ষুদ্র এক লাইনের অন্তরঙ্গ বাংলা, 'এলে তুই স্বভাবতই আমার এখানেই থাকবি—কান্তি।'

ঘাস থেকে রোদ্দুর আরও সরে গেছে। উলকাঁটার থলি সংগ্রহ করে কল্যাণী ভেতরে চলে গেছেন। সম্ভবত দুপুরঘুম ঘুমোতে। সুরম্য জেগে উঠেছেন। খুবই জাগ্রত। হাতে চিঠি ধরা। চোখ খুলে, চোখ বুজে সুরম্য দেখছেন, দেখছেন, দেখছেন।

একদল হিংস্রমুখ ছেলে। অল্প বয়স। শাণিত বুদ্ধি। কিন্তু সামান্যতম সুযোগে ভেতরের রাক্ষসগুলো বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং একদল ছেলে নয়। একদল রাক্ষস আসলে।

কী হল? একশোবার ওঠ-বোস করতে বললুম করলে না?

করলুম তো?

করলে? মাত্র পঁচিশবার করে বলছ একশো? শটকে জানো না এঞ্জিনিয়ার হতে এয়েচ, অ্যাঁ? করো বলছি আরও পঁচাত্তর বার।

আমি গুনে গুনে একশোবার করেছি।

দেখেছিস সৌমিত্র, তখনই বলেছিলুম ছেলেটা তাঁদড়। অল্পের ওপর দিয়ে ছেড়ে দেব ভেবেছিলুম। এই ব্লাডি বাস্টার্ড, পাঁচশোবার কর।

সুরম্য অন্ধের মতো দৌড়ে গিয়ে বড়ো রাক্ষসের মুখ খিমচে দিয়েছে। তিনজন তিন পাশ থেকে ছুটে এসে তাকে ছাড়িয়ে নিল। বড়ো রাক্ষস রাগে কাঁপছে।

এত সাহস! অ্যাতো সাহস! এই তোরা ওকে নিয়ে যা। ওর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

সতেরো বছরের পেটের অসুখে ভোগা, মাদুলি-তাবিজ পরা, মা-বাপের একমাত্র আদুরে রোগাপাতলা ছেলে ঠক ঠক করে কাঁপছে। সুদ্ধু একটা জাঙিয়া পরে।

সবাই মিলে তিনতলার ছাদে নিয়ে গেল ঠেলেঠুলে। বৃষ্টির জলের পাইপ দু-হাতে ধরিয়ে দিল।

নাও। এবার কত বড়ো বাপের ব্যাটা তুমি দেখি, এই পাইপ বেয়ে নীচে মাটিতে নামতে হবে, তবে বুঝব শালা তোর বাপ আছে।

পাইপটা দু'-হাতে শক্ত করে ধরে সুরম্য ছাদের কোণে উপুড় হয়ে রয়েছে। দেহে সাড় নেই। মুখ ফ্যাকাশে। নীচে নিশ্চিত নিষ্ঠুর মৃত্যু।

কে একজন বলল, 'ও নিজে যাবে না। পা ধরে হ্যাঁচকা মেরে ঝুলিয়ে দে।'

দৌড়ে ছুটে আসছে ওরা।

'না।' তীব্রস্বরে একটা চিৎকার। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো। ষণ্ডামার্ক। সুরম্য গতকালই ওকে দেখেছে। ওর পাশের বেড। এসেছে বীরভূম না বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে।

আরে এটা তো সেই জংলিটা না? কী চাঁদ, তোমার দাওয়াই তো আগেই হয়ে গিয়েছে, আবার এয়েচ কেন? ব্যাধি বেড়েচে?

ওকে পাইপ ধরে নামতে বলছেন, যদি পড়ে যায়? যদি কেন? ও যাবেই পড়ে, তখন?

যাব্বাবা, পড়ে যাবার জন্যেই ওকে নামাচ্ছি।

বা চমৎকার! এই আপনাদের শহুরে কালচার? আমি এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি।

যাও, যাও, প্রাণ যদি তাই চায় তো যাও।

তার মানে? আপনাদের প্রাণে ভয়ডরও নেই?

ভয় কীসের? নিজেই চড়ল ছাদে। কত করে বললুম ন্যাড়া ছাদ, এখনও পাঁচিল ওঠেনি। উঠিসনি, উঠিসনি। শুনল না। চড়ে নিজে নিজেই শূন্যে ঝাঁপ খেল। পাখি হতে সাধ গিয়েছিল বোধহয়। পাখি হয়ে কলকাতাতে যে কচি প্রিয়াকে ফেলে এয়েচে তারই কাছে যেতে যাচ্ছিল বেচারা। কেস এক্কেবারে সিধে সরল। যাকে জিজ্ঞেস করবে সাক্ষী দিয়ে দেবে।—খুদ খুশি কর লিয়া হ্যায় ইয়ে বেচারা।

'কি করলে ছাড়বেন ওকে?' বলতে বলতে ছেলেটি এসে হ্যাঁচকা টানে সুরম্যকে ছাদের কোণ থেকে রাক্ষসগুলোর মাঝখানে ফেলে দিল। সুরম্যর পুরোপুরি জ্ঞান নেই। স্বপ্নে দেখার মতো দেখল রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে দেখতে দেখতে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েকজন রাক্ষস নীচে ছুটেছে, 'আশিস আশিস, কী ডেঞ্জারাস ছেলে! তোরা শিগগিরই দোতলার বারান্দায় পজিশন নে।'

প্রিয়াঙ্কুর তুমি তেতলায় চলে যাও। আর কেউ নেই জোরালো চেহারার? রাক্ষসের দলে ভীষণ চঞ্চলতা, ত্রাস, সাড়া পড়ে গেছে।

প্রায় মাঝ রাত্তির, তারা জ্বলজ্বল করছে কালো কুচকুচে আকাশে। হস্টেলের পেছনে ঘাসের ওপর বহাল তবিয়তে দণ্ডায়মান সেই ছেলেটি কান্তিময়। তাকে ঘিরে সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারের দাদারা।

আরে বাস। শাবাশ ভাই। শাব্বাশ। ফর দা অ্যাক্ট অ্যান্ড দা স্পিরিট!

আমাদের একটু সময় দিলে না ভাই! কী যেন নাম বললে? কান্তি? এই, কান্তিকে একটা ট্রিট দে। সুরম্যকেও ইনক্লুড কর। সুরম্য, লেটস বি ফ্রেন্ডস। শেক হ্যান্ডস। থ্রি চিয়ার্স ফর কান্তি উপাধ্যায় হিপ হিপ হুররে। থ্রি চিয়ার্স ফর সুরম্য ঘোষাল হিপ হিপ হুর রে।

প্রোসেশন করে ডর্মে নিয়ে আসা হল কান্তি আর সুরম্যকে। সুরম্যর পরনে তখনও খালি জাঙিয়া। প্রিয়াঙ্কুরদা বলল, 'ছি ছি সুরম্য, তুমি না বালিগঞ্জে মানুষ। এতগুলি দাদার মাঝখানে এই বেশে দেখা দিতে লজ্জা করল না তোমার? ছি, ছি ভাই। শত ধিক্কার তোমাকে।'

জনকদা বলল, 'ধরো আমরা যদি কেউ মেয়ে হতাম? ওমা, কী লজ্জা গো! বেডকভারের খুঁট মাথায় চাপিয়ে মুহূর্তে জনকদা ঘোমটা-দেওয়া-বউ হয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল ত্রিভঙ্গ হয়ে।'

চারদিক থেকে অমনি জামাকাপড় বর্ষণ হতে লাগল সুরম্যর মাথায়। বর্ষণ হয় আর দাদারা বলে, 'পরে নে সুরম্য, দেরি করলেই চাঁটা।' মিনিট পাঁচেক পরে সুরম্যর সাজগোজ শেষ হল। প্যান্ট ফোর্থ ইয়ারের নিমাইদার যার কোমরের মাপ জলহস্তীর, শার্ট গিদওয়ানিদার, হাতাগুলো সুরম্যর হাত থেকে আরও এক ফুট মতো ঝুলছে, জুতো প্রিয়াঙ্কুরদার, সাইজ এগারো, সবাই বলে ইয়েতির পা, মোজাও তথৈবচ, তার ওপরে কোথা থেকে এক খুন-খারাপি রঙের টাই আর খোকাবাবুর মাপের স্ট্র-হ্যাটও হাজির হল।

মাঝরাতের ডিনারটা ভালোই হল। বাসমতীর ভাতের মধ্যে রুটির কুচো, লুচির কুচো, কড়াইশুঁটি, আলু গাজর, বাঁধাকপি, পালংশাক, স্কোয়াশ, টম্যাটো স-ব। মুখে তুলতে তুলতে জনকদা বললে, 'হরি হে মা-ধব, চান করব না গা ধোব? কে রেঁধেছ মানিক, ছুপকে ছুপকে না থেকে আমার নাকের গোড়ায় একটু এসে দাঁড়াও না বাবা, এ যে বিশ্বরূপের খাদ্য সংস্করণ রে শালা।'

গিদওয়ানিদা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'শালা, বাঞ্চোৎ, হুজ্জোৎ, ইজ্জৎ, কেলো, ব্যাটাচ্ছেলে, শুয়ার কী বাচ্চা, খচ্চর, গিদ্ধড় আউর কুছ বাংলা গালি আছে?'

আছে বইকি রে। একখানা আস্ত গালাগালাই যে বাকি রেখে দিলি ব্রাদার, 'এলাটিং, বেলাটিং সই লো, কী খবর আইল, রাজা একটি বালক চাইল,' বলতে বলতে সুরম্যকে নিয়ে মাঝরাতে সে কী হুজ্জোতি রে বাবা!

সুরম্য চিঠিখানাকে যথাযথ ভাঁজ করে লেফাফায় পুরলেন। তিরিশ বছর আগেকার উত্তেজনায়, উষ্ণতায়, বন্ধুত্বে হাত থরথর করে কাঁপছে। হরিহরাত্মা। তিনি হরি, কান্তি হর। তিনি ক্ষীণকটি, গৌরাঙ্গ, শ্রীমান। কান্তি লম্বা, চওড়া, কালো। মুখে নিখাদ প্রশান্তি, বুদ্ধি, ভালোমানুষি। ভালোমানুষ। কান্তিময় উপাধ্যায়। না তিনি যাবেন। অবশ্যই যাবেন।

তখন ওঁরা বলতেন, 'হিজলি।' হিজলি জেলে কয়েকজন রাজবন্দিকে গুলি করে মারা হয়েছিল। প্রতিবাদে আরও কিছু রাজবন্দি অনশন আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। সেই হিজলি জেলভবনই খড়্গপুরের প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনলজি। দূর থেকে টাওয়ারটা দেখা যেত। খড়্গপুর রেল কলোনি পেছনে ফেলে হিজলি যেতে কখনও পথের ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখনও দুদিকেই বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে খোয়াই। লাল লাল হাঁ করা খোঁদল। গাছপালা ছেড়ে তৃণ পর্যন্ত নেই একটুকরোও। জায়গাটার একটা ভীষণ সৌন্দর্য আছে। সূর্যাস্তের রঙের সঙ্গে খোয়াইয়ের রং মিলে গেছে। এমনিতে সূর্যাস্তের রঙে যে রাঙা, গোলাপি, কমলা আভা থেকে তাকে নম্র, পেলব রকমের সুন্দর করে এই খোয়াইয়ের সংস্পর্শে এসে সে রং কেমন পালটে গেছে। যেন যুদ্ধক্ষেত্র, শোণিতস্রোত। কলিঙ্গযুদ্ধ হয়ে গেছে। শবদেহগুলি এইসব খোঁদলের আশ্রয়ে লুকিয়েছে। ধৌলিশৃঙ্গ থেকে অশোক দেখছেন রক্ত রক্ত রক্ত। সব রক্ত এখন শুকিয়ে কালচে হয়ে আসছে। সাইকেল রিকশায় করে বাবার সঙ্গে সেই পথ দিয়ে স্বপ্নে দেখা উচ্চাশামহল খড়্গপুর আই আই টি-তে আসা হয়েছিল। সেই স্মৃতির হাত ধরে যাবেন বলে কান্তিকে টেলিগ্রাম করেননি। একা যাবেন। একা একা।

বাবা বলছেন, কি রে খোকা, এখনও ভেবে দ্যাখ, থাকতে পারবি তো? না হলে এখনও বল ফিরে যাই। ন্যাশনাল মেডিকেলে অ্যাডমিশন্ নিয়ে নিবি। বাড়ি থেকে কলেজ যাবি আসবি। তোর মাও নিশ্চিন্ত। তুইও।

আমি যাব বাবা। আই আই টি-তে পড়ব। মেডিক্যাল পড়ব না। ডেডবডিতে সেকশন করতে হবে ভাবলে আমার ভীষণ গা গুলোয় বাবা।

সে তো জানি। ওসব সয়ে যায় রে। সয়ে যায়।

না আমি এঞ্জিনিয়ার হব।

সে তো অনেক দিন ধরে শুনছি। টিকতে পারবি তো? শুনেছি ভীষণ র‍্যাগিং করে। সইতে না পেরে ফিরে এলে খুব অসুবিধে হবে রে!

ভাবলে এখনও হাসি পায়। কেউ আদেশ করেনি। সুরম্য নিজে নিজেই বাবাকে চিঠি লিখেছিল :

> শ্রীচরণেষু বাবা, তুমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলে। শীতের রাত্তিরে খালি গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনোরকম অত্যাচার ওরা করেনি। উপরন্তু আমার সিনিয়র ছেলেদের সবার সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে পড়াশোনার জন্য সব ক্লাসে না গেলেও চলবে। অবশ্য তুমি ভেবো না আমি লেকচার ফাঁকি দেব। ওয়ার্কশপ খুব ভালো লাগছে। বাবা, এবার তুমি এলে কান্তিময়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। আমার বিশেষ বন্ধু।

কান্তিময়, কান্তিময়, কান্তি। মুখে সিগার, ঢিলে-ঢালা একটা পায়জামা আর ধবধবে পাঞ্জাবি পরা দশাসই চেহারার কান্তি এগিয়ে আসছে লনের মাঝখানে সিঁথির মতো পথটা দিয়ে। পথের পাশে মেহেদির বেড়া, দূরে ঝাউয়ের সারি। কান্তি আসছে। চুলে সামান্য সাদা ছোপ, চোখে সেই ভাবালু দৃষ্টি, সেই তিরের মতো হাঁটা।

রিকশা থেকে নামছেন সুরম্য। স্যুটকেশ ঠিক নয়, ওভারনাইট ব্যাগের মতো তাঁর লাগেজটা কান্তি রিকশাওয়ালার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিচ্ছেন। অন্য হাতে ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে কান্তি অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। এক সেকেন্ড। পরক্ষণেই মুখ ফেটে যাচ্ছে, চৌচির হয়ে যাচ্ছে হাসিতে।

সুরম্য, সুরম্য পাগলাটা! এসে গেছিস! আমাকে তো জানালি না কিছু। ভাবছিলুম হয়তো আসবিই না। ভারি অবাক করে দিলি তো। ভারি দুষ্টু হয়ে গেছিস তো আজকাল।

জানাবার কী আছে? আছেটা কী? এক আধবুড়ো আর এক আধবুড়োর কাছে আসছে। এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ডিনের বাড়ি বললে কেউ চিনিয়ে দিতে পারবে না? ঠিকানা মিলিয়ে না হয় না-ই আসতে পারলুম।

আরে ঠিক আছে। ঠিক আছে। বেশ করেছিস। আয়, আয়। যুগল! এই যুগল, ইধর আও। মেরা দোস্ত। বুঝলি? জিগরি দোস্ত। দুজনের লাঞ্চ দিবি ব্যাটা। ঠেসে পুর ভরবি তোর টম্যাটোর দোরমায়। ঠেসে ঠেসে। হ্যাঁরে সুরম্য। সেই পাতলা পাগলা-পাগলা ভাবটা তো তোর একদম নেই। পাঁচ ছটা বছর টিকিয়ে রাখতে পারলি, আর....

'তুই কি এখনও ডন বৈঠক দিস নাকি? মুগুর-টুগুর ভাঁজিস?' একটু হাঁপ ধরে আজকাল সুরম্যর। সাবধানে থেমে থেমে বললেন।

মুগুর না ভাঁজলে এইসব হাড়বিচ্ছু আই আই টি-র মালদের সামলানো যায়? তু-ই বল না, তোর তো এক্সপিরিয়েন্স আছে। কারিয়া পিরেত বা হয়ে যাচ্ছিলি তো আরেকটু হলে ...

দুজনেই হাসতে থাকলেন।

কান্তিময় বিয়ে করেননি। এমন সুন্দর বাড়িখানাকে তছনছ করে রেখেছে যুগলকিশোর আর তার মনিব। বড়ো হলঘর ভরতি কান্তিময়ের কম্পিউটারের কাণ্ডকারখানা, কম্পিউটার-বাগিং তিনি নাকি বন্ধ করবেনই। শোবার ঘরে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবল। কাচে সূক্ষ্ম লাল ধুলোর আস্তর। তার ওপর ফাইলের পাহাড়। বইয়ের পাহাড়, খোলা পেন, ব্লটারে প্রচুর কালি শুকিয়ে রয়েছে। বিছানার চাদর পালটানো হয়নি কতদিন, তার ওপরও বই, ম্যাগাজিন, কান্তির কোট, প্যান্ট পাতলুন।

ঘরে ঢুকে কান্তি এক হাড়-কাঁপানো ডাক দিলেন, 'যোগলো। এই ব্যাটা যুগলকিশোর!'

'কি সাহেব', যুগলকিশোর এসে দাঁড়িয়েছে।

আবার সা-হেব! না রে সুরম্য আমি ওকে মোটেই সাহেব-টাহেব ডাকতে শেখাইনি। নিজে-নিজেই পিক-আপ করেছে। হ্যাঁ রে গো-খোর, এত কিছু পিক-আপ করতে পারিস আর এই বিছানা থেকে জামাকাপড়গুলো পিক-আপ করতে পারিস না। অ্যাঁ! এ যে একেবারে কাপড়ের এগজিবিশন সাজিয়ে রেখেছিস? বলি, মানুষ বসবেই বা কোথায় আর শোবেটাই বা কোথায়? তোমার মাথায়?

চেয়ারের দিকে এগোলেন কান্তি। সেখানে আর এক পাঁজা বই। যুগলকিশোর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বইগুলো দু'হাতে ধরল, সুরম্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন না সাহেব, আমার এ সাহেব মহা ধূর্তু আছেন। নিজেই আমাকে বলবেন, 'খবর্দার, আমার জিনিসে হাত দিবি না, একটা কাগজ এধার থেকে ওধার করলে ব্যাটা তোমার আমি পিঠের ছাল তুলে নেব।' এই তো? তারপর বাড়িতে লোক এলেই আমার ওপর ত্যান্ডাই ম্যান্ডাই। অতিথ চলে গেলে আমারই লাভ। সাহেবই দু-দশ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দেবেন-- রসগোল্লা খাস যুগল। আমারই ভালো।'

মারমুখী হয়ে যুগলের দিকে দু-পা তেড়ে গেলেন কান্তি।

আমায় তুমি ধূর্ত বল, তুমি নিজে কী? তুমি ব্যাটা বদমাশ। তোমার সঙ্গে আমি বুদ্ধিতে আঁটব? সুরম্য খুব সাবধান, টাকাপয়সা না হোক মারে রে, লাল হয়ে গেল ব্যাটাচ্ছেলে আমার টাকা মেরে মেরে। আমার মেরে আবার আমাকেই কথা শোনাবে। টাকাপয়সা ঠিক করে রাখতে পারেন না তো রোজগার করা কেন?

সুরম্য কান্তির হাতের মোটা বইখানা ধরে ফেললেন। বইটা তিনি যুগলের মাথা টিপ করে ছুড়তে যাচ্ছিলেন।

আরে আরে করিস কী কান্তি? যুগল, তুমি এখন যাও তো বাবা, ভালো করে রান্নাটা করো, আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে।

যুগল চলে গেল, গজগজ করতে করতে গেল, 'আপনি ধরলেন কেন বইটা? যুগলও লুফতে জানে। সরতে জানে। মেঝেয় পড়লে অমন বইগুলো চৌচির হয়ে যাবে বলেই না লোফা।' সুরম্য অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তিনি কাজের লোকের সঙ্গে অনায়াসে কেমন কথা বলে ফেললেন। এটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যেই নেই। প্রথমত তাঁর বাড়ির কাজ করে সব মেয়েলোক। তেলেঙ্গি মেয়ে সব। তাদের কল্যাণীই সামলান। গাড়ি ধোয়াপোঁছার যে ক্লিনারটি সে এক বিহারি যুবক। তাকে সম্বোধন করে সামান্য কতকগুলো শব্দ, তার বেশির ভাগ অব্যয়, তাঁকে উচ্চারণ করতেই হয়। এ বাদে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদেব সঙ্গে কথা বলতে তিনি আদৌ অভ্যস্ত নন। তিনি আরও অবাক হয়ে দেখলেন যে কখন কান্তির সঙ্গে হাত লাগিয়ে বিছানার ওপরটা, চেয়ার, সব খালি করে ফেলেছেন। বইতে বইতে টেবিলটা ছোটোখাটো একটা পাহাড়ের আকৃতি নিয়েছে। দু-হাত ঝেড়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কান্তিময় বললেন—বাঁচা গেল বাব্বা ; সাত সকালে বিছানা ঝাড়ো, চেয়ার ঝাড়ো, বই ঝাড়ো, কাজ কি কম? এই সুরম্য, বিছানার চাদরটা টান মেরে ফেলে দে তো! চিটচিটে ময়লা রে, শুতে ঘেন্না করে, বালিশের ওয়াড়টাও দিয়ে দিবি ওই সঙ্গে। ন্যাড়া বোঁচা বিছানা থাকলে যদি ব্যাটাচ্ছেলের চৈতন্য হয়, যদি ফ্রেশ চাদর ওয়াড় পাই। সবই তো দয়াময়ের দয়া কি না!

কনভোকেশন হয়ে গেছে। হিজলির রাস্তা দিয়ে দলে দলে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদরা চলে গেছে। হাতে ছাড়পত্র। ভারতবর্ষের যে কোনও এক নম্বর প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার পদলাভের ছাড়পত্র। এদের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ শেষপর্যন্ত চলে যাবে বিদেশে। আমেরিকা, জার্মানি,

ফ্রান্স, মধ্যপ্রাচ্য। দু'দিন ধরে সন্ধ্যেবেলায় ঘুরে ঘুরে সুরম্য দেখেছেন বন কেটে সেই বসত যা তাঁরা সদ্য এসে দেখেছিলেন, তা এখন কেমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজি শহরই হয়ে গেছে। কলেজ বিল্ডিং-এর শাখাপ্রশাখা, ছাত্রদের হোস্টেল, ছাত্রীদের হোস্টেল, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন টাইপের কোয়ার্টার্স, হ্যালোজেন-জ্বলা রাতে আলোর গায়ে লেপটে-থাকা রাতপোকা। ন'টা নাগাদ যুগলকিশোর খাবার দিয়ে দিল। খেয়েদেয়ে কান্তিময় বললেন, চল পাগলা, বেড়িয়ে আসি। কালই তো চলে যাবি।'

যুগল বলল, 'সেই ভালো সাহেব, আপনারা একটু বাইরে গেলে বিছানাটিছানা একটু গুছেগাছে রাখতেও আমার সুবিধে হয়।

কান্তি বললেন, নোটিশ দিল রে। ঘরের বউও এমনটা দ্যায় না। এমন মাল আর দেখেছিস?

সুরম্য বললেন, চল, আজ আমাদের পুরনো ফেভারিট জায়গাগুলো ঘুরব, বসে থাকব। যদিও সেসব জায়গা এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত।

কান্তি বললেন, যেত না, তুই চিনতে পারতিস না। আমি মাঝের পাঁচ বছর পশ্চিম জার্মানিতে বাদে টানা রয়ে গেছি এখানে, আমি জানি। আমি বলে দিতে পারি। চল্।

গায়ে সোয়েটার। তার ওপর শাল জড়িয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

চিনতে পারছিস জায়গাটা?

একেবারেই নয়। কোনও ল্যান্ডমার্ক আছে?

আছে, তবে সেটা এখনই বলছি না। এটা হল সেই ধূধূ তেপান্তরের মাঠ যার ওদিকে সে সময়ে উদ্বাস্তু কলোনি বসেছিল।

সেই মাঠের এই চেহারা হয়েছে? বলিস কী? মাঠ বলে যে আর চেনাই যায় না!

সেই মাঠের এই চেহারাই হয়েছে। ল্যান্ডমার্ক হল ওই বট-অশ্বত্থ, দুটো গাছ একসঙ্গে একই স্পট থেকে বেরিয়েছে। মনে পড়ছে? দ্যাখ!

সুরম্য ভালো করে দেখলেন গাছ দুটো। অন্ধকারেও ভিন্ন ভিন্ন পাতার গড়ন বোঝা যাচ্ছে। বট একদম জমাট অন্ধকার। কিন্তু অশত্থের পাতা দুলছে। ফাঁক দিয়ে দিয়ে আকাশের আলো গলে পড়ছে। বললেন, 'ঠিকই। সেই গাছ। এখন মনে হচ্ছে এর অন্ধিসন্ধি চিনি আমি। ঠিক এর ধারে ছিল ফিজিক্সের ডেমনস্ট্রেটর উধম সিংজির কোয়ার্টার্স। পাজি ছেলেরা ওঁর নাম দিয়েছিল উদোম সিং, তোর মনে আছে? কোয়ার্টার্সটা এইচ-টাইপ। ওঁর স্ত্রী সব সময়ে একটা সেমিজ পরে থাকতেন। আঁটসাট মোটা, যখনই দেখা হত 'এ কিষন' বলতে বলতে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় জঞ্জাল ফেলতে চলে যেতেন। আমরা চোখ তুলে তাকাতে পারতুম না।'

কান্তি বললেন, 'ইয়া। এবং ওঁদের কিষন ছাড়াও একটি মেয়ে ছিল। প্রাণচঞ্চল, সুন্দর। তুই তাকে দেখলেই সে সময়ের একটা পপুলার গান গাইতিস—বনময়ূরের নাচ দেখতে যাব ; মনে আছে? মেয়েটা বেড়া ধরে সামনে পেছনে দুলত আর হাসত।'

খুব মনে আছে, সুরম্য হাসি হাসি মুখে বললেন।

শুনলে আশ্চর্য হোস না, সেই মেয়েটি সন্তোষ এখন এখানকারই এক লেকচারারের স্ত্রী। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টেরই। মোটা যা হয়েছে, ইয়া খাড়াই, ইয়া ছাতি, তোর সাধারণ ফিতেতে কুলোবে না।

বলিস কী? বনময়ূরী আর বনময়ূরী নেই?

বনময়ূরী ছেড়ে, বনমুরগি, বন-হরিণী, বন-বাঘিনী কিছুই নেই। নিতান্ত এক ঘরপোষা দুধেল গাই-গোরু বনে গিয়েছে। এমনিই পৃথিবীটার অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের ধরনধারণ রে পাগলা।

বলতে বলতে কালভার্টের ওপর বসলেন কান্তিময়। পাশে বসতে বসতে সুরম্য বললেন, 'তুই কি আমার মতন হাঁপিয়ে গেলি নাকি রে?'

উঁহু। হাঁপাতে আমার এখনও দেরি আছে। একটু বসাই যাক না। একটু বসলেই বুঝতে পারবি ঠিক এইখানটায় আমরা বসতে ভালোবাসতুম। সাইকেল দুটো ও-ই গাছটার গায়ে ঠেসানো থাকত। আমরা বসতুম যেন ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্তুর মন্ত্রীপুত্তুর।

বেশ শীতের রাত। চারদিক শুনসান। পাতাটি কাঁপছে না কোথাও। পৃথিবীর যেন কেমন ঘোর লেগে গিয়েছে। নক্ষত্র দেখতে ওপর দিকে চাইতে হয় না। তারা গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে দুজনকে। অগণ্য তারা, তারামণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া কালপুরুষ, লঘু সপ্তর্ষি, পারসিউস। রাজপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর। অনেক অনেকক্ষণ পরে সুরম্য বললেন, 'কীসের গন্ধ রে? কী ফুল?' যেন ঘুম ভাঙা স্বর।

'পাচ্ছিস? পাচ্ছিস তা হলে?' চাপা উত্তেজনা কান্তিময়ের গলায়।

পাচ্ছি। পাচ্ছি। কী ফুলের গন্ধ বল তো?

ফুল নয় ফুল নয় রে সুরম্য, এ সময়ে ঘর সাজানো রঙিন ফুল ছাড়া আর কী পাবি, বল? এ হল মউল আর শাল, ছাতিম আর বকুল গাছের শরীরের গন্ধ, অন্তত আমার তাই ধারণা। গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর, তারও অনেক অনেক বেশি কতকগুলো ভীষণ ব্যক্তিত্বশালী, অহংকারী গাছ এই রাস্তার আশেপাশে, কোণে-টোনে কোথাও নিজেদের অস্তিত্ব সদর্পে টিকিয়ে রেখেছে রে পাগলা। সেই এক গাছ, এক গন্ধ যা আমরা ছাত্রকালে পেতুম। সেই এক। মনে কর সুরম্য কী আশ্চর্য! কী পরমাশ্চর্য! এইসব ইট কাঠ, রাস্তাঘাট বদলে গেছে, মানুষজন, আমরা যারা যৌবনবাউল ছিলুম কাঁচা বয়সের, তারা এখন পরিপক্ক প্রৌঢ়, তোর মাথায় টাক আমার রগে সাদার ছিট, তোর পেটে ভুঁড়ি, আমার পায়ে কড়া। দ্যাখ তবু সেই এক গাছ, এক বৃক্ষগুচ্ছ, একই গন্ধ সুরম্য, সেই একই গন্ধ। কিছু কি অনুভব করছিস? কিছু কি মনে পড়ছে? মনে পড়ে? এখন? এইখানে? এমনি করে?

মন্ত্রমোহিতের মতো সুরম্য বললেন, 'পড়ে কান্তি। পড়ছে। পঁচিশ বছর আগে কনভোকেশনের পর এখানে এই কালভার্টে তুই আর আমি। আমি আর তুই।'

'মনে আছে আমরা সেদিন কীরকম যেন হয়ে গিয়েছিলুম'—কান্তি বললেন।

'স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার,' সুরম্য বললেন, কান্তি তুই রুদ্ধ গলায় বলছিলি, 'সুরম্য, বন্দরের কাল শেষ হল রে। এবার আমরা এক একজন এক এক দিকে পাল তুলে ভেসে পড়ব।' আমি বললুম, 'জাহাজ আবার পুরোনো বন্দরে ভেড়ে, ফিরে আসে। কান্তি আমরা কোনোদিন এ বন্দরে ভিড়ব না। ফিরব না।'

কান্তিময় বললেন—আমি বললুম—'সুরম্য কথাটা খুব মেয়েলি শোনাচ্ছে কিন্তু আমি তোকে ছেড়ে থাকব কী করে? আমার এই আসল বড়ো হওয়ার কাল, বালক থেকে যুবক। আর কেউ নয়, তুই, তুই-ই থেকেছিস আমার পাশে। দেখেছিস আমার সব দুঃসহ ঘাম দেওয়া কষ্ট, আমার সব শির ছেঁড়া দপদপে আনন্দ। কেউ জানে না, শুধু তুই জানিস। আমি চিন্তাই করতে পারছি না কীভাবে আমি তোকে ছেড়ে ...'

সুরম্য বললেন, 'আজ বলছি, সেদিন তোকে বুঝতে দিইনি। আমি ভেতরে ভেতরে ঠিক এই একই কারণে কাঁদছিলাম। কাঁদছিলাম রে কান্তি। অথচ আমি পুরুষ, আই আই টি-র কঠিন বছরগুলো আমাকে অনম্র পুরুষ করে গড়েছে, তাই সে কান্না দেখানো যায় না। প্রেমিকাকে ছেড়ে চলে যেতে হলে যে দুঃসহ যাতনা হয়, সেই যাতনা তখন আমার মনে।'

কান্তি বললেন, 'আমারও মনে। জানি কোনোমতেই প্রকাশ করতে পারব না। লোকে ভুল

বুঝবে। ভুল ব্যাখ্যা দেবে। অথচ একজন যুবক ছাড়া আর একজন সদ্য যুবককে কেউ বুঝতে পারে না। বোঝার কথা না। সুরম্য সেদিন কী আমরা আবেগের মাথায় কোনো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম?'

'না রে কান্তি,' সুরম্য বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করার পক্ষে, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পক্ষে অনেক পরিণতমনস্ক, প্রাজ্ঞ, আমরা হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রাজ্ঞমন আবেগকে সারাক্ষণ বলছিল, 'স্থিরো ভব। স্থিরো ভব। এই কাঁচামি ভালো না।' তাই দুজনের একজনও অন্যজনকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি।'

কিন্তু মনে মনে? মনে মনেও কি না?

তা নয়। মনে মনে আমরা অবিরাম প্রতিজ্ঞা করছিলাম এই ক-বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বৃথা হতে দেব না। এই অনুপম বন্ধুত্ব নষ্ট হতে দেব না। এই বিদ্যা ব্যর্থ হতে দেব না। আমি কি ঠিক বলছি?

'ঠিকই বলছিস রে রাজপুত্তুর, একদম ঠিক। তোর কি মনে আছে সেই সময়ে, ঠিক সেই সময়ে যখন আমরা আসন্ন বিচ্ছেদে ভারাক্রান্ত দুটি বিভ্রান্ত হৃদয় তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল!'— সুরম্য বললেন, গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এত মনে আছে, আর এই চূড়ান্ত ঘটনাটা, ক্লাইম্যাকসটা মনে থাকবে না? আমরা মৃদু গলায় কথা বলছি। আমাদের ডান দিকে যেখানে এখন প্রফেসরদের কোয়ার্টার্স, দূরে কিছু প্রাইভেট বাড়িও উঠেছে, ওইখানে ছিল তখন সালোয়ার জঙ্গল। বেশ ভালো জঙ্গল। রাতেরবেলায় শেয়াল ডাকত। সেই জঙ্গলের মধ্যে থেকে হঠাৎ মেয়েলি গলার, খুব মৃদু, মধুর মেয়েলি গলার একটা কান্না উঠল। আমরা দুজনেই সটান উঠে দাঁড়িয়েছি। তিরবেগে ছুটে যাচ্ছি।'

কান্তি বললেন, 'দু-হাতে গাছের ডাল ছোটো ছোটো ঝোপ সরাতে সরাতে এগোচ্ছি। তোর শার্টের কাঁধ ছিঁড়ে গেল, আমার চাদর কাঁটায় আটকে যাচ্ছে। মুখে দুজনেই বলছি কে? কে ওখানে? কে কাঁদলে, সাড়া দাও।'

সুরম্য বললেন, 'আমি বলছিলুম, ভয় নেই, আমি আছি। আসছি। দেখলুম একটা বিরাট গাছ। শিরিষ কি তেঁতুল হবে। রাতের অন্ধকারে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না। তার তলায় সাদা কালো ছিট-ছিট শাড়ি পরে একটি মেয়ে পড়ে আছে, যেন হতচেতন।'

কান্তি বললেন, 'দুজনেই দৌড়লুম। পড়ি-মরি করে। তারপর?'

তারপর দেখলুম গাছতলায় শুধু একটা ছায়া পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরম্য চুপ করলেন।

অনেকক্ষণ পর কান্তিময় বললেন, 'নিজেদের তখন যতই প্রাজ্ঞ মনে করি এখনকার তুলনায় তখন তো বালকই ছিলুম। এই ঘটনাটার সঠিক ব্যাখ্যা দেবার পরিপক্বতা আজ হয়েছে। তুই এটার কী ব্যাখ্যা দিস সুরম্য?'

'প্রাকৃতিক ঘটনা। মানসিক আবেগের ফলে একটা ভুল, ভ্রান্তি, ভ্রান্তদর্শন, ভ্রান্ত শ্রুতি এছাড়া কি?' সুরম্য বললেন।

'আর কিছু নয়?' কান্তি বললেন, 'প্রকৃতি হয়তো হাওয়া তুলেছিল, ডালপালার মধ্য দিয়ে তাকে বইয়েও ছিল, প্রকৃতি হয়তো ছায়া ফেলেছিল, কিন্তু দুজনেরই এক ভুল হল কী করে? কেন? তার কারণ আমাদের মনে। সেই কান্না, সেই ছায়াময়ী সে আমাদের মনস্তত্ত্বের একটা সূত্র। আয় আজ তার ব্যাখ্যা করি। তুই চেষ্টা কর প্রথমে।'

সুরম্য বললেন, 'কান্তি আমরা তখন জীবনের একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। বৃহত্তর জীবন আমাদের ডাকছে। সমস্ত দেহমন দিয়ে আমরা এই জীবনের টান অনুভব করতে পারছি। নদী যেমন

অনুভব করে সমুদ্রের টান। কিন্তু সেই জীবন অজানা, অজানা বলেই যেমন আকর্ষক তেমন রোমাঞ্চক। ওই কান্না, নারীকণ্ঠের কান্না, আমাদের সাড়া, ছুটে যাওয়া এবং নারীমূর্তি দেখা সবই সেই ভয় ও আকর্ষণের মিশ্র প্রতিফলন হতে পারে।'

কান্তি বললেন, 'তুই তাহলে বলছিস ওই নারীমূর্তি বৃহত্তর জীবনের প্রতীক? বিপন্ন জীবনের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা ছুটে গিয়েছিলুম! ভালো, ভালো সুরম্য, হতে পারে। আমি সঠিক জানি না, কিন্তু হতে পারে।'

সুরম্য বললেন, 'তোর যেন ব্যাখ্যাটা পছন্দ হল না মনে হচ্ছে? তুই যেন ঠিক স্যাটিসফায়েড নোস। তোরও নিশ্চয় তাহলে একটা আলাদা ব্যাখ্যা আছে।'

আছে রে পাগলা আছে। তোর ব্যাখ্যাটার থেকে আরও অনেক সাকার, সাবয়ব সে ব্যাখ্যা। তুই শহরের ছেলে ছিলি। বরাবর সাহেবি ইস্কুলে পড়েছিস। তার ওপরে বাবা অধ্যাপক, মা অধ্যাপিকা। তোর চিন্তাধারায় দার্শনিকতা বরাবর ছিল। আমি দ্যাখ গাঁইয়া। বর্ধমানের গণ্ডগ্রামে আমার বাড়ি। সাত মাইল জঙ্গুলে পথ ঠেঙিয়ে জেলা স্কুলে পড়েছি। প্রাণ কণ্ঠাগত করে স্কলারশিপ জোগাড় করেছি, আই আই টি-তে জায়গা করে নেওয়ার জন্যে আমায় অনেক দাম দিতে হয়েছে। আমার কাছে এইসব আকাশ-মাটি-গাছপালা কবিতা নয়, এসব বায়োস্ফিয়ার। ওই অদ্ভুত, অলৌকিক ঘটনাটারও আমার কাছে আরও স্পষ্ট, শরীরী ব্যাখ্যা আছে।

সুরম্য আগ্রহে সোজা হয়ে বসলেন। কান্তি বললেন, 'সুরম্য, তোর মনে আছে বনময়ূরীদের কোয়ার্টার্স যে রাস্তায় তার সমান্তরাল আরেকটা রাস্তায় আমরা অনেক সন্ধেবেলায় বেহালা শুনতে যেতুম!'

সুরম্য বললেন,'মনে আছে। বেহালার ভাঙা ভাঙা গলায় কর্ণাটকি মার্গ সংগীত।'

কান্তিময় বললেন, 'আহা, সে যে কী অপূর্ব। কী অপার্থিব! সেখানে, সেই রাস্তাতেও এমনি বকুল, মউলের তীব্র মদগন্ধ ছিল, তার সঙ্গে মিশে সেই ঐশী আকুতি আমাদের কীভাবে আলোড়িত করত তোর মনে আছে?'

আছে।

তবে নিশ্চয়ই এ-ও মনে আছে বেহালা বাজাতেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসার রামানুজ বিনায়ক নায়ারের বোন। কেরল থেকে সদ্য সদ্য এসেছিলেন। চট করে বাইরে বেরোতেন না। দু-একদিন শুধু প্রফেসরের বাড়ি গিয়ে চকিতের জন্য দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সুরম্য বললেন, 'নায়ারের স্ত্রীর কী অসম্ভব শুচিবাই ছিল তোর মনে আছে? বড়ো বড়ো বেডকভার, পর্দা, সোফাকভার প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদিন কাচতেন আর বাগানময় ঝোপের ওপর মেলে মেলে শুকোতে দিতেন।'

কান্তি বললেন, 'আমরা সেসব দেখতুম না, প্রফেসার নায়ারও ছিলেন খুব স্থূল প্রকৃতির মানুষ। তাঁকেও আমরা পছন্দ করতুম না। তবু তাঁর বাড়ি যেতুম, দুজনে যুক্তি করেই যেতুম, নায়ারের বেহালাবাদিনী বোনকে যদি কোনোমতে দেখতে পাই। একদিন আমাদের কফি দিয়ে গেল মেয়েটি, সেদিন তাকে ভালো করে কাছ থেকে দেখি। তোর মনে আছে সেই প্রথম দেখা?'

আছে। তবু তোর মুখে শুনি। শুনতে বড়ো ভালো লাগছে রে কান্তি।

আমরা তার চোখ দেখলুম না, নাক দেখলুম না, মুখ হাত পা কিছু দেখলুম না। শুধু দেখলুম সে তার ওই বেহালাটার মতোই একহারা, ওইরকম মেহগনি রঙের। এবং ওই ভাঙা ভাঙা কর্ণাটকি সুরের মতোই সে করুণ এবং অপার্থিব। আমরা জেনেছিলুম, গোঁড়া নাম্বুদ্রি পরিবারে একমাত্র বড়ো ছেলেরই বিবাহ করার অধিকার আছে। বাকি ছেলেদের বিবাহ সিদ্ধ নয়। তাদের স্ত্রীরা

বিবাহিত স্ত্রীর সামাজিক এবং শাস্ত্রীয় মর্যাদা পায় না। অন্যান্য ছেলেদের এই বিবাহ নায়ার পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে হয়। প্রফেসার নায়ারের বোন এইরকম এক বিয়ের প্রহসনকে পেছনে ফেলে পালিয়ে এসেছে দাদার কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে এই কুলপ্রথার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবেই, এইরকম যেন আমরা কানাঘুসোয় শুনেছিলুম। কেন না মেয়েটির দাদার, অর্থাৎ আমাদের প্রফেসার নায়ারের এ ব্যাপারে বোনের ওপর সহানুভূতি ছিল না। তাঁর স্ত্রীর তো নয়ই। সুরম্য, আমার ধারণা আমাদের ছাত্রজীবনের সেই অন্তিম রাত্রে অরণ্যের মধ্যে সেই কান্না, মেয়েলি কান্না, এবং গাছের ছায়াকে নারী বলে ভুল করার পেছনে ছিলেন প্রফেসার নায়ারের সেই বোন। তাকেই আমরা সেদিন অরণ্যের ছায়ায় দেখেছিলুম।

সুরম্য বললেন 'খুবই অভিনব ব্যাখ্যা। হতে পারে কান্তি। খুবই সম্ভব।'

'তবু, তা সত্ত্বেও'—কান্তি বলে চললেন, 'আমরা কেউই এই মেয়েটির ব্যাপারে একটুও এগোইনি, তার কারণ ছিল, দুজনেই জানতুম আমরা উভয়েই তার প্রেমে পাগল, একজন তাকে উদ্ধার করলে সে অপরজনের কাছে মহাপাতক বলে গণ্য হবে। আমাদের মধ্যে এই অলিখিত সমঝোতা ছিল। সেও এক রকমের প্রতিশ্রুতিই।'

সুরম্য চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন। কান্তি বললেন 'আমি তোকে কোনো আদালতে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায়ে সোপর্দ করতে পারব না সুরম্য। কিন্তু তুই কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাত তাড়াতাড়ি চাকরি জোগাড় করে প্রফেসার নায়ারের বোন সাবিত্রী কল্যাণী নায়ারকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করলি, কলকাতা ছাড়লি আমাকে এড়াতে, এটা করে তুই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মহাপাপ করেছিস সুরম্য। কিন্তু কী করে এটা তুই সম্ভব করলি? তুই কি আগে থেকেই কল্যাণীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলি, আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করে? এর তুই কী জবাব দিবি বল?'

অনেকক্ষণ বসে আছেন, পা ধরে গেছে, সুরম্য আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন 'যোগাযোগ আমি করিনি রে কান্তি। কল্যাণীই করেছিল। সে তার নায়ার নিয়তির থেকেই শুধু মুক্তি চায়নি, তোর কাছ থেকেও মুক্তি চেয়েছিল। কল্যাণী আমাকে সমস্তই বলেছে। কীভাবে তুই তার ভোরবেলা জঙ্গলে বেড়াতে যাবার সুযোগ নিতিস। কীভাবে একদিন শেয়ালে আক্রমণ করলে তুই তাকে বাঁচিয়েছিলি কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একা পেয়ে তুই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে খুবই অসংযত ব্যবহার করেছিলি। কাউকে কিছু না বলবার প্রতিজ্ঞা করলেও কল্যাণী এসব কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেনি কান্তি। তোর পাছে কষ্ট হয় তাই আমি এতকাল এ সবই তোর কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। প্রতিশ্রুতিভঙ্গ তুই-ই আগে করলি। পরে আমি তার চক্রে জড়িয়ে গেলাম।'

কান্তি দুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'সুরম্য, সুরম্য, কল্যাণী আমার অসংযত আচরণটাই দেখল, তার পেছনে আমার উন্মত্ত ভালোবাসাকে দেখল না? সুরম্য, তাই আমার কথা মনে করেও নিজেকে কল্যাণীর থেকে দূরে রাখতে পারলি না? তুই যে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলি! যা পেয়েছিলাম দুজনে একসঙ্গে পেয়েছিলাম, যা পেতাম না দুজনেরই না পাওয়া থেকে যেত!'

সুরম্য শান্ত, মৃদু, নম্র কণ্ঠে বললেন 'কান্তি, আমাদের সেই ছাত্রজীবনের অন্তিম রাত্রির ঘটনার যে ব্যাখ্যা তুই দিলি তা-ও যেমন সত্য, আমার দেওয়া ব্যাখ্যাটাও তেমনই সত্য। আসলে সাবিত্রী কল্যাণী নায়ার ছিল আমাদের কাছে সেই মোহানা, সেই বৃহত্তর জীবনের প্রতীক যা বিরাট, তীব্র, আকাঙ্ক্ষাময়, করুণ, আর্ত। সেই জীবন, সেই প্রার্থী ধরিত্রীকে আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছি। আমি একভাবে করেছি। কল্যাণী আমার ঘরণি হয়েছে, তাকে আমি পেয়েছি।

এবং পেয়েছি বলেই অনিবার্যভাবে আস্তে আস্তে খসে গেছে তার অবয়ব থেকে সেই মোহ, সেই সুদূরতা, সেই গভীর কারুণ্য যার নিবেদন মানুষকে চিরকাল প্রাণিত, স্পন্দিত করে রাখে। আমি প্রৌঢ় হয়েছি। মাংসপেশি শিথিল হয়েছে, হাইপ্রেশার, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, যান্ত্রিকভাবে মেপে মেপে জীবনযাপন করি। সম্পন্ন হয়েছি। কিন্তু সাধারণ। খুব সাধারণ। কান্তি, তুই জিইয়ে রেখেছিস সেই প্রাণ যা এখনও শক্তিতে টগবগ করে, সেই হৃদয় যা এখনও মননে অক্লান্ত, যা এখনও চাইতে পারে, এখনও জীবনের কাছ থেকে অনেক আশা করে, অনেক অনেক আশা, এখনও বেদনায় মুহ্যমান হয়, জীবনে গল্প সাজাতে পারে, ছুটে যায় একটার পর একটা শিখরে। কান্তি, আমার বিশ্বাস সেই ছায়াময়ী যার অন্য নাম জীবন তাকে যদি কেউ পেয়ে থাকে তবে তুই-ই পেয়েছিস।'

হারান-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

মেজদার ছেলে অমুর ছবিটা টিভি তে এলো মঙ্গলবার। মেজোবউদি খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। মেজদা কৌচে বসে। আমি ঘটনাচক্রে ওঘরে ছিলাম সে সময়টা। চেঁচিয়ে ডাকলাম বড়দাকে। বড়দা-বড়বউদি মন্টুল পাপুল চারজনেই ছুটে এল। দীপু এখন নেই, নইলে সেও আসত। আমার ছেলে অরু এ সময়টা কোচিং-এ যায়। মাকে আমি ডাকিনি, মা নিশ্চয়ই ছাদের ঠাকুরঘরে। কিন্তু কীভাবে আমার ডাকের শব্দ ও অর্থ দুই-ই মায়ের কানে পৌঁছে গেল জানি না, মা ও দেখলাম তাড়াতাড়ি এসে ঢুকছে। তখন ঘোষণা শেষ হয়ে এসেছে। অমুর একটু গম্ভীরগোছের, ছেলেমানুষি, আঠারো বছরের মুখখানা সেকেন্ড কয়েক টিভির পর্দায় থমকে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজোবউদির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মা বলল, 'মেজোবউমা, ওরকম অধীর হয়ো না। ওতে অকল্যাণ হয়!'

বড়োবউদি বলল, 'আমরা তো সবাই আছি শীলা, মাথা ঠান্ডা রাখাটাই এখন আসল।'

বড়দার একটা নিঃশ্বাসের শব্দ মনে হল শুনলাম। মা বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন মন্টুল পাপুল। বড়দা একটু দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন বলবে বলবে করে চলে গেল। বড়োবউদিও। মেজদা সিগারেট পাকাতে পাকাতে সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'হুঁঃ।'

অমুর ছবিটা ভালো আসেনি। মুখের বাঁ-দিকটা আবছা। ডান দিকটা অবশ্য চোখ, ভুরু, ওর খাড়া খাড়া কান, চুলের ঢেউ, ছোট্ট পাতলা মেয়েলি ঠোঁট সবসুদ্ধু নিয়ে মোটামুটি স্পষ্টই। এই ছবি দেখে আধা-পরিচিত লোক হলে হয়তো চেহারাটা দেখে চিনতে পারবে কিন্তু একেবারে অচেনা লোকের পক্ষে কতখানি চেনা সম্ভব বলা মুশকিল। আমার মনে হল এই একই ধরনের কিশোর মুখ আমি অনেক দেখেছি। অরুর মুখ, দীপুর মুখও মূলত একই ধাঁচের। রাস্তায় বেরোলেই এরকম পাতলা ছাঁচের সরল গম্ভীর চোখ-অলা, নরম চুল, নরম নতুন গোঁফদাড়ির কিশোর যেন অনেক দেখা যায়। মেজদাকে কথাটা বলতে গিয়েও বললাম না। কে যেন আমার বুকের ভেতর বসে নিষেধ করে দিল বলতে। সত্যিই, কথাবার্তা আমাকে অনেক বুঝে-সুজে কইতে হয়। অরুর বাবা যাবার পর আমার মুখে কুলুপ পড়েছে। কানে শুনি অনেক বেশি, চোখেও দেখি বেশি। কিন্তু অত সব দেখলে শুনলে আমার চলবে না এটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! অরুর বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে ওর লেখাপড়াটা হয়, খাই-খরচ বাবদ সামান্য কিছু দিতে পারি, কিন্তু মোটের ওপর তো আমি দাদাদের ওপর নির্ভর করেই আছি! মা আছে, এটাই মস্ত ভরসা।

তিন দিন হল অমু নিরুদ্দেশ। উচ্চমাধ্যমিকটা হতে না হতেই অমুটা জয়েন্টে বসল। আই আই টি-র এনট্রান্সটা কিছুতেই দিল না। এজন্য ওর মা ওর পায়ে মাথাটা কুটতে শুধু বাকি রেখেছে। বড়দা বড়োবউদি দুজনে মিলে দীপুকে তো তৈরি করেছে ভালো। হাজার হোক দুজনেই মাস্টার। দীপুর বেরোতে আর বছর দুয়েক। ওর বাবা মা মুখে রক্ত তুলে টাকার জোগাড় করছে। বেরোলে আর ভাবনা নেই। মেজদাই বলে, আমি আর জানব কোত্থেকে, ওর বাঁধা চাকরি, চাইকি এক্ষুণি বিদেশি স্কলারশিপ। এই পরিস্থিতিতে মেজোবউদির রোখ চেপে যাওয়া স্বাভাবিক। বংশের একটা

ধারা আছে তো! ঠাকুর্দা ছিলেন পি আর এস পি এইচ ডি। বাবা হেডমাস্টার, লোকে বলত স্বয়ং নেসফীল্ডও বাবার কাছে গ্রামার শিখে যেতে পারতেন। আমার বড়দাকে ঠিক দেবদূতের মতো দেখতে। স্বভাবেও তাই। অত সরল হাসি, নম্র স্বভাব, বৈষয়িক নির্লিপ্ততা যেন ঠিক এ যুগে, এ সমাজে খাপ খায় না। বড়দাও ঠিক বাবার মতো গ্রামার-পাগল, ডিকশনারি-পাগল। তবে, বাবার যতটা সাফল্য আমরা দেখেছি, বড়দার তার কিছুই নেই। দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, সাধারণ শিক্ষক হয়েই জীবন কাটিয়ে দিল।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার এসব হওয়া মেজদার কপালে হয়ে উঠল না, সে নেহাত কপালেরই দোষ। ফিজিক্সে অত ভালো মাস্টার ডিগ্রি করে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করছে। আসলে বাবার পয়সার জোর ছিল না, মেজদার তাই পয়সার জন্য রোখ চেপে গিয়েছিল। দুঃখের কথা কি বলব আমাকে বাবা নিজে মাস্টারমশাই হয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার সুযোগ দিলেন না, ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তার ফলভোগ আমি করছি, তাঁর সৌভাগ্য তাঁকে এ জিনিস দেখে যেতে হয়নি। আমার ছোড়দা যেটি ছিল, সে তো ক্ষণজন্মা। যা শুনত, অবিকল মনে রেখে দিত। ক্ষণজন্মারা থাকে না, ছোড়দাও থাকেনি। অমুর ওপর ওর বাবা-মায়ের, আমাদের সবার অনেক আশা। দীপু ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, হোক। অমু আমাদের ডাক্তার হবে। আমার দাদামশাই ছিলেন ধন্বন্তরী কবিরাজ। সেই ঐতিহ্য যদি অমুর মধ্যে বর্তায় আমরা খুশি হই। মেজদার অবশ্য বরাবরের ইচ্ছে অমু দীপুর মতো ইলেকট্রনিক্স এর দিকেই যাক। দীপুতর ইঞ্জিনিয়ার হোক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অমুর খুবই ভালো হয়েছে। পাঁচ ছটা লেটার বাঁধা। অঙ্কর দুটো পেপারেই পুরো নম্বর। প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করে মেজদা তো খুবই প্রসন্ন মনে হল। মা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছে আমি জানি। বিকেলের দিকে কোন্ ছেলে আর বাড়ি থাকে। অমুও বেরিয়েছিল। কোথায় আর যাবে? পাড়ার ক্লাবে, কিংবা কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারতে। রাত বাড়ল অমু ফিরল না। এখানে ওখানে ফোন, খবরাখবর। কেউ কিছু বলতে পারল না। বাড়ির সামনে একটা দর্জির দোকান। তার মালিক চৈতন্য বলল, 'আরে অমুদাদা তো সন্তুদা আর মিণ্টুর সঙ্গে রকে বসে বসে গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পর দেখি কেউ নেই।'

সন্তু আর মিণ্টুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ অমুর সঙ্গে গল্প করেছে তারপর প্রথমে মিণ্টু পরে সন্তু চলে গেছে। সন্তু যখন গেছে তখনও অমু নাকি আমাদেরই রকে বসে।

অগত্যা পুলিশে ডায়েরি। কাগজে ছবি ছাপা, টিভিতে প্রচার। কিন্তু তিন দিন তো হয়েই গেল। মেজোবউদি শয্যা নিয়েছে। বাড়িসুদ্ধু সবাই হনটান করছে। মেজদা নাম কা ওয়াস্তে অফিস যাচ্ছে। বড়দা দেখছি সারাক্ষণ গালে হাত, ভেতরের দালানের বেঞ্চিটাতে বসে। চোখ বসে গেছে, গালে বাসি দাড়ি। কদিনেই বড়দার টকটকে রঙে একটা ময়লা ছোপ পড়েছে। শুধু অমু বাড়ির ছেলে, সবার প্রিয় বলেই নয়। এই সেদিন পর্যন্ত ও দাদা বউদির কাছেই পড়াশোনা করত। মাত্র মাধ্যমিকের আগের বছরেই মেজদা ওর আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা টিউটর রেখে দিল।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা নিচে একটা হাউমাউ হই হই মতো গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি সদর দরজা খুলে বড়বউদি চেঁচামেচি করছে, দরজার সামনে অমু। চেঁচামেচিতে সবাই-ই তখন নেমে এসেছে। নিচের উঠোনে সব জড়ো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। অমুর চেহারা এই তিন দিনেই হয়েছে কাঙালির মতো। চুল মাটিমাখা, পরনের জামাকাপড় ঝুল-ময়লা, কেমন উদভ্রান্তের মতো চাউনি। মেজোবউদি তখন খুব কাঁদছে আর বলছে, 'কোথায় ছিলি? কোথা থেকে এলি? শিগগিরই বল, বল, বল।'

অমু দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে একটা লোক ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।'

—'বলিস কি রে?' মেজদা এগিয়ে এসে বলল।

বড়দা বলল, 'তোমরা জায়গাটা একটু ফাঁকা করো। ওকে আগে খাওয়া-দাওয়া করতে দাও।'

সত্যিই অমু যেন টলছিল।

স্নান, খাওয়া-দাওয়া এবং লম্বা ঘুমের পর অমু যা বলল তা বড়ো অদ্ভুত। বিংশ শতাব্দীর শেষ হয়ে এসেছে। জলজ্যান্ত একটা শহরের বুকের ওপর এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। পাপুল বলল, 'দ্যাখো দ্যাখো পিসিমণি আমার কেমন গা শিউরোচ্ছে!'

অমুর গল্পটি এইরকম। ও মিণ্টু আর সন্তু আমাদের বাড়ির রকে বসে গল্প করছিল, সন্তু অমু দুজনেই এইচ এস দিয়েছে। মিণ্টু পরের বছর দেবে। ওদের খুব ভাব। মিণ্টু আগে চলে যায়, তারপর সন্তু বলে, 'চল ক্লাবে যাই।' অমু রাজি হয়নি। এমনিই রকে বসেছিল, ভাবছিল এখুনি ভেতরে ঢুকবে। তখন মোটামুটি সন্ধের ছায়া পড়ে গেছে। এমন সময় পেশকার লেনের ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে অমুকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। লোকটার পরনে গেরুয়া জোব্বা। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি, চুলগুলো বাবরিমতো, কাঁচা পাকা, হাতে একটা গেরুয়া রঙের থলি ছিল।

মেজদা বলল, 'ডাকল, অমনি তুই চলে গেলি?'

অমু বলল, 'আমি ভেবেছিলুম, ও আমাকে কোনো ঠিকানা-টিকানা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ও আমাকে দেখেই হাতছানি মতো একটা ইশারা করে চলতে লাগল।'

তুইও অমনি চলতে লাগলি?

হ্যাঁ। কিন্তু কেন আমি জানি না। লোকটা অলিগলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে আমিও পেছন পেছন চলছি। মাঝে মাঝে খেয়াল হচ্ছে আমার ডানপাশে একটু বড়ো নদী, কলকারখানা চিমনি, এইভাবে আমি চলেছি। তারপরে কি হয়েছে জানি না। হঠাৎ যেন আমার খেয়াল হল আমি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছি। একটা লোক আমাকে নিয়ে চলেছে, তখন আমি খুব চেঁচিয়ে উঠি, লোক জড়ো হয়ে যায়। জায়গাটা একটা আধাশহর মতো। দেখি গেরুয়া-পরা লোকটা নেই। ওই লোকগুলোই বলল—জায়গাটার নাম জয়নগর, মেছুয়াপাড়া। ওরাই আমাকে পয়সা দিয়ে বাসে তুলে দিল। তারপর এই এসে পৌঁছচ্ছি।

মেজদা বলল, 'ব্যাটাকে আমি ছাড়ব না। পুলিশ লাগিয়ে যেমন করে হোক খুঁজে বার করব।'

মা বলল, 'তোমরা তো বিশ্বাস করো না, নিশির ডাক, নিশিতে পাওয়া এসব আছে, এখনও আছে।'

'দূর করো তোমার নিশি' মেজদা বলল, 'নিশি-ফিশি নয়। ব্যাটা ছেলে-চোর। কত কি বদ উদ্দেশ্যে আজকাল ছেলে গাপ হচ্ছে খবর রাখো?'

বড়দা বলল, 'কিন্তু অমু তো বাচ্চা নয়! ওভাবে একটা লোকের পেছন পেছন যাওয়াটা ...'

মেজোবউদি বলল, 'নিশ্চয় হিপনোটাইজ করেছিল! কী সাঙ্ঘাতিক!'

বড়োবউদি বলল, 'অত বড়ো একটা ছেলেকে অতক্ষণ ধরে হিপনোটাইজ করে রাখবে, যেখানে খুশি নিয়ে যাবে ... এ তো আমি ভাবতেও পারছি না। এরকম হলে তো কারুরই নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না!'

মেজদা তেতো গলায় বলল, 'হিপনোটাইজ অনেক ভাবেই করা যায় ; অনেকেই করতে জানে।

সেটা কোনও কথা নয়। কথা হল আমার ছেলে হয়ে অমু এতটা সফ্‌টি হয় কি করে? দুর্বল হয় কেন?'

মেজদা সত্যিই খুব কড়া ধাতের লোক। কোনও আবেগ-সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। ওর বিয়ের সময়ে বাবা চাননি কিন্তু মেজদা নিজেই দশ হাজার টাকা পণ দাবি করেছিল, বাবাকে বলে দিয়েছিল ওই পণের টাকা যার কাছে পাওয়া যাবে সেই বাপের মেয়েকেই ও বিয়ে করবে। মার্কেনটাইল ফার্মের এগজিকিউটিভ জামাই করতে খরচা লাগে। এটা ওর এক ধরনের জেদ। বাবা একটু আদর্শবাদী ধাতের মানুষ ছিলেন। বড়দার ওপর ঝোঁকটা ছিল বেশি। বড়দার বিয়েতে এক পয়সাও নেননি। নিজের সঞ্চয় থেকেই খরচ করেছিলেন। মেজদার সেটা রাগের কারণ ছিল। হিপনোটাইজ করার কথাটা মেজদা ওভাবে বলল কেন বড়বউদি বোঝেনি, আমি কিন্তু বুঝেছি। অমু ওদের একমাত্র ছেলে কিন্তু বড়দা-বউদির বড্ড ন্যাওটা ছিল ছোটো থেকে। দীপ্ত, মহুয়া, পাপুয়া, অমু, অরু একটা গ্রুপ। পাঁচজনের খুব ভাব। অনেক সময়ে অমু বড়মার ঘরে শুয়ে পড়ত দাদার পাশে। মেজদা এল টি সি নিয়ে নিয়মিত বেড়াতে যায়। অমু সব সময়ে যেতে চাইত না। এটা মেজদা মেজোবউদি ভালো চোখে দেখত না। ছোটোতে যখন সুবিধে ছিল ছেলে ট্যাঁকে না থাকার, তখন কিছু বলত না। সিনেমা যেতে, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বেড়াতে যেতে অমুকে বড়োমার কাছে রেখে চলে যেত। কিন্তু অমু বড়ো হয়ে যেতে এটা ওদের একদম পছন্দ হচ্ছিল না। অমুর জন্য আলাদা টিউটর রাখাতে বড়দা-বউদি দুজনেই খুব আঘাত পায়। বড়দা অঙ্ক ইংরেজি ভালো জানে। বউদি ভূগোলের টিচার। আমি শুনেছি বড়দা বলছে, 'দ্যাখো উমা, তুমি অসিতকে বারণ করো, অতগুলো পয়সা খরচ করবে কেন শুধু শুধু? ওতো ভালোই করছে আমার কাছে। আমি না পাবলে দীপ্ত রয়েছে। যখন আসবে দেখিয়ে দেবে। তা ছাড়া মাধ্যমিকের জোগ্রাফির কত ফ্যাচাং! তুমি না দেখালে কে আর ওভাবে দেখাবে?'

বড়োবউদি বলেছিল, 'আমার যা কিছু শেখাবার তা অমু কবেই শিখে গেছে। আমার আর ওর মাস্টারি করবার দরকার নেই। আর ওর বাবা-মা যদি তোমার পড়ানোয় সন্তুষ্ট হতে না পারে, তাতে তোমারই বা এতো কি?'

বড়দা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, 'সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টর কথা উঠছে কোথা থেকে? তুমি সবটাই বড়ো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দ্যাখো। আসলে ও মনে করেছে আমি আদতে ইংরেজির লোক, অঙ্কটা ...'

বড়োবউদি বলেছিল, 'মনে তো ঠিকই করেছে। তুমি এই নিয়ে রগড়ারগড়ি করা ছেড়ে দাও।'

অমু নিজেও খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'জেঠু আমার অ্যাডিশনাল ম্যাথ্‌স্ পর্যন্ত সামলে দিচ্ছে। আমার আবার টিউটর কি হবে? ফিজিক্স তো তুমি ইচ্ছে করলেই দেখাতে পারো। কেমিস্ট্রি দরকার হলেই বড়মার কাছে যাই।'

'ভূগোলের মাস্টারনি কেমিস্ট্রির কি জানে রে?' মেজদা তেড়েমেরে বলেছিল।

'জানে অনেকরকম। ডাকিনীবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র', মেজোবউদি মন্তব্য করল। 'হিপনোটিজমের প্রসঙ্গের উৎস ওইখানে। আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি।'

পুলিশের কাছে আবার নতুন করে যাতায়াত শুরু হল। থানার ও. সি. মেজদার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। খাতির আছে। বললেন, 'নৈহাটি অঞ্চলে ছেলেধরা সন্দেহে স্থানীয় লোক দুজন যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে। ছেলেধরার উপদ্রব আমাদের এদিকে তো ছিল না। অমিতাংশুকে দিয়ে শুরু হল। তার মানে লোকটা চট করে এ অঞ্চল ছাড়বে না। ওকে ফিরে আসতে হবেই। আর তখনই ওকে ধরা পড়তে হবে আমার জালে। এক কাজ করো, অমিতকে আমার সঙ্গে একটু একলা কথা বলতে দাও। দরকারি কথাগুলো জেনে নিই।'

আধ ঘণ্টাটাক অমুকে নির্জনে জেরা করে ছেড়ে দিলেন প্রতাপদা। মেজদা বলল, 'প্রতাপ বলেছে বড়োজোর এক মাস। তার মধ্যেই ব্যাটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে ও খুঁজে বার করবেই।'

কিন্তু আমরা অমু সম্পর্কে একটু সাবধান হয়ে গেছি। ওকে বড়ো একটা বাড়ি থেকে বার হতে দেওয়া হয় না। হলে সঙ্গে অরু থাকে। অরু অবশ্য নেহাত ছেলেমানুষ। তবু একটা মানুষ তো! অমুর বন্ধুবান্ধবদেরও পইপই করে বলে দেওয়া হয়েছে ওরা যেন ওকে একলা ফেলে অন্যত্র না যায়।

বড়দা অবশ্য আমাদের এতো সাবধানতা দেখে বলল, 'ছেলেধরাই যদি হয় তা হলে তোরা অরুর ওপরও নজর রাখ। ও তো সত্যিই পুঁচকে। একলা একলা স্কুল, কোচিং, খেলার মাঠ, বাজার সবই তো করছে। অমুর বয়সের ছেলের চেয়ে অরুর বয়সের ছেলের তো বিপদ বেশি।'

শুনে আমার বুকের মধ্যেটা কেমন কেঁপে উঠল। আমি একেবারেই নিঃসহায়। অরুর ওপর পাহারা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা বলল, 'অরু ডাকাবুকো ছেলে, ওর ওপর চট করে কেউ হাত দেবে না।' মা যেন সব জেনে বসে আছে। মহুয়াকে ডেকে বললাম, 'অরুকে একটু তোর কাছে আটকে রাখিস তো!' দিদিকে অরু খুব মানে। মহুয়া বলল, 'তোমারও ভয় করছে পিসিমণি?' সাহসী, মাথা-ঠান্ডা বলে আমার খুব খ্যাতি এ বাড়িতে। আমার সাহস যে নিরুপায়ের সাহস তা মহুয়া কি করে বুঝবে!

দিন দশেক পরে প্রতাপদা এলেন। মেজদার সঙ্গে কি চুপিচুপি কথাবার্তা হল, তারপরেই শুনলাম আমাদের সবাইকেই, অর্থাৎ বড়োদের সবাইকে উনি ডাকছেন। আমি, মা, বড়দা, বড়োবউদি সবাই গেলাম। সব চুপচাপ। প্রতাপদা সিগারেট খাচ্ছিলেন, মাকে দেখে সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন।

'কী ব্যাপার? কিছু পেলে?' বড়দা বললেন।

রহস্যময় হাসি হেসে প্রতাপদা বললেন, 'পেলাম আবার পেলামও না।'

'খুলেই বলো না!' মেজদা মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছে।

প্রতাপদা বললেন, 'অমিতাংশু আদৌ কারো ডাকে সাড়া দিয়ে যায়নি, এমনি এমনিই চলে গিয়েছিল। ওসব দাড়ি-অলা গেরুয়াধারী ওর কপোলকল্পনা। মিথ্যে কথা।'

মেজদা গরম হয়ে বলল, 'অমু মিথ্যে কথা বলছে?'

বড়োবউদি বলল, 'তাতে ওর লাভ?'

সেটাই তো ধরতে পারছি না। প্রথমে ওর বর্ণনা থেকে মনে হয়েছিল লোকটা ছদ্মবেশ পরে আছে। দাড়ি চুল সব নকল। সেটা মাথায় রেখেই অমু যেখানে গেছে বলে বর্ণনা দিয়েছে, সেখানে সেখানে খোঁজ করেছি। অমুর খোঁজ পেয়েছি অথচ লোকটার কথা কেউ বলতে পারছে না। অমুর যাত্রাপথটা আমি মোটামুটি ট্রেস করতে পেরেছি।

পেরেছ?

পেরেছি। কিন্তু সেটা লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে। ওর বর্ণনামতো এগোতে গিয়ে দেখলাম ও মিথ্যে কথা বলছে।

'উত্তেজিত হয়ো না অসিত,' একটু হেসে প্রতাপদা বললেন, 'ছেলে তোমার একা একা কোথাও এখনও যায়নি বিশেষ কিছুই জানে না, চেনে না। বড়ো নদী, কলকারখানা এইসব অস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে ও আমাদের বোঝাতে চেয়েছে ও গঙ্গার পশ্চিম পাড় ধরে এগিয়েছে মোটামুটি। শেষকালে পৌঁছেছে জয়নগর। অথচ জয়নগরের পথ আদৌ গঙ্গার ধার দিয়ে নয়। আর সেখানে মেছুয়াপাড়া বলেও কিছু নেই। আমি যদ্দুর ধরতে পেরেছি, ও ঘুসুড়ি, বালি, উত্তরপাড়া হয়ে হুগলির দিকে চলে যায়। ব্যান্ডেল পর্যন্ত ও গিয়েছিল, কখনও বাসে, কখনও পায়ে হেঁটে। এখন বলো ওদিকে

তোমাদের কোনও আত্মীয় বা অমিতের কোনও চেনাশোনা আছে? কিংবা জয়নগরে? যার কাছে ওর যাওয়ার ইচ্ছে থাকতে পারে!'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কেউ নেই। আমাদের চেনা কেউ নেই। না ব্যান্ডেলের দিকে, না জয়নগর। অমুর চেনা কেউ আছে কি না কি করে জানব? এতদিন ধারণা ছিল অমুকে আমরা চিনি, অমুর চেলাদেরও চিনি। এখন মনে হচ্ছে অমুকেও পুরো চিনি না, সেক্ষেত্রে ওর চেনা অথচ আমাদের অজানা লোক থাকতেই পারে। প্রতাপদা এবার খাটো গলায় বললেন, 'রাগ করবেন না, কোনও লভ অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার!'

'পাগল হয়েছো? অমু করবে প্রেম? মেয়ে দেখলে এখনও শিঁটোয়!'

'ওইরকম ছেলেরাই বেশি প্রেমে ট্রেমে পড়ে, অসিত।'

বড়োবউদি বলল, 'না, না, ওসব নয়। হলে আমি জানতে পারতুম।'

'পরীক্ষা দিচ্ছিল না?' প্রতাপদা জিজ্ঞেস করলেন, 'পরীক্ষা কি রকম হয়েছে? কবে রেজাল্ট?'

বড়দা বলল, 'খুব ভালো হয়েছে। জয়েন্টে চান্স পাওয়া তো কারো হাতে নয়, তবে উচ্চমাধ্যমিক খুবই ভালো হয়েছে।'

বড়োবউদি বলল, 'রেজাল্ট বেরোতে এখনও অনেক দেরি।'

'হুঁ', প্রতাপদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'বাড়িতে কোনো ঝগড়া বিবাদ, ছেলেপুলেদের পক্ষে ট্রমাটিক কিছু! সঙ্কোচ করলে চলবে না।'

মেজদা বলে উঠল, 'প্রশ্নই ওঠে না। এ বাড়ি পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র বাড়ি। কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি এখানে কখনো হয় না।'

কথাটা সত্যি। আশেপাশের বাড়িতে যখন তখন ধুন্ধুমার ঝগড়া, বাসন ফেলাফেলি, কান্নাকাটির আওয়াজ পাই। আমাদের বাড়িতে ওসব নেই। কিন্তু আওয়াজ নেই বলে যে বিবাদও নেই, কথাটা সত্যি না। মহুল বলে, 'পিসিমণি আমাদেব বাড়ি ঠান্ডা লড়াইয়ের বাড়ি, কি বলো?' ঠিক কথা। এটা বরাবর ছিল। আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখনও। বাবা বড়দাকে পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন বেশি। বড়োবউদির ওপরও তাঁর ভরসা ছিল বেশি। বিনা কারণে হয়নি ব্যাপারটা. বড়দা যেমন নির্মলচিত্ত, স্নেহপ্রবণ, বড়োবউদিও তেমন কর্মঠ আপন পর জ্ঞানশূন্য ছিল। সে সময়ে আমাদের পয়সার টানাটানি চলেছে. মেজদার চাকরি হয়নি. ছোড়দা ভুগছে, তখন বড়োবউদি ঘরে বাইরে যে পরিশ্রম করেছে ভাবলে চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমনিতে ওর সকালবেলায় স্কুল। দুপুরেও একটা পার্ট-টাইম নিল। বাড়ি ফিরে তিনটে থেকে টুইশনি। সপ্তাহে তিন চার দিন। কোন্ ভোরবেলা উঠে রান্না সারছে, আমি বাপের বাড়ি থাকলে হয়তো জোগান দিচ্ছি। মা পুজো না করে নিচে নামবে না। বাবারও তখন অনেক ফরমাস ছিল। সেসব মা সামাল দিত। দু-হাতে সব কাজ সেরে, গোছগাছ করে বউদি ঝড়ের বেগে স্কুলে চলে যেত। ফিরে স্নান-খাওয়া করে আবার। সে সময়টা পাপুল হয়নি। বাবা-মা সব সময়ে বাইরে কিংবা কাজে ব্যস্ত। দীপু আর মহুয়া যে কী করে মানুষ হয়েছে! যাই হোক। মায়ের ঝোঁক কিন্তু বরাবর মেজদার দিকে। ছোটোকে মা খানিকটা সমীহ করত। মেজো বরাবর রাগী, জেদি, মা তার রাগকে তেজ, জেদকে দৃঢ়তা বলে প্রশ্রয় দিয়ে• গেছে। বাড়ির মধ্যে এই দুই দুই চিরকাল অশান্তি জাগিয়ে রেখেছে। ধিকি ধিকি আগুনের মতো। বড়োবউদির মার ওপর গভীর অভিমান। বড়দাও বাবা চলে গিয়ে যেন সংসারের মধ্যে খুঁটিহীন একলাটি পড়ে গেছে। মেজবৌ শীলা কোনোদিন বড়োবউদিকে দেখতে পারে না। ওর জ্বালাটা আমি বুঝি। বড়োলোকের মেয়ে, বড়ো চাক্‌রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একেবারে গো-মুখ্যু। সংসারে বড়োবউদির এই প্রতিষ্ঠা, বাইরে তার মানসম্মান এ জিনিস ও এখনও সইতে পারেনি।

মানতে শেখেনি। অথচ বড়ো ওকে আপন বোনের মতো স্নেহ করত। স্পষ্টাস্পষ্টি দোষ ধরতে না পারলে জ্বালাটা বোধহয় আরও তীব্র হয়। আমি জানি মেজোবউদি তার জ্বালার অনেকটাই মেজদার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে। মেজদা আগে থেকেই বড়দার ওপর খাপ্পা ছিল, এখন তাকে একেবারে দেখতে পারে না। বড়োবউদিকে বলে মাস্টারনি। বাড়িতে কেউ খেতে এলে, জোর করে মেজোবউদিকে দিয়ে একটা পদ রাঁধায়। অতিথিকে খাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন কোন রান্নাটা ভালো হয়েছে?' যদি কেউ এখনও মেজোবউদিরটা ভালো বলে তো কূট চোখে চারদিকে তাকায়, বিশ্রী হাসে। শুধু বড়োবউদি নয়, মহুয়া পাপুল পর্যন্ত এ জিনিসগুলো ধরতে পারে। পারে না খালি আমার মা। বলে, 'হ্যাঁ, শৌখিন রান্নায় মেজোবউমার হাত ভালো। ব্যাগারঠালা কাজ নয়তো!'

বড়োবউদির অভিমান হবে না কেন! তা এইসব ক্ষুদ্রতা, প্রতিদিনকার নীচতা কি ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্য? না এ কাউকে বলা যায়! অফিস ফেরত মেজদা যে বড়ো দোকানের কেক-প্যাটিস আনে, ভালো সন্দেশ আনে, দরজা বন্ধ করে স্বামী-স্ত্রী খায়, ছেলের জন্যে রেখে দ্যায়। আর বড়দা যে সামান্য একটু নতুন গুড়ের সন্দেশ আনলেও তার কুটি কুটি ভাগ হয় সবার জন্যে, আর এই জিনিস নিয়ে বড়োবউদি কান্নাকাটি করলে মা বলে, 'ও করছে করুক গে, বউমা, তুমি বড়ো, বড়োর মতো ব্যাভার করো'—এ-ও তো সত্যি! দীপু হোস্টেলে থাকে। কিন্তু মহুয়া পাপুয়া যে মেয়ে, সংসারের ভেতরকার সব গোঁজামিল টের পায়। টের পেয়েও চুপ করে থাকে। কখনও কখনও গম্ভীর উদাস হয়ে যায়, এ তো আমি দেখতেই পাই। সত্যিকার মানসিক ধাক্কা খাওয়ার কথা ওই দুটি মেয়ের। অমু, অরু এরা কতদূর এসব অনুভব করে আমার জানা নেই।

প্রতাপদা বললেন, 'ইনভেস্টিগেশন আমি চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কোনো লাভ নেই। আমি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট শিওর অমিত মিথ্যে বলছে, সত্যটা তোমরা স্বীকার করো চাই না করো।'

প্রতাপদা বেরিয়ে গেলেন। মেজদা ফুঁসছে। 'আমার ছেলে মিছে কথা বলবে?' মেজোবউদিও ফোঁপাচ্ছে, 'অমু আমার ছেলে হয়ে মিছে কথা বলবে এ আমি ভাবতেও পারছি না,' কেন ভাবতে পারছে না ভগবান জানেন। আমি যা জানি তা হল এই মেজদা মেজোবউদি প্রায়ই ট্যাক্সি ভাড়া করে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি লৌকিকতা করতে যায় এবং বড়দা-বউদির নামে তাদের ছেলেমেয়েদের নামে অকথ্য সব মিথ্যে কথা লাগিয়ে আসে। আমার নামেও লাগায়। আমি নাকি ননদিনী রায়বাঘিনী, আমার সমস্ত খরচ ওরাই বহন করে, অথচ আমি ছেলেকে চুপিচুপি আলাদা খাওয়াই। পরিবেশন করতে গেলে বড়ো মাছটা নিজের ছেলের পাতে তুলে দিই। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলে আমার বা বড়দার পরিবারের আজকাল যে হতচ্ছেদ্দা মিলছে তা এই কারণেই, আমি জানি। এ সব কথা কেন যে লোকে বিশ্বাস করে সেটাও আমার কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ওরা কি দেখেনি বড়দার নিষ্পাপ চোখ, মহু পাপুর মিষ্টি ব্যবহার। নিজেদের চোখে দেখেনি বড়োবউদির ভূতের খাটুনি! দেখেছে, দেখে অনেক সময়েই বলেছে, 'বড়োকে একটু সব্বদিক দেখতে হবে বইকি!' তা না হয় দেখল। কিন্তু তারপরেই মা যদি নালিশ করে, 'সংসারের চাবিকাঠিটি বড়োবউমার হাতে! কলকাঠি সব ওই নাড়ছে।' তবে সেটা অন্যায় হয় না? সে গতরে করবে, বুদ্ধিতে করবে, অর্থ দিয়ে করবে, তোমাদের হাতে চাবিটি তবে থাকে কি করে?

বড়দা বলল, 'অসিত, প্রতাপ, যতই হোক একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, তার কথাটা একেবারে ফেলে দিও না।'

মেজদা তেড়ে উঠল, 'মানে, তুমি তা হলে ওকে মিথ্যেবাদী হতেই শিখিয়েছ?'

বড়দা বলল, 'মিথ্যের প্রশ্নই উঠছে না। আমি বলছিলুম ওকে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও।'

'বলছ কি, আমার ছেলেকে পাগল বলছ? পাগল বলতে চাইছ?'

'শোনো অসিত, মাথা ঠান্ডা করো, মাথা গরম করার সময় এ নয়। শুধু পাগলরা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায় না। অনেক রকমের মানসিক বিপদ আছে তা ছাড়াও, তুমি ওকে ডাক্তার দেখাও। ওকে যেন এখন মিথ্যেবাদী বলে শাসন করতে যেও না।'

'শাসন করব না মানে? পিঠের ছাল তুলে নেব!'

'তার আগে শিওর হও যে ও মিথ্যে কথা বলছে!' বড়দাকে কোনোদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা মেজদার সঙ্গে বলতে দেখিনি। বড়দা নিজের ঘরে গিয়ে বড়োবউদিকে বলল, 'উমা, টাকা বার করো, ও না যায় আমিই ডাক্তারের কাছে যাব।'

বউদি বলল, 'না, তুমি যেতে পারবে না।. টাকা আমি দেব না।'

বড়দা আহত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'একথা তুমি বলতে পারলে? এই মহাবিপদের সময়ে তুমি ছোটোখাটো সাংসারিক মনোমালিন্যর কথা ভেবে হাত গুটিয়ে নিচ্ছ?'

বউদির চোখ ছলছল করছে, সে বলল, 'সুবর্ণ, তুই সাক্ষী রইলি, যার ছেলে তার সিদ্ধান্তের ওপর হাত দিলে যে কী ভয়ানক অশান্তি হতে পারে তা জানি বলেই নিষেধ করছিলুম। কিন্তু তোর দাদা আমাকে আপাদমস্তক ভুল বুঝল।' বউদি আলমারি থেকে বার করে দিল টাকা।

বড়দা বলল, 'আমি তো ওকে নিয়ে যাচ্ছি না উমা, ডাক্তারকে শুধু কেসটা বলব, মতামত নেব। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমার প্রাণটা বড়ো অ[illegible]গছে।'

সত্যিই বড়দা যেন ধড়ফড় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

মেজদা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে ঠিকই করল অমুকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। সকলেই বলছে কৈশোর বড়ো খারাপ সময়। ডাক্তার দেখিয়ে নিতে ক্ষতি কী?

অমু প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তারের কাছে সিটিং দিতে যায়। দু'বার করে। মেজদার সময় হয় না সব দিন। বেশির ভাগ দিন আমিই যাই। আমার কাজ আর কিছু না। বাইরে ওয়েটিং রুমে বসে থাকি। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নেন ভদ্রলোক। ইনি শুধু ডাক্তারই নন, সাইকো-অ্যানালিসিসও নিজেই করেন। হয়ে গেলে অমু বেরিয়ে আসে, আমি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।

মাসখানেক পরে ডাক্তার আমায় ডেকে পাঠালেন। কথাবার্তা যা হল তা এই : ডক্টর চন্দ্র : আপনি তো অমিতাংশুর পিসি!

হ্যাঁ।

নিজের?

হ্যাঁ।

আপনি কত দিন এদের বাড়িতে আছেন?

বছর দশেক।

আপনার ছেলের বয়স?

চোদ্দ।

আপনার ছেলে অমিতাংশু যে স্কুলে পড়ত সেখানে পড়ে না কেন?

এসব প্রশ্নের অর্থ কি আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বিরক্তিও লাগছিল। এটা আমার একটা গোপন ক্ষতের জায়গা। অরুকে পাড়ার স্কুলে দিয়েছি। অর্ধেক সময় ক্লাস হয় না। পাজি ছেলেদের আখড়া একটা। পাঁচিল টপকে টপকে সব পালায়। প্রতিবছর অর্ধেক ছেলে ফেল করছে, সবাই

প্রোমোশন পেয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অরুকে যখন ভরতি করেছি ওর মাথাটা কাঁচা ছিল, একদম। অমুদের স্কুলটা দূরেও বটে, কড়াও বটে। মেজদা একটু ধরাধরি করলে হয়ে যেত কারণ দীপ্ত, অমু দুজনেই ওই স্কুলের ভালো ছাত্র। কিন্তু মেজদা বা বড়দা কেউই সেটা করেনি। বড়দার স্কুল কলকাতায়। সেখানে ভরতি করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, মেজদা না হোক বড়দা অমুদের স্কুলে অরুকে ভর্তি করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু করল না। বড়দাও না। আমি এখন বুঝি বড়দা খুব ভালো, কিন্তু মাস্টারমশাই হিসেবে ও ভালো ছেলেদের জন্যে যতটা দরদ অনুভব করে, সাধারণ ছেলেদের জন্য ততটা নয়। তা ছাড়া আমার সন্দেহ হয় অরুর বাবার নামটা ওরা সবার কাছে বার করতে চায় না। অরুকে পড়িয়ে শুনিয়ে অবশ্য বড়দা বউদিও তারপর তৈরি করেছে। স্কুলের সায়েন্স টিচারের কোচিংয়ে না দিলে তিনি ওকে ঠিকঠাক নম্বর দেবেন না তাই দেওয়া। এত কথা ডাক্তারকে বলা যায় না। বলার মানেই বা কি? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডক্টর চন্দ্র বললেন, 'প্রাসঙ্গিকতা না থাকলে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতাম না। মাই পেশেন্ট ইজ ভেরি মাচ হার্ট।'

আশ্চর্য! কি বলছেন উনি? আমি বললাম, 'দেখুন আমার স্বামীর রেখে যাওয়া সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে আমাকে চলতে হয় অনেকটাই। অমুর স্কুলে পড়াবার আর্থিক সাধ্য আমার নেই। আমার ছেলে ভরতির সময়ে তত চৌখসও ছিল না। অ্যাডমিশন টেস্টে পারেনি। এ প্রশ্ন উঠছে কেন আমি বুঝতে পারছি না।'

ডক্টর চন্দ্র হেসে বললেন, 'দেখুন পিসিমণি, আমার পেশেন্ট বহুদিন ধরে লক্ষ করেছে বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বড়োদের কাছ থেকে এক ব্যবহার পাচ্ছে না। আপনার ছেলের স্কুল ভরতি নিয়ে নিশ্চয় বাড়িতে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমার পেশেন্ট মনে করে আপনার ছেলেকে এবং আপনাকেও অবহেলা করা হচ্ছে, এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু শুধু তাই-ই নয়, অনেকরকম পারিবারিক অবিচার, স্কুলের অবিচার, সামাজিক অবিচার ওর মনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে বলে মনে হচ্ছে।'

তো কি? ও কি তাই জন্যেই পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে।

মে বি, হী ওয়াজ ট্রাইং টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ফ্যামিলি, ফ্রম দ্যা সোসাইটি। বাট হী ইজ টেলিং আস ট্রুথ হোয়েন হী সেজ হী ওয়াজ সর্ট অফ ডিউপ্‌ড্ বাই এ ম্যান। পিসিমণি ওই লোকটি সত্যিই। তবে সে লোকজন জড়ো হতে পালিয়ে গিয়েছিল কি না, অমিতাংশু অ্যাট অল ঘুসুড়ির পথে গিয়েছিল না বামুনগাছির পোল হয়ে কোনা জগদীশপুরের দিকে যায় সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। বাই দা ওয়ে, আপনারা কি জানেন অমিতাংশু খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে?

না তো! তবে বউদি বলে ম্যাপ ট্যাপ খুব ভাল আঁকে। বউদির ইচ্ছে ছিল ও জোগ্রাফি পড়ে। কার্টোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করে।

কে বউদি? পেশেন্টের মা?

না, ওর জ্যাঠাইমা, বড়োমা বলে।

হুঁ। ডক্টর চন্দ্র চুপ করে গেলেন, তারপরে বললেন, 'অমিতাংশু আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েছে, ফ্রি হ্যান্ড এঁকেছে, কিন্তু একেবারে নিখুঁত। ওই লোকটির ছবি।'

কে লোক?

যে ওকে ডেকেছিল।

ড্রয়ার থেকে সাদা একটা কাগজ বার করে আমার সামনে রাখলেন ডক্টর চন্দ্র। এবং আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। ছবিটা এগারো বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট আমার স্বামীর। ওর একটা

ছবি আমার ঘরে আছে। ধুলোময়লা পড়ে মলিন চেহারা। বছরে একদিন হয়তো হাত পড়ে তাতে। মালা কখনও পড়ে না। যদিও আমার বিশ্বাস ও আর নেই, তবু মালা পরাতে হাত কেঁপে যায়। তা ছাড়া যে মানুষ তার স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে পুরো সংসারের সামনে একলা অসহায় ফেলে রেখে নিজের যন্ত্রণা, নিজের অভিমানকে বড়ো করে দেখে পালিয়ে যেতে পারে তার ফটোর কি মালা পরা সাজে? অবিকল সেই ছবিটি এঁকেছে অমু। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, কাঁচা পাকা দাড়ি। কিন্তু ভেতরের মুখটি চিনতে অন্তত আমার কোনো ভুল হয়নি। ও কি তবে বেঁচে আছে? সত্যিই আমাদের বাড়ির কাছে এসেছিল? অমুকে ডেকে আমার কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল? তা হলে তা না করে ওকে ওভাবে ডেকে নিয়ে যাবার অর্থ কি? ওভাবে পালিয়ে যাবারই বা অর্থ কি? ওর কি মাথার ঠিক নেই?

ডাক্তার আমার মুখের ভাব দেখছিলেন, বললেন, 'চেনেন?' আমার দিকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলটা খেয়ে নিন। তারপরে উত্তরটা শুনব।'

খানিকটা কবুল করতেই, বললেন, 'গোপন করবেন না। ডাক্তার আর উকিলকে কিছু গোপন করতে নেই, জানেন না?'

গোপন করার আর আছেটা কী? তবে সেসব কথা এখন আমার মনে করতেও কষ্ট হয়। অফিসে টাকা তছরুপের দায়ে সাসপেন্ড হলেন। মস্ত দায়িত্বশীল পদে কাজ। পেমেন্টের জন্য বিল সই হতে আসে অজস্র, প্রতিদিন। রুটিন কাজ। গোছা গোছা ফলস বিল সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অধস্তন অফিসারদের এতো বিশ্বাস করতেন যে তাঁর নিজের সইয়ের জায়গাটি পর পর খুলে ধরলে বিলে তাদের সই আছে কি না দেখে নেবার দরকারও মনে করতেন না। কখনও কখনও এরা তাড়াতাড়ির নাম করে ব্ল্যাঙ্ক চেকও নাকি সই করিয়ে নিয়েছে। এসব আমি পরে শুনেছি। মুখের কথাই ছিল বিশ্বাস করে ঠকব তা-ও ভালো। কেস যখন সাব জুডিস তখন কোথাও আমাদের মুখ দেখাবার উপায় ছিল না। রকম-সকম দেখে ওর রোখ চেপে গেল, বলল, 'কারা করেছে এখন আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তাদের আমি ধরাবই।' অফিস থেকে কোনো সাহায্য পাবার উপায় নেই। একজন অনুগত পিওনের সাহায্যে প্রত্যেকটি অফিসারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করল, অমানুষিক পরিশ্রম আর বুদ্ধি খরচ করে।

এই পর্যন্ত শোনার পর ডক্টর চন্দ্র বললেন, 'ও হো মনে পড়েছে, সে তো সেনসেশন্যাল কেস। আসামি ধরা পড়েনি। পি কে দত্ত বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পেলেন। আচ্ছা। সেই কেস।'

আমি বললাম, 'আসামি ধরা পড়েছিল। প্রতীক দত্ত বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পাননি। বেকসুর খালাস পান। তাঁর অধস্তন তিনজন অফিসার এক সাপ্লায়ারের সঙ্গে মিলে বেশ কিছুদিন ধরে এভাবে টাকা মারছিল। তাদের শেষ পর্যন্ত প্রতীক দত্তই ধরিয়ে দেন। প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু ডক্টর চন্দ্র, আপনি যেমন কেসটার সম্পর্কে ভুল তথ্য জানেন, বিশ্বসুদ্ধ লোকও তেমনি জানে। কেন জানেন? খবরের কাগজের গাফিলতি। যতদিন একটা পদস্থ, মানী লোককে টেনে মাটিতে নামাবার সুযোগ ছিল, তার নাম কলঙ্কিত করবার সুযোগ ছিল ততদিন রগরগে সংবাদগুলো তেল মশলা ঢেলে পরিবেশন করেছে। তার পরের কথা আর কিছু লেখেনি। কিচ্ছু না। কাজেই আপনার মতো সবাই অর্ধসত্য জানে।'

ডক্টর চন্দ্র মুখে একটা দুঃখসূচক শব্দ করলেন, উনি আমার দিকে সোজা তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, 'আর আজ আপনার ব্যবহার যা, এগারো বছর আগে গোটা সমাজের ব্যবহারও অবিকল তাই-ই ছিল। আমাদের নিজেদের লোকেরা, আমার এবং আমার স্বামীর বাবা ভাই কেউ বিশ্বাস করেননি সে নির্দোষ। বেকসুর খালাস পাবার পরও তার সঙ্গে আপনজনদের ব্যবহারে দ্বিধা

অবজ্ঞা অবিশ্বাস মিশে ছিল। উকিল বলেন, 'এইবার আপনি সরকারের নামে মানহানির মামলা করুন মিঃ দত্ত।' উনি চুপ করেছিলেন। অপরাধীদের ধরতে ওঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এবং অপরাধীরা যে তাঁর ভাইয়ের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ছিল, এই চেতনা, এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কেস মিটে যাবার পরও। আর তারপর একদিন শেষ রাতে, এই অসহনীয় সামাজিক নির্যাতন সইতে না পেরে উনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।'

ডক্টর চন্দ্র বললেন, 'এক্সট্রিমলি ইন্টারেস্টিং। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে উনি বেঁচে আছেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন। অমিতকে হয়তো নিজের ছেলেই ভেবেছেন। কেন বাড়িতে আসেননি, বাড়ির কাছাকাছি কোথাও বসে ওর সঙ্গে কথা বলেননি, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। তা হলে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যান ইটস নট এ কেস অফ হ্যালুসিনেশন। যদিও একটা কথা আমি আপনাদের বলবই ডাক্তার হিসেবে, অমিতাংশু ছেলেটি একেবারে স্বাভাবিক নয়। একটু বেশি স্পর্শকাতর। ও পরিবারের এবং তার বাইরের বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডির সব সমস্যা নিয়েই ভেতরে ভেতরে খুব উদ্বিগ্ন। তা ছাড়াও, ও নিজে যা হতে চায়, তা ওর প্রিয়জনেরা ওকে হতে দিচ্ছে না। এ সমস্যাগুলো ওর রয়েছেই। আপনারা ওর সম্পর্কে একটু সাবধানে চলবেন।'

'কী হতে চায়, ও' জিজ্ঞেস করলাম।

'সম্ভবত পেন্টার বা আর্কিটেক্ট।'

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হলে তাঁর একশ পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক টেবিলে রেখে এয়ার কন্ডিশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সপ্তাহে দু-বার দেড়শো করে তিনশো, তার মানে মেজদার মাসিক খরচ হল বারোশো, ডাক্তারের ফি বাবদ। এ ছাড়া ব্রেন স্ক্যান, ই ই জি, ইত্যাদির জন্য আলাদা খরচ তো হয়েছেই। ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই একঝলক গরম হাওয়া লাগল। অন্ধকার বাইরে। অমু ছিল শেষ পেশেন্ট। শূন্য ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বললাম, 'অমু, আয় রে, হয়ে গেছে।'

অমু আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'পিসিমণি, আজ এতো দেরি করলে? আজও ডাক্তার দেড়শো টাকাই নিলেন?'

আমি হেসে বললাম, 'আধঘণ্টা তোর সঙ্গে আধঘণ্টা আমার সঙ্গে কাবার করতে হল—ফি-টা আর এমন বেশি কী!'

অমুর মুখে একটা তীব্র প্রতিবাদ ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই খুব মোলায়েম গলায় বলল, 'পিসিমণি। ঠিক করলাম, আমি ডাক্তারই হবো।'

কেন রে? এতো রোজগার দেখে?'

তাই-ই। একজন, অন্তত একজনও যদি রোগীকে টাকা ম্যানুফ্যাকচার করবার যন্ত্র বলে না ভাবে, আস্তে আস্তে তার থেকে একটা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে না?

তা জানি না, কিন্তু ওর এই সিদ্ধান্তে ওর বাবা খুব খুশি হবে না। ডাক্তারের দাঁড়াতে, উপার্জন করতে অনেক বছর কেটে যাবে। সে তুলনায় একজন ইঞ্জিনিয়ার অনেক তাড়াতাড়ি উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখের সেই ধন্দ-লাগা, বোকা-বোকা উদাস ভাবটা একদম চলে গেছে। আমি জানি, ডক্টর চন্দ্রর সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, অমু যার ছবি এঁকেছে, তাকে ও ওর মনের গোপন ইচ্ছা থেকেই এঁকেছে। তাকে ও সত্যি দেখতে পারে না। প্রতীক দত্তর সুইসাইড নোটটা যে আমি পেয়েছিলাম। ঠিক এগারো বছর আগে সে আমায় লিখে জানিয়েছিল, সমস্ত জীবন তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। সে আত্মহননের পথ বেছে নিল।

হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে গিয়ে সে বহু ফুট নিচুতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ নষ্ট করবে। আমরা কেউ তার দেহ পাব না।

বুঝলাম, তোমার যন্ত্রণাটা বুঝলাম। তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমিও সে যন্ত্রণা সমানে ভোগ করেছি, তোমাকে সান্ত্বনা আর সাহস জোগাবার জন্যে যে আমি প্রাণপণ করেছিলাম। কিন্তু প্রতীক, এভাবে পালিয়ে যাওয়ায় তোমার সারা জীবনের সততার ইতিহাসটা মিথ্যে হয়ে গেল। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে শেষ পর্যন্ত রুখে যাওয়া চাই। সত্য যার হাতের অস্ত্র সে কেন কাপুরুষের মতো স্ত্রী-পুত্রকে তার নিজের পরিত্যাগ করা সমাজের হাতে ফেলে রেখে চলে যাবে? তাই তুমি নিরুদ্দিষ্ট। পথভ্রষ্ট। তুমি আমাদের প্রতি প্রাথমিক কৃত্য করোনি, আমিও তোমার শেষকৃত্য করিনি। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। অমু পালিয়ে গিয়েছিল। তার পরিণত কৈশোরের স্পষ্ট সরল দৃষ্টি দিয়ে গোটা সমাজখানার চেহারা দেখে ভয়ে, বিতৃষ্ণায় পালিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল তার পিসেমশাইয়ের পথটাই একমাত্র পথ। ও-ও তো ওই নিরুদ্দেশের গল্পটাই জানে। পালিয়েছিল। কিন্তু অমু ফিরে এসেছে। এমনি করেই দীপু, অরু, মঙ্গল, পাপুল সব্বাই যে যার পলায়নের জায়গা থেকে যদি ফিরে আসে! আমরা যারা নিরুদ্দিষ্ট, আর আমরা যারা হারিয়ে গেছি, ক্রমাগতই হারিয়ে যাচ্ছি, আমি, মেজদা, বড়দা, মেজোবউদি, বড়োবউদি, মা, ডক্টর চন্দ্র, সেইসব সাংবাদিক যাঁরা স্টেট ভার্সাস প্রতীক দত্তর মামলার অসম্পূর্ণ অর্ধসত্য বিবরণ ছেপেছিল, এই সব, সবাইকে এমনকি আত্মঘাতী প্রতীক দত্তকেও ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব যদি অমিতাংশুরা নেয়!

আসন

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। দরদাম, দলিলদস্তাবেজ, ইনকামট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স, সব। সব হয়ে যাবার পর গলদঘর্ম বাড়ি ফিরে একটু জল গরম করে নিয়ে ঠাকুর্দার আমলের বাথটাবটাতে শুয়ে শুয়ে বিকেল সাড়ে তিনটেয় একটা লম্বা অবগাহন স্নান। আ-হ্। যেন অনেক দিনের পুরোনো পাপের বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে। শুধু স্নান নয়, শুচিস্নান। সত্যিই, পিছুটান বলে তো কিছু নেই। শুধু আপনি আর কপনি। তা আপনির ইচ্ছেমতো কপনি চলবে? না কপনির ইচ্ছেমতো আপনি! এ ক-দিনের মধ্যে এই নিয়ে বোধহয় সাতবারের বার গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু-হাত কপালে ঠেকাল সুনন্দা। স্থাবর সম্পত্তির বড়ো জ্বালা! বড়ো গুরুভার। হালকা হয়ে যে আকাশে পাখা মেলতে চায় ইঁট-কাঠ তার ঘাড়ের ওপর অনড় হয়ে বসে থাকলে সে বাঁচে কেমন করে? সবই গুরুদেবের কৃপা! বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে রাজিই হয়ে গেল শরদ দেশাই। তিন শরিকের এক শরিকি অংশ। বাবা নিজের অংশটুকু ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন তাই বাসযোগ্য ছিল এতদিন। সামনের উঠোন চৌরস করে ভেঙে খোলামেলা নিশ্বাস ফেলবার জায়গা খানিকটা। একটা আম গাছ, একটা নিম, সেগুলো ফেলেননি। নিম আমের হাওয়া ভালো। তা ছাড়াও আমের কোঁকড়া পাতায় ফাগুন মাসে কেমন কচি তামার রং ধরে! বাকি জায়গাটুকু নানারকমের বাহারি গাছপাতা দিয়ে সাজানো। ফুল গাছ নয়, পাতাবাহার। বাবার শখের গাছ সব। না-বাগান না-উঠোন এই খোলা জায়গাটুকু পার হতে হতে দোতলার লাল টালি ছাওয়া বারান্দাখানা চোখে পড়বে। তার ওপর ছড়ানো বোগেনভিলিয়ার ফাগ আর মুক্তো রঙের ফুলঝুরি। মার্চ-এপ্রিল থেকে ফুল ফোটা শুরু হবে, চলবে সেই মে অবধি।

বারান্দাটা যেন বেশ বড়োসড়ো একখানা মায়ের কোল। তেমনি চওড়া, নিশ্চিন্ত নির্ভয়। সুনন্দার নিজের মায়ের কোলটিও বেশ বড়োসড়ো ছাড়ালো দোলনার মতোই ছিল বটে। মনে থাকার বয়স পর্যন্ত সেই শীতল, গভীর কোলটিতে বসে কত দোল খেয়েছে সুনন্দা। তারপর মায়ের বোধহয় বড্ড ভারি ঠেকল। হাত-পা ঝেড়ে চলে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না। টাকার সাইজের এক ধামি সাদা ময়দার গোল পিংপং বলের মতো লুচি সাদা আলুভাজা দিয়ে না হলে যে সুনন্দা রেওয়াজে বসতে পারে না এবং সে-জিনিস যে আর কারও হাত দিয়েই বেরোবার নয় সে কথা মায়ের মনে থাকল না।

অনেকদিন আগলে ছিলেন বাবা। মায়ের কোল থেকে বাপের কাঁখ, সে তো কম পরিবর্তন নয়! ঈশ্বর জানেন বাবাকে মা হতে হলে স্বভাবের নিগূঢ় বাৎসল্য রসের চালটি পর্যন্ত পালটে ফেলতে হয়। তিনি কী তা পারেন? কেউ কী পুরোপুরি পারে? মায়ের জায়গাটা একটা বায়ুশূন্য গহ্বরের মতো খালি না থাকলে বুঝবে কেন সে কে ছিল। কেমন ছিল? বোঝা যে দরকার। মা হতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন, তাই বাবা আরও ভালো বাবা, আরও পরিপূর্ণ বাবা হতে পেরে গিয়েছিলেন। পাঁচজন যেমন বউ মরলেই হুলু দিয়ে থাকে তেমন দিয়েছিল বই কি! তিনি চেয়েছিলেন মাথায় আধ-ঘোমটা গোলগাল ছবিটির দিকে। চোখ দুটি ভারি উদাস, কিন্তু ঠোঁটের

হাসিতে ফেলে-যাওয়া সংসারের প্রতি মায়া ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা। তারপর ফিরে তাকিয়েছিলেন ঘুমন্ত ফুলো-ফুলো মুখ, ফুলো-ঠোঁট আর বোজা চোখ দুটির দিকে। ঘুমের মধ্যে চোখের মণিদুটো পাতার তলায় কাঁপছে। আহা! বড়ো বনস্পতির বীজ। কিন্তু কত অসহায়! মাতৃকুলে যন্ত্রসংগীত পিতৃকুলে কণ্ঠসংগীত। সরু সরু আঙুলে এখনই কড়া পড়ে গেছে। ওইটুকুন-টুকুন আঙুল তার টেনে টেনে এমন নাজনখরা বার করে যে মনে হবে রোশেনারা বেগম স্বয়ং বুঝি হোরি গুনগুন করছেন।

'মানুষের আপন পেটের বাপ-মা কি দুটো হয়?' ভ্যাবলা মেরে-যাওয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কিংবা হিতৈষীদের তাঁর এই একই উত্তর। নাও এখন মানে করো।

বালিকা থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে তরুণী, তরুণী থেকে যুবতি বাবা ঠায় কাঁধে মাথাটি নিয়ে। আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গিপাড়া দিয়ে। একটি দিনের জন্যও ঢিলে দেননি। 'সুনি নতুন শীত পড়েছে, বালাপোষখানা বার কর', 'সুনি, আদা তেজপাতা গোলমরিচ দিয়ে ঘি গরম করে খা, গলাটা বড্ডই ধরেছে', 'টানা তিন ঘণ্টা রেওয়াজ হল সুনি, আজ যেন আর খুন্তি ধরিসনি, তোর বাহন যা রেঁধেছে তাই ভালো।'

মাতৃহীন, অবুঝ, অভিমানী, তার ওপর অমন গুণী পিতৃদেব কিছুতেই আর বিয়ের জোগাড় করে উঠতে পারেন না। পাত্র ঠিক বলে তো পাত্রের বাড়ি যেন উলটো গায। বাড়ি-ঘর ঠিক আছে তো পাত্র নিজেই যেন কেমন কেমন! অমন ধ্রুপদি বাপের সেতারি মেয়ের পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি নয়। গুণীর পাশে দাঁড়াতে হলে গুণী যে হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু সমঝদারিটাও না জানলে কি হয়? বাবার যদি বা পছন্দ হয়, মেয়ে তা-না-না না করতে থাকে।

অমনি রাঙা মুলোর মতো চেহারা তোমার পছন্দ হল বাবা? সবসুদ্ধ ক মণি হবে আন্দাজ করতে পেরেছ?

মেয়ের যদি বা পছন্দ হল তো বাপের মুখ তোম্বা হয়ে যায়, 'হলই বা নিজে গাইয়ে। দু দিন পরেই কমপিটিশন এসে যাবে রে সুনি, তখন না জানি হিংসুটে-কুচুটে তোর কী হাল করে।'

এই হল সুনির বিবাহ বৃত্তান্ত। বেলা গড়িয়ে গেলেও উৎসুক পাত্রের অভাব ছিল না। কে বাগেশ্রী শুনে হত্যে দিয়ে পড়েছে, কে দরবারির আমেজ আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু পিতা কন্যার মন ওঠেনি। আসল কথা ধ্রুপদি পিতার ধ্রুবপদটি যে কন্যা! আর কন্যা তার পবজ-পঞ্চমের আরোহ-অবরোহ যখন ঘাট নামিয়ে-নামিয়ে বেঁধে নিয়েছিল পিতার সুরে, জীবনের সুরটিও তখনই ঠিক তেমনি করেই বাঁধা হয়ে গেছে।

বেলা যায়। বেলা কারও জন্যে বসে থাকে না। একটু একটু করে একজনের মাথা ফাঁকা হতে থাকে। আরেকজনের রুপোর ঝিলিক দেয় মাথায়। বাবার মুখে কালি পড়ে। শেষে একদিন পাখোয়াজ আর পানের ডিবে ফেলে উঠে আসেন শীতের মন-খারাপ-করা সন্ধ্যায়।

কী হবে মা, বেশি বাছাবাছি করতে গিয়ে আমি কি তোর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দিলুম?

ঝংকার দিয়ে উঠল সুনন্দা, 'করেছই তো, খুব করেছ, বেশ করেছ! এখন তোমার ডিবে থেকে দুটো খিলি দাও দেখি, ভালো করে জর্দা দিও, কিপটেমি করো না বাপু!' হেসে ফেলে মেয়ে। বাপের মুখের কালি কিন্তু নড়ে না।

অবশেষে সুনন্দা হাত-দুটো ধরে করুণ সুরে বলে, 'বাবা, একবারও কি ভেবে দেখেছো, আর কেউ সেবা চাইলে আমার সেতার, সুরবাহার, আমার সরস্বতী বীণ সইবে কিনা! এই দ্যাখো—কড়া পড়া দু-আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে, 'এই দ্যাখো আমার বিবাহচিহ্ন, এই আমার শাঁখা, সিঁদুর।'

'আমি চলে গেলে তোর কী হবে সুনি', আঁধার মুখে বাবা বললেন।

'বাঃ, এই আমার একলেশ্বরীর শোবার ঘর, ওই আমার তেত্রিশ কোটি দেবতার ঠাকুরঘর, ও-ই আমার জুড়োবার ঝুলবারান্দা, আর বাবা নীচের তলায় যে আমার তপের আসন। আমি তো আপদে থাকব না! এমন সজ্জিত, নির্ভয় আশ্রয় আমার, কেন ভাবছ বলো তো?'

বাবার মুখে কিন্তু আলো জ্বলল না। সেই আঁধার গাঢ় হতে হতে যকৃৎ-ক্যান্সারের গভীর কালি মুখময়, দেহময় ছড়িয়ে পড়ল। অসহায়, কাতর, অপরাধী দু-চোখ মেয়ের ওপর নির্নিমেষ ফেলে রেখে তিনি পাড়ি দিলেন।

তারপরও দশ-এগারোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে, সুনন্দা খেয়াল করতে পারেনি। রেডিয়োয়, টেলিভিশনে, কনফারেন্সে, স্বদেশে-বিদেশে উদ্দাম দশটা বছর। খেয়াল যখন হল তখন আবারও এক শীতের মন-খারাপ-করা সন্ধ্যা। এক কনফারেন্সে প্রচুর ক্লিকবাজি করে তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেয়নি, চটুল হিন্দি ফিল্মের আবহসংগীত করবার জন্য ডাকাডাকি করছে এক হঠাৎ-সফল সেদিনের মস্তান ছোকরা, যে গানের গ-ও বোঝে না, এখনও এই বয়সেও এক আধা বৃদ্ধ গায়ক এত কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন যে টেরিউলের শেরওয়ানির মধ্যে আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধ দামি আফটার শেভের সৌরভ ছাপিয়ে যেন নাকে চাবুক মেরেছে।

সামনের কম্পাউন্ডে নিমের পাতা আজ শীতের গোড়ায় ঝরে গেছে। আম্রপল্লবের ফোকরে ফোকরে শীতসন্ধ্যার কাকের চিকারি কানে তালা ধরায়, শরিকি বাড়ির ডান পাশ থেকে স্বামী-স্ত্রীর চড়া বিবাদী সান্ধ্য ভূপালির সুর বারবার কেটে দিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকের বাড়ি থেকে কৌতূহলী জ্ঞাতিপুত্র বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে থেকে থেকেই কী যেন দেখে যাচ্ছে। এত রাগ-রাগিণীর ঠাট মেল জানা হল, নিজের রক্তের এই রক্তবীজটি যে কোন্ ঠাটে পড়ে, কী যে ও দ্যাখে আর কেন যে, সুনন্দা তা আজও ধরতে পারল না। শিল্পী বাড়ির শরিক যে কী করে এত রাম-বিষয়ী হয়, তাও তার অজানা। দেখা হলেই বলবে, 'তোমাদের ড্রেনটা ভেন্ন করে ফ্যালো, আমি কিন্তু কর্পোরেশনে নোটিফাই করে দিয়েছি, এর পরে তুমি শমন পাবে।' হয় এই, আর নয়তো বলবে, 'ইস মেজদি, চুলগুলো তোমার এক্কেরারেই পেকে ঝুল হয়ে গেল। বয়ঃ কত হল বলো তো!'

চুল পেকে গেলে যে কী করে ঝুল হয় তা সুনন্দা জানে না। আর, বিসর্গ যে উচ্চারণ করতে পারে 'স' উচ্চারণ করতে তার কেনই বা এত বেগ পেতে হবে, তা-ও জানে না। ও যেন যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে রোজ এসে একবার করে জানান দিয়ে যায়। এই যে মেজদি, তুমি হয়ে গেলেই আমার হয়ে যাবে।

সামনের ঝুপসি অন্ধকারের দিকে চেয়ে সুনন্দা হঠাৎ বলে উঠল, 'ধ্যাত্তেরি।'

বারান্দার আরামচেয়ার থেকে সে উঠে পড়ে, শোবার ঘরে ঢুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার একলার খাট-বিছানা, চকচকে দেরাজ-আলমারি, দেয়াল-আয়নার গোল মুখ, আবার বলে—'ধ্যাত্তেরিকা।' পাশে ছোট্ট ঠাকুরঘর। সোনার গোপাল, কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ এসব তাদের কুলের ঠাকুর। মার্বেলের শিব, কাগজমণ্ডের বুদ্ধ, পেতলের নটরাজ, এসব শেলফের ওপর, নানা ছাত্রছাত্রী, গুণমুগ্ধ অনুরাগীর উপহার। চারদিকে সাদা পঙ্খের দেয়াল, খালি, বড্ড খালি। সিলিং থেকে জানলার লিনটেল বরাবর বেঁকা একটা চিড় ধরেছে। সেই খালি দেওয়ালে একটি যোগীপুরুষের ছবি। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে সে বলে, 'তুমিই ঠিক। তুমিই সত্য। তুমিই শেষ আশ্রয়।'

ড্রয়ারের ভেতরে ফাইল, ফাইলের ভেতর থেকে 'মধুরাশ্রম' ছাপ মারা খামটা দিনের মধ্যে এই তৃতীয়বার সে তুলে নেয়।

মোটা সুতোর কাগজ। হাতের লেখা খুব জড়ানো। ঠাকুর এক বছর ধরে রোগশয্যায়। স্মিতমুখে শবের মতো টান-টান শয়ান। বুকের ওপর খাপ কাটা হেলানো লেখার ডেস্ক, মাথার দিকটা তোলা। ঠাকুর সিদ্ধদাস নিজ হাতে সুনন্দাকে এই চিঠি দিয়েছেন অন্তত ছ-মাস আগে।

সুরাসুরসিদ্ধাস্‌ মা সুনন্দা,

তোমার সমস্যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ অনেক ভাবাভাবি করেছি মা। আমি ভাবার কেউ নয়, যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন বলেই বুঝি তোমার সুরসমুদ্রটি এবার এমন স্রোত গুটিয়ে ভাঁটিয়ে চলল। তোমার হৃদয়ে যখন তাঁর ডাক এমন করে বেজেছে তখন দরজা দু-হাতে বন্ধ রাখবে সিদ্ধদাসের সাধ্য কী? তুমি এসো। মনের সব সংশয়, দ্বিধা ছিন্ন করে চলে এসো। বিষয়সম্পত্তি তুমি যেমনি ভালো বুঝবে, তেমনি করবে। আশ্রমে খাওয়া-থাকার জন্য নামমাত্র প্রণামি দিতে হয়। সে তো তুমি জানোই। এখানে বরাবর বাস করতে গেলে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরার বিধি। নিজের পরিধেয়র ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে। খালি এইটুকু মনে রেখো মা, তোমার বস্ত্র যেন অন্য আশ্রমিকাদের ছাড়িয়ে না যায়। তোমার যন্ত্র সব অবশ্যই আনবে মা। তাঁর আশ্রম স্বর্গীয় সুরলাবণ্যে ভরিয়ে তুলবে, তাতে কি আমি বাধা দিতে পারি? তোমার সিদ্ধি সুরেই। সে তুমি এখানেই থাকো, আর ওখানেই থাকো। আমি ধনঞ্জয়কে তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে রাখতে বলছি। আসার দিনক্ষণ জানিয়ো। গাড়ি যাবে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তোমার ওপর সর্বদা থাকে প্রার্থনা করি।

সিদ্ধদাস

চিঠিটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ঠাকুরঘরে জোড়াসনে বসে থাকে সুনন্দা। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। ঠাকুরকে ফুল জল দেয়, দীপ জ্বালে। ধূপ জ্বালে। একলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, কালো পাথরের চকচকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে। নিচের ঘরের তালা খুলে সুইচটিপে দেয়। অমনি চারদিক থেকে ঝলমল করে ওঠে রূপ। আহা। কী রূপ, কত রূপ! কাচের লম্বা চওড়া শোকেসে শোয়ানো যন্তরগুলো। সবার ওপরে চড়া-সুরে-বাঁধা তার হালকা তানপুরা। পরের তাকে ঈশ্বর নিবারণচন্দ্র গোস্বামীর নিজ হাতে তৈরি, তার ষোলো বছর বয়সে বাবার উপহার দেওয়া তরফদার সেতার। তারপর লম্বা চকচকে মেহগনি রঙের ওপর হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা সুরবাহার। আর সবার শেষে, একেবারে নীচের তাকে অপূর্ব সুন্দর সমান সুগোল দৈবী স্তনের মতো ডবল তুম্বি শুদ্ধ সরস্বতী বীণ। তানসেনের কন্যা সরস্বতীর নামে খ্যাত সুগম্ভীর গান্ধর্বী নাদের বীণা। ডানদিকে নীচু তক্তাপোশে বাবার খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। কোণে বিখ্যাত শিল্পীর তৈরি কাগজের সরস্বতী মূর্তি--কাগজ আর পাতলা পাতলা বেতের ছিলে। বাঁ-দিকে শ্বেতপাথরের বর্ণহীন-সরস্বতী, গুরুদেব জব্বলপুর থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলতেন 'অবর্ণা মা'। এই মূর্তির সানুদেশ ঘেঁষে মেঝের ওপর সমুদ্রনীল কার্পেট। তার ওপর সাদা সাদা শুক্তি-ছাপ। পাশেই আর একটি নীচু কাচের কেসে তার শেখাবার সেতার এবং ডবল ছাউনির টঙটঙে তবলা। ঘরের মাঝখানে নীচু নীচু টেবিল-সোফা মোড়ায় বসবার আয়োজন। মায়ের হাতের নকশা করা চেয়ার ঢাকা, কুশন-কভার এখনও জ্বলজ্বল করছে।

সুনন্দা এই সময়ে রেওয়াজে বসবার আগে এ ঘরেও দীপ ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ঘর খুলতেই যেন কতকালের ধূপগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করল। অগুরু গন্ধে আমোদিত ঘর। মার্বেলের প্রতিমার সামনে দীপগাছ জ্বালিয়ে বিজলিবাতি নিবিয়ে দিল সুনন্দা। আধা অন্ধকার ঘর যেন গন্ধর্বলোক। বাবার পাখোয়াজের বোল কি শুনতে পাচ্ছে সুনন্দা? না, না, সেখানে শুধু ইষ্টনাম। শুনতে পাচ্ছে কি গুরুজির সেই অনবদ্য বঢ়হত, আওচার, মন লুটিয়ে দেওয়া তারপরন? দীপালোকে অস্ফুট ঘরে প্রতিমার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে সুনন্দা। হাতে নিবারণ গোঁসাইয়ের সেতার। সোনালি

রূপালি তারে মেজরাপের ঝংকার। রাগ দেশ। গুরুজি সিদ্ধ ছিলেন এই রাগে। সেতার ধরলেও যা সুরবাহার ধরলেও তা। বীণকারের ঘরের বাজ। সুরে ডুবে ডুবে বাজাতেন। আলাপাঙ্গে তাঁর অসীম আনন্দ। আলাপ থেকে জোড়, মধ্য জোড়, ডুব সাঁতার কেটে চলেছেন। নদীর তলাকার ভারী জল ঠেলতে ঠেলতে গতের মুখটাতে এসে যখন তেহাই মেরে ভেসে উঠতেন তখন আঙুলে সে কী জলের উল্লাস! অনেকদিনের স্বপ্ন বুঝি আজ সত্য হল। যা ছিল রূপকথার কল্পনাবিলাস তা বুঝি ধরা পড়ে গেল প্রতিদিনের দিনযাপনের ছন্দে রূপে। এমনিই ছিল গুরুজির বাজের তরিকা। কনফারেন্সে বাজাতে চাইতেন না। অভ্যাস ছিল নিজের গুরুদেবের ছবির সামনে বীণ হাতে করে বসে থাকা। কিংবা গুটিকতক নিষ্ঠাবান তৈরি ছাত্রছাত্রী ও সমঝদারের সামনে আনন্দসত্র খুলতেন। বলতেন, 'আজ তোদের কাঁদিয়ে ছাড়ব। লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদবি বাবারা।'

কিন্তু সুনন্দা আজ জানতেই পারল না কখন তার দেশ তিলককামোদ-এর রাস্তা ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবনি সারঙের মেঠো সুর তুলতে লেগেছে। একেবারে অন্যমনস্ক। ক-দিন ধরেই এই হচ্ছে। দিন না মাস! মাস না বছর! সুনন্দা যেখানকার সেতার সেখানে শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে বলল, 'আমি চললুম, আমায় মাফ করো।' অবর্ণা সরস্বতীর দিকে ফিরে বদ্ধাঞ্জলি আবারও বলল, 'পারলে ক্ষমা করো, আমি চললুম।'

মধুরাশ্রমে ধনঞ্জয়ের সাজানো ঘরে, নিশ্বাসে মালতীফুলের গন্ধ আর দু-চোখ ভরা তারার বৃষ্টি নিয়ে তবে যদি এ হাতে আবার সুরের ফুল ফোটে। আর যদি না-ই ফোটে তো না ফুটুক। অনেক তো হল। আর কিছু ফুটবে। এই আর কিছুর জন্যে সে বড়ো উন্মুখ হয়ে আছে।

২

মধুরাশ্রমে ঢোকবার গেট বাঁশের তৈরি? তার ওপরে নাম-না-জানা কী জানি কি নীল ফুলের বাহার। মধুরে মধুর। জমিতে মধু, হাওয়ায় মধু, জলে মধু। ভেতরে দেখ বিঘের পর বিঘে বাগান, ফলবাগান, ফুলবাগান, সবজিবাগান। প্রতি বছরেই একবার করে এখানে এসে জুড়িয়ে যায় সুনন্দা। কোলাহল নেই। না যানের, না যন্ত্রের, না মানুষের। নিস্তব্ধ আশ্রম জুড়ে শুধু সারাদিন বিচিত্র পাখির ডাক। সন্ধান দিয়েছিল আজ দশ-এগারো বছর আগে—মমতা বেন। এক ছাত্রী। মমতার বাপের বাড়ির সবাই সিদ্ধদাসের কাছে দীক্ষিত। বাবার মৃত্যুর পর তখন সেই সদ্য সদ্য সুনন্দার মধ্যে একটা হা-হা শূন্যতা তেপান্তরের মাঠের মতো। সব শুনে বুঝে ছাত্রী মমতা গুরুগিরি করল। ঠাকুর সিদ্ধদাসের হাতের ছোঁয়ায় অনেকদিনের পর সেই প্রথম শান্তি।

দেশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগও মমতার মাধ্যমে। মধুরাশ্রমে যখন মন টানল তখন শরিকি বাড়ির অংশটুকু নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিল সুনন্দা। মোটে আড়াই কাঠার বাস্তু, তার ওপরে তো আর জগদ্দল কংক্রিট-দানব তৈরি করা যাবে না, সুতরাং প্রোমোটারে ছোঁবে না। যারা বাস করবার জন্য কিনতে চায় তারাও দুদিকে শরিকি দেয়াল দেখে সরে পড়ে। জমির দাম আকাশ-ছোঁয়া। কে আর লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিবাদ-বিসংবাদ কিনতে চায়? এইরকম হা-হতোস্মি দিনে মমতা বেন দেশাইয়ের খোঁজ দিয়েছিল। কোটিপতি ব্যবসায়ী, কিন্তু সমাজসেবার দিকে বিলক্ষণ নজর। সোশ্যাল সার্ভিস সেন্টার খুলবে। একটা ছোটোখাটো বাড়ি কিনতে চায়। পরিবার-পরিকল্পনা, ফার্স্ট এড, শিশুকল্যাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুনন্দার বাড়ি তার খুব পছন্দ হয়ে গেল। বসবার ঘরটাকে পার্টিশন করেই তিনটি বিভাগ খুলে দেওয়া যায়। ভালো দাম দিল দেশাই।

সবটুকুই সামলাল মমতা আর তার স্বামী। সমস্ত আসবাবসমেত বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে সুনন্দা।

মায়ের বিয়ের আলমারি, খাট, দেরাজ, সোফাসেট, রাশি রাশি পুতুল আর কিউরিকো-ভর্তি শোকেস, বাহারি আয়না, দেওয়ালগিরি, ঝাড়বাতি, সমস্ত সমস্ত। শ্বেতপাথরের সরস্বতী প্রতিমাটি মমতাকে সে উপহার দিয়েছে। বেত-কাগজের শিল্পকীর্তি দেশাইয়ের বড়ো পছন্দ। তার নিজস্ব বাড়ির হলঘরে থাকবে। বিক্রিবাটার পর যতদিন সুনন্দা থেকেছে, বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। আশপাশের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কিচ্ছু।

ঠাকুরঘরের ফাটল আর শোবার ঘরের বাঁ কোণে চুইয়ে-পড়া জলেব দাগটার, দিকে তাকিয়ে সুনন্দা মনে মনে ভেবেছিল, 'বাব্‌বাঃ, এসব কি একটা একলা মেয়ের কম্মো!' ওই ছাদ কতবার হাফ-টেরেস হল, টালি বসানো হল, তা সত্ত্বেও জল চোয়াচ্ছে দেখে মাঝরাত্তিরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল সে। এখন বেশ ঝাড়া হাত, ঝাড়া পা, পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর হাতে সেতার, বাঃ!

এবার যেন মধুরাশ্রম আরও শান্তিময় লাগল। গুরুভাই ধনঞ্জয় সেই ঘরটাই ঠিক করে রেখেছে যেটাতে সে প্রত্যেকবার এসে থাকে। সরু লম্বা। ছয় বাই বারো মতো ঘরটা। ঢোকবার নীচু দরজা সবুজ রং করা। উলটো দিকে চার পাল্লার জানলা। খুলে দিলেই বাগান। এখানকার সবাই বলে মউ-বাগান। মউমাছির চাষ হয় ফুলবাগানের এই অংশে। ঘরের মধ্যে নীচু তক্তাপোশে শক্ত বিছানা। একপাশে সেতার রেখে শুতে হবে। একটিমাত্র জলচৌকি। ট্রাঙ্ক সুটকেস রাখতে পার, সেসব সবিয়ে লেখার ডেস্ক হিসেবেও ব্যবহার করতে পার, কোণে চারটি ইটের ওপর মাটির কুঁজো। আশ্রমের ডিপ টিউবওয়েলের জল ধরা আছে। ঘরের বাইরে টিউবওয়েলের জলে হাত-পা ধুয়ে পাপোশে পা মুছে, কুঁজো থেকে প্রথমেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল সুনন্দা। আহা! যেন অমৃত পান। ধনঞ্জয় বলল, 'দিদি, ঠাকুরের সঙ্গে যদি দেখা করবেন তো এই বেলা।'

ট্রেনের কাপড় ছেড়ে সঙ্গে আনা বেগমপুরের লালপেড়ে শাড়িটা পরে দাওয়া পেরিয়ে ঠাকুর সিদ্ধদাসের ঘরে চলল সুনন্দা। চারদিকে খোলা আকাশ, একেবারে টইটম্বুর নীল। সেই আকাশটা তার রং, তার ব্যাপ্তি, তার গাঢ়তা আর গভীরতা নিয়ে ফাঁকা বুকের খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে টের পেল সে। প্রণাম করল যে, আর প্রণাম পেলেন যিনি উভয়েরই মুখ সমান প্রসন্ন। সিদ্ধদাস বললেন, 'মা খুশি হয়েছ তো?' আলোকিত মুখে জবাব দিল সুনন্দা।

ঠাকুর সিদ্ধদাস তাঁর পুবের ঘরের আসন থেকে বড়ো একটা নড়েন না। ব্রাহ্মমুহূর্তে একবার, সন্ধ্যায় একবার আশ্রমের চত্বর বাগান ঘুরে আসেন। নিত্যকর্মের সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে তিনি তাঁর আসনে স্থির। ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সুনন্দার। সে-ও সে সময়টা বেড়াতে বেরোয়। কিন্তু তখন সিদ্ধদাস তদ্‌গত তন্ময়। কারও সঙ্গে কথা বলেন না, হনহন করে খালি হেঁটে যান। কে বলবে ক-মাস আগেও কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন!

এখানকার দিনগুলি যেন বৈদিক যুগের। শান্তরসাস্পদ। পবিত্র, সরল, উদার, সুগন্ধ। একটু কান খাড়া করলেই বুঝি মন্ত্রপাঠের ধ্বনি শোনা যাবে। নাসিকা আরেকটু গ্রহিষ্ণু হলেই যজ্ঞধূমের গন্ধ পাওয়া যাবে। যেন জমদগ্নি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, উপমন্যু এই বনবাগানের অন্তরালে কোথাও না কোথাও নিজস্ব তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু কী আশ্চর্য, আশ্রমের রাতগুলি যে আরব্য উপন্যাসের! তারার আলো কেমন একটা রহস্যজাল বিছিয়ে দেয় রাত আটটা নটার পরই। কে যেন উঁয়াও উঁয়াও করে রবাবের তাঁতের তারে চাপা আওয়াজ তোলে, চুমকি বসানো পেশোয়াজ, ওড়না সারা আকাশময়, ঘুঙুর পায়ে উদ্দাম নৃত্য করে কারা, হঠাৎ কে তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলে 'খামোশ'! একদিন দু-দিন করে মাস কেটে গেল। আকাশে বাতাসে চাপা রবাবের আওয়াজ শুনে শুনে সুনন্দা আর থাকতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্তে বেড়াতে বার হয় না সে, চৌকির ওপর বিছানা গুটিয়ে রাখে।

সদ্যতোলা গোলাপফুল রেকাবির ওপর রেখে অদৃশ্য সরস্বতী মূর্তিটির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেতারের তারে মেজরাপ ঠেকায়। ললিতে আলাপ। মন্দ্র সপ্তকে শুরু। খরজের তারে অভ্যাস মতো হাত চালায়, টাঁই আওয়াজ করে তার নেমে যায়, নামিয়ে তারগুলোকে আবার টেনে বাঁধে সুনন্দা। কান লাগিয়ে লাউয়ের ভেতরের অনুরণন শোনে। আবার আলাপ ধরে! তারগুলি কিন্তু সমানে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে, সুনন্দার তর্জনী আর মধ্যমার তলায় যেন কিলবিল করছে অবাধ্য, সুর-ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া কতকগুলো সাপ, জোর হাতে কৃন্তন লাগাতে গিয়ে আচমকা ছিঁড়ে যায় তার।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরের ধ্যানের আসর থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসে সুনন্দা। সকালবেলাকার সেই ছেঁড়া তার যেন আচমকা তার বুকের মধ্যে ছিটকে এসে লেগেছে। সারি সারি নিস্তব্ধ, তন্ময় গুরু ভাইবোনেরা। কেউ লক্ষও করে না। কিন্তু তার মনে হয় ধূপজ্বলা অন্ধকারের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া ভুরু তার দিকপানে চেয়ে কুঁচকে উঠছে।

রাতে তার ঘুম আসে না। সকালের ডাকে কলকাতার চিঠি এসেছে। অন্তরঙ্গ এক সহকর্মী দুঃখ করে লিখেছেন, তিনি ছিলেন না বলেই সুনন্দা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তিনি থাকলে নিশ্চয় বাধা দিতেন। কেন যে এ কথা লিখেছেন পরিষ্কার করে বলেনি। সুনন্দার ভালোমন্দ সুনন্দা কি নিজে বোঝে না! জানালা দিয়ে কত বড়ো আকাশ দেখা যাচ্ছে। শহরের সেই গলির বাড়িতে এত বড়ো আকাশ অকল্পনীয় ছিল। আস্তে আস্তে মনটা কী রকম ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে ওই আকাশে, তার যেন আর কোনো আলাদা অস্তিত্ব থাকছে না। কিছুতেই তাকে গুটিয়ে নামাতে পারছে না সে আঙুলে।

মাস তিনেকের মাথায় সিদ্ধদাস নিভৃতে ডেকে পাঠালেন, 'মা, খুবই কি সাধনভজন করছ?'

সুনন্দা চুপ।

তোমার বাজনা শুনতে পাইনে তো মা!

বাজাই না ঠাকুর।

চমকে উঠলেন সিদ্ধদাস, 'বাজাবার কি দরকার হয় না মা? এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন বাজাবার দরকার আর হয় না, মন আপনি বাজে।'

'আমার সে দিন তো আসেনি!' সুনন্দা শুকনো মুখে বলল, 'আঙুলে যেন আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। হাত চলে না। সুর ভুলে যাচ্ছি, হৃদয় শুষ্ক,' সুনন্দার চোখ দিয়ে এবার অধৈর্য কান্না নামছে, 'অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, কিছু ভালো লাগছে না, সব যেন বিষ, তেতো লাগছে সব।

সিদ্ধদাস বললেন, 'অপরাধ কি নেব! তুমিই আমার অপরাধ মার্জনা করো মা। তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারিনি। কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি, তুমি খাচ্ছ না ভালো করে, ঘর ছেড়ে বেরোও না, ধ্যানের সময়ে আস না। মন অস্থির চঞ্চল হয়েছে বুঝেছি। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না একটা উপায় বার হবেই, আশ্রম কখনও তোমাকে জোর করে ধরে রাখবে না। তোমার যেখানে আনন্দ, তাঁরও যে আনন্দ সেইখানেই।'

সেই রাত্রে অনেক ছটফট করে ঘুমিয়েছে সুনন্দা, দেখল সে সমুদ্রের ওপর বসে বাজাচ্ছে। বার বার ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। বিশাল তুম্বি সুদ্ধু বীণ বারবার তার সিল্কের শাড়ির ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। খড়খড়ে তাঁতের কাপড় পরে এল সে। বীণে মিড় তুলেছে। পাঁচ ছয় পর্দা জোড়া জটিল মিড়। কার কাছে কোথায় যেন শুনেছিল। কিছুতেই পারছে না। বীণ শুধু ড্যাঁও ড্যাঁও করে মস্ত দাদুরির মতো আওয়াজ তুলে চলে৺. হাত থেকে ছটাং ছটাং করে তার বেরিয়ে যাচ্ছে। এক গা ঘেমে ঘুম ভেঙে গেল, বীণ কই? সুরবাহার কই? সেসব তো এখনও আসেইনি! আঁচল দিয়ে সেতার মুছে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সুনন্দা। শেষ রাতে আবার চোখ

জড়িয়ে এসেছে। আবারও সেই স্বপ্ন। সমুদ্রের ওপর বীণ হাতে একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। হাত থেকে বীণ ফসকে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুনন্দা।

দরজার কড়া নড়ছে জোরে। ঝাঁকাচ্ছে কেউ। খুলতেই সামনে মমতা।

'সারা রাত কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! এখানে পৌঁছে দেখি বালি মাটির ওপর দিয়ে সব জল কী সুন্দর সরে গেছে', মমতা একগঙ্গা বকে গেল, তারপর অবাক হয়ে বলল, 'একি সুনন্দাদি, কাঁদছ কেন!'

সুনন্দা চোখের জল মুছে বলল, 'তুই হঠাৎ? কী ব্যাপার? আমার বীণ নিয়ে এসেছিস?'

মমতা বলল, 'ব্যাপারই বটে সুনন্দাদি। বীণ আনব কি? গোটা বাড়িটাকেই বুঝি তুলে আনতে হয়।'

ঘরে এসে বসল মমতা, 'শোনো সুনন্দাদি রাগ কোরো না। দেশাই তোমার বাড়ি নিতে চাইছে না। বলছে ওখানে ভূত আছে। রি-মডেলিং করার আগে যোশী আর দেশাই ক-দিন তোমার নীচের ঘরে শুয়েছিল, অমন সুন্দর ঘরখানা তো। তা সারা রাত বাজনা শুনেছে।'

'যাঃ', সুনন্দা অবাক হয়ে গেছে, 'কী বাজনা।'

ওরা কি অত জানে! খালি বাজনা, কত বাজনা। ঘুম আসলেই শোনে, চোখ মেললেই সুর মিলিয়ে যায়। ঘরের একটা জিনিসও সরাতে পারেনি।

কেন? মমতাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুনন্দা।

কেন আর? কিছুই না জিনিস সরাতে গেলেই অমন কাঠখোট্টা ব্যবসাদারেরও মনে হয় আহা থাক। বেশ আছে, বড়ো সুন্দর আর ক-দিন থাকই না।

সুনন্দা বলল —তুই বলছিস আমার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে?

শুধু ঘর নয় গো। বাড়ি আসবাব যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।

সুনন্দা হঠাৎ উত্তেজিত পায়ে বাইরে ছুটল, 'ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!'

কী দিদি!

আমি আজকের গাড়িতেই কলকাতা যাচ্ছি। আমার বাজনা প্যাক করে তুলে দেবার ব্যবস্থা করো ভাই।

বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ঘরে ফিরছেন ঠাকুর সিদ্ধদাস। উদ্‌ভ্রান্ত সুনন্দা উল্কার মতো ছুটে আসছে।

ঠাকুর ঠাকুর, আমি বাড়ি ফিরছি, বাড়ি।

স্মিতমুখে ডান হাত তুলে সিদ্ধদাস বললেন, 'স্বস্তি স্বস্তি।'

কেউ নেই এখন। কেউ না। না তো। ভুল হল। আছেন। অবর্ণা, বর্ণময়ী আছেন। সর্বশুক্লা। তাই লক্ষ সুরের বংবাহার তাঁর পায়ের কাছে মিলিয়ে গিয়ে আরও লক্ষ সুরের আয়োজন করে। সেতার নামিয়ে আজ বীণ তুলে নিয়েছে সুনন্দা। গুরুজির শেষ তালিম ছিল বীণে। বলতেন নদী তার নাচনকোঁদন সাঙ্গ করে সমুদ্রে গিয়ে মেশে বেটি, বীণ সেই সমুন্দর সেই গহিন গাঙ। বীণ তক পঁহুছ যা। সুনন্দা তাই বীণে এসে পৌঁছেছে। মগ্ন হয়ে বাজাচ্ছে, হাতে সেই স্বপ্নশ্রুত মিড়। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে এক ব্যথামিশ্রিত আনন্দ, তবুও মিড়ের সূক্ষ্ম জটিল কাজ কিছুতেই আসছে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, সুনন্দা অসম্পূর্ণ সুরের জাল বুনেই চলেছে, বুনেই চলেছে। খোলা দরজা, বাইরের ছায়াময় উঠোন বাগান দেখা যায়। কিন্তু সুর বন্দিনির মতো গুমরে গুমরে কাঁদছে ঘরময়। কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে মুক্তি দিচ্ছে না তাকেও, দরদর করে ঘাম নামছে, ঘাম না কি চোখের জল যা দেহের রক্তের মতোই গাঢ়, ভারী! পরিচিত জুতোর শব্দ।

খোলা দরজা দিয়ে গুরুজি এসে ঢুকলেন, বললেন, 'সে কী? এতক্ষণেও পারছিস না বেটি! এই দ্যাখ।' চট করে দেখিয়ে দিলেন গুরুজি। কয়েকটা শ্রুতি ফসকে যাচ্ছিল। স্মৃতির কোণে কোথায় লুকিয়ে বসেছিল। গুরুজি তাদের টেনে আঙুলে নামিয়ে আনলেন। সুনন্দা বাজিয়ে চলেছে। হুঁশ নেই আনন্দে। গুরুজি যে চলে যাচ্ছেন, ওঁকে যে অন্তত দুখিলি পান দেওয়া দরকার সে খেয়ালও তার নেই। যাবার সময়ে বলে গেলেন, 'আসন, বেটি। আসন! তুই যে আসনে ধ্যান লাগিয়েছিস, তুই ছাড়লেও সে তোকে ছাড়বে কেন?' বলতে বলতে গুরুজি মসমস করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সুনন্দা যেন এতক্ষণ ঘোরে ছিল। সে বীণ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। গুরুজি এসেছিলেন এত রাত্রে? সে কি? পান? অন্তত দু খিলি পান...কাকে পান দেবে? গুরুজি তো বাবা যাবার তিন বছর পরেই কাশীতে...।

চারদিকে চেয়ে দেখে সুনন্দা। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়। নিমের পাতায় হু হু জ্যোৎস্না। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল সে, তারপর তীব্র ভঙ্গিতে এসে বীণ তুলে নিল। মিড় তুলল। সেই জটিল, অবাধ্য মিড়। হ্যাঁ। ঠিকঠাক বলছে। অনেক দিনের স্বপ্নের জিনিস তুলতে পেরে এখন সুনন্দার হাতে সুরের জোয়ার। আরও মিড়, জটিলতর, আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রাণমন কাঁদানো, সব মানুষের মধ্যেকার জাত-মানুষটাকে ছোঁবার মিড়। গুরুজি সত্যি এসেছিলেন কি আসেননি তৌল করতে সে ভুলে যায়। সে তার আসনে বসেছে, তার নিজস্ব আসন। সমুদ্র নীলের ওপর বড়ো বড়ো শুক্তি ছাপ। সাত বছর বয়স থেকে এই আসনে বসে সে কচি কচি আঙুলে আধো আধো বুলির মতো কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাজ নখরা ফুটিয়েছে ত্রিতন্ত্রী বীণায়। ঠিক যেমনটি কেসর বাই কি রোশেনারার রেকর্ডে শুনেছে। অবর্ণা দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে, কিন্তু নতমুখ আত্মমগ্ন হয়ে, সারারাত সুনন্দা সমুদ্রের দিকে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। পাশে শোয়ানো সেতারের তরফের তারগুলি ঝংকৃত হয় থেকে থেকে। কাচের কেসের ডালা খোলা। সেখান থেকে সরু মোটা নানান সুরে আপনা আপনি বেজে ওঠে সুরবাহার, তানপুরা।

কে আছে দাঁড়িয়ে এই সুরের পারে? তারের ওপর তর্জনীর আকুল মুদ্রায় প্রশ্ন বাজতে থাকে। কে আছে? কে আছ? ঝংকারের পর ঝংকারে উত্তর ভেসে আসে। সুর। আরও সুর। তারপরে? আরও সুর। শুধুই সুর। ধু ধু করছে সুরের কান্তার। ঠিক আকাশের মতোই। তাকে পার হবার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সেই সুরের ধুলি বৃন্দাবন রজের মতো সর্বাঙ্গে মাখো। সেই সুরের স্রোতে ভেসে যাও, আর সুরের আসনে স্থির হয়ে বসো। 'মন রে, তুই সুরদীপ হ।'

বন্ধু

হাওড়ার ফ্যাক্টরি থেকে সোজা গেছি আমহার্স্ট স্ট্রিটে। সেখান থেকে ভবানীপুর। রবিন আজ ছুটিতে। আমিই ড্রাইভ করেছি সবটা। দোতলার দালান পর্যন্ত পৌঁছোতে আজ আমার দম বেরিয়ে গেল। পায়ে যেন জোর নেই। দালান অবধি পৌঁছোতেই কালোমানিক গুড়গুড় গুড়গুড় করতে করতে এগিয়ে এল। পায়ের কাছটায় ফোঁস ফোঁস করছে, যেন প্রণাম করছে। আজ মনমেজাজ এতই খারাপ যে পা-টা ছুড়তে গিয়েছিলাম। সামলে নিলাম। ড্যাসুনটার কী দোষ! ও তো আমায় ছেড়ে যায়নি, যাবেও না ওর আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত। জানোয়ার মানুষের চেয়ে অনেক বিশ্বস্ত, অনেক বৎসল। উঃ, টুকটুক যে কোথায় গেল! ওর বোঝা উচিত গাড়ির শব্দ পাওয়া গেছে, অতএব আমি এসেছি। কোথায় কী এমন রাজকর্মটা করছে! ঠিক আছে। করো তুমি তোমার রাজকর্ম। আমিও কিচ্ছুটি বলব না। জুতো খুললাম না। জামা-কাপড়, ধড়াচুড়ো যা পরা ছিল, রইল। দালানের সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। পাখাটা চলছে ফুল স্পিডে। তবু ঘামছি।

অমিতের ব্যবহার বরাবরই বড়ো শীতল। একেক সময় মনে হত ওর বোধশক্তি হয় নেই, নয় ভোঁতা। অথচ ও যে আমাকে কী টানে টেনেছিল! চিরকালই আমার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, তীব্র। অমির পেট ব্যথা করলে, মাসিমা অনেক সময়ে কাকে ওষুধ খাওয়াবেন ঠিক করতে পারতেন না। হয়তো এত অনুভূতিপ্রবণ বলেই আমি মানুষটা লোকের চোখে মেয়েলি বলে প্রতিভাত হই। অনুভূতি-টুতি সব নারীজাতির একচেটিয়া কি না! যারা এসব মনে করে তারা অবশ্য ইচ্ছে হলে টুকটুককে দেখে যেতে পারে। যাই হোক, মেয়েলি বলুক, বাড়াবাড়ি বলুক, আদিখ্যেতা বলুক, সব সহ্য করতে রাজি আছি, কিন্তু 'ন্যাকামি' বললে মেনে নিতে পারব না। 'ন্যাকা' শব্দটার মধ্যে একটা হিপক্রিসির ব্যাপার আছে। আমার আর অমির সম্পর্কের মধ্যে কোনো খাদ নেই। অমির আদ্যন্ত নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও এই দুর্লভ বন্ধুত্ব টিকে আছে, আমি সে কথা হাজার মুখে বলব, অমি অবশ্য বলবে না, হাসবে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া যদি করাও যায়, অমিকে পিটিয়ে তার মুখ থেকে কথা বার করা সহজ নয়। প্রচণ্ড মুখচোরা। ওই হাসিটাই ওর জবাব। ওর মতামত।

পাখা চলছে। তবু ঘামছি অস্বাভাবিক। দোষ নেই। যত জীবন এগোচ্ছে ততই বুঝতে পারছি প্রয়াত সেই কবির কথাই ঠিক, চতুর্দিকে মুখোশ, শুধু মুখোশ। তুমি কথা বলো, অপরপক্ষের ঠোঁট নড়বে হৃদয় নড়বে না, তুমি কিছু শোনালে কানগুলো শুনবে, কিন্তু মর্মে পৌঁছোবে না। হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—এ একেবারে কাব্যকথা। কবি-বাক্যে বিশ্বাস করে আমরা সারাটা জীবন একটার পর একটা ভুল জায়গায় নিজেকে সমর্পণ করি।

পেছনে একটা শব্দ হল। নিশ্চয় টুকটুক। পনেরো মিনিট কেটে গেল, এতক্ষণে বাবুর আসবার সময় হয়েছে। পেছন থেকে সামনে এল। একটা সবুজ সিল্কের রাজস্থানি পোশাক পরেছে। ভারী সিল্কের ওপর দিয়ে হাওয়া কাটলে একটা অদ্ভুত আকর্ষক শব্দ হয়। সেই শব্দটাই আমি শুনতে পেয়েছিলুম। টুকটুকের জামাকাপড়ের শখ ভীষণ, কত রকমের যে পোশাক করায়। পরে, বাড়িতেও পরে থাকে!

'কতক্ষণ এসেছো?' একেবারে অলস টু-দা পাওয়ার ইনফিনিটি। হাতটা পড়ে রয়েছে সোফার হাতলে। নখগুলো লাল, হাতের পাতায় কোথাও কোনো শিরা জেগে নেই। যেন নেতিয়ে পড়া কেয়াফুলের স্তবক। বাপের বাড়ির হতদরিদ্র ঘরে টুকটুক এমন হাত টিকিয়ে রেখেছিল কী করে— এটা একটা লাখ টাকার প্রশ্ন। আমি যে জবাব দিলাম না, আমার মেজাজটা যে একটু অন্যরকম, ভঙ্গিতে বিষাদসিন্ধু এসব টুকটুক লক্ষই করল না। আপন মনে নিজের আঙুল দেখছে। হাতের কাঁকন দেখছে। পা তুলে একবার সোনালি চটি নাকি তার অভ্যন্তরে নিজের সাদা মসৃণ পায়ের পাতা দেখল। নার্সিসাস!

'খাবে? নাকি বাইরে খেয়েছো?', আমার খাওয়া না-খাওয়া ওর কাছে সমান। এবারেও উত্তর না পেয়ে বোধহয় মেমসাহেবের বোধোদয় হল। বলল, 'কী ব্যাপার? কথা বলছ না যে! কিছু হয়েছে?'

জবাব দিলাম না। টুকটুক এবার উঠে পড়ল। আমার কাছে চলে এল। নীচু হয়ে সোফার পেছনে দু হাত রাখল, আবারও বলল, 'কিছু হয়েছে?'

'অমিত অস্ট্রেলিয়া চলল ফর গুড'—আমি অনেক কষ্টে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারলাম।

'তো কী?'—বুকের ওপর দু-হাত আড়াআড়ি রেখে চূড়ান্ত নির্বেদের সঙ্গে টুকটুক বলল।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। প্রায় কাঁপছি এত উত্তেজনা। বলছি, 'টুকটুক তুমি বলছ কী? অমিত অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে বরাবরের মতো আমাকে ছেড়ে। আর তুমি বলছ,— 'তো কী?' তো তুমি কী?'

টুকটুক আড়াআড়ি হাতদুটো নামাল। ঝট করে পেছন ফিরল, ওদিকের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘাড়টা ফেরাল, তারপর মুখটা সামান্য বেঁকিয়ে আমাকে আমূল কাঁপিয়ে দিয়ে বলল, 'ন্যাকা'।

এই অসহ্য রকমের ঘৃণ্য শব্দটা আমার দিকে ছুড়ে দিল আমার স্ত্রী যাকে আমি কাদা থেকে তুলে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, প্রতিদিন যার সাংস্কৃতিক শিক্ষাদীক্ষা এবং বিলাসের খাতে আমার আয়ের অঙ্কে রীতিমতো একটা বিয়োগ হয়। যার বাবা-মা, দুটি ছোটো ভাইবোনের দায়ও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। কোনোরকম প্রার্থনা অনুরোধ উপরোধ বা প্রত্যাশার দায় মেটাতে নয়। এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক, এটাই সবচেয়ে মানবিক বলে। আমাদের নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দিতে হবে তো!

এই মনুষ্যত্ব রক্ষার তাগিদেই না অমির কাঁধে হাত রেখেছিলাম! তখন বাল্য পেরিয়ে কাঁচা কৈশোর। বই আনেনি এই অপরাধে ভূগোলের ক্লাসে সেবারের সেকেন্ড বয় সাংঘাতিক মার খেল। ভূগোলের মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবু বড়ো নিষ্ঠুর স্বভাবের ছিলেন। মেরে ধরে ছেলেটিকে আধমরা করে উগ্রচণ্ডা দুর্বাসার মতো বেরিয়ে গেলেন প্রফুল্লবাবু, আমি বললাম, 'চল, আমরা হেডসারের কাছে কমপ্লেন করতে যাই।' কয়েক জন ছেলে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। অমিত অর্থাৎ মার খাওয়া ছেলেটি বলল, 'না'।

যাব না? সে কী? কেন?

সত্যিই তো, গতকাল উনি বারবার করে আনতে বলেছিলেন টেক্সটটা।

ঠিক আছে, কিন্তু এই সামান্য ভুলের জন্য ওই রকম মার? অমিত তোমার যে পিঠ লাল হয়ে গেছে। কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ও কিছু না। ওঁর বাড়ি থেকে চলে গেলেই উনি আর মারবেন না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসায় জানলাম—অমিত এবং তার মা প্রফুল্লবাবুর বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া থাকেন। —ওর বাবা বছরখানেক হল হঠাৎ মারা যাওয়ায় ওরা একেবারে অকূলে পড়েছে। ভাড়া দিতে পারছে না মাসছয়েক হল। প্রফুল্লবাবুর মারের পেছনের আসল ইতিহাস এই।

অত সহজে, অন্যান্য ছেলেদের সামনে অবশ্য অমি এত কথা বলেনি। আস্তে আস্তে টিফিন পিরিয়ডে মাঠে বেড়াতে বেড়াতে গাছতলায় বসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে অনেক জেরার পর একটু একটু করে বেরিয়েছে কথাগুলো অমির পেট থেকে।

আমি বললাম, 'আজ ছুটির পর অমিত আমাদের বাড়ি চলো প্লিজ।'

আজ নয়।

তবে কাল।

ঠিক আছে, দেখা যাক।

দেখা যাক নয়, কাল আসছই।

বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব কথা বললাম। আমার মা নেই। বাবা অত্যন্ত উদারচরিত্রের মানুষ। বললেন, 'আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকে দু-খানা ঘর তো এমনিই পড়ে রয়েছে, ওঁদের আসতে বলে দাও। আমি বারান্দাটা ঘেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পরের দিন অমিকে বাড়িতে আনলাম, বাবা কারখানা থেকে ফিরে ওকে দেখলেন, আদর করে বললেন, 'বাঃ, বেশ ব্রাইট ছেলে মনে হচ্ছে!'

কিন্তু আমাদের বাড়ির একতলায় থাকার কথায় অমিত ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। খালি গোঁয়ারের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে। শেষে ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর মার কাছে কথাটা পাড়লাম। উনি বললেন, 'প্রফুল্লবাবুর ছ-মাসের বাকি ভাড়া না দিয়ে কী ভাবে যাই বলো। তা ছাড়া তোমাদের বাড়ির ভাড়াও তো অনেক হওয়ার কথা।'

আমি ছেলেমানুষ। মায়ের মতো এক মহিলার মুখের ওপর আর কী বলব। বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ পাঁচশো চল্লিশ টাকা। আমার হাত খরচের টাকা জমেছিল হাজারের সামান্য ওপরে। তার থেকে পাঁচশো চল্লিশ প্রফুল্লবাবুর হাতে দিয়ে রসিদ নিয়ে অমির মার কাছে গেলাম। হাত ধরে বললাম, 'চলুন না মাসিমা, আমার মা নেই। কেউ আমাকে দেখে না।'

এই শেষের তিরটাই বোধহয় অব্যর্থ হয়ে থাকবে। তাই ওদের বাড়িতে আনতে পারলাম। অমির মা আমার নিজের মায়ের মতো হলেন। ওঁদের একতালার ঘরই হল বলতে গেলে আমার আসল বাসস্থান। রাজশয্যা ছেড়ে ধূলিশয্যা, অনেকেই বলল। —মাসিমার সেলাই-মেশিন এবং অমির কাগজ বিক্রি চলতে লাগল আড়ালে আমাদের বাড়ির ভাড়া এবং আমার পাঁচশো চল্লিশ টাকার ঋণ মেটাবার জন্যে। এবং কোনোক্রমেই আমি অমিকে আমার খাবার টেবিল বা শয্যার ভাগ দিতে পারলাম না, একমাত্র কোনো জন্মদিন-টিনের মতো বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়া। এবং মাসিমাও কোনো দিন তাঁর ভাড়া-করা দু-খানা ঘর-বারান্দার সীমা অতিক্রম করলেন না।

টুকটুক এসে বলল, 'যদি খেয়ে এসে না থাকো, তো চলো খাবার দিতে বলেছি। আমি নিজে রেঁধেছি আজ।'

এটা নতুন। রান্না করতে টুকটুক খুব ভালোই পারে। কিন্তু একদম ভালোবাসে না কাজটা করতে। বললে বলে, 'ভালো রাঁধতে পারি, তো কী? তুমি কী রান্নার জন্যে আমায় বিয়ে করেছিলে? তা হলে আমার মাকে বিয়ে করলেই পারতে, মা আরও অনেক অনেক ভালো রাঁধে।'

টুকটুক! কী অসভ্যতা! কী বিশ্রী!

আমার যদি দিনরাত শুয়ে থাকতে, কী গল্পের বই পড়তে, কী টিভি দেখতে ভালো লাগে আমি তা করতে পারব না। এরকম তো কথা ছিল না!

কথা কী ছিল তা অবশ্য আমি আদৌ জানি না। কিন্তু টুকটুক যখন পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই প্রশ্নটা উচ্চারণ করে আমি প্রাণ ধরে পালটা বলতে পারি না—'কী কথা ছিল?' আমার খারাপ লাগে। আমি বুঝতে পারি টুকটুক রান্না করতে করতে, রান্না করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে এখন ওর তাই রাঁধতে আর ভালো লাগে না। জীবনে কোনোদিন লাগবেও না। আর আমি এত হ্যাংলা নই যে রান্নায় বীতস্পৃহ স্ত্রীকে দিবারাত্র 'এটা করো' 'ওটা করো' বলে নাজেহাল করে তুলব। এমনকী আমাদের আদ্যিকালের বামুনঠাকুরের রান্না খেয়ে টুকটুক যখন নাক কুঁচকে বলে, 'তোমরা ঘটিরা সব তাতে এত মিষ্টি খাও। তোমাদের বামুনঠাকুর কি মাছের ঝোলেও চিনি দেয়?' তখনও আমি বলি না, 'নিজে রাঁধলেই তো পার, কিংবা নিজের পছন্দটা দেখিয়ে দিলেও তো পার!' কোনো কথা ছিল অথবা ছিল না বলে যে একথা আমি বলতে পারি না তা নয়। আসলে এভাবে বলা আমার স্বভাবে নেই। বিশেষত যখন টুকটুকের ব্যাপারটা আমি আগাগোড়াই বুঝতে পারি।

তো সেই টুকটুক আজ রান্না করেছে। জামাকাপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হল। অমি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, সেই খবর বুকের ভেতর নিয়ে আজ আমি টুকটুকের রান্না পোলাও, চিতল মাছের কোপ্তা খাচ্ছি, ঠিক সেই দিনেই, এ কেমন নিষ্করুণ কাকতালীয়? আমাকে অনামনস্ক দেখে টুকটুক দু আঙুল জিভ দিয়ে চেটেচুটে নিয়ে বলল, 'কেমন, ভালো হয়নি বুঝি?'

আমি বললাম, 'ভালো হয়নি মানে? দারুণ হয়েছে, সাংঘাতিক হয়েছে। শুধু তোমার এই একটি গুণের জন্যও আমি পত্নীগর্বে গর্বিত হতে পারি।'

'থাক'—টুকটুক বলল, 'তো বন্ধুকে একদিন ডাকো, খাইয়ে দাও।' টুকটুক কি অমিকে ডাকবার প্রসঙ্গ তুলতেই আজ নিজে হাতে রান্না করেছে। ও কী জানে না, অমিকে নিয়ে আমি প্রায়ই বাইরে খাই, কিন্তু বাড়িতে না। বাড়িতে ডেকে অমিকে কোনো কষ্ট বা অপ্রিয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবার নিষ্ঠুরতা আমি কেমন করে করব?

'কী প্রস্তাবটা পছন্দ হল না বুঝি?', টুকটুকের কাটা কাটা কথা। অমিকে যেমন বাঁচিয়ে চলি, টুকটুককেও তেমনি সত্যি কথাটা বলতে পারি না। আজকে বলে ফেললাম, 'তুমি তো জানো অমি আজকাল আর আমার বাড়ি একেবারে আসতে চায় না। তা ছাড়া ও তো কালই চলে যাচ্ছে।'

উত্তরে টুকটুক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। এই বিচিত্র মুখভঙ্গির মানে কী বোঝবার চেষ্টা করতে করতে আমি খাওয়া শেষ করলাম। হাত মুখ ধুয়ে, সিগারেট ধরিয়ে জানলার পাশে দোলনা চেয়ারে বসলাম। এক হতে পারে—বয়েই গেল। অমি যদি আসতে না চায় ওর জন্যেই নিশ্চয় চাইছে না, সেটা ওর পক্ষে যথেষ্ট অপমানকর। তাই সেটাকে ও উড়িয়ে দিতে চাইছে, আসবে না তো বয়েই গেল। দ্বিতীয় হতে পারে আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি। অর্থাৎ অমিকে আমি আসতে বলেছি অথচ সে আসতে চাইছে না। এটা আমার রচনা। টুকটুকের মধ্যে অবিশ্বাসের শেকড় খুব গভীর। আমার এখনও পর্যন্ত সাধ্যে কুলোয়নি যে তাকে উপড়োই। আস্তে আস্তে হবে। আমি অপেক্ষা করতে পারি। তাড়াহুড়োয় কী লাভ?

অমির জন্যেও তো আমায় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কত দিন, কত মাস, কত বছর। তবু ওর মনের তল পেয়েছি কি কোনোদিন? বড্ড চাপা স্বভাব। একমাত্র যখন আমার বসন্ত হল, তখন, সেই ভয়ংকর সময়টায় অমি আমার ঘরে শুয়েছিল। এক মশারিতে আমি, আরেক মশারিতে ও। কষ্টে ছটফট করছি, ঘুম আসছে না। অমি উঠে এসেছে, নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, মশারি সামান্য তুলে অমির সেই মৃদু গলার প্রশ্ন এখনও আমার কানে বাজে—'বড্ড কষ্ট হচ্ছে না রে

গোপাল? শোন, একদম চুলকাবি না। আমি আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছি।' এইভাবে ফুঁ দিয়ে দিয়ে, মৃদু গলায় গল্প করে, গান করে আমায় অন্যমনস্ক রাখত, ঘুম পাড়াত অমি। সে বছর ঠিক তিন নম্বরের তফাতে আমি সেকেন্ড হয়ে গেলাম। মাস্টারমশাইরা প্রকাশ্যেই বললেন, 'প্রশংসনীয় প্রতিযোগিতা। তবে কিছুতেই অমিতকে এর চেয়ে কম মার্কস দেওয়া গেল না। গোপাল তুমি ইচ্ছে করলে খাতাগুলো দেখতে পারো।' খাতা দেখেছিলাম। সেই বয়সেই মনে হয়েছিল অসাধারণ। সেদিনটা আমার রাস্তায় রাস্তায় কেটে গেল একা, ভাবছি অমিটা কী সাংঘাতিক মেধা লুকিয়ে রেখেছিল। ওর জন্য অনেক বড়ো কিছু অপেক্ষা করছে। আমাদের স্কুল কলকাতার গর্ব। আমিও অহংকার করছি না, যা-তা ছেলে নই। সেই আমার এতদিনের রেকর্ড ভেঙে যে বেরিয়ে যেতে পারে তাকে তো শাবাশ জানাতেই হয়।

সে রাত্রে আর মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি, পরদিন স্কুল যাবার আগে গিয়ে প্রণাম করতে মাসিমা কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'কাল আসিসনি কেন রে গোপাল, দুঃখ হয়েছিল খুব, না রে?'

আমি বললাম, 'সে কী? দুঃখ হতে যাবে কেন? আমার আসলে ভীষণ...'

'না, না, আমি ঠিক জানি এতো দিনের ফার্স্টবয় তুই, মন দিয়ে লেখাপড়া করিস, ফাঁকি তো দিস না, তোর দুঃখ হয়েছে কি না তুই না বুঝলেও আমি বুঝি রে? মাত্র তো তিনটে নম্বর, পার হতে পারবি না!' এতো ভালোবাসতেন আমাকে মাসিমা।

মাসিমার প্রেরণাতেই আব কোনোদিন আমার সেকেন্ড হতে হয়নি। কিন্তু আমি তাতে খুশি হতে পারিনি। অমি ঠিক আমার পেছন-পেছন এসেছে। বরাবর। নয় কি দশ নম্বর পেছনে, যেন পা টিপে টিপে। এই ধরে ফেলল, এই ধরে ফেলল। কিন্তু ধরতে পারছে না। তাতে ওর কোনো বিকারও নেই। যতই বলি না কেন—'অমি, বাক আপ ম্যান, কেন পারছিস না? এরকম কমপিটিশন আমার ভালো লাগে না। আমার মাস্টারমশাইদের কাছে পড়।'

অমি নরম করে হাসে—'না পারলে কী করব বল গোপাল! আর কী-ই বা এসে যায় এতে।' সত্যিই ওর মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনেকক্ষণ বসে আছি। উঠলাম। জল খেলাম। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে 'টুকটুক, টুকটুক!'

শিবুদা এসে ধরল। এইসা ঝিঁঝিঁ ধরেছে যে নড়তে পারছি না। শিবুদা বলল, 'বাঁ পা দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এমনি করে চেপে ধরো।'

'দু পা-ই ধরে গেছে যে!'

শিবুদা তখন নীচু হয়ে আস্তে আস্তে পা মালিশ করে দিতে লাগল। একটু পরে ঝিনঝিনে হাসি শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি টুকটুক। হেসে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে।

বললাম, 'কী হল? শিবুদা তোমার পায়ে ধরে অত সাধছে কেন?'

পায়ে ধরতে যাবে কেন? আচ্ছা তো! ওই জন্যেই তো তোমাকে ডাকছিলাম, তা তোমার পাত্তা পেলে তো।

'কেন ডাকছিলে! পায়ে ধরে সাধতে? এরপর কি সকালবেলা বুড়ো আঙুল ধোয়া জল খেতেও ডাকবে?'—টুকটুকের হাসি বেড়েই যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ঝিঁঝিঁ ধরেছে প্রচণ্ড। কী যে বাজে কথা বল।'

'উঃ। কত ন্যাকামিই যে জানো!' টুকটুকের প্রস্থান। ওকে সাবধান করে দিতে হবে এই কথাটা ও যেন আর ব্যবহার না করে। আমার অ্যালার্জি হয়ে যাচ্ছে কথাটায়। টুকটুক যেন মনে না করে

ওকে যে আমি বিয়ে করেছি এটা একটা ফেরানো-যায়-না গোছের ব্যাপার। আজকালকার দিনে হতে পারে না। এটা ওর জানা উচিত। অমিকেও কয়েকদিন আগেই বলছিলাম, 'টুকটুকের বাইরের রূপ-গুণ দেখে আকৃষ্ট হওয়াটা বোকামি কি বল! ভেতরের মানুষটা ঠিক। ...'

অমি চুপ করে রইল। আমি হেসে বললাম, 'তুই আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অলটার ইগো বলতে গেলে। তুই এ বিষয়ে মতামত দিলে আমি কিছু মনে করব না।'

অমিত বলল—'না.....মানে.....ঠিক.......।'

'না...মানে...ঠিক...? তুই ইয়ার্কি পেয়েছিস! তুই নিজে ওর মধ্যে কী দেখেছিলি?'

অমিত বলল, 'দূর, তুই ও যেমন! ছাড় তো!'

ব্যাস। বিষয় পরিবর্তন। আর একটি কথাও ওকে দিয়ে বলাতে পারিনি।

অমি আমাদের বাড়ির একতলা ছাড়ল মাসিমার মৃত্যুর পর। সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। মনে করলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে। মানুষকে ক্ষমা করতে পারি না। মাসিমা কোনোদিন নিজেদের ঘরের সীমানার বাইরে পা বাড়াতেন না, কিন্তু আমার বাবা নানা প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যেই যেতেন। এই নিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী মহলে একটা চাপা গুজগুজ আরম্ভ হল। আমাদের তখন ফাইনাল ইয়ার। ঘটনা শুনে রাগে আগুন হয়ে গেলাম। আমারই মাথায় আগুন জ্বলছে,তা হলে ওদের না জানি কী হচ্ছে! ঘরে গিয়ে দেখি মাসিমা যেমন অবিশ্রান্ত সেলাই করে যান তেমনি করছেন, অমিত ছাত্র পড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অমিকে ঝাঁকিয়ে বললাম, 'তোর কী দেহে মাছের রক্ত, এইসব ঘটনা শুনেও তুই নির্বিবাদে ছাত্র পড়াতে যাচ্ছিস?'

মাসিমার মুখটা লাল হয়ে গেল। অমির মুখটা একেবারে নীলবর্ণ। আমি টেবিলে চাপড় মেরে বললাম। 'এইসব জঘন্য শয়তানির উচিত জবাব কী জানিস?—বাবার সঙ্গে মাসিমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া।'

মাসিমার সেলাই-কল দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি যেন একটা উদগত চিৎকার চাপলেন। অমিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'গোপাল তুমি বলছ কি, ছিঃ। এসব কথা চিন্তা করলেও ওদের নোংরা ধারণাকে মেনে নেওয়া হয়। বোঝ না?'

আমি বললাম, 'ভুল। ভুল। সমাজ চিরকাল একভাবে চলবে না অমিত, চলতে দেবো না, সমাজের মুখে থাবড়া দেব, এ আমি করেই ছাড়ব। আজই বাবাকে বলছি।'

অমিত বলল, 'হঠকারীর মতো কথা বোলো না, হঠকারীর মতো কাজ কোরো না। যাও তো এখন এখান থেকে, যাও।'

একরকম ঠেলে আমাকে নিজেরই বাড়ির ঘর থেকে বার করে দিল অমিত। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মা-ছেলের মধ্যে কী কথা হয়েছিল জানি না। পরদিন এক বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল। আমাদের পরমপূজ্য মাসিমার কুসুমকোমল শরীরটা সিলিং থেকে...।

অমিত ঘরের কোণে বসেছিল। আছড়ে পড়ে বললাম, 'এ কী করলেন মাসিমা, এ কী করলি অমি? কী বলেছিলি মাসিমাকে?...'

অমিত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মাসিমার শেষ কাজ হয়ে যাবার পর আমাকে বা বাবাকে একটা কথাও না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল অমিত। একদিন ভোররাতে উঠে শুধু দেখলাম, দালানে শ্বেতপাথরের টেবিলে সে মাসের ভাড়ার টাকাটা, ঘরের চাবিটা তলায় চাপা দেওয়া রয়েছে। একটা চিঠি না, কিচ্ছু না।

টুকটুক বলল, 'শুতে চলো। অনেক রাত হয়েছে।'

সত্যিই রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সত্যিই ঘুম আসছে না। সামনের জানলার পর্দা

সরানো দু-পাশে। চাঁদটা একেবারে ঠিক চোখের ওপর। টুকটুক বলল, একটা জিনিস করেছি, দেখবে?

এখন? এই এত রাতে?

ঘুমোচ্ছ না বলে বলছি।

টুকটুক উঠল, আলো জ্বালল, আলমারি খুলল। ভেতর থেকে দুটো প্যাকেট টেনে বের করল। একটা প্যাকেটে হাত-কাটা খুব সুন্দর একটা স্লিপোভার, ধবধবে সাদা। আর একটা প্যাকেটে ঠিক ওইরকম আরেকটা স্লিপোভার, কুচকুচে কালো।

টুকটুক বলল, 'তুমি ফর্সা. তোমাকে কালোটা মানাবে, আর তোমার বন্ধু কালো, ওকে সাদাটা...।'

হেসে বললাম, 'তোমার কালার ম্যাচিং সম্পর্কে ধারণা খুব পুরোনো টুকটুক। এখন সবাই জানে ফর্সা রঙে সাদা পরতে হয়। যাই হোক ওটা একটা ব্যাপারই না। বেশ সুন্দর হয়েছে।'

টুকটুক বলল, 'অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে এটা তোমার বন্ধুকে দিয়ে দিয়ো।'

'বাঃ, তুমি উপহার দিচ্ছ, তুমিই দেবে, আমি দিতে যাব কেন?' আমি পাশ ফিরে শুলাম। টুকটুক তা হলে এখনও অমির জন্য ভাবে। আশ্চর্য!

অমিকে সেবার খুঁজে বার করলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে। পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠল। বললাম, 'ভূত দেখলি নাকি?'

ফিকে হাসল। বললাম, 'ও বাড়িতে থাকতে আর না ই যাস। আমাকে তোর ঠিকানাটা অন্তত দে। আমি যে তোকে ছেড়ে খেতে শুতে পারি না, একথাটা তো এতদিনে জানিসই।'

ঠিকানাটা খসখস করে লিখে দিল। আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা মেসের ঠিকানা। এরপর আমাদের জীবন, আলাপ, অন্তরঙ্গতা সব একেবারেই লেখাপড়া-কেন্দ্রিক হয়ে উঠল। মাস্টারমশাইরা অর্থাৎ সায়েন্স কলেজের মাস্টারমশাইরা নিত্য আসতেন বাড়িতে। ওঁরা বলতেন কে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে আর কে যে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হবে বোঝা যাচ্ছে না। আমি বলতাম, 'অমিত হবে,' অমি বলত --'গোপাল হবে।' পাঁচ নম্বর, মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়ে গেল অমিত।

সেইজন্যেই মনোদুঃখে কী না জানি না অমি একটা চাকরি নিয়ে বসল। ভালো চাকরি, কিন্তু গবেষণার সুযোগ নেই। শুধু সেলস। অনেক বোঝালাম, শেষে ইনস্টিট্যুটে যোগ দিতে ও রাজি হল। তারপর আমাদের যুগ্ম গবেষক জীবনের শুরু। কী পরিশ্রম করছে অমি, আমি বুঝতে পারছি ও এবার কিছু করবে। করবেই। প্রাণপণে ওকে সাহায্য করে যাচ্ছি। ওর নির্দেশমতো চলছি। পেপার বার হচ্ছে আমাদের উভয়ের নামে। তারপর? তারপর ভাগ্যের সেই অদ্ভুত খেলা। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সেই আবিষ্কার যা অদ্ভুতভাবে শেষ পর্যন্ত আমার হাত দিয়েই হল। নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। রাতে সবাই চলে যাবার পর আবার গেলাম ল্যাবে। দারোয়ানকে দিয়ে চাবি খুলিয়ে, সারারাত কাজ করছি, খুঁজছি তারপর হঠাৎ আলোর ঝলক। পর দিন সকালে চতর্দিকে ছড়িয়ে গেল খবর। প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন ডক্টর বর্মা, আমি জোর করেছিলাম আমাদের দুজনের নামই থাক। অমি রাজি হল না। রিসার্চ ছাড়ল অমি। অবশ্য ছাড়ল বলা ঠিক না। চাকরি তো রিসার্চেরই। কিন্তু ওর সেইসব মূল্যবান গবেষণা তো আর ওর ব্যক্তিগত থাকবে না। অনেক বারণ করেছিলাম। কিছুতেই শুনল না। ওর নাকি টাকার দরকার। আমারও আর ভালো লাগল না। ছেড়ে দিলাম ইনস্টিটিউট। সেই সময়ে বাবা মারা গেলেন, আমাকে হাল ধরতে হল বাবার ব্যাবসার। মনে অশান্তি নিজের পছন্দমতো কাজ পাচ্ছি না। বাবার ইলেকট্রিক্যাল পার্টস-এর ব্যাবসা,

বাঁধা খদ্দের সরকার, কাজের মধ্যে রস পাই না। একদিন এসপ্লানেডে গাড়ি থেমে আছে ট্রাফিক সিগন্যালে, দেখলাম ওদের দুজনকে। অমি তখনও পুরনো মেস ছাড়েনি, বলে, 'বেশ তো আছি, নিজস্ব বাড়ি মানেই নানান ঝামেলা।' মনে মনে হাসলাম, ও এইজন্য তোমার টাকার দরকার। এইবার তুমি বাড়ির ঝামেলায় যাবে। গাড়ি ঘুরিয়ে তুলে নিলাম। পরিচয় হল। হেসে বললাম, 'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি কেন? আমার বাড়িটা কী তোর নয়?'

পরের রবিবারই ডাকলাম ওদের দুজনকে। আলোয় ফুলে ভরে দিলাম বাড়ি। ইনটিরিয়র ডেকোরেটর ডেকে ঘর সাজালাম। ওরা এল। সারাটা মুগ্ধ সম্মোহিত সন্ধ্যা খালি গান আর গল্প, গল্প আর ছবি, যেখানে যা ভালো খাদ্য আছে, অমি যা ভালোবাসে, যা ওর পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব—সবই জড়ো করেছিলাম।

চিকমিকে সব জরির ঝালর। টুংটাং ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে বড়ো বড়ো চোখ কপালে তুলে টুকটুক বলছিল, 'এত বড়ো, এত সুন্দর বাড়ি, এই বিশাল গাড়ি, এত সম্পদ সব আপনার একার?— কোনো দ্বিতীয় ভাগীদার নেই?'

আমি হেসে বলছিলাম, 'আর এইসব রোশনি, এই খুশবু, এই সমস্ত আপ্যায়ন আয়োজন আপনার। আপনার একার। কোনো ভাগীদার নেই।'

স্বপ্নালু চোখে টুকটুক বলছিল, 'কথা বলাও কি আপনি মাস্টারমশাই রেখে শিখেছিলেন?'

আমি বলছিলাম, 'চলতে ফিরতে হাসতে যদি আপনি মাস্টারমশাই রেখে শিখে না থাকেন, তা হলে কথা বলতে শিখতেও আমার মাস্টারের দরকার হয়নি।'

আমার বাড়ি ওদের জন্যে খোলা রইল। চাবি দিয়ে দিলাম একটা—অমির হাতে। অমি সেটা টুকটুকের হাতে চালান করে দিল।

দু-তিন দিন পর টুকটুক এল একা একা। অমি নাকি কাজে ব্যস্ত। আরও কয়েক দিন পর টুকটুক আবার এল একা, অমি ট্যুরে গেছে। আরও কয়েকদিন পর টুকটুক আমার দেওয়া চাবিটা ব্যবহার করল। অর্থাৎ আমি বাড়ি এসে দেখলাম টুকটুক—দালান আলো করে সোফায় এলিয়ে আছে। তারপর একদিন টুকটুক এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অমি নাকি বিয়ে করতে চাইছে না। —'প্রায় দু বছর এত মেলামেশার পর...আমি মুখ দেখাতে পারব না বাড়িতে', টুকটুক দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। অমির অফিসে গেলাম। খুব উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। ওর ঘরে আরও দুজন কর্মী বসে। গ্রাহ্য করলাম না। যা বলার বললাম। অমি বলল, 'আমি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করেছি, বিয়ে করব কথা দিইনি তো!'

'বাঃ চমৎকার। তুই যে এত বড়ো স্কাউন্ড্রেল তা আমার জানা ছিল না। কথা দিসনি তো ও ভাবল কী করে?' এই সময়ে সহকর্মী দুটি উঠে বাইরে চলে গেল।

অমিত মৃদু হেসে বলল, 'তাই তো? ভাবল কেন? আমার বাঁধা পড়বার ইচ্ছে নেই, কাজ অনেক কাজ, আচ্ছা গোপাল, দ্যাখ না ও যদি তোকে বিয়ে করতে রাজি হয়!'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ওকে যখন এভাবে পরিত্যাগ করেছ, তখন ও এরপর কাকে বিয়ে করতে রাজি হবে সে কথা ভেবে আর নাই মাথা ঘামালে!'

যাক্ গে, সে সব দিনও গত হয়ে গেছে। গত মাস কয়েক ধরেই আমার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আমার এই লোহা-লক্কড় আর ভালো লাগছে না, ওটা আছে থাক। ওষুধের ফ্যাক্টরি করব। অমি অনেক প্ল্যান-ট্যান ছকে দিল, এসবে ওর মাথা তো পরিষ্কার! আমি বললাম, 'তোকে কিন্তু আসতে হবে আমার সঙ্গে।'

কী ভাবে?

কেন? তুই ওয়ার্কিং পার্টনার, ল্যাবরেটরির ভার তোর ওপর।

অমিত যেন কী ভাবছে। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'দেখা যাক।'

তারপর কালকে ওই ঘোষণা। আগে থেকে কোনো খবর না, কিছু না। দুম করে—'কাল আমি মেলবোর্ন যাচ্ছি। হ্যাঁ ওখানেই চাকরি নিয়েছি। কবে ফিরব ঠিক নেই। খুব সম্ভব কোনোদিন না।'

ভোর হয়ে গেছে। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারিনি।

বলেছিলাম, 'আমার ওষুধের কারখানার কী হবে?'

'তুই একটা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডি এস সি বায়োকেমিস্ট গোপাল, তোর ভাবনা হওয়া উচিত নয়।' অমিত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

বোধহয় আধ ঘণ্টার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টুকটুক জাগিয়ে দিল। —'রেডি হবে না? প্লেন তো ন'টায়।'

ঠিক। তা তুমিও যাচ্ছো নাকি?

বাঃ, তুমিই তো বললে উপহার নাকি আমার নিজে গিয়ে দিতে হবে।

এই ফ্যান্সি ড্রেসটা পরেই?

টুকটুক গোঁয়ারের মতো বলল, 'হ্যাঁ।'

কালকের সেই রাজস্থানি পোশাকটা পরেছে ও, এটা পরলে ওকে রানা প্রতাপ সিংহের যুগের রাজপুতানি সুন্দরীদের মতো দেখায়। দারুণ সেজেছে টুকটুক। আপাদমস্তক রঙিন। ম্যাচিং গয়না ঝকমক করছে। পারফিউমের গন্ধে ঘর ভরে যাচ্ছে।

আমি উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। ইচ্ছে ছিল, অমির সঙ্গে দিল্লি পর্যন্ত গিয়ে সি-অফ করবার। কিন্তু এত দেরিতে খবরটা জানায় সেটা সম্ভব হল না। টুকটুকের হাতে মস্ত ব্যাগের মধ্যে প্যাকেট। আমি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম একবার। কিন্তু টুকটুকের ভুল হয়নি। খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ও কোনটা দিচ্ছে অমিকে। সাদাটা না কালোটা। ব্যাগ ফাঁক করে দেখাল টুকটুক। গোঁয়ারের মতো মুখ। সাদাটাই। ওই সাদাটার সুতোয় সুতোয় ও বোধকবি অমি সংক্রান্ত ভাবনাগুলো বুনে রেখেছে।

অমিটা স্টেট্‌স থেকে ঘুরে আসতে পারত। জার্মানি। ফ্রান্স কিংবা ইউ কে হলেও কিছু বলার ছিল না। ওর কোম্পানি না পাঠাক, আমি পাঠাতাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া! ওকি চিজ-রুটি, আর ভেড়ার মাংস, কিংবা ক্রিকেট-ট্রিকেটের লোভে অস্ট্রেলিয়া চলল নাকি? কথাটা মনে করে হাসি পেল আমার। কিন্তু এয়ারপোর্ট যতই এগিয়ে আসছে, হাসি মুছে যাচ্ছে, আমার মন থেকে। মুখ থেকে। অমি চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, আমি কেমন করে বাঁচব? আর দুজনে পাশাপাশি কাজ করতে পাব না। আর হবে না সেইসব আড্ডা, তর্ক, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেগুলো আমার জীবনে অপরিহার্য ছিল, আমার ধারণা অমিতের জীবনেও ছিল। এখন সে ধারণা আমি পরম অভিমানে পালটে নিতে বাধ্য হচ্ছি। একা একা অমি মেলবোর্ন চলল। এখনও ভীষণ মুখচোরা। প্রয়োজনের কথা কাউকে বলতে পারে না। বিদেশি শহরে ওর একাকিত্ব যেন আমার।

ওই তো অমি। লাউঞ্জে ঢুকেই দেখতে পেলাম অমি একটা দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সব ওর সহকর্মী সহকর্মিণী। আমাদের দেখতে পেয়ে হাসল। টুকটুক বলল, 'পালিয়ে যাচ্ছেন বেশ! বাঃ!'

অমি হেসে বলল, 'যঃ পলায়তি স জীবতি মিসেস সেন।' ওর অফিসের কলিগরা দেখলাম খুব বিচলিত, একটি অল্পবয়সি উৎসাহী ছেলে বলল, 'এখনও ভেবে দেখুন অমিতদা। আপনি না থাকলে আমাদের পুরো টিমটাই কানা হয়ে যাবে।'

অমি তার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কথাটা ঠিক বললে না অরূপ। কারো জন্য কিছু পড়ে থাকে না। নেচার অ্যাভর্স আ ভ্যাকুয়াম, জানো না!'

'যতই প্রবাদ প্রবচন বলুন, আমাদের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা হল যে স্থান একবার শূন্য হয় তা আর কখনও পোরে না।'

'বিশ্বাস করো এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না।' এই অবিশ্বাস্য কথাটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে অমি হঠাৎ একটি সহকর্মিণীর দিকে এগিয়ে গেল ; চলতে চলতে হঠাৎ পেছন ফিরে বলল, 'গোপাল, মিসেস সেন আলাপ করানো হয়নি। এই আমার স্ত্রী অর্পিতা।' মেয়েটি দু'হাত জড়ো করে ফিরে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলাম—এখন ভালো করে দেখলাম স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ বুদ্ধির শ্রী মেয়েটির মুখে। ঝকঝকে দাঁতে নির্মল হাসি। ধবধবে সাদা একটা দেশি সিল্ক পরেছে, ছোটো চুল পেছনে গোছা করে বাঁধা। তার পাশে কটকটে দিনের আলোয় টুকটুক যেন যাত্রাদলের রং মাখা সং।

আমাদের বিমূঢ় রেখে ওরা দুজন এগিয়ে গেল। এরোড্রোমের টারম্যাকের ওপর দিয়ে ওরা হাঁটছে। প্লেনের সিঁড়ি থেকে একবার হাত তুলে বিদায় জানাল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি ফিরে আসছে। প্লেন গতি নিল বলে।

পেছন ফিরে দেখি টুকটুক দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। অমি কবে বিয়ে করল? অস্ট্রেলিয়া যাবার ব্যবস্থার মতো বিয়ের ব্যাপারটাও চুপিচুপি সেরেছে। কেন? আমাকে জানায়নি কেন? কয়েকটা বিদ্যুৎ নির্মমভাবে ঝলকাচ্ছে। আমি অমিকে মেঘের মধ্যে একবার দেখতে পাচ্ছি, একবার পাচ্ছি না। ও কি আমাকে ভয় পেয়েছে? কেন? ও কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি? কত কাল? ও কি আমাকে কোনোদিনই...!

পৌত্তলিক

গাড়ি থেকে নেমে শুভব্রত টাইয়ের গিঁটটা আলগা করে নিল। এই এক গেরো। দেশটা গ্রীষ্মপ্রধান। কণ্ঠবন্ধনী-পরা সাহেবরা বিদায়ও নিয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। কিন্তু এই ভাদুরে গুমোটেও সিনিয়র এগজিকিউটিভকে সেই সাহেবদের বেঁধে দেওয়া নেংটিটি গলায় বাঁধতেই হবে। একেই বোধহয় বলে গলায় গামছা বেঁধে ধরে আনা। এদিকে সামনে লম্বা দুটো ঝুমঝুমি সাপ। একটি আপ একটি ডাউন, মাঝে মধ্যে আরও কিছু-কিছু ঢুকে পড়েছে। থেকে থেকেই হর্নের প্যাঁ পোঁ এবং বিষাক্ত নিশ্বাস। পেছন দিকে সেই ঝুমঝুমি সাপ বোধহয় কোনো বহুপুচ্ছ—পৌরাণিক সরীসৃপে পরিণত হয়েছে। স্ট্র্যান্ড রোড। কলকাতা শহরের বিখ্যাত জ্যাম। ফল-ফুলুরির জ্যামের থেকে এই জ্যাম এখানে অনেক সস্তায় মেলে। একেই অনেকে বাসে-ট্রামে 'জাম্প' বলে থাকেন। 'জাম্প'ই বটে। রামভক্ত বজরংবলির মতো একখানা জগঝম্প লাফ না দিলে এই জ্যাম থেকে উদ্ধার পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তারই মতো বহু অভাগা গাড়ি ট্যাক্সি-বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে সরীসৃপের খাঁজ খোঁদল পরীক্ষা করছে, যদি কোনো ফোকর দিয়ে কোনো ফিকিরে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ঘাড় আর গলার মধ্যে ঘাম আর ময়লা জমে কুটকুট করছে। রুমাল চালিয়ে বেশ খানিকটা হিউম্যান কাদা মুছে ফেলে দাগি রুমালটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুভব্রত।

শফার বলল, 'একটু হাওয়া খেয়ে উঠে পড়ুন স্যার। এখান থেকে নিউ আলিপুর তো আর হেঁটে যেতে পারবেন না। যখন জাম ছাড়বে, তখন যাবেন।'

না, হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। বছর কুড়ি আগে হলে দুর্গা বলে নেমে পড়া যেত। কিন্তু এখন আর হয় না। তা ছাড়া লাগেজ রয়েছে। সামান্য হলেও লাগেজ। এবং অফিসের কিছু জরুরি কাগজপত্তর। দিল্লি থেকে অনেক যত্নে সঙ্গে করে বয়ে আনা। লাস্ট মিনিটে পিএ গদাধর 'রাজধানী'র টিকিটটি হাতে ধরিয়ে দিল। আকাশের টিকিট মেলেনি। ট্রেনজার্নির সময়টুকু বাদে ঠিক দু'দিন হাতে। তারই মধ্যে নিজেদের অফিসের ব্রাঞ্চ, মার্কিন এমব্যাসি, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর। আগস্ট মাসের গরমে এই প্রাণান্তকর ছুটোছুটির পর স্ট্র্যান্ড রোডে কালো জাম। ড্রাইভার-কর্তৃক হেঁটে নিউআলিপুর যাবার প্রচ্ছন্ন পরামর্শ। স্বভাবটা আদৌ রাগি না হলেও শুভব্রতর গায়ের মধ্যে নানান জায়গায় কেমন চিড়বিড় করতে লাগল। একেই বোধহয় বলে গায়ের ঝাল! আচ্ছা একখানা জীবন! সেই ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে ফার্স্ট হতে হতে আসছে। প্রতি বছর ফার্স্ট প্রতি বছর দুশ্চিন্তা—পরের বছরও হবে তো! ক্লাসটিচার প্রোগ্রেস রিপোর্টটা হাতে তুলে দিয়ে চিৎকার করে বলতেন 'আসছে বছর...'। ছেলেরা সমস্বরে স্লোগান দিত 'আবার হবে।' সেই 'আবার হবে' এম-টেক অবধি গড়াল। গড়াবার মূল্যস্বরূপ গেল রাতের ঘুম, দিনের শান্তি। বন্ধুবান্ধব যখন হইহই করে আড্ডা মারছে, সিনেমা দেখছে, ফার্স্ট বয় তখন আসছে বছরের জন্যে মুখ গুঁজে টেবিলে। রাত-আলো ভোরের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ ডিগ্রিটার পরে দম ফেলতে না ফেলতেই পাঁচ হাজারি মনসবদার। তারপরেই গুরুজনেরা উলু-উলু করে গলায়

লটকে দিলেন একটি সালংকারা ঢুলুঢুলু চোখ সলজ্জ নায়িকা। নায়িকা খোলসা করে কিছু বলেন না, খালি আভাসে ইঙ্গিতে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে চলেন। একমাত্র ছেলেটাকে কোনোমতেই দার্জিলিং সেন্ট পলের কমে দেওয়া গেল না। মেয়েটাও মুসৌরি। বিয়ের পরে কাশ্মীরে হনিমুন ছিল। ডাল লেকে নারী জলের শোভা দেখতে দেখতে কণ্ঠলগ্না হচ্ছেন, অঙ্গে নিত্যনতুন কাশ্মীরি শাল, আর তুমি ভাবছ ট্রাভলার্স চেকগুলো তো ফুরিয়ে এল। আর কলকাতায় ফেরার পর দিনই সাইট দেখতে মধ্যপ্রদেশে পাড়ি দিতে হবে।

শুভব্রত সরকার একটা সাংঘাতিক সুখী মানুষ। বন্ধুদের ভাষায় 'লাকি গাই' সুন্দরী শান্ত স্বভাবা স্ত্রী। দুটি ছেলে মেয়ে পৃথিবীর যেখানে যা বিদ্যে আছে সব আয়ত্ত করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একটি বাবা, একটি মা। এখনও চোখ কান হাত-পা বজায় আছে। নীচের তলায় বিশ্বাসী কাজের লোকসহ বাস করছেন। আলাদাকে আলাদাও হল আবার যৌথকে যৌথও।রবিবার-রবিবার খাবার টেবিলে সবাই একত্র। অফিস-অতিথি না থাকলে। সকালে লাফ মেরে মেরে অফিস বেরোবার সময়ে দুর্গা নামও রোজ শোনা হচ্ছে মায়ের মুখে। খবরের কাগজের আবডাল থেকে বাবার 'সাবধানে চোলো', যেন শুভব্রত চলে! সে যে সদা সর্বদাই চালিত হচ্ছে, বাবা কী জেনেও জানেন না! সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চেন-রিঅ্যাকশন। একটা নিউট্রন গিয়ে আরেকটা নিউট্রনকে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে, সে আবার আরেকটাকে, এইভাবে চলল। জনগণের মঙ্গল হচ্ছে। বাড়ি হচ্ছে, গাড়ি হচ্ছে, শাড়ি, রকমারি পোশাক, বিউটি পার্লার এয়ারকুলার, অ্যাক্রিলিক পেন্ট, ভি সি আর সব হচ্ছে। তোমার কী হচ্ছে? তুমি মানুষটি আসলে আর মানুষ নেই। নিজেই জানো না। জাপানি রোবটে পরিণত হয়েছ। তোমার সুখ বলতে চায়ের রংটা ঠিক হয়েছে কি না, শান্তি বলতে ভেড়া গুনতে গুনতে রাত আড়াইটের ঘুম এল কি না, আহ্লাদ বলতে এক পাত্র মদিরার কৃত্রিম স্নায়বিক উত্তেজনা।

মাসকয়েক আগে স্কুলের বন্ধু নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে ও এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ছুটোছুটির মাঝখানে। বলল, 'চল না—একটু কফি হাউসে বসা যাক।' মাস্টারমশাইদের স্ট্রাইকে লাগাতার ছুটি। তোমার আর কী শালা। এদিকে আমি শুভব্রত সরকার আসলে আমার ওপর আলাদের বাজার সরকার। 'সময় নেই' শুনে নিখিলেশ বলল, 'খাসা আছিস সত্যি।' বলতে বলতে সিগারেটের প্যাকেটে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে মহা-আনন্দে কফি হাউসের দিকে চলে গেল। সময় না থাকাটা যে কী করে খাসা থাকার লক্ষণ হতে পারে শুভব্রতর মাথায় আদৌ আসে না। সিগারেটের প্যাকেটে টোকা দিতে দিতে কফি হাউসের দিকে চলে যাওয়াটা, যেতে পারাটা বরং তার কাছে ঈর্ষণীয় সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে হয়।

'আরে, শুভ না?' সামনে দাঁড়িয়ে কালো দাড়ি-অলা ফর্সা রং হাফ-পাঞ্জাবি পরা এক হৃষ্টপুষ্ট সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক যাঁকে শুভব্রত কস্মিনকালেও দেখেনি। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অগত্যা সে আমতা আমতা করল, 'আপনাকে তো ঠিক...'

হাসিমুখে ভদ্রলোক নিজের দাড়িটা চেপে ধরে উজ্জ্বল চোখে শুভব্রতর দিকে চেয়ে রইলেন।

'আরে তাই বল, চিত্ত? জব্বর দাড়ি রেখেছিস তো?' শুভব্রত এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল।

দাড়িতে মুখের চেহারা কীভাবে পালটে দেয় দ্যাখ, সাধে কি আর ক্রিমিন্যালরা দাড়ি রাখে? তা তুই এখানে কোত্থেকে?

'গঙ্গায় চান করে ফিরছি!' ইঙ্গিতে চিত্ত হাতের পুঁটলিটা দেখাল।

'গঙ্গাচ্চান, এই সন্ধেবেলায়?' শুভব্রতর মুখ হাঁ।

চিত্ত হেসে বলল, 'মুখটা বুজিয়ে ফেল, আরশুলো ঢুকে যাবে, তুই জ্যামে পড়ে গেছিস মনে হচ্ছে!'

গাড়িটার দিকে হাত দেখিয়ে শুভব্রত বলল, 'তাই তো দেখা যাচ্ছে!'

নটা সাড়ে নটার আগে এ জ্যাম ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না রে? কোত্থেকে আসছিস?

আরে দিল্লি থেকে। গাড়ি স্টেশনে নিতে গিয়েছিল, তারপর এই।

বলিস কী? তুই ট্রেন-জার্নি করে এসে এইভাবে জাঁতাকলে পড়ে আছিস? আয়, আয়, আমার সঙ্গে আয়। তোর কি নিজের গাড়ি না কোম্পানির?

'ওই হল।'—শুভব্রত বলল।

ছেড়ে দে। চলে যেতে বল সময় মতো। তোর লাগেজও যাক। তুই আমার বাড়িতে একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করে যাবি এখন।

কোথায় তোর বাড়ি?

আরে এই তো কাছেই, হ্যারিসন রোড ধরে যাব, চিৎপুরের কাছে। একটা রিকশা নিয়ে নেব এখন, আয় তো!

শুভব্রত এক মুহূর্ত চিন্তা করল। প্রচণ্ড রকম ডায়াবিটিক শরীর। ঝিমঝিম করছে এখন। প্রেশারও আছে। সত্যি-সত্যিই পারা যাচ্ছে না।

ড্রাইভার মদন পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। শুভব্রত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী মদন? আমি তা হলে চলেই যাই! তুমি লাগেজ পৌঁছে দিও।'

মদন বলল, 'ঠিক আছে সার। ঠিকানাটা বলে দিন। জ্যাম ছাড়লে আমি একবার ট্রাই করতেও পারি।'

তার আর দরকার হবে না। শুধু শুধু আবার একগাদা ঘুরতে হবে তোমায়। তুমি চলে যেও।

দরকারি কাগজের ব্রিফকেসটা শুধু হাতে তুলে নিয়ে শুভব্রত চিত্তকে বলল, 'চল।'

চিত্তর মুখটা দেখে মনে হল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর হাত থেকে ব্রিফকেসটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে সে স্ট্র্যান্ড রোড পার হয়ে একটা রিকশা ধরলে। রিকশাওলা দেখা গেল ওকে চেনে। রাস্তা পার হতে না হতেই ঠুনঠুন করতে করতে এগিয়ে এল। মুখে কৃতকৃতার্থের হাসি। জ্যামের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে যেতে কোনো আপত্তিই নেই।

রিকশায় উঠতে উঠতে শুভব্রত বলল, 'মানুষের কাঁধে চড়তে আমার কেমন ইয়ে লাগে রে চিত্ত!'

চিত্ত হেসে ফেলে বলল, 'মানুষের কাঁধে তো মানুষই চড়ছে রে বাবা, যন্ত্র তো আর চড়েনি! নে, তোদের এই পুতুপুতু ভাবটা ছাড় তো। যে সিস্টেম আছে ওরা এই করেই তো ওদের খেতে হবে। তুই না চড়লে আবেক জন চড়বে। তোর চেয়েও মোটা। ওর আরও কষ্ট হবে তখন। তা ছাড়া একটা গরিব মানুষের সম্মানের রোজগারে তোর অবদানটুকু থাকবে না!'

সবই জানি, তবু...

'সবই যদি জানিস তো আর দ্বিধা করিসনি। কেমন সুন্দর ফুরফুরিয়ে হাওয়া দিচ্ছে দেখ তো! রিকশায় উঠলে যেমন হাওয়া পাওয়া যায় অন্য কোনো যানে তেমন যায়? আর দ্যাখ দৌড়োনোর কায়দাটা। লোকনৃত্য করছে না রিকশা চালাচ্ছে বোঝা যায়! সাক্ষাৎ নটরাজ মহাদেবের শিষ্য সব।'—চিত্ত সামান্য একটু ঝুঁকে বসল।

রিকশাওলা চলছে। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের পিস্টনের মতো তার কনুই দুটো তালে তালে সামনে পেছনে সামনে পেছনে সরছে। ঘাম চকচক করছে। ফুলে ফুলে উঠছে পেশিগুলো।

চিত্ত বলল, 'দেখেছিস? দেখেছিস? অপূর্ব না? ভাস্করদের সাবজেক্ট রে। আমাদের মেঠো চোখ আর কী দেখছে!'

শুভব্রত হেসে বলল, 'তুই এখনও তেমনি পাগলা আছিস চিত্ত। আঁকিস-টাকিস আজকাল?'

চিত্ত কিছু বলল না। হাসিমুখে চুপ করে রইল।

কতকগুলো জিনিস মানুষ কখনই ভোলে না। কেমন করে কে জানে ঠিক স্মৃতিতে থেকে যায়। চিত্তর পাশাপাশি চলতে চলতে সেই কথাগুলো এখন এমন জীবন্তভাবে মনে পড়ল শুভব্রতর যেন গঙ্গার পুলের তলা দিয়ে পঁচিশ বছরের জল গড়িয়ে যায়নি।

চিত্তটা অঙ্কর খাতায় সব সময়ে একটা কাঁটালি চাঁপা ফুল রেখে দিত। খানিকটা করে অঙ্ক কষবে আর ফুলের গন্ধ শুঁকবে। জিজ্ঞেস করলে বলত, 'বুদ্ধির গোড়ায় ফুলের গন্ধ দিচ্ছি। আঁকগুলো কীরকম সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে দ্যাখ না।'

সত্যিই! জিওমেট্রিতে এঁটে উঠতে পারত না বলেই চিত্তটা শুভব্রতর থেকে কম নম্বর পেত অঙ্কে। আঁকার সুযোগ পেলেই ও নানারকম কারিকুরি করবে। করবেই। ডায়াগ্রামের চারপাশে শেড দেবে। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা। তলার লেখাগুলো সব বাহারি। প্রত্যেকবার অঙ্কের মাস্টারমশাই ওর কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবেন বেঞ্চে। তবুও ও করবেই। তা ছাড়া যা দেখবে তাই আঁকবে। ক্লাসঘরের জানলার পাটে বসে একটা দাঁড়কাক বিশ্রী স্বরে ক্ব ক্ব করত। তাকে সুদ্ধু এঁকে ফেলল ঠোঁটের ভেতরকার লাল সমেত। তার সেই ঘাড় বাঁকানো ভঙ্গিতে একচোখো তাকানো দেখে ক্লাসসুদ্ধ ছেলের কী হাসি!

চিত্ত বলল, 'নাম। দে ব্রিফকেসটা আমার হাতে দে তো।' তড়াক করে অনায়াসে নেমেছে ও। শুভব্রতর একটু কষ্ট হয়। প্রথমত অনভ্যাস, দ্বিতীয়ত ভুঁড়িটা ঘনত্বে, বেড়ে গেছে বেশ, তৃতীয়ত হাঁটুতে আজকাল একটা খচখচে ব্যথা হচ্ছে।

সরু গলির মধ্যে হলেও চিত্তর বাড়িটা দেখা গেল খুব প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। এসব অঞ্চলের রাস্তাঘাট যে রকম একটা ঘিনঘিনে নোংরা হয় সেরকম নয় মোটেই। বেশ বড়ো উঠোন তার চারদিক ঘিরে রোয়াক। উঠোনময় প্রচুর টবে ফুলগাছ। প্রত্যেকটা টব চকচক করছে। শুভব্রত চিত্তর বাড়িতে ঢুকেই যেন একটা ডুব দিল। দু-হাতে জল সরিয়ে সরিয়ে, জল সরিয়ে সরিয়ে ঝপাৎ করে ডুব। সময়ের লহরিমালার অভ্যন্তরে কোথাও বুঝি মানুষের জীবনের পুরোনো সময় টিকে থাকে। আসলে ওরা দুজনেই এক গ্রামের ছেলে। শহরতলির গ্রাম। শুভব্রতদের ছেলেবেলায় সেসব গ্রাম খুব এঁচড়ে পক্ক হয়ে ওঠেনি। সারা গ্রীষ্ম রোদ্দুরের গন্ধ, জ্বলন্ত আকাশের গন্ধ ঠান্ডা জলের গন্ধ আর ফুলের গন্ধে টইটম্বুর হয়ে থাকত সেই শহরতলির গ্রাম। সিনেমার পোস্টার, ফিলমি গানের ঘেয়ো কুকুর তখনও তার সর্বাঙ্গে চাটেনি। সেইসব ফুলের গন্ধ চিত্ত তার উঠোনে কোনো আশ্চর্য জাদুতে জিইয়ে রেখেছে। শুভব্রত মেশিন পার্টস চিনেছে চিরকাল, ফুল-টুল অত চেনেনি, বিশেষত দেশি ফুল। কিন্তু ফুলের গন্ধ তার সমস্ত চেতনা ছেয়ে আছে।

'জুতোটা এখানে খোল শুভ, দাঁড়া একটা টুল এনে দিই'...চিত্তর গলার স্বরে সে চমকে উঠল।

রোয়াকের এক কোণে জুতো আর মোজা খুলে ঘরে ঢুকল শুভ। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার চমকে উঠল। চিত্তর ঘরের দেয়ালে দেয়ালে কুলুঙ্গি খুপরি, কাঠের তাক, এবং সর্বত্র পুতুল। ঘরটা ধূপের ধোঁয়ায় আবছায়া, বাইরের ফুলের গন্ধ এখানে চার দেয়ালের মধ্যে আরও প্রবল। ফুলদানিতে, গেলাসে, বোতলে, রেকাবিতে সর্বত্র ফুল। একটা নীচু তক্তপোশে তাকে বসিয়ে চিত্ত বলল, 'দাঁড়া আসছি। সিগারেট খাসনি ভাই প্লিজ।'

সিগারেট খাওয়ার অবশ্য কোনো প্রশ্নই নেই। ডায়াবিটিসের সঙ্গে হাই প্রেশার। ডাক্তার একদম

ত্যাগ করতে বলেছেন। তবে ধীরে। এখন দু-বেলায় দুটো এসে দাঁড়িয়েছে। খাওয়ার পর একটা করে ধরায়। ওই ধরানোই। কিং সাইজ সিগারেট আঙুলের ফাঁকেই ছাইয়ের স্তম্ভ হতে থাকে। দু-একটা টান দেয় কী না দেয়। ঘরে ঢুকল চিত্ত এক হাতে থালায় প্রচুর খাবার, আরেক হাতে চা। বলল, 'ওই টুলটা টেনে নে না ভাই!'

শুভব্রত বলল, 'খিদে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এত খাবই বা কী করে আর জোগাড়ই বা করলি কোথা থেকে? তুই একা না দোকা তা-ই তো এখনও বুঝতে পারলুম না রে!'

চিত্ত হেসে বলল, 'খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিবি, ফুরিয়ে গেল। মেয়েদের মতো তা না না করিসনি তো! এই সব লুচি আলুবদম ঘুগনি সব আমার দিদির হাতে করা, দোকানের নয় একটাও। তা ছাড়া স-ব ঠাকুরের ভোগ। খা।'

'ঠাকুরের ভোগ? কী ব্যাপার বল তো?'

চিত্ত হাতটাতে ঘরের চারদিকে ঘুরিয়ে এনে বলল, 'এই তো সব ঠাকুর। আমরা যা কিছু খাই, খাওয়াই স-বই দেবতার ভোগ রে শুভ. আলুটালু কিছুই খেতে দ্বিধা করিসনি।'

শুভব্রত বলল, 'বলিস কী? আমি এক্ষুনি ভাবছিলুম এত পুতুল তুই জোগাড় করলি কোত্থেকে! এসব শখ তো মেয়েদের থাকে বলেই জানতুম।'

চিত্ত রহস্যের হাসি হেসে বলল, 'পুতুলই বটে! মিথ্যে কিছু বলিসনি। আর শখের কথা বলছিস! দু-চারটে আমার কিংবা দিদির কেনা। ব্যস।'

বাকিগুলো? সব গিফ্‌ট?

চিত্ত বলল, 'ধর যদি রাস্তায় একটা ছোট্ট অনাথ ছেলে এসে তোকে আশ্রয়ের জন্যে ধরে, আর ধর তোর সংসার বলতেও কিছু নেই, অভাব বলতেও কিছু নেই। তুই কী করবি শুভ?'

'কী আর করব, ভাগিয়ে দোব।' চিত্তর কথাবার্তা বেশ অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল শুভব্রতর।

কিন্তু তার পরেও যদি দেখিস ছেলেটা ঠিক তোর বাড়ি চিনে চিনে এসে হাজির হয়েছে আর জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে সেরে ফেলে শুধু তোর একটু মায়া-মমতার আশা করে রয়েছে, তবে?

তা হলে তাকে রাখা যায় বটে। ছোটো ছেলে, সুতরাং কর্পোরেশন স্কুলে লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থাও করে দেওয়া যায়।

চিত্ত অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ঠিক। আমিও ঠিক তাই-ই করেছিলুম রে। মাইনে তো নিলই না। স্কুলেও গেল না। যাবার কোনো দরকারও ছিল না।'

'ব্যাপারখানা কী খুলে বল তো।' শুভব্রত লুচিতে কামড় দিয়ে বলল, তারপরেই বলে উঠল, 'তোর দিদির রান্না বললি না! এটা কি প্রিপেয়ারেশন রে? অদ্ভুত ভালো খেতে তো!'

চিত্ত বলল, 'ভোগ অমনিই খেতে হয় রে শুভ। দিদির বাহাদুরি সামান্যই।'

আনমনার মতো হেঁটে হেঁটে চিত্ত ঘরের মাঝখানে একটা কুলুঙ্গির দিকে চলে গেল। কুলুঙ্গিতে একটা কৃষ্ণমূর্তি, নীলচে রং, হাতে বাঁশি। একলা মূর্তি। রাখালবেশী বালক কৃষ্ণ।

'চমৎকার না?' চিত্ত বলল, 'এরকম মূর্তি কখনও দেখেছিস?'

শুভ বলল, 'পুতুলটা খুবই সুন্দর, সত্যিই। কৃষ্ণনগরের নাকি রে?'

'ঠিকই ধরেছিস।' চিত্ত বলল, 'বছর দশেক আগেকার কথা, কেষ্টনগর বেড়াতে গেছি। ঘূর্ণিতে গিয়ে অনেক কিছুর মধ্যে এই মূর্তিটা খুব পছন্দ হয়ে গেল । সঙ্গে ছিলেন তেজেশবাবু আমার এক সহকর্মী। তখন পাকপাড়ার একটা স্কুলে কাজ করতুম। ভদ্রলোক ফিজিক্সের লোক, বললেন,

কিনছেন তো অন্য জিনিস কিনুন, পুরনো সংস্কারের ওই সব ভূতগুলোকে আর কিনবেন না চিত্তবাবু। বরং ওই টিকটিকি জোড়া কিনুন। আসলের থেকে তফাত করতে পারবেন? আমি বললুম, আমার ঘরের দেয়ালে টিকটিকির অভাব নেই তেজেশদা। এ পুতুলটা আমার চমৎকার লাগছে। তা আমার গরজ দেখে লোকটা একটা সৃষ্টিছাড়া দাম হেঁকে বসল। রাগ করে চলে এলুম। কলকাতায় ফিরে ভিড়ের মধ্যে দেখি একটা বছর দশ বারোর ছেলে আমার পেছু ধরেছে—বাবু তোমার মোটটা আমায় দাও না। যত বলি মোট কোথায় যে দেব। থাকার মধ্যে তো খালি একটা ব্যাগ বা ঝোলা যা বলিস। 'ওইটেই নোব।' ভাবলুম বোধহয় খুব অভাব, পয়সাটা পেলে ওর উপকার হয়। দিলুম ব্যাগটা। নে বাবা, ব'। সেদিনও এমনি জ্যাম। সারাটা পথ হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি। পয়সা দিতে গেলুম, নিল না। বললে, 'দুটি দুধ-ভাত দেবে?' দিদি খেতে দিল ভালো করেই। নিঃসন্তান বিধবা। বাচ্চা ছেলেমেয়ের ওপর একটু অতিরিক্ত মমতাই। তা সেই থেকে ছেলেটা দিদির মন ভিজিয়ে বাড়িতে থেকে গেল। পায়ের কাছে চকচকে জুতো। হাতের কাছে জামা। দিদি কলঘরে থাকতে থাকতেই অর্ধেক রান্না সেরে ফেলে। এদিকে একদম ভদ্রলোকের ছেলের মতো কথাবার্তা টানটোন। দিদিতে আমাতে ঠিক করলুম ছেলেটাকে মানুষ করব। সব ব্যবস্থা করে ফেলে বললুম, কী রে কেষ্টা, তোর তো খুব মাথা। স্কুলে ভরতি করে দিয়ে আসি চল। কী বলল জানিস?—'ক দিন পরেই তো বুড়ো হব, তার পরেই পট করে মরে যাব। তোমার ইস্কুল শেখাতে পারবে কী করে বুড়ো টুড়ো না হয়ে যতদিন ইচ্ছে বেঁচে থাকা যায়? নইলে লেখাপড়া শিখে সেগুলো কাজে লাগাতে না লাগাতেই তো মরে যাব! পাকা পাকা কথা শুনে আমরা ভাইবোন তো হাঁ। পর দিন সকাল থেকেই ছেলেটাকে আর খুঁজে পেলুম না। দিদির সন্দেহ হয়নি। আমার তো পাপ মন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে দেখছি কিছু হারিয়েছে কিনা। যে ঝোলা নিয়ে কেষ্টনগর গিয়েছিলুম সেই ঝোলার ভেতরে দেখি সেই কেষ্টনগরের কৃষ্ণমূর্তি। কী বলব শুভ—এই দ্যাখ আমার গায়ে এখন কাঁটা দিচ্ছে।'

শুভব্রতর একবার মনে হল গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে চিত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ও থেমে গেল। তন্ময় দৃষ্টিতে সে কৃষ্ণমূর্তিটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

শুভ বলল, 'ছেলেটা নিশ্চয় পড়ার ভয়ে পালিয়েছে। হয়তো ঘূর্ণি থেকে মূর্তিটা সরিয়ে তোর পেছু নিয়েছিল, অনাথ-টনাথ হবে। তা সেই থেকেই কি তুই ঠাকুরের মূর্তি জোগাড় করে চলেছিস?'

চিত্ত বলল, 'না রে শুভ, একটা মূর্তিও আমি জোগাড় করিনি।'

তবে? এই যে তোর দুর্গা, কালী, নটরাজ, সরস্বতী, লক্ষ্মী—এটা কী?

গঙ্গা। মকরবাহিনী, দেখছিস না?

এসব তুই জোগাড় করিসনি?

তুই হরিদ্বারে গেছিস?

'একবার গিয়েছিলুম বটে,' শুভব্রত বলল।

'তুই গিয়ে কী দেখেছিলি জানি না, আমি তো গঙ্গার ঘোলা জল আর গুচ্ছের কুষ্ঠরুগি দেখে দারুণ হতাশ। গঙ্গার ধারেই একটা ধর্মশালায় উঠেছি, দাদা-বউদির হোটেলে দু বেলা ভাত খাই। আর কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে গিয়ে বসে থাকি। কী রে বোর হচ্ছিস না তো?'—চিত্ত হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল।

শুভব্রত তখন প্লেটের খাবারের একেবারে শেষাংশটুকু আনমনে চাটছে। কতদিন খেতে বসে আঙুল চাটা, থালা-চাঁছা হয় না। এ-ও ছেলেবেলার এক লুপ্ত স্মৃতি। লুব্ধতার স্মৃতি। যে লুব্ধতা এখন অসভ্যতার নামান্তর। সে বলল—তুই বলে যা চিত্ত আমি ঠিক শুনে যাচ্ছি।

চিত্ত বলল, 'একদিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছি। দারুণ ফর্সা একজন গাড়োয়ালি যোগিনী মতো গঙ্গার ধারে বসে জপ করছে দেখি, ব্রিজটার ঠিক মুখে, আমাকে দেখে বলল, 'এ বেটা উধর মাৎ যাও। ইধর যাকে গঙ্গাজিকি মন্দির মে পূজা চড়াও!' গলায় যেন খানিকটা আদেশের সুর। সত্যি দিন তিন-চার হয়ে গেল এসেছি। গঙ্গামন্দিরের দিকে যাই-ই নি। মহিলা ঝুলি থেকে বার করে ওই মূর্তিটা দিলে, ভালো লাগল মূর্তিটা, দাম জিজ্ঞেস করলুম, বললে, 'মন্দির সে ওয়াপস আ যাও, পৈসা লে লুঙ্গি।' তো ঠিক আছে। গঙ্গামন্দিরে গিয়ে পূজো চড়াব কি মূর্তি দেখে আমি অবাক, অবিকল সেই যোগিনী, ফেরবার পথে মহিলাকে আর দেখতে পাইনি। যে ক-দিন ছিলুম হরিদ্বার চষে ফেলেছি। একদম বাতাসে মিলিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।'

শুভব্রত হেসে বলল, 'তুই কি সিদ্ধি-টিদ্ধি খাস না কি বল তো? বরাবরই তুই ছিটে পাগলা। কিন্তু এসব রোগ তো তোর ছিল না?'

চিত্ত হাসিমুখে বলল, 'নাই বা শুনলি এসব গুলগপ্পো। ছেলেবেলাকার মতো আড্ডা মারি আয়।'

শুভব্রত নিজের মনের ভেতর খানিক হাতড়ে বলল, 'প্রোফেশন্যাল টক করে করে ব্রেনের ভেতরটা কী রকম ইয়ে হয়ে গেছে রে চিত্ত। তুই শুরু কর। তুই আজকাল করছিসটা কী? সেই পাকপাড়ার স্কুল?'

ছেলেবেলায় যা করতুম তাই। পাক পাড়ার ইস্কুলেও তাই। এখানেও তাই।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আঁক কষছি।

মাস্টারি-ই?

না রে, এক ব্যাবসাদারের গদিতে হিসেবনিকেশ করি।

বড়বাজারি নাকি রে?

হ্যাঁ ; কেন বল তো?

ওরা তো সাবর্ডিনেটদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। শুনেছি চাকরবাকরের মতো দেখে! মনে করিসনি কিছু।

না, মনে কবব কেন? তুই তো ঠিকই বলেছিস। করত। আমার মনিবও করত। এখন আর করে না। আমার সঙ্গে তো নয়ই। অন্য কোনো কর্মচারীর সঙ্গেও না।

'আগে করত। এখন করে না?' শুভব্রত অবাক হয়ে বলল। একটু থেমে ও আবার বলল, 'খুব ঝেড়ে দিয়েছিলি বুঝি? বেশ করেছিস। এই তো চাই। চিত্ত তোর গায়েব জোরও তো কম ছিল না রে, তেঁতুলবাগানের কুস্তির কথা মনে আছে? সেই গোবরবাবুর ফটো সামনে রেখে একলব্যের মতো...?'

চিত্ত হাসতে হাসতে বলল, 'তুই তো কিছুই ভুলিসনি দেখছি।'

শুভব্রত বলল, 'এত যে আমার মনে আছে তাই-ই জানতুম না। ওঃ, সে একখানা সিন করেছিলি তুই, এক-একজন আসছে আর বলছিস, 'উঠাকে পটাক দেগা!' বাপ্‌স্ রে। কতজনকে কাত করেছিলি বল তো?'

জনা চার-পাঁচ হবে। ও কিছু নয়। আসলে ওগুলো ছিল কাপুরুষ। না হলে নিরীহ মাস্টারমশাইকে অপমান করে?

কী করেছিল বল তো?

দূর দূর ওসব ছাড়।

তা তোর মনিবকেও কি ওই রকম পটকে দিয়েছিলি নাকি!

'দূর দূর তাও কখনও কেউ করে?' চিত্ত হাত নেড়ে বন্ধুর কথা একদম উড়িয়ে দিল।

এই সময়ে বাইরে থেকে একটা হাঁক শোনা গেল, 'বাবুজি! চিতরঞ্জন ভাইয়া!'

চিত্ত তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। শুভব্রত দেখল রোয়াকের ওপর উঠে আসছেন ফিনফিনে মিলের ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা দুধে ঘিয়ে অতিরিক্ত পুষ্ট ধবধবে ফর্সা এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। পেছনে একটি চাকরশ্রেণির লোক। তার হাতে খুঞ্চিপোশ ঢাকা মস্ত থালা। উঠতে উঠতে ভদ্রলোক বললেন, 'কেতোবার বলিয়েছি চিতজি হামাকে আপনি শিউরতনভাই বলবেন, তো হামি এতো পাপতাপ করিয়েসে যে একঠো বাত রাখতে পারলেন না।'

চিত্ত বলল, 'আগরওয়ালজি আপনি তো বয়সেও আমার থেকে বড়ো। এতদিনের অভ্যাস কী করে ছাড়ি বলুন তো?'

হাঁ উমর, উমর। কেতো উমর হামার? চিত্‌জি পিছলে পিছলের সোব জনম হিসাব করেন, জরুর দেখবেন আপনি হামার থেকে বোরো আছেন।

শিউরতনবাবু জুতো খুলে উঠলেন। সঙ্গের লোকটি খালি পায়ে এসেছিল, চিত্ত বালতি থেকে মগে করে তার পায়ে জল ঢেলে দিতে লাগল। শুভব্রতর দিকে লাজুক দৃষ্টিতে চেয়ে শিউরতনবাবু বললেন, 'দেখছেন তো। এ চিতজি বিলকুল পাগলা আদমি আছেন। নোকর উকর কুচ্ছু মানবেন না।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে লোকটির হাত থেকে বিশাল থালাটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন শিউরতনবাবু। বাঁ দিকে একটি তাকের সামনে চলে গেলেন, খুঞ্চিপোশের ঢাকা খুলতেই এক শতাব্দী আগেকার গাওয়া ঘি-এর গন্ধে ঘর ম ম করে উঠল। আড়চোখে চেয়ে শুভব্রত দেখল থালাটি রুপোর, তার ওপর পুরি, কচুরি, লাড্ডু, রাবড়ি ; এবং আরও নানারকম বস্তু বাটিতে বাটিতে সাজানো। তাকে গণেশের একটি ছোট্ট মূর্তি। এক বিঘৎ মতো। মাটির ওপর শিউরতনের লোক বোধহয় গঙ্গাজলের আছড়া দিল, তিনি থালা নামিয়ে রেখে ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন। চিত্ত ইশারা করল। শুভব্রত তার সঙ্গে বাইরে চলে এল। কিছুক্ষণ পর শিউরতনও বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দশ মিনিট চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ 'জয় রামজি, জয় বজরংবলি, জয় গণেশজি' বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। পেছন পেছন চিত্ত ও শুভব্রত।

হুমড়ি খেয়ে থালাটায় কী দেখছেন শিউরতন। হঠাৎ আবার 'জয় বজরংবলি' বলে হুংকার দিয়ে উঠলেন।

'কী হল?' শুভব্রত নিজের অজান্তেই বলে উঠেছে।

গণেশজি কী কিরপা মিল গয়া।

চিত্ত প্রশান্তমুখে বলল, 'ঠাকুর দৃষ্টিভোগ করেন আগরওয়ালজি। আপনাকে আমি আজও বোঝাতে পারলুম না।'

'আরে চিতজি। দৃষ্টিভোগ তো জরুর করেন। কিরপা কি লিয়ে কচৌড়ি, মিঠাই, খান ভি কভি কভি। দেখিয়ে লিন লাড্ডু সে, জিলাবি সে কুছু কুছু সেবা করিয়েসেন।'

শ্যেন দৃষ্টি মেলেও লাড্ডু বা জিলাবির মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখতে পেল না শুভব্রত। শিউরতনের মতে লাড্ডুর ওপর বড়ো বড়ো বাদামের টুকরো ছিল ন-টি তিনি স্পষ্ট দেখেছেন এখন আট টুকরো আছে।

ততক্ষণে শিউরতনের লোকটি ভেতর থেকে একটি থালা নিয়ে এসেছে। শিউরতন তার ওপর তুলে দিচ্ছেন কচুরি, লাড্ডু মতিচুর রাবড়ি।

চিত্ত অধৈর্য হয়ে বলল, 'শিউরতনজি আপনাকে কতবার বলেছি প্রসাদ কণিকামাত্রই যথেষ্ট, কেন আপনি এইভাবে...'

হঠাৎ শিউরতন হুড়মুড়িয়ে চিত্তর পায়ে পড়ে গেলেন। গদগদ স্বরে বললেন, 'বজরংবলির কিরপা মিলল গণেশজির কিরপা মিলল, চিতজি আপনার কিরপা মিলল না এখনও।'

'করছেন কী করছেন কী ভাইয়া, ইস উঠুন।'

সত্যি-সত্যি সজল চোখে উঠে দাঁড়ালেন শিউরতন। 'বাস আপ নে মু সে ভাই বোলা, তো কিরপা আধা মিলই গয়া।'

ভদ্রলোক নোকরের হাতে থালাটি তুলে দিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনিই ফিরে গেলেন।

শুভব্রত বলল, 'কী ব্যাপার রে, চিত্ত? এ যে দেখি রীতিমতো নাটক?'

চিত্ত নিশ্বাস ফেলে বলল, 'উনিই আমার মনিব, তোরা যাকে বলিস বস্। নানারকম ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস এর এজেন্সি, তা ছাড়াও কাপড়ের দোকান, উলের স্টকিস্ট। আমি ওঁর গ্যাজেটস্-এর দোকানে বসি।'

বসিস, ভালো করিস। তো আজকের নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু খুলেই বল না বাবা।

অনিচ্ছুক স্বরে চিত্ত বলল, 'তা হলে তো আবার গল্প বলতে হয়।'

বল বল, গল্পই বল, খুব দর বাড়াচ্ছিস চিতে!

পুরোনো নাম শুনে চিত্ত হেসে ফেলল বলল, 'ব্যাপার কিছুই না। যা হয় আব কী! লোকটা প্রতিদিন ক্যাশ মেলাবাব সময়ে এসে ঝামেলা করত এ বাঙালিবাবু সোব মালে পক্কা-ক্যাশ মেমো দিবে তো হমাব খাতা মিলবে কী করে? বুরবক কঁহাকা।' রোজ রোজ।

আমি হিসেবের কারচুপিতে রাজি নই। এদিকে আমার মতো ভালো অ্যাকাউন্টসও ওখানে কেউ জানে না, বিশ্বাসীও না সবাই। একদিন এসে কি করল জানিস? দোকানের সামনের ঝাঁপ পড়ে গেছে, পেছন দিক দিয়ে বেরোচ্ছি দুজনে। শেয়ালেব মতো হেসে বললে, 'চিতরঞ্জনবাবু, কয়েদখানার ভেতরটা দেখিয়েছেন?'

আমি বললুম 'মানে?'

মানে আপনি তো কুছু কুছু করে আমার বহুৎ রুপেয়া সরিয়েছেন, কয়েদঘর দেখতে হোবে না? সোচুন, সোচে লিন খাতা ঠিক করবেন কি শ্বসুরাল যাবেন।'

আমি বললুম, 'আজই আপনাব চাকবি আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আসানি কি বাত ক্যা বাবু? লাখো রুপেয়া মারকে ভাগ যানা এতনা আসান?' বলে লোকটা চোখ ছোট ছোট করে আমার দিকে চেয়ে রইল। টলতে টলতে বাড়ি চলে এলুম। খেলুম না, দেলুম না। পর দিন জ্বর এসে গেল। অনেক রাতে দিদি মাথা ধুইয়ে দিতে দিতে বলছে শুনলুম, 'শিউরতনের গণেশ মূর্তিটা নিয়ে এসেছিস বেশ করেছিস। হনুমানটাকেও আনলি না কেন?' মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা তারই মধ্যে আমি উঠে বসেছি, 'শিউরতনের গণেশ মূর্তি। আমি আনব কেন? কী যা তা বলছ?'

সামনেই তাকের ওপর বসানো গণেশ ওই যে যেটিকে পুজো করে গেলেন শিউরতনজি। ওঁর গ্যাজেটের দোকানে ছিল গণেশমূর্তি, আর কাপড়ের দোকানে হনুমানজি। গণেশটিকে দেখতে গিয়ে হনুমানজিকেও পেলুম। কৃষ্ণমূর্তিটির পেছনে লুকিয়ে ঝুকিয়ে বসে আছেন।

আমার যন্ত্রণা তো আরও বেড়ে গেল। সকালেই হয়তো চুরির দায়ে শিউরতন আমাকে অ্যারেস্ট করাবে। দিদি বলল, 'মূর্তিদুটো তা হলে লুকিয়ে ফেলি।' আমি বললুম, 'না, যেমন আছে, তেমন থাক।'

পরদিন বিকেল নাগাদ ঠিক একটা ঝোড়ো কাকের মতো শিউরতন আমার বাড়ি পৌঁছল।

চিত্তরঞ্জনবাবু হমার গণেশজি চোলে গেলো, ইনকম ট্যাকসের ধরপাকড় হচ্ছে বহুত্। ডাকু ক্লথ স্টোর্সমে আগ লগাকে ভাগ গিয়া। লেকেন দেওতা তারা লেয়নি। কেন লেবে? মিট্টি কি মুরত, উসমে হ্যায় ক্যা, উন লোগোঁকে লিয়ে?

আমি বললুম, 'শিউরতনবাবু আপনার দুই মূর্তিই আমার ঘরে, বজরংবলিও। আমি কিন্তু নিয়ে আসিনি। ওই দেখুন।'

খুব হম্বিতম্বি করে মূর্তি নিয়ে চলে গেল। পরদিন আমার জ্বর আরও বেড়েছে, দিদি ভীষণ ব্যস্ত, ঘোরের মধ্যে শুনছি ডাক্তার বলছেন, 'শক ফিভার মনে হচ্ছে, জ্বরটা ভালো ঠেকছে না। ডা. ধরকে কনসাল্ট করুন।'...

এমন সময়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল শিউরতন। আমার অবস্থা দেখে চমকে গেল। খুব নরম সুরে দিদিকে বলছে শুনি, 'বহেনজি আপ ঘাবড়াইয়ে মৎ ডাগদারবাবুকে হমি গাড়ি ভেজকে ডেকে আনছি। হমারা মূরত ফির কিসনে চোরি কিয়া। বহুত গলত হো গয়া মেরা। যে আদমি, দুসরা খাতা বনাতে হমার পসিনা ছুটিয়ে দিল সে চোরি করবে?' বলতে বলতেই শিউরতন দিয়েছে এক দারুণ লাফ। লম্ফ যাকে বলে।

'ওই তো হামার মূরত!' ঠিক যেখানে আগের দিন গণেশের মূর্তিটি ছিল সেখানে গোলাপি পেটের ওপর সাদা শুঁড়টি গুটিয়ে ভদ্রলোক বসে আছেন। কৃষ্ণমূর্তির পেছনে বীরবাহাদুর হনুমান এক হাতে গদা এক পা তুলে পাশ ফিরে দণ্ডায়মান। ফ্যাল ফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরতন আমার দিদির পায়ে পড়ে গেল, তারপর আমার পায়ে।

সেই থেকে ও কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে না। মূর্তি দুটি আর নিয়ে যায়নি। ফি সপ্তাহের তিন দিন করে পুজো করে যায় এখানে। তা ছাড়া ডেইলি ভোগ পাঠায়। আমাকে রোজ ধরছে ওকে দীক্ষা দেবার জন্যে। কিছুতেই বোঝাতে পারি না আমি কিছুই জানি না। একজন সাধারণ মানুষ। ওর ধারণা আমি ছদ্মবেশী মহাপুরুষ-টুরুষ হব।

শুভব্রত হাসতে হাসতে বলল, 'আমারও তো তাই ধারণা রে। শাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতা নিজের থেকে যেচে তোর কাছে এসে পড়ছে। বিপদে টিপদে পড়লে একটু দেখিস বাবা।'

চিত্ত বলল, 'ঠাট্টা করছিস? ঠাট্টা করারই কথা। কেন যে এমন হয় আমি সত্যিই বুঝতে পারি না। কত পুণ্যবান মানুষ আছে জগতে। ছেলেবেলা থেকে মূর্তি দেখতে, গড়তে ভালোবাসতুম। এইটুকুই শুধু...'

ঘরের মধ্যে একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। চিত্তর মতো দশাসই নয়। হঠাৎ দেখলে চিত্তর থেকে বয়সে ছোটো বলে মনে হয়। সাদা ধবধবে সবুজ পাড় একটা শাড়ি পরনে। চিত্ত বলল, 'দিদি রে শুভ, আমার দিদি।' 'আমার দিদি' কথাগুলোর মধ্যে কী যেন ছিল। শুভ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মহিলার হাতে দুটো থালা, হাসিমুখে বললেন, 'প্রসাদ খেয়ে নাও।'

শুভব্রত শিউরে উঠে বলল, 'এইমাত্র অত খাওয়ালেন, আবার প্রসাদ?'

'একজন সিদ্ধিদাতা গণেশ, আরেকজন ভক্তি এবং শক্তিদাতা শ্রীহনুমান। এঁদের প্রসাদে কখনও না করতে আছে!' দিদি দুজনের দিকে দুটো পাথরের থালা এগিয়ে ধরলেন। ভদ্রমহিলা ছোটোখাটো হলে কি হবে, বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে।

বাবা বললেন, 'আমরা বুড়ো হয়েছি খোকা, আমাদের অবস্থাটার কথা একটু বিবেচনা করো।' গলা বেশ গম্ভীর। মা মাথায় কাপড় টেনে বলল, 'কে এসে বলল বন্ধু, অমনি তুই চলে গেলি! রাত দশটা বেজে গেল। আমরা কেউই এখনও কিছু মুখ দিইনি।'

বয়োবৃদ্ধ বাবা-মাদের ভালোবাসার এই একমাত্র প্রকাশ। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বাড়ি-ফেরা না-ফেরার সময় নিয়ে অযথা চিন্তা করা। তাঁদের দুশ্চিন্তা হবে বলে তুমি নিয়মমতো বাড়ি ফেরার রুটিন ভঙ্গ করতে পারবে না। রুটিন পালন করতে করতে তোমার জীবনের রস মূল থেকে শুকিয়ে গেলেও না।

রাত-আলোর সবুজ আলোয় বিছানার ওপর পাশ ফিরে কনুইয়ে ভর দিয়ে অনুশীলা বলল, 'হ্যাঁ গো, দিল্লির চটি আর সালোয়ার-সেট এনেছ?' ওপাশ ফিরতে ফিরতে শুভব্রত বলল, 'হুঁ।' অনুশীলা সবুজ-আলোয় স্বপ্নের মৎস্যকন্যা।

আর কার্ডিগ্যান? ওখানে তো ডিসকাউন্ট দেয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ —শুভব্রতর গলায় বিরক্তি।

রাগ করছ কেন বাবা? ওখানে কত সস্তায় চমৎকার চমৎকার পাওয়া যায়। তোমারই খরচ কমাচ্ছি।

খরচ কমানোর জন্য খরচ বাড়াবার এই এক চিরকালি ধান্দা এদের। শুভব্রত বলল, 'চাবিও জানো। সুটকেসের সঠিক অবস্থানও জানো। আমাকে একটু ঘুমোতে দিলে হত না? দুটো বড়ি গিলেছি।'

অনুশীলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। বাঁচা গেল। চিত্তটা কি গাঁজা খায়, না সোজাসুজি লোক ঠকায়? কৃষ্ণনগরের বাজার থেকে পছন্দসই কৃষ্ণমূর্তিটা নির্ঘাত হাত সাফাই করেছিল যদি না পুরো গল্পটাই গাঁজা হয়। হনুমান আর গণেশের মূর্তিদুটো সেও শিউরতনকে জব্দ করবার জন্যে নিজের বশংবদ কাউকে দিয়ে সরিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহই অবশ্য নেই। করেছে বেশ করেছে। এন্ডস অলওয়েজ জাস্টিফাই মীনস্। শিউরতন লোকটা তো চিরকালের মতো জব্দ হয়ে গেছে! বাস। কিন্তু গল্পের পেছনের আসল গল্পটা বন্ধুর কাছে চেপে যাওয়াটা কি উচিত হল চিত্তোর? তা ছাড়া ওই সব গঙ্গা ফঙ্গা। সেইজন্যেই সন্দেহ হয় চিত্তটা হয় গেঁজেল নয় গুলবাজ। চেহারাটা বেশ সৌম্য সৌম্য বাগিয়েছে কিন্তু। যেন খুউব শান্তিতে আছে ঘর ভর্তি ওই সব পুতুল ফুতুল নিয়ে।

'দারুণ হয়েছে গো শালটা। সেমি পশমিনা, না আসল?'—ও ঘর থেকে অনুশীলার গান গান গলার আদুরে চিৎকার ভেসে এল।

চিত্তর দিদির ব্যাপারটা কিন্তু হেভি গোলমেলে। নিজের দিদি নয়, মাসতুতো। চোরে চোরে মাসতুতো একেবারে। নিঃসন্তান, বালবিধবা। এই সব মহিলারা সাংঘাতিক হয়। সেক্স-স্টার্ভড্ হিস্টিরিক। চিত্তোটাকে হিপনটাইজ করে রেখেছে কিনা কে জানে? পয়সাকড়ি আছে মহিলার। খালি আপনজন কেউ নেই। চিত্তই একমাত্র আপন। মহিলা যদি ঘোরে ডালে ডালে তো চিত্তে ঘোরে পাতায় পাতায়। দুজনের মধ্যে রিলেশন ফিলেশন...ওষুধে ঘুমের ঘোর নামছে। একটা ফিনফিনে পাতলা মসলিন কেউ তার চেতনার ওপর টুপ করে ফেলে দিল। তলিয়ে যাচ্ছে এবার। কবোষ্ণ একটা সমুদ্রের মধ্যে মিছরির দানার মতো গলে যাচ্ছে যে সে কি সত্যিই কেউ? কোথাও যাচ্ছিল? তারপর যেতে যেতে...আদৌ কি সে আর কোথাও যেতে পারবে? কে যেন সুখী সুখী মাজা মাজা চর্চিত গলায় বলে উঠল, 'তুমি ছিলে কর্মবীর। আজকের এই দিনটিতে গত বছর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তোমায় আমরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করি বাবাই, মোনালিসা, অনুশীলা বাবা ও মা।' চমকে খানিকটা ভেসে উঠল সে। মোনালিসার গলা না? সে তা হলে মরে গেছে? সত্যিই তা হলে...বাবা মা সবাই তার শ্রাদ্ধ করছে? কথাটা শ্রাদ্ধ না শ্রদ্ধা? কাকে? কারা? আপাদমস্তক ঘেমে পুরোপুরি জেগে উঠল সে। ঢং ঢং

করে কোথাও রাত দুটো বাজল। খলবলে পায়ে খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে নামল, টেবিলে রাখা বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল। পুরো আধ বোতল খেয়ে থামল। বুকের মধ্যে জল আটকেছে। ব্যথা। আস্তে আস্তে সেটা নেমে গেল। জানলার ধারে গিয়ে ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। ধরাল না। আকাশটা ঝকমকে কালো। কালীপুজোর রাতে টুনি বালবের মতো তারাগুলো জ্বলছে, নিবছে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার আকাশে তমিস্রা, তবু জীবনের ঘুড়িখানা মাঝ আকাশ বরাবর টানটান হয়ে উড়ছে। এখান থেকে বেশ লাগছে। সে, একমাত্র সে-ই জানে বড্ড টান। যে কোনও মুহূর্তে ভো কাট্টা হয়ে যেতে পারে। তা যাক। কিন্তু তারপরে? হঠাৎ সে টের পেল দিকচিহ্নহীন মহাকাশের মধ্যে এক ফোঁটা বস্তুবিন্দু তার ওই ঘুড়িখানা গোঁত্তা খাচ্ছে। তার বড্ড বিপদ এবং সে চিত্তর সঙ্গে তাব আকাশ বদল করতে চায়। এখন, দমবন্ধকরা গ্রীষ্মের নিদ্রাহীন মাঝরাতে তন্ন তন্ন করে আকাশময় সে আসলে খুঁজছে কোনো মিষ্টিমুখের রাখাল পুতুল, যার বাঁশির আওয়াজে ভয় ভোলা যায়, কিংবা কোনো গৌরকান্তি যোগিনীমূর্তি যে তার বহতা জটাভার মেলে তাকে চমকে দিয়ে বলে উঠবে, 'উধর মৎ-যাও বেটা, মায় য়হাঁ হুঁ।'

পিসিমা

ব্রাহ্মণ ভোজন গতকাল হয়ে গেছে। এলাহি লোকজন। আজ নিয়মভঙ্গ। নয় নয় করেও আড়াইশোর কাছে লোক হয়ে গেল। বাড়ি-বর্গে নিজেদের গুষ্টিই তো পঞ্চাশের ওপরে। তার ওপর এতগুলি কুটুম। পাড়ার লোকও আছে।

অনীশ বলল, 'ওদের মাছ-ভাত না খাওয়ালে বাবার তো মান থাকতই না, আমাদেরও না। করেছে অনেক।'

দীপিকা বা দীপু বলল, 'একশোবার। বাবা অদড় হয়ে পড়েছিল। তোমরা ছেলেরা তো কোন্‌কালে ভেগে গেছ। পাড়ার এইসব কেষ্টা, বিষ্টু, গনু, ভোঁদড়—এরা না থাকলে বাবার ডাক্তার বদ্যিটুকুও সময়ে অসময়ে হত কি-না সন্দেহ। পিসিমা মেয়েমানুষ বই তো নয়!'

কথার মাঝখানটা অনীশের খট করে লেগেছিল। দীপুটা চিরকালের অপ্রিয়বাদিনী। সে তো স্বীকারই করছে সে করেনি। তার করার অবস্থা ছিল না। কর্মস্থল যদি কারুর হোসিয়ারপুর পাঞ্জাব হয় তা হলে বাবার দেখাশোনার জন্য শ্রীরামপুর ঋষি বঙ্কিম সরণি ঘড়ি-ঘড়ি দৌড়ে আসা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বরঞ্চ যারা অপেক্ষাকৃত কাছেপিঠে থাকে তাদেরই উচিত ছিল নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নেওয়া এ ব্যাপারে। দীপিকার টিপ্পনীর উত্তর অবশ্য দিল অনীশের বউ, দীপিকার বউদি। কুমিল্লার মেয়ে, তার কথার বাঁধুনিই আলাদা। বলল, 'তা দিদি, তোমার বড়দা তো সংসারের সবার সুসারের কথা ভেবে ভেবে কোন্‌কালেই গেছেন, কিন্তু মেয়েরাও তো আজকাল সম্পত্তির ভাগ পাচ্ছে। দেখাশোনার বেলা বুঝি শুধুই ছেলে!'

দীপিকা মুখ শুকনো করে জবাব দিল, 'তোমার যদি আমার ছেলের মতো একটি গুণধর থাকত। তা হলেই একমাত্র বুঝতে বউদি আসানসোল থেকে শ্রীরামপুর য' ঘণ্টারই রাস্তা হোক, ঘন-ঘন বাপেরবাড়ি আসার ভাগ্যি আমার নয় কেন।'

অতীশের বউ শুক্লা আমুদে মানুষ, ঝগড়াঝাটি, মনকষাকষি পছন্দ করে না। সে হেসে উঠে বলল, 'এসে অবধি দেখছি দিদি তুমি সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরার মতো বুবুলরামকে ধরেছ। কেন? কী করেছে সে!'

'কী আর করবে ভাই! কিছুই করেনি। শুধু প্রতিদিনকার রুটিনটা ওর রক্তাক্ষরে লেখা। আজ ভুরুর ওপর ট্যাংরা মাছের কাঁটা। কাল কুঁচকিতে ডিউস বল, পরশু হাত বঁটির ওপর পড়ে দে-গঙ্গা নে-গঙ্গা। এদিকে পাড়া থেকে ওদিকে স্কুল থেকে নালিশের পর নালিশ। যাই হোক না প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠছে, তাই অত শয়তানির পরও স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়নি।' পুত্রগর্বে এই সময়ে দীপুর মুখ চকচক করতে থাকে।

'এত দুষ্টু বুবুলরাম? কই দেখলে তো মনে হয় না!'

কথাটা অন্য খাতে বওয়াতে পেরে দীপু বেশ খুশি হয়ে গিয়েছিল। সে তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়নি। মাঝে মাঝে একটু কুটুস-কামড় দিতে তার ভালো লাগে। সে বলল, 'দুষ্টু মানে? বলছি না শয়তান! শয়তান! তার ওপরে বালির বস্তায় ঘুষি মারছে দু-বেলা, আমাকে উবু করে

বসিয়ে মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে যাবে, না কি ক্যারাটে শেখা হচ্ছে। ক্লাবটি তো হয়েছে সোনায় সোহাগা।'

দীপুর বোন অনীতা বা অনু দিদির পুত্রগর্বে গর্বিত বোধ করছিল। সাধারণত বোনে বোনে এসব ব্যাপারে একটা সহমর্মিতা থাকে। সে বলে উঠল, 'মেজবউদি, তুমি শোনোনি, বুবুল অল বেঙ্গল যোগকুমার হয়েছে গত বছর। যোগাসনে চাম্পিয়ন। কী শক্ত শক্ত আসন করে তোমার দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সার্কাসের প্লাসটিক বডিকে হার মানায়।'

শুক্লা চোখ কপালে তুলে বলে, 'বলো কি অনু, ওইটুকু ছেলের এত গুণ। বুঝতে পারিনি তো! আমরা জানতুম লেখাপড়াতেই ভালো।'

মহিলাদের আড্ডা যথারীতি ছেলেদের গুণগানে পৌঁছেছে দেখে অনীশ এই সময়ে বিরক্ত হয়ে ঘর ত্যাগ করছিল। অতীশ এসে বলল, 'দাদা, তুমি এখানে করছ কি? বাবার বস দাসসাহেব অফিসের আরও কয়েকজনকে নিয়ে এসে সেই কখন থেকে বসে আছেন। দাসসাহেবকে মনে আছে তো!'

দাসসাহেবকে মনে থাকবে না, কী যে তুমি বলো রন্টু! উনি তো আমাকে গাইড করেছেন অল্প বয়সে। ওঁর কথাতেই তো আমি কমপিটিটিভ পরীক্ষার দিকে যাই। ডাকবে তো আমাকে!

লম্বা কোঁচাটা সামলাতে সামলাতে ন্যাড়া মাথায় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী চেহারার দুই ভাই অবিলম্বে শশব্যস্তে বেরিয়ে গেল।

ছোটো বোন ঈশিতা বা ইতুর সঙ্গে দালানেই ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দাদাদের। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতলার বড়ো হলঘর, নিমন্ত্রিতরা সেখানেই বসেছেন। ইতু তাঁদেরই আপ্যায়ন করছিল। দাদাদের সঙ্গে দেখা হতে হাত মুখ নেড়ে বলল, 'এই যে গৌর নিতাই ওরফে জগাই মাধাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে দু-জনের হন্তদন্ত হয়ে! ফার্স্ট ব্যাচ বসাতে হবে সে খেয়াল আছে!'

অতীশ বলল, 'তুই তো এক্সপার্ট, যা না, দীপু অনু বউদি এদেরও ডেকে নিয়ে যা, শুক্লাটাকে ডাকিস না। উলটোপালটা করবে।'

'উলটোপালটা করবে, না নিজের বউকে আড়াল করছ বাওয়া!', ইতু ভ্রূভঙ্গি করল।

যা, যা, ইয়ার্কি মারিস না। নিয়ে গিয়েই একবার মজাটা দ্যাখ না—মাসিকে কেমন মামি বলে, কাকাকে দাদা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপালে মজাটা নিজেই টের পাবি।

অতীশ আর দাঁড়াল না, দাদা এগিয়ে গেছে, সেও কোঁচাটা হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। দাসসাহেবরা অনেকক্ষণ বসে আছেন। বাড়ির বড়ো ছেলে অনীশ যখন ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি এসসি পাস করল তখন এই দাসসাহেবই তাঁর রাশভারি গাড়ি চড়ে এক বাক্স কেক নিয়ে থিয়েটার রোড থেকে শ্রীরামপুর এই সারাটা পথ উজিয়ে এসেছিলেন। গমগমে গলায় পুরনো বাড়ির অলিগলি ভরে দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখবেন রাখহরিবাবু, ছেলেকে যেন আবার এম এসসি-তে ভরতি করবেন না। কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসান।'

সে কী? অত ভালো রেজাল্ট করল ছেলেটা, পড়াব না!

কেন? কেরানিগিরি করতে! না দুশো পঁচাত্তর টাকার মাস্টারি করতে! অনীশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষায় বসবে এই আমার হুকুম। এম এসসি-টি ভুলে যাও। বাঙালির ছেলে অল ইন্ডিয়া কমপিটিশনে ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছে রাখহরিবাবু। মাদ্রাজি, ইউ পি, এমনকি বেহার থেকে পর্যন্ত সব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যাচ্ছে, আর এই বইয়ের পোকা বঙ্গসন্তান সব ফ্যারাডে আর এডিসনের ভূত মাথায় পুরে দিন আনছে দিন খাচ্ছে।

অনীশ যে সময়ে আই পি এস হয়েছিল সেসময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সত্যিই এ লাইনে

চিন্তা করত না। মধ্যবিত্ত বাবা তো নয়ই। অশীতিপর দাসসাহেবকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে করতে অনীশের সেই কথাই মনে হচ্ছিল।

'থাক, থাক, দীর্ঘায়ু হও বাবা।' দাঁত পড়ে, চুল খুইয়ে এককালের সাহেব মানুষটি এখন খুব ঘরোয়া বাঙালি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ঝুলন্ত মুখগহ্বরে সব সময়েই যেন কী চিবোচ্ছেন। হাতে লাঠি। ধবধবে ধুতিপাঞ্জাবির ভেতরে কোনো মানুষের শরীর আছে কি না সন্দেহ হয়।

'তোমাদের পিতৃদেব সেন্ট পার্সেন্ট সৎ মানুষ, সৎ নাগরিক ছিলেন বাবা। কর্তব্যপরায়ণ, স্বার্থশূন্য, পরহিতৈষী। স্ত্রী বিয়োগের পরও তাঁকে দশ-দশটা বছর এভাবে বেঁচে থাকতে হল কেন জানি না। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।'

অনীশের শ্বশুরমশাই উপস্থিত ছিলেন, বললেন, 'আমার বেয়ান রত্নগর্ভা ছিলেন রাধামোহনবাবু। ছেলে মেয়ে কটি সবই তো তাঁর দয়ায় সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি যেখানে যেমন রেখেছেন, সেখানেই থাকতে বাধ্য তো সব। যথা নিযুক্তোহস্মি, তথা করোমি। তবে দেখাশোনা সব বাবাজিরা পালা করেই করত। তার ওপরে সবার মাথায় ছিলেন আমার আরেক বেয়ান। এদের পিসিমা। দাদাকে দু হাতে আগলে রেখেছিলেন, এদের গর্ভধারিণীর অভাব জানতে দেননি। যাওয়া-আসা একরকম নিত্যই করতুম কি না পানটি ছেঁচা, সময়ে ফলের রস, চা, শরবৎ, বেলের মোরব্বা, ইসবগুল। একেবারে তেবেকেটে ধা, তালে বাঁধা, তাল কাটার কোনো উপায় নেই।'

'তাই নাকি তাই নাকি' দাসসাহেবের সচল মুখ আরও সচল হয়ে উঠল।

তা হলে তো রাধহরিবাবুর অশেষ পুণ্য। আমি তো একটি মাত্র কন্যার কানাডায় বিয়ে দিয়ে মনে মনে দিন গুনি দাদা, গৃহিণীর তিরোধান যেন সইতে না হয়। জপের মালার মতো জপি দিনরাত। আহা, উইডোয়ারের দুঃখে শেয়াল কুকুরও কাঁদে, জানেন তো দাদা তা সেই পুণ্যবতী ভগ্নীটি আমার কই তাঁকে দর্শন করে চক্ষু সার্থক করি একবার।

দাসসাহেবের সামান্য ভীমরতি হয়েছে সেটা অনীশ অতীশ দু ভাই-ই বেশ বুঝতে পারছিল। কিন্তু নখদন্তহীন এই ব্যাঘ্রই একদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ এবং এ বাড়ির গার্জেন এঞ্জেল ছিলেন স্মরণ করে অনীশ বলল, 'রন্টু, পিসিমাকে একবার আনো।'

শ্রাদ্ধের দিন এসেছিলেন দাসসাহেব, তাঁর পুরোনো মরিস মাইনরে চেপে। কিন্তু সেদিন এরা ভাইয়েরা সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। ষোড়শোপচার শ্রাদ্ধ। একেবারে শাস্ত্রবিধিসম্মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুরোহিত। তিনি কোনো কাজে একবিন্দু আপস সইবেন না। কাজে কাজেই সেদিন এত কথাবার্তা আপ্যায়নের সুযোগ ছিল না। কীর্তন শুনে, প্যালা দিয়ে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাছে মিনিট দশেক বসে লিমকা আর রাজভোগ খেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ আর সবাইয়ের মতো।

অতীশ পিসিমাকে দোতলায় মেয়েদের ঘর থেকে সিঁড়ি নামিয়ে বড়ো দালান পেরিয়ে আনতে আনতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছিল। এর চেয়ে যদি দাদাসাহেব তার বউ শুক্লাকে আনতে বলতেন কাজটা আরও সহজ এবং মনোজ্ঞ হত। শুক্লা সপ্রতিভ, পরিহাসপটু, সুশ্রী, সুশ্রী কেন রীতিমত সুন্দরীই। আজ বারো দিন পর নখ-টখ পালিশ করে চুলে শ্যাম্পু দিয়ে, সিঁদুর টিপ পরে, নতুন গোল্ডেন সিল্ক টাঙ্গাইল পরে দেখাচ্ছে দারুণ টকটক করে আসত, টুকটুক করে কথা বলত। কিন্তু এই পিসিমাকে নিয়ে যেতে তার দম বেরিয়ে যাচ্ছে। একেই তো তিয়াত্তরের ওপর বয়স হয়েছে। মাথাটি সাদা কালো কদম ফুল। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো এক পেল্লাই সাইজের মাড় খড়খড়ে থান পরিয়েছে ভাইঝি আর ভাইপো বউয়েরা মিলে, পায়ে বাত, দাদাটি গত হবার পরই পিসিমা যেন হঠাৎ করে আশি পেরিয়ে পড়েছেন। জড়ভরত পুঁটলির মতো। চোখ চলে না, পা চলে না। অতীশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার কি কুশ পা না কি গো, পিসিমা এত ফ্যাশনের কাপড়ই

বা তোমাকে পরাল কে! এ যে কুইন এলিজাবেথের গাউনের মতো চারদিক থেকে ফুলে রয়েছে! যাচ্চলে!'

পিসিমার দাঁতগুলি এই বয়সেও গুটিকয় কষের দাঁত ছাড়া, মোটামুটি আছে। বললেন, 'আমি কি আর পারি ধন? মানিক আমার! এখন তোমরাই আমার হাত পা, তোমরা আমার চোখ, যদি নিয়ে যেতে পার তো গেলুম। নয়তো এখেনেই বসলুম।'

অতীশ বলল, 'ভালো জ্বালা। থামা দিলে কেন? দাসসাহেব তোমাকে দেখতে চাচ্ছেন যে!'

শেষ ব্যাচ সুদ্ধু বাড়ির ভাইবোন বউজামাই লোকজনকে নিয়ে। পিসিমা তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছেন দেখে অনীশের বউ প্রতিমা জোর দিয়ে বলল, 'তা হয় না পিসিমা, আপনি এবার গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন।'

পিসিমা বললেন, 'তুই মা পূর্ববঙ্গের মেয়ে হয়ে দুপুরে শোয়ার কথা মুখে আনিস কী করে? আমার শুতে লাগবে না।'

খেলেনও না তো কিছু!

বাঃ, দু-দুটো পুরুষ্টু কলা, হাতাভর চিঁড়ে ভিজে, সন্দেশ! ভেসে যায় রে, ভেসে যায়। তিযাত্তর পার হয়ে চুয়াত্তরে পড়লুম—একবেলা দুটোখানি যা হোক হলেই এ শরীর চলতে থাকে ঠিক। এখন তো আর শরীরের জোরে চলি না ধন, মনের জোরে চলি।

ছোটো একটি মোড়া টেনে, গুটিসুটি বসলেন পিসিমা একধারে।

শোলপোড়া একটু একটু মুখে দাও মা, শুক্লা, মেজবউমা, ফেলে দিসনি। ভাতের মধ্যে করে একটু গিলে নে মা, দশহরার দিন যেমন কলা গেলো।

অনীশ বলল, 'এ সব পুরনো আচারবিচার আর নেই পিসিমা, যেটুকু আছে উঠিয়ে দাও।'

শুক্লা অতীশকে বলল, 'দশহরার দিনে কলা গেলা কি গো!'

'ওসব কলা গেলা ফেলা কি আমি জানি?'—অতীশ বলল।

দীপিকা উলটো দিকে বসেছিল, বলল, 'কেন, তোর মনে নেই মেজদা, দশহরার দিনে কলার মধ্যে উচ্ছে পুরে মা আমাদের গিলিয়ে খাওয়াত। খুব নাকি ভালো প্রতিষেধক! সত্যিই আমাদের কিন্তু রোগাভোগগুলো কম হত। হপ্তায় দু দিন চিরেতা, দু দিন কালমেঘ। সেসব দিন গেছে! হাত পা ছোড়াছুড়ি, কান্নাকাটি, বাব্‌বাঃ!'

তিনটে নাগাদ মোটের ওপর খালি হয়ে গেল বাড়ি। আত্মীয়কুটুমরা সব একে একে বিদায় নিলেন। রবিবার বলেই নিমন্ত্রিতরা সবাই এসেছিলেন। অনেক দিন পর সবার সঙ্গে দেখা, খবরাখবর নিতেই সময় চলে যায়। বৃদ্ধেরা সব একে একে যাচ্ছেন। একে একে নিভিছে দেউটি। সে কথা বলাবলি করতে করতে চলে গেলেন সব। ছেলেপিলেরা কেউ এখনও ডেকোরেটরের চেয়ার নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, কেউ ঘুমে ঢুলে পড়েছে।

অনু এসে বলল, 'তোর ছেলেকে আমি সামলাতে পারলুম না রে দিদি। হেরে গেলুম। বুবুল একাই থ্রি ফোর্থ চেয়ার তুলে দিল। ডেকোরেটরের লোকগুলো বেকার বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর দাঁত বার করে হাসছে। চেয়ার সারা হয়েছে এবার টেবিল তুলছে। মানে সেই লম্বামতো কাঠগুলো আর কি!'

দীপু পান চিবোতে অলস গলায় বলল, 'কেন, দাদা, মেজদা কী করছে?'

দাদা মেজদা কি এ তল্লাটে আছে না কি? দাদা তো শ্বশুরকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল। মেজদাও....

'শুক্লা বলল, 'এই মেজদি আমি আছি কিন্তু এখানে। বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না বাবা।'

অনু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। ইতু হাসছে। বলল, 'আমরা তিন বোনে যা বলি মুখের সামনেই বলি, আড়ালে বলি না মেজবউদি।'

শুক্লা হেসে বলল, 'আমরা কিন্তু বুবুলরামকে নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম।'

দীপু বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে চেয়ার-টেবিল তুলছে তো! ঠিক আছে। তুলতে দাও। যে ভবিষ্যতে যা হবে তার মহড়া আগে থেকেই শুরু হয়ে যাওয়া ভালো।'

অনু বলল, 'তোর ছেলে কি ডেকোরেটর হবে। না কেটারার হবে রে?'

দীপু বলল, 'চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হবে ভাই। ওর দ্বারায় আর কিছু হবে না।'

শুক্লা বলল, 'বাপ রে, ক্লাসে প্রতিবার ফার্স্ট হয়ে ওঠা ছেলেকে নিয়ে তুমি এত ভাবছ?'

দীপু বলল, ক্লাস ফোর স্টাফের মধ্যে আই কিউ কম আছে বলে মনে করো নাকি? একেক জন আছে ঠিকমতো গাইড্যান্স দিলে অনেক এঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের ভাত মারতে পারত। আসলে প্রবৃত্তি, বউদি প্রবৃত্তি। এঁটো পাত তুলতে যার প্রবৃত্তি সে ভবিষ্যতে এঁটো পাতই তুলবে। কেন, এতগুলো ছেলেমেয়ে তো রয়েছে, দাদারাই না হয় বড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার কিষণ অনু শাম্পি-মাম্পি কেউ আর শূন্য চেয়ার, এঁটো টেবিল তুলছে, এঁটো পাত তুলছে?'

ইতু বলল, আমার ছেলের অ্যাকটিভিটি বাদ দিলি কেন দিদি? দ্যাখ ও কিসের রিহার্সাল দিচ্ছে।

ইতুর ছেলের বয়স সাড়ে সাত মাস। সে এখন সবে ঘুম ভেঙে উঠে বড়োকর্ম করে মুখটা ভেবলে ছিল। ইতু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'দ্যাখ তোর ফর্মুলা অনুসারে আমার ছেলেটা সারাজীবন এই-ই করবে।'

দীপু হাত বাড়িয়ে বোনের পিঠে একটা কিল বসাল। শুক্লার হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, বলল, 'বাব্বাঃ! ইতুটা পারেও। দেখি, তোমাদের দাদারা আর দিদিভাই কোথায় গেল।'

ইতু চেঁচিয়ে বলল, 'দাদার সঙ্গে রা আর দিদিভাইটা বাদ দে মেজবউদি! তুই কাকে খুঁজতে যাচ্ছিস আমরা সবাই জানি।'

সকলে হাসতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শুক্লা সত্যিই চারজনকে ধরে নিয়ে এল। অনুর বর আজ আসতেই পারেনি, দীপুর বর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখে আসানসোল ফিরে গেছে। একমাত্র ইতুর বর, বাড়ির ছোটো জামাই, জামাইদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

অতীশ এসে কোঁচা গুটিয়ে সবার মাঝখানে জমিয়ে বসে বলল, 'বলো এবার তোমরা কে কী বলবে। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে শুনছি।'

দীপু বলল, খুঁজছিল আসলে শুক্লা, কিন্তু তুই যখন এসেই গেছিস তখন ধর আমরাও তোকে খুঁজছিলুম। কদিন পর ভাইবোনেরা মিললুম বল তো! কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয়, বোনে বোনে হয় না। আমাদের শুধু বোনে বোনে নয়, ভাইবোনেও দেখা হয় না রে!

অনীশ বলল, তা বাচ্চাগুলো সব কে কোথায়? দীপুর ছেলেটা তো দেখলুম ইসমাইলের সঙ্গে জোর তর্ক জুড়েছে। ইসমাইল বলছে ওদের গ্রামে নাকি কে এক খুনখুনে বুড়ো আছে, দুশো তিয়াত্তর বছর বয়স। দীপুর ছেলে বলছে তা হতেই পারে না, গিনেস বুকে নাকি ও কোন্ রাশিয়ান না চীনে বুড়োর নাম দেখেছে।

অনু বলল, সত্যি! বুড়ো হওয়ার কী কষ্ট, না? বাবার কত হয়েছিল গো!

দীপু বলল, তিরাশি। কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না, দাঁত নেই যে পছন্দের জিনিস খাবেন।

অনীশ বলল, কেন, বাবার তো বাঁধানো দাঁত ছিল।

প্রতিমা বলল, থাকলে কি হবে, বাবা তো সেটা নিয়মিত ব্যবহারই করলেন না, একটু লাগত, প্রথম দিকে যেমন লাগে। আমার বাবার তো ষাটের কোঠা থেকেই পুরো বাঁধানো। এঁর মাথায় কে ঢুকিয়েছিল ক্যানসার হতে পারে। ব্যাস্।

ইতু বলল, চোখের ছানি কাটানো নিয়ে তো সেই সত্তর বছর থেকে বলা হচ্ছে। তখন মা ও বেঁচে, আমারও বিয়ে হয়নি। খালি এক কথা কটা দিনই বা আর বাঁচব, এই চোখেই আমার চলে যাবে।

অতীশ বলল, সেই সত্তর তিরাশিতে গড়াল। আজকাল এসব অপারেশন কিছু না, দু'ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেয়। আমায় একবারটি অনুমতি দিলেই নেত্রালয়ে ব্যবস্থা করে দিতুম। করতে তো দিলেন না।

দীপু বলল, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েননি, বেডসোর হয়ে যায়নি, সে শুধু পিসিমার জন্যে। দুই ভাইবোনে টুকটুক করতে করতে দুবেলা ছাদে উঠতেন, গাছের পরিচর্যা করতেন। বাবা সোজা-সমর্থই গেছেন। নিরামিষ ছাড়া খেতে ভালোবাসতেন না ইদানীং।

ইতু বলল, আমরা এলে কিন্তু পিসিমার মাছ-মাংস আনানো চাই।

অনু বলল, ইতু, তোর পিসিমার হাতের আলুর তরকারি মনে আছে। আর নটে শাকের চচ্চড়ি?

ইতু বলল, থাকবে না আবার! মজাটা শোন না! আমি তো আগে শাক-টাক খেতুম না! আলুও খুব একটা পছন্দ করতুম না। ওদিকে ভাগলপুরে ওদের বাড়িতে বিহারি বামুন রাঁধে। সে কি জঘন্য ধারণা করতে পারবি না। শুধু অড়র ডাল আর বেগুন-চোখা বলে ওদের নিজস্ব একটা রান্না ভালো করত। আমাদের এদিকের রান্না কিচ্ছু পারে না। আমার শাশুড়ি তো আবার অ্যাডভোকেট। এসব দিকে হুঁশ খেয়াল নেই। আমি তিন মাস পরে বাড়ি এসে পিসিমার হেঁশেলে উঁকি দিয়েছি! পিসিমা বলল, যা খেতে বসগে যা, দিচ্ছি। আমি বললুম, যা যা রেঁধেছ একটু একটু দিয়ো পিসিমা। পিসিমা বলল, নটেশাকের চচ্চড়ি তুই খাবি? আমি বললুম, জরুর। ওরে দিদি রে, বউদি রে, সে কি রান্না রে, মুখ ছেড়ে গেল একেবারে। বিকেলবেলা পিসিমা নরম সাদা সাদা পরোটা করে দিল আর আলুর তরকারি। দম নয়, তরকারি। তার কী স্বাদ!

অনু বলল, আমার শ্বশুরবাড়িতে তো ফি বছর একঝুড়ি করে খাজা যায়। আমাদের আশেপাশে তো জ্ঞাতি ভাশুর-দেওররা থাকে, তাদের ভাগ দিই। এমন হয়েছে পুজোর ষষ্ঠীর দিন থেকে ওরা সব বলতে থাকবে বউদি, বউদি, অনীতা, অনীতা এবার পিসিমা খাজা পাঠাবেন তো! এমনি হ্যাংলা!

অতীশ বলল, এ আর বেশি কথা কি! দুর্গাপুরে যখন আমার প্রথম পোস্টিং হয়, পিসিমাকে নিয়ে গিয়েছিলুম। শি সুন বিকেম আ পপুলার ফিগার। ছাত্ররা, কলিগ-রা সব আমাকে যত না চেনে, পিসিমাকে চেনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আরে আমার পরিচয়ই হয়ে গেল 'পিসিমার ভাইপো', ওই খাজা গজা, মালপো, আচার আরও কী কী সব তোদের আছে! বেগতিক দেখে একদিন বললুম, 'পিসিমা তোমাকে আনলুম আমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে দূর করবার জন্য, এদিকে তুমি সারা দুর্গাপুরের খাওয়াদাওয়ার ভার নিয়ে বসে আছ? এরকম রান্না রাঁধলে তো আমাকে পথে বসতে হবে!' পিসিমা হেসে বলল, 'কেন? কেউ খেতে চাইছে? পি আর সেন ছিল একেন্নম্বরের পেটুক, বুঝলি! ও-ই ধরেছিল। পিসিমা আমাকে অভয় দিয়ে বললে, 'দাঁড়া আমি দেখছি কী করা যায়।' সেদিন বিকেলে পি আর সেন এসেছে, পিসিমা এক প্লেট রসবড়া দিয়ে বললে, 'পিনাকী, ক-দিন ধরেই বাবা খুব একটা সাধ জাগছে তোমাকে নিয়ে।' পি আর সেন বলল, 'বলুন পিসিমা, এ ভাইপো আপনার হুকুম তামিল করতে সব সময়ে হুজুরে হাজির। বলুন, ক-

বার বাজার যেতে হবে?' পিসিমা বলল, 'তা একটু যেতে হবে বাবা। তোমার বাড়িতে আমার হাতে একদিন সব্বাইকে খাওয়াবে এই আমার সাধ বাবা।' পি আর সেন পড়েছে এদিকে ফাঁপরে। কিন্তু এত ভালোবাসত পিসিমাকে সঙ্গে সঙ্গে পিসিমাকে কোলে তুলে নিয়ে ধেই ধেই নাচ। আমাকে এতটুকু খাটতে পর্যন্ত হয়নি। ক্যামপাসসুদ্ধ কলিগ-কে খাইয়েছিল পিসিমার হাতে। ধন্য ধন্য রব চারদিকে।

দীপু বলল, 'পিসিমা তো তা হলে বুদ্ধিও ধরে খুব। আই কিউ টেস্ট করলে নিশ্চয় অ্যাবভ অ্যাভারেজ হবে।

অনীশ বলল, তা তো হতেই পারে। মারই তো দেখেছি কী ভীষণ স্মৃতিশক্তি, যে-কোনো ঘটনার সাল তারিখ অবিকল বলে দিতে পারত। কবে ইতু কী মজার কথা বলেছিল, রন্টু কোথা থেকে এশিয়াটিক কলেরা নিয়ে এল, আমার বন্ধুরা আড্ডা মারতে মারতে মাকে কবে কি বলেছিল, সব মা মুখস্ত বলে দিত। সাংঘাতিক মেধা। আমাদের দেশের অনেক বয়স্ক লোকের মধ্যেই এটা পাবি। অরিজিন্যাল ব্রেন পাওয়ারটা যাবে কোথায় বল? তা পিসিমা এখন কোথায়?

'একটু শুতে পাঠিয়েছি জোর করে, অনু' ইতু বলল।

অনীশ বলল, একটা খুব জরুরি কথা আছে, এখনই সেটা সেরে নেওয়া ভালো। জামাইরাও সব থাকলে ভালো হত। যাক্ সে, নেই যখন আমাদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

অনীশের গম্ভীর গলা শুনে অনু ঘাবড়ে গিয়েছিল, বলল, 'অত সিরিয়াস কেন রে দাদা, একটু হাসিমুখে যা বলবি বল না বাবা! তোর রকম দেখে আমার বুক ধড়ফড় করছে!'

অনীশ গলা খাটো করে বলল, 'এই এত বড়ো বাড়িখানাতে পিসিমা এখন একেবারে একা হয়ে গেল, এটা কেউ খেয়াল করেছ? একদম একলা। তিয়াত্তর বছরের একজন বৃদ্ধাকে এইভাবে রাখা ঠিক কি না তোমরা বলো!'

দীপু বলল, তাই তো! তা হলে! একটা বিশ্বাসী লোক পর্যন্ত নেই।

অতীশ বলল, বিশ্বাসী লোকের কথা ছাড়ো। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কোনো লোকের হাতেই এত বড়ো বাড়ি এবং একজন বৃদ্ধাকে ছেড়ে রাখা যায় না। একমাত্র উপায় আমাদের কেউ সঙ্গে থাকা। অনু, তুই পারবি!

অনু বা অনীতা বালিগঞ্জ প্লেসে থাকে। স্বামীর নিজস্ব অডিটার্স ফার্ম। সেটা গড়িয়ার দিকে। বাড়িতে শ্বশুরশাশুড়িও আছেন। অনীতা বলল, 'আমি আসা-যাওয়া করতে পারি। কিন্তু এসে থাকা ইমপসিব্‌ল। আমার শ্বশুরেরও চুয়াত্তর হল। শাশুড়ির উনসত্তর। তাঁদেরও তো আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই দেখতে হয়। শাম্পি-মাম্পি মর্ডানে পড়ে। কত কষ্ট করে, কত কাঠ খড়-পুড়িয়ে ওদের ভর্তি করা!'

অনীশ বলল, অনুই একমাত্র কলকাতায় থাকে। তারই যখন এসে থাকবার প্রশ্ন উঠছে না, তখন অন্যদের তো কথাই নেই। তা হলে উপায় পিসিমাকেই নিয়ে যাওয়া। আমার দ্যাখ অনিশ্চিত অবস্থা। তিন বছর হয়ে এল, যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো মুহূর্তে বদলি হয়ে যেতে পারি। যেখানেই যাই, বড়ো কোয়ার্টার্স পাব। সবই ঠিক। কিন্তু আমাকে সবসময়ে ডেঞ্জার জোন-এ থাকতে হয়, যেতে হয়। রাইকেই আমি হস্টেলে রাখি। প্রতিমাকেও অন্যত্র রাখলে ভালো হয়, তার ওপর পিসিমার মতো একজন পরনির্ভরশীল বৃদ্ধাকে নিয়ে গেলে আমার কিংবা প্রতিমার এক হপ্তার মধ্যে দুশ্চিন্তায় স্ট্রোক হয়ে যাবে। রন্টু তুই কি বলিস!

অতীশ বলল, তুমি তো জানোই দাদা, মাস তিনেকের মধ্যে আমার জার্মানি যাবার কথা।

কিষণকে বোর্ডিং-এ রেখে, শুক্লাকেও নিয়ে যাব ভেবেছি। স্ত্রী অ্যালাউড। এরকম সুযোগ ওর জীবনে দু-বার আসবে না। পিসিমাকে নিয়ে গেলে তো সেটা সম্ভব নয়! দীপু তুই তো পারিস? অনু ইতু দু-জনেরই শ্বশুরশাশুড়ি রয়েছেন, অন্যান্য আত্মীয় পরিজনও রয়েছে। তাদের মাঝখানে পিসিমাকে নিয়ে যাওয়াটা তো ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না!

দীপু আমতা আমতা করে বলল, ও নেই। ওর মত না নিয়ে তো আমি কিছু বলতে পারি না। তা ছাড়া ও সাংঘাতিক রাগি মানুষ। এটা আমি লুকোছাপা করি না। তোমাদেরই জামাই, তোমরাই দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছ। যেকালে তোমাদের জামাইয়ের পান থেকে চুন খসলে রইরই কাণ্ড হয়, সেকালে তার অনুমতি না নিয়ে পিসিমাকে তার সংসারে নিয়ে যাবার সাহস আমার নেই। তা ছাড়া আমি জানি, অনুমতি সে দেবে না, বাড়িতে থার্ড পার্সন তার একদমই পছন্দ নয়।

অনীশ হতাশ হয়ে বলল, তা হলে?

অতীশ বলল, তা হলে একটাই উপায় বাকি রইল। অনেক ভালো ভালো বৃদ্ধাবাসে হয়েছে আজকাল। তারই একটাতে দেখেশুনে নিয়ে দাও।

অনীশ বলল, বাড়ি?

বাড়ি বিক্রি করে আমরা পাঁচজনে ভাগ করে নেব, শ্রীরামপুরে তো আর কেউ থাকতে আসছে না। আমি দুর্গাপুরেই জমি কিনেছি। বাড়িটা তা হলে আরম্ভ করে দিতে পারি, এ-বাড়ি বিক্রির টাকাটা পেলে।

অনীশ চিন্তিত মুখে বলল, বাড়ি তো সত্যিই আমারও দরকার। আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত দিল্লিতেই সেট্‌ল করব। টাকাটা পেলে আমারও সুবিধে হয়। তবে পাঁচ ভাগ করে আর শেষ পর্যন্ত কী বা থাকবে?

দীপু অনু নীরবে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। দীপু বলল, ভাগ ছেড়ে দেওয়ার কথা যদি বলো, তা হলে তোমাদের জামাইদের উপস্থিতি দরকার।

অতীশ বলল, বাজে বকিসনি। বাড়ির ভাগ থাকলে তোদেরই থাকবে। জামাইদের তো আর ভাগ নয়। যা বলবার তোরা অনায়াসেই বলতে পারিস।

ইতু বলল, শ্বশুরবাড়ির হাত তোলা হয়ে থাকি। পাঁচ ভূতের বাড়ি। ওর পর্যন্ত রোজগারের পাইপয়সা শ্বশুরের হাতে তুলে দিতে হয়। হাতে নিজস্ব টাকা না থাকার কী কষ্ট সে আমিই জানি।

অনু বলল, যা বলেছিস। আমারও সেই এক কথা। চাবি শাশুড়ির কাছে, কর্তৃত্ব তাঁর, খাটুনি আমার। কখনো যদি হাতখরচ কিছু দিল তো তার ডেবিট-ক্রেডিট দাখিল করো, জার্নাল মেনটেন করো। বাব্‌বাঃ।

দীপু বলল, দেখো বড়দা-মেজদা ভদ্রেশ্বরের বাড়ি ওদের পৈতৃক। সাত ভাইয়ের ভাগ। বুঝতেই পারছ কী অবস্থা। তিন ভাই বাইরে থাকে। বাকি চার ভাই ভদ্রাসন কামড়ে পড়ে আছে। এদিকে এলেও তো বরাবর আমি বাবার কাছে উঠি। শ্বশুরবাড়ির ভাগ পেয়ে তাতে জমি কিনে বাড়ি তুলতে হলে আমাকে এক জন্ম ঘুরে আসতে হবে। এ বাড়ির ভাগের টাকাটা পাই তো আসানসোলে হোক, ভদ্রেশ্বরে হোক, যেখানে হোক একটা মাথা গোঁজার আস্তানা করার কথা ভাবতে পারি।

অনীশ বলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবে ওই কথাই রইল। সবাই বৃদ্ধাবাসের খোঁজ করতে থাকো, আমি আর দিন সাতেক আছি, এরই মধ্যে যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সময়ে দরজায় শব্দ হল। পিসিমার কদমফুল মাথাটি দেখা গেল, তিনি দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে বললেন, দীনু আয় বাবা, এখানে আমার চাঁদের হাট বসেছে। বড়ো বউমা ধন আমার, দীনুর ট্রে থেকে চা-গুলো সব ঢেলে ঢেলে তুলে তুলে দাও তো মা!

প্রতিমা, ইতু দুজনেই উঠে পড়ল। প্রতিমা চা ঢালছে, আর ইতু কাপগুলো এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। দিতে দিতে ইতু বলল, এ কী পিসিমা, মাছভাজা, পাপড়ভাজা এসব কী কাণ্ড? পানতুয়া! দুপুরের অত খাওয়ার পর!

পিসিমা বললেন, তুই থাম তো মুখপুড়ি। লুচির ফোসকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুই মড়াব দড়া হয়ে থাকবি তো থাক। দুপুরে গাঁই গোত্তর সব খাইয়ে তোরা কতটুকু দাঁতে কেটেছিস যেন আমি দেখিনি! ঠাকুরকে সব মাছ কালিয়া দিতে দিইনি। এখন সব খা, গরম গরম ভালো করে খা। মন্টু খবর্দার না বলবি না, মেজবউমা, তুমি রণ্টু ধনকে জোর কবে খাইয়ে দাও তো, তুমি বললে কেমন না খায় দেখি। ...দীপু মানিক, ছেলেব দৌরাত্ম্যে দুপুবে কিছু খাওনি মা আমি দেখেছি।

অনু বলল, আমায় ধন মানিক কিচ্ছু বললে না পিসিমা, খেতেও বললে না। আমি খাব না যাও। গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, না?

পিসিমা একমুখ হেসে বললেন, তোকে যে আমি কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেব মা। তোর যে আলাদা খাতির! শিবঠাকুরের তো লক্ষ্মী সরস্বতী আছেই, কিন্তু তাঁর একদম নিজের নিজস্ব কন্যেটি যে মা' মনসা, তার জায়গা যে ঠাকুরের একবাবে কোলে-কাঁখে!

সত্যিই, অনু হবার সময়ে তার মা যায়-যায় হয়েছিলেন। অনেক দিন খাওয়ানোদাওয়ানো তো দূরেব কথা, একটু কোলে করাও তাঁর বাবণ ছিল। অনুকে পিসিমাই একরকম বড়ো করেছেন।

শুক্লা বলল, পিসিমা বসুন না, এই যে মোড়াটাতে বসুন।

তা বসব বইকি, পিসিমা বললেন, এমন জমজমে আনন্দমেলা বসেছে, দেখব না? দুটো চোখ যখন ভগবান এখনও রেখেছেন তখন দেখে সাধ পুন্ন করি।

অতীশ বলল, বাবাব শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গ উপলক্ষ্যে এই জমায়েত। একে তুমি আনন্দমেলা বলছ পিসিমা?

বলব না তো কি! দাদা নিজেও ওপব থেকে দেখে দেখে ঠিক এই কথাই বলছে যে রে, বউদির সঙ্গে হাসতে হাসতে বলছে। আমরা না ম'লে যে তোবা একত্তব হস না বাবা। সে বেশ গেছে। ভগবান করুন আমিও যেন এমনি যেতে পাবি। তখনও তোবা এমনি মেলা বসাবি, আমোদ আহ্লাদ কববি। খুনসুটি করবি .।

পিসিমা আঁচলেব খুঁট নিয়ে চোখেব জল মুছলেন।

দিন তিনেক পবে খোঁজখবর করে অতীশ এসে অনীশকে বলল, দাদা একটা ভীষণ মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

কেন রে?

বৃদ্ধাবাস ইজ অল রাইট। কিন্তু ভালোগুলো সবই বেশ মোটা টাকা চায়। কয়েকটা তো আবার প্রথমেই থোক টাকা জমা রাখতে বলছে!

তুই মিশনারিদেরগুলো খোঁজ করেছিলি?

করেছি, কিন্তু পিসিমার স্ট্রিক্ট্ ব্রাহ্মিনিজম্ তো জানিসই। মিশনারি প্রতিষ্ঠানে রাখলে শেষে অন্নজল না ত্যাগ করে।

ভাবালে। অনীশ চিন্তিত মুখে বলল, দেখি আমার সোর্সগুলো ট্যাপ করে দেখি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুর বর রঞ্জিত খবর আনল একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের। পবিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি হিন্দুই। তবে সব জাতের বৃদ্ধ বৃদ্ধাই তারা রাখে, একেবারে বিনা পয়সায়। জায়গাটা শেয়ালদা লাইনে, একদিন অনীশ-অতীশ, রঞ্জিতকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এল। ভালোই মনে হচ্ছে। বহু বড়ো বড়ো লোকেব গোপন ডোনেশন আছে, ওরা কিছু নেয় না।

নেহাত পীড়াপীড়ি করলে হয়তো ডোনেশন কিছু নিতে পারে। পিসিমার কাছে তারপর ভাঙা হল কথাটা।

দীপু বলল, পিসিমা, তুমি এখন কি করবে?

কীসের কী রে?

না মানে কোথায় থাকবে? কীভাবে? সে কথা কিছু ভেবেছ?

ছেলেমেয়েরা সবাই উপস্থিত। পিসিমা অবাক চোখে চেয়ে বললেন, একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে আমার। তিয়াত্তর বছর বয়সে আমার ভাবনা আমি ভাবব?

ছেলেমেয়ে সকলেই চুপ করে রয়েছে। অতীশই শেষে বলল, ঠিক আছে। তোমার ভাবনা আমরা ভাবব তো? ভাবতে দিচ্ছ তা হলে! শোনো তবে, তোমার জন্যে শ্যামনগরে একটা খুব ভালো প্রতিষ্ঠান দেখা হয়েছে। সেখানেই তুমি থাকবে। ওরাই তোমার দেখাশোনা করবে। আমরা যে যখন পারি মাঝমধ্যেই যাব, দেখে আসব। হিন্দুদের জায়গা পুরোপুরি, কেরেস্তান-টান, ম্লেচ্ছ-টেচ্ছ ব্যাপার নয়, তুমি নিজের মতো থাকতে পারবে।

পিসিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বিস্ময়ে তাঁর মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে। হাবলা মুখে তিনি বললেন, 'পতিষ্ঠান? পতিষ্ঠান আমার কী করবে রন্টু? এ বাড়িতে, এই 'ড্যাস গল'-এ আমি থাকতে পাব না?' বাড়িটার নাম 'গ্রেস ডেল'। পিসিমা বরাবর উলটোপালটা বলে এসেছেন। ওই উলটোপালটা নামটাই তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়।

অপ্রস্তুত মুখে অতীশ বলল, থাকতে পাবে না কেন? কিন্তু এখানে কে তোমার দেখাশোনা করবে? সেটাই তো হচ্ছে মুশকিল। বয়সটা তো তোমার বাড়ছে? না কমছে! এত বড়ো বাড়ি দেখাশোনা পরিচ্ছন্ন রাখা চাট্টিখানি কথা না কি? সেরকম বিশ্বাসী লোকই বা কই?

কেন রন্টু, দীনু রইল। তোরা মাস গেলে দুশো একশো যে যা পারিস দিতিস, বাবা থাকতে যেমন দিচ্ছিলি! আমার ভেসে যেত। তোরা এদিকে এলে সব আমার কাছে আসবি। খাবি, থাকবি।

তারপর তোমার অসুখবিসুখ করলে?

আমার কিচ্ছু হবে না ধন। ভগবানের আশীর্বাদে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাব। দীনুও রইল।

দীনুকে আমরা অতটা বিশ্বাস বা নির্ভর করতে পারছি না পিসিমা। ফসল-কাটার সময় হলেই তো ও দেশে চলে যাবে, দু মাস তিন মাস বেপাত্তা। শেষকালে দেখবে এ বাড়ি জবরদখল হয়ে যাবে। ওই দীনুই সাহায্য করবে তাদের।

তা হলে?

তা হলে যা বললুম, খুব সুন্দর জায়গায় থাকবে তুমি, আমি জার্মানি থেকে ফিরে তোমায় নিয়ে যাব যখন, দাদার সুবিধে হলে দাদাও নিয়ে যাবে। আপাতত তো এ ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।

পিসিমা কিছু বললেন না। অনীশ-অতীশের কাজ ছিল। বেরিয়ে গেল। বাইরে বাড়ির দালাল। ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে যেতে হবে, মিউটেশনের জন্য কী কী করা দরকার...। সবই তো এই ক-দিনের মধ্যে! প্রতিমা রাইকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। তার মেয়ের মাথায় ঈষৎ সোনালি চুল, টকটকে রঙ, সুন্দরী না হলেও জৌলুস-অলা চেহারা। সে মিরান্দা হাউজে পড়ে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে এসে সেই ছোট্ট এতটুকু রাইকে এত বড়ো, এত সুন্দর দেখে পাড়ার অনেকেই মুগ্ধ। তাদেরই অনুরোধে এই সামাজিক নিয়মরক্ষা। শুক্লা কিছুক্ষণ বসেছিল, হঠাৎ মনে হল কিষণকে অনেকক্ষণ দেখেনি, কে জানে বুবুল দুরন্ত ছেলে তার সঙ্গে মিলে কি বদবুদ্ধি করছে! সে 'কিষণ কিষণটা কোথায় গেল' বলতে বলতে উঠে গেল। দীপু বসে বসে নখ খুঁটছিল, তিন বোনে সামান্য

আগে পরে পিসিমার ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল। পিসিমা ছোটো মোড়ার ওপর বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। তাঁর মুখের ওপর দিয়েই সন্ধে গড়াল, রাত হল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পিসিমার দশটি বছর বয়স বেড়ে গেল।

সইসাবুদ শেষ হলে দীপিকা বলল, আচ্ছা মাতাজি, আপনাদের ভিজিটিং-ডে এবং আওয়ারগুলো আমাদের একটু বলে দেবেন, নোট করে নিই।

মাতাজি মুখ তুলে বললেন, দেখুন, আপনারা একটু ভুল করছেন। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের তিনকুলে কেউ নেই দেখাশোনা করার বা আর্থিক দায়িত্ব বহন করার। কাজেই আমাদের ওসব ভিজিটিং আওয়ার-টাওয়ারও নেই।

অনীতা হাঁ করে বলল, ভিজিটিং আওয়ার নেই!

না, আপন বলতে যাদের কেউ নেই, তাদেরই একমাত্র এখানে রাখা হয়।

অনীতা সামলে নিয়ে বলল, তা অবশ্য সত্যি দিদি, পিসিমাব তো যাকে বলে আপন, তেমন কেউ নেই। ছেলে না, মেয়ে না। নাত-নাতনি কেউ না।

দীপু বলল, আমরা তো যাকে বলে নিষ্পর। পরস্য পর। পিসিমা তো আবার বাবার সতাত বোন, জানিস তো!

ইতু বলল, মা বেঁচে থাকতে আমরা কেউ জানতেই পারিনি কথাটা।

অনু বলল, মায়ের বাহাদুরি আছে. হাজার হোক পরের বাড়ির মেয়ে তো!

দীপু বলল, বাবারও বাহাদুরি।

এইখানেই এ কাহিনি শেষ হয়ে যেত। হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু হল না। একদিন গভীর রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে দীপু হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। শব্দে জেগে উঠেছে অসমঞ্জ, তার রাগি স্বামী। ওদিকে দামাল ছেলেও। অসমঞ্জ বললে, আরে মাঝরাত্তিরে এরকম মড়াকান্না জুড়লে কেন? হয়েছেটা কী?

দীপু বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদছে আব বলছে, পিসিমাকে তুমি আমার কাছে রাখতে দেবে কি না বলো, আগে বলো। আমি সারাটা জীবন তোমাব কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অনু হবার পর আমি খেতুম না পিসিমা খাইয়ে না দিলে, পিসিমার বুকে হাত রেখে মা মনে করে ঘুমোতুম। সেই পিসিমাকে....। উঃ! ওগো, পিসিমা না থাকলে আমি মরে যেতুম। পুঁয়ে পাওয়া হয়ে গিয়েছিলুম। তুমি আমায় পেতেই না। অন্য কোনো রাক্কুসি এসে তোমার এ সংসার সাজাত!

অসমঞ্জ বললে, মাঝরাত্তিরে তুমি এ কী আরম্ভ করলে? পিসিমাকে তুমি তোমার কাছে এনে রাখতে চাও এ কথা তো আগে বলোনি!

বলব কি? তোমার যা মেজাজ, তোমাকে আমি হিটলারের চেয়েও ভয় পাই।

তা হলে আর আমায় বলা কেন। পিসিমা এলে তো চমৎকাব হয়, রান্নাবান্নায় তো তিনি একাই একশো। যাও যাও নিয়ে এসো গে, রোজ রোজ আব আমায় নুন কম, মিষ্টি বেশি, আধসেদ্ধ খেতে হবে না। এই জন্যে এত কান্না!

যদি তোমার মা কিছু বলেন?

বলবেন তো ভদ্রেশ্বরে। এখানে তো সে কথা আমাদের কানে আসছে না। আর বলবেন আমার মা বলবেন, সে আমি বুঝব। ওহ্ তোমরা মেয়েরা না একেন্নম্বরের কুচুটে।

কুচুটে নয় গো কুচুটে নয়, ভিতু। ভিতু।

আচ্ছা তাই তো তাই। এখন ঘুমোও দিকি!

স্টেশনেই অনুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দীপুর। এখন ওদের পাঁচজনের কাছেই শ্রীরামপুরের

বাড়ির চাবি ভেতরের কোল্যাপসিবল গেটের। বাইরে দরজার চাবি দীনুর কাছে। যতদিন না বাড়ি বিক্রিবাট্টা হয়, সে-ই কেয়ারটেকার।

অনু অবাক হয়ে বলল, দিদি তুই?

দীপু বলল, অনু তুই?

অনুর চোখ ছলছল করছে। বলল, 'কাল রাতে স্বপ্ন দেখছি একটা খুব রোগা না-খেতে পাওয়া বেড়ালছানা, তাকে শাম্পি পাঁচিলের ওপাশে ফেলে দিচ্ছে, হঠাৎ বেড়ালটা মিউ মিউ করে ডেকে উঠল করুণ স্বরে। তার পরেই দেখলুম সেটা বেড়াল নয়, পিসিমা। দিদিরে, আমি পিসিমাকে বৃদ্ধাবাসে ফেলে রেখে থাকতে পারব না। ভগবান তা হলে কখনো আমাকে মাপ করবেন না। মায়ের সূতিকার সময়ে পিসিমাই তো আমায় বাঁচিয়েছে। পিসিমাই আমার আসল মা।' অনু কেঁদে ফেলল।

দুই বোনে এক রিকশায় মনের কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলল। দীপু বলল—তোর অসমঞ্জদাকে আমি সত্যি বলছি অনু এত দিন শুধু ভয়ই করে এসেছি। মারাত্মক ভয়। মোজা রিপু নেই, ছুড়ে ফেলে দিল, ডালে নুন নেই, ছুড়ে ফেলে দিল, বুবুলের স্কুল থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল, আসতে দেরি হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাপরে৷ সেই লোক৷ আজ এই প্রথম ওকে শ্রদ্ধা করলুম, ভালোও বাসলুম বলতে পারিস।

অনু বলল, অনেক ভেবে ঠিক করলুম, যতদিন না বাড়ি বিক্রি হয় আমি এসে থাকব। দ্যাখ, এতদিন আমি শাশুড়ির ছেলেকে দেখেছি, কিছুদিন উনি আমার মেয়েদের দেখুন। শাম্পি-মাম্পি শুক্রবার রাতে এ বাড়ি চলে আসবে, রবিবার আবার বাবার সঙ্গে চলে যাবে। ওদেরও একটু আত্মনির্ভরশীল হওয়া ভালো, এইট তো হল। তারপর বাড়ি বিক্রি হলে, আমার ভাগটা দিয়ে আমি পিসিমাকে আমাদের বাড়ির খুব কাছে, একটা মাদ্রাজি পরিবারে পেয়িংগেস্ট রাখব। পেয়িংগেস্ট মানে—মেজানিন ঘর, একটু রান্নাঘর, বাথরুম ওরা দেয়, পিসিমা নিজের রান্না নিজেই করে নেবে। পিসিমার সুন্দর কুলিয়ে যাবে। আমি তো সব সময়ে দেখাশোনা করতে পারবই।

শ্রীরামপুরের বাড়ির দরজা খুলে দিল অতীশ স্বয়ং। খুলেই অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার রে? তোরা জয়া-বিজয়া কোত্থেকে?

মেজদা তুই?

আরে, আর বলিসনি, দুর্গাপুরে পৌঁছে থেকে শুক্লা গুম হয়ে আছে। কাল মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। বলে, 'আমি জার্মানি যাবো না। ভাগ্যে থাকলে আমার হবে। না থাকলে না-ই হল, আমি অমন ফরেন-হ্যাংলা নই। তুমি ঘুরে এসো। পিসিমা আর কিষণকে নিয়ে আমি থাকব এখানে।' তার পরে আবার আরেক কাণ্ড।

কি কাণ্ড?

আয়, ভেতরে আয়, দেখাচ্ছি।

ভেতরে যেতে যেতে অনীশ চেঁচিয়ে বলল, দীনু ভালো করে কাঁচা তেজপাতা ভিজিয়ে চা কর। একটা তরকারি কিছু চড়িয়ে দে। দিদিরা দুজন এসেছে।

দীনু এসে বলল, টাকা দিন কিছু, বাজার আনি। কেরোসিনেরও ভাঁড়ে মা ভবানী। সে-ও কিনতে হবে।

দুম করে লোডশেডিং হয়ে গেল। উঠোনে শ্যাওলা, তুলসী গাছটা বিরাট ঝাড় হয়ে উঠেছে, তাকে আর ঠাকুর-দেবতা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে উড়নচণ্ডী রাক্ষসি।

অতীশ বলল, সাবধানে বাথরুমে যাস দীপু, উঠোনটা একেবারে... আমি তো পড়ে গিয়ে যা কেলো....উঃ।

দীনু বলল, পিসিমা থাকলে এসব কিছু ভাবতে হত না, দাদা। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। বাড়িতে লক্ষ্মী অষ্টপহর জ্বল জ্বল করছেন। শ্যাওলা উঠোন, আঁধার-বাড়ি এ আমি আমার জন্মে কখনও দেখিনিকো।

অতীশ ধমক দিয়ে বলল, যা যা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর। বেশি আর লেকচার দিসনি। তোর আবার জন্ম। এ বাড়িতে কদিন আছিস? পাঁচ বছর না সাত বছর?

দীনু বলল, যাঁহা পাঁচ তাঁহাই সাত, ধরুন না গিয়ে দাবাবু।

আলো এলে একটা টেলিগ্রাম, আর একটা কিউ এম এস লেখা অন্তর্দেশীয় পত্র অতীশ দু বোনের হাতে তুলে দিল।

টেলিগ্রামটা অনীশের। অতীশের দুর্গাপুরের ঠিকানায় করা।

অ্যাম ট্রানসফার্ড টু ডেলহি। সেন্ড পিসিমা শার্প বাই দা নেক্সট রাজধানী। অ্যাওয়েটিং ইনফর্মেশন—দাদা।

ইতুর চিঠিটাও দুর্গাপুরের ঠিকানায়। লিখেছে অতীশ-শুক্লাকে।

প্রিয়, মেজদা-মেজবউদি,

পিসিমাকে বৃদ্ধাবাসে পাঠবার প্রস্তাবটা আমাদের গোড়ার থেকেই ভালো লাগেনি। কিন্তু আমি একে সবার ছোটো, তার পরে শ্বশুরবাড়িতে পরিজনও অনেক। তোমাদের জামাই একে মুখচোরা, তায় সেও বাড়িতে সবার ছোটো। আমার পক্ষে পিসিমার কোনো ব্যবস্থা করা নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু যখন থেকে শুনেছি পিসিমাকে এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যেখানে দেখতে যাবার পর্যন্ত অনুমতি দেয় না, তখন থেকেই আমার প্রাণ কাঁদছে। এখানে এসে তোমাদের জামাইয়ের সঙ্গে অনেক আলোচনার পর একটা লিগ্যাল পয়েন্ট আবিষ্কার করলুম। পিসিমা বাবার সৎ বোন হলেও, একই বাবার সন্তান। এবং শ্রীরামপুরের—'গ্রেস ডেল' বাড়ি বাবা একটু-আধটু বাড়ালেও ঠাকুর্দারই করা। সেই হিসেবে কিন্তু বাড়ির অর্ধভাগ পিসিমার প্রাপ্য হয়। বাকি অর্ধভাগকে পাঁচ ভাগ করে আমরা পাঁচ ভাইবোন নিতে পারি। সেক্ষেত্রে পিসিমাকে আমরা যতটা অসহায় মনে করছি ততটা তিনি নন। বাড়ি বেচে হয় তোমরা পিসিমাকে তাঁর প্রাপ্য টাকায় একটা যথার্থ ভালো প্রতিষ্ঠানে রাখো, যেখানে তাঁকে আমরা দেখতে যেতে পারব, এবং প্রয়োজন হলে নিজেদের কাছে এনে রাখতে পারব। আর তা যদি না হয়, পিসিমা অবলা বলে তাঁকে যদি তোমরা বঞ্চিতই কর, তা হলে আমার ভাগটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তা দিয়েও পিসিমার অনুরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। সাত কাঠার কাছে ভদ্রাসন আমাদের। পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো লাখখানেক টাকা হবেই। ভালোবাসা জেনো।

ইতি

তোমাদের ইতু

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে দীপু বলল, সত্যিই তো, মেজদা আজকালকার আইনে পিসিমারও তো একটা ভাগ থাকার কথা। এটা তো আমাদের কারো মনে হয়নি। তোর হয়েছিল?

অতীশ বলল, অনেস্টলি বলছি দীপু হয়নি।

বহু রাত পর্যন্ত তিনজনে পরামর্শ হল। মাঝে দীনু দোকান থেকে অখাদ্য রুটি-তড়কা এনে দিল। কেরোসিন পাওয়া যায়নি। চারজনের রান্নায় দীনুর খুব একটা উৎসাহও দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল অবিলম্বে পিসিমাকে 'আশা-নিকেতন' থেকে নিয়ে আসা। শ্রীরামপুরের বাড়ি বিক্রির চেষ্টা আপাতত বন্ধ থাক। পিসিমা যতদিন আছেন বাড়ি ভোগ করুন, দীনু থাকবে, দরকার হলে আর একটি লোকও রাখা হবে, ঠিকে। অনু দেখাশোনা করবে। শনি-রবিবার এসে থাকবে। পরে পিসিমার মৃত্যু হলে যা হয় ব্যবস্থা করা হবে।

পরদিন সকালে তিন ভাইবোন নতুন ব্যবস্থার কথা জানিয়ে অনীশ এবং ইতুকে টেলিগ্রাম করে শেয়ালদা চলল।

ট্রেন চলেছে। তিন ভাই বোন অধৈর্য হয়ে স্টেশনের নাম পড়ছে।

অতীশ বলল, দ্যাখ। সত্যিই আমাদের অ্যাকচুয়ালি মা-বাবা আর পিসিমাতে কোনো তফাত নেই। মা-বাবা কোনোদিন করেননি।

দীপু বলল, একটু লেটে বুঝলি মেজদা। পিসিমার মধ্যে আমরা বাবার রক্ত আর মায়ের স্নেহ পেয়েছিলুম।

অনু বলল, মা কীভাবে 'দিদিমণি' বলে ডাকত, সে ডাকটা তোর মনে আছে? বালবিধবা বলে বাবা-মা যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে পিসিমাকে আগলে রাখত।

দীপু বলল, আমি আগেরবার বাবাকে বলতে শুনেছি—'রুচি তুই আমার আগে যাস।' পিসিমা বলছে, 'অমন কতাও বোলো না দাদা, তুমি আগে যাও, পরে আমি আসছি। আমি গেলে তোমায় দেখবে কে?'—'আমি গেলেই বা তোকে দেখবে কে শুনি?' বাবা বলল। পিসিমা বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও। একটু, এই এতটুকুটি হলেও মেয়েমানুষের ভেসে যায়...'

আশা-নিকেতনে এখন যিনি তত্ত্বাধানে আছেন, সেই মাতাজি আগের জন নন। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। সেই একই রকম সাদা কাপড়, কানের পাশ দিয়ে ঘোমটা দিয়ে পরা। সব কথা মন দিয়ে শুনে বললেন, দেখুন, আপনারা খুব ভুল, খুব অন্যায় করেছেন। আমাদের এখানে আত্মীয় পরিজনহীন মানুষ ছাড়া নেওয়া হয় না। সমাজের নিয়ম হল পরস্পর পরস্পরকে দেখা। যাঁর দেখবার লোক আছে তিনি কেন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানে আসবেন। তাঁর দেখাশোনা যেমন করেই হোক, তার নিকটজনদের নৈতিক দায়িত্ব। কেন আপনারা রেখেছিলেন ওঁকে? বিপদটা কি জানেন? সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। শুধু বৃদ্ধ বৃদ্ধা নয়, সর্ব অর্থে অনাথ যারা তাদেরই ব্যবস্থা এখানে করা হয়, আমাদের সাধ্যমত। প্রত্যেককে কিছুটা শ্রমও দিতে হয়। আবাসিকদের আমরা দীর্ঘ দিন এক জায়গায় রাখি না। কয়েক মাস অন্তর অন্তর স্থান বদল করাই। এই আমাদের নিয়ম। এবং তাঁদের কোনো ঠিকানা নিই না। নাম নিই না। একটা নম্বরের পাশে, তাঁদের এখানে নতুন নামকরণ হয়। পুরোনো পরিচয় মুছে ফেলে তাঁরা যাতে নতুন জীবন লাভ করতে পারেন, তারই চেষ্টা করি। তবে আমার যতদূর মনে পড়ছে, সম্প্রতি এখান থেকে ওরকম স্থানবদল হয়নি। আপনাদের দেওয়া এই রুচিশীলা ভট্টাচার্য, নাম আমরা ভেতরে গিয়ে বলতে পারব না। আমাদের নাম আলো, সলিল, বহ্নি, বরুণ, পবন, আগুন—এইসব। কে যে এঁদের মধ্যে রুচিদেবী তা জানি না, জানাতেও পারি না।

অনুকে কাঁদতে দেখে, মাতাজি বললেন, ঠিক আছে, আপনাদের জন্য আমি একটা কাজ করছি। এ ঘরে আপনারা বসুন, ঘরটা আমি অন্ধকার করে দিচ্ছি। ওদিকের চৌকো জানলাটা দেখছেন, ওর পেছনে দালান। ওই দালান দিয়ে আমি মহিলা আবাসিকদের পাস করাব। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইভাবে আপনারা গুনবেন। ঠিকজনকে চিনে নেবেন, তারপরে আমি ওঁকে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

বাইরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন মাতাজি। ভেতরের জানলাটা খুলে দিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরে জানলার ওপাশে আইডেনটিটি প্যারেড শুরু হল। প্রথম জন, মাথার চুল কদম ছাঁট, সাদা কালো, মুখ ঈষৎ কুঁচকোনো, না কালো না ফর্সা। দ্বিতীয় জন—মাথার চুল ঘাড় অবধি সাদা-কালো, কুঁচকানো মুখ, না কালো, না ফর্সা। তৃতীয় জন মাথার চুল কদমছাঁট সাদা, কুচকোনো

মুখ, না ফর্সা, না কালো। এইভাবে তেরোজন হয়ে গেল, শোভাযাত্রা থামল। একটু পরে মাতাজি ঘরে ঢুকে বললেন, দেখছেন? বলুন কোনজন?

দীপু বলল, কে আবার! প্রথম জন!

অতীশ বলল, যাঃ, তৃতীয় জন। চুলগুলো একেবারে পেকে গেছে বলে বুঝতে পারিসনি।

অনু বলল, আমি শিওর পঞ্চম জন।

মাতাজি বললেন, সে কি? আপনাদের আপনজন, পিসিমা বলছেন, চিনতে পারছেন না? আচ্ছা আমি এই তিনজনকেই আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করে আসছি তিনি রুচিশীলা দেবী কিনা। যদিও, আবার বলছি—এটা আমাদের নিয়ম নয়।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে মাতাজি বললেন, ওঁদের কারুর নামই রুচিশীলা নয়। প্রথমজনের নাম জানকিবাই—উনি বিহারি। তৃতীয় জন ফতিমা বেগম—বুঝতেই পারছেন বাঙালি মুসলমান। আর পঞ্চম জনের নাম শুদ্ধ বুড়িয়া, ও একটি ভিখারি-বস্তিতে থাকত, কখনও নামকরণ হয়নি, হয়ে থাকলেও ভুলে গেছে, ওকে আমরা 'ধরিত্রী' বলে ডাকি। আপনারা এক কাজ করুন, আপনাদের পিসিমার একটা সাম্প্রতিক ফটো, তাঁর চেহারার সঠিক বর্ণনা, আর কিছু আইডেনটিফাইং মার্ক দিন। তারপর দেখছি কী করা যায়।

তখন অতীশ, দীপু ও অনু নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা করে দেখল—গত দশ বছরে কোথাও, কোনো উপলক্ষ্যে পিসিমার কোনো ফটো তোলা হয়নি। এবং তাদের পিসিমা খুব রোগাও না, কালোও না, ফর্সাও না, চুল পুরো পাকা না, আবার পুরো কাঁচাও না, দাঁত যে সব গোটা তাও না, আবার সব যে পড়ে গেছে তা-ও নয়, তিনি খুব বুড়োও নন, আবার কম বুড়োও নন আসলে তাঁর কোনও পরিচয়চিহ্ন নেই। তিনি আসলে শুধুই একজন পিসিমা। অগণ্য পিসিমার মধ্যে একজন। কারো মা নয়, বাবা নয় শুধুমাত্র পিসিমা।

পথিক বন্ধু

গাঢ় নীল আকাশ। মেঘলেশহীন। কালোর নানান শেড দিয়ে আঁকা একখানা অতিকায় বোল্ডার। তিনটি বাজ গাছ পেছনে। সারি সারি দাঁড়িয়ে তিনজন। হলুদ-কালো সিল্কের শাড়ি পরে একটু ঘাড় বেঁকিয়ে হাসছে মা। পাশে বাবা। অর্ধেকটাই মায়ের পেছনে ঢাকা পড়ে গেছে। সদ্য-কেনা জমকালো স্লিপ-ওভারটা কী চমৎকার এসেছে! বাবার মুখে হোল্ডারে সাদা কাঠি। ঠোঁট চাপা। চোখ দুটো চশমার আড়ালে হাসি-চকচক। বাবা একেবারে পার্ফেক্ট টি. ডি. এইচ। টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। বাবার হাত ধরে তার স্বাভাবিক ভীষণ আহ্লাদী ভঙ্গিতে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে এণা। নীল জিনস, ভীষণ চওড়া ফ্যাশনেবল্ বেল্ট, মাস্কাট থেকে সেজজেঠুমণি এনে দিয়েছিল। বেল্টের সামনের কারুকাজগুলো পর্যন্ত নিখুঁত উঠেছে। সরু সরু ঝকমকে দাঁত বার করে গলে গিয়ে হাসছে এণা। ভীষণ ভী-ষণ খুশি। কানের দু পাশ থেকে ঝুলে থাকা খোলা চুলের মধ্যে দিয়ে জাফরির মতো দেখা যাচ্ছে লাল টপটার নকশা।

ডান হাতে ছবিটা নিয়ে তারিফের ভঙ্গিতে হাতটা সামনে প্রসারিত করল বাবা।

বাঃ, চমৎকার তুলেছে তো ছোকরা! একেবারে প্রোফেশন্যাল হাত। আমাদেরগুলো অত ভালো হয়নি। রঙিন বলেই উতরে গেছে।

মা বলল, তোমার হাতে ছবি এসেছে এই ঢের! মনে নেই বিয়ের পর তিলাইয়ায় কী কীর্তি করেছিলে? নতুন নতুন শাড়িগুলো পরে কতরকম পোজ দিয়ে ছবি তুললুম। সব ব্ল্যাঙ্ক! জানিস এণু, কোনোটাতে আবার ঝুমকো-পরা, আধ-খাবলা গালসুদ্ধু একটা কান, কোনোটাতে ভেলভেট জর্জেটে পরা ধড়! উঃ, তোমার জন্যে আমার সবচেয়ে রোম্যান্টিক সময়টার কোনো দলিল রইল না।

আহাহা! তুমি এখন তার চেয়েও কত রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছ নিজেই জানো না, দুঃখু করছ কেন!

বাবা-মার কথা শুনতে শুনতে কুলকুল করে হাসছিল এণা।

তারপরেই হঠাৎ এণার বুকের মধ্যে জমাট পাথর। বাবা মেলে ধরেছে সেই ছবিটা। গ্র্যানাইটের উটের পিঠ উঁচু হয়ে রয়েছে। নীল আকাশের ক্যানভাসে মস্ত দেওদার সহিস পাশে নিয়ে একটি বলবান সাদা ঘোড়া। লাগাম হাতে, সানগ্লাস চোখে বিশুদ্ধ কিশোরী হাসি হাসছে এণাক্ষী।

'এক্সেল' বাবা বলল, 'আগেরটার নাম যদি দাও 'থ্রি ইন ওয়ান' তো এটার নাম দেওয়া উচিত 'দা উইনার্স'।

এই দুটোই ওদের রোলিফ্লেক্সে তুলে দিয়েছিল ও।

বাবার চেম্বারে যাবার সময় হল। মায়ের ফোন এসেছে। নতুন অ্যালবামটা এণার কোলের ওপর ফেলে দিল মা, 'নে, সাজিয়ে ফ্যাল, পেছনে তারিখ-টারিখগুলো যেন দিতে ভুলিস না এণু।'

ছবি এবং অ্যালবাম কোলে ডিভানের ওপর বসেই থাকে, বসেই থাকে এণা। বিস্বাদ সব। কেন ও জানে না। কী একটা মূল্যবান জিনিস যেন হারিয়ে গেছে, মা-বাবা যেন হঠাৎ ওকে না বলে

কয়ে কোথায় চলে গেছে। কবে আসবে জানে না। অন্যান্যবার বেড়াতে গিয়ে যেসব ছবি তোলা হয় সেগুলো নিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয় সে। বন্ধুদের দেখাতে হবে, শর্মীদি রাজাদা মৌ তুলতুল...কার কোন্‌টা পছন্দ কপি করাও, দফায় দফায়। আরেকবার তাদের মতো ছবিগুলো সাজিয়ে ফেলল সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। না, একটাতেও নেই। একটাতেও ওর একটা প্রোফাইল পর্যন্ত নেই। হারিয়ে গেল? পুরোপুরিই হারিয়ে গেল তা হলে? প্রথম দিকের গুলোতে তো থাকবেই না। কিন্তু গানহিলের ওপর সেই ঝোড়ো সন্ধ্যায়? গাইডদের মধ্যে পেশাদার ফটোগ্রাফার ছিল, তাকেই তো তুলতে বলা হয়েছিল। তা হলে কেন...। ওরা বলছিল, 'শিগগিরই ঘরে ঢুকুন। বাতাসে উলটে ফেলে দেবে...'। ও বলছিল, 'একটু, আর একটুখানি দাঁড়িয়ে যাই, শুনতে পাব মেঘ বলছে দত্ত দয়ধ্বম্‌, দাম্যত, দাও, দয়া করো, দমন করো। একজন ইংরেজ কবি শুনতে পেলেন আর আমরা মেঘের দেশের মানুষ হয়ে দৈববাণী শুনব না?' কেম্পটিতে বোল্ডারে বোল্ডারে লাফ দেবার সময় বাবা তোলেনি? কাঠের রিকশায় ওরা যাচ্ছে, পাশে বড়ো বড়ো পা ফেলতে ফেলতে ও, 'চল চল রে নওজোয়ান', গান গাইছে আবার, বাবার ফরমাশ অবশ্য। রিকশায় ওঠার কথা বলতে বলল, 'এই বাইসেপ্‌স আর এই ছাতি নিয়ে আমি উঠব ওই দুবলা বৈজলালের কাঁধে? শেম! শেম!' একেবারে খেয়াল হয়নি কারো যে ওর ছবি থাকছে না একটাতেও? অথচ এণাদের রোলিফ্লেক্সে, তা ছাড়া নিজের ভীষণ দামি কী যেন জার্মান ক্যামেরায় কত ছবি তুলল ও। বারবার মনে মনে ও-ও বলে এণা যেন কেমন লজ্জা পেল। 'ও' তো মা-বা বাবাদের বলে। শুধরে নিয়ে মনে মনে সে বলল, শফিদা। শফি।

এ ক-মাসে অন্তত ছখানা চিঠি সবসুদ্ধু জে. এন. ইউতে পাঠিয়েছে এণা। একটারও জবাব আসেনি। খুবই আশ্চর্য। ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় পাঠালে কি চিঠি যথাস্থানে বিলি হয় না? এই তো ওর মামাতো দিদি নবনীতা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে এসে উঠেছে সম্প্রতি। 'গার্লস হোস্টেল' বলে আন্দাজে একটা চিঠি ছেড়ে দিয়েছিল সে। দেরি হলেও পেয়ে গেছে তো ঠিক! কে জানে! জে. এন. ইউ তো বিশাল ব্যাপার হোস্টেলের নাম-ঠিকানা, রুম নম্বর-টম্বরগুলো কেন যে জেনে নেওয়া হল না! কিন্তু ও? ও-ও তো লিখতে পারে। ওর কাছে রয়েছে এণাক্ষীদের বাড়ির ঠিকানা ডিরেকশন সব। বাবা-মা কতবার করে আসতে বলেছে ওকে। খুবই আশ্চর্য! মা-বাবাকে বলতে আজকাল কেমন বাধোবাধো ঠেকে। বন্ধুদেরও! কেন এণা জানে না। কেন যে এণার জগতে প্রাইভেসি বলে বিচ্ছিরি অচেনা একটা ব্যাপার ঢুকল! কিছুদিন আগেও এটা ছিল না।

কিন্তু মুখ শুকনো দেখলেই এখনও মা জিজ্ঞেস করবে, 'কী হয়েছে রে এণু?' মাকে এড়ানো মুশকিল। 'কী আবার হবে, কিচ্ছু না।' মাকে কেন যেন বলা যায় না প্রথম বাহারি চিঠিগুলোর জবাব না পেয়ে রাগ করে শেষে একটা অন্তর্দেশীয় পত্র ছেড়েছিল সে, প্রেরকের জায়গায় নাম-ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল নিজের। ফেরত এসেছে সেটা। কথাটা কাউকে বলতে পারেনি সে। অন্তরা, লায়লী, পিউ, কাউকে না। এমনিতেই তো ওরা খ্যাপায়, 'কোথায় গেল রে তোর বয়ফ্রেন্ড? উবে গেল না কি? সাবলিমেশন?' শুনেলও রাগ ধরে। আর ওই এক হয়েছে বয়ফ্রেন্ড বয়-ফ্রেন্ড! ও তো শফিদা! অন্তরার সেই সম্রাট রায়ের মতো নাকি! ডিস্কো নাচে। কী রকম গাড়ি-বারান্দা-অলা-চুল! কি বিচ্ছিরি তাকায়! অন্তরার আড়ালে আবার ওর সঙ্গে কী রকম গদগদ গলায় কথা কয়! বয়ফ্রেন্ড! দূর। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপমানবোধ জমে। প্রত্যাশা পূরণ হয়নি পনেরো বছরের জীবনে এমনটা আর কখনও হয়নি যে! ইশ্‌শ্‌! ও কি আবার ঘুরতে চলে গেল? ঘোরাই তো ওর হবি। বলেছিল, 'পারলে পেঙ্গুইন আর নীল তিমিদের সঙ্গেও মোলাকাত করে আসব আইসবার্গের

পিঠে চড়ে।' জে. এন. ইউ কি ছেড়ে দিল? কেমন একটু খেয়ালিও যেন ও। আবার ও? এণাক্ষী জিভ কাটল। শফিয়ুজ্জামান। শফি।

বিছানার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে তেত্রিশখানা মুসৌরি। যেন পোস্টার-কালারে আঁকা। অফ সিজনের কী সুন্দর নিরিবিলি হোটেলটা! কী সস্তায় পুরো একটা স্যুইট! ঘরের সামনে চওড়া গোল বারান্দা। খাদের ওপর ঝুলে আছে। গোল গোল ঝুড়ি চেয়ারে নরম কুশনে পিঠ দিয়ে বসলেই কাচের ওপারে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অদ্ভুত আলো-আঁধারি। বড়ো বড়ো মেঘের ছায়া বিশাল হয়ে বিছিয়ে রয়েছে তলায়। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওই মেঘের ছাতার তলায় দাড়াতে। পাক খুলতে খুলতে চকচকে রাস্তা নেমে গেছে কত দূর। গোছা গোছা গ্রামের গাছপালা ঘরবাড়ির মধ্যে থেকে একটা একবগ্‌গা পাহাড়ি নদীর মতো মনে হয় রাস্তাটাকে। রাত্তিরে অনেক নীচে অর্ধবৃত্তাকার আলোর নকশা। শফি বলত, 'কালো চোলিতে জরির বুটির মতো চমকাচ্ছে দেখো দুন ভ্যালি। উর্বশী মেনকা কোই হবে, নাইট-ড্রেস পরেছে কালো, দারুণ না? বম্বের কুইন্স নেকলেসটা এবার গলায় ঝুলিয়ে দিলেই হয়।'

গত বছর দার্জিলিঙে এণাদের একদম ভালো লাগেনি। ঠিক ম্যালের ওপর একটা ভীষণ পশ হোটেল ছিল সেটা। দোতলার রাস্তার ওপর ঘর। সারা দিনরাত আশপাশের রেস্তোরাঁ থেকে ঝমাঝমম্ বাজনা। আনারস আর খোয়াক্ষীর দিয়ে কী সাংঘাতিক মাংস রান্না করত একটা! খেয়ে সব্বার পেট খারাপ। বাবা বলেছিল, 'কান-মাথা-পেট আপসেট করবার জন্যে এক্সট্রা পয়সা দিতে হয় জানা ছিল না আমার।' ম্যালের ওপর কী অসংখ্য মানুষের ভিড়। রোগা রোগা ঘোড়ার পিঠে মোটা-মোটা মহিলা। বেনারসি। হাই-হিল। গড়িয়াহাটের মোড়ের সঙ্গে কোনো তফাত নেই। তার ওপর আবার তখন মে'র শেষ। সারাক্ষণ মেঘ, সারাক্ষণ বৃষ্টি, কুয়াশা আড়াল করে রইল গোটা হিমালয়। কাঞ্চনজঙঘা মেঘের আড়ালেই ছুটি কাটালেন। একদিন রেঞ্জের বাঁ দিকটা একটু উঁকি দিয়েছিল, তাইতে মন আরও খারাপ। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, ঘিঞ্জি, নোংরা, গোলমাল, একদম বাজে!

এপ্রিলের শেষ। বাবা বলল, 'যাবি নাকি? একটু স্কুল কামাই হবে।' কী আর করা যাবে। স্কুল কামাই না করলে কি আর দেখা যেত স্নো পিকস? লালটিব্বার দূরবিনে চোখ লাগিয়ে সারি সারি সাদা টুপি পাহাড়ের ছবি? ওসব মে জুন এমনকি অক্টোবরেও নাকি দেখতে পাওয়া যায় না। কী ঝলমলে আবহাওয়া! সব সময়ে যেন হালকা হলুদ রঙের একটা চুন্নি দুলছে চোখের সামনে। মিষ্টি-মিষ্টি আইসক্রিম-ঠান্ডা রোদ। চুপচাপ চারদিক। রাসবিহারীর ঠিক মাঝ মধ্যিখানে এণাদের বাড়িটা। ঢং ঢঙে ট্রাম, শাঁ শাঁ বাস, ধড়ফড় করতে করতে লরি ট্রাক-টেম্পো সবই চলছে। মা বলে, 'বাবা রে বাবা! ঝালাপালা করে দিল কান!'

এখানে মে-জুন মাসে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব থেকে দারুণ গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কিছু কিছু লোক ছুটে আসে ঠিকই। কিন্তু এখনও সে ছুট পুরোপুরি আরম্ভ হয়নি। শহর একরকম ফাঁকাই। চওড়া, কালো রাস্তাগুলো সারাদিন পড়ে পড়ে অতিকায় ময়ালের মতো রোদ পোহায়। গাছের মধ্যে থেকে কী-সব পাহাড়ি পাখি অদ্ভুত স্বরে ডাকতে থাকে। নির্জনতা যেন আরও বেড়ে যায় তাতে। উতরাই ভাঙতে ভাঙতে গ্র্যানাইটের দেয়ালে চার পাপড়ির হলদে গোলাপ। মা বাবা খালি বলছিল, 'তুই যা দুরন্ত, ছটফটে, ঠিক দেড় দিন পরেই বলবি, 'বোরড হয়ে গেলুম'। জাঠতুত দিদি মীনাক্ষীকে অনেক সাধাসাধি করেছিল আসতে। হায়ার সেকেন্ডারি ফাইন্যাল ইয়ার। সায়েন্স নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে. স্কুল কামাই করতে সাহস পেল না। সারা বছর রোগীর ভিড় ঠেলতে হয় যে মানুষটাকে, সারা বছর শব্দদূষণে ভুগছেন যে মহিলা তাঁদের কাছে নির্জনতা আশীর্বাদ এবং নিরাময় মনে হতে পারে। কিন্তু এণা!

সারাদিন বাবা মা হোটেলের ঢাকা বারান্দায় দূরের দিকে চেয়ে যেন সংসার-টংসার ত্যাগ করে বুদ্ধদেব হয়ে গেছে একেবারে। কোলের ওপর রোদের রিবন। আধঘণ্টাটাক এই কাচের কৌটোর মধ্যে খুশি মনে ঘোরে এণা। পাহাড়ের ঢালে বেওয়ারিশ গোরু চরছে এবং ল্যাজের ঝাপটায় মাছি তাড়াচ্ছে এই ছ হাজার ফুট উঁচু শৈলশহরেও। পাকদন্ডি বেয়ে গিরগিটির মতো উঠে গেল দুটো গাড়োয়ালি বাচ্চা। বড়োটা আবার ছোটোটাকে পিঠে নিয়েছে। নীচে বাস রাস্তায় বাস এবং ল্যান্ডরোভার ক-টা লুকোচুরি খেলছে। খেলনার গাড়ির খেলা। বারান্দার এদিক ওদিক থেকে সমস্ত দৃশ্যটাই বারবার দেখা হয়ে গেল। চারদিকে শুধু বাজ আর বাজ। স্থানীয় লোকেরা মিষ্টি করে বলে বাঞ্জ। বুনো এপ্রিকটে কাঁচা ফল ঝুলছে। দেওদারগুলোর প্রসারিত ডালা থেকে ঘন শ্যাওলার মতো কী একটা পর্দা দুলছে। ব্যাস। আর পারে না এণা।

বেরোও না বাবা একটু! কতক্ষণ তো বসে বসে কুমিরের মতো রোদ খেলে।

দাঁড়া দাঁড়া, তোর মা কবিতা-টবিতা লিখবে নাকি ভাবছে আমি যদি মিল-টিল সাপ্লাই দিতে পারি ..।

মা বলে, 'কবিতা আর আমার এ জন্মে হবে না। তা বলে এই রোদ্দুরে হটর হটর করে ঘোরা আমার কম্মো না। আমি একটু বিশ্রাম করছি, বুঝলি? যেতে হয় বাবাকে নিয়ে যা।'

বাবা তখন মৌজ করে সিগারেটে টান দিচ্ছে। পাজামার ওপর এলিয়ে আছে গায়ের চাদর। কী কুঁড়ে! কী কুঁড়ে! জেঠু বলে তামসিক। সেই তামসিকতার চূড়ান্ত। কবিতা না আরও কিছু। এণার কথা যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

তা হলে তোমরা থাকো। আমিই একটু রাইড দিয়ে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যা', মা বলল, বেশি দূর যাসনি যেন।

'সাবধানে চড়বে, এখানকার ঘোড়াগুলো অশ্বই, তর নয় কিন্তু', বাবা হেঁকে উঠল। ততক্ষণে এণা পায়ে কেড্‌স্ এঁটে চুল দোলাতে দোলাতে ছুট। অপেক্ষা করলে যদি বাবা-মার মত বদলে যায়।

সবে স্কুলবাসের খবরদারি থেকে রেহাই পেয়েছে এণা। এখন খাবার টেবিলে বসে বাসের হর্ন শোনে নিশ্চিন্ত মনে। পাশের বাড়ির পুচকিগুলোর ফার্স্ট ট্রিপ। ও এখন হেলতে দুলতে পিউয়ের সঙ্গে একা একা রাস্তা পার হয়। ট্রামে ওঠে, হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলে চলে যায়। এক-একদিন বাবা হাসপাতালে যায় ওর স্কুলের সময়ে। সেদিন গাড়িতে উঠতে হয়। পেছনের সিটে বসে ফিসফিস করে গুলতানি করে ও আর পিউ : সুনীতা লাস্ট বেঞ্চে বসে জিওগ্রাফির মিসের কার্টুন আঁকে, শিরীন ওর বয়ফ্রেন্ডকে দিয়ে সমস্ত হোমটাস্ক করায়...এই সব। দুজনে দুজনকে খোঁচা মারে আর ফিসফিস করে হাসে, বাবা যেন শুনতে না পায়।

এই প্রথম একা একা মুসৌরির রাস্তায় এণা। বেশ মুরুব্বি চালে দরাদরি করছে, এই. ঠিকসে বাতাও তো কেত্‌না লেগা?

দশ রুপেয়াসে কুলরি ঘুমাকে লায়েগা। চড়িয়ে না—মেমসাব।

মেমসাব! আবার চড়িয়ে! ঘোড়াঅলাটা এণারই মতন অবশ্য। সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বীরদর্পে কুলরির দিকে চলে যাচ্ছে এণা। মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। ঝাঁক ঝাঁক ঘোড়া। উজ্জ্বল বাদামি, সাদা, কালো, দু রঙের মিশেল। পায়ের তলায় পাথুরে জমিতে খটাখট। গান হিল থেকে কুলরি অবধি সারা ম্যাল রোড জুড়ে, রাস্তার ধারে ধারে ভুটিয়াদের পসরা। রঙিন গরম জামা আর পাথরের মালা-টালায় ঝলমল করছে রাস্তা। আকাশ থেকে আলো, পায়ের নিচে আলো, রং, নকশা। শূন্যের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে এণা। ঘোড়ার বাঁকা পিঠের বেয়াড়া

দুলুনিটা না থাকলে তো স্রেফ পরির দেশের রাস্তা। ঘোড়াঅলাটা বলেছিল, আপ তো বহোৎ অচ্ছি চড়নেবালি হ্যাঁয়। ঔর পাঁচ রূপেয়া দিজিয়ে না, ক্যামেলস ব্যাক ভি ঘুমায় গা।

পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর প্রাণী হল ঘোড়া। আগে আগে এণার ধারণা ছিল কুকুরই মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই যে এখন ওর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে স্পিৎজ খোকাটা! সাদা সাদা ঝুলঝুলে লোমের মধ্যে গুলগুলে চোখ, বাড়িতে কারো ঢোকবার জো নেই, সরু গলায় প্রাণপণে চেঁচাবে অমনি কৌ কৌ কৌ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ধমক খেলেই জুজু। হয় এক লাফে এণার কোলে উঠে ফ্রকের কলার চিবোতে থাকবে, নয়তো সোজা খাটের তলায়। পারমিতাদের ডবারম্যানটা অবশ্য আরেকটু মান্যগণ্য। অ্যালসেশিয়ানদের ধরনধারণও অনেক দেখা গেছে। কিন্তু কুকুরেরা আসলে হল চাকরের জাত। বড়ো জোর পুঁচকে বাচ্চু। কিন্তু ঘোড়া? সওয়ার বইলে কি হবে! আকাশের দিকে মুখ তুলে, কেশর ঝেড়ে যখন হ্রেষাধ্বনি করে? কী দারুণ ম্যানলি। ক্যামেলস ব্যাকে ঢুকে কী বেকায়দাই না ফেলে দিয়েছিল এণাকে। খানাখন্দে ভরা নির্জন রাস্তা। পাইন আর দেওদারে কালো হয়ে আছে, সকাল বলে মনে হয় না। কিছুটা যায়, আর খাদের ধারে গিয়ে আগাছা খেতে শুরু করে। খাওয়াটাও উপলক্ষ্য। যেন কিছু খুঁজছে। মালকিনকে যেন জানিয়েও দিচ্ছে তোমার মর্জিমাফিক আমি চলব মনেও কোরো না।

মেয়ে গেছে বহুক্ষণ। কমলেশবাবু বললেন, 'মেয়েটাকে একলা পাঠাতে তুমি যেরকম ব্যস্ত হয়ে পড়লে...'

সুস্মিতা বললেন, 'বা রে তুমি যেন পড়োনি! কবিতা ভাবছ, শুধু অশ্ব, তর তম নয়, কত কি জপালে! সব দোষ আমার এখন, না!'

'দোষ কার জানি না। তবে ইটস এভিডেন্ট বাই নাউ যে কাজটা ভালো হয়নি। নির্জন অচেনা শহরের রাস্তায় একটা বিপদ হতে কতক্ষণ? আর বিপদ কি আজকাল একরকম?'

শিউরে উঠে দাঁড়ালেন সুস্মিতা। কমলেশবাবু অনেকক্ষণ থেকেই কাচের ওপর চোখ পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। উতরাইয়ে নামছেন দুজন। গান্ধি চৌকের দিকে। ঘোড়াঅলা, রিকশাঅলারা অনেকেই খুব চেনা হয়ে গিয়েছিল। রিকশাঅলা বৈজলাল বললে, 'ডরিয়ে মৎ সাব। বেবি আ যায়গি' বলল বটে, কিন্তু কার ঘোড়ায় এণা চাপল, কোন দিকে গেল, কিছুই বলতে পারল না। মোড়ের মাথায় দুজনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবনার ব্যারোমিটারে পারার অবস্থা বিপজ্জনক।

সুস্মিতা বললেন, চলো, বৈজলালকে নিয়ে খুঁজতে বেরোই।

কোন দিকে যাবে? তিন দিকে তিনটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

তা বলে তো আর চুপ করে বসে থাকা যায় না।

ছোটাছুটিটা তুমিই করো তা হলে, আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।

'হুয়া ক্যা?' বৈজলাল, কমলেশবাবু এবং প্রায় সাশ্রুনেত্র সুস্মিতার সামনে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে, স্পাইকঅলা ট্রেকিং শ্যু পরে দুদিকে দু পা সটান, টেরিউলের চেক-চেক ট্রাউজার্সের পকেটে হাত, বয়স বেশি না হলেও বোঝা যায় বেশ অভিজ্ঞ সে। যে কোনো পরিস্থিতির প্রভু। কমলেশ-সুস্মিতা দুজনেই বেশ ভরসা পেয়ে গেছেন। খুব সম্ভব পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবি হবে, পাশ কাটিয়ে চলে গেল না তো! ওঁদের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই সামান্য টান-অলা উচ্চারণে বলল, 'আহা! দিস গার্ল! সফেদ ঘোড়ার পিঠে একেই আমি ঘুমতে দেখেছি ক্যামেলস ব্যাকে। সোচছিলাম কি লোক্যাল মেয়ে, নইলে বারণ করতাম। দাঁড়ান, আমি দেখছি। ঘাবড়াইয়ে মৎ।'

কমলেশ আর সুস্মিতা তখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন না। দুজনে দুজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

এণার ঘোড়া খাদের বিপজ্জনক ঢালে। নাক বাড়িয়ে নীচে কী খুঁজছে সেই জানে। পিঠ থেকে নামানো ঘাড় পর্যন্ত একটা বিচ্ছিরি বাঁক। হড়কে হড়কে নেমে আসছে এণা। রাশ আঁকড়ে প্রাণপণে শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার পিঠে। ছোকরা ঘোড়াঅলাটা সমানে হ্যাট হ্যাট করে চলেছে। এণা কিছু দেখতে পাচ্ছে না খালি নিচে খাদ, পাহাড়ি কুঁড়ে ঘর। ওরই একটার চালে সে ঝপাং করে পড়বে। তারপর গড়াতে গড়াতে গড়াতে. শেষ। হাত-পা-ভাঙা দ হয়ে বেঁচে না থাকাই তো ভালো! মায়ের মুখটা মনে পড়ছে। আছাড়ি পিছাড়ি করে কাঁদছে। বাবা? পাথর। সামনে একটা শক্ত থাবা দেখতে পেল এণা। ঘোড়ার মুখের কাছে লাগামটা ধরেছে। তারপর এক ঝটকায় তার সাদা ঘোড়া ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে ডাক দিয়ে উঠল। এণা দেখল বাদামি ঘোড়ার পিঠে চেক-চেক ট্রাউজার্স চকোলেট উইন্ডচিটার, সবল কাঁধ, দেবদূত?

'আপনার মা বাবা কান্নাকাটি লাগিয়েছেন। জলদি চলুন।'

ঘোড়াঅলাটাকে সাঙঘাতিক ধমক।

এই প্রথম এণাকে কেউ আপনি বলল।

কী রাগারাগি! বকাবকি! এণার সঙ্গে মা-র। ঘোড়াঅলা ছেলেটার সঙ্গে বাবার। উদ্ধারকর্তা হেসে বলল, 'বকাঝকা করে ফায়দা কি আ্যান্টিজি? ঘুমতে গেলে একরম কিছু কিছু হবেই. নেই হোনেসে ঘুমবার চার্ম থোড়াই আছে। জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার. ইয়ে এক বাত হ্যায় না?'

সুস্মিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি খুব বাংলা বলতে পারো তো! কিছু মনে করো না পাঞ্জাবি...না!'

উর্দু। গুজরাটি মুসলিম। মাদার ল্যাঙ্গোয়েজ সাপোজড টু বি উর্দু। জানি না। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ। স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ বাংলা ছিল। বাংলা বলতে আমার কিছু ডর্ ধা নেই

মা বলল, 'পশ্চিমবঙ্গে দু-তিন পুরুষ কাটিয়েও তো অবাঙালিরা ভালো বাংলা বলতে পারে না। তোমাকে উৎসাহী বলতে হবে।'

বললাম না, সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ বাংলা ছিল। আমি তো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সবই অরিজিন্যালে পড়েছি। যত ভালো পড়ি, তত ভালো বলি না। আরও অনেক প্রোবাদ-সুভাষিত জানি আ্যান্টিজি, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, নাচ নেই জানে তো উঠানকাই গলতি হ্যায়, ঠিক কি না?

মিটি মিটি হেসে সুস্মিতা বললেন, 'কলকাতার কোথায় থাকো তোমরা?'

থাকি না, থাকতাম। ওয়েলিংটন। এখনও আস্তানা আছে সেখানে। লেবার-প্রোবলেমের জন্য বাবাও ব্যাবসা গুটিয়ে দিল্লি গেলেন। আমাকেও ওখানে জে. এন যুতে ঢুকতে হল।

কীসের ব্যাবসা তোমাদের?

আমাদের কি? বাবার। কেমিক্যালসের। ক্যা চিজ মুঝে মালুম নেই, আ্যান্টিজি। ইন্টারেস্ট নেই। ডক্টরেট করব। বাইরে যাব। ব্যাবসা ছোটো ভাই দেখতে হয় দেখবে। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পড়ছি।

ঠিক কি নাম যেন বললে তোমার?

সৈয়দ শফিয়ুজ্জামান। শফি বলবেন।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে বাবা বলেছিলো, বেশ ছেলেটি।

মা বলেছিল, বাংলা সম্পর্কে মমতা আছে এরকম অবাঙালিদের ওপর তোমার বরাবরের দুর্বলতা।

উঠে দাঁড়াল এণা। কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। ভেতরে যেন ফিউজটা জ্বলে গেছে। সব

অন্ধকার। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। স্বর্ণদি বলল, 'আঙুরগুলান খাইতে ভুলছস এণু? বরফে রাখি? খাস। বকা খাইবি নইলে...'

ক্যাশমিলনের এই মেরুন কার্ডিগ্যানটার জন্য পঁচানব্বুই প্রায় দিয়েই দিয়েছিল মা। শফি বলল, 'কী করছেন? এ সোয়েটারবালি, সোচা সব নাদান, ক্যা?'

আশাতীত কম দামে ভালো ভালো জিনিস কিনেছিল ওরা। শফি বলেছিল, 'চোখে লাগলে কিনে নিন, আন্টিজি। অন্য হিল স্টেশনে এরকম ফ্যাশনেবল্ জিনিস পাচ্ছেন না।' কোনো কোনো সময় আবার বলত, 'দিয়েই দিন যা চায়। আফট্রল পভার্টিলাইনের নীচে তো। জ্বালানির জন্যে তামাম পাইনবন সাফ করে দিলে। এৎনা ডিফরেস্টেশন হোনে সে ক্যা হোগা ফিউচার মে, মালুম?'

'আপনি বুঝি মার্কেট রিসার্চ করেন? স্ট্যাটিসটিক্স্ নেন ঘুরে ঘুরে?' ওর দরাদরির বহর দেখে এণা বলেছিল।

তা বলতে পারেন। ডালহৌসি বাদ সব হিল স্টেশন ঘোরা কিনা। ভুটিয়ালোগদের হালচাল সব জানা। আপনার মতন তো এক মাদার নেই আমার যে প্যার সে বানিয়ে দেবেন, নিজের দেখভাল নিজেরই করতে হয়, নিজে নিজেই কিনে নিতে হয় কিনা সব!

বাবা বলল, 'এণুকে তুমি আপনি বলছ? হাসালে! এখনও রোজ রাত্তিরে আমার কোলে বসে পুরো এক গ্লাস দুধ খেয়ে তবে শুতে যায়। শী ইজ ফোর্টিন, গোযিং অন ফিফটিন।'

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু বাবা', এণা প্রতিবাদ করল লজ্জায়, রাগে।

সুস্মিতা বললেন, 'এই শুরু হল। দুজনে যত ভাব তত ঝগড়া। না শফি। এণা মোটেই অমন করে না। তবে বড্ড ভূতের ভয় কিনা! তাই মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ লম্ফ মেরে মা-বাবার মধ্যিখানে সেঁটে যায়। যদি ভূতে হাত বাড়ায়।'

এণার খুব রাগ হচ্ছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'তোমরা যা খুশি বলতে থাকো, আমিও যা খুশি করতে থাকি। ওই কাটা ফল না কী যেন বিক্রি করছে লোকটা, ওইগুলো আমি খাচ্ছিই খাচ্ছি।'

শফি খুব হাসছিল। ডানদিকে একটা গজদাঁত। হাসলে দেখা যায়।

কমলেশবাবু মোটেই করিৎকর্মা নন সুস্মিতার মতে, সুস্মিতা ভীষণ খরচে কমলেশবাবুর মতে, বাবা-মা সঙ্গী হিসেবে একেবারে হোপলেস, এণার মতে। এণা ইজ টু মাচ বাবা-মার মতে। বাবা বলেছিল, 'একলা একলা তোমাদের এই ইমপেচুয়াস ইমপিরিয়াল মেজাজের পেয়ারকে সামলানো একটা সুপারহিউম্যান টাস্ক। যা দেখবে তাই কিনতে হবে! আর কী শেমলেস দরাদরি। একশো টাকার জিনিসটাকে বেমালুম বলে দিলে পাঁচ টাকা। আমার পক্ষে যাই বলো মোস্ট হিউমিলিয়েটিং এক্সপিরিয়েন্স!'

বাবারই সবচেয়ে বেশি জিনিস কেনা হয়েছিল কিন্তু। মা রাগ করে বলেছিল, 'ঠিক আছে। শুধু শুধুই যখন কিনছি তখন বিলিয়ে দোব। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীর নেমতন্ন তো কম হয় না। তোমার বন্ধুরা—পরিতোষ ভৌমিক, অসীমাংশু চট্টোপাধ্যায় সব পরবে এখন...'

তেগবাহাদুরের একটা আলাদা, একক ছবি নিয়েছে এণা। এই যে।

ওদের প্রিয় সাদা ঘোড়াটার নাম তেগবাহাদুর। কেন কে জানে? বারান্দা ছেড়ে আবার ঘরে এসে বসেছে এণা। তেগবাহাদুরের ছবিটা ব্রততীর কাকাকে দিতে হবে, অয়েলে একটা এঁকে দিতে বলবে। ও[illegible] এই ডিভানের ঠিক পায়ের দিকে থাকবে। ওর প্রিয় ভঙ্গিই ছিল কেশর ঝেড়ে আকাশের দিকে মু[illegible]নাকে তোলা। ছুঁচোলো মুখটা দিয়ে যেন আকাশটাকেই বিদ্ধ করবে ও। শফি বলত—করবে না কেন? ও তো আসলে পিকাসোর ঘোড়া। ঘোড়াদের ভগবানের কাছে দিনরাত প্রে করছে—'ও [illegible]র্ড, পরের জন্মে যেন এসব সওয়ার ঔর সইস লোগ ঘোড়া হয়, আর আমি যেন

মানুষ হই, এ জন্মে ওরা আমার পিঠে চড়ল তো সে জন্মে হম ভি ওদের ওপর চড়ে যাব। শোধ বোধ!'

ব্রেকফাস্টের পর ও রোজ এণাকে তেগবাহাদুরের পিঠে চড়াতে নিয়ে যাবেই। প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতার পর এণা ভয় পেত। শফি বলত, ঝান্সি কী রানি বনবার এমন চান্স কভি মিলবে না। ডরবে না একদম। ঠিক পেরে যাবে। মঞ্জিলকে লিয়ে দো গম চলু তো মঞ্জিল সামনে আ জায়ে। তোমার মঞ্জিল মুন ভি হোতে পারে।' সত্যিই! পিয়ালি শুটিং ক্লাবে যায়, রত্না পাল ক্রিকেট খেলে, স্বাতী মিত্র রোয়িং করে কত প্রাইজ এনেছে,এণার মা বাবা ওকে খেলাধুলো কিচ্ছু করতে দেবে না। কেন? ক-দিনেই মন্দ শেখেনি কিন্তু। জকিদের ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েও পড়ত মাঝে মাঝে। তখনও ও বলত, 'দ্য মোস্ট বিউটিফুল অ্যানিমল ইন দা ওয়ার্ল্ড। হোয়াট গ্রেস! পোয়েটিক! হিরোইক!'

ময়দানে মাউন্টেড পুলিশগুলোকে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায় এখন। কী ভাগ্যবান লোকগুলো! দাবা খেলার সময়েও ওই ঘোড়ার চালেই বেশিরভাগ ওকে মাত করত শফি, বলত, 'দেখছ তো, ঘোড়াদের সঙ্গে আমার কি পার্ফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং! অ্যান্ড দেয়ার আর মোর থিংস ইন হর্সেস দ্যান আর ড্রেমট্ অফ ইন ইয়োর বুকস অন চেস!'

এই ছবিটা কেম্পটির পথে, বাবা তুলেছে। কত নীচে ফলস। ওপর থেকে মানুষগুলোকে ছোটো নাইলনের ডলের মতো দেখাচ্ছে। দুটো রুপোলি ধারায় নেমে গেছে প্রপাত।

শাড়ি ভিজে যাবে বলে মা নামল না কিছুতেই। বাবা তো কুঁড়ের বেহদ্দ। অন্তত দশ হাত দূরে ক্যামেরা কাঁধে দাঁড়িয়ে। বোল্ডারগুলোর ওপর নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছিল এণা। ধা ধিনা, না তি না, তেরে কেটে ধুন, কৎ, তে ধাগে. ।

কী মজা না? আপনি আগে কটা ফলস দেখেছেন?

কতো! হুড্রু, উস্রি, ভিক্টোরিয়া, নর্মদা ফলস, যোগ এখনও বাদ আছে কেদার যেতে কত ঝরণা ফলস, র‍্যাপিডস, ক্যাটার্যাক্টস!

উস্রি আমিও দেখেছি, ছোটবেলায়। এটা একদম অন্যরকম, না?

নেচারে তো কভী ডুপ্লিকেট পারে না। অর্ডারি চাঁজ নেই তো! মানুষ ভি ডুপ্লিকেট হয় না। আমরা সব অলগ্ অলগ্ ফলস আছি।

উবি বাবা! কবি না ফিলসফার?

স্ট্যান্ড ক্লোজ টু দা সাবলাইম, অ্যান্ড ইউ আর বাউন্ড টু বি বোথ।

আচ্ছা আচ্ছা। তা আপনি কী রকমের ফলস সাব?

আমি? অফ কোর্স নয়াগ্রার মতো! দুর্দান্ত আওয়াজ। টপ স্পিডে ঝরে যাচ্ছি। লেকেন উইনটার আনে দো। থেমে যাবো অচানক। ঝটসে জিরো ডিগ্রির নীচে যাবে টেম্পারেচার। বাস। অ্যাবসল্যুট সাইলেন্স।

ভীষণ অহংকারী তো দেখছি।

সুস্মিতা বললেন, কী এত বলাবলি করছে গো ওরা? অত কিসের হাসি?

কমলেশ মুখ থেকে সিগারেটটা না সরিয়েই জবাব দেন, যাই বলুক না কেন? তাতে তোমার কী?

আমার কি? বেশ বলছ তো? আমার মেয়ে নয়?

তুমিও একদিন পঞ্চদশী ছিলে। মুগ্ধ যুবকদের সঙ্গে অনেক অর্থহীন প্রলাপ বকেছ। অনেক অর্থহীন হাসি হেসেছ। ও কিছু না।

প্রলাপ বকেছি? হায় রে! আমাদের বাগবাজারের বাড়ির বারান্দায় সাবেকি চিকটা এখন ঝোলানো আছে, ভুলে গেছ বুঝি?

তা। পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে পারোনি বলে এখন হিংসেয় মেয়ের ওপর টিকটিকিগিরি করছ, এই তো!

সুস্মিতা রাগ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিটিমিটি হাসতে হাসতে কমলেশবাবু ক্যামেরা তুলে নিয়েছিলেন। তেরো নম্বর ছবিতে মায়ের রাগত প্রোফাইল। কেন রাগত এণা জানে না।

নামার সময়ে ওরা স্বচ্ছন্দে নেমে গিয়েছিল। ওঠার সময়েই হল বিপদ। বিশেষ করে সুস্মিতার। বাবা-মা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। ওরা দুজন টকাটক এ পাথরে ও পাথরে পা রেখে উঠে যাচ্ছে. কী সুন্দর মিহি রোদের দিন। পরিশ্রমে ছোট্ট ছোট্ট দানার মতো ঘাম ফুটছে কপালে।

'অত জোরে দৌড়োয় না' শফি বলেছিল, 'হঠাৎ লেগে যেতে পারে। আনন্যাচারাল ব্রিদিং হতে লাগছে তো!'

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল এণা—'আনন্যাচারাল ব্রিদিং না হাতি। আমি আরও জোরে দৌড়তে পারি। নিজে আর পারছেন না তাই বলুন।'

'আমি পারছি না। হাউ ডেয়ার য়ু! জানো কতবার ট্রেকিং-এ গেছি! ফালুট, সান্দাকফু, রূপকুণ্ড, পাহাড়ে চড়ার কতকগুলো নিয়ম আছে বেবি. সেগুলো ফলো করতে হয়।'

নববিবাহিত দম্পতি এসেছে প্রচুর। বোধহয় হনিমুনে। অস্বস্তিকর দৃশ্য চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে। অস্বস্তি কাটাতে শফি বলেছিল—দাঁড়াও তোমার একটা ছবি তুলি। ওই উঁচু পাথরটার ওপর ডান পাটা তুলে দাঁড়াও তো!

বাঘের মৃতদেহের ওপর পা রেখে শিকারিরা যেমন দাঁড়ায়? তা আমার রাইফেল কই?

বাঃ, আচ্ছা বলেছ তো! অরিজিন্যালিটি হ্যায়। লেকেন অরিজিন্যাআলিটি ইজ সিম্পলি এ পেয়ার অফ ফ্রেশ আইজ।

কোথা থেকে একটা গাছের ডাল জোগাড় করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, 'এই নাও, এবার আর ছবিটাতে তাল কাটছে না। দিস মাস্ট বি এ পিস অফ মিউজিক।'

পাঠাতে মনে থাকবে তো? ঠিকানা দিয়েছি কিন্তু কাল। আর কলকাতায় গেলেই আগে আমাদের বাড়ি।

জরুর। তবে ছবিগুলোই আসল হেডেক কিনা! মেয়েরা ছবি বিষয়ে বেদম লোভী আছে।

সত্যি বলছি। শুধু ছবিগুলোর জন্যে মোটেই নয়। একলা একলা বাড়িতে বোরড লাগে আমার। দারুণ দারুণ বিদেশি ইনডোর গেম আছে। ভালো সঙ্গী না হলে খেলা হয়? মজার মজার বন্ধু আছে। আলাপ করিয়ে দোব। রুম্পাদের রুফ গার্ডেনে মুনলাইট পিকনিক করা যাবে।

শুধু ফটোগুলোর জন্যে নয়, ঠিক? তিন সত্যি লাগাও।

বাবা বাবা! করলুম তিন সত্যি। তিন সত্যিও জানেন? কি ভীষণ সুপারস্টিশাস! গাঁইয়া একেবারে।

ও, আমার বেলা সুপারস্টিশাস! কাল তা হলে—এক শালিক দেখে অমনি কালো মুখ হল কেন?

মোটেই না।

মোটেই হ্যাঁ।

আজ্ঞে না। আমি আসলে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। মুে [illegible]রিতে শালিক দেখে অবাক হবো না! মনে হচ্ছিল ওটা আমাদের পার্কের শালিকটাই। রোজ যেটা [illegible]গাচূড়ার ডালে বসে কটর কটর করে!

হতেই পারে। দোস্ত তো! তোমার ট্রেনটার সাথ্ সাথ্ উড়েছে বেচারা।

ছবিগুলো একমনে দেখছে এণা। কখনও চলে যাচ্ছে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন, কখনও গান হিল। বিদ্যুৎবর্ষী আকাশের তলায়, দেওদার বীথিকার পথে পথে বহু দূর। পায়ের তলায় ঘোড়ার নালে শব্দ উঠছে। ফুলকি বেরোচ্ছে। ছোটাও। ঘোড়া ছোটাও। জোরে আরো জোরে! কী বিস্ময়কর বাঁক নিয়ে পথ নেমে গেছে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইনস্টিট্যুটের দিকে। রংবেরঙের মোমের ফুলের মতো বিরাট বিরাট গ্ল্যাডিওলাস ফুটে আছে ঝাড়ে ঝাড়ে। আলো হয়ে আছে কাচঘর। রবারের বোট ভাসছে লেকের জলে। সবুজ দোপাট্টা উড়ছে বোটবিহারিণীর। শফি বলেছিল—ওদের নিয়ে গোমুখ যাবে। পথ যেমনি দুর্গম। তেমনি সুন্দর। ওয়াইল্ড বিউটি। জ্যোৎস্নারাতে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার যা দেখায় না!

আসবার আগের দিন ঠিক সাড়ে সাতটায় হাজির। সেই চেক চেক গরম প্যান্ট। চকোলেট উইন্ডচিটার। তখনও প্রচণ্ড শীতের কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে হোটেল। এণা বলেছিল—বেডটির লোভটাও বুঝি ছাড়তে পারলেন না? বাবা! বাবা! অ্যাত্তো সকালে কেউ কাউকে ঘুম থেকে তোলে? তুললে পাপ হয়।

বাবা বলল, ঘুমো না তুই কত ঘুমোবি। তবে মনে রাখিস, আগামীকাল এরকম সময় আমরা দেরাদুনগামী বাসে চড়বার জন্যে রেডি হচ্ছি। শেষবারের মতো যা দেখবার দেখে নে।

হোটেল থেকে বেরিয়েই মা বলল, আমাদের একটা ফ্যামিলি গ্রুপ তুলে দাও তো শফি! ও একটাতেও থাকছে না।

রাস্তার বাঁকে সেই ছবি। মা-বাবার বুকের কাছে হারের লকেটের মতো দুলছে এণা। ঝকঝকে হাসি। তারপরই বাবার ক্যামেরাটা নিয়ে দুজনে ক্যামেলস ব্যাক। বাবা-মা রেস্তোরাঁর সামনে কালভার্টের ওপর বসে রইল। তেগবাহাদুরের পিঠে ওরা দুজন। সেই প্রথম দিনকার স্পটটাতে এসে রেলিফ্লেক্স তুলে নিল শফি। পেছনে আকাশ, দেওদার, নীল, কালচে সবুজ।

প্রথম দেখা যেখানে, শেষ দেখাও সেখানেই হোক, কী বলো এণা! লাস্ট রাইড টুগেদার...

এণার মনটা হঠাৎ বড্ড বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

কেন? আজ তো সারাদিনই আমাদের সঙ্গে থাকবার কথা। বেশ তো!

সহী বাত। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা, ঠিক কিনা?' 'তোমার' শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর। চোখে চোখ। এণা চুপ। 'তোমার' শব্দটা ঘিরে তৈরি হচ্ছে অজানা, নিবিড় একটা অদ্ভুত গোপন অনুভূতির অবয়ব। সানগ্লাসের কুয়াশার আড়ালে এই প্রথম আরেক রকম শিশির জমছে।

ভালো করে হাসো! বাঃ!—ক্লিক।

এখন সেই ছবিটাই দেখছে এণা। দেরাদুনের মামার কাছে পড়েছিল। কয়েকটা ফিল্ম বাদ ছিল, সেগুলো মামাই তুলল, তারপর বলল, 'আমি ওয়াশ-টোয়াশ করে পাঠিয়ে দোব কমলেশদা।' বাবাও যেমন, বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' এত কুঁড়ে মামা যে ছবি পাঠাতে যুগ কাবার করে দিলে। অক্টোবরের আকাশ আজ তেমনি মুসৌরি নীল, রোদ্দুরে মাঝ দুপুরের মুসৌরি ওম, তেমনি পাহাড়ি সবুজই বুঝি ফলে আছে রাসবিহারীর গাছগাছালিতে। বিকেল তিনটের নির্জনতায় চিঁউ চিঁউ করে কী একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে ক্রমাগত, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা জোড়া ট্রাফিক সত্ত্বেও ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রোশ ক্রোশ মন-কেমন-করা নির্জনতা। এণার বুকের মাঝখানটায় সেই গোপন বালির বিন্দুটাকে ঘিরে ঘিরে কেমন একটা অব্যক্ত কান্না শরীর নেয়। শুক্তির মধ্যে মুক্তো। অন্যমনস্কভাবে একটা ঢোঁক গিলে ঘুঙুরের ব্যাগটা তুলে নেয় এণাক্ষী। আনমনেই পার হয় রাস্তা। নাচের স্কুল আছে। অন্তরা, লায়লী, কে, সাবিত্রী, উষা...ধা... ক্রেধা...ধিনতা কৎ, ধিনা নানাধা, ধিনা নানাধা,

ধিনা। ভীষণ ভিড় বাসটায়। আনমনে বাসে উঠল, টিকিট কাটল। রোববারেও এত ভিড়। হাজরার মোড়। হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল এণা। স্টপে তিন-চারটি ছেলে খুব হাত-মুখ নেড়ে কথা বলছে। ওদের মধ্যে শফি না?—'শফিদা! শফিদা! এই শফি!'

ও দেখতে পাচ্ছে না কেন? শুনতে পাচ্ছে না কেন? এত ভিড় টের পাচ্ছে না তো এণা! মাঝখানে তো কেউ নেই! একবার যেন তাকাল এদিকে! চোখাচোখি হয়েও হল না। কে হবে ও ছাড়া! পাকা পেয়ারার মতো মুখের রং! সোনালি সোনালি গোঁফ! একগাল কোঁকড়া দাড়ি, চওড়া কাঁধের ওপর সেই অশান্ত চুল। বাসটাতে উঠেও উঠল না যে! এণা নামতে চাইল, পারল না। সামনে জমাট মানুষের দেয়াল। যা ছেড়ে দিল। ঠিক সেই সময়ে চোখে চোখ পড়ল।

কী হল রে? ছেড়ে দিলি যে বাসটা? আচ্ছা আহাম্মক তো!' শ্যামলের কথার কোনো জবাব দিল না কল্যাণ। সে শুনেছে। মাইল মাইল জনজঙ্গলের নির্জনতার মধ্যে থেকে শরবিদ্ধ পক্ষীশাবকের চড়া সুরের আর্ত ডাক—'শফিদা! শফিদা! এই শফি!' হৃদয়জোড়া বিভ্রান্তির মধ্যে দেখতেও পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে একটি অপাপবিদ্ধ কিশোরী মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়। অভিমান? আশাভঙ্গ। অপমানে নীল মুখখানা।

কিন্তু কী করবে সে? পথের আলাপ ঘরে টেনে আনার কোনো উপায় নেই যে তার। কি করবে সে একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত দীন পরিচয়ের মধ্যে আটকে থাকতে যদি না চায় মন? প্রবাসে তাই তো সে সব সময়ে অজ্ঞাতনামা গরঠিকানা। কখনো বাঙালি ক্রিশ্চান অ্যালফ্রেড বিকাশ মণ্ডল—মুখে শেকসপীয়র, এলিয়ট, হুইটম্যানের ফুলঝুরি, কখনো অমলজ্যোতি সিংহরায় রাঢ় বঙ্গের জমিদারবংশের শেষ কুলপ্রদীপ, প্রাচীন জলসাঘরের স্মৃতি কাফি ঠুংরি, বাগেশ্রী তারানার টুকরা হয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কখনো এমনি গুজবাতি মুসলিম সৈয়দ শফিয়ুজ্জমান। প্রতারক? শহরতলির স্টুডিয়োতে তালা ঝুলিয়ে যখন সে একা একা বেরিয়ে পড়ে তখন তো গৃহত্যাগী বৈরাগীর মতোই ফেলে দিয়ে যায় এখানকার পরিচয়। সন্ন্যাসীরা অন্য নাম নেন না? সেও তো একরকম পরিচয় বদলের নেশা! এক পরিচয়ে যে বড়ো ক্লান্তি! পথের ঝুলি বেঁদিয়ার আলখাল্লা আবার পথেই নামিয়ে দিয়ে আসে মফস্‌সলের ফটোগ্রাফার কল্যাণময় বিশ্বাস। ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত কলকাতার লোকের সঙ্গে, সাধারণত এড়িয়ে চলে সে। এবার বড়ো ভুল হয়ে গিয়েছিল। উতরাই ভাঙতে ভাঙতে গ্র্যানাইটের দেয়ালে ফুটে ছিল হলুদ গোলাপ। চার পাপড়ির ছোট্ট ফুল! ছেঁড়েনি ছোঁয়নি। শুধু চোখ মেলে চেয়ে দেখেছে। অ্যালবামের পাতায় বন্দি হয়ে থাক দু পাথরে দুই পা, পাহাড়ি গাছের ডাল হাতে পঞ্চদশী সেই ভ্রমণসঙ্গিনী। স্রোতের পাথর কি চার দেওয়ালের মধ্যে কুড়িয়ে আনতে আছে? জলের তলায় জেগে জেগে ওরা দূর আকাশের স্বপ্ন দেখে। জাগরস্বপ্ন ভাঙাতে নেই।

অন্য ভাই

শমী এসেছে আগে। ধৈর্য ধরতে না পেরে। মেয়েকে নিয়ে একলা। ওর স্বামী বিনায়ক কথা দিয়েছে শিগগির আসবে। দু-একদিন থেকে ওদের নিয়ে ফিরে যাবে। সময় জিনিসটা ওর কখনও হয় না। ছুটি জিনিসটাও ও কক্ষনো নাকি পায় না। আসল কথা, শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের কারও অতিথি হয়ে থাকতে বিনায়কের ভীষণ আপত্তি। কতবার শমী বলেছে, 'দিদির তো নিজের সংসার। শ্বশুরবাড়ির কেউ নেই। সংকোচ কিসের? অতবড়ো বাংলো, গেলেই একখানা পুরো ঘর, বাথরুম, সামনের ব্যালকনি ছেড়ে দেবে। ব্যালকনিতে তুমি যত খুশি যোগাসন কর না, কেউ দেখতে আসবে না। অত করে বলে জুলি, যেতে দোষ কি?' দিদি বেশি বড়ো নয়, শমী তাকে জুলি বলে ডাকতেই অভ্যস্ত। বিনায়কের সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। বলবে—'কী আশ্চর্য, দিদি অমন একখানা গ্ল্যামারাস শালী, যেতে বলছে, আমি কি উপায় থাকলে যেতুম না!'

শমী এর চেয়ে বেশি কথা বলতে পারে না। তার ছিপছিপে নাতিদীর্ঘ শরীরের ওপর পাতলা ঈষৎ পাণ্ডুর মুখ। গভীরভাবে বসানো চোখের বাদামি মণি হঠাৎ হঠাৎ বড়ো বড়ো পল্লব দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে সে। কোনো তর্কাতর্কির সম্ভাবনা দেখলেই এই তার প্রতিক্রিয়া। নাকের পাটা একটু কাঁপে। কপালের ওপর একটা লম্বা শিরা জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়। শমী বেশি কথা বলতে পারে না।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে সে খুব ধাতস্থ। কাণ্ডজ্ঞানের বেড়া ভাঙবার মতো ভাবাবেগের কারবারি আদৌ নয়। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে ভাবাবেগে কখনও কখনও তার গলার কাছের পেশি ত্বক সব কিছুকে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। তারপর বহু চেষ্টায় মস্ত বড়ো একটা খাদ্যপিণ্ডের মতো এবার নেমে যাচ্ছে গলনালি দিয়ে। এসব জিনিস কেউ বড়ো একটা লক্ষ করে না। শমীর স্বামী বিনায়কও না। কাজেই শমী যে কী, শমী যে কে এ প্রশ্ন অনুত্তরই থেকে যায়। আরও অনেক মেয়ে, কিছু কিছু পুরুষ অর্থাৎ আরও কিছু কিছু মানুষের মতো এ লোকযাত্রায় শমী পরিচয়হীন রয়ে গেছে। ছাইয়ের ওপর হালকা ফুলছাপ শিফন শাড়ি পরে, একটা পাতলা সুটকেস একহাতে, আর তার সযত্নলালিত বারো বছরের মেয়ে লোপামুদ্রাকে আর একহাতে নিয়ে শমী যখন প্ল্যাটফর্মে পা দিল, তার দিদি জুলি আর জামাইবাবু বরুণদা দু ধার থেকে মহা হইচই বাধিয়ে দিলেন, 'যাক শমী তুই শেষ পর্যন্ত আসতে পারলি তা হলে। সূর্যটা তো ঠিক দিকেই উঠেছিল রে।'

'দেখো চাঁদটা লক্ষ করতে হবে। চাঁদের একটা কিছু গোলমাল হয়ে থাকতে পারে।'

জুলি আদর করে কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস। বরুণদা বললেন, 'নিজের সঙ্গে তুলনা করলে তুমি সব্বাইকেই রোগা দেখবে জুলি। ওটা কোরো না।'

'নিজেকে বাদ দিয়ে কথা বলো না।' জুলি খ্যাঁক করে উঠল, 'যতই হোক তোমার মতো ভুঁড়ি আর ডবল গাল তো আমি বাগাতে পারিনি। জানিস শমী, তোর বরুণদার ক্লাবের ওপর কী টান, কী টান। ক্লাবে গিয়ে রোজ সন্ধেবেলা কী হয় বলো তো?'

শমী একটু মৃদু স্বভাবের। সে বাধা দিয়ে বলল, 'ওঃ জুলি, বরুণদার কী সুন্দর লালচে গাল হয়েছে, তুই শুধু ফ্যাটটাই দেখলি!'

বরুণদা গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখো বাবা গালাগাল দিচ্ছো না তো?'

লোপামুদ্রা ওরফে লুপ তখন তার তিন বছরের বড়োদাদা সীজারের সঙ্গে গল্পে মত্ত। উত্তেজিত হাত-পা নাড়ার মধ্যে থেকে স্টেফি, এডবার্গ, লেন্ডল বুলেটের মতো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। দুজনে এগিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে। বড়োরা কেউ এল, না এল লক্ষ্যই নেই।

বরুণদা বলল, 'চলো, জুলি শমী তাড়াতাড়ি পা চালাও, সুটকেসটা আমার হাতে দাও, কী এমন মহামূল্যবান সম্পত্তি ওতে করে নিয়ে এসেছ যে তখন থেকে আঁকড়ে রয়েছ?'

জুলি বলল, 'হ্যাঁরে শমী, তাড়াতাড়ি পা চালা, নইলে স্টিয়ারিং সীজারের হাতে চলে যাবে।'

শমী ভুরু কুঁচকে বলল, 'সে কী? ওর কি লাইসেন্স আছে নাকি! ওর বয়সের ছেলেকে কি লাইসেন্স দ্যায়?'

জুলি বলল, 'ষোল-আঠারো ওসব সাধারণ মানুষের নিয়ম শমী। জিনিয়াসদের ক্ষেত্রে বয়সটা কোনও বাধাই নয়।'

বরুণদা বললেন, 'তা ছাড়া গাড়ির স্টিয়ারিং তো সামান্য কথা জীবনের স্টিয়ারিংটাই আমার ছেলের হাতে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে।'

শমী হেসে ফেলল, 'তা হলে আর দেরি নয়, শিগগির চলুন যদি আটকাতে পারি।'

বরুণদা কটাক্ষে দুই বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আটকাবে সিজারকে?' বলে হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন মশা মাপে কত জল!'

জুলি রেগে উঠল, 'দ্যাখো আমাকে যখন তখন হাতি, ঘোড়া, জলহস্তী, বাইসন যা খুশি বলো আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বোনকে খবরদার মশা মাছিটাছি বলতে পারবে না।'

বরুণদা হাসতে হাসতে বলল, 'মাছির আগে যদি টুক করে একটা মউ বসিয়ে দিই? তবে? তবে গ্রাহ্য হবে তো?'

শমী বলল, 'জুলি রাজি হসনি। মউমাছি কী রকম ভিনভিন করে দেখেছিস? ঘেন্না লাগে না ঘুরঘুর করলে? আর সুযোগ পেলেই হুল ফোটায়। আমাদের বারান্দার পাশে দোলনচাঁপার অত সুন্দর গাছটা কেটেই ফেলতে হল মউমাছির জ্বালায়।'

বরুণদা বলল, 'দুই বোনই দেখছি সমান বিচক্ষণ।'

গাড়ি যখন জুলিদের বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকল তখন তামাটে দিগন্তে সূর্য একটি গনগনে লাল গোলা। দু—দিকের দুটো দরজা খুলে সিজার আর লুপ আগে পিছে দৌড় দিয়েছে। শমী বলল, 'কী সুন্দর রে জুলি। রোজ ভোরবেলা বেড়াতে যাব।'

বরুণদা বলল, 'খবরদার ওটি কোরো না। ভীষণ ডাকাতের উপদ্রব এ অঞ্চলে, ভোরই বলো, সন্ধেই বলো, নির্জন সময়ে পায়ে হেঁটে এসব রাস্তায় বেরোনোর কথা কল্পনাও কোরো না।'

শমী হতাশ গলায় বলল, 'কী যে বলেন বরুণদা। ওসব আপনার বাহানা। বেরোলে সাহেবের প্রেসটিজ যায় নাকি?'

বরুণদা বলল, 'বেশ তো দিদিকে জিজ্ঞেস করো।'

'সত্যি রে', জুলি বলল, 'আমাদের থেকে দক্ষিণে কোণাকুণি ওই বাড়িটা, ওখানে চ্যাটার্জিরা থাকে, রবিবার সকালে চাবি দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে এসে দ্যাখে স্কুটার টিভি টোস্টার—মানে যাবতীয় গ্যাজেট চুরি গেছে। সেই সঙ্গে ভালো ভালো জামাকাপড়। তা ছাড়াও শুনেছি, গ্যাং রাস্তার মাঝখানে পথ আটকে কত লোকের ঘড়ি আংটি হার সব খুলে নিয়েছে।'

শমী বলল, 'এসব পরাই বা কেন!' সিজার, লোপামুদ্রা কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা খেয়াল করেনি, সিজার বলে উঠল, 'ডোন্ট ওয়ারি মাসি। আমি তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবো। শুধু টাইমটা আমায় বলে দিয়ো।' 'গ্যাং-ট্যাং এলে কী করবি?' শমী হেসে বলল।

'গ্যাং? আমি নিজেই তো একটা গ্যাং। কী করবে ওরা আমি থাকতে? ফুঃ।'

বরুণদা জনান্তিকে বললেন, 'সিজারের বাণী কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ হয় না, বুঝেছ শমী? সাধারণত উনি এত উদার হন না। হয়েছেন যখন অফারটা নিয়ে নাও।'

টেনে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল শমী। তামাটে রঙের মাটি। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ছবির মতো। সন্ধে হতেই ঝুপ করে নির্জনতা নেমে পড়ল যেন পাখা বিস্তার করে। জুলি নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—'এখানে জঙ্গল নেই, না রে?'

'নাঃ। জঙ্গল এখানে পাবি না। তবে এত গাছ, এত সুন্দর সাজানো, সযত্নে গড়ে তোলা পার্ক যে জঙ্গলের অভাব তুই টেরই পাবি না।'

শমী ভুরু কুঁচকোল—'কী যে বলিস? সাজানো পার্ক আর জঙ্গল এক হল? জঙ্গল যে অরণ্য, আদিম একেবারে প্রাথমিক, স্বতঃস্ফূর্ত, বলতে বলতে শমী হঠাৎ যেন সংকুচিত হয়ে থেমে গেল। সে বেশি কথা বলতে পারে না। যখন বলে, বলে ফেলে, তখন এমনি করে সংকুচিত হয়।

জুলি ঈষৎ অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখে যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টি। বলল, 'শমী তোর জঙ্গল জঙ্গল বাই এখনও গেল না? সাজানো গাছপালা, বীথিকা, মানুষের হাতে পরিকল্পনা করে পোঁতা গাছ অনেক ভালো বুঝলি?' জুলি নিঃশ্বাস ফেলল একটা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ রে, বিনায়ক ঠিক আসবে তো?'

'না এলে কী? আমি একলাই তো এলাম। একলাই আবার চলে যেতে পারব।'

'তা নয়, মানে হ্যাঁরে শমী। তোরা একসঙ্গে বেড়াতে যাস না? এই যে তুই চলে এলি ওর দেখাশোনা কে করবে? শাশুড়ি? কিন্তু তোর মন খারাপ করবে না?'

শমী হেসে ফেলল, বলল, 'কেন বেড়াতে যাব না, এই তো গত বছরই গোয়া ঘুরে এলাম, জানিসই তো! আর শাশুড়িই তো বরাবর দেখাশোনা করে এসেছেন, এখনই হঠাৎ সেটা বদলে যাবে কেন?'

জুলি স্বস্তির হাসি হাসে, বলে, 'যাই বলিস বাবা, বরছাড়া বিয়ের পর কোথাও যেতে কেমন কেমন লাগে। যেন মনে হয় লোকে মনে করবে দুজনে বনিবনা নেই।'

'তুই কি তাই-ই ভাবছিস না কি?' এবার গম্ভীর হয়ে শমী জিজ্ঞেস করল।

'না তা ঠিক নয়।'

'জুলি ভুলে যাস না তেরো বছর বিয়ে হয়ে গেছে আমার। ছোটোখাটো হলেও একটা কাজকর্ম আমি করি। বনিবনার বাইরের চেহারাটা তোদের মতো গাঢ় নাও হতে পারে।'

'ভেতরের চেহারাটা ঠিক থাকলেই হল' জুলি হেসে বলল—'যাক চল তো এখন, তোর বরুণদা চায়ের জন্য অনেকক্ষণ ধরে হাঁকডাক করছে।'

চায়ের আসরে দুই ছেলেমেয়েকে দেখা গেল না। শমী ব্যস্ত হলে বরুণদা বললেন, 'তুমিও যেমন, সিজার নিশ্চয় লুপকে নিয়ে ক্লাবে চলে গেছে। দুজনেই খেলা পাগল, এখন ক্লাবে জুনিয়রদের টেনিস হবে।'

শমী বলল, 'বলে যাবে তো!'

'বলে যাবে সিজার? তা হলেই হয়েছে। বলে-টলে যাবার কথা তার স্মরণে থাকলে তো!' জুলি কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শমীর ঘুম আসে না। চারদিক

থেকে একটা নিবিড় আরাম ঘিরে ধরেছে তাকে। এই ফাঁকা ফাঁকা কলোনি, নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ বাতাস, বাতাসে গাছের গন্ধ, এ তার কিশোরী বয়সের প্রতিবেশ। গত চার বছর ধরে জুলিরা এখানে আছে। প্রথম থেকেই তাকে ডাক দিচ্ছে। এতদিনে তার আসার সময় হল। যেন মনে হচ্ছে সে এখানেই ছিল। মাঝখানটা অর্থাৎ হোস্টেল, গোয়াবাগান, এন্টালি, বিনায়ক এই সবসুদ্ধ জীবনের অংশটা স্বপ্ন। দরজায় টুকটুক করে আওয়াজ। উঠে দরজা খুলে দিল শমী। যা ভেবেছে তাই। জুলি উঠে এসেছে। ফিসফিস করে বলল—'ঘুমোসনি তো! আমিও ঘুমোতে পারিনি। কতদিন পরে দু-বোনে, বল তো! তোর মেয়ে ঘুমিয়েছে?'

'অনেকক্ষণ। আমিই এপাশ ওপাশ করছি।'

'কেন রে? বালিশ-টালিশ ঠিক হয়েছে তো? তুই তো পাতলা বালিশে শুস।'

'বালিশটা কোনো সমস্যা নয়। আমার ঘুম হচ্ছিল না...'

'নতুন জায়গা বলে না কি রে?'

'নতুন বলে নয় রে জুলি পুরোনো বলে', শমী যথাসম্ভব ফিসফিস করে বলল।

বিছানার ওপর উঠে এসে জুলি সাবধানে লোপামুদ্রাকে সরিয়ে দিল। তারপর বোনের পাশে ঝপাং করে শুয়ে পড়ল।

'তোর এ জায়গাটা পুরোনো লাগল?'

'দিনের আলোয় লাগেনি। এখন রাতের অন্ধকারে লাগছে...।'

শমী বেশি কথা বলতে পারে না। জুলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কী করে যে তোর পুরোনো লাগছে জানি না। কোথায় সে শালের জঙ্গল? বনকাটা বসত কই? রোজই কোয়ার্টার্স উঠছে নতুন নতুন....সদ্য কাটা গাছের গুঁড়ি, ডালপালার ছাঁট রাস্তার পাশে সে সব কই?'

'না-ই থাকল', ছোট্ট গলায় জবাব দিল শমী, 'অন্ধকারে আমি শালমঞ্জরীর গন্ধ পাই এ রকম ফাঁকা জায়গায় এলেই। আসিনি অনেকদিন। গন্ধটাও পাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেইসব দিনের গন্ধ।' শমী পাশ ফিরে জুলিকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখে। জুলি বলল, 'শমী, তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষ থাকবি!' শমী জুলিকে ছেড়ে সরে শুল, বলল, 'আমি তো ছেলেমানুষ নই! আমি তো কোনো কালেও ছেলেমানুষ ছিলাম না জুলি, চিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধ, তৌল করে, মেপে চলি, চলি না!'

জুলি তরল গলায় বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই একেবারে ঠাকুমা-দিদিমা আমি জানি। এখন চুপ কর তো! লুপটা ঠিক তোর মতো হয়েছে। না রে?'

শমী অবাক হয়ে বলল, 'লুপকে তুই আমার মতো কোথায় দেখলি? ও কি দস্যি জানিস! তা ছাড়া ও খুব মিশুক। খেলাধুলো করে। ওর চেহারাও খানিকটা ওর বাবার মতো। সবাই বলে।'

সবাই বলুক। ভীষণ একটা আদল আছে। আসলে আজকাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ধরনটা এমন হয়েছে যে ওরা খানিকটা দস্যিগিরি দলে পড়েই করে। এগুলো বাইরের ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে ও তোর মতন।

আমার মতো হয়ে আর কাজ নেই। তুই একদিন দেখেই ওর ভেতরটা বুঝে ফেললি।

তোরা রোজ দেখিস তো! আমরা মাঝে মাঝে দেখি বলে আদলটা ঝট করে ধরতে পারি। চুলের ফেরটা ঘাড় কাত করে তাকাবার ভঙ্গিটা। দেখিস ও-ও কথা বলতে বলতে হঠাৎ তোর মতো চুপ হয়ে যায়।

তোর ছেলে কিন্তু তোরও এক কাঠি বাড়া হয়েছে রে জুলি।

যা বলেছিস। সমস্ত গ্যাজেটস-এর পার্টস খুলে ফেলে জানিস, যখন তখন কার্নিশ বেয়ে বেয়ে

ছাদে উঠে যাচ্ছে, লগি দিয়ে বাথরুমের ছিটকিনি ফেলে দিচ্ছে। বাড়িতে লোক এলে তার স্কুটার নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে, যা-তা একেবারে।

পার্টস খুলে ফেলে? তার মনে ও এঞ্জিনিয়ার হবে, দেখিস।

'মেকানিকও হতে পারে', জুলি মস্ত বড়ো একটা হাই তুলল।

'আমরা পাহাড়ে যাচ্ছি, মা, বাবা, মাসি, আমার পাহাড়ে...' স্কুটার নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল সীজার।

'সিজার, সিজার' সিজারের বাবা আতঙ্কিত রুষ্ট গলায় চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এলেন। কিন্তু স্কুটারের আওয়াজে বেচারার গলায় আওয়াজ একেবারে চাপা পড়ে গেল।

'জুলি, তুমি কিছু বললে না।'

'বলবার সময় পেলে তো বলব'। জুলি স্যান্ডউইচে মাখন মাখাতে মাখাতে উত্তর দিল। স্যান্ডউইচগুলো হাতে করে তৈরি করে প্রথমেই দুই ছেলেমেয়েকে দিয়েছে। দুধ ঢেলে দিয়েছে কাপে। সিজার তো খায় না, গেলে। চোঁ করে দুধ খাওয়া হয়ে গেল। তিন চার কামড়ে স্যান্টউইচ শেষ। লুপকে বলল, 'দেরি করছিস কেন? আর স্টাইল করে খেতে হবে না। এখনও গোঁফে দুধ লেগে যায়। আবার কড়ে আঙুল উঁচু করে কাপ ধরা হয়েছে!'

জুলি একটা ধমক দিল, 'ওর তোর মতো সাপের গেলা নয়। দাঁত আছে তার ব্যবহার করছে। স্টাইল আবার কি? ভদ্রভাবে খাচ্ছে। তোর মতো হাউমাউ করছে না এ আমাদের অনেক ভাগ্য।'

লুপ কিন্তু একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়েছে---হাতে তখনও স্যান্ডউইচের টুকরো, 'আমার হয়ে গেছে।' চুল নাড়িয়ে সুর করে সে বলল। বলতে বলতে দু-জনেই খোলা দরজা দিয়ে ছুট। তিনজনেই ভেবেছে ওরা বাগানে যাচ্ছে। সিজার যে সোজা গ্যারাজে গিয়ে স্কুটার বার করে ফেলবে, ভাবেনি কেউ।

জুলি বলল, 'এমনিতে কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু ট্যাঁকে গুঁজে মেয়েটাকেও নিয়ে গেল যে, দলমা পাহাড় কি এখানে?'

শমীর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে, আর থাকতে না পেরে বলল, 'কী হবে বরুণদা! পাহাড়ের পথে স্কুটারের পেছনে। লুপের তো স্কুটারে চড়ার কোনো অভ্যেসই নেই।'

বরুণদার মুখে চোখে ছেলের প্রতি গভীর বিরক্তি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্বেগ খুব বেশি নেই। বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই। বিপদের ভয় নেই। ও ছেলেকে এখানে সবাই চেনে। আমার আপত্তি হচ্ছে এই ডোন্ট কেয়ার ভাবটাতে। নিজে প্ল্যান করেছে, বলবার জানাবার দরকার মনে করে না। মায়ের আদরের ফল। ফল ভোগ তো করতে হবেই। চোদ্দ পনেরো বছরের ধেড়ে ছেলেকে সব সময়ে আমার জোনি, আমার যিশু করে ন্যাকামি করার ফল পেতেই হবে।'

জুলি বলল, 'আর তুমি যে একেকটা দুরন্তপনামি করে আর বাহবা-বাহা-বাহা করে ওঠো? শুধু 'জোনি যিশু' করলেই আদর হয় না। সবেতে ও-রকম আমার ছেলে কী দারুণকীর্তি করেছে ভাব দেখালে প্রশ্রয় হয় যেটা আদরের চেয়েও খারাপ। জানিস শমী, সেদিন ভুলে চাবি না নিয়ে সদর দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়েছে। তিনজনেই বেরিয়েছি। চাবি না নেওয়ার দোষটা ওর; তারপরে ফিরে রাত নটায় আর বাড়ি ঢুকতে পারি না। ওদিকে উনি, মানে সিজারচন্দ্র কোত্থেকে লাঠি জোগাড় করে পেছন দিকের দরজা দমাদ্দম পিটিয়ে তার ছিটকিনি খুলে ফেলেছে। সে এক কাণ্ড! আর তোর বরুণদার সে কি স্মিতমুখ, ভাবটা ছেলের মতো ছেলে তৈরি করেছি একখানা। গণ্ডগোলটা নিজে পাকিয়েছিল কিনা! এখন তুইই বল রাত নটায় ওভাবে খিড়কির দরজার ছিটকিনি খোলার কৌশলটা যদি চোর-ডাকাতের চোখে পড়ে যায়?'

বরুণদা বলল, 'লুপের জন্য তুমি ভেবো না শমী। সিজার কিন্তু সত্যিই খুব ডিপেন্ডেবল।'

দুপুর একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে জুলি বলল, 'খেয়ে নিই আমরা। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

শমীর ইচ্ছে নেই—বলল, 'আরেকটু দেখি, ওরা খেল না।'

বরুণদা আর জুলি হাসি হাসি মুখে চোখাচোখি করল, বরুণদা বললেন, 'একটা বেজে গেছে অথচ সিজার খায়নি এ হতে পারে না। আর সিজার খেলে লুপুও খাবে। শমী তুমি বিনা দুশ্চিন্তায় খেয়ে নাও।'

খেয়ে-টেয়ে মশলা মুখে দিয়ে দু বোনে সব তোলাতুলি করছে, দুই মূর্তি ঢুকল। আওয়াজে আগেই জানান দিয়েছিল।

জুলি মারমুখী হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? পিঠে বেত ভাঙব নাকি? নিজে তো যা খুশি করছ, বোনটার যে মুখ শুকিয়ে গেছে না খেয়ে না দেয়ে। সে খেয়াল নেই?'

সিজার উবাচ, 'না খেয়ে না দেয়ে? লুপ!' বলে লুপের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল।

লুপ বলল, 'না মাসি আমরা নটরাজ থেকে খেয়ে এলুম। সিজারদা অনেক খাইয়েছে।'

'রেস্ত কোথায় পেলি?' জুলি সিজারের দিকে তাকিয়েছে।

'তোমার ব্যাগ।' অম্লানবদনে উত্তর দিলেন সিজারবাবু।

বরুণদা বললেন, 'ওকে চুরি বলে, তুই চোর তা হলে?'

সিজার বলল, 'পকেট মানি দিচ্ছ না যে! গার্লফ্রেন্ডদের কাছে আমার প্রেসটিজ থাকে না।'

সিজার আঙুলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

শমী-জুলি চুপ। বরুণদাও। লুপ চুপিচুপি মার কানে কানে বলল, 'মা খুব রাগ করেছ? সীজারদা ব্রেকফাস্টের সময়েই ঠিক করল পাহাড়ে যাবে, বলবার দরকার নেই বলল। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে মা। দারুণ।'

শমী যেন অনেক দূরে চলে গেছে, জবাব দিচ্ছে না, কিন্তু তার মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই। সেও কি যাচ্ছে? স্কুটারে না, সে সময়ে স্কুটারের এত চল তো ছিল না। সাধারণ বাইসাইকেলে ডবল ক্যারি করছে তাকে একটি ছিপছিপে চেহারার লম্বা ছেলে। খুব কোমল মুখ। সবে গোঁফ দাড়ি গজিয়ে মুখটা জঙ্গল হয়েছে। ত্বকের লালিত্য যায়নি এখনও। চোখ দুটো স্বপ্নে ভরা। শালজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কখনও সাইকেলে, কখনও সাইকেলকে হাঁটিয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটে, শুকনো শালপাতা দু পায়ে মাড়িয়ে মড়মড় শব্দ করতে করতে।

'এই জঙ্গলটা পার হলেই একটা ছোট্ট টাকলামাকান মরুভূমি বুঝলে শমী। বালিতে পা ডুবে যাবে। মরুভূমি পার হলে তবে অজয়। অজয়ে হাঁটুজল। পার হলে কেন্দুবিল্ব। যদি কপালে থাকে, আর রাত জাগতে পারো তো আসল বাউলের গান শুনতে পাবে—'ভালো করে পড়গা ইস্কুলে—এ-এ, নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।'

জুলি বলল, 'গেছিস, গেছিস। মাকে না বলে গেছিস কেন রে?'

'দ্যাখ, মা কী ভীষণ অভিমান করেছে, লুপু আর এ রকম করিস না।' জুলি দাঁড়াল না, তার অনেক কাজ। বরুণদা ঘরে চলে গেছে। এই একটা দিনই তো বিশ্রাম। লুপু মায়ের উরু জড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ে বলল, 'মা তুমি সত্যি রাগ করেছ? সিজারদাটা যে কি? এমন করে বলে আমি না বলতে পারি না। ওর যা এনথু না! মা, সিজারদাটার মাথায় কয়েকটা স্ক্রু ঢিলে আছে, কিন্তু একেবারে ফ্যানটা!'

শমী মৃদু হেসে বলল, এখনও কিছু প্রোগ্রাম আছে না কি তোদের?

তেমন কিছু না। ওয়ার্ড-মেকিং খেল্লি একটু! খেলি?

এতদূর থেকে রোদে রোদে টহল দিয়ে এলি একটা বইটই নিয়ে বসলে তো হত!

'দূর, টহল আবার কি।' লুপ ফিক করে হেসে ফেলল।

সত্যিই ওদের বয়সে শুয়ে বসে থাকা কারোই রুটিনে লেখে না। জুলি বেড়াত সারাক্ষণ টঙস টঙস করে। শমী একটু শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু সেও পড়াশোনার সময়টুকু ছাড়া দেখো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নতুন গড়ে উঠেছে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কলোনি। দেখতে দেখতে উঠে যাচ্ছে সামনে পেছনে জমিশুদ্ধ সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার্স। লরিতে করে কাটা গাছের গুঁড়ি যখন তখন হু হু করে চলে যাচ্ছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। শমীদের বাড়িটা তখনও শেষ বাড়ি। তারপর থেকেই জঙ্গলের সীমানা আরম্ভ হয়েছে। শালের ঘন জঙ্গল। তার সঙ্গে প্রচুর সেগুন, মহুয়া, ছাতিম, শিরীষ গাছ। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরাটাই ওর প্রধান করণীয়। তার ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া পড়াশোনা ছোটখাটো ঘরের কাজকর্ম। বাবা সকালবেলা ইনস্টিট্যুটে চলে যাবেন। দুপুরবেলা কোনোদিন খেতে আসবেন। কোনোদিন টিফিন ক্যারিয়ার পৌঁছে দিতে হবে। বেশিরভাগ দিনই বাড়ির কম্বাইন্ড-হ্যান্ড দীনবন্ধু যায়, সে না পারলে জুলি চলে যায় সাইকেলে চড়ে। কেউ নেই আর, কেউ কোথাও নেই, একমাত্র মেজপিসিমার ছেলে রিনটিনদা ছাড়া। সে ইলেকট্রিক্যাল পড়ছে। হোস্টেলে থাকে। যখনই সময় পায় হঠাৎ হঠাৎ করে দুই বোনের কাছে চলে আসে। জঙ্গল চষা হয় আরও ভালো করে। অনেক দূর চলে গেছে ছুটির দিন সন্ধেবেলায়। সপ্তপর্ণী বৃক্ষের পেছন থেকে চাঁদ ওঠা দেখা হয়েছে। জুলি বলছে, 'রিনটিনদা তোর খিদে পায়নি, আমরা বেরিয়েছি তখন আড়াইটে, তিনটে হবে। দেখ তো কটা বাজে! জঙ্গলে শেয়াল ডাকছে।'

ঘড়িটা রিনটিন রুমাল দিয়ে চট করে বেঁধে ফেলল। —বলল, 'সময়কে একটু ভোলো, ভুলতে শেখো, খিদে তো আমারও পেয়েছে। খিদে পাওয়ার ফিলিংটা অদ্ভুত সুন্দর নয়? লেট ইট লাস্ট এ লিটল মোর।' সুগন্ধ রাতটাকে সিল্কের চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে হিম আর জ্যোৎস্না মেখে বাড়ি ফেরা। বাবা টেবল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছেন, কিছুই খেয়াল নেই। দীনবন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে। মুখ গম্ভীর। তার সব খেয়াল আছে। হিম লেগে পরদিন শমীর ঠেসে জ্বর। গনগনে মুখের ওপর জুলি ঝুঁকে পড়েছে 'ওষুধটা খা। শমী।' শমী মুখ টিপে আছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রিনটিনদা বলছে, 'জ্বর হলে আমিও চট করে ওষুধ খাই না। জ্বরের ফিলিংটা আমার অসাধারণ লাগে। কী রকম দাঁত কষতে ইচ্ছে করে। কী রকম একটা ঝিমুনি ধরে। লালচে ঝিমুনি। শমী, দেখো, চোখ চেয়ে দেখলে ঘরবাড়ি জীবন সব এখন স্বপ্ন মনে হবে। আসলে জ্বরটর হলেই সত্যি বোঝা যায় জীবনটা স্বপ্ন।'

'জীবনটা স্বপ্ন?' জুলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে।

জ্বরোজ্বরো গায়ে শমী মুগ্ধ হয়ে ভাবছে জীবনটা স্বপ্ন!

রিনটিন জানলার কাছে থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছে, শমীর বিছানার খুব কাছে—'হ্যাঁ! ঘুমিয়ে পড়েছি, সামহোয়ার এলস দেখছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—আমি শমী, আমি জুলি, আমি রিনটিন, আমার কত কাজ, কত ইচ্ছা, সাধ! হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে, বুঝতে পারব...।'

'কী বুঝতে পারব? আমি জুলি নই!' জুলি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করছে।

শমী উদগ্র আগ্রহে উত্তরটার জন্যে অপেক্ষা করছে। রিনটিন হেসে বলছে,

জানি না, জানি না তো কী বুঝতে পারব। এখনও তো ঘুম ভাঙেনি!

যত্ত বাজে কথা। রোজ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেগুলো দেখি সেগুলো তবে কী?

স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন। তার ভেতর আরও স্বপ্ন। ভেতর থেকে ভাঙতে ভাঙতে আসবে স্বপ্নগুলো।

জ্বরের ঘোরে শমী শুনছে আর তলিয়ে যাচ্ছে, কোনো গভীর গহন, অন্যরকম অন্যালোকে।

সমস্ত অন্তরঙ্গতা, বন্ধুতা, ভালোবাসাগুলো তো স্বপ্নই। ভেতর থেকে ভাঙতে ভাঙতে আসে। ঠিক যেমন শুনেছিল। অবিকল। নিশ্বাস ফেলে শমী পাশ ফেরে। ম্যাগাজিন হাতে করে, ছবি আর লেখার ওপর চোখ, মনের মধ্যে অন্য ছবি অন্য শব্দ। দিনের জাগরণবেলা নিমেষেই ফুরিয়ে যায়। বিকেলের ঘুম ভাঙে।

লুপের বাবা এসে গেছে। জুলি বলল, 'এসেছ খুব ভালো কথা, আমরা হাতে চাঁদ পেয়েছি, কিন্তু ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে কেন? দুদিন থাকো!'

বিনায়ক বলল, 'উপায় নেই। সময় নেই। নাই নাই নাই যে সময়। দিদি কত কষ্ট করে একটা উইকএন্ড বার করেছি যদি জানতেন।'

'উইকএন্ড আবার বার করতে হয় না কি? ও তো প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে থাকেই!'

'আরে?' শমীকে জিজ্ঞেস করুন! কত শনিবার আমাকে হুটহাট করে টুরে চলে যেতে হয়!'

শমী হাসছে। গুছিয়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে সব। পেছনের বাগানে শুকোচ্ছে তোয়ালে, পেটিকোট, পটির কাছটায় একটু ভিজে। শাড়িটা পাট করে নিচ্ছে। ঘরে এল। লুপ পেছন পেছন বাগানে গিয়েছিল। এখন আবার পেছন পেছন ঘরে ফিরে এসেছে। বায়না ধরেছে, 'ও মা, আর দুদিন পর তো এমনিই ছুটি ফুরিয়ে যেত। আর একটা দিন, জাস্ট একটা দিন থেকে গেলে কী হয়!'

বাবা বলল, 'তোর তো দিনপঞ্জি মাসির আদরে এখন সবই ওলটপালট হয়ে গেছে রে লুপু। অভ্যেসে ফিরতেই তো ও দুটো দিন লেগে যাবে।'

পকেটে হাত, ঠোঁটে সিগারেট বাবা চলে যাচ্ছে। এখন কেউ নেই। বাবা, মাসি, মেসো সব লনে নেমে গেছেন, গল্প করছেন। মাসি লুপের জন্য রং-বেরঙের একটা জাম্পার বুনেছেন, তাড়াতাড়ি করে ঘর বন্ধ করছেন এখন। একটু পরেই বেরোতে হবে। এখানে শুধু মা, মায়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরে লুপু কাঁদছে। বুকভাঙা কান্না। যেন লুপু নয়, তার বুকের ভেতর বসে অন্য কেউ এ কান্না কাঁদছে। শমী আশ্চর্য হয়ে গেছে, 'আবার তো ছুটি পড়বে লুপু তখন আসব, গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে বেশি করে থাকিস। তখন আম পাকবে, কাঁঠাল পাকবে, মাসি বলছিল শুনিসনি?'

গুমরে গুমরে কাঁদছে লুপ। আম-কাঁঠালের জগৎ থেকে অনেক দূরে।

লুপু শোন, এ রকম বোকার মতো কাঁদে না।

সিজারদা যে জানে না। ও যে নেই! টুর্নামেন্ট খেলতে গেল টেলকোয়। কাল আসবে, দেখা হবে না।' লুপু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল।

তাতে কী হয়েছে! টুর্নামেন্ট খেলতে গেছে জানি তো। আবার পরে যখন আসবি, দেখা হবে!

'আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।' ভাঙা ভাঙা বোজা গলায় লুপ বলল।

শমী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্তম্ভের মতো অনড়। নির্বাক। থোকা থোকা চুল লুপুর মাথায়। তার কোলের ওপর। চারদিকে ছড়িয়ে আছে লুপুর সাদা নাচ-ফ্রক লাল-কালো স্কার্ট, ব্লু জিনস, লুপুর ছোটোবেলা। টুকরো টুকরো এইসব যাত্রার আয়োজন এবং মেয়ের ছোটোবেলা সামনে রেখে শমী ফিরে যাচ্ছে তার নিজস্ব সেই অন্ধকার বারান্দায়। ওই তো জুলি কিছুদূরে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঙুলে শাড়ির আঁচল পাকাচ্ছে। রিনটিন বলছে, 'ট্রেনের সময় হয়ে এল, এবার তো আমায় যেতেই হবে। জুলি, শমীকে বলো একবার আমার দিকে ফিরতে, একটিবার আমার সঙ্গে কথা বলতে, ওকে বুঝিয়ে বলো জুলি। আমি...আমি যে আর আসব না।'

শমী যে বেশি কথা বলতে পারে না। নিজের ভেতরের অনুভব বাইরে প্রকাশ করতে অসীম সংকোচ। ধূসর অন্ধকারের মধ্যে সে শুধু ধূসরতর ছায়া। বিবর্ণ। প্রাণশূন্য। জুলি ফিসফিস করে

বলল, 'তুই কেন এলি? আমরা তো বেশ ছিলাম। রিনটিনদা তুই কেন এলি?' তার গলায় অভিমান, তিরস্কার।

বোধহয় সত্যি আসিনি জুলি, স্বপ্নে এসেছিলাম ... তোরা একবার বল আমি শমীকে নিয়ে যেতে আবার আসব ..

'না।' জুলি চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'যা, তুই যা প্লিজ।'

রিনটিনের পায়ের শব্দ কোনদিনই হয় না। নিঃশব্দে সে কখন চলে গেছে।

এখন মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শমীর গলা দিয়ে মস্ত বড়ো একটা পিণ্ড নামছে। গলার পেশি, ত্বক সব কিছুকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে। মা বলল, 'লুপ এখনই এত অধীর হলে চলবে কী করে? এইটুকুতেই যদি ভেঙে পড়ো। তা হলে এর পর?'

কান্নাভেজা মুখ তুলল লুপ। মায়ের গলা নির্লিপ্ত, উদাসীন, যেন অনেক দূর থেকে বলছে। মা কখনও লুপকে তুমি বলে না! দুঃখ? অধীর? এর পর? আরও আছে? এর পর আরও আছে?

যাও, মুখ ধুয়ে এসো।

অন্য গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়েছে লুপুর মুখে। জুলি মাথায় হাত বুলিয়ে ভিজে গালে চুমু খেয়ে বলল, 'মন খারাপ করছিস কেন? আবার আসবি মাসির কাছে। অনেক দিন থাকবি।'

শমী মনে মনে বলল, না জুলি না, আর আসব না, আর ও থাকবে না। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ওই সিঁদুরে আগুন আমাকে পার হতেই হবে।

ট্রেনে উঠে বিনায়ক ডবল সিটে গুছিয়ে বসল মেয়েকে নিয়ে। মৃদু আলো জ্বলছে—ও কী রে লুপু! তোর মুখখানা যে কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে মা। এত কেঁদেছিস কেন?

লুপ কিছু বলছে না। বিনায়ক বলল, 'কী ব্যাপার শমী? কীসের কষ্ট ওর? অত কেঁদেছে জাস্ট মাসিদের জন্য মন কেমন! কিচ্ছু বলছে না যে!'

বাবার মুখে উদ্বেগ। ট্রেনের শব্দ। গতিবেগ বাড়ছে। বাইরে অন্ধকার লম্বা দৌড়ে নেমেছে। শমী তার ঈষৎ ভাঙা অথচ কেমন এক রকম মিষ্টি গলায় যেন আপন মনে বলল, 'জানলে তো বলবে! ও যে জানেই না।'

করুণা তোমার

ঠাকুরমার ঝুলি-র 'ছোটোরানি আছাড় খাইয়া পড়িলেন'-এর মতো দৃশ্যটা। পাপু মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে। উপুড় পিঠটা নিথর। কাঁধের তলায় পিঠের ওপর দুদিকে দুটো ত্রিভুজ। একটু একটু উঠছে নামছে। ছোটো চুল। বব-ছাঁট ছিল। একটু বড়ো হয়ে গেছে। তাই আগাগুলো মেঝেতে লুটোচ্ছে।

পাপুর বাবা ঘরে ঢুকেই অবাক।

'একি? পাপুর কী হল?' কোথাও কোনো জবাব নেই।

পাপুর বাবার পুনরুক্তি, 'বলি, হলটা কী?'

পাপুর মা অর্থাৎ শ্রীলা উল বুনছিল। উলের থলি টেবিলের ওপর রেখে গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমি কি চা পান করবে?'

হতভম্ব সুরজিৎ অর্থাৎ শ্রীলার স্বামী ওরফে পাপুর বাবা বলল, 'চা তো আমি রোজই এ সময়ে পান করে থাকি। হঠাৎ প্রশ্ন? প্রশ্নের জবাব এড়াতেই প্রতি-প্রশ্ন নাকি?'

'বোঝ তো বেশ। বুদ্ধি ভালোই। আরেকটু বাড়লে যেটা বুঝেছ সেটা মুখে বলে বোকা বুদ্ধির পরিচয় দিতে না।'

'বুদ্ধিও বুঝি। বোকাও বুঝি। বোকা বুদ্ধিটা কী?'—সুরজিৎ তরল গলায় প্রশ্ন করছে। যদিও চোখ দুটো অনড় পিঠটার ওপর স্থির। মেয়ে সুরজিতের প্রাণ।

ঘরে ঢুকে পড়েছে পাপুর পিঠোপিঠি দাদা পিন্টু।

'বাবা জানো, আসলে...' পেছন থেকে তার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়েছে শ্রীলা।

চা খাওয়া শেষ। চা এর সঙ্গে টা। পিন্টু খেলতে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরে চায়ের বাসন ঠুনঠুন করে ধুচ্ছে বোধ হয় চুনী। শ্রীলা বলল, 'চুনী, যা ঘুরে আয়। বেশি দেরি করবি না। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে তোর আড্ডা শেষ হওয়া চাই।'

কাচের চুড়ির আওয়াজ। চুনী বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিন মুখে খই ফোটে। আজকে দিদির মেজাজ খারাপ। অবহাওয়া থমথমে। চুনী তাই চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

শ্রীলা বলল, 'মেয়েকে ভালো শিক্ষা দিচ্ছ না।'

যা বাব্বা, আমি আবার কখন শিক্ষা দিলুম, ওসব তো তুমি আর তোমার কনভেন্টের মিসের এক্তিয়ার।

না, ইয়ার্কি নয়। পুজোর কেনাকাটা করতে গিয়ে সেদিন পাপুর স্কাই ব্লু রঙের চাইনিজ সিল্কের চুড়িদার সেটটা কিনেছিলুম মনে আছে? সাদা স্যাশের মতো আছে।

তোমরা যে কেনাকাটা করতে গিয়ে কী কেনো, কত কেনো আর কতরকম কেনো...

আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। দয়া করে পুরোটা শোনো। চুনী সেটা দেখতে পেয়ে গেছে। ধরল ওকেও পুজোয় ঠিক ওই রকমই কিনে দিতে হবে। ওর খুব পছন্দ। ঠিক ওই রং, ওই ডিজাইন। এসব জিনিস তো ডুপ্লিকেট হয় না। দামও অনেক। আজকে ঠিক ওই জিনিসটাই দোকানে ঝুলছে দেখে

কী মনে হল কিনে ফেললুম। মেয়েটা তো বরাবর পুরোনো, রং জ্বলা জিনিস নিয়েই তুষ্ট আছে। বড়ো মুখ করে বলল। তা সেই থেকেই তোমার কন্যে অমনি পেছন উলটে শুয়ে আছে।

'কেন?' সুরজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কেন বুঝতে পারছ না তো! যাক, তোমার সম্পর্কে ভাবনা ছিল সেটা অন্তত ঘুচল। বুঝতে পারছ না? তোমার কন্যা চুনীর সঙ্গে একরকম জিনিস পরবে না।

ও হো হো। তা পালটে দিলেই তো হয়। চাইছে না যখন।

বাঃ চমৎকার। মেয়ের জেদ বজায় থাকবে! হৃদয়বৃত্তি কোনোদিন ডেভেলপ করবে না এমন করলে। দয়া করে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো।

সুরজিৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তা হলে একটু টাইম দাও। তলিয়ে বুঝি।'

শ্রীলা রাগ করে সামনে থেকে উঠে গেল।

পাপুটার সঙ্গে চুনীটার যে কী রেষারেষি! অনেক লোক বদলে বদলে অবশেষে এই মেয়েটাকে পেয়েছে সে। বছর পনেরোর মেয়ে, পাপুর থেকে সামান্য ছোটোই। দেখতে তো ছোট্টখাট্ট। একটু খরখরি। কিন্তু বেশ কাজের। অন্ততপক্ষে কথা বললে শোনে। বেশ চটপটে। মুখে হাসি লেগেই আছে. কথাও আছে সাতকাহন। একটু বড়ো হয়ে গেলেই এরা যেমনি সেয়ানা হয়ে যায়, তেমনি হয় বদমাশ। চুনী এসে শ্রীলার মনে শান্তি এনেছে। যেমন যেমন শেখায়, তেমন তেমন করে মেয়েটা। নিমেষে বুঝে ফেলে। ঘষর ঘষর বাটনা বাটছে, খচখচ আনাজ কুটছে, ফটাফট জামাকাপড় কেচে ফেলছে। কিন্তু কী যে নজর মেয়েটার! পাপুর সঙ্গে সব কিছুতেই ওর পাল্লা দেওয়া চাই। ঠোঁটে রং, নেল পালিশ, জবিঅলা জুতো, চকচকে ঝলমলে জামা—এসব নিয়ে গোড়ায় গোড়ায় খুশি ছিল। এখন আর এ সব মনে ধরে না। পাপুর ফেলে-দেওয়া প্লিটেড স্কার্ট, জাম্পার, দর্জি দিয়ে তৈরি করানো সালোয়ার কামিজ এই সব মোটামুটি পায় ও। এইগুলো পরে পরে ওর রুচি ঘুরে যেতে শুরু করেছে। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পাপুর হেয়ার-ব্যান্ড মাথায় দিয়ে দেখছিল একদিন। পাপুর সেই থেকে ওর ওপর রাগ। শ্রীলা পরদিনই ওকে একটা হেয়ার-ব্যান্ড কিনে দিয়েছে। কিন্তু ও ঠিকই বুঝেছে দিদির জিনিসটার মহিমা আলাদা। মুখ গোঁজ করে থাকে। কথায় কথায় পাপুর সঙ্গে ওর লেগে যায়।

'দুধে কেন সর রে?' পাপু দুধে মুখ দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল।

মা তোমাকে কতবার বলেছি তুমি নিজে ছেঁকে দেবে। এরকম করলে আমি দুধ খাব না।

শ্রীলা চেঁচাল, 'চুনী, দুধ ছাঁকিসনি? এত করে বলি যে...।'

চুনীর খ্যানখেনে সরু গলা শোনা যাবে, 'ছাঁকলুম তো। কতবার ছাঁকব? আধ ঘণ্টা আগে দুধ ঠিক করে রেখে এসেছি। আবার সর পড়লে কি করব? দুধ আর ছাঁকনি নিয়েই সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তা হলে...' খরখরি বলেই যাবে, বলেই যাবে।

ও কিন্তু ঠিকই বলেছে পাপু, গরম দুধ আলগা থাকলে সর পড়বেই, যখন দেয়, তখন খেয়ে নিলেই পারিস।

ও যখন যা দেবে দয়া করে, ওর হাত থেকে সব নিয়ে নিয়ে খেতে হবে নাকি তক্ষুনি তক্ষুনি!

পাপু ভীষণ রেগে যায়, 'তুমি, তুমিই ওকে আশকারা দিয়ে দিয়ে এমনি করেছ।'

প্রায় কেঁদে ফেলে মেয়ে, 'আমার একটা কথা থাকবে না। নিজের পছন্দমতো জিনিস কক্ষনো পাব না। খারাপ হলে বলতেও পাব না, যাও আমি খাবই না।'

সাধাসাধি করেও মেয়েকে আর খাওয়াতে পারে না শ্রীলা। মহা জ্বালা হয়েছে তার। কোন্ দিকে যাবে? পাপুর নালিশও ঠিক, পাপুর দিক থেকে। আবার চুনীর সাফাইও কতকটা ঠিকই তো।

পাপু পিন্টু কেউই খাবার দিলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে খায় না। ডেকে ডেকে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। কাজের একটা শৃঙ্খলা আছে তো!

সুরজিৎ ডাকল, 'পাপু, আপ্পু উঠে পড়ো।'

কাঁধটায় একটু ঝাঁকানি দিল মেয়ে। ওর গড়ন একটু দোহারা। সামান্য এদিক ওদিক হলেই মোটা হয়ে যাবার ধাত। বাবা আপ্পু বলে ডাকলে খেপে যায়। খুব একটা সত্যি সত্যি নয় অবশ্য। সুরজিৎ নীচু হয়ে চুলের ঝুঁটি ধরল, 'উঠে পড়।'

হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে উঠে বসল পাপু। —'না বাবা, ইয়ার্কি নয়। মা কী বলতে চায়! একটা কাজের মেয়ে আর আমি এক মায়ের কাছে? আমাকে মা যা দেবে ওকেও ঠিক তাই দেবে! পুজোর সময়ে ও আর আমি একরকম পরে ঠাকুর দেখতে যাব!'

সুরজিৎ হেসে ফেলল, 'বলিস কী রে! একে দাদা তোর ভাগে ভাগ বসিয়ে রেখেছে। আবার আরেক শংকরা?'

শ্রীলা বলল, 'তুমি চুপ কর তো। দাদা ভাগ বসিয়েছে আবার কী? ওকি একবারও বলেছে সে কথা? তুমি তো দেখছি আরও জটিলতা, হিংসেহিংসি সৃষ্টি করছ।'

পাপু মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ আমি বাচ্চা কি না, বাবা বলল আর অমনি দাদাকে হিংসে করতে শুরু করে দিলাম।'

সুরজিৎ বলল, 'আরে আমিও তো তাই-ই বলতে যাচ্ছিলুম। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করতে চললি, তুই কি একটা বাচ্চা? বেবি!'

'বেবি হলে এগুলো মনে হত না বাবা। মা লোকজন নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। মা-র সঙ্গে তো আর কিছু করবে না। তোমার সঙ্গেও না। মা মাথায় চাপাচ্ছে। আমাদের মাথায় উঠে নাচবে। তোমরা ফল ভোগও করবে না, বুঝবেও না।'

শ্রীলার ভীষণ রাগ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে হতাশা। কাজের লোক তো দূরস্থান। অন্য কেউই যে কখনও ছেলেমেয়ের সমান হতে পারে না, তা কী করে ওকে বোঝাবে! সে বলল, 'একটা, মাত্র একটা পোশাক তোমার মতো দিলেই, তোমার মনে হয়, ও আর তুমি আমার কাছে এক? চমৎকার!'

'তুমি অন্ধ মা, তুমি বুঝবে না। যেভাবে সবসময়ে ওর হয়ে ওকালতি করো। আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।'

পিন্টু এসে ঢুকল। হাতে ঝুলছে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। বলল, 'এখনও তোমাদের সেই এক নীলজামা প্রসঙ্গ চলছে? আরে বাবা এটা বুঝছিস না কেন, তোর মতো জামা পরলেই কি চুনী তুই হয়ে যাবে? চুনী চুনীই থাকবে।'

সুরজিৎ যেন হালে পানি পেল, বলল, 'রাইট। দুজনে এক রকম জামা পরে বেরোলেও, কখনও দুজনকে একরকম দেখাবে না রে পাপু।'

পাপু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

সপ্তমীর দিনে চুনী সেজেগুজে নীল রঙের চুড়িদার পরে একগাল হেসে শ্রীলাকে প্রণাম করল, বলল, 'পাপু দিদি, তুমি এই জামাটা কবে পরবে?'

পিন্টু বলল, 'আরে এ চুনী, তু যে শাঁকচুন্নি বন গিয়া রে!'

চুনী বেশ কথার পিঠে কথা শিখেছে বলল, 'আমার শাঁকচুন্নিই ভালো বাবা, কটা ভূত হয়ে কাজ নেই।'

পাপু নীল পোশাকটা আর কোনোদিনই পরল না। অথচ খুব পছন্দ করে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিনেছিল জিনিসটা।

জটিলতা এখানেই থেমে থাকল না। একদিন ওর বাতিল করে দেওয়া স্কার্ট-ব্লাউজ পরে চুনী পেছন ফিরে কী করছিল ঘরে, সুরজিৎ তাকে পাপু বলে ডেকে ফ্যালে। সেই থেকে পাপু আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। ইদানীং ওর পুরনো জামাকাপড়গুলোর শ্রীলা হদিস পাচ্ছে না। নিজের মেয়ের বয়সি কাজের মেয়ে থাকলে জামাকাপড়ের খাতে খরচটা কমে। লোক রাখবার সময়ে এ হিসেবটাও মনে মনে করে নিতে হয়। জামাকাপড়ের খরচ কি কম? দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে, বেড়েই যাচ্ছে। একদিন পাপুর অনুপস্থিতিতে তার আলমারিটা ভালো করে খুঁজে দেখল, তাকের পেছনের দিকে পুরনো তোয়ালে মোড়া বাতিল জামাকাপড় গুছোনো রয়েছে। কাউকে দেবে? না নিজেই কিছু ভেবে রেখে দিয়েছে? মেয়েকে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে তোর কালো স্কার্টটা তো আর পরিস না, কোথায় গেল রে?'

পাপু উদাস গলায় বলল, 'কী জানি?'

অথচ একটু আগেই শ্রীলা দেখেছে কালো স্কার্ট তোয়ালে-মোড়া সযত্নে রাখা রয়েছে। নিজেই রেখে দিয়েছে, অথচ অনায়াসে বলে দিল 'কী জানি!' মেয়েকে কিছু বলতে আর সাহস পায় না শ্রীলা। আসল কথা ওগুলোও চুনীকে দিতে দেবে না। এইভাবে নীরবে ওগুলো সরিয়ে রেখে সে কথাই ও জানাতে চাইছে। এখন শ্রীলা কী করে?

অগত্যা আর বছরখানেকের মধ্যে শ্রীলা চুনীকে শাড়ি ধরায়। পাপুকে পারবে না। পাপু এখনও অনেক বয়স পর্যন্ত অনেক রকম পোশাক পরবে। চুনী তো আরও ক্ষয়া চেহারার মেয়ে, স্বাস্থ্য অনেক ভালো হলেও পাপুর কাঠামো সে পাবে কোথায়? অনায়াসেই আরও ক'-বছর চালিয়ে দিতে পারা যেত। চুনীর খুব পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা, বোঝাই যাচ্ছে। ফ্রক-স্কার্টে বয়সটা বেশ ঢেকে রাখা যায়। সব মেয়েই বাচ্চা থাকতে চায়। শ্রীলাদের ঘরের মেয়েও। চুনীদের ঘরের মেয়েও। শ্রীলা নিজের একটা লাল শাড়ি বাছে। লাল রংটা আজকাল আর পরছে না সে। শাড়িটা দিব্যি নতুন।

চুনী, চুনী, দ্যাখ দিকি, এই শাড়িটা পছন্দ হয় কি না।

লাল টাঙ্গাইল শাড়ি, জরিপাড়। এই অসম্ভব প্রাপ্তিতে খুশিতে ঝলমল করতে থাকে চুনী। 'এটা আমার, মা?'

'হ্যাঁ রে তোর, বেশ লম্বা হয়ে গেছিস, শাড়ি ধরে ফ্যাল এবার।'

চুনী আমতা আমতা করতে থাকে, 'মাঝে মাঝে পরব মা। সব সময়ে পরলে কাজের অসুবিধে হবে না?'

'যেগুলো আছে সেগুলো পরতে থাক। এরপর যখন দরকার হবে শাড়িই দেব।' সিদ্ধান্ত নেওয়ার গলায় শ্রীলা বলে। আরেকটা পরিত্যক্ত ছাপা শাড়ি এনে চুনীকে গছায়, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্ত। ব্লাউজগুলো একটু ঢলঢলে করে, ছুঁচ-সুতো দিয়ে তাকে মেরে ছোটো করে নেয় চুনী। কখনও শ্রীলা নিজেই করে দেয়। এইভাবে একরকম হঠাৎই চুনীর ফ্রক-স্কার্ট থেকে শাড়িতে উত্তরণ ঘটে যায়। পাপুর সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলবার কোনো উপায়ই থাকে না। একজন জিনস টিশার্ট, অন্যজন শাড়ি। একজন লম্বা স্কার্ট, অন্যজন শাড়ি। একজন কাফতান, অন্যজন শাড়ি। শাড়ি এবং শাড়ি এবং শাড়ি।

প্রথম প্রথম কাঠিতে জড়ানো কাপড়ের মতো দেখাত শাড়ি পরিহিত চুনীকে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর শ্রীলা সুরজিতের সংসারে থেকে তার কালো রঙে চাকচিক্য এসেছে, চুলে ঔজ্জ্বল্য। এখন শাড়ির আড়ালে হঠাৎ-ই যেন তার শরীর ভরে উঠতে থাকে। পরিচ্ছন্ন পাট পাট করে ধোপদুরস্ত, রং-মিলোনো শাড়ি ব্লাউজ পরে চুনী যখন ঘোরে ফেরে দোকানের শো-কেসের কালো মডেল

পুতুলের কথা মনে পড়ে যায় শ্রীলার। কিন্তু খুব শীগগিরই শ্রীলা অস্বস্তির সঙ্গে আবিষ্কার করে চুনী শুধু তার চোখেই নয়, পাড়ার রিকশাঅলা, বস্তুতলের কেয়ারটেকার, দারোয়ান, চায়ের দোকানের ছেলে, পাড়ার কিছু অকালকুষ্মাণ্ড—এদের চোখেও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চুনীর বিকেলের ছুটির সময় ক্রমশই বাড়ছে। অন্যান্য বাইরের কাজ, যেমন দুধ আনা, বাজার করা, মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতেও সে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে। এবং সময়টময় নিয়ে যখন বাড়ি ফিবছে তখন সারা শরীরে বেশ একটা হিল্লোল নিয়ে ফিরছে। চোখে মুখে যেন খুশি আর ধরে রাখতে পারছে না।

একদিন পিন্টু এসে বলল, 'মা, চুনীটা কি ওস্তাদ হয়েছে জানো, রাস্তাব মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা কুলি-কাবাডি লোকের সঙ্গে যাচ্ছে তাই ইয়ার্কি দিচ্ছিল। আমি দেখেও ফেলেছি, শুনেও ফেলেছি।'

শ্রীলা গৃহসমস্যার সব কথা সুরজিৎকে বলে না। এটা বলল, 'দিনকাল ভালো না। এভাবে চললে বিপদে পড়তে কতক্ষণ?'

সুরজিৎ গম্ভীর মুখে বলল, 'আরও আদর করে শাড়ি পরাও!'

'কেন, কত দুঃখে শাড়ি ধরিয়েছি জান না নাকি?' শ্রীলা রাগ করে বলে। সুরজিৎ হেসে বলল, 'যে কারণেই পরিয়ে থাক, তোমার হাত থেকে তাস এখন বেরিয়ে গেছে। এবার ট্রাম্পড হবাব জন্য প্রস্তুত থাক।'

সত্যিই চুনীকে সামলানো এবার দায় হয়ে উঠল। যখন তখন খিল খিল খিল, চুনী কাজ করছে না তো, ঘরে-দোরে নদী বইছে, এত ঢেউ। চুড়ির বিনিঠিনি, বাহাবি টিপেব রংচং, চটির ফটাস ফটাস। মাথায় টপ নট। ক্লিপ দিয়ে দুপাশ থেকে চুল তুলে মাথার পেছন দিকে আটকানো, বাকি চুল ছাড়া পেছনে, চুনী কিছুই শিখতে বাকি বাখেনি। লাল শাড়ি পরে এইভাবে ঢেউ কাটতে কাটতে চুনী সুরজিৎকে, পিন্টুকে জলখাবার দেয়। শ্রীলার চোখ করকর করে। নানা ছুতোয় ধমকায় সে মেয়েটাকে।

পিন্টু বলে, 'কী রে চুনী, আজ যে দেখছি টিকায়াম আগুনম।'

চুনী দারুণ চালাক। ঠিক ধরতে পারে, বলে, 'বাজে বকো না দাদা। যতই অং বং চং বল ফিলিমের আসল হিরোইনরা রেখা শ্রীদেবী সব কালো, কুচকুচে কালো।'

সুরজিৎ বলে, 'তাই নাকি রে?'

শ্রীলা প্রসঙ্গ থামাতে এক ধমক দেয়, 'তুমি চুপ কর তো। চুনী চুপচাপ কাজ কর। যত্ত বাজে কথা।'

চুনী দাঁত বার করে বলল, 'হিঁ, আমি সত্যি জানি মা, সব্বাই তো আর পাপুদিদির মতো গোরে গোরে নয়।'

'তুই থামবি?' শ্রীলা আবার বলল।

পাপু শেষ লুচিটা কোনোমতে মুখে পুরে উঠে গেল।

চুনীকে সোজাসুজি ধমকানোটা আর এড়ানো যাচ্ছে না। হেমন্তের সন্ধে। রবিবার। শ্রীলা ছাড়া কেউ বাড়ি নেই। চুনী আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরল।

শ্রীলা গম্ভীর মুখে বলল, 'চুনী শোন। চটিটা ছেড়ে এসে এ ঘরে শোন।'

চুনী আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল।

'যত রাজ্যের ছেলের সঙ্গে অত বাজে বকবক করিস কেন রে? সিঁড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে লিফটম্যান জালাল। নীচে দারোয়ান বাহাদুর, রাস্তার হরেকরকমের ছোকরা তাদের সঙ্গে তোর অত কলকলানি কীসের? বিপদে পড়তে চাস না কী?'

চুনী আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে বলল, 'দিদি তো করে। দিদির তো অত ছেলে-বন্ধু, তারা বাড়িতে এসে যখন গল্প করে দিদিও তো হেসে হেসে ইয়ার্কি দেয়। তখন তো কিছু বল না। তা ছাড়া আমি তো শুধু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করি, দিদি যে সিনেমায় যায়, পিকনিকে যায়, সেগুলো বুঝি কিছু না।'

হাসবে না কাঁদবে শ্রীলা ভেবে পায় না। বলল, 'ওরা তো সব দিদির কলেজের ক্লাবের বন্ধু, মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে ওদের কোনো তফাত-ই নেই। তোর কি তাই? তুই যেটা করিস সেটা ভালো দেখায় না তো বটেই, তুই একদিন মহা বিপদে পড়বি। কী বিপদ, কেন বিপদ কিছু কিছু বোঝবার বয়স তোব হয়েছে চুনী।'

চুনী গোঁয়ারের মতো বলল, 'সব্বাই মোটেই দিদিব কলেজের বন্ধু নয়, দিদি তো একজন লম্বা গোঁফ দাড়িঅলা ছেলের সঙ্গেও একা একা ঘোরে। সিনেমা যায়। ইস্টিশানে একদিন ট্রেন থেকে নামল।'

তুই কোত্থেকে দেখলি?

আমি জানি।

শ্রীলা স্তম্ভিত।

সেদিন সুরজিৎ ফিরলে তাকে সব খুলে বলে শ্রীলা দৃঢ়কণ্ঠে দাবি জানাল, 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।'

সুরজিৎ বলল, 'খেপেছো? সবে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে, পার্ট ওয়ান এসে গেল। এখনই বিয়ে? তুমিই না বলতে মেয়ে তোমার ছেলের সমান। পড়বে, যতদূর ইচ্ছে, ডক্টরেট করবে, চাকরি করবে।'

সে আমাব ভাগ্য আব আমার মেয়ের ভাগ্য। কপালে যদি না থাকে আমি কি করব বলো, আমাব দিক থেকে তো চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

সুবজিৎ বলল, 'তুমি এখনই অত হতাশ, অদৃষ্টবাদী হযে পড়ছ কেন? সে ছেলেটি কে, কার সঙ্গে মিশছে, ব্যাপারটা আদৌ সত্যি কিনা এসব জানো, জানতে চাও। চুনী কি না কি বলল, তুমিও অমনি বিশ্বাস করে বসলে? তা ছাড়া সত্যিই যদি সিরিয়াস কিছু হয় মেয়েকে টেনে এনে বিয়ে দিতে পারবে? না সেটা উচিত হবে? তুমি কোন্‌কালে আছো বল তো?'

শ্রীলা গম্ভীর ভাবে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি মা। আমাকে সব সময়ে আগামীকালে থাকলে চলে না। তুমি যত সহজে 'জানো, জানতে চাই' বললে আমি তা পারব না। উপদেশটা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। বাবারা সব সময়ে কথায়বার্তায় সুপার ফাস্ট। কাজেকম্মে মান্ধাতার যুগে। আমি অন্তত এ বিষয়ে এটা চলতে দিতে রাজি নই।'

সুরজিৎ বলল, 'ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণ করলাম।'

সুরজিৎ চ্যালেঞ্জ নেবার দিন সাতেকের মাথায় শ্রীলা জানল, 'গোঁফ-দাড়িঅলা লম্বা একটি বন্ধু সত্যিই পাপুর হয়েছে। ছেলেটি হোস্টেলে থাকে। এম-ই করছে। ইউনিভার্সিটির চত্বরেই আলাপ। পাপুর গ্রুপের সঙ্গেও ওর ভালোই চেনা। তবে হ্যাঁ, পাপু দু-এক দিন ওব সঙ্গে কয়েকটা খুব ভালো ভালো বিদেশি ছবি দেখতে এসপ্লানেড পাড়ায় গিয়েছিল। বালিগঞ্জ স্টেশনে একবার ওরা কয়েকজন বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিচ্ছিল, নিজেরা কোথাও যায়নি। পাপু জানতে চেয়েছে কোথা থেকে সুরজিৎ এত কথা জানতে পারল। সে তো লুকিয়ে কিছু করেনি। অন্যান্য বন্ধুদের মতোই জয়ও একদিন এ বাড়িতে আসতই। ইন ফ্যাক্ট জয় পরের রবিবার নিজেই আসতে চেয়েছে।

ছেলেটি—জয়দীপ—যেদিন বাড়িতে এলো সুরজিৎ, শ্রীলা তো বটেই পিন্টু সুদ্ধ মুগ্ধ হয়ে

গেল। সোজা স্বাস্থ্যবান চেহারা, দাড়ি গোঁফে দারুণ ইনটেলেকচুয়াল দেখায়। অথচ কোনো কৃত্রিমতা, কোনো দম্ভ নেই। এঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে, কবিতা এবং ফিল্ম সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ, শুধু পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে কথা বলেই সে পিন্টুকে কাত করে দিল। খাবার সময়ে খুব সহজভাবে জয় জানাল সে শিগগিরই এম আই টিতে ডক্টরেট করতে চলে যাবে। বাবা মার ইচ্ছে বিয়ে করে যায়। বউকে শিগগিরই নিয়ে যেতে পারবে। পাপুর সঙ্গে বিয়ে হলে সে খুব আনন্দিত হবে। শ্রীলা সুরজিৎ উভয়েই অবাক। এত তাড়াতাড়ি, এভাবে যে এমন প্রস্তাব কেউ করে ফেলতে পারে তারা ভাবতেই পারেনি। পাপুটারও মুখ লাল হয়ে গেছে। সে বোধ হয় এত সব ভাবেনি।

সুরজিৎ বলল, 'সে কি! তোমার বাড়ি, বাবা-মা?'

জয় হাসল, বলল—'বাবার বর্ধমানে নার্সিংহোম আছে। ডাক্তার। মা-ও সেসব সামলান। ওঁরা নিশ্চয়ই শিগগিরই এসে দেখা করবেন। তবে বিয়ের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পাপুর পার্ট ওয়ানের পরই বিয়েটা হতে পারে। ডিসেম্বর নাগাদ আমি চলে যাব। পাপু পার্ট টু-টা দিক। তারপর আমি এসে নিয়ে যাব। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স ওখানেই করবে। অসুবিধে কি? স্টুডেন্টস ভিসায় বরঞ্চ এটাই যাবার সুবিধে। আমি আমার বায়োডাটা কাল পরশুর মধ্যেই দিয়ে যাব।'

জুলাই মাসের এক আশ্চর্য সুন্দর বৃষ্টি-ধোয়া অকালবসন্তের হাওয়া-বওয়া দিনে মাত্র উনিশ বছর বয়সে পাপুর বিয়ে হয়ে গেল। এবং জুলাই মাসেরই এক উপর্ঝুরন্ত বাদল দিনে চুনী এসে শ্রীলাকে জানাল, সে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ সে বিয়ে করছে। বর রাজমিস্ত্রি। সনাতন মিস্ত্রির নাম এ দিকে কে না জানে, ঢালাই বাবদই হাজার হাজার টাকা কামায়। তাকে আর চাকরি করতে দেবে না বর। বারুইপুরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। কোনো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। খালি এক শাশুড়ি।

শ্রীলা অবাক হয়ে বলল, 'কবে হবে বিয়ে? কোথায়?'

চুনী সলজ্জে জানাল, 'বিয়ে হয়ে গেছে গত পরশু। কালীঘাটে। চুলের ভেতরে সিঁদুর সে লুকিয়ে রেখেছিল।

শ্রীলা বলল, 'আগে বললেই পারতিস। তোর বাবা-মা নেই। আমরাই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিতে পারতুম। একটু খোঁজ-খবর নিতে পারতুম।

চুনী সলজ্জ নতমুখে নখ খুঁটতে খুঁটতে জানাল, তারও দিদির মতোই হুট বলতেই বিয়ে হয়ে গেল।

শ্রীলা মনে মনে খুব খানিকটা হাসল। কে জানে, দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেই বিয়েটা ও হুট করে করে ফেলল কি না! কিছুই অসম্ভব নয়। সে পাপুর উপহারের শাড়ি থেকে বেছে একটা রংচঙে ভালো সিল্কের শাড়ি চুনীকে দিল। নিজের একটা হালকা রুপোর সেট ছিল, সেটাও দিয়ে দিল। বলল, 'এতদিন চাকরি করে যা পয়সা জমালি সব পোস্ট অফিসে তোলা আছে। এই নে পাস বই। সাত বছরে এগারো হাজারের মতো জমেছে সাবধানে রাখিস চুনী। এই এখন তোব সর্বস্ব।'

চুনী শ্রীলাকে প্রণাম করে ছলছল চোখে বাড়ি ছাড়ল।—'বাবার সঙ্গে, দাদার সঙ্গে দেখা হল না মা। পরে এসে নিশ্চয়ই দেখা করে যাব।'

আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর শেষ হয়ে গেল। প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেকবার যখন পাপু আসে, শ্রীলা অবাক হয়ে দেখে, সে প্রতিদিন আরও সুন্দর, আরও শ্রীময়ী হয়ে উঠছে। বরাবরের গোলগাল ভাবটার ভেতর থেকে কে যেন বাটালি দিয়ে কেটে বার করে আনছে ধারালো চেহারা। গোঁয়ার, জেদি, রাগি, ভাবটা কোমল ঝলমলে লাবণ্যে করে মিলিয়ে গেল। সে যে আপাদমস্তক জয়দীপ

নামে মানুষটার বিস্ময় দিয়ে মোড়া, এখন বুঝতে পারছে না একটা অপরিমিত আনন্দের ভাণ্ডার তার সামনে কেমন করে খুলে গেল, এ বিস্ময় কেমন করে তার নিজের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল— এ কথা শ্রীলা-সুরজিৎ বুঝতে পারে। নিজেদের মধ্যে সুখের হাসি হাসে। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ডিসেম্বরে জয়দীপ চলে গেল। এপ্রিলে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাপুও যাবে। এ কটা মাস প্রধানত মায়ের কাছেই থাকছে সে। একদিন নিজের পুরোনো আলমারি গোছাতে গোছাতে পাপু একটা প্যাকেট হাতে বলল, 'মা, একদম নতুন একটা চুড়িদার-কামিজ রয়েছে, দ্যাখো, কী সুন্দর পাউডার ব্লু রংটা।'

শ্রীলা মুখ ডুবিয়ে ডাঁই জামায় বোতাম বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই বলল, 'যা হঠাৎ তোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, এখনও কত ওরকম নতুন ড্রেস পড়ে রয়েছে দ্যাখ। স্কার্ট-টার্ট নিয়ে যা না ক-টা। বিদেশে পরতে পারবি। নতুন নতুন জিনিসগুলো নষ্ট হবে, খুব গায়ে লাগে রে!'

পাপু বলল, 'না মা, এটা একদম নতুন। কী সুন্দর চওড়া সাদা স্যাশ!' শ্রীলা এইবার ফিরে দেখল। চিনতে পারল তিন-চার বছর আগের পুজোয় কিনে দেওয়া সেই চায়না-সিল্কের পোশাক যা পাপু কোনোদিন স্পর্শ করেনি। কেন পরেনি সেটা ও বেমালুম ভুলে গেছে। সে হেসে বলল, 'পর না পাপু, আজই পর।'

'পরব?' চুল দুলিয়ে পাপু বলল, 'আজ বিকেলে একটু লাইব্রেরি যাব মা, তখন পরব, হ্যাঁ?'

সন্ধে প্রায় হয়ে গেছে। এসব পাড়ায় শাঁখ বাজে না। কিন্তু ধূপ জ্বলে। শ্রীলা ঘরে ঘরে চন্দন-ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ধূপের অনুষঙ্গে শাখের আওয়াজও কেমন মনে এসে যায়, মনের মধ্যে বসে— স্বর্গত পূর্বনারীরা শাঁখ বাজান। অমঙ্গল অশুভ দূর হয়ে যাক এই প্রার্থনা বুকে নিয়ে মধ্য কলকাতায় ভীরু কিশোরী সন্ধের শাঁখ। সে সময়ে চারপাশ ঘিরে বাবা-মা-ঠাকুমা-দাদা-দিদিরা থাকা সত্ত্বেও সন্ধের মুখটাতে পৃথিবীটাকে কেমন একটা নাম-না-জানা অপরিচিত রহস্যের জায়গা, দুঃখের জায়গা বলে মনে হত। সেই বিষাদের অনুষঙ্গও ধূপের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে। এই সময়কার নির্জনতাটুকু শ্রীলা খুব রোমান্টিকভাবে উপভোগ করে।

বেল বাজল। ছেলে গেছে দিঘা। সুরজিৎ আজ অফিস ফেরত পাইকপাড়ায় যাবে। তার বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই খুব অসুস্থ। আসতে দেরি হওয়ার কথা। তবে নিশ্চয় পাপুই। দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে কিন্তু সে পাপুকে দেখতে পেল না। আধা-অন্ধকারে ল্যান্ডিংটাতে পুঁটলি হাতে করে যেন চুনী দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে দিয়ে শ্রীলা থমকে দাঁড়াল—চুনীই তো!

কী রে চুনী?

চুনী হঠাৎ ল্যান্ডিংটার ওপরেই বসে পড়ল। হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'মা আমায় তোমার কাছে আবার কাজ করতে দাও মা। তোমার কাছে আমায় ঠাঁই দাও মা!'

আলোটা জ্বেলে দিল শ্রীলা। পেছনে পাপু এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা নীল চুড়িদারে দেখছে চুনীকে। চুনীর সেই কালীঘাটের কালীর মতো চকচকে কালো কোথায় গেল? আপাদমস্তক খসখস করছে। এই ক-মাসে সে অমন হাড় জিরজিরেই বা হল কী করে? পরনের শাড়ি ব্লাউজ দুটোই চিট ময়লা। চুলে জট, যেন হাওড়া-শেয়ালদার সারাদিন ধরে বেগুন-ঢ্যাঁড়স-বেচা শহরতলির ফেরিওয়ালি। কিংবা সোজাসুজি ভিখারিনি। কোলে একটা পেট ফুলো, ন্যাংটাপুটো বাচ্চা ধরিয়ে দিলে মানাত।

শ্রীলা বলল, 'কাজ করবি তো বেশ কথা। কাঁদছিস কেন? সনাতনের কী খবর?'

'ও মিনসের নাম কোরো না মা', এ ক-মাসে চুনীর মুখের ভাষারও অনেক অবনতি ঘটেছে, 'ঠগ, জোচ্চোর, আমার জমানো টাকাগুলো তুইয়ে বুইয়ে নিয়ে নিয়েছে, শাউড়িতে আর ওতে

মিলে মেরে মেরে আমায় উচ্ছন্ন করে দিয়েছে মাগো! এই দ্যাখো।' ছেঁড়া ব্লাউজের ভেতর থেকে কালশিটের দাগ দেখায় চুনী, বলে, 'তারপর পরশুদিন কোত্থেকে ছেলেপুলে সুদ্ধ একটা বউকে নিয়ে এসে বললে, 'এই আমার আসল বউ। তুই দূর হয়ে যা'—চুনী আবার হাঁউমাউ করে উঠল।

শ্রীলা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কাঁদিসনি চুনী। ওরা ওইরকমই হয়। তুই তো আমাদের কথা শুনিসনি। ঘরে আয়। কাপড় দিচ্ছি, সাবান দিচ্ছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নে। সে আবার এসে গোলমাল করবে না তো?'

ইস, গোলমাল করলেই হল? নিজেই তো বলল, 'কালীঘাটের বিয়ে আবার বিয়ে!' এই বাড়িতে তোমার কাছে থাকতে পেলে আমি আর কোথাও কখনও যাবো না মা!

শ্রীলার এত দুঃখেও হাসি পেল। তার শাশুড়ি একবার বলেছিলেন, 'পেটের খিদে মিটে গেলে, গায়ে-গতরে একটু শাঁসজল লাগলেই এদের অন্য খিদে চাগাড় দিয়ে উঠবেই। তখন মিষ্টি কথাই বলো আর টাকাই দাও, কিছু দিয়েই বশ মানাতে পারবে না।'

চুনী পুঁটলি খুলে বলল, 'তোমার দেওয়া সিল্কের শাড়িখানা খালি আনতে পেরেছি মা, গয়নাগুলো সুদ্ধ গা থেকে খুবলে খুবলে নিয়েছে।'

'ঠিক আছে। তুই এই কাপড়খানা পর।' শ্রীলা নিজের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে তার ঘরে পরার একখানা শাড়ি আর ব্লাউজ তক্ষুনি এনে দিল।

যা বাথরুমে যা চুনী। এরকম নোংরা হয়ে থাকিসনি। দেখতে পারছি না।

চুনী বাথরুমে ঢুকে গেল। শ্রীলা হালকা মনে পাপুর ঘরে ঢুকল।

ভালোই হল, বুঝলি পাপু। এতদিন ধরে লোক খালি আসছে আর যাচ্ছে। একটাও ভালো...

থমকে গেল শ্রীলা। পাপু বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। নীল চুড়িদার পরনে। তার পিঠের দুটো তিনকোণা হাড় জামার মধ্যে দিয়ে উঠেছে নামছে। ঝুঁটি বাঁধা চুল পিঠ থেকে কাঁধের ওপব জাপানি পাখার মতো ছড়িয়ে গেছে। ছবিটা কেমন পরিচিত লাগল শ্রীলার। সে ঝুঁকে পড়ে পাপুর পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ কী হল?

সে নরম গলায় বলল, 'পাপু! জয়ের জন্য মন কেমন করছে? আর ক-মাস পরেই তো দেখা হবে, কাঁদছিস কেন?'

পাপু তেমনি উপুড় হয়ে ভাঙা ভাঙা বোজা গলায় বলল, 'মা; চুনীর কী কষ্ট...মা! কেন এমনি হবে?'

শ্রীলা ঝুঁকে ছিল। সোজা হয়ে গেল। খাটের মাথার দিকে শুভ্র দেওয়াল। সেখানে কি কোনো লিখন? অনন্ত-কারুণিক কোনো আশিস-দৃষ্টি? নিদাগ দেয়ালের সেই অলক্ষ্য চাহনির দিকে শ্রীলা তাকিয়ে রইল পরম আনন্দে, বিষাদে। কৃতজ্ঞতায়। পাপু কাঁদছে। নিজের জন্য নয়। চুনীর জন্য।

প্লুটনিক

শীতকালে বৃষ্টি বড়ো বিরক্তিকর। ঘরে বসে তবু একরকম। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ভোগ করতে হলে সব মাটি। জায়গাটা গোপালপুর। যাকে আগে লোকে বলত গোপালপুর-অন-সি। আমাদের বড়ো প্রিয় জায়গা। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে। সমুদ্রের রূপ এখানে মে-জুন মাসে উত্তাল, দুর্ধর্ষ, জল যেন টগবগ করে ফুটছে মনে হয় এককে সময়।

শীতকালে আবার সেই সমুদ্রকেই চেনা যাবে না। একেবারে সুনীল জলধি। গুঁড়ি-মেরে-এগিয়ে-আসা নীচু ব্রেকারগুলো নয় নয় করেও কিছু তো থাকেই। না থাকলে মনে হত মানস সরোবর। যেসব ভাগ্যবানরা মানস সরোবরে গেছেন তাঁদের তোলা ছবিতে এই রকমটাই যেন দেখেছি। দু-এক বছর বাদ বাদই আমরা গোপালপুরে বেড়াতে আসি। গ্রীষ্মেও আসি। শীতেও আসি। উঠি ব্যাবিংটন সাহেবের বাংলোয়। বরাবর। আমরা আসছি শুনলেই উনি বেরহামপুর স্টেশনে শওকতকে দিয়ে জিপ পাঠিয়ে দেন। আরামে চলে আসি।

এই বাংলোর ওপর আমাদের এত ঝোঁক কেন সেটা চট করে এককথায় বোঝানো যাবে না। কারণ বাংলোটা সুন্দর নয়, আধুনিক তো নয়ই। আশেপাশেই কয়েকটা আছে এটার চেয়ে অনেক সুদৃশ্য। ব্যাবিংটন সাহেবের বাংলো পথের শেষে একটা বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধেকটা তার বাঁধানো রাস্তায়, অর্ধেকটা বালির আঁটসাঁট উঁচু স্তূপের ওপর। দাঁড়িয়ে আছে বললেও ভুল হবে। হেলে আছে। পেছন দিকে সমুদ্র। এই পেছন দিকটায় বালিয়াড়িটা এমন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে যে সমুদ্রের দিক থেকে দেখলে মনে হবে বাড়িটা যে-কোনো মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু পড়ে না তো! ছ-সাত বছর ধরে দেখছি। একই রকম বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কোনোদিন আমরা থাকাকালীনই হুড়মুড়িয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও কী রকম একটা আকর্ষণ আছে বাড়িটার। ভেতরে ঢুকলে মনে হয় পুরোনো ইংল্যান্ডের কোনো পোড়ো কানট্রি-হাউজে এসেছি। ঢুকে পড়েছি ভিন দেশের অতীত ইতিহাসের পোকায় খাওয়া পাতার ভেতরে। সামনের দিকে বেশ বড়ো হাতা, তার একদিকে একটা ছোট্ট আউট হাউজ। হাতাটা ঢালু। শান বাঁধানো হলে কি হবে, বালিতে ভরতি থাকে সবসময়। ধারে ধারে কেয়ারি করা। তেমন কিছু গাছপালা নেই। কে-ই বা যত্ন করবে! তবে বেশ কিছু টবের পাতাবাহার আর ফুলগাছ আছে। এই-ই বাংলোর বাগান।

ঢুকে প্রথমে বাঁদিকে ব্যাবিংটনের নিজের ছোট্ট ঘর। ডানদিকে একটা লাউঞ্জ মতো। সেটা ব্যাবিংটন সাহেবের অফিস। একদিকে ক-টা বেতের চেয়ার। সামনে কাউন্টার। তার পেছনে ব্যাবিংটন সাহেব শর্টস আর আলগা টি শার্ট পরে খুব কায়দা মেরে বসে থাকে। গাবদা একটা খাতা নিয়ে সারা সকাল খুটখাট কাজ করে। কত তো ওর গেস্ট আসছে! কুল্লে ঘর তো তিনখানা। লাউঞ্জ দিয়ে ঢুকতে পেল্লাই একটা হল। তার বাঁদিকে ওই হলের মতোই প্রায় লম্বা আর একটা পেল্লাই ঘর। উঁচুতে বোধহয় বিশ ফুটেরও বেশি। এই ঘরটা ওর চারজনের। তবে দরকার হলে ছ জনের দলকেও অনায়াসেই দেওয়া যায়। দেয়ও। ডানদিকে দুখানা ঘর ডবল বেড। হল পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গেলে আগে একটা ঢাকা দালান, তার বাঁদিকে রান্নাঘর আর স্টোর। দালানটাতে

কিচেন টেবল আছে, আরও নানা খুচখাচ ঘরকন্নার জিনিস। এই দালানটার শেষে বিরাট, মোটা কাঠের দরজা। তার ওদিকে আবার চাতাল। খোলা। মাথার ওপর অর্ধেকটা টালির ছাদ আছে। বাকি সব দিক খোলা। এইখানে বসে সমুদ্র দেখা যায় অবাধ।

হলটা দারুণ। যেমন লম্বা তেমন চওড়া। মেঝে ভরতি পুরনো দিনের মেরুন রঙের কার্পেট। মাথায় ঝাড়বাতি। যদিও জ্বলে না। একদিকে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। বাজে না। ঠিকঠাক সময়ও দেয় না। কিন্তু চলে। আপন খেয়ালে, সময়ের কোনও তোয়াক্কা না রেখে টিক-টিক টিক-টিক চলে। হলে ঢুকতেই বড়ো বড়ো গদি দেওয়া সোফাসেট। আর রান্নার চাতালের ধার ঘেঁষে বহুদিন আগেকার ডিমের মতো আকারের বিরাট ডিনার টেবিল। চেয়ারগুলো লাল ভেলভেটের গদি-মোড়া, বাঁকানো পায়ের। পিঠের দিকে বেশ কারুকার্যও আছে। সব আসবাবই সেগুন কাঠের, চকচকে পালিশঅলা, আকারে বড়ো। কাবার্ড, আলমারি সবই। বেমানান খালি একদিকে একটা খুব খুদে ফ্রিজ। আর তার ওপরে টেলিফোন। এই দুটো জিনিস বাদে ঘরখানাতে একটাও এ শতাব্দীর জিনিস নেই, বাজি ধরে বলতে পারি।

ঘরের আসবাবও ওই রকমই। ওয়ার্ডরোব, খাট, দেরাজ-আয়না। শুধু অতিরিক্ত বিছানা দিতে হলে, স্টিল ফ্রেমের ফিতে-লাগানো খাট দেওয়া হয়। ওপরে ডানলোপিলোর তোশক বা গদি যাই হোক।

এখানে বেশিরভাগ বাড়িই পোর্তুগিজ গোত্রীয় সাহেবদের। এটাই বোধহয় একমাত্র কলকাতাইয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের। অন্তত আমি যদ্দূর জানি। ব্যাবিংটন সাহেবের রং বেশ লালচে ফরসা, অনায়াসেই আসল সাহেব বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। পঞ্চাশের ওপর বয়স মনে হয়, কিন্তু খুব মজবুত শরীর। কটা চুল। পাকা টাকা বুঝি না। সব সময়েই দেখি শর্টস পরে ঘোরে। খালি শীতের শর্টসটা একটু মোটা ধরনের, আর গরমেরটা পাতলা। গরমে অনেক সময়ে খালি গায়েও ঘুরতে দেখেছি।

চব্বিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়ায় শীতের কোনো লক্ষণই নেই। এমনিতেই সমুদ্রের ধারে শীত তত বোঝা যায় না। এবার যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের শৈত্যাভাব। এমনিতে বেশ মনোরম কিন্তু একটু রোদ উঠলেই আর সি-বিচে থাকা যাচ্ছে না। চান করে উঠে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কুহু আর গোবিন্দ বলতে বলতে গেল, 'ভাবো তো, পৃথিবীর নানান জায়গায়, এমনকী ভারতবর্ষেও কোথাও কোথাও এখন বরফ পড়ছে!' এরা স্বামী-স্ত্রী বোধহয় অল্পদিন বিবাহিত, বিয়ের ঠিক পরেই বেরোবার সুযোগ পায়নি, এখন ক-মাস পরে এসেছে হনিমুনে। আছে আমাদের ডানদিকের ঘর দুটোর একটায়। আমরা ওদের নিজেদের মধ্যে বলি কুহু ও কেকা। খুব একটা ভাব না হলেও কুহুর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ভালোই কথাবার্তা বিনিময় হয়। বেশ মিশুক মেয়েটা। আরেকটা ঘরে আছেন বি. সেন বলে এই ভদ্রলোক। এঁরও বয়স পঞ্চাশের ওদিকে। কিন্তু নিশ্চয় করে বলাও কিছু যায় না। মাথার চুল বেশিরভাগই পাকা হলে হবে কি, বেশ তাগড়া চেহারা। হাঁটা-চলা সবল, দ্রুত। থলথলে না হলেও একটু মোটার দিকেই। তামাটে রং গায়ের। খুব শৌখিন। মাথায় বিদেশি ক্রিম-ট্রিম মাখেন বোধহয়, সবসময়ে একটু মৃদু গন্ধ বেরোয়, মনে হয় মাথার চুল থেকেই। গন্ধটা ঠিক ধরতে পারি না। জামাকাপড় জুতো সব ফিটফাট, যখনকার যা তখনকার তেমনটি। সবুজ রঙের সুইমিং ট্রাংক পরে চান করতে নামবেন, বিরাট একটা টার্কিশ তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে। বিচ দিয়ে হাঁটছেন দেখব পাতলা লাটখাওয়া ট্রাউজার্স আর আলগা টি শার্ট পরে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। আবার সন্ধেবেলায় বসবেন, স্যুট-টাই হাঁকিয়ে, পালিশ করা কেতাদুরস্ত জুতো। তাই এঁকে আমরা বলি বড়োসাহেব।

এঁর কাছে ব্যাবিংটন আপাতত ছোটোসাহেব হয়ে গেছেন। কুহু আব গোবিন্দ বা কুহু ও কেকা যেমনি হাঁসকুটে, গপ্পোবাজ, তেমনি একলষেঁড়ে ওই বি. সেন। কারও সঙ্গেই যেন আলাপ করার গরজ নেই। গতিবিধিও আমাদের সঙ্গে মেলে না।

দুই সাহেব সন্ধে থেকেই বোতল নিয়ে বসে। সমুদ্রের দিকের চাতালটায়। দৃশ্যটা ভারি মজার। বাঁ পাশে এক সারি মরকুটে ঝাউগাছ। আধভাঙা বালিয়াড়ির ওপর সিমেন্ট-চটা চাতাল। চাতালের ওপর গেলে স্টিলের ফোল্ডিং টেবলটা পেতে ফেলে ব্যাবিংটন। শওকত, তার হুকুমবরদার, স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার পেতে ফেলে যেন অন্তত আধডজন লোকের মজলিশ বসবে। পাপাম্মা, ব্যাবিংটনের আরেক হুকুমবরদার, একটি তেলেঙ্গি মেয়ে, বড়ো এক প্লেট কাজুবাদাম, বোতল গেলাস সব সাজিয়ে রেখে যায়। ওরা দুজনে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকে, হাতে গেলাস, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে, নামিয়ে রাখছে, আবার তুলে নিচ্ছে। পাশাপাশি চেয়ারে বসে দুজনেই একেবারে আকাট চুপ। গম্ভীরভাবে, কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে বসে বসে গিলে যাচ্ছে। অন্তত আমি তাই বলি। যাই হোক, গেলার প্রভাব কিন্তু কারও ওপরই বিন্দুমাত্রও পড়ে বলে মনে হয় না। ব্যাবিংটন আগেও যেমন হাসিখুশি সদাশয় ভদ্রলোক, পরেও ঠিক তেমনি। বি. সেন আগেও যেমন গোমড়া, পরেও তেমন গোমড়া।

এই সময়টা কুহু-কেকা ফেরেই না, কোথায় কোথায় বেরিয়ে যায়, আমরা বুঝতেই পারি না। আমরাও সাড়ে সাতটা-আটটা পর্যন্ত বাংলোর কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে বসে থাকি। যতক্ষণ দিনের আলো থাকবে ততক্ষণ বিচ ধরে বেড়াব, অন্ধকার হলেই বসে পড়ব। লাইট-হাউজটা কাছেই। অন্ধকার জলের ওপর লাইট-হাউজের আলোটা যতক্ষণ না ঘুরতে আরম্ভ করছে, ততক্ষণ আমার ছেলে বাবাই আমাদের উঠতেই দেবে না। এখান থেকে দুই সাহেবের পান-দৃশ্যটা দেখা যায়। বাবাই বলে, 'মা, ওরা কত থামস আপ খাবে!'

ঘোষ সাহেব অর্থাৎ বাবাইয়ের বাবা বলে, 'ওরা থামস আপ খাচ্ছে? তুই তো দেখছি বুদ্ধু দা গ্রেট।'

আমি চিমটি কেটে থামবার চেষ্টা করলে কী হবে, ঘোষ সাহেব তার সদাসত্য বলিবে কদাচ মিথ্যা বলিবে না নীতি অনুসারে বলে, 'থামস আপের বোতল তুই চিনিস না? ইয়ার্কি পেয়েছিস?'

'তবে কী খাচ্ছে বাবা, মদ?' মদটা খুব চুপিচুপি বলে বাবাই।

'এই তো ঠিক ধরেছিস ব্যাটা', বলে বাবা ছেলের পিঠে একটা বিরাশি-সিক্কা ওজনের তারিফসূচক থাবড়া দিয়ে, জনান্তিকে আমাকে বলে, 'থামস আপ, ধোঁকা দিতে শিখেছে কেমন দেখেছ! তোর বাপ চেনে আর তুই চিনিস না?'

আমরা তিন ঘর অতিথিই এক ডিনার-টেবিলে খাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। সবচেয়ে প্রথমে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে খেয়ে নেয় ব্যাবিংটন আর বি. সেন। নটা নাগাদ খাই আমরা। নব-দম্পতির খাওয়া সবচেয়ে দেরিতে। ওরা যখন খায় তখন আমরা সামনের, কি পেছনের চাতালে বসে গল্পগাছা করছি। নয়তো শুয়েই পড়েছি কোনো কোনো দিন। ওদের হাহা হুহু কানে আসে। পাপাম্মা বলে তেলেঙ্গি মেয়েটি, আমরা যতদিন আসছি, দেখছি ব্যাবিংটনের বাংলোতেই আছে। খুব ভালো রাঁধে, বিশেষ করে পশ্চিমি রান্না। খাওয়ার জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হয়, যে যা খেতে চায় তা-ই রেঁধে দেয়। স্পেশ্যাল তেল-ঘি বা কোনো ডিশ খেলে সেগুলো কিনে দিতে হয়। এসব থেকে দু হাতে মারে, বুঝতে পারি। কিন্তু এত ভালো রাঁধে, আর এত ভালো ব্যবহার যে মেনে নিই। মেয়েটা আঁটসাঁট গড়নের, কুচকুচে কালো। মাথার বেণীতে সবসময়ে ফুল থাকবে, নাকের দুদিকে দুটো নাকছাবি। খুব পরিষ্কার। শাড়ি ব্লাউজ ঝকঝক করে, ভালো ট্যালকম পাউডারের

গন্ধ বেরোয় গা থেকে। কাজেই আমাদের কোনো অসুবিধেই হয় না। হ্যাঁ বলতে ভুলেছি, ব্যাবিংটনের বাংলোর সবচেয়ে মজাদার অধিবাসী হল প্লুটো, একটা তাগড়া অ্যালসেশিয়ান। সবসময়ে নখের থপ থপ শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকালবেলা মুখে করে কাগজ নিয়ে আসবে। পাপাম্মার সঙ্গে বাজারে যাবে, ভারী থলিটা মুখে করে কামড়ে নিয়ে আসবে। যতক্ষণ পাপাম্মা টেবিলে পরিবেশন করবে, টেবিলের একধারে থাবা দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যা-হ্যা করবে জিভ বার করে। একমাত্র ব্যাবিংটনের খাওয়ার সময়েই পাপাম্মা পরিবেশন করে, ব্যাবিংটন আর বি. সেনকে। আমাদের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রথম প্রথম পরিবেশন করত, কিন্তু টেবিলের ধারে কুকুরটার অমনি দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের মোটে পছন্দ হয় না, তাই ওকে বলি কুকুর নিয়ে চলে যেতে, হয়ে গেলে সব তুলে-টুলে নেয়। রাতে আবার কুহু-কেকা খেতে এলে, সব গুছিয়ে দিয়ে চলে যায়। দশটার পর ও আর বাংলোয় থাকতে চায় না। আউট-হাউজে চলে যায়।

যাই হোক, চব্বিশে পর্যন্ত বেশ ছিল। পঁচিশে সকাল থেকেই আরম্ভ হল বৃষ্টি। ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে। সেইসঙ্গে হাওয়া চলছে খুব। আমরা জানি ব্যাবিংটন ক্রিসমাস করে খুব ঘটা-পটা করে। জানি মানে জানতাম, ওর কাছে থেকেই শুনেছিলাম। এবার দেখবার সুযোগ হল। মাঝের হলঘরটা চব্বিশ তারিখে সারাদিন ধরে পরিষ্কার হল। লোক বলতে শওকত, সেই আধবুড়ো ড্রাইভার, পাপাম্মা, ব্যাবিংটন আর প্লুটো। একটা অ্যান্টিরুমে ক্রিসমাসের সব সাজ-সরঞ্জাম থাকে। সেখান থেকে ওর কৃত্রিম ফারগাছ বেরোল, বেরোল চকচকে সব কাগজের শিকলি। চীনে লণ্ঠন, গুচ্ছের নানান আকার নানান আয়তনের বেলুন, জাপানি ফিতের ফুল। আর একটা বিরাট সোনালি বেথলিহেম স্টার। বেশিরভাগ জিনিসই মুখে করে করে নিয়ে এল প্লুটো। আমার ছেলেও মহা উৎসাহে হাত লাগাল। ব্যাবিংটন বলল, তার ফারগাছের শাখা থেকে উপহারের প্যাকেট ঝুলবে. ভালো করে প্যাক করে আমরা যেন সব রাত্তিরে টেবিলে রেখে যাই। কার উপহার বোঝা যাবে, কিন্তু কে দিচ্ছে বাইরে থেকে বোঝা গেলে চলবে না। যা ববা বা। ঘোষ সাহেব বললে, 'পড়েছি ব্যাবিংটনের হাতে, খানা তো খানা, আরও কত কী সঙ্গে করতে হয় দেখো।' তা যা পারলাম, করলাম।

কিন্তু ওই যে বললাম সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। হাওয়া ভীষণ জোলো। ঠান্ডা। গায়ে যেন ভিজে কম্বল লেপটে আছে। দু-একবার পেছনের চাতালে যাবার চেষ্টা করলাম। দেখি এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, অর্থাৎ ক্রমশই সাইক্লোনিক হয়ে যাচ্ছে ওয়েদার। ব্যাবিংটন বলল, 'মিসেস ঘোষ, খবরদার ওদিকে যেয়ো না। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে আছড়ে ফেলে দেবে সি-বিচের ওপর।'

সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি শওকতকে ডাকি। আমি না হয় না গেলাম। কিন্তু বাবাই! সারাদিন ঘরের মধ্যে থেকে উত্যক্ত হয়ে রয়েছে, যা দস্যি, টুক করে সবার অলক্ষ্যে ওদিকে চলে গেলেই হল। শওকত, পাপাম্মা, ব্যাবিংটন সবাই মিলে ঝোড়ো হাওয়ার মুখে সেই বিশাল দরজা বন্ধ করে দিল। দুপাশ থেকে দুটো চওড়া লোহার খিল পড়ল। লাউঞ্জের দিকের দরজাও বন্ধ। আমাদের সব ঘরের জানলার শার্সিও বন্ধ। এবার ঝড় এ চত্বরের বাইরে যত খুশি মাতামাতি করুক।

সন্ধে হতেই ঝাড়লণ্ঠনে মোম জ্বলে উঠল। চীনে লণ্ঠন জ্বলে উঠল, ক্রিসমাস ট্রির গায়ে ছোটো ছোটো টুনি বাল্‌ব জ্বলে উঠল। চারিদিক ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। বিশেষ করে হলের দরজার মাথায় সেই সোনালি রঙের বেথলিহেম স্টারটা। সেটা থেকে রীতিমতো আলো ঠিকরোচ্ছে।

'কী মাস্টার বাবাই, এবার তোমার মন ভালো হয়েছে?' ব্যাবিংটন বলল। জবাবে বাবাই দুম করে একটা বন্দুক ফাটাল। সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। ব্যাবিংটন বলল, 'ব্যাস, আমাদের

ক্রিসমাস উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল।' প্লুটো পর্যন্ত দেখি প্রচণ্ড ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ তারও খুব আহ্লাদ।

ভোজ হল জমাট রকম। ছোটো ছোটো চিকেনের গোটা রোস্ট। বাঙালি পোলাও, প্রতি গ্রাসে কাজু, কিসমিস, মটরশুটি। পমফ্রেটের ফ্রাই। দু রকম স্যালাড। আর ক্রিসমাস পুডিং।পাপাম্পা সত্যিই দারুণ রাঁধিয়ে। একেবারে ওস্তাদ। ওর রান্নার লোভেই বোধহয় ব্যাবিংটনের ভুতুড়ে বাড়িতে সারা বছর একটা গেস্টের ধারা অব্যাহত থাকে। আজকের ভোজটা আবার ব্যাবিংটনই দিতে চেয়েছিল। আমরা সবাই আপত্তি করেছি। জোরজার করে চাঁদা দিয়েছি। কাউন্টারে গাবদা খাতা খুলে বসে হিসেব কষলেও, তেমন কিছু উপার্জন ওর নেই। নইলে গত ছ-সাত বছর ধরে দেখছি তো! রঙ তো দূরের কথা, বাড়িটাকে চুনকাম পর্যন্ত করায়নি একবারও। শুধু কিছু কিছু প্লাস্টারের তাপ্পি চলছে জায়গায় জায়গায়।

সবাই যে যার গিফট পেয়ে গেছি। বাবাইয়ের কোলে তো অ্যাত্তোগুলো জড়ো হয়েছে। তার পরেই ব্যাবিংটনের। আমরা সবাই দু-তিনটে করে পেয়েছি। খুলতে যাব, ব্যাবিংটন বলল, 'ধৈর্য ধরো মিসেস ঘোষ, প্যাকেট খুলবে একেবারে রাত্তিরে, যে যার ঘরে গিয়ে। এখন আড্ডা। খালি মাস্টার বাবাই যা ইচ্ছে করতে পারে।' বাবাই তৎক্ষণাৎ তিন লাফ দিয়ে একটার পর একটা প্যাকেট খুলতে লাগল। টিনটিনের কমিকস পেয়েছে দুটো, ব্যাবিংটন দিয়েছে। একটা ইয়াব্বড় টয়লেট সাবান, বিদেশি—বি. সেন দিয়েছেন অবশ্যই। কাজুবাদামের প্যাকেট—কুহু ও কেকা। আমরা আসবার সময়ে একটা স্ক্র্যাবলস গেম কিনে এনেছিলাম, সেটাই দিয়েছি। ভাগ্যিস, ওকে আগে দেখাইনি।

বাবাই তার উপহারের প্যাকেট সব দু হাতে আঁকড়ে ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এখন ও কমিকস দুটো গোগ্রাসে গিলবে।

ব্যাবিংটন বলল, 'কী? আড্ডায় সবাই রাজি তো?'

আমাদের তো কোনো আপত্তিই নেই। কুহুরাও দেখলাম খুব উৎসাহী।

'কী মিস্টার সেন? বসছেন তো?' ঘোষ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

বি. সেন ধীরসুস্থে একটা পাইপ ধরালেন, তারপর এই প্রথম চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'ইয়েস। অফ কোর্স। তবে অন কন্ডিশন। যদি ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে পাই।'

ব্যাবিংটন বলল, 'ইন্টারেস্টিং গল্প? মানে ভূতের?'

বি. সেন বললেন, 'প্রেমের হতে পারে।'

'প্রেম আর ভূত?' কুহু খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন দুটোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর মিল আছে', বি. সেন মিটিমিটি হেসে বললেন।

ঘোষ সাহেব বললেন, 'কেন? প্রেমও ভূতের মতো হুট করে ঘাড়ে চাপে, তারপর পট করে ঘাড় মটকায় বলে?'

ব্যাবিংটন বললে, 'ছিঃ মহিলারা মনে কষ্ট পায় এমন কথা না-ই বললে মিঃ ঘোষ!' বলছে বটে, কিন্তু তার মুখে দুষ্টু হাসি।

'আর কোনো মিল? দুটোর মধ্যে?' বি. সেন চারদিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিলেন একবার, যেন কুইজ-মাস্টার!

কেকা অর্থাৎ গোবিন্দ বলল, 'আমি একটা মিলের কথা বলতে পারি—'ভূতও নেই, প্রেমও নেই।'

ব্যাবিংটন এবারে সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল, 'নো, নো, ইয়াং ম্যান। তুমি একটা সদ্য-বিবাহিত যুবক। হনিমুন কাটাতে এসেছ, তোমার মুখে এসব কথা! নো, নো...' ব্যাবিংটন মাথা নাড়তে লাগল।

'বললে আর কী করবেন? ঠ্যাঙাতে পারবেন? দিন না বেশ করে দু ঘা।' কুহু হাসতে হাসতে বলল।

এরই মধ্যে বি. সেনের গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'উহু। প্রেম আছে, যেমন ভূতও আছে। কী বলেন, মিসেস ঘোষ!'

সবাইকে ছেড়ে আমাকেই ভদ্রলোক সাক্ষী মানলেন কেন বোঝা গেল না। বললাম, 'হ্যাঁ কবি বলেছেন বটে বোঝা গেল না, গেল না। ওকি মায়া কি স্বপনছায়া? ও কি ছলনা?'

কুহুর যেমন অভ্যেস। সে হেসে গড়াতে লাগল। অন্য সবাইয়েরও স্মিত মুখ। ব্যাবিংটনের সুদ্ধ। যদিও এত শক্ত বাংলা ও বুঝতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু বি. সেন যেন হাসিটা গিলে নিয়ে বললেন, 'এ তো রোমান্টিক ব্যাপারস্যাপারের কথা বলছেন। প্রেমের রহস্য কিন্তু আরও অনেক সিরিয়াস।'

রোমান্টিক হলে সেটা কেন আর সিরিয়াস হবে না আমি বুঝতে পারলাম না। রোমান্টিক শুনলে নিউ জেনারেশন নাক শিঁটকোয়, ইনি নিউ জেনারেশন না হয়েও নাক শিঁটকোচ্ছেন। অথচ এ যুগের রোবো, ডাইনোসর, মাইকেল জ্যাকসন এসব যেন আর রোম্যান্টিক নয়! তবে বি. সেন লোকটা যে রকম ঘোড়েল, ও যে চূড়ান্ত রকমের আনরোমান্টিক হবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

এই সময়ে ব্যাবিংটন চোখ গোলগোল করে বলল, 'প্রেম আর ভূত দুই ই আছে, এমন একটা গল্প শুনবে না কি?'

কুহু এগিয়ে বসে বলল, 'বলুন মি. ব্যাবিংটন প্লিজ।'

'তাহলে কফি খাওয়াও। পাপাম্মা আউটহাউজে চলে গেছে। তোমার হাতের কফি খাই।' কুহু কোমরে শাড়ি জড়িয়ে উঠে পড়ল। বলল, 'নিশ্চয়ই।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ও। মিনিট কয়েক পরেই ওদিক থেকে ডাকল, 'রীনাদি, একটু হেল্প করবে এস না।'

আমি উঠে পড়ে রান্নাঘরে যেতেই খুব উত্তেজিত কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'কী গিফট পেয়েছ রীনাদি?'

এখনও তো খুলিনি।

'আমি আর কৌতূহল সামলাতে পারিনি ভাই, খুলে ফেলেছি এই দ্যাখো, একটা কী রহস্যময় গিফট পেয়েছি!' বলে ও একটা দামি কাগজ মেলে ধরল। তার মধ্যে একটা লিপস্টিক। কাগজটাতে লেখা, 'উইথ কিসেস।'

কে বলো তো?

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'তোমার বর আবার কে?'

ও চিন্তিত হয়ে বলল, 'এটা মোটেই ওর হাতের লেখা নয়। ওর কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং আমি চিনি।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার বরেরও নয়, একটু আশ্বাস দিতে পারি।' ও ভুরু কুঁচকে কফি তৈরি করতে লাগল, ইতিমধ্যে আমি চট করে ওই চাতালের দিকের দরজা দিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে দেখি বইটই, খেলনা-টেলনা ছড়িয়ে বাবাই ঘুমিয়ে কাদা। আমার প্যাকেটগুলো খুললাম। এক প্যাকেট খুব সুন্দর বাহারি মোমবাতি। কে দিয়েছে নাম নেই। আমার কর্তা কিস্যু দেয়নি মনে হল, কিন্তু এ কী? কুহুর মতোই একটা কাগজের প্যাকেট না? খুলে দেখি ভেতরে একটা ছোট্ট

পারফুমের শিশি, কাগজে লেখা, টোয়েন্টি সেভেন্থ, মিডনাইট, হোয়েন দা ওয়ার্ল্ড ফলস অ্যাস্লীপ লাস্ট চান্স। ওবলাইজ। ভেনু-ব্যাক টেরেস।

এ কি রে বাবা! আমরা অবশ্য আঠাশে সত্যিই চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ লেখার কী মানে? কেউ ঠাট্টা করেছে? ব্যাবিংটন জানে আমরা কবে যাব। অন্যরা জানলেও জানতে পারে। কিন্তু ঠাট্টাও যদি হয়, কী জংলি আপমানজনক ঠাট্টা! আমার মাথার মধ্যেটা জ্বলতে লাগল। কাগজটা বালিশের তলায় কোনোমতে দুমড়ে গুঁজে রেখে রান্নাঘরে ফিরে গেলাম। কুহুর কফি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমি নিয়ে গেলাম ট্রে-টা। পেছনে আর একটা ট্রেতে বিরাট পট-টট নিয়ে ও।

কুহু বসে পড়ে বলল, 'নিন এবারে বলুন। প্রেমিক ভূত, না ভুতুড়ে প্রেম' বলতে বলতে কুহু আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। বুঝতে পারছি ও ব্যাবিংটনকে সন্দেহ করছে।

'ভয় পেলে কিন্তু চলবে না।' ব্যাবিংটনের মুখ এখন আরও গোল হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'ভয়? যা নেই তাকে ভয়টয় আমরা করি না মি. ব্যাবিংটন; তবে যা আছে কিন্তু লুকিয়ে আছে তাকে একটু ভয় পাই।' কুহু মুচকি হেসে আমার দিকে চাইল।

ব্যাবিংটন বলল, 'হেই প্লুটো, এদিকে আয় তো!'

গরগর গরগর করে একটা চাপা আওয়াজ করে অ্যালসেশিয়ানটা এগিয়ে এলো, ব্যাবিংটনের চেয়ারের পাশে থাবা গেড়ে বসল। ল্যাজটা খুশিতে যেন লাফাচ্ছে।

'এর কত বয়স হবে বলো তো?'

'কত হবে? দশ কি এগারো।' বড়োসাহেব বি. সেন বললেন। বলবার হক ওঁরই আছে মনে হল। আমার আবার কুকুর-টুকুর আসে না।

কুহু আমার কানে কানে বলল, 'নেড়ি কুকুর ছাড়া আর কোনো কুকুরেরই বয়স বাবা আমি বলতে পারি না।'

আমি চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'নেড়ি কুকুরেরটাই বা কী করে পার?'

'আমাদের বাড়ির একতলার গুদোমঘরে একটা নেড়ি বাচ্চা পেড়েছিল। পাঁচটার মধ্যে চারটে বছরখানেকের মধ্যেই মরে গেল। পঞ্চমটা সাত বছর পরে, ঠিক যে গুদোমে জন্মেছিল সেইখানেই এসে মরে।'

এই সময়ে ব্যাবিংটন ঘোষণা করল, 'প্লুটোর উনিশ বছর বয়স পেরিয়ে গেছে।'

'ইমপস্‌সিবল', বি. সেন বললেন।

ব্যাবিংটন বলল, 'এগজ্যাক্‌টলি। আমিও তাই বলি। কিন্তু সম্ভব হয়েছে। হয়তো প্লুটো প্লুটো নয়। অন্য কেউ।'

'মানে?' বি. সেন মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে ফেলেছেন।

ব্যাবিংটন বলল, 'তোমরা ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ সোলস মানো? বিশ্বাস করো?'

বি. সেন বললেন, 'আরে জন্মান্তরবাদ তো আমাদের সংস্কারের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। মানি বা না মানি।'

আমার কর্তা বলল, 'না না, উনি বোধহয় সেই পিথ্যাগোরাসের থিয়োরির কথা বলছেন, একজন মারা গেল তো তার আত্মা হয়তো অন্য কেউ, এমনকি কোনো জন্তুজানোয়ারকেই গিয়ে আশ্রয় করল। বহু পুরোনো তত্ত্ব। তাই না, মি. ব্যাবিংটন?'

ব্যাবিংটন নীরবে মাথা নাড়ল।

'অলরাইট, বলো তোমার গল্প'—বি. সেন চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন।

ব্যাবিংটন বলতে লাগল, 'পাপাম্মাকে দেখছ তো! অন্ধ্রের মেয়ে। ক্রিশ্চান। সব কিছুতে

এক্সপার্ট। তেমনি বিশ্বাসী। প্রথমে ওর মা এখানে কাজ করত, ও স্কুলে পড়ত। তারপর ওর মা হঠাৎ মারা যেতে ও আমার কাছে আশ্রয় চাইল। আপন আর কেউ নেই। সেই থেকে কাজ করতে আরম্ভ করল এখানে। ওর মা থাকত দূরে, ওদের বস্তিতে, ও কিন্তু এইখানে আউটহাউজটা পরিষ্কার করে থাকতে আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই কাজকর্মে মাকে তো বটেই, আরও অনেককেই ছাড়িয়ে গেল। আমার তো একেবারে ডান হাত। গেস্টদের এমন যত্ন করত যে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বাংলোর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সারা বছর গেস্ট। আর আমাকেও এমন দেখাশোনা করত যে আমি বলতাম ও একাধারে আমার পাপা আর মা। এইভাবে বেশ চলছিল। ইতিমধ্যে একটি ক্রিশ্চান ছোকরা ওর প্রেমে পড়ল। অঙ্কেরই ছেলে। বোধহয় সাত-আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, তাইতেই নিজেকে নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে একটা কেউকেটা গোছের ভাবতে শুরু করেছে। শুঁটকি মাছ চালানের ছোটোখাটো কারবার করে সেই যোসেফ এসে পাপাম্মাকে বিয়ে করতে চাইল। কী আর করি। বললাম, করতে পার, কিন্তু আমার আউটহাউজে তাই বলে থাকতে দেব না। যোসেফের মতলব ছিল ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু পাপাম্মা এতদিন এই পরিবেশে মানুষ। এত বড়ো বাড়িতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়; নানান রকমের মানুষ দেখে, কত মেমসাহেবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আমার কাছ থেকে লেখাপড়াও আরও শিখছিল, ভালো ভালো খানা রান্না করে, ফুলবাগান করে, তার ওখানে পোষাবে কেন? সে যেমন আমার কাজ করছিল করতে লাগল। কিন্তু আর এখানে থাকত না।'

কফিতে চুমুক দিল ব্যাবিংটন। কুহুর বর বলল, 'মি. ব্যাবিংটন, শেষ পর্যন্ত আমাদের চাকরানির প্রেমের গল্প শোনাচ্ছেন?'

বি. সেনের মুখের ওপরও এক চিলতে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। ব্যাবিংটনের মুখটা থমথম করছে, বলল, 'ওহ, তার হাতের রান্না খেয়ে রোজ তারিফ করতে পার, তার পাতা বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে পার, আর তার যে একটা প্রাইভেট লাইফ আছে, সেটাও ইন্টারেস্টিং হতে পারে, তা মানতে চাও না! বেশ আমি আর বলছি না।'

প্লুটো গরগর করে দুবার ল্যাজ ওলটপালট করল।

কুহু তিরস্কারের দৃষ্টিতে গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না না, মি. ব্যাবিংটন বলুন, প্লিজ, ও না শোনে, না শুনুক, আমাদের খুব ভালো লাগছে।'

ব্যাবিংটন আর এক চুমুক দিল কফিতে। পট থেকে আরও একটু ঢালল। আমাব কর্তা ঘোষ সাহেব বলল, 'আরে, বলোই না ব্যাবিংটন। আমরা সবাই এখন মেজাজে আছি। এমন করে কেউ দুম করে সুইচ অফ করে?'

ব্যাবিংটনের বলবার ইচ্ছে ষোলো আনা। আমার ভেতরের রাগ আর জ্বালা এখনও থামেনি। অর্ধেক মন দিয়ে শুনছি। আর অর্ধেক মন দিয়ে ভাবছি লোকটা কে? কী করে এর শোধ নেওয়া যায়। ওদিকে ব্যাবিংটন বলে চলেছে।

'যোসেফের সব ভালো। রোজগার ভালো করত। ফিটফাট বাবু থাকত সবসময়ে। পাপাম্মাকে ভালোও বাসত খুব। কিন্তু এক দোষে সব গুণ বরবাদ। ভয়ানক মদ খেত। আর মাতাল হয়ে গেলে তার আর জ্ঞান থাকত না। বউকে মেরে ধরে একশা করে দিত। সন্দেহ বাতিকও ছিল প্রচণ্ড। ওদের পাড়ায় পাপাম্মার মতো মেয়ে তো আর ছিল না। স্মার্ট, শিক্ষিত, রুচি বলে একটা জিনিস আছে, কেতাদুরস্ত। ব্যাস, অমুকের সঙ্গে কথা বলেছিলি কেন? অমুকের সঙ্গে বাজার গেলি কেন? মার, প্রচণ্ড মার।

চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটা কাজ করতে এলে বলতাম, 'দূর, মদ খেয়ে নিজের পয়সাগুলোও

উড়োচ্ছে, তোরগুলোও উড়োচ্ছে। রোজ ঠ্যাঙাচ্ছে। দে ওকে ছেড়ে, না হয় অন্য কাউকে বিয়ে কর।'

ও বলত, 'ভাবি তো সায়েব, কিন্তু যোসেফ তাহলে পাগল হয়ে যাবে, নেশা কেটে গেলে অন্য মানুস একেবারে। পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে, এই দ্যাখো কেমন নাকছাবি গড়িয়ে দিয়েছে। আর অন্য কাউকে বিয়ে! যোসেফ বেঁচে থাকতে? যোসেফকে ছেড়ে? যোসেফ তাকে খুনই করে ফেলবে।'

বি সেন একটু হেসে বললেন, 'যাক, এতক্ষণের লভের মোটিফটা স্পষ্ট হচ্ছে।'

ব্যাবিংটন তখন গল্পের ঘোরে। সে অত লক্ষই করল না। সে বলে চলল।

'তার পর একদিন মেয়েটা আমার কাছে এসে একেবারে আছড়ে পড়ল। সারা পিঠে দাগড়া দাগড়া লাল দাগ। বেত না লাঠি কী দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়েছে। সর্বাঙ্গে কালশিটে, ফুলো, মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, চোখমুখ ফুলে গেছে. আমি বললাম, এ কী? এ যে তোকে খুন করে ফেলতে বাকি রেখেছে। আমি এখুনি যাচ্ছি থানায়, ডায়েরি করতে। তো মেয়েটা বললে, 'থানায় যেও না সাহেব, ও ওর যা খুশি করুক, জাহান্নামে যাক, আমি আর ওর কাছে ফিরছি না।' বলে আউটহাউজে ওর পুরনো জায়গায় গিয়ে শুয়ে রইল। ডাক্তার ডাকলাম। কপালে স্টিচ হল, মাথায় ব্যান্ডেজ হল। ওষুধ ইঞ্জেকশান।

'এটা সকালের কথা, দুপুরবেলায় যোসেফ এল। তা ডাইম্যান্ডাই নেই। ভয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে. আমি বললাম, গেট আউট, আভভি নিকালো হিঁয়াসে। পায়ে পড়ে গেল। 'এমন আর কখনও হবে না সাহেব, মা মেরির দিব্যি, যিশুর দিব্যি, আমি আর মদ ছোঁব না। মাতাল হলেই আমার ভেতর থেকে শয়তান বেরিয়ে আসে।' কিছুতেই যাবে না। ছিনে জোঁক একেবারে। সকালে আসছে, দুপুরে আসছে, সন্ধেয় আসছে—'একবার, একটিবার ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও সাহেব।' কত আর হাঙ্গামা সইব। একদিন বললাম, 'ঠিক আছে যাও। কিন্তু কোনো ঝামেলা করবে না।' নিক বাবা, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিক।

'আউটহাউজের জানলা খোলা। আমার অফিস থেকে দেখা যায়। দেখতে পাচ্ছি—পাপাম্মা শুয়ে রয়েছে। কপালে ব্যান্ডেজ, মুখের নানা জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার আটকানো। যোসেফ ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে গিয়ে কপালে হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে বসল মেয়েটা। ওর হাতটা ছুড়ে ফেলে দিল। খাট ছেড়ে ঘরের কোণে চলে গেল। কী বলছে শুনতে তো পাচ্ছি না। কিন্তু ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি বেরিয়ে যেতে বলছে। আরও কদিন এল। খিল এঁটে পড়ে রইল মেয়েটা। দরজাই খুলল না। ভালো হয়ে উঠে একদিন রান্নাঘরে কাজ করছিল দূর থেকে যোসেফকে আসতে দেখেই রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ভেতর থেকে শাসাতে লাগল, যোসেফ এক্ষুনি চলে না গেলে পুড়ে মরবে। সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।

'এর কদিন পরে শুনলাম যোসেফ বিষাক্ত মদ খেয়ে মরে গেছে। এ রকম এখানে মাঝে মধ্যে হয়। মেছোগুলো প্রচণ্ড টানে, যত সস্তা পাবে, তত টানবে। নানারকম বিষক্রিয়া হয় তাতে। একটু ধরপাকড় হয়। আবার যে কে সেই। আরও কয়েকটা লোকও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু মারা গেল একা যোসেফ। লোকটা কি আত্মহত্যা করল? না কি ব্যাপারটা কাকতালীয়? ঠিক বুঝলাম না। যা জ্বালাচ্ছিল, মনে মনে ভাবলাম আপদ গেছে। পাপাম্মারও কোনো ভাবান্তর নেই। মুখ টিপে আছে একেবারে। চোখে জল টল কিছুই দেখলাম না।

'সেই সময়ে প্লুটো কিছুদিন হল আমার কাছে এসেছে। নেহাত ছেলেমানুষটি নয়। ছিল এখানকারই ডি সুজা সাহেবের কুকুর। আমায় ভালোই চিনত। ডিসুজা সব বেচেবুচে চলে গেল

অস্ট্রেলিয়া, কুকুরটাকে আমার কাছে দিয়ে গেল। 'ক-বছরই বা বাঁচবে আর, কোথায় ফেলব, একে একটু যত্ন কোরো ব্যাবিংটন।' সঙ্গে, ওই যে ড্রেসারটা দেখছ ওটাও উপহার দিয়ে গেল। তা তো দিল। প্লুটোকে নিয়ে পড়লাম মহা মুশকিলে। আমাকে চেনে, কোনো অসুবিধে করে না, কিন্তু কদিন পর থেকেই নিজের মনিবকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ মনমরা হয়ে গেল। যোসেফ যখন হাঙ্গামা করছে সে সময়টা আমি প্লুটোকে নিয়ে অস্থির। খেতে দিলে খায় না। জল পর্যন্ত খুব তেষ্টা না পেলে খাবে না। বাইরের চাতালে গিয়ে মুখ উঁচু করে করুণ সুরে কাঁদে। ক্রমশই শীর্ণ হয়ে পড়ছে। কমজোরি হয়ে পড়ছে। থাবায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে আর শরীরটা থর থর করে কাঁপে। মাছি ঘোরে আশেপাশে। বুঝলাম একে বাঁচাতে পারব না। যে কোনো মুহূর্তে মরে যাবে।

ঠিক আগের দিন যোসেফ মারা গেছে, খবর এসেছে পরদিন সকালবেলা। আমি বাগানে কাজ করছি। হঠাৎ দেখি ঝাঁঝরি হাতে পাপাম্মা রান্নাঘরের দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্ক।

'সায়েব, সায়েব' ওর পেছন পেছন দেখি প্লুটোও আসছে। মাংসপেশিগুলো ফুলে উঠেছে। শীর্ণ, কমজোরি ভাবটা আর নেই।

দেখে তো আমি খুব খুশি। বললাম, 'ডর খাচ্ছিস কেন? এতদিনে কুকুরটা পোষ মানল।'

পাপাম্মা তেমনি ভয়ের সঙ্গে বলল, 'যোসেফ, যোসেফ এসেছে।'

'কোথায় রে?' আচ্ছা তো! দিনের বেলায় ভূত দেখছে! এদের যা কুসংস্কার না! বললাম, 'চল দেখি কোথায় তোর যোসেফ।'

আঙুল দিয়ে প্লুটোকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে ওর মধ্যে ঢুকেছে। রান্নাঘরে একেবারে আমার কাপড়ের মধ্যে ঢুকে গেছিল।' আমরা সবাই হেসে উঠেছি। আমি সুদ্ধ। বি. সেন সুদ্ধ।

ব্যাবিংটন গম্ভীরভাবে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমিও প্রথমটা হেসেই ছিলাম। কিন্তু তারপর ব্যাপারটা লক্ষ করলাম। পাপাম্মা খেতে না দিলে খাবে না, খেতে খেতে মাঝে মাঝেই ওর দিকে চাইবে, চোখে যেন জল। কালো কালো কী রকম চোখ দেখছ তো? চাউনি যেন কুকুরের মতো নয়। কোনো মতেই নয়। আস্তে আস্তে মেয়েটার ভয় কেটে গেল। আমাকে বলল, দেখো সাহেব, ও যে যিশুর নামে দিব্যি গেলেছিল ভালো ছেলে হবে, দেখো হয়েছে।

'কী রে প্লুটো? হয়েছিস ভালো ছেলে?' ব্যাবিংটন অ্যালসেশিয়ানটার দিকে তাকাল। প্লুটো অমনি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, ব্যাবিংটনের কাঁধের ওপর দুই থাবা রেখে উঠে দাঁড়াল।

দেখে কুহু আমার দিকে ঘেঁষে এসে বলে উঠল 'বাবা রে!'

প্লুটো বলল, ঘাঁউ ঘাঁউ! তারপরে আবার থাবা নামিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে যেমন বসেছিল, বসে পড়ল।

বি. সেন মুচকি হেসে নিবে-যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'আচ্ছা একখানা আষাঢ়ে গল্প শোনালে যা হোক।'

ব্যাবিংটন গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, 'ও কীভাবে বাজারের থলি বয়ে নিয়ে আসে, কাগজ নিয়ে আসে মুখে করে, দুধঅলা, ডিমঅলা, মাছঅলা এলেই চেঁচিয়ে ডাকে পাপাম্মাকে খেয়াল করেননি? দেখেননি কীভাবে গাল চেটে পাপাম্মাকে আদর করে, সারাটা দিন ওর পায়ে ঘোরে, রান্নাঘরে ওর হাতা-বাসন পর্যন্ত এগিয়ে দেয়!'

বি. সেন বললেন, 'অনেক কুকুরই এরকম করে থাকে মি. ব্যাবিংটন। শেখালেই করে। আমার তিনটে কুকুর আছে, আমি জানি। মনিবকে, যে খেতে দেয় তাকে, এরা, বিশেষত এইসব পেডিগ্রি

ডগগুলো ভীষণ মানে। আমার তো মনে হয় তোমার কুক ওই মেয়েটির থেকে ও তোমারই বেশি ভক্ত। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে, এখন আর ওর খোঁজ করছে না। তোমার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে।'

ব্যাবিংটন আরও গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে কথা নয় আসলে রাত হলে ও আর আমার কাছছাড়া হতে চায় না।'

'কেন? এর মধ্যে বিশেষত্বই বা কী আছে?' ঘোষ সাহেব বলল।

ব্যাবিংটনের মুখ ঈষৎ লাল। বলল, 'দেখো না কেমন বেয়াড়া লোকটা। একেবারে সন অফ এ বিচ। যত বলি ও মেয়েটা আমার বাপ-মা, সব। আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না। সারা রাত আমাকে ঠায় পাহারা দেবে। টয়লেট পর্যন্ত হুশ হুশ করে ঢুকে যাবে। টয়লেটটা আউটহাউজের দিকে মুখ করে কি না। পাঁড় জেলাস শয়তানটা, দেখবে?' বলতে বলতে ব্যাবিংটন হাত বাড়িয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপল।

কিছুক্ষণ পরই হলঘরের লাউঞ্জের দিকের দরজাটার বেল বাজল। ব্যাবিংটন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিসেস ঘোষ, যদি কিছু মনে না করো তুমিই গিয়ে দরজাটা খুলে দাও। একটু কষ্ট হবে, তবু তুমিই দাও, দেবে?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে উঠেছেন বি. সেন। দরজার দিকে যেতে যেতে বলছেন, 'হোয়াট ননসেন্স, এই ভায়োলেন্ট ওয়েদারে একজন মহিলাকে দরজা খুলতে পাঠানো?'

ব্যাবিংটন বলে উঠল, 'না সেন, তুমি যেও না, লেট মিসেস ঘোষ গো, শি শিওরলি ওন্ট মাইন্ড!'

কিন্তু ততক্ষণে বি. সেন দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন। ব্যাবিংটন হাঁ হাঁ করে ছুটে যেতে না যেতেই দরজাটা খুলেও ফেলেছেন। আমরা বিদ্যুতের মতো কতকগুলো ঘটনা চমকাতে দেখলাম। বি. সেন প্রাণপণে দরজাটা খুলে ধরলেন। সাইক্লোনিক ঝড়ের ঝাপটা সামলাতে সামলাতে পলিথিনের ওয়াটারপ্রুফ পরে ভেতরে ঢুকে এলো পাপাম্মা। এবং প্লুটো উল্কার মতো ছুটে গিয়ে পাপাম্মা আর বি. সেনের মাঝখানে তার ভয়াবহ বিশালতা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুই থাবা বি. সেনের কাঁধে। দেখলাম হিংস্রভাবে সে বি. সেনের গাল থেকে মাংস খাবলে নিচ্ছে।

মাহ্ ভাদর

শহরের অবিরাম ঘূর্ণমান কর্মচক্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন মুখার্জি দম্পতি। দূরে দূরে ছোট্ট ছোট্ট বাগানের মধ্যে পুতুলের বাড়ির মতো বসানো বাসগৃহ। সুন্দর, সুন্দর ছাঁদ। লাল টালি, কাচ-ঢাকা বারান্দা, হাঁসের পালকের মতো মসৃণ গা। বেশ লাগে দেখতে। কিন্তু নির্জন। বড্ড নির্জন। রাত আটটার পরই নিশুতি হয়ে যায় একেবারে। বাজার-হাটও একটু দূরে। কিন্তু ভোর-সকালে বহুবিধ গাছপালায় সবুজ ছায়াপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাও। প্রাতর্ভ্রমণও হবে, আবার বাজারও হবে। মন্দ কী। মুখার্জিসাহেব পরিতুষ্ট মুখে চারদিকে চেয়ে গিন্নিকে বলছেন, 'কী গো? অসুবিধে হবে খুব?'

'হলেই বা করছি কী?' গৃহিণী ঈষৎ অভিমানের সুরে বললেন।

কেন? তিন লিটারের ফ্রিজ কিনে দিয়েছি। সব স্টোর করো। ওষুধপাতি, পোস্টেজ— এসবও স্টকে থাকবে। টেকনলজির যুগ। ওয়াশিং মেশিন থেকে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থেকে কোনটা নেই? বই পড়ো, বাগান করো আর গান শোনো। টেলিভিশনে সারা গ্লোবের খবরাখবর নাও। যেটা যখন ভালো লাগে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা নির্জনতা, খানদানি নির্জনতা একেবারে। উপভোগ করো। এনজয় করো সেটা।

মুখার্জিগিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুড়ো বয়স এমনিতেই নির্জন। হাজার মানুষ আশপাশে ঘুরলেও মনে হয় কেউ নেই। যাদের সঙ্গে এক স্মৃতি ভাগ করে বাঁচা, তারা সব চলে গেছে। যারা আছে তারা অন্য প্রজাতির জীব যেন। নির্জনতা আর কাকে বলে? এই নিঃসঙ্গতা যেন পাষাণভার, বুকের ওপর ক্রমশই ভারী হয়ে চেপে বসছে। আর উনি এলেন এখন নির্জতার ওপর লেকচার দিতে। দূর দূর!

তা ভোরবেলা সত্যি সত্যিই প্রাতর্ভ্রমণের নাম করে বাজার আর বাজারের নাম করে প্রাতর্ভ্রমণ সারেন মুখার্জি সাহেব। পরনে খাকি শর্টস, হাফহাতা মোটা সুতির ভেস্ট, পায়ে কেডস আর হাতে লাঠি। ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে চুরুটটা ধরিয়ে নেন। ফিরে একপট চা নিয়ে দুজনে বসবেন, 'পাটশাক পেয়েছি আজ', কিংবা 'একেবারে ফ্রেশ পটোল বুঝলে?' 'খয়রা মাছগুলো ঠিক খাবার আগে কড়কড়ে করে ভাজবে। এসব জিনিস তুমি শহরে পাবে না। সেখানে তুঁতেয় ভেজানো পটোল, শাকে ইনসেকটিসাইডের গন্ধ, বুঝলে?'

নিঃশব্দে চা ঢালতে ঢালতে স্বামীর যাবতীয় কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দ্যান মুখার্জিগিন্নি। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন পাটপাতা আর ফ্রেশ পটোল নিয়ে আদিখ্যেতা ভালো লাগে না তাঁর। টাটকা খয়রা মাছ! হুঁ! মাছের জন্যে তো তিনি মরে যাচ্ছিলেন কি না!

চা খেয়ে বাগানে নেমে পড়েন সাহেব। খুরপি দিয়ে খোঁচাখুঁচি। এটা তুলে ফেলা, ওটা বসানো। ঝারি কিনেছেন একটা। গাছে জল দিতে দিতে মুখ থেকে হাসির ছটা বেরোতে থাকে একেবারে। গিন্নি এই সময়ে খটরখটর করে গৃহকর্ম আরম্ভ করেন। অল্পস্বল্প ফার্নিচার। সব নরম কাপড় দিয়ে

ঝকঝকে করে মোছেন। কাচগুলো খবরের কাগজের টুকরো জলে ভিজিয়ে পরিষ্কার করেন। উর্মি আসে, সে বাসন ধুয়ে, ঘরদোর পরিষ্কার করতে থাকে, বলে, 'নতুন করে মোছামুছি আর কী করব দিদিমা, সব তো পরিষ্কারই আছে গো। থাকত একটা কচিকাঁচা তো হন্ডুল-মন্ডুল করে দিত তোমার সব। তখন উর্মির কাজ বাড়ত।' ন্যাতা টানে আর আপনমনে বকবক করে যায় উর্মি, সতৃষ্ণ শ্রবণে শুনতে থাকেন মুখার্জিগিন্নি। উর্মি কাজ সেরে চলে গেলেই একটু দূরে গুঁড়ি-মেরে বসে-থাকা নির্জনতাটা আবার হুড়ুম করে এসে পড়বে, গ্রাস করে নেবে এই ছোট্ট 'ফ্লাওয়ারি নুক'।

উর্মি বলে, 'এবার চানটা সেরে নাও গো দিদিমা, আমি কাপড়চোপড়গুলো কেচে, মেলে দিয়ে যাই।'

নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে মুখার্জিগিন্নি চানঘরে ঢুকে যান। তাঁর রান্না সারতে আর কতটুকু সময় যাবে? দুই বুড়োবুড়ির রান্না। এটা বারণ, সেটা চলে না। পরিমাণও খুব কম। তবে মুখার্জি সাহেব শৌখিন খুব। নানান রকম খেতে ভালোবাসেন। তাই টুকটাক করে হালকা হালকা খাবার বানান গৃহিণী। পনির অ্যাসপারাগাস, মটর ডালের বড়ি দিয়ে পাটপাতা, মৌরলা মাছের টক, বেগুন-বাসন্তী। এইটুকু একমুঠো বানান। তাইতেই ঢের হয়ে যায়, ঢের। বিকেলে বাসন ধুতে এসে উর্মি বলে, 'তোমাদের যেন পুতুলের ঘরকন্না, এইটুকুনি-টুকুনি বাটিতে কী খাও গো দিদিমা?'

কেন ডাল?

ঘন ক্ষীরের মতন করো বুঝি?

দূর, পাতলা সুপের মতো ডাল চুমুক দিয়ে না খেলে খাওয়াই হয় না তোর দাদুসাহেবের।

উর্মি, মুখার্জি সাহেব উঁচু দরের দামি মানুষ বুঝে শুধু দাদু বলে না, বলে দাদুসাহেব। আর মুখার্জি সাহেব উর্মিকে বলেন শেঠ উর্মিচাঁদ। দিদিমার সঙ্গে কথাবার্তা জমলেই তিনি বলবেন, 'এই যে শেঠ উর্মিচাঁদ, ষড়যন্ত্র কদ্দুর এগোল?'

বিকেলবেলা রোজই দুজনে হাঁটতে বেরোন। শীতকালে চারটে নাগাদ। গরমকালে আর একটু পরে। তখন সাহেবের পরনে তাঁতের সূক্ষ্ম ধুতি, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, হাতে রুপো বাঁধানো লাঠি। এটা গরমকালে। শীতে ঢোল্লা গরম কাপড়ের ট্রাউজার্স। গিন্নির বুনে-দেওয়া কার্ডিগান, মাফলার, মাথায় কানঢাকা টুপি। মুখার্জিগিন্নি কী শীত কী গ্রীষ্ম ধবধবে সাদা বাহারি পাড়ের টাঙ্গাইল শাড়ি। সাদা ব্লাউস। শীতকালে উলের জামা, হাতা-অলা সোয়েটার আর তার ওপর গরম শাল।

বেরোবার সময়েই চা-টা খেয়ে নেন দুজনে। ফিরে খেলে বড়ো দেরি হয়ে যায়; রাতে ঘুম হয় না। ফিরে দুজনের কারোই কোনো কাজ নেই। গোল বারান্দায় বসে গান শোনেন মুখার্জিসাহেব। পুরোনো দিনের গান—কানা কেষ্ট, ভীষ্মদেব, শচীন দেববর্মন এইসব। কিংবা বাজনা শোনেন, মেনুহিনের ভায়োলিন। বিদেশি সব বাখ মোৎসার্ট মেন্ডেলসন-ফন গুচ্ছের কী যেন আছে! একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানঘ্যান করে বেজে যায়। সাহেবের মন রাখতে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকেন গৃহিণী, তারপর টুক করে উঠে পড়ে গুটিগুটি ঘরের ভেতরে চলে যান। একটু আয়নার সামনে দাঁড়ান। একটু এ ছবি দেখেন, একটু ও ছবি, পিকাসো না কি ছাইভস্ম। অসভ্য ছবি সব। কাঞ্চনজঙঘার লম্বা পোস্টার একখানা—বরফে বরফ। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বিছানার টান-চাদর আবারও টানটান করেন। তারপর আঁচল থেকে চাবি নামিয়ে আলমারি খোলেন, লকার খোলেন। লকারের ভেতর সোনাদানা নেই। হীরে-মুক্তো কিছু নেই। রয়েছে কয়েকটা ফটো। অ্যালবাম। বাস। যে-কোনো একটা নামিয়ে নেন। তারপর খাটের পাশের হেলানো চেয়ারে বসে অ্যালবামের পাতা খোলেন : বেরিয়ে পড়েন রায়বাহাদুর মাখনলাল চ্যাটার্জি। তাঁর বাবা। ইয়া গোঁফ, সুট কোট হ্যাট,

একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। রংটি ছাড়া। তা রং তো আর ফোটোগ্রাফে বোঝা যায় না। তাঁদের বিয়ের ছবি। বিয়ের পরেই তোলা। ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে দেওয়া হয়েছিল। মুখার্জিসাহেবের চেহারাটা তখন কত ভালো ছিল! স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল যুবক। পাশে তিনি, খুব রোগা। গলার হাড় দেখা যাচ্ছে। চুড়িবালা হাতে ঢলঢল করছে। মাথায় ঘোমটা নেই। ঘোমটা খুলে দিয়েছিল ফোটোগ্রাফার, 'আজকাল আর ফোটোতে চলছে না।' দেখে শাশুড়ির কী রাগ। 'যতই সাহেব-মেমসাহেব হও, নতুন বিয়ের কনে মাথায় ঘোমটা থাকবে না? এ ছবি দেখলে এ- বাড়ির গুরুজনরা সব বলবে কী?' আবার আলাদা করে ঘোমটা-দেওয়া ফোটো তোলা হল। সেই ফোটোই বাঁধানো তাঁদের টেবিলের ফোটোস্ট্যান্ডে থাকত।—হাজারিবাগে বাড়িসুদ্ধু সব যাওয়া হয়েছিল, রোজ পিকনিক! রোজ পিকনিক! সেখানে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ! কত গান, কত গল্প! সেই সব ফটো। অনিরুদ্ধ ঠাকুরপোর ছবি। জ্বলজ্বলে চেহারা, হাসিটা কী! একেবারে জ্যান্ত। চোখের সামনে যেন ভাসছে! চীনের যুদ্ধে মারা গেল। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা খুলে বসে থাকেন মুখার্জি গিন্নি।

'আরে কোক খাবে তো ক্যানের কোক খাও', মুখের সামনে ক্যান খুলে ধরছে।

'আসল জিনিস। খেলেই তফাতটা ধরতে পারবে।' কত জিনিস আনত, দু হাতে উপহার দিত, এনতার খরচ করত। পাতা ওলটালেন মুখার্জিগিন্নি, একটি রুমুঝুমু চুলঅলা শিশু বেবি-ফ্রক পরা, নিদন্ত মুখে হাসছে। এ ছবি অনিরুদ্ধ ঠাকুরপোর তোলা। তলায় লেখা বুড়িমায়ি, পঁচিশে নভেম্বর, উনিশশো তেষট্টি।

খসখস শব্দ, চটি ঘষতে ঘষতে মুখার্জিসাহেব ঘরে ঢুকছেন। চকিতে গৃহিণী অ্যালবামটা বন্ধ করে দ্যান। ঘরে ঢুকে আড় চোখে অ্যালবামটা দেখেন সাহেব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'ও সব তো পাস্ট, ইতিহাস নিয়ে কি আর বাঁচা যায় গিন্নি, বাঁচতে হয় বর্তমানে। প্রেজেন্ট কন্টিনুয়াস। এই মুহূর্তে কী হচ্ছে, আমি কী করছি, কেন করছি—এই।'

'বাঁচার দরকারটা কী'? মৃদু, থমথমে স্বরে কথাগুলো বলে মুখার্জিগিন্নি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। হালকা কী একটা গন্ধ-অলা ট্যালকম পাউডার মাখেন, সেই গন্ধটা অতীতের সুখস্মৃতির মতো ঘরের হাওয়ায় ভেসে থাকে। নিশ্বাস ফেলে মুখার্জিসাহেব অ্যালবামটা তুলে নেন। অন্যমনস্কভাবে যে-কোনো একটা পাতা খুলে ফেলেন। অমনি বেরিয়ে পড়ে কালো গাউন পরা মাথায় ঝালর-অলা টুপি, হাতে গ্রাজুয়েশনের সার্টিফিকেটটা পাকানো, এক তরুণী। হাসছে। তলায় লেখা বুড়িমা ১৯৮৩। দেখতেই থাকেন, দেখতেই থাকেন। অবশেষে কাপড়ের খসখস শব্দ পান পিঠে ঝনাত করে চাবি ফেলার শব্দ। গিন্নি আসছেন। চট করে অ্যালবামটা বন্ধ করে বিছানার ওপর যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিয়ে নিজের কামানো গাল পরীক্ষা করতে থাকেন মুখার্জি সাহেব। যেন ভীষণ চিন্তিত, কাল সকালে দাড়িটা কামাবেন, না কামাবেন না।

গৃহিণী ঢুকে কোনোদিকে না তাকিয়ে ঝনাত করে আলমারি খোলেন, কড়াক করে লকারের চাবি ঘোরান, অ্যালবামটা রেখে দ্যান। চাবি বন্ধ করেন পর পর; তারপর বলেন, 'এত তো গান শোনো, গান শুনলে তো জানি মানুষের মনমর্জি নরমসরম হয়। তা যদি না-ই হয় তো শোনা কেন?' তিনি যত দ্রুত সম্ভব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। মুখার্জিসাহেব জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতক্ষণ, যে মনে হয় তাঁকে কেউ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গেছে।

সকালবেলায় বেরিয়ে একদফা আলাপ হয় স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে। তার মধ্যে সবজিঅলা তাজু, মুরগিঅলা কিষেন, মাংসকাটা আনোয়ার, ডিমঅলা ভুবন এরা আছেই।

'ও সাহেব, পরশু দিনকেই তো মুরগি নিলেন। আজ আমার কাছ থেকে একটু খাসির মাংস নিয়ে যান না।' অনুযোগে অনুরোধে মিশিয়ে আনোয়ার বলে।

আরে বাবা, রেড মিট আমাদের চলে না। মুরগি, তা-ও তোর দিদিমা খায় না। তবে নেব, নেব। বাড়িতে লোকজন এলে দেখবি নিয়ে যাব।

'কবে তোমার বাড়ি লোক আসবে?'—কাঁচা গলায় ডিমঅলা ভুবন বলে। বারো তেরো বছরের ছেলেটা। ভুবনের কাছ থেকে ডজনখানেক ডিম কিনে সবজিবাজারের দিকে এবার এগোন মুখার্জিসাহেব। উদাস গলায় বলেন, 'আসবে, আসবে...।'

ছোটো বাজার। যা এল তা এল। তার বাইরে আর কিছু নেই। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। —'বেগুনগুলো কেমন চিকন দেখুন সাহেব' তাজু তার আজকের পসরা নিয়ে বড়াই করে। মামুলি আলু পেঁয়াজ ছাড়া আজ তার কাছে ওই বেগুন।

চিকন তো বলছিল খুব! কানা নয় তো! ভাবিসনি আমি দেখতে পাবো না।—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন মুখার্জিসাহেব। শাকে ভিটামিন, মিনার‍্যালস আছে। টাটকা শাক তিনি রোজ কিনবেন। বাঃ, আজ বড়ো বড়ো পালং পাতা রয়েছে। চট করে থলি খুলে ধরেন তিনি। মাছ? মাছ বসেনি? ছোটো ছোটো পোনা, চারাও নয়, বড়োও নয়। মাছঅলা ভোম্বল বলে, 'একেবারে লাফাচ্ছে দাদুসাহেব, ঝালে খাবেন, ঝোলে খাবেন, ভাজা খাবেন, মুখ ছেড়ে যাবে, তাকত বাড়বে।'

ছোটো বাজারের ব্যাপারী। বড়ো বড়ো শহরে বাজারের বিক্রেতাদের ঘমন্ড এদের নেই। যত না বিক্রিবাটা হয়, তার চেয়ে বেশি হয় গল্পসল্প, একটু ডাকাডাকি করে মানুষকে বুঝি আপন করে নেওয়া।

বাজারে আসেন আরও দু-পাঁচজন ভদ্রলোক। বিকাশ গাঙ্গুলি, অজয় মান্না, প্রীতম সিংহ, বীরেশ্বর মহাপাত্র। প্রায় সকলেই মুখার্জিসাহেবের থেকে ছোটো। জিনিসপত্রের দর নিয়ে, শহরের ক্রমবর্ধমান দূষণ নিয়ে, সংস্কৃতির হাল নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁর থেকে ছোটো হলেও দেখা যায় এঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে যাচ্ছেন। শহর থেকে দূরে হওয়া সত্ত্বেও এই জায়গায় বাস করতে এসেছেন দূষণমুক্ত হাওয়া, শব্দহীন দিনরাতের খোঁজে। বিকাশবাবু বলেন, 'আমি তো প্রায় বার্ডওয়াচার হয়ে গেলাম মুখার্জিদা। এত রকমের যে পাখি আছে, তারা যে শুধু বইয়ের পাতায় থাকে না, বাস্তবেও নড়েচড়ে উঠে ডেকে বেড়ায়—তা আমার জানা ছিল না।' অনেকেরই গাড়ি আছে। প্রীতম তো গাড়ি নিয়েই অফিস করে। ট্রাভেল এজেন্সি আছে তার। শহরে চলে যায় হুশ করে। একটা পার্ট-টাইম ড্রাইভার পেলে মুখার্জিসাহেবও গাড়ি রাখতে পাবেন। নইলে আজ কাল আর গাড়ি চালাতে ঠিক ভরসা পান না। তা প্রীতম বলে, 'গাড়ি রাখবেন কেন আঙ্কল, হররোজ তো দরকার হচ্ছে না। কোথাও যেতে হলে প্রীতম আছে। প্রীতমকে ডেকে নেবেন।'

তা এসব আলাপ মুখার্জিসাহেবের একার। আসল আলাপসালাপ হয় বিকেলবেলা। সস্ত্রীক বেড়াতে যাবার সময়ে। তখন মিসেস বিকাশ, মিসেস ও মিস মহাপাত্র, মিসেস মান্না, তাঁর দুরন্ত নাতি—এঁরাও বেরিয়ে পড়েন।

মিসেস বিকাশ একদিন বললেন, 'ছেলেমেয়ে সব বিদেশে, বাইরে বুঝি, বউদি?'

মুখার্জিগিন্নি কিছু উত্তর দেবার আগেই সাহেব বললেন, 'না, নেই, আমাদের নেই অণিমা, দুর্ভাগ্য!'

পরে বিকাশবাবু বাড়িতে এসে গৃহিণী অণিমাকে ভীষণ বকাঝকা করেন। শহর ছেড়ে এসেছ বলে কি সভ্যতা-ভব্যতার অভ্যেসগুলোও সেখানে রেখে এসেছ? সেই এক মেয়েলি কৌতূহল—'ছেলেপিলে ক-টি?' আমার দিদিমা-ঠাকুমাকেও বলতে শুনেছি, মা-মাসিদেরও বলতে শুনেছি, আর আমার ডবল এম. এ. গিন্নিকে বলতে শুনছি। ছিঃ!'

অণিমা ডবল এম. এ মানুষ, মোটেই বকাবকি মেনে নেন না! ঝাঁঝাল গলায় বলেন—'শহরে

সভ্যতার মুখোশ জীবনভর বয়ে বেড়াবে তো তুমিই বেড়াও। আমি মানুষ, মুখোশ নই, বুঝলে? মানুষই মানুষকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাকরি করে, পরস্পরকে জানতে। মেয়েলি কৌতূহলেও নয়, আর কাউকে অপদস্থ করতেও নয়।'

তা সে যাই হোক, বকুনিটা অনিমা গাঙ্গুলির ওপর দিয়ে গেলেও, দরকারি খবরটা সবারই জানা হয়ে গেল। মান্নাদের, মহাপাত্রদের, সিংদের, আরও আয়েঙ্গার, সেনগুপ্ত, রায়চৌধুরি যে যেখানে ছিল সব্বার। অরিন্দম মুখার্জি সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের বড়ো চাকুরে, রিটায়ার্ড হবার পরও প্রাইভেট একটা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেকদিন, ধনশালী লোক, স্ত্রীটি সেকালের গ্র্যাজুয়েট হলেও অতি ভালোমানুষ। এঁদের ছেলেমেয়ে নেই। নিঃসন্তান। অনিল সেনগুপ্ত বলেন, 'এ নিয়ে তোমরা এতো খেদ করছ কেন আমার মাথায় আসছে না ভায়া, আমাদেব অনেকেবই তো আছে। আমার তো শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পাঁচটি। বড়ো বস্টনে, মেজ অস্ট্রেলিয়ায়, সেজ বোম্বাই, বড়ো মেয়ে ডেড অ্যান্ড গন, ছোটোটি কানেটিকাট। তা হরেদরে তো সেই একই হল, না কি? যাঁহা পাঁচ তাঁহা শূন্য কেমন কি না?'

এই অনিল সেনগুপ্তর বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েই সুরাহাটা হল। অনিলের স্ত্রী সাহানার ছায়ার মতো ঘোরে একটা রোমশ বেঁটে ভুটিয়া কুকুর পুটপুটি। কালো পুঁতির মতো চোখ হালকা খয়েরি রঙের লোমের ক্লোকটি পরে সে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় আর ছোট্ট একটি নাতিপুতির মতো সাহানার আঁচল কামড়ে থাকে। লোকজন এলে কিছু দূরে চলে যায়। এবং থাবায় মুখ বেখে পিটপিট করে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। একটুও হিংসে-বিদ্বেষেব লক্ষণ নেই। অভ্যাগতবা যতক্ষণ থাকবেন সে এইরকম সভ্যভব্য হয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এবং তাঁরা চলে গেলেই গোলাপি জিভ বার করে বিশাল হাই তুলে আবার সকর্মক হবে। সাহানাই পরামর্শটা দিলেন, 'আচ্ছা দাদা, আপনারা তো থাকেন একটেরে, একটা কুকুর পুষুন না! কুকুর যে কী ভালো সঙ্গী! কুকুরের স্নেহমমতা, বিশ্বস্ততা, এসব যে কী দুর্লভ গুণ, যারা কুকুর না রেখেছে বুঝতে পারবে না। আপনাদের কখনও কুকুর ছিল না?'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'না সাহানা। কুঁকুরে আমার বরাবর কেমন ভয়, ঘেন্নাও বলতে পারো। কখনও পুষিনি।'

মুখার্জিদা আপনি?

আরে আমার তো ভালো লাগে। কিন্তু এ সব ব্যাপারে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। বুঝলে কি না?

সাহানা বললেন, 'ও সব বললে শুনছি না, কুকুর আপনাদের একটা কিনিয়ে দেবই। পরে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

সেই হাজরা রোডে জহর দাসের বাড়িতে আসা। অনিল সেনগুপ্তর অ্যামবাসাডর চড়ে। বেল বাজাতেই ভেতর থেকে ভৌ ভৌ, ঘাউ ঘাউ, কৌ কৌ--সারমেয়দের অর্কেস্ট্রা। দোতলার জানলায় জানলায় কৌতূহলী সারমেয়কুল ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একজন আবার মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, তার নোয়ানো বিঘৎ পরিমাণ ব্রাউন রঙের কান ঝুলছে। দেখেশুনে মিসেস মুখার্জি বললেন, 'বাপ রে!'

সাহানা বললেন, 'ভয় পাবেন না দিদি, ওরা তো সব ঘরে ঘরে বন্ধ। কত রকমের ব্রিড আছে, নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে নিতে পারবেন।'

জহর দাস এবং তার স্ত্রী পুতুল তখন সাদা সাদা অ্যাপ্রন পরে সদ্যোজাত কুকুর শাবকদের পরিচর্যা করছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। এক একটা বড়ো বড়ো লোহার ক্রিবে, মা কুকুর তার ছানাদের নিয়ে সগর্বে বসে আছে। চারদিকে এমন করে তাকাচ্ছে যেন অমন কাজটি ভূ-ভারতে

আর কেউ কস্মিনকালে করেনি। ওঁদের দেখে জহর দাস শ্রীমতী পুতুলের হাতে সবকিছু ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে চলে এলেন। 'কী রকম কুকুর চান? পেট টাইপ? না প্রহরী কুকুর? চোর ডাকাত তাড়াবে, বদলোক ঢুকতে দেবে না। কী রকম?'

দু তিন মাসের অ্যালসেশিয়ান বাচ্চা দেখালেন। 'এর আসল নাম জার্মান শেফার্ড ডগ, বুঝলেন? সবচেয়ে পপুলার এখন। ট্রেনিং দিন। দুর্দান্ত পুলিশ ডগ হয়ে দাঁড়াবে। ভালোবাসুন, খেলা করুন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, একেবারে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য বন্ধু।'

'বাচ্চাটাকে তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। বড়ো হলে কী রকম দাঁড়াবে বলুন তো?'

একটা ঘরের দরজা খুললেন জহরবাবু, একটা উঁচু লম্বা ভারী কুকুর দৌড়োতে দৌড়োতে এগিয়ে এল। কিচ্ছু করল না, খালি মুখ নীচু করে আগন্তুকদের শুঁকতে লাগল।

এই রকমটা দাঁড়াবে, এটাই বাবা বাচ্চাটার। সাতষট্টি আটষট্টি পাউন্ডের মতো ওজন হবে।

'ওরে বাবা' মুখার্জি গিন্নি বলে উঠলেন,—'অ্যালসেশিয়ান আমি কোনোদিনও দু-চোখে দেখতে পারি না। নেকড়ের মতো। কেমন হিংস্র দেখতে। তার ওপর অত ওজন, আমি সামলাতে পারব না বাপু।'

জহর দাস হেসে বললেন, 'আপনি যদি বাচ্চা-কাচ্চার মতো নিয়ে, আদর করে আনন্দ পেতে চান আবার এ-ও চান বাড়িতে ইঁদুর আরশোলা বেড়াল না থাক, যদি চান চোর ডাকাত এলে লড়াই করতে না পারুক অন্তত পক্ষে ডেকে আপনাকে জাগিয়ে দেবে তাহলে আপনার জন্যে আইডিয়াল কুকুর হবে মাসিমা আইরিশ টেরিয়ার। সঠিক নামটা হবে গ্লেন অব ইমান টেরিয়ার। খুব রেয়ার ডগ, মানে আমাদের এখানে। টেরিয়ার আমার কাছে দুটো বাচ্চা এসেছে, একটা রাজাপালের জন্যে তাঁর এডিকং নিয়ে গেছেন, আর একটা আছে আপনাকে দেখাচ্ছি।'

নীলচে ছাই-ছাই রঙের একটা ছোট্ট গোল্লামতন দেখালেন জহরবাবু। বললেন 'পেট ডগ, বিশেষ করে যেগুলো টয় টাইপ, সবই খুব লোমশ হয়। টিবেটান অ্যাপসো, কি টেরিয়ার, ওয়েস্ট হাইল্যান্ড টেরিয়ার, পিকিনিজ, পামিরেনিয়ান, স্পিৎজ্। লোম নিয়ে উস্তম-খুস্তম হয়ে যাবেন। এটারও লোম আছে, ন্যাড়া টাইপের কুকুর মোটেই নয়, অথচ ম্যানেজেবল্। ভীষণ মজাদার, কেজো কুকুর। এটাকে মানুষ করতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। ভালোবেসে ফেলবেন। বড্ড ভালোবাসবেন। বিচ কিন্তু।'

'বিচই ভালো', বলে বেতের টুকরিসুদ্ধ নরম স্পঞ্জের গদিতে উলের বলটি তুলে নিলেন মুখার্জি গিন্নি। সাহানা বললেন, 'আমাদের পুটপুটিটার সঙ্গে মিলবে ভালো। ওটাও বিচ। খেলবে এখন দুজনে খুব।' ছাপানো কুকুর-পালন-বিধি নিয়ে ফিরে এলেন মুখার্জি দম্পতি।

'ফ্লাওয়ারি নুক'-এর ফ্লাওয়ারগুলি আছে ঠিকই। কিন্তু 'নুক'টি এখন ঝুপলির হয়ে গেছে। ঝুপলি, সেই নীলচে ছাই রঙের গোল্লাটা পেট উলটে বোতলের দুধ খায়। ছোটো বাচ্চাদের মতো সামনের দুই থাবা দিয়ে বোতল আঁকড়েও ধরে কখনও কখনও। মোটা তুলোর বিছানায় বেতের দোলনায় শোয়ানো হয় তাকে। পিচ পিচ করে হিসি করে বড়ো কম্মো করে, সেখানকার তুলোটুকু ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঝুপলির উন্নতি হয়, ঝুপলি নিজের কট থেকে ঝাঁপিয়ে নামে, লুটোপুটি খায়, খাটের পায়া কামড়ে ধরে, নিউ মার্কেট থেকে তার জন্যে টিদিং রিং আনা হয়। ডগ বিস্কিট আসে। খেলবার জন্যে বল আসে, ছোটো বড়ো। খেলনা আসে। ঝুপলিকে কোলে নিয়ে মুখার্জি মা বসেন চোখ বুজিয়ে, মুখার্জি-বাবা পা চেপে ধরেন। প্যাট করে ইনজেকশন ফোটানো হয়। পাউডার সাবান, বুরুশ, চিরুনি দুতিন রকম। অ্যান্টিসেপটিক। বোরিক তুলো, পেরোক্সাইড ভিনিগার। ক্রমশ নীলচে ছাই লোমে ছেয়ে যায় শরীর, মুখ। তার মধ্যে থেকে

থ্যাবড়া কালো নাকটা বেরিয়ে থাকে। বোকার মতন কুতকুতে চোখ। বেঁটে লোমশ, খাড়া ল্যাজ নড়ে। মুখার্জি সাহেব তাকে সপাটে ওপরে ছুড়ে দ্যান, লুফে নেন, আবার ছুড়ে দ্যান। রই রই করে ছুটে আসেন গিন্নি! 'কী করছ? তোমার বদভ্যেস কি কখনও যাবে না? অত উঁচু থেকে পড়ে গেলে মানুষ বাঁচে?'

'প্রতিমাদেবী, এটা মানুষ বাচ্চা নয়,'—ঝুপলিকে লুফে নিতে নিতে মুখার্জি সাহেব বলেন! আর মানুষ বাচ্চাদেরও এমনি করে লোফালুফি করতে হয়, নার্ভ স্ট্রং করবার জন্যে, কুকুরের তো কথাই নেই!'

সব সময়ে অত কুকুর-কুকুর করবে না তো! কুকুর বলে কি মানুষ নয়! সযত্নে ঝুপলিকে কোলে তুলে প্রতিমাদেবী বেরিয়ে যান।

মুখার্জি সাহেব ভারি মজা পেয়ে হাসতে থাকেন, 'কুকুর বলে কি মানুষ নয়? সত্যিই তো কুকুর বলে কি এটা মানুষ নয় নাকি?'

মাস তিনেকের বাচ্চা যখন, তখন থেকেই কুকুর-পালন-বিধি দেখে দেখে ঝুপলির ট্রেনিং আরম্ভ হয়ে যায়। নরম সোয়েডের কলার তৈরি হয় তার জন্যে বিশেষ অর্ডার দিয়ে। তার সঙ্গে স্টিলের চেন। আনব্রেকেবল গোল ফুলকাটা বোলে ঝুপলি পরিজ খেল, চকচক করে জল খেল, এইবার মুখার্জি সাহেব ডাকবেন—''ঝুপলি কলার। ঝুপলি কলার।' কলার পরতে ঝুপলির ভীষণ আপত্তি। সে দূর থেকে বোকার মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রতিমা বলবেন 'পরে নাও ঝুপলি, ল-ক্ষ্মী মেয়ে, কী সোনা মেয়ে গো! ও তো গয়না! বাবা গয়না কিনে দিয়েছে!' ঝুপলি আরও বোকাটে চোখ করে পিছু হটে। মুখার্জি সাহেব বলেন—ওভাবে মানুষের মেয়েকে বলার মতো বললে হয় না আজ্ঞে! 'ও তো গয়না! বাবা গয়না কিনে দিয়েছে!' হুঃ, খুব বুঝল ও, গয়নার লোভে লসলস করছে কি না! কিছু শেখাতে হলে সোজাসুজি গম্ভীর, কঠিন গলায় নির্দেশ দিতে হবে, সম্ভব হলে মনোসিলেবল, যেমন সিট ডাউন—ডাইসিলেবলও চলতে পারে, কিন্তু ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন—'ঝুপলি, কলার প-রো'। গম্ভীর কড়া গলায় বলে কলারটা সামনে ধরে নাচাতে লাগলেন মুখার্জি সাহেব, হঠাৎ এক পা দু-পা করে এগিয়ে এসে ঝুপলি কলারের ফাঁসের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিল। ইতিউতি তাকাচ্ছে। ঠিক করেছে কিনা বুঝতে পারছে না এখনও। মাথায় কিস্যু নেই।

তখন তাকে প্রচুর আদর করতে হয়, গলায় খুশি ঢেলে দিতে হয় বুঝলে? যাতে সে বোঝে এই রকম আচরণ করলেই সে ভালোবাসা পাবে, হাততালি পাবে। এই দেখো লেখা আছে—'ল্যাভিশ প্রেইজ অন হিম হোয়েন হি রেসপন্ডস টু কমান্ড', এসব ট্রেনিং-এর অঙ্গ। জহরের বইটা ভালো করে পড়ে দেখো না। তোমাকে তো তাই-ই করতে বললুম।' এইবার তোমার ওই লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়েগুলো প্রাণভরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারো।—বিজয়গর্বে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুখার্জি বলেন।

'আমার ভারী বয়ে গেছে।' গিন্নি উঠে যান।

'নাগ হয়েছে নাগ?' ছি! ছি! ছি! মানী মানতে শেখেনি, মানী মানতে শেখেনি' বলে মুখার্জি সাহেব তাঁর বয়স-টয়স ভুলে গিয়ে আঙুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে নাচেন, ঘুরে ঘুরে নাচেন। গিন্নিকে খ্যাপাবার এই নতুন উপায় খুঁজে পেয়ে তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত। তাঁর রকম দেখে ঝুপলি তার কচি গলায় ডাকে পৌ পৌ পৌ, গলার চেন ঝনঝনিয়ে সে-ও দু-একটা পাক খেয়ে নেয়। কিন্তু নাচে তার মুখার্জি কর্তার মতো প্রতিভা নেই, দেখা যায়।

উর্মি এসে বলে, 'ও দাদুসাহেব কী করছ গো? দিদিমা যে কাঁদতে নেগেছে।'

'অ্যাঁ?' সাহেবের নাচ থেমে যায়।

কুকুর বগলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিদিমার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

খাবার টেবিল সামনে নিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে দিদিমা বসে আছেন।

কী হল? আরে বাবা, কুকুর যখন তোমার আদেশ ঠিকঠাক পালন করতে পারবে?

'আমার পড়েও কাজ নেই। কিছু করেও কাজ নেই!' গিন্নি একই রকম থমথমে মুখে বসে থাকেন।

'তবে রইল তোমার ঝুপলির মর্নিং ওয়াক, সে মোটা হিপো হোক, তার গেঁটে বাত ধরুক, আমার কী'। ঝুপলিকে গিন্নির কাছে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে সাহেব চলে যান। আর কুকুরটাও এমনি পাজি যে পোঁ পোঁ করে দুবার ডেকে মায়ের কোলের ওপর লুটোপুটি খেয়েও লাফাতে লাফাতে ছোটে মুখার্জি সাহেবের পিছু পিছু, পেছনে চেন লুটোচ্ছে।

'কী বিচ্ছু দেখো দিদিমা,' উর্মি চেঁচায়, 'ওই যে জানে দাদুসাহেব বেই বেই যাবে?'

'ওরা ওইরকমই। মায়ের থেকে আদর যত্ন সেবা সব আদায় করবে। আর হবার বেলায় হবে বাপ-সোহাগি;' গভীর খেদের সঙ্গে দিদিমা উচ্চারণ করেন।

উর্মি বালতিতে ন্যাতা ডুবিয়ে বলে, 'তা যদি বলো দিদিমা, ব্যাটাছেলে হয়েও দাদুসাহেব ঝুপলির জন্যে কম করে না! দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি, খেলা দেওয়া! মুখের গোড়ায় খাবারটি যেমন বোঝে, ঘুমের সময় কোলটি যেমন বোঝে, খেলাটিও তো তেমন ষোলো আনার জায়গায় সতেরো আনা বোঝে কি না! একটা মানুষের বাচ্চার সঙ্গে তফাত কী?'

হঠাৎ বুকটা চেপে ধরেন মুখার্জি গিন্নি প্রাণপণে। বুকের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ: না না, সত্যিই, মানুষের বাচ্চার সঙ্গে কোনো তফাতই নেই। কোনোই তফাত নেই।

আনোয়ারের আজকাল মুখে খুশি ধরে না। মুখার্জি সাহেব নিয়মিত মাংস কিনছেন। হাড়-হাড় দেখে মাংস বেছে দেয় আনোয়ার। মেটুলি, কিডনি একেক দিন! মুরগিঅলা কিষেণের দিন খারাপ যাচ্ছে। তাকে মুখার্জি সাহেব ধৈর্য ধরে বোঝান—তাঁর নিজের জন্যে আর কতটুকু লাগে। দিদিমা যে খায় না। আর ঝুপলি? কক্ষনো ওদের মুরগি দিতে নেই। সরু সরু হাড় যদি একবার পেটের ভেতরে চলে যায় তো ইনটেসটিন ফুটো হয়ে যাবে একেবারে। তখন অক্কা। '—নলি নলি হাড় দিস, বেটি চিবোক, যত পারে চিবোক'—তিনি আনোয়ারকে নির্দেশ দ্যান। বেছে বেছে গাজর কেনেন, বাঁধাকপি কেনেন, পালং শাক, কলমি শাক। ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ যেন কম না হয়ে যায় ঝুপলির শরীরে।

ইতিমধ্যে মুখার্জি গিন্নিরও বিজয় গৌরবের কারণ ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ঝুপলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুচিতা সম্পর্কে খুব সজাগ। প্রত্যেকবার খাবার পর তুলো জলে ভিজিয়ে মুখ মুছে দ্যান। ঝুপলির দাঁত মাজার দরকার নেই শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়েছিলেন। মানতেও চাননি। কিন্তু তাঁর স্বামী যখন কিছুতেই দাঁত মাজাতে দিলেন না তখন তিনি জল আর পেরোক্সাইডে মিশিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে রোজ রাতে একবার করে ঝুপলির দাঁত পরিষ্কার করে দিতে থাকলেন। ঝুপলি হেগো পেছনে থাকবে এ-ও তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না। তুলো ভিজিয়ে তার শৌচকার্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। মুখার্জি সাহেব যতই ব্যঙ্গের হাসি হাসুন। আর খ্যাপান, এ কাজগুলো তিনি করবেনই। উর্মি পর্যন্ত তাঁকে বোঝায়, 'আচ্ছা দিদিমা, ধরো তুমি কোনোদিন পারলে না অদড় হলে তখন? কে ওকে ছুঁচিয়ে দেবে? কে দাঁত মাজাবে? ভগবান ওদের ওমনি করেই গড়েছেন, দাঁত মাজবার, ছোঁচাবার দরকার হয় নাকো।'

শুনে দাদুসাহেব বলেন, 'উর্মিচাঁদ একটা মুকখু মেয়ে যা এত সহজে বুঝে গেল, তুমি ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের গ্র্যাজুয়েট হয়েও তা বুঝলে না গিন্নি ; তোমাকে আর উর্মিচাঁদকে দেখেই আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারি—নলেজ ইজ ইনস্টিংটিভ, ইট কান্ট বি অ্যাকোয়ার্ড।'

তা সে যাই হোক তার মুখার্জি-মায়ের গর্বোল্লাসের উদ্রেক করে একদিন ঝুপলি ঝুম ঝুম করে বাগানে দৌড়ে গেল। ঝুপলি কোথায় গেল? ঝুপলি কোথায় গেল? দেখা গেল ঝুপলি বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সযত্নে তার বড়ো-বাইরে চাপা দিচ্ছে।

'দেখেছ? দেখেছ। কী রকম ট্রেনিং। কাজটা যে খারাপ, জিনিসটা যে নোংরা ও ঠিক বুঝতে পেরেছে।' মুখার্জি গিন্নি বলে ওঠেন।

রে রে করে ওঠেন মুখার্জি কর্তা, 'জিনিসটা নোংরা না হয় স্বীকার করছি প্রতিমা, যদিও জিনিসটা আমরা প্রত্যেকে দেহের ভেতরে বইছি! কিন্তু কাজটা খারাপ, মানে? কাজটা তাহলে না করাই ভালো বলছ? ঠিক আছে উর্মিচাঁদ, তোকে ভার দিয়ে রাখলুম, পাহারা দিবি কাল থেকে তোর দিদিমা যেন খারাপ কাজটা না করে।'

উর্মি হি হি করে হাসতে থাকে। প্রতিমা বলেন 'বুড়ো যে হয়েছ, সেটা অসভ্য কথা শুনলেই বোঝা যায়। যার যত বয়স তার তত অসভ্য মুখ!'

এরই মধ্যে আবার ছোট্ট একটু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেল। সাহানা সেনগুপ্তদের কুকুর পুটপুটি, আর প্রতিমা মুখার্জিদের ঝুপলি বিকেলের দিকে একই সঙ্গে বেড়াতে যায়। বেড়িয়ে টেড়িয়ে হয় মুখার্জিদের বাড়ির গোল পোর্টিকোতে নয় সেনগুপ্তদের বাগানে দুই দম্পতি কুকুর নিয়ে বসে আড্ডা দ্যান। এ সময়টা কুকুরদের চেন, কলার সব খুলে নেওয়া হয়। কলারটা খুলে সযত্নে গলাটা ক্রিম দিয়ে ডলে তবে ঝুপলিকে ছেড়ে দ্যান মুখার্জি সাহেব। দুটো কুকুরে মিলে কৌ কৌ পৌ পৌ করে, লুটোপুটি খায়, এ ওর পেছনে দৌড়োয়। একদিন দেখা গেল ঝুপলি তিরবেগে দৌড়োচ্ছে। কী? না একটা ধেড়ে ইঁদুর। দেখাদেখি পুটপুটিও দৌড়োল। কিন্তু ঝুপলি একটা টেরিয়ার, তার ভেতরের জিন তাকে ইঁদুর ভোঁদড় শিকার করতে শিখিয়ে দ্যায়। অপর পক্ষে পুটপুটি একটা চূড়ান্ত অলস ও সুখী কুকুর—দিবারাত্র পাখার তলায় শুয়ে হ্যা হ্যা করে আর খাবা পেতে ঘুমোয়। সুতরাং অবিলম্বে ঝুপলি ইঁদুর ধরে। আছড়ে মেরে ফেলে। মুখার্জি সাহেব মন্তব্য করেন, 'দ্যাখো সাহানা, পুটপুটির মা বিদ্যেয় ঝুপলির মায়ের থেকে বড়ো হতে পারে, ঝুপলি কিন্তু পুটপুটিকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে।' ইতিমধ্যে ঝুপলি তার জীবনের প্রথম শিকারটিকে পরম পরিতোষ সহকারে খেতে শুরু করেছে। এবং প্রতিমা চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'ম্যাগো, ঝুপলি এই, ঝুপলি—তুই কি খেতে পাস না যে ওইসব নোংরা! ছি ছি ঝুপলি খায় না। না না।' ঝুপলি ভেবলে গিয়ে একবার মুখ তুলে মা বাবার দিকে তাকাল, কেন যে মা তাকে বাহবা দেওয়ার পরই হঠাৎ এমন কঠোর হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারল না, এবং না পেরে ইঁদুরটিকে চেটেপুটে খেয়ে নিল। পুটপুটি তখন অনেক দূরে বসে পিট পিট করে দেখছে।

সাহানা বললেন, 'ঠিকই বলছেন মুখার্জিদা, কিন্তু কে যে বেশি খানদানি সেটাও স্পষ্ট বোঝা হয়ে গেল। একজন ইঁদুর খায়, আরেকজন ছুঁয়েও দেখে না।' ঠাট্টার সুরেই বললেন সাহানা, কিন্তু পরে দুই দম্পতি যে যার বাড়িতে একা হলে এ নিয়ে বেশ মনোমালিন্য হল। প্রতিমা বললেন, আজেবাজে জিনিস খাবার ঝোঁকটা ঝুপলি তার বাবা অর্থাৎ মুখার্জি সাহেবের থেকে পেয়েছে। তিনি যে অত শুদ্ধতা, বাছবিচার মেনে চলেন সে কি এমন এমনি? আর সাহানা কোন্ মুখে খানদানের কথা উচ্চারণ করে? পুটপুটিকে ওরা দার্জিলিঙে এক ভুটিয়ার কাছ থেকে কিনেছিল কুড়ি না পঁচিশ টাকা দিয়ে। আর ঝুপলি? জহর দাস তো বিগত তিন পুরুষের হিসেব দিল ঝুপলির।

ঝুপলির ভাই তো রাজ্যপালের ঘরে মানুষ হচ্ছে। আইরিশ টেরিয়ার। পাওয়াই যায় না এদেশে। তবে?'

ওদিকে সেনগুপ্তদের বাড়িতে সাহানা বললেন, 'এম. এ. বি. টি করা যে এত দোষের সেটা এই প্রথম জানলুম!' অনিল সেনগুপ্ত বললেন, 'আরে ছাড়ো তো তোমাদের মেয়েলি কুটকচালি!' সাহানা তখন রাগ করে বললেন, 'ঠেস দেওয়া কথাটা কিন্তু কোনো মেয়ে বলেনি, একজন পুরুষই বলেছেন এবং তাঁর সত্তরের যথেষ্ট ওপরে বয়স পঁচাত্তর তো হবেই। পেডিগ্রি-ডগ কিনে অহংকারে একেবারে মটমট করছেন। আরে বাবা পরামর্শটা কে দিল? কিনিয়েটা দিল কে?'

ঝুপলি কিন্তু সেনগুপ্ত পরিবারেরও খুব নেটিপেটি। প্রথম ইঁদুরটি মারার পর থেকে সে নিজেদের বাড়িতে তো বটেই সেনগুপ্তদের বাড়িতেও ইঁদুর মারতে যায়। যদিও আর খায় না। ইঁদুরের স্বাদ তার ভালো লাগেনি। একতলা বাংলো বাড়ি। ইঁদুর-ছুঁচোর উপদ্রব আছেই, উপদ্রব বাড়লে সাহানাই বলেন, 'ঝুপলিকে ডাকো তো!' ইনি তো একটি কম্মের ঢিপি।' এই নিন্দাবাদ শুনে পুটপুটি তার ক্লোকের মধ্যে আরও সেঁদিয়ে যায়। অন্তত সাহানার তাই ধারণা। কিন্তু লজ্জা পেলে কী হবে। আরাম, ঘুম এ সমস্ত ছাড়বার কোনো লক্ষণই সে দেখায় না। সাহানা বলেন, 'বেহায়া তো! অপমান হজম করবে, তবু গতর নাড়বে না!'

সেবার পুজোয় বিজয়ার সময় ভারি মজাই হল। বিজয়া দশমীটাই একমাত্র উপলক্ষ্য যখন মুখার্জিদের বাড়িতে প্রচুর জনসমাগম হয়। সব বাড়িতেই হয়। মুখার্জিদের বাড়ি একটু বেশিই। একাদশী থেকে কালীপুজো পর্যন্ত চলে। তা, এইরকম একটা দল সেবার বোধহয় প্রথম আসছে, আশেপাশে জিজ্ঞেস করছে বাড়ির নম্বর বলে। এদিকে পরিকল্পিত পল্লি যেমন হয়, একই রকমের রাস্তা, বাড়িগুলোও মোটামুটি একই ধাঁচের। কিছুতেই ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না দলটি, অবশেষে একটি বালক বলল, 'ও ঝুপলিদের বাড়ি? ওই তো ডানদিকে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরেই দুটো বাড়ি পরে।'

এঁরা মুখার্জিদের মাসিমা মেসোমশায় ডাকেন। বাড়ি খুঁজে আসা হল, খাওয়াদাওয়া আড্ডা সব হল, শেষে ইতস্তত করে বললেন—'মেসোমশায় কি কোনও বাচ্চা পোষ্য-টোষ্য নিয়েছেন না কি?'

কেন বলো তো?

'না। ওইদিকে একটি ছোটো ছেলে বলল কি না ঝুপলিদের বাড়ি।' ঝুপলি তখন গ্যাঁট হয়ে তার মায়ের কোলে বসে বসে কুতকুত করে অভ্যাগতদের দেখছে। এত বোকার মতো যে দেখলেই হাসি পাবে।

মুখার্জি সাহেব তাকে দেখিয়ে হেসে বললেন, 'পোষ্যই বটে। এই যে ইনিই সেই ঝুপলি ঠাকরুন, যাঁর নাকি এই বাড়ি! সাধ করে নাম রেখেছিলুম 'ফ্লাওয়ারি নুক'। ফ্লাওয়ার্সও মন্দ ফোটাইনি। তিন রঙের জিনিয়া, কলাবতী, রাজ্যের দোপাটি, জবা, লাল সাদা গোলাপ। কিন্তু হলে কী হবে বাড়ি এখন 'ঝুপলিজ নুক' হয়ে গেছে! একেই বলে ফোকটেল, বুঝলে হে প্রকাশ! আর একেই বলে কপাল!'

এইভাবেই চলছিল। চলছিল ভালোই। বছর বছর ঝুপলির জন্মদিনে পার্টি হয়। সবাই মিলে নানারকম মুখরোচক খাবার ধ্বংস করতে করতে আড্ডা জমে। কিন্তু একদিন প্রতিমা অত্যন্ত অসময়ে অস্বাভাবিক বেগে ছুটে গেলেন সাহানার বাড়ি। দুজনে মিলে ফিসফিস করে কী কথা হল। শেষে সাহানা বললেন, 'অত ভাবছেন কেন বলুন তো? ওরা জানোয়ার, নিজেদেরটা নিজেরা বুঝবে, ওর জন্যে কি এখন আপনি স্যানিটারি ন্যাপকিনের খোঁজে যাবেন, না কি?'

কী লজ্জা, কী নোংরা! পাঁচজনের সামনে, ছি ছি!

পাঁচজন কোথায় পেলেন দিদি? বাড়িতে তো পুরুষ বলতে এক আপনার উনি। মুখার্জিদার সঙ্গে এতদিন ঘর করলেন সে কি লুকোচুরি খেলে?

'তোমার যেমন কথা!' প্রতিমা মুখার্জির ভাঁজ পড়া মুখ লাল হয়ে গেল।

তবে? নিজেই তো দেখে-শুনে বিচ নিলেন? তখন ভাবেননি যে ইয়ে হবে?

না সত্যিই ভাবেননি প্রতিমা। কেন নিয়েছিলেন? কেন স্ত্রী-জানোয়ারের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব? কেন? কেন? জহর দাস যখন, বলল, 'বিচ কিন্তু।' তিনি তো আর পাঁচটা দেখতে চাননি, একেই তুলে নিয়েছিলেন। ঝুমঝুমু চুল, পশমের গোল্লার মতো, যেন নীলচে ছাই রঙের ফারকোট পরে আছে। কাশ্মীর থেকে কিনেছিলেন এটা! ছোট্ট ফারকোট! সাদা জুতো বকলশ দেওয়া। বড়ো হয়েও যখন বি. এ. পাস করে এম. এ পড়ছে সে তখনও অমনি ছোট্টখাট্টো, মিষ্টি, কোকড়া পিঠ-ছাপানো চুল! বুকের ভেতর থেকে ডাকটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে বুড়ি, বুড়িমা! প্রতিমা প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করেন, মুখ চোখ সে চেষ্টায় একবার লাল তারপর ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যেন পাথর গিলছেন। চোখে অন্ধকার। সাহানা বলেন, 'কী হল দিদি! শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে না কী? আর শরীরের বা দোষ কী? যা গরমটা পড়েছে। কথায় বলে ভাদুরে গুমোট।' সাহানা ঠান্ডা জল আনেন; কপালে বরফ বুলিয়ে দ্যান। সামলে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে আসেন প্রতিমা।

'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!' রাস্তায় কতকগুলো নেড়ি কুত্তা তাঁর পেছু নেয়। দূর! দূর! প্রতিমা কোনোমতে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ির গেটের কাছে এসে নেড়ি কুত্তাগুলো দ্বিগুণ জোরে ডাকতে থাকে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

'আ-মর—মোলো যা'—উমি বাগান থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মারে—'দূর দূর দূর'। যায় না নেড়িগুলো। যদি বা অন্যগুলো যায় একটা কিছুতেই যায় না। গেরুয়া আর কালো মেশানো রং, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পাত-কুড়োনো খেয়েও। গেট টপকাবার চেষ্টা করে, ডাকতে থাকে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।' খাবার ঘরের কোণে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল ঝুপলি। তার ছোটো ছোটো কানগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, সে একবার সাড়া দেয়—কৌ।

'ঘৌ ঘৌ ঘাউ!' ওদিক থেকে ভেসে আসে।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ঝুপলি—কৌ, খৌ, ঘৌ, ঘৌ— সে তিরবেগে গেটের দিকে ছুটে যেতে থাকে। মুখার্জি সাহেবের সমস্ত শরীরের জোর লাগে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার খাবার ঘরে আনতে, কলার এবং চেন বেঁধে আটকাতে। আটকাবার পরও ঝুপলি মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়, আকুলিবিকুলি করে এবং ডাকতে থাকে কৌ, কৌ, ভৌ। যদিও নেড়িটাকে ততক্ষণে নির্ভীক উমিচাঁদ তাড়াতে তাড়াতে পাড়া পার করে দিয়ে এসেছে।

মুখার্জি সাহেব জরুরি বৈঠকে বসেন সেনগুপ্তের সঙ্গে। সেনগুপ্ত বলেন, 'আমার পুটপুটিটা যদি পুং হত তো কথাই ছিল না। দুটোতে কেমন চমৎকার মিলও। আহা জানোয়ারদের জগতে যদি হোমো থাকত দাদা।'

মুখার্জি চুরুটে টান দিয়ে বলেন, 'না অনিল, কথাটা তুমি লাইটলি নিয়ো না।'

অনিল সেনগুপ্ত বলেন, 'আচ্ছা রাত্তিরের দিকে সব চুপচাপ হয়ে গেলে একটা খুব গম্ভীর কুকুরের ডাক শুনি যেন। কোথায় বলুন তো? দাঁড়ান আমি খোঁজ নিই।'

দু চারদিন পরে খোঁজ খবর করে এসে অনিল সেনগুপ্ত বলেন, 'চলুন দাদা আপনার সমস্যার সমাধান বোধহয় হয়ে গেল। যশবন্ত কাপুর বলে এক পাঞ্জাবি থাকে ওদিকে। অ্যালসেশিয়ান। আপত্তি নেই তো?'

আরে বাবা জাতে খানদানি হলেই হল। অ্যালসেশিয়ানই হোক আর তোমার ডালমেশিয়ানই হোক।

বিকেলের দিকেই ঘটকালি অভিযান শুরু হল। প্রতিমা যেতে চাননি।

'যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড!' সাহানা পুটপুটিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোবেন। অগত্যা অনিল সেনগুপ্ত একাই মুখার্জিদাকে সঙ্গ দ্যান। মুখার্জি সাহেবের পাশে পাশে হেঁটে চলে শেকল-বন্দি সদ্য রজঃস্বলা ঝুপলি।

যশবন্ত কাপুর সাদরে গেট খুলে দ্যান, 'আই য়ে আই য়ে মুখার্জিসাব, আই য়ে সেনগুপ্তা সাব, ইয়ে তো আপকীই কোঠি হ্যায়। বইঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে।' লনের মাঝখানে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা। কেতাদুরস্ত বেয়ারা এসে লস্যি দিয়ে যায়। বেয়ারাকে নির্দেশ দেন যশবন্ত কাপুর— রোভারকো ছোড় দো। সবে দু তিন চুমুক দেওয়া হয়েছে লস্যিতে, পশ্চাৎপটে মিসেস কাপুরকেও দেখা যাচ্ছে হাসতে হাসতে, বিপুল ফাঁদের সালোয়ার কুর্তা পরা সদালাপিনী বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় শোনা গেল—'ঘাঁউ ঘাঁউ ঘাঁউ।' অর্থাৎ রোভারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরক্ষণেই সুপুষ্ট পেশিপ্রবাহে বিদ্যুৎ খেলিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসতে লাগল রোভার। রোভার তো রোভারই। বালি-বালি রঙের মাজা শরীরটি। দুই কানের মাঝখানটা কালো, নাক মুখও কালো। ঝকঝকে, বলিষ্ঠ, অভিজাত, মধ্যযুগের বীর যোদ্ধাদের মতো কুকুর রোভার। জামাই করতে হয় তো এইরকম! বাতাসে নাক তুলে যেন কী শুঁকল, তারপর ঝড়ের বেগে ঝুপলির দিকে দৌড়ে আসতে লাগল রোভার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জি বাবার হাতের শেকল হ্যাঁচকা টানে খুলে টেবিলের ওপর লস্যির গেলাস উলটিয়ে ঝুপলি তার লোম-টোম খাড়া করে দিল ভোঁ দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়। একেবারে এ গলি পেরিয়ে সে গলি পেরিয়ে সে বাড়ি টপকিয়ে সে ফ্লাওয়ারি নুক-এ হাজির। মুখার্জি মা র কোলের ভেতরে ঢুকে তবে নিশ্চিন্ত।

লনে লস্যির প্লাবন বইছে, দুখানা গ্লাস ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। মুখার্জি সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন বারবার।

'ইসমে আপকা ক্যা কসুর হ্যায় জী?' যশবন্ত কাপুর মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন।

গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন মুখার্জি বাবা, সেনগুপ্তকাকা। বাড়ি ফিরতে সাহানা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল?'

সেনগুপ্ত বললেন, 'না : রিস্তা নাকচ করে দিলে বেটি! বহোৎ নারাজ।'

'তাই ই!' সাহানা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন সব শুনে!

মুখার্জিদের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা খুব হাসির রইল না। তাঁরা ঝুপলিকে সাধারণত ছেড়ে রাখতেই পছন্দ করেন। খুব ভালো মেজাজের কুকুর। কাউকে বিরক্ত করে না, কামড়ায় না। ঘরদোর নোংরা করে না, গেট বন্ধ আছে, তার চত্বরের মধ্যে যত খুশি ঘুরে বেড়াক না। চেন পরবে একমাত্র বেড়াতে যাবার সময়ে। ঝুপলি তার এ স্বাধীনতা উপভোগ করে, অপব্যবহার করে না কখনও। মুখার্জি সাব বিকেলবেলা তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময়ে ডাকাডাকি করেও পেলেন না। আশ্চর্য! ঝুপলি তো বাড়ির মধ্যে নেই। আঁতিপাঁতি খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। এ বাড়ি ও বাড়ি খোঁজা শেষ করে, উদ্বেগে হতাশায় কালো হয়ে দুজনে বসে আছেন, এমন সময়ে দেখা গেল ঝুপলি ফিরছে। গেটের ফাঁক দিয়ে গলে এলো। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। বাবা কিছু বলছেন না, মা কিছু বলছে না। ঝুপলি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সে তার চেনটা মুখে করে আনছে। বাবার পায়ের কাছে চেনটা রেখে দিয়ে সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। বোকা বোকা কুতকুতে চোখদুটো বাবার চোখের দিকে চেয়ে স্থির। প্রতিমা ধীরে ধীরে উঠে ভেতরে চলে গেলেন। মুখার্জি সাহেব

আর্দ্র গলায় বললেন, 'ঝুপলি, ঝুপলি, নটি গার্ল তোমাকে চেন পরতে হবে না, এখন চেন পরালে তোমার মা ভীষণ কাঁদবে। কিন্তু আর কক্ষনো অমন একা একা বাইরে যাবে না। যাবে না তো?' ঝুপলি তার বেঁটে ল্যাজটা প্রাণপণে নাড়াতে লাগল। তারপর লাফিয়ে বাবার কোলে উঠল, কোলের মধ্যে যদ্দুর সম্ভব কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে বসে আদর খেতে লাগল।

জোর আলোচনা চলছে বাবা আর কাকার মধ্যে। অনিল সেনগুপ্ত বললেন, 'জহর দাসকে কনট্যাক্ট করা ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না। কেনেল ক্লাবের ব্যাপার-স্যাপার আমরা কিছুই জানি না! ওদের শুনেছি অনেকরকম নিয়মকানুন আছে। গিয়ে শুধু শুধু অপমান হব কেন? তার চাইতে জহরকে কনট্যাক্ট করি। কিন্তু জহরের তো আবার ফোন পাচ্ছি না!'

তা মানুষটাকে দু দিন সময় দে! জহর থাকে, সে কি এখানে? অনিলের গাড়ি গেছে গ্যারাজে, তারও তো সাতষট্টির কাছে বয়স হল। ওরকম হুড়ুমদুম করলে সে পারে? ঝুপলি দিব্যি সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করলো, দুটোর সময়ে আটার রুটি মাংস, অসময়ের গাজর দিব্যি সব সাঁটাল। তিনটে নাগাদ খুব সম্ভব, দূরে শোনা গেল সেই আওয়াজ, ঘেউ ঘেউ, ঘৌ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

অমনি ভৌ ভৌ! সাড়া দিয়েই ঝুপলি ছটফট করতে লাগল। মুখার্জিসাহেব রকম দেখে তাকে বেঁধে রাখলেন। প্রতিমা আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর বললেন, 'এ ভাবে শাস্তি দেওয়া কেন? কথায় বলে যার যেখানে মজে মন.. ।'

'তাই বলে একটা পারিয়া ডগ? নেড়ি কুত্তা?' গর্জন করে উঠলেন মুখার্জি সাহেব। প্রতিমা কেঁপে উঠলেন।

ছোট্ট একটু দুপুর-ঘুমের অভ্যেস মুখার্জি সাহেবের। আর্ম চেয়ারে শুয়ে শুয়েই ঘুমোন। চটকাটা ভাঙলে মুখ-টুখ ধোবেন, চান করবেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরবেন, তারপর দাঁতে চুরুট কামড়ে চেন হাতে ঝুপলিকে নিয়ে বেরোবেন। বেরোতে গিয়ে দেখলেন, চেন ছেঁড়া পড়ে রয়েছে, ঝুপলি নেই।

বিকেল কাটল, সন্ধে হল, রাত হল, রাত গড়িয়ে ভোর হল ঝুপলি নেই। রাতে দুজনে ঘুমোতে পারেননি, পোর্টিকোয় বসে কাটিয়ে দিয়েছেন। ভোরের দিকে চেয়ারে বসে বসেই ঢুলেছেন। পরদিন যখন দুপুর কেটে বিকেল হচ্ছে, আকাশে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে, গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে, ভরা বাদর শুরু হল বলে, এমন সময় দেখা গেল ঝুপলি ফিরছে। খোলা গেট দিয়ে ঢুকে এল, কুৎকুতে লোমে-ঢাকা চোখদুটো এদিক ওদিক ঘুরছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে এবার।

মুখার্জি সাহেব গর্জন করে উঠলেন, 'গেট আউট, গেট আউট আই সে।'

ঝুপলি ভেবলে গিয়ে তাকাল। তিনি পথ আটকিয়ে দাঁড়ালেন। যেদিক দিয়েই ঝুপলি ঢুকতে যায় তাঁর কেডস্ পরা পা জোড়া সেখানেই গিয়ে দেয়ালের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিমা পেছন থেকে আর্ত গলায় বললেন, 'কী করছ? কী করছ? এবার ছেড়ে দাও। অনেক শাস্তি হয়েছে, ওকে ঢুকতে দাও!'

মুখার্জি সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'নো'।

গর্জমান আকাশের তলা দিয়ে মুখ নীচু করে ঝুপলি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশে রোলার গড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামল। জলের প্রবল ছাটে পোর্টিকো ভিজে যাচ্ছে, উঠে যেতে যেতে প্রতিমা কাঁদো কাঁদো গলা বললেন, 'দেখো তো কী করলে? এই বৃষ্টিতে কোথায় ভিজে জাব হবে এখন! নিউমোনিয়া না হলেই বাঁচি। মুখার্জি বললেন, 'কিস্যু হবে না। কম চালাক নাকি? সেনগুপ্তদের বাড়ি সেঁদিয়েছে দেখবে। পুটপুটির সঙ্গে হয়তো খেলা জুড়ে দিয়েছে।'

তাই বলে এই ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে এইভাবে বার করে দেবে?

মুখার্জি সাহেব দাঁতে চুরুট কামড়ে বললেন, 'ওর একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

'ওই শিক্ষাই দাও জীবনভর, আর কিছু দিয়ো না, কিছু দিতে শিখো না' প্রতিমা দ্রুতবেগে স্বামীর এলাকা থেকে দূরে শোবার ঘরের আশ্রয়ে চলে যেতে থাকলেন।

বৃষ্টি থামলে, চকচকে ভিজে রাস্তার ওপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে মুখার্জি সাহেব চললেন সেনগুপ্তের বাড়ি। বেল বাজছে। সাহানা খুললেন, 'কী ব্যাপার দাদা? আপনি এতো রাতে?'

ঝুপলি আসেনি?

কই না তো? বাড়িতে নেই?

নাঃ।

মহাপাত্রদের বাড়ি গেলেন মুখার্জি. ঝুপলি? আমার টেরিয়ারটা! এসেছে?'

কই না।

প্রীতমের বাড়ির বেল বাজালেন মুখার্জি। প্রীতম খুলে দিয়েছে, 'ক্যা হুয়া আঙ্কল : কুছ গড়বড় তো নহী হুয়া!'

ঝুপলি ইজ মিসিং। একটু বকাঝকা করেছিলুম!

'ওহ হো' প্রীতম বোকার হাসি হাসল, 'কীধর জায়েগী উও, পেট হাউজ ডগ, কোঠী গিয়ে দেখুন, এসে বসে আছে।'

কোঠীই চলে এলেন মুখার্জি। উর্মি খুলে দিল।—'ঝুপলি ফিরেছে রে?'

না তো দাদুসাহেব! এই দুর্যোগের রাতে কোথায় গেল বলো তো?

বাইরের জুতো মোজা ছেড়ে শোবার ঘরে এসে থমকে গেলেন মুখার্জি। প্রতিমা একটা অ্যালবাম বুকে আঁকড়ে মড়ার মতো চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছেন। ঠোঁট নড়ছে। বোধহয় জপ করছেন।

তারপর দিনও ঝুপলি এল না। পর দিনও না। পর দিনও না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল লস্ট কলমে 'এ টুয়েলভ ইঞ্চ হাই ব্লুয়িশ গ্রে আইরিশ টেরিয়ার আনসারিং টু দা পেট নেম অব ঝুপলি ইজ মিসিং সিন্‌স থার্ড সেপ্টেম্বর...এটসেটেরা এটসেটেরা।' একদিন দুদিন করে পুরো একমাস হয়ে যাবার পর অবশেষে মুখার্জি সাহেব বুঝতে পারলেন ঝুপলি আর আসবে না। এবং প্রিয় মানুষে আর প্রিয় কুকুরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো তফাতই নেই। ঝুপলি তাঁর সমস্ত আদেশ বেদবাক্য বলে মানতে শিখেছিল। মনোসিলেবিক সব আদেশ। 'সিট ডাউন' তো 'সিট ডাউন', 'স্টে পুট' তো 'স্টে পুট', 'গেট আউট' তো 'গেট আউট'। সে এমনটাই বুঝছে। তার বোকাটে কুতকুতে চোখ, ভোঁতা কালো নাক আর বেঁটে খাড়া লোমশ ল্যাজ নিয়ে ঝুপলি এই নিরাত্মীয় পৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেছে।

পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষাক্রান্ত মানুষটি শেষে একেবারে ভেঙে পড়েন। ভাঙা গলায় বলতে থাকেন, 'আই ডিডনট্ মীন ইট বুড়ি, ওহ বুড়ি মা, আই নেভার মেন্ট ইট। ইউ জাস্ট কাম ব্যাক অ্যান্ড সি...'

মেঘলা আকাশের তলা দিয়ে ফিরছেন সেনগুপ্ত দম্পতি। দুজনেরই মন খারাপ। সাহানা ভারী গলায় স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ঝুপলিকে আবার কবে থেকে বুড়ি মা বলে ডাকা ধরেছেন মুখার্জিদা?'

অনিল সেনগুপ্ত বিষণ্ণ মুখে বলেন, 'কী জানি!

সমুদ্র

ছেলেবেলায় আমরা ছিলুম গরিব। কিন্তু একদম ছোটোদের ঐশ্বর্য সম্পর্কে ধারণাটা বড়োদের মতো নয় বোধহয়। তাই আমার ভাইবোনেরা, অন্তত আমি আর বিনু জানতুম না যে, আমরা গরিব। বাবা গলা ছেড়ে হা হা করে হাসতেন। মা ছিলেন সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখার মতো। আর, আমাদের বাড়ির যে অংশটা আমাদের ভাগে পড়েছিল সেখানে মাঠের মতো দালানের এক অংশ।

আর বিরাট উঁচু সিলিং-এর তিনখানা ঘর, আর জালিঘেরা ব্যাডমিন্টন খেলা যায় এমন বারান্দা—এরকমটা আমাদের কোনো বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে আমরা দেখিনি। আসবাব ছিল কতকগুলো—আড়ে দিঘে মহাকায় এক আলমারি, ভীষণ ভারী একটা দেরাজ, পেতলের টপওয়ালা টেবিল আর পাঁচ-ছখানা অদ্ভুত আকারের চেয়ার। পায়াগুলো তাদের গড়িয়ে-আসা ঘন গুড়ের মতো। কালচে লাল, মেহগনি পালিশ। সবার ওপরে, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল দালানে আমার চেয়েও বড়ো মাপের একটা সাদা পাথরের পরির মূর্তি। সে ডানা গুটিয়ে মুখ একটু নীচু করে নামছে। একটা পা মাটিতে, আর এক পা এখনও শূন্যে-তোলা পায়ের আধখানা ভাঙা। একটা পা অমন ভাঙা বলেই যেন পরিটা ছিল আমাদের খুব কাছের মানুষের মতো, যার জন্যে মন খারাপ হতে পারে।

কতদিনকার জিনিস সব, হিসেব জানি না, কখনও এসবে পালিশ চড়েনি, ঘরদোর কখনও রং হতে দেখিনি, কিন্তু সব কিছু ঝকঝক তকতক করত। বাবা মা আর দিদি মিলে ঝেড়ে ঝুড়ে সব কিছু এমনি রাখতেন। বাইরের থেকে বাড়িটাকে দেখিয়ে যদি বন্ধুদের বলতুম, 'এই আমাদের বাড়ি', তাহলে তারা মূর্ছা যাবার জোগাড় হত—'তোরা এই বাঘ-বাড়িতে থাকিস? তোদের বাবা রাজা নাকি রে?' একথা বাবা-মার সামনে বলার জো ছিল না। বললেই বাবার হাসিমুখ আঁধার হয়ে যেত, মায়ের মুখের চেনা আলোর শিখাটা দপ করে নিবে যেত আর পরে কোনো সময়ে দিদি কোনো একটা হাতের কাজ সারতে সারতে আনমনে ধমক লাগাত, 'বলার আর কথা পাস না, না রে টুনি? হুঁ, রাজা? রানি! রাজকন্যে হবার খুব শখ, না রে?' ভগবান জানেন, রাজকন্যে হবার শখ আমার মোটেই ছিল না। রাজকন্যেদের রাজ্যে দৈত্য এসে সব পাথর করে দিয়ে যায়। রাজকন্যেকে উঁচু জলটুঙ্গি ঘরে জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেয় সোনার কাঠি রুপোর কাঠি মাথায় পায়ে রেখে, জাগায় শুধু নিজের আকাট-বিকট মুখখানা দেখবার জন্যে। রাজকন্যে কি হতে আছে? আমার ভাই বিনুকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করতুম—'হ্যাঁ রে বিনু, দিদি আমাকে বকল কেন রে! বাবাকে রাজা বললে বাবা কেন রাগ করে রে?' বিনু আমার থেকে বয়সে ছোটো হলে কী হবে, বুদ্ধিতে ছিল অনেক পাকা, বলত, 'তুই জানিস না টুনি! আমাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদা এই এত বড়ো বাড়ি, বাগান, ঠাকুরদালান সব করে গেছিলেন। ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে সবাই রাজা বলত।'

তো কি? ভালো তো!

দূর বোকা, ভালো কোথায়! মদ খেত তো ঠাকুর্দাদের সব্বাই। কেউ কোনো কাজ করত না। খালি পায়রা ওড়াত আর বেড়ালের বিয়ে দিত আর সায়েবদের পা চাটত। তাই তো আমাদের আজকে এই দরবস্তা।

বিনুটা সে সময়ে বাংলায় ভীষণ ভালো হবার চেষ্টা করছে। 'দুরবস্তা' তো কোন ছার 'অকুতভোয়', 'অদূরদর্শিতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেও ঘন ঘন স্কুলের মাস্টারমশাইদের মূর্ছার কারণ হচ্ছে। যাই হোক, বিনুর কথাবার্তা থেকে আমি বোকা মেয়ে খালি এইটুকু উদ্ধার করতে পারতুম, রাজা হওয়াটা খুব খারাপ, রাজারা খুব খারাপ লোক হয়, বোধহয় আমাদের পাড়ার হাতকাটা তেঁতুলদার চেয়েও খারাপ।

একমাত্র দুটো সময়ে আবছাভাবে বুঝতে পারতুম---আমরা গরিব, আমাদের যথেষ্ট পয়সা কড়ি নেই। পুজোর সময়ে আর বেড়াতে যাবার মরশুমে। পুজোর সময়ে আমাদের ঠাকুরদালানে ডাকের সাজ পরা দুর্গাপ্রতিমা পুজো হত, সারা কলকাতার লোক ভেঙে পড়ত ঠাকুর দেখতে, কিন্তু আমাদের দুটোব বেশি তিনটে জামা হত না। মা সারা ভাদ্র-আশ্বিন, সেই পঞ্চমীর দিন পর্যন্ত হাত মেশিনে সেলাই করত। বাড়ির সবার সায়া, পাঞ্জাবি, ব্লাউজ, ফতুয়া, ফ্রক, জাঙিয়া, শার্ট, প্যান্ট। শুধু নিজেদের নয়, সেই রায়বাড়ির বাসিন্দা নানান রকমের কাকা জ্যাঠাদের পরিবারের। এই ডাঁই জামা-কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা অপূর্ব থাক-থাক দেওয়া সোনালি রঙের খড়মড়ে ফ্রক বার করে হয়তো আমাকে ডেকে বলত, 'টুনি দ্যাখ দিকি নি পছন্দ হয় কিনা!' আমি দৌড়ে আসতুম, অমন জামা পছন্দ না হয়ে পারে? বলতুম, 'মা এটা অষ্টুমির দিন পরব তো? ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবুমি, এগুলো? মা আবার সেই ডাঁইয়ের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা সাধারণ ছিটের সাদা-সিধে ফ্রক বার করে বলত--'এইটা ষষ্ঠীব দিন পরবি।'

আব?

আবার কী? দেখছিস না কতজনের কত ফরমাশ, এই সব সেরে আর কখনও করতে পারি? নড়া ব্যথা হয়ে গেল যে রে!

এমনিতে খুব মাতৃভক্ত হলেও, আমি নড়া-ব্যথার কথায় ভুলতুম না। কেঁদেকেটে একশা করতুম। কারণ আমার চোখের সামনে তখন ভাসছে খুড়তুতো দুই বোন পুতুল-বীথির পাঁচ দুগুণে দশটা করে ফ্রক, কোনটা ফ্রিল দেওয়া, কোনোটার কুকুরের কানের মতো কলার, কোনোটাতে সিল্কেব ওপর মিকি মাউস, এক একটায় একেকরকম চমক। তাদের পাশাপাশি আমি ওই সোনালি অর্গ্যান্ডির ফ্রক পরে রো---জ!

'কেন তুমি এত জনের এত জামা করবে? কেন খালি আমার বিনুর আর দিদির আর তোমার আর বাবার করবে না! কেন? কেন? কেন?' আমার সেই নেই আঁকড়া কান্নার মধ্যে মা সেলাইকলের ওপর গালে হাত দিয়ে চুপটি করে গম্ভীর মুখে বসে থাকত। দিদি জোর করে আমাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত, আর ঠিক এমনই সময়টা বাবা এসে দাঁড়াতেন, 'কী হল? টুনি এত কাঁদছে কেন? ও কি, বুলা, টুনিকে ওমনি করে এক পা ধরে টানছিস কেন?'

'দ্যাখো না বাবা, টুনি মাকে কাজ করতে দিচ্ছে না, পুজোর আর ঠিক পনেরো দিন বাকি! এ সবই তো আমাদের শেষ করতে হবে, না কি।'

দিদি মাকে সাহায্য করত। বোতাম বসানো, বোতাম-ঘর করা, হেম-সেলাই করে দেওয়া, সিল্কের জিনিস তৈরি করার সময়ে টানটান করে ধরে বসে থাকা, স-ব। বাবা সমস্ত শুনে গম্ভীর হয়ে যেতেন। পরদিন দুপুরবেলা গলদঘর্ম হয়ে কোথা থেকে ফিরে এসে ডাকতেন, 'টুনি-ই, টুনটুনি-ই, টুন-টুনটুনি-ই!' আমি ছুটে যেতে হাতে একটা বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, 'দ্যাখো তো টুনি, পছন্দ হয় কি না!' বাক্সের ভেতর থেকে বেরোত সাদা-ধবধবে সুইস-সিল্কের লেস-দেওয়া স্বর্গীয় ফ্রক, তার জায়গায় জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট এমব্রয়ডারির ফুলের গোছা।

ফ্রকটা তুলে নিয়ে তার ভেতরে নাক ডুবিয়ে আমি শুধু সেই গন্ধটুকু নিতুম প্রাণ ভরে, হারিয়ে

যেতুম গন্ধটার ভেতর। আমি তখন একটা খুশির পুতুল, ডুবে যাচ্ছি সুখের সাগরে। আর ঠিক সেই সময়ে মা এসে দাঁড়াত, 'এ কী গো? এ ফ্রক কোত্থেকে আনলে? এ যে অনে-ক দাম! কোত্থেকে?'

নিউ মার্কেট।

ইসস্‌স! কত নিল?

সুন্দর তো বটেই! দামটা কত সুন্দর সেটাও আমার জানা দরকার!

পঁয়তাল্লিশ টাকা।

কী বললে? পঁয়তা-ল্লিশ টাকা? এতে যে ওর তিনখানা ফ্রক হয়ে যেত গো! কোথা থেকে...

আঃ, চুপ করো না এখন!

'এর পরেও আছে জুতো, মোজা, রিবন, পুজোর ক'দিনের নানা বায়না...', মা কথা শেষ না করে চলে যেত।

রাত্তিরে দিদি গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলত, 'টুনি, বাবার না একটা খুব দরকারি জিনিস কেনার ছিল, সেটা বাদ দিয়ে তোর অত দামি ফ্রকটা কিনে এনেছে। তুই কাল বাবাকে বলবি ফ্রকটা ফেরত দিতে, বলবি ওটা তোর পছন্দ নয়, হ্যাঁ?'

'কী করে মিছে কথা বলব? আমার যে জামাটা খুব পছন্দ দিদি? বাবা দরকারি জিনিসটা অন্য টাকা দিয়ে কিনুক না!'

দিদি বলত, 'বলবি সাদা জামা আমার পছন্দ না, তুই আর জামা নিবি না!'

আমি তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলতুম, 'তোমরা সবাই বিচ্ছিরি। আমার জামাটা এত পছন্দ, তবু ওটা অপছন্দ বলতে বলছ। পুতুল, বীথি, পরি, দীপু, মঞ্জু সবাই একেক দিন একেকটা জামা পরবে। সব্বাই। খালি আমি...'। 'কথা শেষ করতে পারতুম না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকতুম। কান্নার আওয়াজে মা ঘরে ঢুকে বলত, 'বুলা। টুনি কাঁদছে কেন রে? বকেছিস?'

'দ্যাখো না মা' আমি নাকেকান্না চড়াবার আগেই দিদির হাত কঠোরভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দিত, মা একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে বলত, 'বুলা, ওকে বকিস না। ছেলেমানুষ..'

পুজোর কদিন ভারি মজা। বুড়ির মাথার পাকা চুল, হাওয়া মেঠাই, পাঙ্খা বরফ, লম্বা বেলুনের চ্যাঁ চোঁ, গ্যাস বেলুন। ঠাকুরদালানে ঝাড়বাতির নীচে ডাকের সাজ পরে ঠাকুর ঝলমল করছে। কোনো একজন কাকিমা ডেকে বলছে, 'টুনি এই সিল্কের জামা তোকে কে দিল রে?'

'কে আবার দেবে? আমার বাবা।' বাবার গর্বে ঝকমকে মুখ আমি দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছি বন্ধুদের ভিড়ে আমার ডাকের সাজে। সাদা ধবধবে সিল্ক, তাতে সরু লেসের পাড়, চকচকে সুন্দর লজেন্স লজেন্স গন্ধঅলা এমব্রয়ডারির নানান রঙের ফুলের গোছা। 'টুনি—টুনি-ই', বীথি ডাকছে বুঝি। 'কী সুন্দর তোর এই জুতোটা!' 'আইরিন এর নাম। বাটার নতুন জুতো, বাবা কিনে দিয়েছে। আমার বাবা!' সগর্বে বলতে বলতে আমি দৌড়ে নামব, ঠাকুরদালানে চামড়ার জুতো পরে ওঠা বারণ। তার সামনের চত্বরে হাজার মুখের মেলা, তারই মধ্যে কোনো কোনো চোখ আমার ওপর, আমার ফ্রকের ওপর আটকে যাবে, কেউ হয়তো বলে উঠবে, 'ফ্রকটা কী সুন্দর, দেখেছ? মিনুকে এই রকম একটা...'

নতুন কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল মাথায় দিয়ে, পায়ে-আলতা মা চলে যাচ্ছে ঠাকুরদালানের দিকে। হাতে পেতলের ভারী থালায় কত কী রহস্যময় পুজোর জিনিস। বাবা কোরা কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে ঠাকুরমশাইয়ের পেছনটিতে বসে, বিনুর হাত থেকে ফিরোজা রঙের গ্যাস বেলুনটা হুউশ্‌শ্‌শ্‌! ধনেখালির হলুদ ডুরে শাড়ি পরে দিদি এসে দাঁড়াচ্ছে। আমার দিদি, আরও

অনেক দিদি। খুড়তুতো, জাঠতুতো, পাড়াতুতো। কেউ সিল্ক, কেই অর্গ্যান্ডি, কেউ বেনারসিই। মহা সমারোহে সন্ধিপুজো শুরু হয়ে গেল। সেই ধুমধামের সন্ধিপুজোর ধুনো-গুগ্‌গুলের চোখ-আঁধার করা আবছা পর্দার মধ্যে থেকে ঘোমটার ভেতর মায়ের ভক্তিনম্র, অনিন্দ্য মুখখানা মাঝে মাঝে দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলছে, 'বুলার শাড়িটা বড্ড খেলো। পুজোর কাজে নষ্ট হয়ে যাবে বলে পরেছে না কি রে?' কে যেন তার জবাব দিচ্ছে, 'দূর, কোথা থেকে দামি শাড়ি পাবে!' ...কথাগুলো তাদের পুরো অর্থ নিয়ে আমার ছোট্ট মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু শরীরে কেমন একটা আসোয়াস্তি, রাগে দুঃখে আস্তে আস্তে কান গরম, মাথা ফাঁকা! আমার দিদির শাড়িটা খেলো! মানে বাজে? কেন? কত সুন্দর দেখাচ্ছে যে দিদিকে! শাঁখে ফু পাড়ছে দিদি সমানে, গালগুলো গোল টোপর হয়ে ফুলে উঠছে, কপাল, নাক, থুতনি সব দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো লাল! 'কোথায় চললি টুনি?' কে যেন পেছন থেকে বলছে চেঁচিয়ে। ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে তুমুল হুল্লোড়ে, কাঁসর বাজছে কাঁই না না কাঁই না না। আমি গরিব, আমরা গরিব, দিদির শাড়িটা খেলো, বিনুর হাফপ্যান্ট ঝলঝলে, বাবার খালি গায়ে কোঁচার খুঁট, এই পুজো, এই হই-চই এসব পুতুল বীথিদের জন্যে, মঞ্জু-দীপুদের জন্যে, মাধুদি, নীলমাসি, নতুন কাকিমা, গীতালিদিদের জন্যে। আমি চলে যাচ্ছি সাদা সিল্কের ফ্রকের ঠাট্টা শুনতে শুনতে আমাদের উঁচু ঘরের অসীম নিঃশব্দ পরিসরের মধ্যে আমার কান্না লুকিয়ে ফেলতে।

পুজো ফুরিয়ে গেলে আবার সব ভুলে যাই। তখন দিদির অনেক যত্নে তুলে-রাখা মলাট দেওয়া বই স্কুলব্যাগ, টিফিনকৌটোয় ঘুগনি, বাবার কাছে অঙ্ক-ইংরিজি, বিকেলবেলায় মণিমেলা, দিনগুলো সব একে অপরকে হারাবার জন্যে দুদ্দাড় ছুটত, আমিও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতুম। আর সারাদিন ছোটার ক্লান্তিতে, আনন্দে রাতের কোলে, মায়ের কোলে দিদির কোলে ঢলে পড়তুম অবাধ সুন্দর শীতল বিস্মরণের অথই দিঘিতে।

কিন্তু গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটির সময়ে গরিব-বিছেটা আবার আমায় কটাস কটাস করে কামড়াত। পুজোর সময়ে না হয় সব শরিকে মিলে মল্লিকবাড়িতে বিখ্যাত একশো বছুরে পুরোনো পুজো, কোথাও যাওয়া যাবে না। গরমের ছুটিতে না হয় বাবার আপিস, বড়োসায়েব কিছুতেই ছুটি দিতে চায় না, কিন্তু বড়োদিন? তখন যে কলকাতায় ঝুড়ি-ঝুড়ি কমলালেবু, থইথই করছে আকাশনীল। এখানে সেখানে চড়ুইভাতি। স্কুলের বন্ধু মিতালি বলত, 'তনিমা, তোরা শীতে কোথাও যাবি না? আমরা এবার গিরিডি যাচ্ছি। উশ্রী জলপ্রপাত আছে, খু-উ-ব সুন্দর জায়গা! ' কেয়া বলত, 'আমরা যাচ্ছি হাজারিবাগ, জঙ্গল দেখব, বাগানে লুকোচুরি খেলব আর রোজ মুরগি, রোজ ...।' শিপ্রা বলত, 'দূর, হাজারিবাগ, গিরিডি ওসব তো হাতের কাছে, ট্রেনে চড়লি নেমে পড়লি। কোনো মজাই নেই। আমরা যাব, দু-রাত্তিরের পথ, দিল্লি! লালকেল্লা দেখব, কুতুবমিনার দেখব, তাজমহল দেখব চাঁদের আলোয়, বাবা বলেছে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবতুম কুতুবমিনার! কুতুবুদ্দিন আইবক তৈরি করেছিলেন, ইলতুতমিস শেষ করেন সেই কুতুবমিনার! লালকেল্লা! যার ভেতরে ময়ূর সিংহাসন, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই আম! ওসব তো পুরোনো-হয়ে যাওয়া ইতিহাস বইটার পাতায় থাকে! দেখা যায়! ওদের দেখা যায়! আর তাজমহল? 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' সেই তাজমহল? সেইটা দেখবে শিপ্রা? যে রোজ ইস্কুলে আমার পাশে গা ঘেঁষে-বসে থাকে, আমার ঘুগনি খায়, আমাকে গোলাপজাম খাওয়ায়, সেই শিপ্রা?

বাবা! বাবা! এবার বড়োদিনের ছুটিতে আমরা কোথায় যাবো?' বাবা অবাক হয়ে চেয়ে বলতেন—'অ বুলা। দেখ তো ছোট্ট টুনটুনি পাখিটা কী যেন কিচিরমিচির করছে।'

না বাবা, সত্যি বলো না, শিপ্রারা যাচ্ছে, মিতালিরা যাচ্ছে। সবাই যাচ্ছে যে!

সবাই চলে যাচ্ছে? তাহলে তো সারা কলকাতাটাই গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা হয়ে যাবে রে! সুদ্ধু আমরা কজন? বেড়াব, খালি বেড়াব।

হুঁউ—ঠাট্টা নয়, বলো না!

দিদি হঠাৎ তার বাটনা-বাটা হলুদ হাত ছোটো লাল গামছায় মুছতে মুছতে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবাকে বিরক্ত করছিস কেন রে টুনি। দেখছিস না হিসেবের কাজ করছে!

বাবাকে, মাকে ভয় পেতুম না, কিন্তু দিদিকে বিলক্ষণ।

ও দিদি, বাবাকে বলো না বড়োদিনের ছুটিতে আমাদের দিল্লি নিয়ে যাবে! লালকেল্লা দেখব, তাজমহল ... বলো না!

দিদি গম্ভীরভাবে বলত, 'তোর কোন বন্ধু যাচ্ছে?'

শিপ্রা তো! শিপ্রা যাচ্ছে!

তাই ওমনি তোকেও যেতে হবে। লোকে যা যা করবে তোকেও ঠিক তাই তাই করতে হবে? বাঃ। লোককে নকল করে যারা তাদের কী বলে জানিস?

ভয়ংকর কিছু বলে নিশ্চয়ই। আমি আর কথা বাড়াতে সাহস পাই না। কিন্তু কান্না গিলে নিতে নিতে ভাবতে থাকি—দিল্লি যাওয়াটা তো খারাপ কাজ নয়। কোনোমতেই নয়। তাহলে? রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে মায়ের গলা শুনি,'সত্যি, কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি থেকেও যদি...' দিদির গলা—

'তুমি চুপ করো তো মা! এই করতেই বাবার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে ... ছোটোরা তো ওরকম অবুঝপনা করবেই ...!' আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ছোট্ট একটা বিছে বুকের ভেতরে নিয়ে। বিছেটা কুটুস কুটুস কামড়াবে, গর্তের মধ্যে সেঁধোবে, আর ঘুমের মধ্যে কে যেন বলতে থাকবে তোদের টাকা পয়সা নেই, তোরা কী করে ... তোর বাবার টাকাপয়সা নেই, তোরা কী করে . .। ট্রেনের চাকার ঘ্যানঘেনে আওয়াজের মতোই সারা রাত সেই শব্দগুচ্ছ আমার আধ-ঘুমন্ত অভিমানী মাথার মধ্যে গুমগুম করে বাজবে। আমি যাচ্ছি, আমি ট্রেনে চড়েছি ঠিকই। কিন্তু সে ট্রেন দিল্লি যায় না, হাজারিবাগ যায় না, উশ্রী যায় না, এক নিদারুণ দুঃখের দেশে, নেই-নেই গরিবের দেশে নিয়ে যায়। সেখানে বাবাদের টাকা থাকে না, দিদিদের শাড়ি খেলো হয়, খাটো শাড়ি শেমিজ পরে রাতুল-চরণে-আলতা মায়েরা অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়ায় কাজের পাকে।

সেবার কিন্তু বাড়িতে ভারি একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল। বিদেশি টিকিট মারা নীলচে নীলচে চিঠি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসত। একদিন ওই রকম একটা চিঠি নিয়ে বাবা ঝলমলে মুখে দালানের শেষে রান্নাঘরের মুখে এসে দাঁড়ালেন, 'ওগো শুনছ। ফুটকুন আসছে যে!'

মা তোলা উনুনে দুধ বসিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে আরও ঝলমলে মুখে বলল, 'ফুটকুন ঠাকুরপো? সত্যি!'—'হ্যাঁ গো! সব্বাই। ফুটকুন। স্টেলা, ছেলেমেয়ে।' মা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমাদের এখানে? সে কি গো? মেমসায়েব ... তার সাহেব মেম ছেলেমেয়ে ... কোথায় থাকবে? কী খেতে দেব!'

বাবা হাসিমুখে বললেন, তবে শোনো ফুটকুন কী লিখেছে :

> প্রিয় মেজদা, এবার দেশের এবং আমাদের বাড়ির সাবেকি পুজো দেখাতে ফ্যামিলি নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তোমার কাছেই থাকব। অন্য কোথাও তো আমাদের জায়গা হবে না! আমাদের থাকা নিয়ে একদম উদ্বিগ্ন হবে না। আমি লাউশাকের চচ্চড়ি খাব মটর ডালের বড়া দিয়ে, লাউচিংড়ি, পটোল ভাজা, মৌরলামাছের বাটি চচ্চড়ি .. যদি সম্ভব হয়, আর এরা খায় আলুসেদ্ধ, বিন আধসেদ্ধ, কাঁচা টম্যাটো, কাঁচা গাজর। শুধু জলটা একটু ফোটানোর ব্যবস্থা করবে। পুজোটা

কাটিয়ে আমরা একটু বাইরে বেরোব। তারপর ফিরে আসব। তিন সপ্তাহের ছুটি। মেজবড়াদর চরণে আমার প্রণাম দিও। বুলা কত বড়ো হল? তোমার ফুটকড়াই দুটোকে তো আমি দেখিইনি।
ইতি তোমাদের ফুটকুন।

দিদিও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে বলল, 'আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বাবা, তুমি ভেবো না। সাহেবকাকা আর স্টেলাকাকিমা থাকবে আমাদের ঘরে, তোমাদের ঘরে থাকবে লীলা আর সুভাষ, বৈঠকখানার তক্তপোশে বিনু আর তুমি, মেঝেতে বিছানা করে আমি মা আর টুনি।'

বাবা বললেন, 'দেখলে তো, হয়ে গেল! বুলা না হলে কিছু হয়!' বলে বাবা মধুক্ষরা দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাইলেন।

জন্মে থেকে, বোধহয় আঁতুড়ঘর থেকে শুনছি—সাহেবকাকা, সাহেবকাকা, ফুটকুন ফুটকুন! এ বাড়ির এক ছেলে, আমাদের জ্যাঠতুতো, না খুড়তুতো, না কী কাকা, ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে নাকি আর ফেরেননি, ওখানেই মেম বিয়ে করে রয়ে গেছেন। তাঁর সাহেব ছেলে, মেম মেয়ে। তাঁর বাবা রেগেমেগে তাঁকে ত্যাজ্য করে দিয়েছেন। নিজের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, খালি মেজদা-মেজবউদি বলতে সাহেবকাকা অজ্ঞান। নিয়মিত চিঠি লিখে খোঁজখবর নেন, সে বোধহয় আজ সতেরো আঠারো বছর হয়ে গেল। সেই সাহেবকাকা, মেমকাকি আসছেন।

আমার আর বিনুর তো বুক গুড়গুড় করতে লেগে গেল। বাবা কোথা থেকে টাকাকড়ি জোগাড় করে বাথরুমে একটা কমোড আর একটা ছোট্ট বেসিন বসালেন। আমি আর বিনু চুপিচুপি হেসে গড়াগড়ি খাই। সাহেব মেমরা উবু হয়ে ড্যাশ বসতে পারে না। চেয়ার চাই। তাকে বলে কমোড। হিহি! হিহি! আমাদের হাসি আর ফুরোতেই চায় না। তবে হাসির মধ্যে একটু ভাবনাতেও পড়ে গেছি। সাহেব দাদা-দিদিদের সঙ্গে কথা বলব কী করে? দু ভাইবোনে মুখস্থ করতে থাকি—হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? মাই নেম ইজ মিস টানিমা মল্লিক, মাই নেম ইজ মাস্টার বিনায়ক মল্লিক। হোয়্যার ডু ইউ লিভ? আই লিভ অ্যাট জোড়্যাবাগান ইন ক্যালকাটা। তারপর বাসস্থানের প্রশ্নোত্তরটা দরকার লাগবে না বুঝে দুজনে আবার হাসতে থাকি। হুইচ ক্লাস ডু ইউ রীড ইন? আই রীড ইন ক্লাস ফোর, আই রীড ইন ক্লাস থ্রি। বলতে বলতে বিনুটার ধৈর্য শেষ হয়ে যায়, সে হাত পা ছুড়ে বলে ওঠে হ্যাট, ম্যাট, ক্যাট, কুট, গুট, দ্যাট, র‍্যাট, ফাই, হাই, নাই, হাউ, কাউ, হাঁউ, মাউ, খাঁউ বলতে বলতে দুপাটি দাঁত বার করে, বগলে রবারের বল নিয়ে দে ছুট। বাবা একদিন শুনে ফেলে হেসে বাঁচেন না, বললেন, 'তোদের অত ইংরেজি বলতে হবে না, তোরা বাংলাতেই কথা বলবি, হড়বড় না করে একটু স্পষ্ট করে, ধীরে ধীরে বলবি, তাহলেই বুঝতে পারবে। সাহেব নাম হয়ে গেলে কী হবে! ফুটকুন কোনো দিন সাহেব ছিল না। হবেও না।'

চিকচিকে সিল্কের শাড়ি পরা, ঘাড়ের কাছে নুটু-নুটু খোঁপা বাঁধা স্টেলাকাকিমা চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতো উঁচু গর, এর্কম আর্কিটেকচার, বিউটিফুল স্ট্যাচুজ, এ তো ক্যাস্‌ল-এ থাকে। তুমরা এ বাড়ি পাবলিক শো-এর জন্য ওপন করে ডাও না কেনো? আমাদের ওখানে কোতো এর্কম বাড়ি ডিউক, ব্যারনরা পাবলিকের জন্যে ওপন করে দিচ্ছেন, তাইতে মেইনটেনান্সের খরচা উঠে আসে।'

ফুটকুনকাকা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'স্টেলা তুমি আর এখানে তোমার ইংরিজি পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই খেলালে। ইতিহাসের পাতা এখানে জীবন্ত হয়ে রয়েছে ডারলিং, মিউজিয়ম হয়ে নেই।'

স্টেলাকাকিমা বলেন, 'পাটুয়ারি কী বললে? কুনও গালি নোয় তো!'

বাবার দিকে তাকিয়ে একচোখ টিপে ফুটকনুকাকা বললেন, 'কী যে বলো! তোমাকে বাংলা

গ্রামারটা এখনও শেখাতে পারলুম না। বারোয়ারি পুজো বলছিলুম না। আমাদেরটা যদিও মল্লিকবাড়ির পুজো, এখন বারোয়ারিই হয়ে গেছে। কতজন শরিক এখন মেজদা?'

কথা ঘোরাতে পেরে ফুটকুনকাকা খুব খুশি। বাবা বললেন, 'সাঁইত্রিশ জন।'

লীলাদি বলল, টুনি! হাউ কিউট : শী ইজ এ লিটল রেড রাউডিং হুড?

ওরা কেউ কিছুতেই সেদ্ধ খাবে না। সুভাষদা তার বাবার কথা শুনে বলল, 'ড্যাড বোরাবোর একটু সেলফিশ থাকছে। আমরা সোব কাবো।' স্টেলাকাকিমা বললেন, 'মেড্‌ডি, কালি জাল ডিয়ো না।'

এইভাবেই বিশাল বাড়ির অলিগলি আনাচ-কানাচ লম্বা-চওড়া দালান, জমাদারের ঘোরানো সিঁড়ি, তিন চারটে ফুটবল খেলার মাঠের মতো ছাদ আর এ কোণে ও কোণে বিস্ময়বালক-বিস্ময়বালিকা এঞ্জেলের মূর্তি, দেওয়ালগিরি, প্রাচীন পট, ফোটোগ্রাফ এবং সর্বোপরি দুর্গাপুজো দেখতে দেখতে আমাদের ফুটকুন কাকাদের পরিবারের সঙ্গে ভীষণ আলাপ হয়ে গেল। আমার দিদি বুলা লীলাদির ভীষণ বন্ধু, সুভাষদার সঙ্গে বিনুর গলায় গলায় ভাব, দুজনে খালি ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়, আর বেড়ায়। উত্তর কলকাতার সব প্রাচীন সরু গলিঘুঁজি, সুভাষদার দেখা চাই। আর আমি স্টেলাকাকিমার আদুরে। তিনি খালি বলেন 'মেড্‌ডি তুমার এই টুনি ডল আমি নিয়ে যাবো।'

মা বলে, 'যাও না নিয়ে। যা কিচিরমিচির করে!'

'সত্যি কিন্তু। তোখোন আর নো করতে পারছে না।'

মা হাসত। আমি ভাবতুম ভালোই তো! ফুটকুনকাকাদের কী সুন্দর বাগানঅলা বাড়ি। বাকিংহাম প্যালেস, টেমস নদী, টিউব ট্রেন। আমি যাব, লীলাদির মতো টুকটুকে ফর্সা হয়ে যাব, মেমসাহেব একেবারে, কত জামাকাপড়, কত বেড়ানো .... ভালোই হবে বেশ।

ফুটকুনকাকা বললেন, 'পুজোর পর টিকিট কাটছি গোপালপুর অন সি। তোমরা সকলে আমাদের সঙ্গে চলো।' বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন---'একাদশীর দিন থেকেই অফিস ফুটকুন, কোনো উপায় নেই।' মা হেসে বলল, 'তবেই-বোঝ, তোমার দাদাকে দেখাশোনা করবার একটা লোক চাই তো! তুমি বরং বুলা, টুন্টি বিনুকে নিয়ে যাও।'

লীলাদি বলল, 'বুলা, য়ু মাস্ট টেক আ হলিডে।'

দিদি হেসে বলল, 'পরের বার লীলা, পরের বার, ডোণ্ট মাইন্ড।' আমি জানি দিদি যাবে না। দিদি ভীষণ ঘরকুনো। অবশেষে অনেক আলোচনার পর ঠিক হল আমি আর বিনু যাব। মহানন্দে আমাদের বাক্স গুছোনো হল। আমার আর বছরের সাদা সুইস ফ্রক তো, এখনও তেমনি সুন্দর আছে। সোনালি অর্গান্ডির ফ্রকটাও। তারপর স্টেলাকাকিমা আমাদের জন্য কত রকমের জামা এনেছেন, তাদের বলে ড্রেস। বিনুকে আর চেনা যাচ্ছে না। আমিও যখন লম্বা স্ল্যাক্স পেন্টুল আর নকশা-করা টপ পরে ছোটো চুলে পনি টেল বেঁধে ফিটফাট হয়ে গেলুম, দিদি আদর করে বলল, 'দ্যাখ তো টুনি, এবার তোকে কেমন ছবির বইয়ের খুকুর মতো দেখাচ্ছে!' আমি আর বিনু মহা গর্বে উৎফুল্ল হয়ে দু পকেটে হাত গুঁজে ট্যাকসিতে উঠে পড়লুম। ভীষণ তাড়া। ওদিক থেকে মিতালি ছুটতে ছুটতে আসে, 'তনিমা, তনিমা কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'সমুদ্র দেখতে সমুদ্র। গোপালপুর অন সি।' আলো-আলো মুখে বলতে থাকি।

ট্রেন চলেছে স্নুইশ্‌শ্ করে, শব্দ নেই। মোটা গদির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। কী সুন্দর ঠান্ডা। দু হাত জড়ো করে বুকের কাছে ধরেছি। লীলাদি অমনি গোলাপি রঙের তিনকোনা শাল আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। তার কোনো ওজন নেই, অথচ কী সুন্দর গরম। কাচের বাইরে কিছু দেখা যায় না। খালি আমাদেরই ছবি। কামরার মধ্যে আলো, স্টেলাকাকিমার লালচে সাদা মুখ, লীলাদির লাল

ব্লাউজ, কালো স্কার্ট, সুভাষদার সোনালি চশমা, বিনুর ছটফটানি। কামরা জুড়ে ওদের অবিশ্রান্ত উত্তেজিত ইংরেজি, যার একবর্ণ বুঝতে পারছি না। বাস্কেট থেকে নাম না-জানা সুগন্ধের খাবার, স্পেনসেস নামের হোটেলের নাম লেখা বাক্স, তারপর একটা পুরো বাক্স জুড়ে দুলতে দুলতে ভুলতে ভুলতে ঘুম। ঢুলতে ঢুলতে কখন জাগি, কখন আবার ঘুমের মধ্যে গুলিয়ে যাই, নিজেই জানি না। এমন ঘুম কখনও ঘুমোইনি। এমন দোলা কখনও দুলিনি। এমন জাগাও কখনও জাগিনি। সিঁদুরের গোলার মতো সূর্য। মাঠের পরে মাঠ, ডোবা, খাল, বিল, নদী, নালা ঢকাঢক ঢকাঢক, পুল, সূর্য পানকৌড়ি, সাদা বক, কালো ফিঙে, সূর্য, মাঠগুলো দূরে সরে যায়, আবার কাছে চলে আসে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য।

বিনু চলেছে, টুনি চলেছে, টুনি চলেছে, বিনু চলেছে। লীলাদি কোলে বইয়ের পাতায়, বিনুর হাতে লঞ্জেসছানা, মেমকাকিমা সাহেবকাকা, সুভাষদাদা, খবর পড়ে, লাফিয়ে নামে লাফিয়ে ওঠে, টুনি চলেছে অনেক দূরে, বিনু চলেছে অনেক দূর, পুরনো শহর পুরনো বাড়ি, নোংরা গলি, ধ্যাত্তেরিকা, ঘ্যাঙর চবকা ঘ্যাঙর, ইদুজ্জোহা ইদ-উল ফিতর, টুনি-বিনুর পেবথম টুর, দেখতে দেখতে বেরগামপোব।

হোটেলের গাড়ি এসেছে টুনিদের নিয়ে যেতে। মস্ত বড়ো ভ্যান গাড়ি যেতে যেতে অবশেষে তার চাকা বসে যায় বালিতে। টুনিতে বিনুতে চুপিচুপি বলাবলি করে - ঠিক যেমন ট্রেনের গদিতে ওরা ঢুকে যাচ্ছিল, তেমনি গাড়িটা বালির গদিতে ডুবে যাচ্ছে। বলতে বলতে ওরা হেসে ওঠে। ফুটকুনকাকু বলেন, 'হাসলি কেন রে টুনটুনিটা?' কাকিমা বলেন, 'ছুটোবা শুদুশুদু হাসে, কোনও কেনো নাই।' তারপর হঠাৎ দিগ্‌বলয়ে এক অবাক দৃশ্য, অবাক শব্দ। টুনি-বিনু বিস্ময়ে চুপ, একদম চুপ। সুভাষদা লাফিয়ে নামছে। ও ও করে ছুটে যাচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে। কাকিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'ওহ ইটস ওয়ান্ডারফুল।' লীলাদি বলে, 'ইটস বেটার দ্যান ব্রাইটন।' ফুটকুনকাকা টুনি-বিনুর দিকে তাকিয়ে এক চোখ টিপে বলেন, 'দেখতে হবে তো, কাদের দেশের সমুদ্দুর!'

সেই হোটেলটাও অবাক, অবাক তার ঘরদোর, বাথরুম, বিছানা, জানলা, বারান্দা, তার লাউঞ্জঘর, খানাপিনা, পামগাছের সারি। কিন্তু সবার থেকে আশ্চর্য ওই সমুদ্দুর। তার সামনেটা যেন গঙ্গাজলের সঙ্গে সাবানের ফেনা মেশানো, আরেকটু দূরে অদ্ভুত সবুজ, যেন তার তলায় আলো জ্বলছে, তার তারপর নীল, নীল চিকচিকে ময়ূরকণ্ঠী নীল। বালির পাড়ে কত বালিয়াড়ি। মাথায় বসে সবুজ নীল, নীল সবুজ ডিঙি ভেসে যায়। ভেসে ফিরে আসে। দূরে ট্রলার। এখানে চান করো না, পাথর আছে। বিনু শুনছে না, সুভাষদার সঙ্গে কালো পাথরের ওপর বসে বসে হাসতে হাসতে ঢেউ খাচ্ছে। টুনির অত সাহস নেই। সে কাকুর ছোটো প্যান্টের কিনারা ধরে জলে নামে। হুশ্ করে মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়, উঠতে না উঠতে আবার ঢেউ। সারাদিন, সারা বিকেল। সেই বিশাল পারাবারের তীরে টুনিরা করে খেলা। অদ্ভুত খোলা পোশাক পরে, সাদা হাত সাদা-পা, লীলাদি, মেম-কাকিমা, বালির ওপর রোদ পোয়ায়, জলে নেমে যায়, ভালুকের মতো রোঁয়াওলা নরম তোয়ালে জড়িয়ে উঠে আসে, মাথায় কেমন চুল ঢাকা টুপি।

খেলতে খেলতে কাছাকাছি হলে বিনু কুলকুল করে হাসে, 'দ্যাখ টুনি আমরা কেমন বিলেতে এসেছি।' টুনি যদি বলে, 'ভ্যাট!' বিনু তখন আঙুল তুলে দ্যাখায়, 'ওই দেখ কত্ত মেম, কত্ত সায়েব।' সত্যি। বালুবেলায় স্টেলাকাকিমা লীলাদির মতোই আধশোয়া হয়ে থাকে কত মেম, চোখে সানগ্লাস, ঢেউয়ের মাথায় লাল-নীল ছোটো প্যান্ট পরে নাগরদোলা খায় কত সাহেব! টুনিরা কাঁটা চামচে খায়, কোলে ন্যাপকিন পেতে। ঠিক কেয়াফুলের মতো ন্যাপকিন গেলাসে থাকে। গাল না ফুলিয়ে, শব্দ না করে খেতে শিখিয়েছে লীলাদি। বেয়ারারা সেলাম করে। তাদের মাথায় পেখমঅলা

টুপি। কিন্তু যখন খুব বেশি বিলেত বিলেত লাগে তখন টুনি হাঁ করে ফুটকুনকাকার আর বিনুর তামাটে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। রাত্তিরবেলায় লীলাদির পাশের খাটে শুয়ে সমুদ্রের গর্জন শোনে। কেমন অচেনা, অজানা, বিলেত-বিলেত। টুনি কি সত্যি-সত্যি তবে নিজের দেশ, নিজের শহর কলকাতা ছেড়ে বহুদূরে বিলেতে চলে এসেছে? ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়, জানলা দিয়ে থই-থই জল দেখা যায়। হুশ্‌শ্‌শ্‌ করে বালির ওপরটা ফেনায় সাদা করে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। ব্যালকনিতে বসে লীলাদিদের হ্যাটম্যাটক্যাটের মধ্যে বসে বসে ব্রেকফাস্ট। কিছুকিছু এখন বুঝতে পারা যায়।

ফুটকুনকাকা—কী স্টেলা, লীলা, এখন কেমন লাগছে?

কাকিমা—খুব ভালো। ফীলিং অ্যাট হোম।

কাকা—তাহলে বলো জোড়াবাগান তোমাদের ভালো লাগেনি।

কাকিমা—ডোরাবাগান ইজ অল রাইট। কিন্তু এখানে এসে শাড়ি খুলে ফেলতে পেরে, আর অত লোকের কিউরিয়সিটির বাইরে এসে আমার স্বস্তি হচ্ছে।

লীলাদি—আসলে ড্যাড, ভালো লেগেছে, কিন্তু বিদেশে অ্যাডভেঞ্চারের মতো।

ফুটকুনকাকা—তাহলে বুঝে দ্যাখো, তোমাদের জন্যে সারা জীবন বিদেশে পড়ে থাকতে আমার কেমন লাগে! আর এই এক সপ্তাহের কলকাতা-মল্লিকবাড়িই বা আমার কেমন লেগেছে!

কাকিমা—আয়্যাম রিয়ালি সরি ফর য়ু।

সুভাষদা—আমি ঠিক করেছি গ্রাজুয়েশনের পর ইন্ডিয়া টুর করব, ইয়োরোপ নয়। ওই সব সরু সরু গলি আর বড়ো বড়ো ছাদ আমাকে দারুণ ফ্যাসিনেট করেছে। মানুষরাও। আঙ্কল, আন্টির মতো মানুষ আমি দেখিনি। সাধারণ মানুষেরাও অদ্ভুত। কিছু কিছু লোক আছে জাস্ট একটা ল্যাকির মতো, কেউ কেউ আবার দেখবে যেন গড, কুকুর-বেড়াল কিংবা ইন্যানিমেট অবজেক্টের মতো মানুষও দেখেছি।

ফুটকুনকাকা—তোমরা বিনু-টুনির সঙ্গেও কথা বলো। ওরা লেফট-আউট ফীল করবে।

লীলাদি—ওঃ, তাও তো বটে। টুনি, এখানে তুমার কেমন লাগছে?

টুনি—ভীষণ ভালো।

—বিনু তুমার?

বিনু—আমি বড়ো হয়ে বিলেত যাব। বিলেতটা তো এখানকার মতো?

সুভাষদা—সোবটা আছে না বিনু। কিছু কিছু আছে।

ফুটকুনকাকা (হেসে)—ভালো, সুভাষ আসছে ইন্ডিয়ায়, বিনু যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। বেশ একটা ইয়ুথ এক্‌স্‌চেঞ্জ প্রোগ্রাম করা যায়। টুনি, লীলা, তোমরা কী করবে, বলো? ওহ্ লীলা তো আবার...

এবার ওরা চারজনেই কোন্ লুকোনো কারণে ভীষণ হাসতে থাকছে। বিনু কিছু না বুঝে হাসতে হাসতে ব্যালকনির রেলিং-এর দিকে ছুটে গেছে। টুনির হাতে মিল্‌ক শেক, গোঁফে ফেনা লেগে গেছে, ন্যাপকিন দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে লীলাদি। গোপালপুরের এই বিলেত অবশেষে তার কাজুবাগান, বালিয়াড়ি, আরামের হোটেলবাড়ি এই সব নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে নীল সমুদ্দুরের ওপর কালো কালো কাস্তের মতো ডজনে ডজনে নৌকা, রাত্তিরে কালো জলের ওপর বাতিঘরের ঘুরে ঘুরে টর্চ ফেলা, ট্রলারের আলো, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের নাচ। পড়ে থাকছে অনেক পেছনে গোপালপোর অন সি, বেরহামপোর নীল সমুদ্দুর, সবুজ সমুদ্দুর, টুনির চোখ গলছে চুপিচুপি। ফিরে চলেছে, ফিরে যেতেই হয়, নজরমিনার থেকে হাওয়া-বেলুন ওড়ানো দেখা আর হবে না, আর হবে না ঢেউয়ের চূড়ায় পৃথিবীর রানি হওয়া, জলকন্যে হওয়া, বিশাল সমুদ্দুর চলে

যাচ্ছে, কাছে চলে আসছে পুরোনো শহর, পুরোনো বাড়ি, পুরোনো জীবন। ছেঁড়া মলাট, ফাটা বেঞ্চি, কালির দাগ। খ্যাংরা ঝাঁটা ঝুরো গোঁফ, টাকমাথা, টিউবয়েলের ঘটাং ঘটাং, হ্যাঁচচো হাঁচি, ফিচকে হাসি। মোড়-জটলা, বস্তি-ঝগড়া, সরু গলি।

টুনি-বিনুকে নিয়ে বাঘবাড়ির চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন ফুটকুনকাকা। ধরা গলায় বলছেন বাবার হাত ধরে, 'আসছি মেজদা, আবার কবে দেখা হবে জানি না।'

লীলাদি বললে, 'থ্যাংস ফর দা ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স জেঠিমা, বুলা আই'ল মিস ইউ।'

কাকিমা বললেন, মেডডি, আমাদের ওকানে চোলে আসুন একবার।

সুভাষদা বলল, বিনু-টুনি উই মাস্ট মীট সুন।

নেমে যাচ্ছে সবাই। এবার ট্যাক্সি। তারপর এয়ারপোর্ট হোটেল। তারপর প্লেন।

এখানে এখন জালি-ঘেরা বারান্দায় নতুন শীতের উসুম-কুসুম সকাল। এখানে এখন মোটা মোটা কত কালের পুরোনো কড়িবরগার নীচে নতুন টুনি নতুন বিনু। আর পুরোনো মা, পুরোনো দিদি, পুরনো বাবা। বিনুর হাতে ঝিনুক থলি, টুনির মাথায় বেতের টুপি। বাবার কাঁধে কোঁচার খুঁট, মা হাসছে, দিদি হাসছে চিকন হাসি, বাবা ডাকল, 'বিনু! বিনু।' হাতের থলি খলবলাচ্ছে বিনায়ক। বাবা ডাকছে, 'টুনি-ই, টুনটুনিই-ই।' বাবার ছড়ানো দুই হাতের মাঝখান দিয়ে ঝপ্‌পাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে টুনি। বাবার খোলা বুকের সঙ্গে সেঁটে গেছে টুনির মাথা, টুনির কান। কান পেতে শুনছে পুরোনো বুকের মধ্যে গুমগুম গাগুম গুম। অবিকল সেই গভীর ডাক। নীল সমুদ্র। সবুজ সমুদ্র। ভেতরের এক অপরূপ অন্ধ আলোড়ন ঢেউ হয়ে ছুটে আসছে। ভেঙে পড়ছে। টুনির গালের বেলাভূমি তাই ফেনায় ফেনা।

শুনঃশেফ

আমাব নাম যতি। জ্যোতি নয়। যতি। বর্গীয় জ আর অন্তঃস্থ য এর মধ্যেকার এই তফাতটা আমার জীবনে খুব গুরত্বপূর্ণ। কেন যে এই তফাত তা নিয়ে খুব অল্প বয়সেই আমার মধ্যে একটা আবছা কৌতূহলের জন্ম হয়েছিল। আমার সঙ্গে আমাদের ক্লাসে আরেক জ্যোতি পড়ত। সে বর্গীয় জ-য়ের জ্যোতি। মাস্টারমশাইরা দুজনকে তফাত করবার জন্যে আমাকে ডাকতেন ওয়াইতি। অবিকৃত জ্যোতি নামের সম্মান আমার সহপাঠীই পেত। এবং তাই নিয়ে একটু বড়ো হতে না হতেই সে কলার তুলতে শুরু করে। আরেক দল মাস্টারমশাই ছিলেন, তাঁরা আবার বলতেন, 'জ্যোতি দা ব্রাইট' আর 'যতি দা ডার্ক'। স্কুলে পড়ার ওই বয়সে যখন ঠ্যাং সবে বেখাপ্পা রকমের লম্বা হতে শুরু করেছে, গাল খসখস করছে, কপালে গালে দু চারটে ব্রণ উঁকিঝুঁকি মারছে, সেই লজ্জাকর, মুখচোরা সময়ে 'যতি দা ডার্ক' কিংবা 'ওয়াইতি' ডাক আমাকে যে কী ভয়ানক আত্মগ্লানির কটাহে নিক্ষেপ করত তা একমাত্র আমিই জানি। মাস্টারমশাইরা একজনও আমায় পছন্দ করতেন না। প্রাণপণে পড়া মুখস্থ করলেও না। অঙ্ক সব মিলে গেলেও না। হাতের লেখা ভালো করেছিলুম অনেক অভ্যেস করে করে, কিন্তু তাতেও তাঁদেব অপছন্দের নিরেট দেয়াল ভেদ করতে পারিনি। কিন্তু অভয়পদ স্যারের যেন আমার ওপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। কেমন একটা আক্রোশ কাজ করত ওঁর আমার প্রতি সব ব্যবহারেব পেছনে। উনি পড়া জিজ্ঞেস কববেন বলে বিশেষ করে ওঁর ক্লাসের পড়া ভালো করে তৈরি করে যেতুম। ভেতরের সমস্ত কাঁপুনি সংযত কবে সঠিক, সুন্দর উত্তর দিচ্ছি, উনি মাঝপথে থামিয়ে দিতে ছড়া কেটে উঠতেন, 'আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম ডাছে মৌ।' ক্লাসে ইতস্তত হাসি শুরু হত। আমি লজ্জায়, ক্ষোভে বেগনি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম।

এই অভয়পদবাবু একদিন সু-মেজাজে থাকায় এবং বাইরে তুমুল বৃষ্টি হওয়ায় ক্লাসে গল্পগুজব হচ্ছিল, হঠাৎ উনি বললেন, 'একটা থট-রিডিং-এর ম্যাজিক দেখবি? 'যতি দা ডার্ক, ওঠো বাবা! ' আমি উঠে দাঁড়াতে কিছুক্ষণ শ্যেন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল মুখের সামনে ঘোরাতে লাগলেন, তারপরে বললেন, 'যতি দা ডার্কের তো দেখছি তিন তিনটে দিদি আছে! ' 'সত্যি? সত্যি?' আশেপাশে সবাই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমি কথা বলতে পারছিলুম না, ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে বসে পড়েছিলুম। আমি থাকি শিকদার বাগান লেনে। অভয়পদবাবু আসতেন বরানগর থেকে, আমাদের বাড়ির কারও সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক ছিল না। থাকবার কথা নয়। তবু অভয়পদবাবু কী করে আমার তিন দিদির কথা জানলেন? ধূর্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন অভয়পদবাবু। যেন আমার তিন দিদি থাকা ব্যাপারটা খুব দূষণীয়। প্রায় অশ্লীল। ব্রণ ওঠার মতোই অশ্লীল। তখন অভয়পদবাবু প্রত্যেকটি শব্দ চেটেপুটে খেতে খেতে বলছেন, 'এই যতেটা না জন্মালেও কোনো ক্ষেতি ছিল না। এই ধরনের ছেলেপুলেরাই বাপ-মায়ের চক্ষুশূল হয়ে থাকে।' অভয়পদবাবু এই চূড়ান্ত ঘোষণাটি করবার পর টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেল। মনে হল সহপাঠীরা ঘৃণা এবং ভয়ের দষ্টিতে আমার দিকে চাইতে চাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে হিমের

স্রোত, গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত পা কাঁপছে, কোনোক্রমে নিজের বইখাতা ব্যাগে ভরে সবার শেষে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে অনুভব করলুম---আমার শুধু বাবা-মা কেন, একজন বন্ধুও নেই। এই বিশাল জগতে আমি একদম একা।

টিফিনের পয়সায় সেদিন কিছু খেলুম না। আইসক্রিম কেনবার ছল করে স্কুলগেটের বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর এদিক ওদিক দেখে বড়ো রাস্তা পার হয়ে দেশবন্ধু পার্কের দিকে হাঁটা দিলুম।

দুপুরবেলাটায় দেশবন্ধু পার্ক ফাঁকা-ফাঁকা থাকে। আমার একটা প্রিয় কলকে ফুলের গাছ ছিল, গাছটার তলায় বসে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে প্রথমটায় খানিকটা গরম চোখের জল বেরিয়ে যেতে দিলুম। তারপর প্রতিজ্ঞা করলুম আর স্কুলে যাব না। বাড়ির থেকেও নিজেকে আস্তে আস্তে মুক্ত করে নেব। সত্যিই তো, আমি যে বাবা-মার চক্ষুশূল এ বিষয়ে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই সন্দেহ থাকতে পারে না। বাবা অত্যন্ত রাশভারী, কড়া প্রকৃতির মানুষ। এতদিন ভাবতুম অনেক বড়ো, প্রায় বুড়ো বলেই বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেন না, এখন বুঝতে পারছি তা নয়, আসলে চক্ষুশূল, আমি চক্ষুশূল। চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করলেই দেখতে পাচ্ছি ওই তো বাবা দাদাকে ডেকে কি বললেন, ওই তো দিদির সঙ্গে, মেজদির সঙ্গে, ওই তো এমন- কি ছোড়দির সঙ্গেও বাবা কথা বলছেন।

কই দিনের পর দিন যায়, বাবা সোজাসুজি, মুখোমুখি আমার সঙ্গে তো কথা বলেন না। বড়ো জোর- 'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?' কিংবা 'কোথায় চললে?' আর মা? মা আমাকে দিনের মধ্যে সাতবার দোকানে পাঠায়। 'এই হারুর দোকান থেকে একটু গরম মশলা নিয়ে আয়' এই আবার 'দৌড়ে যা তো যতি, তোর বাবার দই আনাতে ভুলে গেছি।' এক ঘণ্টাও যাবে না, লন্ড্রি থেকে দাদার শার্ট-প্যান্ট আনতে হবে। অমনি একপাতা সেফটিপিন, ভুলুর জন্যে একটা পেনসিল, ফরমাশের আর শেষ নেই। যে অনুপাতে মা আমাকে খাটায় সেই অনুপাতে আবদার রাখে কি? রাখে না। বিশ্বকর্মার সময়ে ঘুড়ির লাটাই-মাঞ্জার পয়সা মাপা-মাপা। দোলের সময়ে পেতলের পিচকিরি আজও হল না। একটা ভালো ক্রিকেটব্যাট মা আজও দিচ্ছে, কালও দিচ্ছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে যাবার সময়ে সর্বদা সঙ্গে যাবে ভুলু, মায়ের কোলপোঁছা। আমার অবশ্য নেমন্তন্ন যেতে একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু ভোজের দিকটাও তো আছে! মাকে কোনোদিন বলতে শুনিনি, 'যতি আজ আমার সঙ্গে চল্'।

সেইদিন থেকে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। ঠিক সময়মতো খেয়ে দেয়ে, স্কুল ব্যাগ পিঠে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। তারপরে কোনোদিন দেশবন্ধু পার্ক, কোনোদিন গড়ের মাঠ। কোনোদিন গঙ্গার ধার চলে যাই। কিন্তু ভীষণ দীর্ঘ সময়। কাটতে চায় না। লোকেরা কীরকম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়। আমার মনে হয় যে যেখানে আছে সবাই বুঝতে পারছে আমি স্কুল পালিয়েছি। সবচেয়ে মুশকিল হয় বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে, ওইটা দেখলেই লোকে ধরে ফেলে আমি স্কুলের ছেলে। সেই জন্যে কোথাও বসার চেয়ে আমার মনে হয় হাঁটাই ভালো। হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে যাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, রেস কোর্স, খিদিরপুর, চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢুকে সময়টা বেশ কেটে যায়। বাঘের গায়ে কটা ডোরা, সিংহী কটা হাই তুলল, ভালুক কতবার দাঁড়াল, কতবার পড়ে গেল, ভোঁদড় যখন মাছ ধরে ডাঙায় ওঠে, মাছটা কীভাবে মুখের মধ্যে ঝটপট করে এইসব দেখতুম কেমন অন্যমনস্ক হয়ে।

একাধিকবার মুশকিলেও পড়লুম। চিড়িয়াখানায় মন দিয়ে শিম্পাঞ্জির খিঁচুনি দেখছি, পিঠের ওপর একটা ভারী হাত পড়ল, 'যতি না?' মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলুম ভদ্রলোককে।

বাবার কেমন ভাই হন। বিজয়ার পর সপরিবারে আসেন বছরে একবার।—'স্কুল থেকে এসেছ?' নিজেই সমাধান করে দিলেন সমস্যার। আমি তাড়াতাড়ি বললুম 'হ্যাঁ।' 'কোথায় আর সব ছেলেরা? টিচার?' আমি বললুম 'ওইদিকে আছে।' 'দেখো আবার, হারিয়ে যেয়ো না।' বাবার ভাই এগিয়ে যান। আরেক দিন পাঁচ নম্বর বাসে চড়েছি, লেকের দিকে যাব। লেডিজ সিট থেকে এক ভদ্রমহিলা ডেকে বললেন, 'এই যতি, যতি, জায়গা খালি হচ্ছে এইখানে বোসো।' আমি দূর থেকেই যথাসম্ভব হাত নেড়ে বোঝালুম আমি বেশ আছি। ভদ্রমহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি ওঁকে চিনতে পারছি না, কিন্তু উনি আমাকে ঠিকই চিনেছেন। দূর থেকে বিশেষ কিছু বলতে পারছেন না, কিন্তু ওঁর খুব সন্দেহ হয়েছে। এখন দুপুর একটা, আমার পিঠে স্কুল ব্যাগ। এই ব্যাগটাই হয়েছে আমার কাল। যতটা পারি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তারপর স্টপ আসতেই নেমে পড়ি। সামনে যে গলি পাই, তারই মধ্যে ঢুকে পড়ি, ইশ্‌ ভুল হয়ে গেছে, ভদ্রমহিলা প্যাঁট প্যাঁট করে দেখছেন। রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকের গলিতে ঢোকা উচিত ছিল। অনেকটা সময় গলিটার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে যেই বেরিয়েছি, দেখি ভদ্রমহিলা রাস্তার ওদিক থেকে আসছেন হনহন করে। আমার চোখে চোখ পড়ে গেল। চোখ পাকিয়ে বললেন, 'একদম নড়বে না, পালাবে না।' কাছে এসে একটা হাত পাকড়ে ধরে বললেন, 'তুমি রমলাদির ছেলে যতি না? আমাকে চিনতে পারছ না? সুপ্রভাত কাকা ... রথীন ...' আমি বললুম, 'আপনাকে আমি চিনি না। আপনি কে আমি জানি না। আমার নাম যতি নয়।'

যতি নয়? তাহলে তখন যতি বলে ডাকতেই বাসের মধ্যে সাড়া দিলে যে!

আমার নাম ব্রতী। আমি শুনেছি ব্রতী।

তাহলে আমাকে দেখে বাস থেকে নেমে পড়লে কেন? এই গলির মধ্যে ঢুকেছিলে কেন? লুকোবার জন্যে নয়?

আমি বললুম, 'আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি। খুব দরকার। আমার বাবার খুব অসুখ, মা পাঠিয়েছে, এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। তাই ...।'

মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে? বাবার অসুখ? মা পাঠিয়েছে? কী নাম তোমার বাবার?

গা-ভরতি ঘৃণা নিয়ে আমি উচ্চারণ করলুম, 'অভয়পদ মজুমদার।' এত চট করে বললুম যে ভদ্রমহিলা থতিয়ে গেলেন। বললেন, 'কী ঠিকানা খুঁজছ? তোমাকে একেবারে রমলাদির ছেলে যতির মতো দেখতে। না, যতি এতটা কালো নয়, এত রোগাও নয়।'

যাক কী ঠিকানা যেন খুঁজছিলে?

আমি বললুম, 'পঁচিশের এক বকুলবাগান রো না রোড গুলিয়ে ফেলেছি, বাড়িটা দেখলেই আমি চিনতে পারব।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কিছু মনে কোরো না। আমার এক আত্মীয়ার ছেলের সঙ্গে তোমার খুব মিল। যাও তোমার দেরি করিয়ে দিলুম। আমারও দেরি হয়ে গেল।'

হাতঘড়ির দিকে একবার চেয়ে উনি আবার বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমি বকুলবাগানের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে থাকলুম।

সারা কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর থেকে লেক কালীবাড়ি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতুম। কিন্তু পথও আমায় টানত না। কোনো কিছুকেই আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় বলে মনে হত না। এই সমস্ত বাড়ি ঘর ইট-কাঠের দৈত্য সব, গলি রাস্তা, মোড় অজানা এক জনহীন গ্রহের। জনহীন। এত মানুষ বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, ফুটপাতে ভিড় করে যাচ্ছে, দোকানবাজার গমগম করছে কিন্তু আমার মনে হত কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই। যেন সিনেমা দেখছি। টিকিটের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এক

এক দিন কোনো হলে ঢুকে পড়তুম। সারাদিন ঘোরা, খাওয়াদাওয়া নেই, পর্দার হট্টগোল কান ফাটিয়ে দিত, তুমুল নাচ-গানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কোমর, উরু সব ব্যথা করত, রক্ত অস্বস্তিকর রকমের গরম হয়ে উঠত, সস্তার সিট, চারপাশ থেকে অশ্রাব্য খিস্তি, সিটি বেজে উঠছে, পর্দার নাচিয়ে মেয়েটির পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে পাশের সিটের লোক বলত, 'কী খোকা পছন্দ হয়?' জবাব না দিলে ছাড়ত না। 'ইস্কুল পালিয়ে তো দেখতে এসেছ, পছন্দটা বলতে দোষ কী ; আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখতুম।' বলে লোকটা খা খা করে হাসত। পান গুণ্ডি খাওয়া কালো মাড়ি কালো দাঁত দেখা যেত। আমার ভেতরটা গুলিয়ে উঠত। ইনটারভ্যালের সময়ে উঠে পড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিতুম। হেঁটে হেঁটে সময় ভরানো। কোনো কোনো দিন সময়ের ঠিক রাখতে পারতুম না। হা-ক্লান্ত হয়ে আগে আগেই বাড়ি ফিরতুম। মা বলত—কী রে! আজ সকাল-সকাল ছুটি হয়ে গেল?'

বলতুম, 'হ্যাঁ, একজন টিচার মারা গেছেন।'

কোন টিচার রে! আহা! ছেলে মেয়ে আছে!

গম্ভীরভাবে বলতুম, 'পুরোনো টিচাব। আমি ঠিক চিনি না।'

একদিন খুব দেরি হয়ে গেছে, পা টিপে টিপে বাড়ি ঢুকছি. নীচের দালানে মৃদু আলো জ্বলছে। সিঁড়ির ওপর থেকে একটা খুব জোরালো নারীকণ্ঠ ভেসে এলো। কেমন চেনা-চেনা।

'না রমলাদি, তোমার যতিকে আজ আব দেখা হল না। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসলে কী জানো, পাঁচ নম্বর বাসে ক মাস আগে একটা যতির মতো ছেলেকে দেখলুম। পিঠে ব্যাগ। আমি 'যতি, যতি কোথায় যাচ্ছ' বলে ডাকতে নেমে বকুলবাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। তো আমিও নেমে ছেলেটাকে পাকড়েছি। কী ভুল দেখো। ছেলেটার নাম ব্রতী। বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে। জ্যাঠার বাড়িতে খবর দিতে এসেছে। বরানগরে থাকে, স্কুলেব টাইমে এসেছে বকুলবাগান। তা ছেলেটাকে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু তারপর মনে হল স্কুলের ব্যাগ কেন পিঠে? আর ধরতে পারলুম না। সেই থেকে মনটা খচখচ করছে।'

ভদ্রমহিলা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমি তৎক্ষণাৎ দালানের অপর প্রান্তে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন, উঠোনের ওদিকে কলতলা, তার মধ্যে।

মিনিট দশেক পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে ওপরে উঠছি, মা রান্নাঘরের থেকে বেরিয়ে বলল, 'কী রে যতি, আজ এত দেরি যে?' উঃ আমি আর বানাতে পারি না, পারি না।

'ড্রিল সার ডিটেন রেখেছিলেন,' যা মুখে আসে তাই বললুম।

'ডিটেন রেখেছিলেন? কেন?' মার ভুরু কুঁচকে উঠল।

'ড্রিল পারিনি, তাই।'

'ড্রিল কি মুখস্থ করা যায় যে না পারলে ডিটেন করবে? আস্পদ্দা তো কম নয়!' মা বিরক্ত মুখে গজগজ করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেল। দোতলায় উঠতে মেজদি বলল, 'হ্যাঁরে যতি, স্কুল থেকে ফিরেই কলঘরে ঢুকেছিলি কেন রে?'

বাথরুম পেয়ে গিয়েছিল।

মেজদি বলল, 'দিদি দেখেছিস যতিটা কী ভীষণ কালো আর রোগা হয়ে গেছে?'

দিদি বলল, 'তাই তো বুলু, ঠিক বলেছিস তো! হ্যাঁরে যতি, আজকাল তো আমার কাছে সংস্কৃত দেখাতে আসিস না! দাদার কাছে অঙ্ক-ইংরিজি দেখাতে তো দেখি না?'

আমি উত্তর দিচ্ছি না দেখে দিদি এগিয়ে এসে আমাকে ঝাঁকানি দিল 'কী রে, কথা বলছিস না যে? এ কী? তোর হাতগুলো কী ময়লা রে? কী নোংরা তুই, ছি। ছি।'

মা নীচে থেকে ডাকল, 'যতি, জলখাবার খেয়ে যা!' লুচি ভাজার গন্ধ আসছিল। আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই দিদি বলল, 'সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খেতে বসবি যতি।' খেতে বসে কিন্তু আমার বমি পেতে লাগল। কোনোক্রমে একটা লুচি গলাধঃকরণ করে আমি উঠে পড়লুম। মা অবাক হয়ে বলল, 'তোর জন্যে টাটকা ভেজে তুললুম, না খেয়ে উঠছিস্ যে! আমারই ঝকমারি হয়েছিল দেখছি ...'

'ভালো লাগছে না'—কোনোমতে বলে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, দেখি দুই দিদি তখনও সিঁড়ির মাথায় গুলতানি করছে। আমাকে উঠতে দেখে দিদি কী যেন বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এল। আর আমার ভেতর থেকে কতদিনের ঘেন্না, কষ্ট, রাগ, দুঃখ, খালি পেটে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার অনিয়ম, সমস্ত হড়হড় করে বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ভীষণ কষ্টে আমি সিঁড়ি টপকে নীচে পড়তে থাকলুম। প্রচণ্ড লাগল মাথায়, তারপর সব কালো।

মাথাটা পরিষ্কার হতে চোখ মেলে দেখি অনেক জোড়া চোখ আমার ওপর। মাথার যেখানটায় লাগছে সেখানে ঠান্ডা কিছু চেপে ধরেছে কেউ। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে কেউ। চোখ মেলতে দেখে মা আতঙ্কিত গলায় বলল, 'যতি, যতি, ও যতি, বমি করে অমন অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন? খুব লেগেছে মাথায়? গা-টা গরম গরম লাগছে। কখন থেকে শরীর খারাপ হল?'

মা একটানা বকেই যাচ্ছে, বকেই যাচ্ছে। দিদি বলল, 'মা, ওকে এখন কথা বলিয়ো না। দাঁড়াও ওর জামা-টামাগুলো পালটে দিই। কী বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছে। বুলু বালতি করে জল নিয়ে আয় তো?' আমার নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। কথা বলবার চেষ্টা করলেও বলতে পারছি না। শরীরটা যেন কাঠের মতো শক্ত। আমি দেখতে পাচ্ছি বমিতে মাখামাখি কাঠের মতো আমার শরীরটা মেঝেতে পড়ে আছে। সেটাকে ঘিরে মা আর দুই দিদি। মেজদি জল নিয়ে এল, খোসা ছাড়াবার মতো করে জামাকাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছে দিদিরা, মুখটা কাত করে ভালো করে গামছা ভিজিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে মুখ। আমার চোখ দুটো কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। গায়ে পাউডার দিয়ে দিল মেজদি। কোমরের ওপর চাদর চাপা দিয়ে দিদি আমার প্যান্ট খুলে নিল। পাজামা পরিয়ে দিল। পায়ের পাতাগুলো ঘষে ঘষে মুছিয়ে দিচ্ছে। কী বিশ্রী দেখতে আমাকে। ঠিক একটা পোড়া কাঠের টুকরোর মতো। কানগুলো মস্ত বড়ো বড়ো, লতপত করছে। মাথার পেছনের চুল খাড়া খাড়া। ঠোঁটের ওপর মুখের কালি যেন গাঢ় হয়েছে। এমন স্পষ্টভাবে নিজেকে আমি কী করে দেখতে পাচ্ছি? চোখের ওপর একটা আয়না ধরা আছে নাকি? তারপর দেখলুম মা ভয়ার্ত গলায় বলছে, 'বুলু, ডাক্তার ডাক, ও ওরকম কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রয়েছে কেন? ও সাড়া দিচ্ছে না কেন? যতি, ও যতি।' আমি তখন বললুম, 'মা যতি মানে কী, আমার নাম যতি কেন? তোমরা সবাই কেন আমার ওপর এত বিরূপ? কেন, আমি কী করেছি মা?' দেখতে পেলুম—মা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে আর কাঁদছে, 'যতি, যতি রে, অমন করে চেয়ে আছিস কেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না?' বুঝতে পারলুম মা আমার কথা আদৌ শুনতে পায়নি। তখন আমার খেয়াল হল আমি মাকে কথাগুলো বললুম রাস্তার দিকের জানলার কাছ থেকে, যদিও আমার কাঠের মতো শরীরটা পড়ে আছে দরজার কাছে মেঝেয়। দুই দিদি আর মা শরীরটাকে অনেক কষ্টে তুলে তক্তাপোশে শোয়ালে। দিদি বলল, 'মা কেঁদো না, পড়ে গিয়ে এরকম হয়েছে। কী যে মুশকিল, দাদার এখনও পাত্তা নেই। বাবা কখন আসবে কে জানে, বুলু তুই ও বাড়ি থেকে টুলটুলকে ডেকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যা।' মেজদি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'টুলটুলকে আর ডাকবার সময় নেই, আমি যাচ্ছি।' মেজদি এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জানলার কাছ থেকে আমি আমার চোখ দুটোকে প্রাণপণে বুজিয়ে চেষ্টা করতে লাগলুম, মা ভীষণ ভয়

পাচ্ছে। ক্রমাগত কাঁদছে আর দুর্বল গলায় বলে যাচ্ছে, 'যতি, যতি রে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না! কী হবে এখন, শীলা, কী হবে?' দিদি ক্রমাগত আমার শক্ত হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, 'মা চুপ করো, কাঁদছ কেন, অসুখবিসুখ মানুষের হয় না?'

আস্তে আস্তে জানলার কাছেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ খেয়াল হল ঘরে বাবা, ভুলু, দাদা, ডাক্তারবাবু, পেছনে ছোড়দি, মেজদি। ডাক্তারবাবু আমার নাড়ি দেখছেন, বাবার পরনে এখনও কোর্টের পোশাক। বাবা আমার পায়ের কাছে বসেছেন। পা দুটো নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি—বাবা তারস্বরে বলে চলেছেন, 'নারায়ণ নারায়ণ, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, এ কী বিপদ মা!' বাবার ঠোঁট নড়ছে কি নড়ছে না। জানলার ধার থেকে এখন আমি ঘরের মাঝখান অবধি সরে এসেছি।

কী রকম দেখলেন অবিনাশদা?

আরে প্রেশার ভীষণ লো। একটা ফিটের মতো হয়েছে মনে হচ্ছে। ইঞ্জেকশন দিচ্ছি একটা।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। একটু হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারব কান্নায় ভিজে মুখ মাকে। চোখ ছলছল করছে দিদির এতক্ষণ একলা একলা সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। মেজদি উদ্বেগে ঝুঁকে আছে, ভুলু ভয়ের চোটে মুখে একটা আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে খাটের মাথার দিকে। বাবা। অনেক দূরের মানুষ এখনও, যতির পা কোলে করে জপ করে চলেছেন? দাদা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখ শুকনো। আমি প্রত্যেককে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমার নাম যতি কেন? যতি মানে বিরতি, ক্ষান্তি। বড়ো বিরক্ত হলে মানুষ তবে ক্ষান্তি চায়। বাবা মা আমি তোমাদের ভীষণ বিরক্ত করেছি, উত্ত্যক্ত করেছি, আমার হাত থেকে তোমরা মুক্তি চাও আমি জানি। এই তো তোমাদের কত আদরের বড়ো ছেলে রয়েছে গোপাল। শান্ত, সৌম্য মুখ চোখে সোনালি চশমা। তোমাদের সাধ পূর্ণ করতে কত জলপানি পায়, কত বড়ো বড়ো বই পড়ে, কত জানে। ওই তো তোমাদের বড়ো আদরের বড়ো মেয়ে শীলা, কী সুন্দর ফর্সা। ঠিক মায়ের চেহারা পেয়েছে বলে সবাই। বি. এ পাশ করে গেল গত বছর। যতি কোনোদিনও পারবে না। তোমাদের মেজ মেয়ে বুলু, বাড়ির আরেক ছেলের মতো, সব দিকে নজর আছে, সে-ও কত যত্নের। বিকেলবেলা মা যখন তিন মেয়ের চুল বেঁধে দেয়, তখন বোঝা যায় কত যত্নের, কত ভালোবাসার মেয়ে সব। চমৎকার গান করে, বড়ো বড়ো বই পড়ে, ভালো ভালো পাস করে। আর সব থেকে ছোটো ভুলু, ও তো আদরের দুলাল। সব সময়ে মায়ের পায়ে পায়ে, মায়ের কোলপোঁছা, কোলেরটি। এই চাঁদের হাটে যতি? ক্ষ্যামা দাও মা, বড়ো ঘেন্না, মুখে ব্রণ, বারো বছরেই গোঁফ উঠছে। কাঠি কাঠি পা, কোনো কিছু মাথায় যেতে চায় না, ভালো লাগে না কিছু, আমি আর স্কুলে যাব না।' শরীরের যন্ত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে শিরশিরে হাওয়ার মতো শব্দগুলো ফিসফিস করে বেরোল।

বাবা বললেন, 'অবিনাশদা, ও কিছু বলল?'

ডাক্তারবাবু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যতি, কিছু বলছ?'

আমি পাঠাচ্ছি আমার বার্তা, আমার শরীর সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ও শুধু গোঙাচ্ছে।' তিনি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বার করলেন।

দিদিরা বলে আমি নাকি বুভুক্ষুর মতো ঘুমিয়েছিলুম, একটা হা-ঘুম, যো-ঘুম মানুষের মতো। একবারও নড়িনি, একবারও পাশ ফিরিনি। কী করে নড়বো? আসলে আমি তো কড়িকাঠের কাছে। ঘরে মৃদু সবুজ আলো জ্বলছে। মা আমাকে ছুঁয়ে শুয়েছিল। বাবা অন্য ঘর থেকে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরে আমার বুকের ওঠা-পড়া দেখে মাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কী গো? কী বুঝছ? ও ঘুমোচ্ছে না অজ্ঞান হয়ে আছে!'

মা বলছিল কাঁদো-কাঁদো গলায়, 'আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না। শীলু, তোর কী মনে হচ্ছে?'

'ও ঘুমোচ্ছে মা, ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিয়ে গেলেন না?'

'তারই এফেক্ট বলছিস?' বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বললে।

'তা ছাড়া কী? তুমি শুতে যাও।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল না। দুপুরেও না। বিকেলে যখন পশ্চিমের জানলা দিয়ে রাঙা রাঙা রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে তখন আমার ঘুম ভাঙল। ঠিক সেই সময়টায় ঘরে কেউ ছিল না। আমি জেগে উঠে বুঝতে পারিনি ওটা বিকেল। ওপর থেকে দেখলুম একটা শূন্য ঘরে তক্তাপোশের বিছানার ওপর যতি শুয়ে আছে। গায়ের চাদরটা কোমরের কাছে। ঘরে রোদ। আমি ভাবলুম ভোর হয়েছে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে যে সকালবেলার রোদ আসতে পারে না অতসব আমার খেয়াল ছিল না। বিশেষত আমি। আসল আমি রয়েছি কড়িকাঠে, উপুড় হয়ে দেখছি ঘরটা। কিন্তু পাশের বাড়িতে ঝাঁটার শব্দ জানলার ঠিক বাইরে টিউবওয়েলে, সকালে একটা মস্ত লাইন পড়ে যায়। তার হট্টগোল, চেঁচামেচি—এইসব মেশানো থাকে সকালের হাওয়ায়। সেগুলো পাচ্ছিলুম না, তাই কেমন গা ছমছম করছিল। এ যেন অন্য কোথাওকার সকাল। একা, আমি একা। পাশ ফেরবার চেষ্টা করলুম, যেন একটা পাথরকে নাড়াচ্ছি এমনি শক্ত, ঠান্ডা হয়ে আছে শরীরটা। ছোড়দি ঘরে এল। ছোড়দির মাথায় কষে আঁট করে বাঁধা দুটো মোটা মোটা বিনুনি। একটা খয়েরি রঙের ডুরে শাড়ি, খয়েরির ওপর হলুদ ডুরে, ছোড়দির মুখে আলতো পাউডার, কপালে টিপ। এখন অর্থাৎ সকালে ছোড়দির চুল ভিজে এলো থাকবার কথা, মুখ তেলতেলে, স্নিগ্ধ। আমার বিভ্রম আরও বেড়ে গেল। কীরকম মনে হল আমাকে ফেলে রেখে ওরা সবাই কোথায় চলে যাচ্ছে। ছোড়দি বোধহয় নিজের কিছু জিনিস ভুলে গিয়েছিল তাই একবারটির জন্য ফিরে এসেছে। যাক, তাই যাক। আমি এখন সব শেষের জন্য প্রস্তুত। যা ঘটার তো তা ঘটবেই। হঠাৎ মাথার মধ্যে মায়ের অর্ধেক কান্না অর্ধেক মমতামাখানো ডাক শুনতে পেলুম, 'যতি। যতি রে!' ঘাড় সামান্য বেঁকিয়ে ছোড়দির দিকে চাইলুম। ছোড়দি আমার পাশে বসে পড়ে ঝলক ঝলক হেসে বলল, 'উঠেছিস? একখানা ঘুম দেখালি বাবা! কটা বাজে জানিস? সাড়ে তিনটে। বিকেল সাড়ে তিনটে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোলি। দাঁড়া দিদি মেজদিকে ডাকি।' এইবারে, এই ছুতোয় ও চলে যাবে, প্রাণপণ চেষ্টায় আমি ছোড়দির আঁচলে একটাই দুর্বল টান দিলুম, 'বোস না ছোড়দি।' 'বাঃ তোকে মুখ ধুতে জামাকাপড় ছাড়তে হবে না? খেতে হবে না? আগে মুখ ধুয়েই খেতে হবে। কীরকম টিঁটি করছিস দেখছিস না?'

ছোড়দি ছুট্টে চলে গেল। আমার দিদি খুব গম্ভীর প্রকৃতির, দায়িত্বশীল, মায়ের চেয়েও যেন বড়ো, মেজদিও কতকটা তাই। কিন্তু ছোড়দি টুলটুল কথায় কথায় হাসে। হাসলে ছোড়দির ঝকঝকে দাঁত দেখা যায়, সামনে পেছনে বাতাস লাগা গাছের মতন ছোড়দি দোলে। ছোড়দির অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে, আদরের ডাক আছে, সিঁড়ি দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে নামতে নামতে বলে, 'মাং, দিদিং খিদিং পেয়েছেং। কখনং হবেং? ক্রিপস-মিশনং ব্যর্থং ব্যর্থং।' অর্থাৎ ও ইতিহাস পড়ছিল। ক্রিপসমিশনের ব্যর্থতার কথা পর্যন্ত পড়েছে। আর পারছে না, এবার ওকে খেতে দিতে হবে। ভুলুকে ও কখনও বলে ভুলিওকাস দা সেকেন্ড। কখনও ভুল ভুলাইয়া, কখনও সাদাসিধে ভুল-মহারাজ। শুধু বলে না, চটকে চটকে উৎখাত করে দেয় একেবারে, যতক্ষণ না ভুলু 'ওঁমা। ওঁ দিদি দেঁখোঁ না' বলে নাকি সুর ধরছে। অমন যে গম্ভীর দাদা এম. এসসি করে রিসার্চ করছে, চোখে

সোনালি চশমা. তাকেও ছোড়দি ছেড়ে কথা কয় না। কখনও বলবে 'গোপাল গো-বিন্দ মুকুন্দ শৌরে' কখনও বলবে, 'এই যে গ্যাপেলিও গ্যালিলিও আঁকটা কযে দিন তো!' দাদার একটা অদ্ভুত শাসন আছে। বাঁ হাত দিয়ে, দাদা ন্যাটা তো! বাঁ হাতের শুধু তর্জনী দিয়ে গালের ওপর চড়াৎ করে মারে। ভীষণ লাগে। আমি অনেকবার খেয়েছি ছোড়দিও খেয়েছে। যে দাদার কাছে পড়তে যাবে সে-ই একবার না একবার খাবে। ওইরকম এক আঙুলের চড় খেয়েও ছোড়দি এক হাতে গাল চেপে বলবে, 'উফফ্ এ কী চড়কোভস্কি রে বাবা, মাথাটা যে গোগোল গোগোলোভিচ হয়ে গেল। আঁকগুলো প্যাক প্যাক করে পালিয়ে যাচ্ছে!' ছোড়দি সবে শাড়ি ধরেছে। তাই ছোড়দিকে আমার কেমন অচেনা লাগে। বড্ড বেশি মেয়ে মেয়ে! আর মেয়ে দেখলেই আমি কুঁকড়ে যাই। মেয়েরা আমাকে দেখলে হাসে, নিজেদের মধ্যে কীসব চুপিচুপি বলাবলি করে, মেয়েদের ছায়া আমি পারতপক্ষে মাড়াই না। ছোড়দিটা ইদানীং ফ্রক স্কার্ট ছেড়ে সেই ভয়ংকর মেয়েদের দলে ভরতি হয়েছে।

দরজা দিয়ে গামলা-মগ-গামছা-তোযালে আরও কী কী নিয়ে মেজদি-ছোড়দি ঢুকল। মেজদি বলল, 'যতি, নিজে নিজে দাঁত-টাত মাজতে পারবি তো?'

আমি দেখলুম কনুইযে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে পারছি। মুখ-টুখ ধুয়ে ছোড়দির কাঁধে ভর দিয়ে কলঘরে যাচ্ছি, ছোড়দি বলল, 'জটিয়াবাবা কথা বলছিস না কেন রে? রাগ করেছিস আমার ওপর?' আমার চোখ জ্বালা করছে। কলঘরে ঢুকে চোখের জল লুকোই। দোতলায় ধরা জল। কল থেকে যদি জল পড়ত তো কলটা খুলে রেখে আমি খানিকটা শব্দ করে কেঁদে নিতে পারতুম। নিজের এইসব প্রবৃত্তিতে আমার নিজের ওপর ঘেন্না আরও বেড়ে যায়। ছেলেরা, আমার বয়সের ছেলেরা কাঁদে না। দাদাকে দেখেছি, ফার্স্ট ক্লাস ফসকাতে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দিদিদের মতো কান্নাকাটি করেনি। কেমন গুম হযে ছিল অনেকদিন। যখন জ্যাঠামশাই মারা গেলেন, বাবা জ্যাঠামশাইকে ভীষণ ভালোবাসতেন, শ্মশান থেকে এসে দাঁড়ালেন—মুখটা যেন ঝলসে গেছে। সেই কালচে ভাব বাবার মুখে এখনও আছে। কিন্তু কাঁদতে দেখিনি। আমি যে কোনোমতেই আমার বাবার মতো, দাদার মতো নই, হতে পারছি না—এটাই প্রমাণ করে মানুষ হিসেবে আমি কত নিকৃষ্ট। ভালোবাসবার মতো, পছন্দ করবার মতো আমার মধ্যে কিছু নেই। মেজদি দরজায় টোকা দিচ্ছে . 'যতি, হল? সাড়া দে একটা।' অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে বললুম, 'যাচ্ছি।' নিজের গলাটা নিজের কানেই হতকুচ্ছিত লাগল। তিন চারটে স্বর বেরোচ্ছে যেন। কী করে আমি তাড়াতাড়ি করব। জুতোর মধ্যে পা-গলানোর মতো আমার নিজেকে যে শরীরের মধ্যে গলাতে হয়।

বাবা. বাবা আমার সঙ্গে কথা বলছেন! বা বা : কী ভীষণ ভয় পাই বাবাকে, সম্ভ্রম করি। আমার মতো একটা অবাঞ্ছিত উৎপাত, কুরূপ, নির্গুণের সঙ্গে বাবা আলাদা করে কী কথা বলতে চেয়েছেন? ভয়ানক ভয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

'বোসো যতি'—বাবার চেম্বার এটা। রাত নটা। সবেমাত্র শেষ মক্কেল, সেইসঙ্গে মুহুরি কাকা চলে গেলেন। অতবড়ো গদিওলা চেয়ারে আমার হালকা শরীরটা রাখতে আমার ভয় করছিল। এত হালকা আমি ... যদি আবার .. ।

শরীরটা এখন কেমন বোধ করছ?

মুখ নীচু করে বলি, 'ভালো।'

সত্যিই মাসখানেকের ওপর আমি বাড়িতেই আছি। অহরহ ফলের রস, দুধ, ছানা, ডিম খাচ্ছি। তাকিয়ে দেখি আমার বাইরের চেহারাটা একটু একটু চকচকে হয়েছে বটে। চোখের সেই গর্তে-

বসা ভাবটা নেই আর। গাল-টালগুলো অত কালো নেই। চুল কাটা হয়নি অনেকদিন। মাথার পেছনের কতকগুলো চুল কী রকম খাড়া থাকত। এখন সেগুলো বসে গেছে। চুলগুলো বড়ো হয়ে ঘাড়ের কাছে কেমন একটু পাকিয়ে গেছে। কিন্তু এ সবই তো বাইরের। ভেতরে আমি প্রায় সেই একইরকম কৃষ্ণকায়, কাষ্ঠকঠিন, নির্বান্ধব, যতি দা ডার্ক। রাতের আঁধার, সবুজ বাতির লক্ষ্মণের গণ্ডির প্রান্ত থেকে রোজ উঁকিঝুঁকি মারে। আমার আসল জায়গা, আমি জানি, সবুজ আলোর বৃত্তের ওপারে, ওই অন্ধকারে, অজানায়। যা পাচ্ছি, আমার প্রাপ্য বলে পাচ্ছি না, নারীজাতির চরিত্রে অসীম করুণা, তাই তার থেকে আমার মতো অভাজনও কিছু পায়। নিজস্ব কোনো গুণে নয়।

বাবা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'খোঁজ নিয়ে জানলাম গত তিন চার মাস তুমি স্কুলে যাওনি, কোয়ার্টারলি পরীক্ষাটাও মিস করেছ, কেন?' কেনটা বাবা খুব ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন যেন বাবাকে আমি যতটা লজ্জা পাচ্ছি, ভয় করছি, বাবা তার চেয়েও ভয় লজ্জা আমাকে পাচ্ছেন। আমি কিছুই বলতে পারছি না। যে চেয়ারে আমি বসে আছি, তারই পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি অসহায়, উদাসীন।

'পড়াশোনা করতে ভালো লাগছে না যতি? তোমার প্রোগ্রেস তো খারাপ নয়?'

এই সময়ে দাদা বাড়ি ফিরল। সে টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। বাবার দিকে একবার, আমার দিকে একবার চাইছে। চোখে খুব দুশ্চিন্তা। সুইং-ডোরটা খুলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে এল বড়দি। পেছনে মেজদি, ছোড়দি, মা-ও। ওরা কি আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছিল? দিদি বলল, 'যতি, আজ তোকে বলতেই হবে স্কুলে তোকে কে এমন কী বলেছে যে স্কুলে যাবার নাম করে ...' মেজদি বলল, 'যতি, তোকে যদি বদমাশ লোকে ধরত। তুই যদি হারিয়ে যেতিস . ও কি রে তুই কাঁদছিস?' আমার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল পড়ছিল ভীষণ জ্বালা করে। আমি দেখতে পেলুম মা আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, ছোড়দি কাঁদছে। বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক করে নাও। দেখি কী করা যায়।'

আমি তখন উঠে দাঁড়াচ্ছিলুম। পাতালের দেবতা আমাকে দু হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তাই আমার হাতে হাত, পায়ে পা, চোখে চোখ, কানে কান সব খাপে খাপে বসে যাচ্ছিল। কাটা দরজাটা দিয়ে ভেতরবাড়িতে যেতে যেতে শুনতে পাচ্ছিলুম বাবা আস্তে করে বলছেন, 'আর মনটা যতি, মনটাকেও ঠিক করো।' বাবা হয়তো আব বলেননি, কিন্তু গুনগুন করছিল আমার কানের সন্নিকটে বাবার গলা, 'মন, মন, মনটা যতি মন।'

নন্দিতা

'শুনছ? শুনছ? ওঠো না গো একবার!' মাঝরাত্তিরে নন্দিতার ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা একেবারে কাচের বাসনের মতো খানখান হয়ে গেল।

'হলটা কী?' ধড়ফড় করে উঠে বসল শুভেন্দু। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানালাগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। তা সত্ত্বেও ধারাবর্ষণের তুমুল শব্দ কাচ কাঠ সমস্ত অনায়াসে ভেদ করে ফেলছে।

ভোঁতা, ভারী শব্দ একটা! ভরা শ্রাবণের মধ্যরাত। জ্বালাময় মাঝ-বর্ষার দিনাবসান। ধরিত্রীরও। তার বুকে অবিরাম জীবনধারণের লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলিরও। অন্ততপক্ষে শুভেন্দুশেখরের তো বটেই। গতকাল সকালে ট্রেনেই ফিরেছে তিনদিনের ঝটিকা ট্যুর সেরে, তারপর গেছে অফিস। সেখানে ট্যুর-ক্লান্ত বলে কোনো বিশেষ বিবেচনা স্বভাবতই মেলেনি। সন্ধেয় বাড়ি ফেরার লগ্ন থেকেই ঘুমটা আসছিল নেশার মতো। একটা চমৎকার আমেজ, তাকে আরও চমৎকারভাবে জমিয়ে দিল বেশি-করে গাওয়া ঘি-ঢালা নাতিগাঢ় মুগের ডালের খিচুড়ি আর পাটিসাপটার মতো কি জানি কীসের পুর ভরা দুর্দান্ত ওমলেট। বর্ষারাতের সেই জমজমাট ঘুম এইভাবে কেউ ভাঙায়? ঠেলে ঠেলে! অল্প ঠেলায় হল না দেখে ধাঁই ধাঁই করে রামধাক্কা মেরে?

'শুনতে পাচ্ছ না?' নন্দিতা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

'কী শুনতে পাবো?' ঘুমে ভারী, বিরক্ত গলায় শুভেন্দু বলল।

'কুকুরটা কী ভীষণ কাঁদছে!' অন্ধকারে মনে হল নন্দিতাও কাঁদছে। গলার স্বরটা যেন আধা-বিকৃত।

অবিরাম বর্ষণের ভারী আওয়াজ ভেদ করে এই সময়ে কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর ডাক শুনতে পাওয়া গেল। করুণ সাইরেনের মতো ধাপে ধাপে সুরে চড়ল ডাকটা, তারপর আবার খাদে নেমে এল। কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ, অতঃপর ভিন্ন রাগিণীতে শুরু হল আলাপ।

'ঘুমোতে না পারো, একটা কাম্পোজ খেয়ে শুয়ে পড়ো', শুভেন্দু আবার ঝুপ করে শুয়ে পড়ল।

'ঘুমোতে না পারার কথা হচ্ছে না'—নন্দিতা আর্তগলায় বলে উঠল, 'কুকুরটা যে ভয়ানক কাঁদছে। ওকে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে ছাদে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া ...' নন্দিতার কথা শেষ হল না, শুভেন্দু প্রায় খেঁকিয়ে উঠল 'তো আমি কী করব?' কথাগুলো কেটে কেটে প্রত্যেকটাতে বেশ খানিকটা রাগ ভরে ভরে সে বলল। কদিন ধরে এ এক মহা উৎপাত শুরু হয়েছে। তাদের দোতলা বাড়ির পরেই একটা ছোটো জমি ঘেরা পড়ে আছে। তারপর এক পুলিশ ইনসপেক্টরের বাড়ি। ভদ্রলোকের খুব জন্তু-জানোয়ারেব শখ। খরগোশ, গিনিপিগ থেকে আরম্ভ করে ছাগল, গোরু, এমনকি বাঁদর পর্যন্ত পোষা হয়ে গেছে। তা পুষুন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু পোষা প্রাণীগুলোর কোনও যত্নই ওঁরা করেন না। খরগোশ, গিনিপিগগুলোকে গুভাম্বলো এসে এসে খতম করে গেল। ছাগলিটা যে কদিন দুধ দিল, দিল। তারপর ভদ্রলোক স্বহস্তে তাকে কেটে খেয়ে ফেললেন। গোরুটা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দিবারাত্র হাম্বা হাম্বা করত, গলার দড়ি কখনও খোলা

হত না, তার কী গতি হল তাদের কারুরই জানা নেই। আর বাঁদরটার লক্ষ্য ছিল এ পাড়ার যত্তেক গৃহস্থবাড়ি। নিজের মালিকের কাছ থেকে যথেষ্ট খেতে পেত না কিনা কে জানে, কিন্তু পাড়ায় হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভোজ্য সংগ্রহ না করেছে। ক্লাইম্যাক্স হল শুভেন্দুর শার্ট পাঞ্জাবির বোতাম ভক্ষণ। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। পুলিশের দারোগা, ওরে বাবা, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তবে ইদানীং ভদ্রলোক যা শুরু করেছেন সত্যিই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটার পর একটা দারুণ সুন্দর দামি কুকুর আনছেন আর অযত্ন অবহেলা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মেরে ফেলছেন। শুভেন্দু আর অতশত জানবে কোত্থেকে, নন্দিতাই জানায়। জানালায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ইশারা করে শুভেন্দুকে ডাকে, 'দেখো দেখো দেখে যাও।' দারোগার বাড়ির উঠোনে একটা ছোটো ডোল, তাতে গিন্নি এঁটো কাঁটা সব এনে ফেলে দিলেন, তারপরেই ডাক দিলেন, 'আঃ আঃ টমি, আঃ আঃ!' আপাদমস্তক টানটান চব্বিশ-পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু একটা গ্রেহাউন্ড অপরূপ ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। ভদ্রমহিলা তাকে এঁটোকাঁটাগুলো খাওয়াবার জন্যে ক্রমাগত তাড়না করছেন, আর অভিজাত বংশীয় গ্রেহাউন্ডটা ক্রমাগত তার লম্বা সরু চকচকে মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছে। গ্রে-হাউন্ডটা বোধহয় মরে গেল তবু পাত-কুড়োনো মুখে দিল না এবং কুকুরটা মরে গেল তবু তার মালিকরা তাকে তার যোগ্য খাদ্য দিলেন না। একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল মরে গেল আপাদমস্তক ঘা হয়ে। চুলকোতে চুলকোতে কুকুরটা যেন খেপে যেত একেক সময়ে। সারা শরীর থেকে খাবলা খাবলা লোম উঠে, দগদগে ঘা নিয়ে প্রচণ্ড লাফিয়ে উঠে সামনের থাবায় মুখ দিয়ে শুয়ে পড়ল, উঠল না আর। কোথা থেকে ভদ্রলোক এত সুন্দর সুন্দর পেডিগ্রি-ডগ জোগাড় করেন কে জানে। পুলিশের লোক, কোথা থেকে আর! মিনি-মাগনা পায় বলেই বোধহয় আরও এত অচ্ছেদ্দা। কী জিনিস পেয়েছে জানেই না। লেটেস্ট হচ্ছে একটা ডালমেশিয়ান। অপরূপ কুকুর। নন্দিতা জানলার কাছ থেকে নড়েই না, 'দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে!' সাদার ওপর কালো কালো গোল গোল ছিট, আবার ভালো চামড়ার কলার, এবার বোধহয় দারোগার মক্কেল কলার সুদ্ধুই উপহার দিয়েছে। কুকুরটা খুব সম্ভব পূর্ণবয়স্ক। পোষ মানতে চাইছে না। পোষ মানাবার উপায় হিসেবে দারোগাবাবু থার্ড-ডিগ্রি প্রয়োগ করেছেন। 'টমি—কাম হিয়ার।' ভদ্রলোকের সব কুকুরই টমি! টমি আসছে না, লম্বা হিলহিলে চাবুকের বাতাস কাটার শব্দ সুইশ্‌শ্‌শ। নন্দিতা কানে আঙুল চেপে বসে পড়ে। 'টমি সিট ডাউন।' এবারও টমি আসছে না, আবারও চাবুক নামছে। এবার নন্দিতা জ্ঞানশূন্য হয়ে জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, 'অ মেসোমশাই, মেসোমশাই'। তার তীক্ষ্ণ সরু গলাও ভদ্রলোকের মোটা কানে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে! অবশেষে অবাক হয়ে দারোগা মেসোমশাই মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কস্মিনকালেও নন্দিতা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মাসি-বোনঝি সম্পর্ক পাতায়নি। অতএব অবাক।

'মারবেন না, প্লিজ, অমন করে মারবেন না!' আকুলিবিকুলি করতে থাকে নন্দিতা। চোখের কোলে টলটলে জল। অতশত হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না মেসো, কিন্তু কেমন হতবুদ্ধি হয়েই হাতের বেতটা ফেলে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। উঠোন ছেড়ে ভেতরে। ঘরের আশ্রয়ে।

সেই অবাধ্য ডালমেশিয়ানেরই এখন এই দুর্গতি হয়েছে। দোতলার ছাদে উপর্যুপরি বৃষ্টির তলায় আশ্রয়হীন। কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে তার উপায় নেই। বাঁধা। নন্দিতা অনেক কষ্টে চোখের জল চাপতে চাপতে বলল, 'তুমি তো কদিন ছিলে না, জানো না। রোদে জলে ওকে একভাবে বেঁধে রেখে দ্যায়। নিজেরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। আমরা ঘুমোতে পারছি না! খাবার মুখে রুচছে না! ওদের দেখো হেলদোল নেই!' কেঁউ কেঁউ কেঁউ—আবার বৃষ্টি ছাপিয়ে কুকুরের ডাক ভেসে এল! নন্দিতা বলল, 'ওর নিশ্চয় অসুখ করেছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, যাও না একবার প্লিজ।'

শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওদের পাড়ায় সবাই ভয় পায়, এড়িয়ে চলে, আমি মাঝখান থেকে কুকুর ডাকছে বলে এই রাত্তিরে গিয়ে কমপ্লেন করব?'

'ওহ, বুঝতে পারছ না, কুকুর ডাকছে বলে নয়!' নন্দিতার গলা যেন রুদ্ধ হয়ে যাবে 'কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে বলে। বৃষ্টিতে! রোগে। ...' সে আর কিছু বলতে পারে না, ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে।

শুভেন্দু বলে, 'একটা কুকুর কষ্ট পাচ্ছে বলে, এই দুর্যোগের রাত্তিরে তুমি আমাকে বাড়ি-ছাড়া করবে? জানো কত জন্তু-জানোয়ার, কত মানুষ নিরাশ্রয় ঠিক এখন, এই মুহূর্তে। বৃষ্টিতে উড়ে গেছে কার খোড়ো চাল, জল জমে ভেসে গেছে গেরস্থালি...'

শুভেন্দুর কথা শেষ হল না, হঠাৎ নন্দিতা দড়াম করে এক লাফ দিল বিছানা থেকে মাটিতে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দরজার খিল নামাল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

অগত্যা শুভেন্দুকে উঠতেই হয়। খোঁজো কোথায় টর্চ, কোথায় বর্ষাতি, কোথায় ছাতা! নীচে নেমে সে অবাক হয়ে দেখল সদর দরজা খোলা। হু হু করে বৃষ্টির ছাট ঢুকছে। নন্দিতা এই রাত্তির দেড়টায় জলের মধ্যে একাই বেরিয়ে গেছে।

কোনোক্রমে বর্ষাতি টর্চ আর ছাতা সামলাতে সামলাতে প্রতিবেশীর বাড়ির দরজায় সে যখন পৌঁছোল ততক্ষণে সে বাড়ির দরজাও খুলে গেছে। চৌকাঠের এপারে সোঁপাটে ভিজে নন্দিতা, ওপারে টর্চ হাতে লুঙ্গি-পরিহিত ভুঁড়িয়াল দারোগা, 'দোহাই আপনারা কিছু করুন, কিছু করুন মেসোমশায়, কুকুরটা যন্ত্রণায় কতরাচ্ছে, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে ওর, কিছু করুন!'

দারোগা বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা জাহাঁবাজ মহিলা দেখছি। আমার স্ত্রী বলেন বটে জানলা থেকে যখন তখন স্পাইং করেন, আমার কুকুর আমি মারি কাটি আপনার কী? ইয়ার্কি পেয়েছেন?' শেষ কথাটা উনি শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন।

শুভেন্দুর ভেতরটা রাগে জ্বলে যাচ্ছে নন্দিতার ওপরও, দারোগার ওপরও। সে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, 'আসলে কী জানেন, আমার স্ত্রী কুকুর ভীষণ ভালবাসে, একটু দেখুনই না! এত করে বলছে যখন!'

কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে দারোগা হাঁক দিলেন, 'হারু, হারু, ঢ্যাপলা! ছাতা নিয়ে একবার ওপরে যা দিকিনি , দ্যাখ তো টমিটা কেন এত চেঁচাচ্ছে!'

দুটো ছায়ামূর্তি ছাতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে দেখা গেল। দারোগা বললেন, 'দেখুন মশাই, এক পাড়াতে থাকি, বিপদে আপদে নিশ্চয় একে অপরের সহায়। কিন্তু পরের ব্যাপারে খামোখা এভাবে নাক গলালে মেয়েছেলে বলে মান রাখতে পারব না। আসুন আপনারা। আসুন এবার .. ।' গলাটা শেষের দিকে আরও কড়া।

এই সময় একটি ছায়ামূর্তি টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে পরম সন্তোষের সঙ্গে বলল, 'বাবা, টমি আর চ্যাঁচাচ্ছে না, কেমন দাপাচ্ছিল, কাটা পাঁঠার মতো, এখন চুপ করে শুয়ে পড়েছে।'

নন্দিতা ফিসফিস করে বলল, 'মরে গেছে।' সে স্খলিত পায়ে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়ি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দড়াম করে আছাড় খেল একটা। শুভেন্দু তাকে তুলে ধরে, কোনোমতে বাড়ি নিয়ে আসে, সেই রাতে গরম জল করে ব্রান্ডি দিয়ে খাওয়ায়, পরদিন সকাল না হতেই টেটভ্যাকের খোঁজে ছোটে। হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দুটো স্টিচ। সে এক কাণ্ড!

নন্দিতা ডাকসাইটে কুকুর-প্রেমিক বলেই যে এমনটা ঘটল তা কিন্তু নয়। নন্দিতা কুকুর দেখতে

ভালোবাসে, পুষতে মোটেই নয়। সে কোনো জন্তু-জানোয়ার পাখি-টাখি পোষবার আদৌ পক্ষপাতী নয়। ওসব আবদার তার নেই। বলতে গেলে কোনও আবদারই তার নেই। আপন খেয়ালে বইপত্তর, ক্যাসেট-ফিল্‌ম নিয়ে থাকে, ভালো ভালো রান্না করে, করে দু পক্ষের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ায়। খুব মিশুকে। যেখানে যায় হেসে গল্প করে, মজা করে একগাদা বন্ধু বানিয়ে ফেলবে। এরকম একটা স্টিমার পার্টির জমায়েতে হাসি-খুশি উচ্ছল স্বভাবের প্রাণবন্ত মেয়েটিকে মাস্তুল ধরে পাক খেতে খেতে একটাব পর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেই একেবারে ঘাড়মোড় ভেঙে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শুভেন্দু। আর বিয়ের পর তো নন্দিতা একটা অভিজ্ঞতা। এত স্বতঃস্ফূর্ত তার আবেগ! ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এমন জমকালো! এমন হৃদয়ের দু কূল ভাসিয়ে নেওয়া প্লাবনের মতো উত্তাল! যে শুভেন্দু মনে মনে গোপনে জানে এমনটা বোধ হয় আর হয় না। এবং সে অতি ভাগ্যবান! বিশেষত সে বাপ-মা মরা, মামার বাড়িতে এবং পরে হস্টেলে মানুষ। স্নেহ-ভালোবাসা-আদরের জন্য কতটা কাঙাল সে ছিল, বিয়ের পর নন্দিতার প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভালো করেই বুঝতে পারে। ওই এক দোষ, একে কী বলবে শুভেন্দু বুঝতে পারে না। খামখেয়ালি না সেন্টিমেন্টাল! না ওই পরের ব্যাপারে নাক-গলানোব আদিখ্যেতা! কী বলবে একে সে সত্যিই জানে না।

রোজই অফিস থেকে ফেরবার সময়ে এক বুক আনন্দ নিয়ে ফেরে শুভেন্দু। সে জানে যতই কলিগের সঙ্গে মনোমালিন্য হোক, ডিরেক্টর যতই বাঁকা চোখে তাকাক, গুচ্ছের নীরস অর্থহীন কাজের জন্যে তাকে যতই ছোটাছুটি করাক এবা, বাড়িতে তার জন্যে অসাধারণ কিছু অপেক্ষা করে আছে। দরজা খুললেই চমকে উঠবে হলুদ শাড়ি, শ্যাওলা সবুজ চুলের সেই মেয়ে কাজলবিহীন কাজলা চোখে এমন চাওয়া চাইবে, দাঁত ঝিকিয়ে এমন হাসি হাসবে যে সহস্র রকম দুর্ব্যবহার, হাজারখানা সমস্যার উদ্যত মুখ সব বাঁশির নাচনে সাপের ফণার মতো নুয়ে পড়বে। তারপর বেতের হালকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে চা খাওয়া, ঝুপঝুপ সন্ধে নামছে, আলো জ্বলছে। সারাদিনেব জমা কথা ফুটছে টুকটাক, দু একটা গানের কলি, একটা ধূপ জ্বেলে দেওয়া। ঘাড় ফিরিয়ে একটু ভ্রূভঙ্গি—শুনতে এইটুকু কিন্তু এরই মধ্যে যে কী অসামান্য রস ভরা থাকে তা শুভেন্দু ছাড়া কেউ কি জানবে?

কিন্তু কোনো একদিন ওইরকম প্রত্যাশার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যদি হাসির চমক না দেখে? সারা শরীরে শোকের ছাপ, যেমন-তেমন মলিন শাড়ি, বিকীর্ণমূর্ধজা, মেঘে-ভরা আকাশের মতো বর্ষণোন্মুখ চোখ।

কী হয়েছে নন্দিতা?

কিছু না। এসো।

চা খাওয়া হয়, চায়ের সুগন্ধের সঙ্গে ফিলটার-সিগারেটের গন্ধ মিশতে থাকে। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যন্ত্রচালিত দুটো হাত ধূপ জ্বেলে দেয়। হাতের মধ্যে যেন কোনো আগ্রহ নেই। রাত্তির হয়, খাবার বাড়া হয়। কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, চোখের-আঙুলের-ঠোঁটের আদর ছাড়া খাবার বিস্বাদ মনে হয়, কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করে করেও উত্তর পাওয়া যায় না।

কী আবার হবে? কিছু না।

রাত্রে বোঝে নন্দিতা জেগে আছে। কিন্তু কোনো গভীর শোকে সে অনমনীয়, তাকে এখন ছোঁয়া যাবে না।

পরদিন খবর জানল রাস্তায় বেরিয়ে। দু-তিন বাড়ি পরে থাকে অভিলাষদা, তার স্কুল-পড়ুয়া ন-দশ বছরের ছেলেটি মারা গেছে। একেবারে হঠাৎ। স্কুলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাবাকে তার

অফিসে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাবা আসতে আসতেই সব শেষ। কেন, কী বৃত্তান্ত ভালো বোঝাই যাচ্ছে না।

কদিন পরে শুভেন্দু বলে, 'চলো নন্দিতা, উট্রাম ঘাট থেকে ঘুরে আসি।' উট্রাম ঘাটে যেতে, জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আঁচল ওড়াতে, গোল রেস্তোরাঁয় খেতে নন্দিতা ভীষণ ভালোবাসে।

কিন্তু নন্দিতা শূন্য চোখে চেয়ে বলে, 'কী লাভ?'

কীসের কী লাভ?

এভাবে কোথাও বেড়াতে গিয়ে? বা কিছু সে যাই হোক না কেন, করে? কী লাভ? টুবলুর মতো একটা কচি ছেলে যদি এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে .. তো কী লাভ? তুমিই বলো?

রাত্তিরে নন্দিতা গভীর শোকে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে, যেন তার নিজেরই সন্তান গেছে।

আস্তে আস্তে মেঘ কাটতে থাকে, নন্দিতা স্বাভাবিক হয়, যদিও বৎসহারা জননীর এক গভীর, গভীরতর অসুখ সে যেন তার জীবনযাপনের ভেতরে চিরকালই বহন করে যাবে বলে মনে হয়। সবচেয়ে ভয় এবং আশ্চর্যের কথা এবং বেশ কয়েক মাস পরে শুভেন্দুর মাসতুতো বোনের বিয়েতে নেমন্তন্নে গিয়ে, খাওয়াদাওয়া হবার আগেই সে শুভেন্দুর হাত ধরে এসে, 'চলো এক্ষুনি চলে যাব।'

'কেন? কী হল?' সুন্দর সিল্কের শাড়ি-পরা অলংকৃত বউয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু।

শুনতে পাচ্ছ না সানাই বাজছে?

বিয়েবাড়িতে তো সানাই বাজবেই।

আমি সইতে পারি না যে! টুবলু যেদিন চলে গেল, সেদিন সারাদিন সারারাত দূর থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে এসেছিল। আমার .. আমি সইতে পারি না।

টুবলুর মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক। একশোবার। কিন্তু টুবলুদের সঙ্গে নন্দিতার কোনো যাওয়া-আসাই ছিল না। টুবলুর সঙ্গে সে জীবনে দুবার কথা বলেছে কি না সন্দেহ।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করে, নন্দিতাকে আগে থেকে কিচ্ছু না বলে বাড়ি পালটে ফেলার ব্যবস্থা করে শুভেন্দু। একটু শহরতলির দিকে। মস্তানি-ফস্তানি আছে নাকি একটু আধটু। কিন্তু চার ফ্ল্যাটের নতুন দোতলা বাড়ি। গেটে নন্দিতার পছন্দের মাধবীলতা থোকা থোকা দুলছে। নির্মল আকাশ দেখা যায়। রেললাইনের ধারে সাঁঝের বাজার বসে। সেখানে হরেক রকম টাটকা মাছ, সবজি পাওয়া যায়। একেবারে হাতের কাছে।

নন্দিতা প্রথমে গুঁইগাঁই করেছিল। তার আবার পুরোনো বাড়ি, উঁচু উঁচু সিলিং, রাশি রাশি জানলা-দরজা, এসব ভাল লাগে। সে ছাদে উঠে গনগনে রোদে কাপড় শুকোতে দেবে, আবার কালবৈশাখী এলে ঝড়ের হাওয়ায় উথালপাথাল হতে হতে কাপড় তুলে আনবে। দুমদাম দরজা জানলার আওয়াজ, ঘুলঘুলিতে চড়ইপাখির বাসা, পাঁচিলের ফাটলে অশ্বত্থগাছ এ সবই তার ভারি পছন্দের জিনিস। কিন্তু শুভেন্দুর এক গোঁ। সে এ বাড়ি ছাড়বেই। বউয়ের খামখেয়ালের জন্যে নতুন বাড়িতে থাকতে পারবে না নাকি সে তাই বলে? আচ্ছা বউ তো তার! তখন নন্দিতা অগত্যা হেসে ফেলে। দৌড়োদৌড়ি করে সব গুছিয়ে তুলতে থাকে। কী ফেলে যাবে, কী নেবে, কী নতুন কিনবে তার হিসেবনিকেশ করতে করতে একটা শালিখনি কি চড়ুইনির মতোই মহা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে শুভেন্দুর বুকের ভেতরটা আনন্দে শিরশির করতে থাকে। 'নন্দিতা, আ-নন্দিতা অ-নন্দিতা' সে গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে।

আগেকার পছন্দটাকে আঁকড়ে ধরে নতুনের সব কিছু বরবাদ করে দেবে এমন মেয়েই নয় নন্দিতা। নতুন বাড়িটা তার ভারী ভালো লেগে যায়। ফিকে লাইল্যাক রঙের দেওয়ালে যামিনী রায়ের গণেশজননী টাঙাতে টাঙাতে সে দুদ্দাড় করে ছোটে প্লেনের আওয়াজ শুনে, জানলার গ্রিল ধরে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে, বলে, 'ভালোই হল বলো। আজকাল এয়ারপোর্ট ঢুকতে যা খরচ, এত কাছ থেকে বেশ নিখরচায় প্লেন দেখা যাবে। কী আওয়াজ! যেন আমাদের বাড়িতেই নেমে পড়বে মনে হয়!' শুভেন্দু পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু মৃদু হাসে। বিজয়ীর মতো।

তুমি আর বড়ো বড়ো কথা বলো না! আসতেই তো চাইছিলে না!

'তা অবশ্য সত্যি গো!' নন্দিতা কাঁচুমাচু মুখে অকপটে স্বীকার করে, 'আগের বাড়িটা আমার ভীষণ মায়াবী বাড়ি ছিল! পুরোনো বলে আমি কেমন খারাপ বাসতে পারি না। অন্যে পছন্দ করছে না দেখলে আমার যেন আরও মায়া বসে যায়। এ বাড়িটা একটু নীচুও। কিন্তু দেয়ালগুলো? সাটিনের মতো! আর জানলা দিয়ে মাধবীলতার ভিউটা দারুণ।' অতএব সে খুব চটপট নতুন বাড়ি মনের মতো করে গুছিয়ে ফেলে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হেসে কুটোপাটি হয়ে, বরের গাল চটকে, কান কামড়ে। খুব তাড়াতাড়ি বাকি তিন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-টালাপও সেরে ফেলে। সন্ধেবেলায় উৎসাহের চোখে দু চার সিঁড়ি টপকে টপকে উঠতে উঠতে শুভেন্দু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শোনে তার বাড়ির জানালা দিয়ে নির্ভুল ভাবে গান ভেসে আসছে, 'পিয়া বিন রয়না নহী জায়'। সে বেল বাজিয়ে দরজা খুলতে না খুলতেই বলে ওঠে, 'পিয়া বিন রয়না যাবার কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। পিয়া হাজির।'

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক নন্দিতামিটা তার বউ এখানেই করে ফেলল। এগুলোকে আজকাল শুভেন্দু নন্দিতামি বলে, আর কোনো নাম বা সংজ্ঞা খুঁজে না পেয়ে। সন্ধের শোয়ে এসপ্লানেড পাড়ায় ছবি দেখতে গিয়েছিল। একেবারে খেয়ে বাড়ি ফিরছে। দুজনেরই খুব মেজাজ খুশ। সারা রাস্তা বাসে বসে বসে ফিলম্‌টার পিণ্ডি চটকেছে দুজনে আর হেসে খুন হয়েছে। তাদের বাড়ি যেতে হলে একটা পাক-খাওয়া গলি পড়ে। গলিটা এড়িয়েও যাওয়া যায়, তবে তাতে ভীষণ ঘুর হয়ে যায়। গলিপথে কিছুটা এগোবার পর একটা চাপা বচসার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, তারপরেই সামনে যেখানে মোড়, গলিটা দু-ভাগ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে সেইখানে টিমটিমে আলোয় একটা জটলা, কয়েকটা তীক্ষ্ণ গালাগাল তারপর একটা ছোরা ঝলসাতে দেখল ওরা। শুভেন্দু কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যা-মুক্ত তির কিংবা বলা উচিত বুলেটের মতো বেগে নন্দিতা তার পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুভেন্দু দেখতে পেল উদ্যত ছোরা হাতে এক বিশাল চেহারার ঝাঁকড়াচুলো মস্তান, তার পেছনে আরও কিছু দলা-পাকানো লোক, অপরদিকে মাথা নীচু করে এক হাত ওপরে তুলে আঘাত এড়াবার ভঙ্গিতে এক ছোকরা। উভয়ের মাঝখানে লাল শাড়ি পরা নন্দিতা একটা ছোট্ট হাইফেনের মতো, কিংবা ছোট্ট একটা ফুলকির মতো। 'না, না খবরদার না' সে চিৎকার করে বলছে, 'খবরদার মারতে পারবেন না।' নিমেষের মধ্যে ছোকরা ডানদিকের গলি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বেরিয়ে গেল, মস্তানের চোখে আগুন, ছোরা নেমে আসছে।

ব্যস, শুভেন্দু আর কিছু দেখেনি, জানে না। তার সামনে নিকষ আঁধার। যখন আবার দেখল, দেখতে পেল গলির মোড় শূন্য, সে বসে পড়েছে, নন্দিতা বলছে, 'কী হল তোমার? ওঠো! শিগগির বাড়ি চলো।' শুভেন্দু অবাক হয়ে দেখল তার বউ অক্ষত আছে।

কোনোক্রমে বাড়ি ফিরে, দরজায় ভেতর থেকে একটা তালা লাগাল শুভেন্দু। ভারী একটা কৌচ এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখল। নন্দিতা বলল, 'কী করছ?'

শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, 'এতে কিসুই হবে না। দু-চারখানা লাথিতেই ভেঙে পড়বে। তবু ডুবন্ত মানুষ তো কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরে।'

তার মানে? কে লাথি মারবে?

কেন? ওই যাদের নোংরা কাজিয়ার মধ্যে তুমি তোমার নির্বোধ নাকটি গলিয়েছিলে? খুব ভাগ্য ভালো যে তোমাকেই খুন করেনি বা...

নন্দিতা বলল, 'তাই বলে, আমার চোখের সামনে মানুষ মানুষকে খুন করবে আর আমি কিছু বলব না তা তো হয় না, হতে পারে না!'

আর যদি আক্রোশে তোমাকেই খুন করত?

খুন হয়ে যেতাম, কেউ না বাঁচালে।

আর যদি রেপ করত?

রেপই হয়ে যেতাম। নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে বা কেউ না রক্ষা করলে! তবে এসব ভাবিনি তখন, দেখেছিলাম দুটো মানুষ, একজনের হাতের ছুরি অন্যজনের ওপরে নেমে আসছে, মাঝখানে দু-আড়াই ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা, ওইটুকু ছাড়া আর কিছু দেখিনি, কিচ্ছু ভাবিওনি।

কী ভয়ানক। কী ভয়ংকর ভয়ানক! এ মেয়েটা ভাবে না পর্যন্ত! শুভেন্দু ভাবল, এবং ভাবতেই থাকল, ভাবতেই থাকল। অফিস যাবার সময়ে বেরোতে বেরোতে ভাবে, বাড়ি ফেরবার সময়ে ফিরতে ফিরতে ভাবে। গলিতে কদাচ নয়। তথাপি ভয়। আর কিছু না হোক বাড়ি গিয়ে কী দেখবে এই ভেবে ভয়। যার জন্য এত ভয় ভাবনা সেই নন্দিতা কিন্তু একদম স্বাভাবিক। দোকান-বাজার যাচ্ছে, দরজা হাট করে খোলা রেখে বাসনওয়ালির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, হাসি গান গল্প। দিব্যি আছে।

কদিন পরে শ্যামবাজারের মোড় থেকে বাসে উঠছে, হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভারী হাত পড়ল। একেবারে চমকে উঠেছে শুভেন্দু।

কী রে শুভ?

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে শুভেন্দু খুশিতে ফেটে পড়ল, 'আরে রমেন না?'

চিনতে পেরেছিস তাহলে!

ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্তর্পণে তাকে বার করে আনতে আনতে রমেন বলল।

তোকে কখন থেকে ডাকছি গাড়ির মধ্যে থেকে শুনতেই পাচ্ছিস না। অনেকক্ষণ থেকে তোকে ফলো করতে করতে আসছি। চল্ ওইদিকে গাড়িটা পার্ক করেছি। শুভেন্দু একমুখ হেসে বলল, 'কবে ফিরলি?'

বছর খানেক। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউয়ের মুখে চেম্বার করেছি। আয় না, দেখে যাবি। আমি অবশ্য এখন চেম্বার বন্ধ করে বেরোচ্ছি।

শুভেন্দু বলল, 'ঠিকানাটা দে, অন্য একদিন যাব। আজ না। বউ বাড়িতে একা রয়েছে। জায়গাটা ভালো না।'

'বিয়ে করেছিস? কবে?' রমেন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বছর তিনেক হল।

তো চল্, তোর বউ দেখে আসি। নেমতন্নটা তো একেবারেই মিস করে গেছি দেখছি।'

যাবি? খুব ভালো হয় তাহলে।

রমেন তার ক্রিম রঙের মারুতি ভ্যানের দরজা সরিয়ে দিল। তারপর বলল,

আমি পিঠে হাত রাখতে ওরকম ঘাবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলি কেন রে?

ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলুম বুঝি?

হ্যাঁ, একেবারে চমকে উঠলি।

আর বলিস না, এই বউটা আমার মাথা খারাপ করে ছাড়বে।

কী ব্যাপার?

গাড়িতে যেতে যেতে শুভেন্দু তখন ব্যাপারটা বলল! শুনে রমেন হাসতে লাগল।

অন্যদিন শুভেন্দুর ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আজ রমেনের গাড়িতে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। দরজা খুলে দিল বাসনমাজার মেয়েটি। 'কে রে?' নন্দিতার গলা শোনা গেল। মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে, 'দাদাবাবু।'

'ওমা, তুমি এত সকালে!' বলতে বলতে শোঁ-ও-ও করে নন্দিতা এসে হাজির হল। পরনে চুড়িদার-কুর্তা। ওড়নাটা কষে কোমরের সঙ্গে বাঁধা আঁটসাঁট করে একটা বিনুনি বেঁধেছে। পায়ে রোলার স্কেট। এ বাড়িতে কোথাও চৌকাঠ নেই। রোলার স্কেট পায়ে চড়িয়ে নন্দিতা ঘর থেকে ঘরান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একবার শোঁ করে পেছনে গড়িয়ে আরেকবার দ্বিগুণ শোঁ করে সামনে গড়িয়ে এসে নন্দিতা রাজকীয় সালাম জানাল রোলার স্কেটের ওপর থেকে 'আইয়ে জনাব'। পরক্ষণেই পিছনে অপরিচিত মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিতে নিতে তার পশ্চাদপসরণ। একেবারে রান্নাঘরের মধ্যে 'ক্কী কাণ্ড!' একটু পরে খালি পায়ে ওড়না দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে সে বলল। মুখে লাজুক-লাজুক হাসি।

রমেন বলল, 'কেন, বেশ তো ছিলেন, বাহনের ওপর থেকে নেমে এলেন কেন?'

নন্দিতা মুখ ঢেকে হেসে উঠল।

শুভেন্দু বলল, 'এই হল আমাদের রমেন। রমেন দা গ্রেট।'

'বাস? ওইটুকুতেই ইনট্রোডাকশন হয়ে গেল?' রমেন বলল।

'এর চেয়ে বেশি বলতে হবে না, বুঝলেন?' নন্দিতার হাসি-হাসি মুখ, 'আপনি প্রায়ই আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে থাকেন, তা জানেন?'

'সুদূর লন্ডনে বাস করে আপনাদের মাঝখানে ... আমি কি ভূত-টুত নাকি?'

'আরে, ও বলতে চাইছে তোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে গল্পসল্প হয়। এই আর কি!'

'তাই নাকি, বাঃ।' রমেন খুব খুশি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দিতা দশভুজা হয়ে উঠল। প্রথমেই একদফা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। চা টা শেষ হতে না হতেই কীসের বড়া গরম গরম ভেজে এনেছে, তার সঙ্গে আবার চা। তার পরে ছানার পুডিং হাজির করল, সেটা শেষ হলে বলল, 'মুখটা মিষ্টিয়ে গেল না কি? কুচো নিমকি খাবেন?'

রমেন বলল, 'তাই বলি শুভটা রোগাপ্যাংলা ছিল বরাবর, এমন গায়েগতরে হয়ে উঠল কী করে? এই-ই তার সিক্রেট?'

নন্দিতা বলল, 'ওসব বললে শুনছি না, আপনি আজ খেয়ে যাচ্ছেন।'

রমেনের সমস্ত আপত্তি হাওয়ায় উড়িয়ে দিল নন্দিতা। তারপর সে এই সদর দরজা খুলে ছুটে যাচ্ছে সম্ভবত বাজারে, এই আবার প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে, রান্নাঘরে যাচ্ছে একবার, পরক্ষণেই সে এসে বসছে, গল্পে যোগ দিচ্ছে। এমনি করে রাত নটা নাগাদ সে গা ফা ধুয়ে একটা জমকালো পোশাকি শাড়ি পরে, কপালে টিপ, পুরো চুল খোলা খেতে ডাকল ওদের। হাত বাড়িয়ে বিরিয়ানি দিচ্ছে ওদের প্লেটে, তখনই শুভেন্দু এবং রমেনও লক্ষ্য করল জিনিসটা। ডান হাতের তলার দিকে আড়াআড়ি একটা চওড়া লালচে দাগ।

'ওটা কী? কী হয়েছে?' শুভেন্দু শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল।

হাত উলটে নন্দিতা দাগটা দেখল, একটু অবাক হয়ে বলল, 'তাই জ্বালা-জ্বালা করছিল। ও কিছু না।'

কিছুতেই সে আর কিছু বলল না।

'দারুণ খেলাম' রমেন হাত ধুতে ধুতে বলল।

'আবার যাতে আসেন তাই চেষ্টাচরিত্র করে ভালো খাওয়ালাম।' নন্দিতার জবাব, 'বিরিয়ানি রাঁধলাম, জামদানি পরলাম আপনার অনারে, আর এই নিন।'

সে মুঠোভরতি কাঁটালিচাপা ফুল রমেনের দুহাতে উপুড় করে দিল। ফুলগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা পলিথিনের প্যাকেটও এনে দিল রাবার ব্যান্ড সুদ্ধু।

রমেন বলল, 'রোলার স্কেট না পরেই তো আপনি হানড্রেড মাইল স্পিডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখলুম। ওটার দরকার হয়েছিল কেন?'

নন্দিতা চারদিকে কেমন বিহ্বল চোখে চেয়ে মৃদু হাসল, বলল, 'কেন জানেন না? শোনেন নি, সেই :

'জলের কলে টিপ, টিপ
টিপ্ টিপ্
আমরা বলেছিলাম যাব
সমুদ্রে।
নদী বলেছিল যাবে
সমুদ্রে।
আমরা বলেছিলাম যাবো'
সমুদ্রে।
আমরা যাব।

বলতে বলতে মুখটা উলসে উঠল তার।

নীচে গিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে রমেন বলল, 'দারুণ কাটল রে সন্ধেটা। চলি। আবার দেখা হবে। তারপর স্টিয়ারিঙে হাত রেখে হেসে বলল, 'তোর বউটা একটা পাগলি।'

কী বলতে চাইল রমেন? শুভেন্দু ওপরে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগল। তারপর থেকে প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাথার মধ্যে কথাটা তাকে আঘাত করে যায়, 'পাগলি, তোর বউ একটা পাগলি।' কেন এ কথা বলল রমেন? পাগলি কথাটা লোকে আদর করে বলে আপনজনকে। 'দূর পাগলি!' আবার বিরক্ত হলে বলে, 'কী পাগলামি করছ?' কিন্তু 'তোর বউটা একটা পাগলি।' কী প্রকৃত মানে এই কথার? শুভেন্দু তার বউ নিয়ে গর্বিত। তিন ঘণ্টার মধ্যে লাফঝাঁপ করে বানিয়ে দিল বিরিয়ানি, ফিশ তন্দুর, ফ্রায়েড চিকেন। নিজেই বাজার গেল, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কী মালমশলা সংগ্রহ করল কে জানে, বানিয়ে তো দিল। অরেঞ্জ-চকোলেট রঙের ওই শাড়িটা পরে কপালে লম্বা টিপ, আধ-কোঁকড়া চুল খুলে যখন খাবার টেবিলে পরিবেশন করছিল? সম্রাজ্ঞীর মতো। ম্যাজিশিয়ানের মতো যখন হাতের মুঠো থেকে কাঁটালিচাঁপাগুলো বার করল? কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ঠিক কথা বলার মতো করে বলে উঠে একটা চমৎকার ছোটো গল্পের মতো শেষ করল শুভেন্দুর বাড়িতে রমেনের প্রথম আসার দিনটা!

অথচ প্রতিক্রিয়ায় 'তোর বউটা একটা পাগলি!' এ কথা কেন বললি রমেন? ভেবে বললি?

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো শুভেন্দুর মনে পড়ে যায় নন্দিতার ডান হাতের সেই চওড়া কালশিটের দাগ, কদিন আগে যা লাল ছিল. মনে পড়ে যায় বৃষ্টির রাতে ছুটে যাওয়া, 'কুকুরটা কী ভয়ানক কাঁদছে গো!' মনে পড়ে যায় মস্তানের উদ্যত ছুরির তলায় লাল শাড়ি পরা স্ফুলিঙ্গের মতো নন্দিতাকে, সানাই ভাল লাগে না যার, সানাই শুনলে যে বিষাদের অতলান্তে তলিয়া যায় সেই নন্দিতাকে। শুভেন্দু আর দেরি করে না।

অফিসে আজ খুবই দেরি হয়ে গেছে। তবু সে শ্যামবাজারের মোড় থেকে চট করে বাস ধরে না। চলে যায় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ। ডক্টর রমেন বাগচির চেম্বারে।

নিজের নাম পাঠিয়ে দিয়ে ওয়েটিং রুমে বসে শুভেন্দু। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি লাল চোখ তরুণকে নিয়ে বসে আছেন। ছেলেটি যেন ঘুমঘোরে রয়েছে। ঘোর ভাঙলেই সে ভয়ংকর কিছু একটা করে ফেলবে। আরও দুজন সঙ্গী রয়েছেন ভদ্রলোকের। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে এসে চুপি চুপি কথা বলে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর পাশেই বসে আরেক জন, শুভেন্দুর থেকে বড়ো হলেও যুবকই। তাঁর সঙ্গে একটি খুব সুন্দরী বউ। এতো সুন্দর, কিন্তু যেন-বিষাদপ্রতিমা। দেখলে মনে হয় নৈরাশ্যের সিন্ধু থেকে উঠে এল বুঝি। শুভেন্দুর বাঁ পাশে একটি অল্পবয়সি ছেলে। চোখে চশমা। ধারালো মুখ। সে শুভেন্দুর সঙ্গে যেচে আলাপ করল। —'কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি কার জন্য এসেছেন?'

শুভেন্দু কী বলবে ভেবে পেল না। সে কি সত্যি-সত্যিই নন্দিতার জন্যে এসেছে? নন্দিতা কী

'এসেছি এক নিকট আত্মীয়ার ব্যাপারে', ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে বলল শুভেন্দু। আপনি?

'আমার নিজের জন্যে।' ছেলেটি খুব সুন্দর হেসে বলল, 'অনেকের ধারণা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে খালি মনোরোগীরাই আসে। ধারণাটা ঠিক নয়। অনেক রকম ডিজঅর্ডার আছে জানেন তো? আমার কথাই ধরুন না কেন। দুবার ডাবলু বি সি এস দিয়েছি। র‍্যাঙ্ক ভাল আসেনি তাই আবার দিচ্ছি। এবার বুঝলেন .. হয় এসপার নয় ওসপার! তো যা-ই পড়তে যাই মনের মধ্যে ঝমঝম করে কবিতা বাজে, এখান থেকে এক লাইন ওখান থেকে এক লাইন, ধরুন 'দাওয়ায় বসে জটলা করে পূর্বপুরুষেরা' কি 'তোমায় আমি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে' কি 'অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে/আমায় গভীর রাত্রে ডাকে— ও নিরুপম, ও নিরুপম ও নিরুপম' বলতে বলতে ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সটান উঠে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করে দিল যেন এটা মঞ্চ :

মন্দ ভালো নেইকো কিছুই, আকাশ মাথায়
বাউল-বাউলি দাঁড়িয়ে থাকায়,
নিম ঘোড়ানিম আকাশ ফুঁড়ে কৃষ্ণ-কিবিচ ফাঁসিয়ে রাখায়,
থই থই থই সমুদ্র জল তাথৈ তাথায়,
ওপর নীচে ডাইনে বামে আমার থেকেই আমায় ভাগায় ... আমায়
ভাগায় ... আমায় ভাগায়।

শুভেন্দু আশেপাশে তাকাল। সবাই ভয়ের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে। সুন্দরী মেয়েটির চোখ ভরতি জল। লালচোখ ছেলেটি লম্বা সিটের ওপর শুয়ে পড়ছে। রমেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি এসে ডাকল, 'কৌস্তুভ সেনগুপ্ত।' কবি ছেলেটি তাড়াতাড়ি চেম্বারে ঢুকে গেল। শুভেন্দর

হঠাৎ ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয়। এসব যেন তার চেনা। এ লাল চোখ সে দেখেছে 'খবর্দার মারতে পারবেন না' বলে যখন ঝলসে উঠেছিল। ওই বিষাদপ্রতিমা নয়ন-ভরা জল, দিনে রাতে দেখতে দেখতে এক সময় সে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আর এই রকম মিঠে হাসি, চোখ দুটো হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, এই রকম . ঠিক এই রকম .. ঠিক! ভয়ে অধীর হয়ে উঠল সে। উঃ। কখন তাকে ডাকবে রমেন?

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি একটা ছোট্ট নোট পেপারে লেখা একটা চিঠি এনে দিল।

শুভ, একটু বোস ভাই। পেশেন্টদের ছেড়ে দিয়েই তোর সঙ্গে বেরোব।

রমেন, রমেন তুই জানিস না, শুভ তোর সঙ্গে মজা মারতে, ইয়ার্কি দিতে আসেনি। তার বাড়িতে ভীষণ বিপদ। খুব বিপন্ন একজনের জন্যেই আজ সে তোর কাছে ছুটে এসেছে।

ঠিক এক ঘণ্টা বারো মিনিটের মাথায় শেষ রোগীটি বেরিয়ে গেলে, শুভেন্দুর ডাক পড়ল।

'কী ব্যাপার বল্? চা খাবি তো? না কফি, মায়া একটু কফি বানাও ভাই।' অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রমেন বলল।

'আরে দূর তোর কফি' শুভেন্দু বলল, 'আমি ভীষণ সমস্যায় পড়ে এসেছি।'

'তোর আবার কী সমস্যা? ফার্স্ট ক্লাস আছিস!' রমেন পাত্তাই দিল না।

শুভেন্দু বলল, 'তোকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করছি রমেন, নন্দিতা আমার বউ কি অস্বাভাবিক, মানে অ্যাবনর্ম্যাল?'

রমেন ঝুঁকে বসে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কী? একথা কেন বলছিস?'

শুভেন্দু বলল, 'সেদিন ওর ডান হাতে একটা লাল দাগ দেখেছিলি, মনে আছে? সেটা কি জানিস? স্কেলের বাড়ি। আমাদের নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা মেরেছেন।'

বলিস কী রে? এফ. আই. আর কর, এফ. আই. আর. কর। ডেঞ্জারাস মহিলা তো!

আরে, আগে সবটা তো শোন!

বল, আয়্যাম অল ইয়ার্স।

নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার একটি হাবাগোবা ছেলে আছে; বছর বছর ক্লাসে ফেল করে। তা করবে না তো কী?

পেনসিল-পেন-খাতা-বই এ সবেরও শ্রাদ্ধ করে ছেলেটা!

করবেই! তার কি সেন্স আছে!

সেটাই। তো ভদ্রমহিলা ছেলেটাকে এরকম কিছু ঘটলেই আচ্ছা করে পেটান। তুই যেদিন গেলি সেদিন সকালে নাকি নন্দিতার ভাষায় অমানুষিক পেটাচ্ছিলেন। ছেলেটার চিৎকার শুনতে পেয়ে ও ছুটে যায়, দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রহারে বাধা দেবার চেষ্টা করে, স্কেলের বাড়িটা ছেলের ওপরেই নামছিল, নন্দিতার হাতের ওপর পড়ে।

'তাই বল!' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমেন বলল।

শুভেন্দু বলল, 'ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আমার কাছে গম্ভীর মুখে নালিশ করে গেলেন, আমার স্ত্রী ওঁদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে। যখন নালিশ জানাচ্ছিলেন, তখন নন্দিতা বাজার গেছিল। ফিরে এসেছে, ওঁরা দেখতে পাননি। নন্দিতা চোখ গরম করে বলল, আপনারা যদি টুটুকে পেটানো বন্ধ না করেন আমি পুলিশে খবর দেব, হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব, জেনে রাখবেন। সে কী চেহারা রে, যেন বাঘিনি!'

রমেন হাসতে হাসতে বলল, 'তো কী। ভালোই করেছে তো! সন্তানের দ্বারা বাবা-মাকে ডিভোর্স করার আইনটা পাস হয়ে গেলে ভালোই হয়।'

শুভেন্দু বলল, 'আরও শোন', সে পূর্বাপর আজ অবধি যা ঘটে গেছে সবগুলো বলে গেল, তারপর অভিযোগের স্বরে বলল, 'তুইও তো প্রথম আলাপেই আমার বউটাকে পাগলি বললি। বলিসনি।'

'বলেছিলুম বুঝি।' রমেন হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা তোর কী বলার আছে বল।'

'বলবার আর কী আছে? আমি তোর কাছ থেকে প্রফেশন্যাল ওপিনিয়ন চাইছি। অ্যাড্ভাইসও।

রমেন হাতের আঙুলগুলো মন্দিরের মত চুড়ো করতে করতে বলল, 'দ্যাখ শুভ, আমাদের শাস্ত্রে বলে সেন্ট পার্সেন্ট নর্ম্যাল লোক খুব কম। আসল হল ব্যালান্স। মানে ভারসাম্য। এই ভারসাম্যটা যদি এদিক ওদিক হেলে একটু কম বেশি হয়ে যায় তো মানে বুঝেছিস? এক চুলের তফাত।'

আতঙ্কিত চোখে তার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বলল, 'তা হলে?'

'ধুর— ঘাবড়াচ্ছিস কেন?' হালকা গলায় হেসে উঠল রমেন, 'ঘাবড়াবার আছেটা কী? মেডিক্যাল সায়েন্স যে এত উন্নতি করল, প্রযুক্তি বিজ্ঞান যে আজ কোন চুড়োয় উঠে গেছে, এসব কি ঘাবড়াবার জন্যে? ম্যান ইজ অলমোস্ট গড নাউ। সামান্য খুব সামান্য একটু মেডিকেট করলেই নন্দিতা ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে বেস্ট ওষুধ দিচ্ছি আমার স্যাম্পল থেকে।' সে খসখস করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর ড্রয়ার খুলে বেছে বেছে কয়েক পাতা ওষুধ বার করে দিল। দু রকম ওষুধ। খাওয়াবার নিয়মটা বলে দিল। তারপর বলল, 'তিন বছর বিয়ে হয়েছে বললি, না? এবার একটা বাচ্চা বানিয়ে ফ্যাল। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অবাক চোখে চেয়ে নন্দিতা বলল, 'ওষুধ? ওষুধ খাব কেন?'

আরে খাওই না। আমি তো তোমার স্বামী, না শত্রু? বিষ টিষ দেব?

না, তা নয়। তবে কনট্রাসেপটিভ পিল টিল আমি আর খাচ্ছি না।

সে তো নয়ই। এবার মেটার্নিটি হোম, কাথা, ভ্যাকসিনেশন, ওঁয়া ওয়া শুরু হয়ে যাবে, আমার দুঃখের দিন এল বলে।

নন্দিতা হেসে ফেলে—'বাব বাঃ, কী হিংসুটে।'

এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নাও দিকি।

কীসের ওষুধ বলবে তো?

নার্ভের, বাবা নার্ভের, নার্ভ শান্ত রাখবে। মন ঠান্ডা থাকবে, হবু জননীর আদর্শ মানসিক অবস্থার সূচনা হবে।

'সত্যি? কই দাও।' অনাবিল বিশ্বাসে নন্দিতা হাত বাড়ায়। সকালে, বিকেলে, রাত্রে। সকালে, বিকেলে, রাত্রে। সকালে, বিকেলে, রাত্রে।

তৃতীয় দিন অফিস থেকে সে ফোন করল রমেনকে।

কেমন আছে রে, নন্দিতা?

পার্ফেক্ট। থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ ভেরি মাচ।

নিজেকেই থ্যাংকসটা দে। তোর ডায়গনোসিস, আমার প্রেসক্রিপশন', রমেন বলে, 'ঠিক হয়েছে, চালিয়ে যা এখন কিছু দিন।

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরলে দরজা খুলে দেয় পরিষ্কার ফিটফাট নন্দিতা।

দুজনে চা আর ডালমুট নিয়ে গল্প করে।

জানো, আজকে নন্দিনীকে খুব দিয়েছি।

তাই?

সোজা বললুম, আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে জানেন না, আগে শিখুন, তার পরে বলবেন।

ওমা!

একেবারে চুপসে গেল, জানো? প্রোমোশনের চিঠি আমার হাতে। কী বলবে আর!

ঠিকই।

এবার বোসকেও ধরব। যত রদ্দি মার্কা টুর সব আমাকেই করতে হবে। বললেই বলবে ঠেসে টি. এ বিল দেবেন কোম্পানিকে। ভালোই তো।' যেন আমি ফলস্ টি. এ বিলের এক্সপার্ট। আমার ফ্যামিলি লাইফ বলে প্রাইভেট লাইফ বলে কিছু থাকতে নেই। সব অপমানের শোধ এবার তুলব।

'দাঁড়াও, প্রেশারের তিনটে হুইশ্‌ল হয়ে গেল' নন্দিতা চলে যায়। অনেকক্ষণ আসে না আর।

সান্ধ্য চান সারতে সারতে শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হয় নন্দিতা তো কই 'নন্দিনীকে খুব দেওয়া'র প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল না। বলল না তো, 'আহা, ওরকম রূঢ়ভাবে বললে কেন?' জিজ্ঞেসও তো করল না কীসের প্রোমোশন। কেন প্রমোশন!

কাজের মেয়েটি চলে গেলেই গোটা ফ্ল্যাটটাতে তারা একা। সেই সময়ে নন্দিতা কোনো কোনোদিন এসে তার কোলের ওপর ঝুপ্ করে বসে পড়ে, গলা ধরে দোল খায়। বলে, 'জানো, তোমার ঘামে একটা কাটা ফলের মতো গন্ধ বেরোয়। প্লিজ, আরেকটু পরে চান কোরো।' কাঁধের ওপর মুখ রাখে নন্দিতা। 'দেখো, ভিড় বাসে মেয়েদের সিটের সামনে দাঁড়ালেও, কখনও কোনো মেয়ে তোমার দিকে নাক কুঁচকে তাকাবে না। মেয়েদের আসলে নাকটাই খুব, বোধ হয় সবচেয়ে জোরালো। বুঝলে?' তারপর শুভেন্দুর নাকে নিজের নাকটা ঠেকিয়ে বলে, 'তাই বলে যেন তুমি আবার বাসে মেয়েদের কাছে এটা পরীক্ষা করতে যেয়ো না। খবরদার।' চোখ পাকিয়ে তর্জনী তোলে নন্দিতা।

তা সেসব তো কই কিছুই হয় না! শুভেন্দু পত্র-পত্রিকা নিয়ে স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে থাকে। সাহেবরা অক্লান্ত গল্‌ফ খেলে যায়। গল্‌ফ খেলে যায়। সামনে দিয়ে নানা কাজে যাতায়াত করে নন্দিতা। কখনও কুশনের ওয়াড় পালটাচ্ছে, কখনও টেবিল মুছছে। টি.ভি -র গায়ে চুম্বক লাগানো ছোট্ট মূর্তিটা ওপরের দিকে ছিল, নীচে সরিয়ে দিল। হেঁকে বলল একবার, 'গান শুনবে? চালাব কিছু?' কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়ে টেবিলে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার। তারপর একটু টিভি দেখা। নিবিড় ঘুম। রাতে কোনো দিন হয়তো 'বলো হরি, হরিবোল' যায়। বাড়ি কেঁপে ওঠে হরিধ্বনির চোটে। শুভেন্দু জেগে যায়। এই বুঝি নন্দিতা ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাঃ। নন্দিতা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোনোদিন মাঝরাত্তিরে রেললাইনের ধারে দু-দলের বোমাবাজির শব্দে রাত যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নন্দিতা কাছে এসে কাতর গলায় বলে না, 'ইস্‌স্‌স্ দেশটা দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে, কতগুলো টাটকা তাজা ছেলে এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।' নন্দিতার স্নায়ু খুব শক্ত হয়ে গেছে। সে নিবিড় ঘুম ঘুমোচ্ছে।

এমনকি, অফিস যাওয়ার সময়ে খেতে বসে অনেক সময়ে শুভেন্দু টুটুর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পায়। ডাক্তার বলে দিয়েছে, ওর মস্তিষ্ক অপরিণত, ও পারবে না। তবু ওর মা ওকে ঠ্যাঙাচ্ছে। শুভেন্দু উৎকর্ণ হয়ে থাকে। টুটুর জন্যে ততটা নয় যতটা নন্দিতার জন্যে। তার ভাব লক্ষ করে নন্দিতা নিঃশব্দে পাতে আর একটু ভাত তুলে দেয়, বলে, 'খেয়ে নাও। শুনে কী করবে? করতে তো পারবে না কিছু। ওদের ছেলে ওরা বুঝবে।'

কাছেই কারও বাড়ি বিয়ে, সকাল থেকে সানাই বাজছে, ভয়ে ভয়ে অফিস যায়, অফিস থেকে

ফেরে শুভেন্দু। চোখের সামনে সেই সুন্দরী মেয়েটির ছবি ভাসছে। বিষাদপ্রতিমা, নয়ন ভরা জল। ভয়ে ভয়ে দরজায় বেল দেয়। সর্বনাশ, কেদারা ধরেছে এবার! কেদারা! কেদারা সইতে পারে না নন্দিতা! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে, 'টুবলু, আমার টুবলু চলে গেল, উঃ, ওকে তোমরা নিয়ে যেয়ো না, নিয়ে যেয়ো না! ফিরিয়ে দাও।' দরজা খুলে যায়। নন্দিতা শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'কী হল তোমার? শরীর খারাপ করছে? ভেতরে এসো। যা গুমোট চলছে।'

শরবত এনে দেয়। ভিজে গামছা দিয়ে কপাল, ঘাড়, হাত-পা সব মুছিয়ে দেয়। ফ্যানটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে সামনে বসে থাকে। 'কী গো? ঠিক আছ তো? না ডাক্তার বলব!'

ওদিকে মন প্রাণ নিংড়িয়ে কেদারের সুর ওঠে নামে। নন্দিতা যেন বধির হয়ে গেছে।

রমেন ফোন ধরেছে, 'হ্যালো, হ্যালো। শুভ? বউ ঠিক আছে তো?'

'একদম ঠিক ভাই, একদম।'

'তো এইবার একটা ... বুঝলি তো? শুধুই দুজন করিব কূজন আর নয় ...

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ঠিক আছে, বুঝেছি, বুঝেছি।'

চাঁদনি রাত। শ্রাবণের চাঁদ। যদি দেখা গেল না তো গেলই না। কিন্তু যদি দেখা গেল তো সে তার রুপোলি মদ দিয়ে তোমাকে মাতাল করে দেবে একেবারে। তখনই বোঝা যাবে এ চাঁদ নীল আর্মস্ট্রং-এর নয়, এ চাঁদ সুকান্ত ভট্টাচার্যেরও নয়। এ সেই আদি অকৃত্রিম কবি মহা-কবিদের রাকা শশী। চাঁদনি। হেনার উগ্র সুবাস সঙ্গে নিয়ে সেই চাঁদনি ঘরের মধ্যে ঢুকছে। একটা ফিকে রঙের ফ্রিল দেওয়া দেওয়া রাত-জামা, যেন ওই চাঁদেরই ফেনা। নন্দিতা ঘুমোচ্ছে। মাতোয়ালা শুভেন্দু মৃদু মথিত মন্দ্র স্বরে ডাকছে, 'নন্দিতা, নন্দিতা, কই এসো।'

নন্দিতা কি জাগবে না? এমন ডাকেও জাগবে না? আবার ডাকে শুভেন্দু, আবার, আবার।

নন্দিতা জাগছে। খুলে গেছে তার চোখের পাপড়ি।

নন্দিতা আসছে। কিন্তু ও কী?

আসছে আহত জন্তুর মতো। গুঁড়ি মেরে। নিজেকে টেনে টেনে।

শিঙালের রাত-চেরা আকাঙ্ক্ষার ডাকে হরিণীর ঠ্যাঙের তুরুকে নয়। নিবে গেল বুঝি পৃথিবীর কোটরের সৃজনী আগুন। বাঁধের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে দুর্দান্ত নদী। না চাইতেই দু কূল ভবে আর দেবে না। তার পুরুষের বুকের তলায় নন্দিতা যান্ত্রিক, উদাস, অসাড় হয়ে থাকে। অবিকল এই পৃথিবীর মতো।

নকশা

'শুনেছিস? অরি বিশ্বাস বেপাত্তা'—সুদেব সরকার বলল সমীরকে, 'এখনও পাবলিক জানে না।'

'বলিস কি? এ তো অবিশ্বাস্য খবর? ফার্স্ট পেজের অ্যাঙ্কর-এ যাবে।'

'হ্যাঁ। সে ডিটেলস বার করতে পারলে। খুঁজে আনতে পারলে তো আর দেখতে হচ্ছে না। এখন ব্যাপারটা খুন, না অ্যাবডাকশন, না স্বেচ্ছা-পলায়ন . সেটা সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকে বার করতে হবে। একটু টিকটিকিগিরি আর কি।'

সমীর বলল, 'এই সেদিন নতুন ছবির মহরত হল অত ঘটাপটা করে, অত খানাপিনা নাচা-গানা। এত উল্লাসের কেন্দ্রীয় কারণই তো অরি বিশ্বাস।'

'আবার কি? কত দিন থেকে জাল পেতেছে বল তো। এতদিনে ধরা পড়ল। ধাড়ি কাতলা। আগের ছবিগুলোর দুটোই তো পাবলিক গপাগপ খেল। প্রথমটা একটু বেশি নাটুকে হয়ে গেছিল, তা ও।'

'এবারেরটা জানিস তো? অরিজিৎ-প্রতিভার বিভিন্ন দিকের দর্পণ বিশেষ।'

'কী রকম?'

'আরে আমি তো প্রেস-কার্ডে গিয়েছিলাম। পরিচালক সামন্তই বলল, এবার উনি পঁচিশ বছরে সা-জোয়ান ছোকরা থেকে বাহাত্তুরে বুড়ো পর্যন্ত সাজছেন। লিডার। অরিজিতের অ্যাকটিং, অরিজিতের মেকআপ-এর উপরই ছবিটা দাঁড়িয়ে আছে।'

সমীর বলল, 'হতেই পারে। স্টেজের উপর তো চাষাভুসো সাজলে মনে হয় এই বুঝি দেহাত থেকে ধরে নিয়ে এল। আবার আঁতেল হয়ে নামলে মনে হয় আরে, এই তো সেদিন ইনিই কফিহাউসের লর্ডস-এ বসে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো ফেঁদেছিলেন। আচ্ছা সুদেব, ওঁর 'অম্বরীষ'-এর কী হবে? বা হচ্ছে?'

'চলছে। একেবারে তো ছেড়ে দেননি। টিমটা গড়ে ছিলেন প্রাণ দিয়ে। কাজেই চলছে। ওঁর নামেই এখন পয়সাগুলো উঠে আসছে সব। তবে ওরা একটু মিইয়ে গেছে। আমার ভাইয়ের বন্ধু আছে তো ওখানে। বলছিল টিম-ওয়ার্ক খুব ভালো কথা। কিন্তু সেটা করাতে ব্যক্তিত্ব লাগে। জ্ঞান, ভালোবাসা এবং ক্রোধও লাগে। সেসব অরিজিৎ বিশ্বাসের মতো আর কারও নেই। সত্যি, ওই রকম চলা-বলা-গলা পালটাতে আর কাউকে দেখলাম না। এক কেয়া চক্রবর্তী পেরেছিল 'ভালোমানুষ'-এ।'

অরিজিৎ বিশ্বাসকে শেষ দেখা গিয়েছিল শর্মিলি সেনের গাড়িতে। শর্মিলি সেন মানে শ্যামলী তরফদার। প্রচারের প্রয়োজনে পালটে ফেলা হয়েছে নামটা। প্রাচীন শ্যামলী হয়েছে মডার্ন শর্মিলি। তরফদারটা সেতারে ছাড়া চলে না এ বিষয়ে সবাই এক মত। এবং পদবি খুঁজতে খুঁজতে স্বভাবতই সেন। সেন পদবিটা বাংলা-জয়ী। যেমন বল্লাল সেন, সুকুমার সেন, বনলতা সেন, সুচিত্রা সেন ...। দুষ্টু লোকেরা বলে শর্মিলি নয়, এঁটুলি। অরি বিশ্বাসের লেটেস্ট। শর্মিলিও রয়েছে ছবিটায়। তারই সাদা অ্যামবাসেডার-এ অরিজিৎকে শেষ দেখা গিয়েছিল। শর্মিলির শফার, ক্যামেরাম্যান

ধীরু ব্যানার্জি এবং অরিজিতের নিজস্ব মেকআপম্যান শিবসাধন সেনাপতি ঠেসেঠুসে তাঁকে সাদা অ্যামবাসাডরটায় তুলেছিলেন। অরিজিৎ স্ববশে ছিলেন না।

চোদ্দো পনেরো লাখ খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। বাংলা ছবির পক্ষে যথেষ্ট। প্রচার দেওয়া হচ্ছে খুব। ডিস্ট্রিবিউটার মুখিয়ে আছে। সবারই ধারণা ছবি পড়তে পাবে না। এমত সময়ে অরিজিৎ সেটে এলেন না। প্রথমেই ফোন করা হল শর্মিলির ফ্ল্যাটে। হয়তো সেখানেই মশগুল হয়ে রয়েছে। আর্টিস্টরা যে যত প্রতিভাশীল হোক না কেন আসলে সব... সামন্ত একটা মধুর গালাগাল উচ্চারণ করল মনে মনে। কিন্তু না, শর্মিলি জানে না। না, সেদিন ওঁকে ওঁর হোটেলের ঘরেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। না, উনি শর্মিলির ফ্ল্যাটে যাবার অবস্থায় ছিলেন না।

এবার কোথায়? হোটেলে।

না, সাতাশে অক্টোবর থেকে অরি বিশ্বাসের চাবি ম্যানেজমেন্টের কাছে, ঝুলছে। আসেননি। না, একবারও না।

'অম্বরীষ'-এর অফিসে ফোন করা হল।

'আপনারা জানেন না, আমরা জানব?' অভিমানী উত্তর।

সত্যি সত্যি জানেন না?

মানে? আপনারা কি ভাবেন ওঁকে আমরা কিডন্যাপ করব?

তবে 'অম্বরীষ' থেকে কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঠিকানা মিলল। প্রায় সকলেই বললেন, অরি বিশ্বাসের কোনো সংবাদই তাঁরা রাখেন না। একজন রেগে মেগে বললেন, 'আপনারা, এই আপনারাই চাঁদির জুতো মেরে তাকে আমাদের কাছ থেকে ফুসলিয়ে নিয়েছেন। আবার এত বড়ো আস্পদ্দা যে আমাদের কাছেই তার খোঁজে এসেছেন। পালিয়েছে? খুব ভালো কথা। এমনটাই চাইছিলুম। খোঁজ পেলেও বলব না।' পরবর্তী অভিযান আত্রেয়ী ভট্টাচার্যের আস্তানায়। আত্রেয়ী অরিজিতের ভূতপূর্ব স্ত্রী। অনেক চেষ্টা করে তাঁর ঠিকানা জোগাড় হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা খুব যাকে বলে ডেলিকেট। আত্রেয়ী দেবীও এক সময়ে বহুদিন 'অম্বরীষ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, নাটকে অংশ নিতেন না। উনি ছিলেন শিল্পী। সেট তৈরি করা, আঁকাজোকার কাজ, পাবলিসিটির জন্যে লে-আউট তৈরি করা—এইসব দায়িত্বে ছিলেন। অরিজিতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে যাবার পর 'অম্বরীষ'কেও উনি ছেড়েছেন। 'অম্বরীষ'-এর ক্ষতির খাতায় উনি দু-নম্বর। আজকাল এক ইনটিরিয়র ডেকোরেটর্স সংস্থায় কাজ করেন। তা, তাঁর অফিসে ফোন করায়, অরিজিতের খবর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে শুনে উনি দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে ফোন নামিয়ে রাখলেন। অগত্যা ওঁর বাড়ি। দু কামরার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট। উত্তর কলকাতার একটা সরু গলিতে। সামন্তকে উনি চিনতেন না বলেই বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছিলেন। অরিজিতের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন, 'আর কত সরবো?'

মানে? আপনি কী বলছেন আমি ঠিক ...

বলছি, আর কত সরবো? এই দেখুন, আট বাই দশ দুখানা ঘর কুল্লে, রান্না আর খাওয়া এক জায়গাতেই সারি। বাথরুমটা রান্নার জায়গার একেবারে পাশেই। উত্তর পশ্চিমের ফ্ল্যাট। শীতকালে কী ঠান্ডা ধারণা করতে পারবেন না। বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ নেই। মানে, থেকেও নেই। আর কোথায়? আর কত সরবো?

যদি একটা ধারণাও দিতে পারতেন। একটা আইডিয়া... উনি কোথায় যেতে পারেন।

আইডিয়া? আমার মাথায় অত আইডিয়া আবার খেলে না, বুঝলেন। কী নাম আপনার? সামন্ত? আমি ওই ব্রথেল-ট্রথেল পর্যন্ত জানি। তারপর জাহান্নমের পথে যেতে ঠিক কতগুলো,

কতরকম স্টপ আছে, থাকে, আমার জানা নেই। এবার আপনি আসুন। কই উঠুন? কুইক। আমার কাজ আছে।

সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বাপরে। কী মহিলা। দিব্যি ঠান্ডা, শান্ত-শিষ্ট মনে হয় দেখলে। এ যেন কোল্ড ড্রিংক-এর বোতল। হাত বোলালে ঠান্ডা। ছিপি খুললেই ফোঁস্‌স।

ট্রেনটা আরও স্পিড নিচ্ছে না কেন? কী হবে এতগুলো চোতা স্টেশনে থেমে? নিদারুণ অধৈর্যে, বিরক্তিতে ষষ্ঠতম সিগারেটটা শেষ না করেই বাইরে ছুড়ে ফেলে দেন অরিজিৎ বিশ্বাস। এক ব্যাটা ভিখিরি লোপপা ক্যাচের মতো সেটা লুফে নিল। এটাই একটা অকাট্য প্রমাণ যে যতটা স্পিডে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ততটা স্পিড নিচ্ছে না গাড়িটা। প্লেনে যাওয়ার জায়গা নয়। গাড়িতে গণ্ডগোল। গ্যারাজে অতএব। একগাদা টাকা দিয়ে ঘটা করে বিদেশি গাড়ি কেনবার মজাটা এবার বোঝো হে বিশ্বেস। অতীন, সর্বেশ্বর, মণীশ সব্বাই বারণ করেছিল। হো-হো করে তাদের কথা উড়িয়ে দিয়েছিলে। দিয়েছিলে তো? ভেবেছিলে গ্রুপ থিয়েটার হল শো-বিজ-এ মিডল ক্লাস। একেবারে মিডল মিডল ক্লাস। বড়ো বড়ো বক্তিমে করো সুযোগ পাবে। ফটাফট হাততালি। হাঁ, তা ও। রিভিউ?— প্রচুর প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্মী কখনও ঝেড়ে কাশবে না, দাদা! ঢাকের দায়ে মনসা বিককিরি। তা সেই গ্রুপ থিয়েটারের ওরা দেশি-বিদেশির তফাত আর কী বুঝবে?

যেমন চোতা ট্রেন, তার তেমনই চোতা ফার্স্ট ক্লাস। বাথরুমে বেসিনটা ফটাস করে খুলে এল। মানে কোনও শ্রীমান তাকে সরাবেন শিগগিরই। কাজ এগিয়ে রেখেছেন। সপ্তম সিগারেটটা ধরালেন অরিজিৎ। রাত বাড়ছে। রাত। আহা রাত? রাত বড়ো ভালো মাল। ঝিকমিক আলো। চেনা মুখ অচেনা। অচেনা মুখ যেন বড়ো চেনা চেনা ঠেকে হে। খাও দাও বেপাত্তা হয়ে যাও। কে তোমায় চ্যাং দোলা করে তুলে নিয়ে গেল, কার সঙ্গে কী বোঝাপড়া হল, কাকে কাকে চুমু খেলে, সব বঙ্কিম বুদবুদের মতো ফেটে যায়, আবার গজায়, আবার ফাটে, আবার গজায়। আর সকাল? সকাল হল শালা ঘেয়ো কুকুরের বাচ্চা। ছাল চামড়া সুদ্দু উঠে গেছে। ছ্যাঃ। খোঁয়াবি ভাঙার সকাল। অন্য সময়। অন্য সময়ে মেজাজে থাকলে তুমি সকাল, দুপুর, বিকেল কিছুর পরোয়া করো না অরি বিশ্বেস। করো না কি? নাঃ, করি না। কাজ করি। কা-জ। এমন কাজ যে হোল ওয়ার্ল্ডের তাক লেগে যায়। এই পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চির খোলে ডিনামাইট ঠাসা আছে হে সামন্ত। পাল্লা দিতে চেষ্টা কর। পারবি না।

আরেকটু পরেই এরা ডিনার দেবে বলেছে। ইংলিশ ডিনার আবার। হাঃ হাঃ। পায়রার ঠ্যাং, বেমালুম পায়রার ঠ্যাং চালাবে মোরগার ঠ্যাং বলে। ঘোড়ার পেচ্ছাপের মতো চা খাইয়েছে কয়েকবার। এবারে পায়রার ঠ্যাং। রাসকেল সব, স্কাউন্ড্রেল। গোটা রেলওয়েজ, রেলওয়ে মিনিস্ট্রি। এদের চাকরিতে যে যেখানে আছে, সব, স—ব। পয়সা নেবে, গলায় গামছা দিয়ে, দেবার বেলায় লবডঙ্কা। এদিক থেকে হিন্দি ফিল্মও সৎ। পাবলিক রেপ চায়, রেপ দেয়, মারদাঙ্গা চায়, মারদাঙ্গা দেয়। আধ ন্যাংটো মেয়েছেলে দেখতে চায়, তো তাই দেয়।

সুটকেসটা খুললেন অরিজিৎ। মাল বার করতে হবে। নইলে পায়রার ঠ্যাং গলা দিয়ে নামবে না। সামনে আবার তিনটি পুঙ্গব বসে। বহুক্ষণ থেকে গবাদি পশুর মতো চেয়ে আছে। হয় বাইরের দিকে, নয় তাঁর মুখের দিকে। চিনতে পেরে থাকবে। চেনো বাবা, চেনো। খালি ভাব জমাতে যেয়ো

না। আর 'চরণামেত্তো'ও আশা কোরো না। যারা একা একা মাল এনজয় করতে পারে না, অরিজিৎ তাদের দলে নয়। তা কয়েক ঢোঁক খাবার পরে দেখলেন পুঙ্গবগুলি প্রকৃতি দেখছে। অদূর ভবিষ্যতে যখন গপ্পো ফাঁদবে তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে, 'জানিস ফটিক, অরিজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে সেবার ট্রাভল করছিলুম। কী সদাশয় ভদ্রলোক: খুব গপ্পে। যা জমেছিল না। শেষ কালটা মানিক-অরিজিদ্দা, অরিজিদ্দা-মানিক' ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

ট্রেনটা হঠাৎ হেঁচকি তুলে থেমে গেল। এতক্ষণ বেশ 'আমি যাব না, তুমি যাবে না, তুমি যাবে না আমি যাব না' করে যে করে হোক চলছিল। এখন যেন গোঁত্তা খেয়ে ঘুড়ি লাট খেয়ে পড়েছে। বোতলটা ঢুকিয়ে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে দিলেন অরিজিৎ। বাইরে পৃথিবীর আদি রং, নিকষ কালো। বন-জঙ্গলের মতো মনে হচ্ছে জায়গাটা। উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। উলটো দিকের সিট থেকে একটি যুবক চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার, এখানে নামতে যাবেন না, অন্ধকার, অনেক নীচু, তা ছাড়া ভীষণ ডাকাতি হয় এ লাইনে। দরজা একদম খুলবেন না, কাইন্ডলি।'

অপাঙ্গে একবার চেয়ে দেখলেন অরিজিৎ। ডাকাত। মানে দস্যু। মানে গুন্ডা? অর্থাৎ মাফিয়া? সর্বনাশ। তিনি ফিরে এসে অষ্টম সিগারেটটা ধরালেন। হঠাৎ মনে হল পকেটে বিছে কামড়াচ্ছে। টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম। হোটেলের কাউন্টারে খোঁয়ারি ভাঙার সকালে আকাট টেলিগ্রাম একখানা। পাঁচ দিন না সাড়ে ছ দিন পার হয়ে গেছে। পোস্টাল সার্ভিস কী তোর বাপের? যে টেলিগ্রাম করলেই সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। কী আছে ওতে জানেন অরিজিৎ, তবু আরেকবার খুলে পড়তে লাগলেন। তিনটে শব্দ। ব্যাস আর কিছু না। এখন তাহলে আমি কী কবব। হাততালি কুড়োতে পারি, কনট্র্যাক্ট সই করতে পারি। মাল খেতে পারি। কিন্তু হনুমানের মতো লম্ফ তো দিতে পারি না। আর সব স্পোর্টস ছেড়ে এখন পশ্চিমবঙ্গে এই লম্ফ দেওয়ার খেলাটিই প্রোমোট কবা উচিত। ট্রেন ধরবে? পাথর পাতা স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে রে রে করে আসছ! জ্যাম। কুছ পরোয়া নেই। গুনে গুনে দশ পা পিছিয়ে যাও তারপর রই রই কবে স্পিড নিয়ে লাফ ঝাড়ো, এক লম্ফে হাওড়ার পুল, দুই লম্ফে হাওড়ার নতুন অ্যানেক্স। হাজরা মোড় থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত জলে ভাসছে? পঁচিশ মিনিটের প্রবল বর্ষণে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত? আবারও ওই উল্লম্ফন ভরসা। লাফ দাও বঙ্গ সন্তান, লাফ দাও। লাফ দিতে দিতে শিরদাঁড়ার তলার হাড়টি বাড়তে পারে। কার্টিলেজ, শক্ত হাড় নয়। এর নাম অভিযোজন। সোজা বাংলায় অ্যাডাপ্টেশন। এয়ার পিলো মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন অরিজিৎ।

* * *

আমি এবার যাই খোকা, আমার কেমন সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।

সে কী? রাগ করেছ? এত অভিমান করে না মায়ি। বিহার শরিফে ট্রাক নিয়ে গেছি। ন দিনের জায়গায় পনেরো দিন। এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে মাগো। অপরাধই যদি হয়ে থাকে এবারের মতো মাফ করে দে মা। আর কখনও এমন হবে না।

না রে, অভিমান-টান নয়। একটুও উদ্বেগ হয়নি আমার। সেটাই আশ্চর্য। জানিসই তো আগে তোর ফিরতে দেরি হলে কেমন মুখ শুকিয়ে আমসি করে থাকতুম। এখন, এবার এসব কিছু হল না খোকা। তুই সাবালক হয়ে গেছিস। নিজের পথে চলবি।

মা, মা, মা, তুমি বেঁচে আছ তো? কথা আছে, কথা ছিল। অনেক। মা তুমি চুপ করে থেকো না। একটু কথা বলো। একটু।

স্যার, স্যার আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন অরিজিৎ।

ঘুমের মধ্যে খুব যন্ত্রণার শব্দ করছিলেন।

'ওহ সরি। সরি টু হ্যাভ ডিসটার্বড ইউ।'

অরিজিৎ মাথার এলোমেলো চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালালেন। ঢক ঢক করে জল খেলেন খানিকটা। নবম সিগারেটটা ধরালেন। ভোর হয়ে আসছে। ঘুমজড়ানো প্ল্যাটফর্ম সব পার হয়ে যাচ্ছে। আধো আধো গলায় 'চা-গ্রম'।

'এই এদিকে দেখি, দু গ্লাস, হ্যাঁ। যাক পৌঁছোনো গেল। তাহলে পৌঁছোনো যায়।'

ফাঁকা ফাঁকা জায়গাটা। যখন মাকে রাখতে এসেছিলেন, তখন আরও ফাঁকা ছিল। এখন অনেক বাড়ি ঘর। দোকানপাট। চায়ের স্টল। ধাবা। টেম্পো, অটো, সাইকেল রিকশা। কিন্তু বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়িটিতে বসে মনে হল কিছুই নেই। যা কিছু আপাত পরিচিত, জীবন-যাপনের যন্ত্রাংশ, কিছুই নেই। মা-ও তো নেই। মা সেবা-ভবনে। অথচ এই ছোটো বাড়িটাতে মা যেন আছে। সেই গর্ভধারিণী যিনি এক হাতে বড়ো করে তুলেছিলেন একটি শিশুকে, একটি বালককে। একটি কিশোরের, একটি যুবকের যিনি সব বুঝতেন। এক সময়ে তিনি মা বাবা-দাদা-দিদি-বন্ধু-সবই ছিলেন। সেই মা-ই তো? না, মা তো নয়। যেন জননী-জননী মনে হয়।

অল্প বয়সি ডাক্তারটি বললেন, 'সংকটটা কেটে গেছে। হার্ট ডাইলেটেড। এদিকে প্রেশার বড্ড ফ্লাকচুয়েট করছিল। ভাবিনি বাঁচাতে পারব।'

মা ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'হ্যাঁ, ওকে ভালো করে বলো। নইলে ও ভাববে. .'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে অরিজিৎ বললেন, 'থামো তো তুমি . .!'

মা বিছানা ছাড়ল। ধীরে ধীরে বাগানে বেড়াচ্ছে আজকাল। ভোরে একবার, সন্ধ্যায় একবার। সঙ্গে অরিজিৎ, 'মা তুমি বল পাচ্ছ তো শরীরে?'

পাচ্ছি। কিন্তু খোকা কত দীর্ঘদিন আমাকে দেখিস না। আমি থাকলেই বা কী? গেলেই বা কী! যুক্তি দিয়ে বোঝ। বোঝবার চেষ্টা করো।

ঠিক আছে। যুক্তি দিয়েই বুঝি। মা, তুমি আছ, কোথাও আছ, এই জ্ঞানটা আমার বেঁচে থাকার পক্ষে কাজ-কর্ম করার পক্ষে দরকার। তুমি দূরে থাকলেও আছ তো! ইচ্ছে করলেই দেখতে পাব। না হলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়।

মা খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি থাকলেও কি গোলমাল আটকাতে পারি খোকা?'

অরিজিৎ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন, তারপর বললেন, 'হয়তো পারো। ইচ্ছে করলে।' তাঁর মাথার মধ্যে একটা স্তব্ধতা, আশরীর কেমন একটা শৈথিল্য, আলস্য। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা থেকে কোনো গতিকে রক্ষা পেয়ে যদি তার নৌকো পায় সুবাতাস, শান্ত জল, সবুজ দ্বীপ, তাহলে নাবিক যেমন ডাঙা আর ছাড়তে চায় না, তেমনই।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হল। জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তাই তো! তোমার গুরু কই?'

মা হাসল, বলল, 'কই? গুরু নেই তো!'

তবে? তোমার ঠাকুর? যার জন্য তোমার নাকি সব ত্যাগ হয়ে গেল?

মা সন্তর্পণে ফুলের গাছগুলোতে হাত বোলাতে লাগল, 'এখানে তোর ভালো লাগছে না?'

ভালো লাগছে বইকি! এত সুন্দর জায়গা! এমন নিঃশব্দ। আমার ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

মা নীচু হয়ে একটা গোলাপ গাছের ফুল সুদ্ধ ডাল সাবধানে তার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'দ্যাখ।'

অদ্ভুত উজ্জ্বল মভ্ রঙের গোলাপ। আকারে প্রায় একটা মাঝারি চন্দ্রমল্লিকার মতো। মভ্ গোলাপ অরিজিৎ কখনও দেখেননি। শিশিরে ভেজা। অদ্ভুত কোমল, মসৃণ স্পর্শ।

'আরও আছে', মা বলল।

গাছে গাছে যেন তারা ফুটে রয়েছে। সাদা তারা, নীল তারা, আলতা রঙের তারা। বিশাল সাদা ক্যাকটাসের ফুল ফুটেছে। তার বাইরেটা সাদা, ভিতরটা হলুদ।

একদিন আবিষ্কার করলেন খুব ভোরবেলায় মেয়েরা সব ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল আনে। আর একটা বেদির উপর মা তাদের সঙ্গে মিলে ফুলের নকশা বানায়। ঘন ঠাসবুনুনি সব নকশা! গন্ধে-বর্ণে যেন নন্দন-কানন।

'এই বেদিটাই তাহলে তোমার ঠাকুর!' মা কিছুই বলল না। সব উত্তরই যেন তাঁকে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু রোজই ভোরে এসে তিনি দেখতে থাকেন শ্বেতজবা, মভ্ গোলাপ, কদম্ব, শিরীষ, কুমুদ, জুঁই, ফুলের পরে ফুল, ফুলের পাশে ফুল। অখণ্ড মনোযোগে নকশা তৈরি হচ্ছে।

মেয়েদের জিজ্ঞেস করেন, 'কী করিস তোরা? যে যার জীবনের নকশাখানা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছিস নাকি?'

'যা বলেন', মেয়েরা দুলে দুলে হাসে, তারপর আবার ফুলের মধ্যে ডুবে যায়। দেখতে দেখতে একদিন কেমন জেদ চেপে গেল। অরিজিৎ বললেন, 'ঠিক আছে। আমিও সাজাব। অনেক নির্মাণ তো করলাম জীবনে, দেখি এটা কেমন পারি। দে আমাকে ফুল দে।'

মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি হাসে, 'নিজের ফুল আপনাকে নিজেকেই বেছে নিতে হবে, এটাই নিয়ম।'

অরিজিৎ হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। বিচিত্র বর্ণের সব বোগেনভিলিয়ার মতো পত্রালি।

মেয়েরা বলল, 'বাঃ, আরক্ষা নিয়েছেন দাদা। ভালো। ভাগ্যবান আপনি।' তখন তিনি তুলে নিলেন লাল রঙের, সাদা রঙের, হলুদ রঙের গোলাপ। মেয়েরা যেন রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'শরণাগতি। শরণাগতি। আপনি কিন্তু শরণ নিয়ে নিলেন দাদা মনে রাখবেন।'

'কীসের শরণ? কার শরণ?' সব কিছু উড়িয়ে দেবার হাসি হাসতে হাসতে অরিজিৎ ডবল রজনিগন্ধার ছড়িতে হাত রাখলেন। মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, 'অ্যাসপিরেশন। অভীপ্সা বাছলেন দাদা।' অরিজিৎ তুলে নিলেন আকন্দ। ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'সাহস, সাহস! ঠিক আছে তবে সাজান এবার। বেদির নৈর্ঋত কোণটুকু আপনার জন্যে ছেড়ে রাখলাম।'

সেই থেকে অরিজিৎ সাজান। কখনও অভীপ্সার গুচ্ছ মাঝখানে লম্বা ফুলদানে উল্লম্ব রেখায় বসিয়ে তার চারদিক ঘিরে শরণাগতির চক্র রচনা করেন। সাহসের রেখা, চক্রের অরের মতো চারদিক থেকে গিয়ে ছুঁয়ে থাকে শরণের গোলাপগুলোকে। আরক্ষার পত্রালি দিয়ে দুর্ভেদ্য বৃত্ত রচনা করেন তারপরে। কখনও রজনিগন্ধা দিয়েই শুরু করেন। তার কেন্দ্র নেই। সব সোপান। তাদের দুপাশ ঘিরে জমাট হয়ে থাকে রক্তগোলাপ। তারপরে আকন্দ, হলুদ গোলাপ। এইভাবে নানা নকশা বুনতে থাকেন অরিজিৎ। সাজাতে সাজাতে একদিন নিজেই বললেন, বাঃ। নানা রঙের বোগেনভিলিয়ার পাপড়ি পুরো নকশার উপর ছড়িয়ে দিতে থাকেন অরিজিৎ। পত্রং পুষ্পম্। পত্রং পুষ্পম্। কানে আসে বাড়ির দিক থেকে একটা তুরীয় উল্লাস, একটা কোলাহল যেন ভেসে আসছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে।

উঠতে উঠতে অরিজিৎ একটা আলোর ঝলক দেখতে পেয়ে ভেবেছিলেন বিদ্যুৎ চমকাল। কিন্তু মুসাণ্ডার ঝাড়ের ওপার থেকে সুদেব সরকার উঠে দাঁড়াল। পাশে সমীর। সে-ই ফটোটা তুলেছিল।

'কী দাদা। চিনতে পারছেন?' অনেকগুলো দিনের অনভ্যাস, অরিজিৎ ভুলে গিয়েছিলেন। এখন

সমস্ত ব্যাপারটা ফ্ল্যাশ-গানের ঝলকের মতোই ঝট করে বুঝে ফেললেন। সুদেব তো একজন সাংবাদিক, খুব ভালো করেই ওকে চেনেন অরিজিৎ। ও-ই তাঁর সব কাজকর্মকে সবচেয়ে ভালো কভারেজ দ্যায়।

আরে চলো, চলো। বিষ্টি পড়ছে। খোলা আকাশের নীচে কথা হয়?

কীভাবে যে আপনার ঠিকানা বার করেছি। চিন্তা করতে পারবেন না অরিজিৎদা।

'তাই না কি? কীভাবে করলে?' উৎসুক গলায় অরিজিৎ বললেন।

'সে সব ট্রেড-সিক্রেট বলা হবে না।' সুদেব সমীরের দিকে চোখ রেখে হাসল। ঘরে পৌঁছে অরিজিৎ পা তুলে বসলেন তাঁর তক্তাপোশে। সুদেব বসল সামনের চেয়ারে। অরিজিৎ দেখলেন সুদেব টেপ-রেকর্ডারের সুইচটা অন করছে। চমৎকার ব্যাটারি সেটটা ওর। ঘুরে ঘুরে ছবি নিতে থাকল সমীর। সুদেব ষড়যন্ত্রীর হাসি হাসছে, 'হঠাৎ অজ্ঞাতবাসের কারণটা কী অরিজিৎদা?'

'প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই!' গলা গাঢ় করে বললেন অরিজিৎ।

প্রেশার না কি? খুব চিন্তা?

হ্যাঁ। তবে আমার না। মায়ের। চিন্তা তাঁর জন্য?

তা একটা খবর দিলেন না কেন?

'খবর? ...তাই তো।' ভীষণ রকমের অবাক হয়ে অরিজিৎ বললেন, 'ভুলে গিয়েছিলাম... একেবারে ভুলে..'

আমাকেও ঠিক কথাটা বলবেন না দাদা! সাউজি আর সামন্তর সঙ্গে টার্মস নিয়ে গণ্ডগোল তো আপনার গোড়া থেকেই' আপনাকে দিয়েই লাভ তুলবে, অথচ আপনি যা চেয়েছেন তার অর্ধেকও দেবে না .

তাই তো .. তুমি জানলে কোথা থেকে?

আরে দাদা, আমাদের সব জানতে হয়, আমরা অবিকল জাগ্রত ঠাকুরের মতো।

তা বটে। কিন্তু সে জন্যে তো আমি চলে আসিনি সুদেব!

জানি দাদা, শর্মিলি সেন. . প্লিজ কিছু মনে করবেন না, ওকে এড়ানো ভগবানের বাবারই সাধ্য নেই, তো আপনি।

শ র্মি-লি সেন? ও হ্যাঁ। শর্মিলি! একটু নাছোড়বান্দা টাইপের বটে। কিন্তু ওকে এড়ানোর জন্যে আমি চলে আসতে যাব কেন? একেবারে পিয়োর অ্যান্ড সিম্পল কারণটা। মা মরণাপন্ন শুনে মাথার মধ্যে সব কেমন হয়ে গিয়েছিল।

টেপ-রেকর্ডারের নব খটাশ করে বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সুদেব। মুখে হতাশা।

ঠিক আছে দাদা, আজ বিশ্রাম করি।

'এঁদের গেস্ট-হাউসটা ভা-রি সুন্দর। শান্ত। আরে আমাদের তো স্বস্তি শান্তি দরকার। যেভাবে বেঁচে থাকি ওকে কি আর বাঁচা বলে? বলে কোনোমতে টিকে থাকা। প্রচণ্ড ঝড় চারদিকে, এলোমেলো বাতাস, তার মধ্যে দৌড়োতে হচ্ছে। এখন, পায়ের ব্যালান্স কে কতটা ঠিক রাখতে পারে। এই তো কথা।' দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সুদেব। গেস্ট হাউজে ফিরতে ফিরতে সমীর বলল, 'অরিজিৎদাকে কেমন নার্ভাস লাগছিল, খেয়াল করেছিলি?'

সুদেব আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'উনি একজন নট, মনে রাখিস।'

তুই বলছিস, সবটাই অভিনয়?

অফ কোর্স। মায়ের অসুখ! লাখ লাখ টাকার প্রজেক্ট, বন্ধু-বান্ধবী, এত্তো জানাশুনো কাউকে কোথাও কোনো খবর দেওয়া নেই। ইয়ার্কি নাকি?

অন্য কিছু বলছিস?

আই বেট।

অগাথা ক্রিস্টির কেসটা মনে আছে? স্বামী আর বান্ধবীর বিশ্বাসঘাতকতার শকে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল। শর্মিলির সঙ্গে... সে রকম কিছু...

'শর্মিলি নয়। শর্মিলি নয়। যবনিকার অন্তরালে কেউ আছে... কেউ... উঃ' সুদেব নিজের বাঁ হাতের পাতার ওপর ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারল।

'মায়ের অসুখ দিয়ে স্মৃতিভ্রংশ হয় না। স্টোরিও হয় না। ঠিকই।' তারের পাপোশে জুতোর কাদা তুলতে তুলতে সমীর মন্তব্য করল।

কাল আবার...

উহুঁ। কাল নয়। দুটো দিন সময় দে। আমরাও চারদিকটা একটু দেখে নিই। কে জানে সেই শ্রীমতী এখানেই কি না!

ইতিমধ্যে আর কেউ গন্ধে গন্ধে এসে পড়লে?

সম্ভব নয়। তবু যদি আসে, আসবে! ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

'ও কী তুললেন দাদা?' মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি শিউরে উঠল।

মুঠো ভরা বড়ো বড়ো নীল অপরাজিতা নিয়ে অরিজিৎ, 'কেন? কী হল?' তিনি তুললেন রক্তকরবী। মেয়েগুলি কাঁপছে। অরিজিৎ বললেন, 'রোজ রোজ একই ফুল দিয়ে কত আর নকশা করা যায়। আজ নতুন কিছু বানাব। এই করবীকে তোরা কী বলিস?'

সংগ্রাম।

আর এই নীল অপরাজিতা?

মেয়েদের দলে কাজের ধুম পড়ে গেল। ভীষণ ব্যস্ত। কেউ দীপ সাজাচ্ছে, কেউ ধূপ জ্বালাচ্ছে। কেউ রাশীকৃত পাতা ঝাঁট দিচ্ছে। কেউ ঝারিতে করে জল আনছে। অরিজিৎ শেষ উত্তরটা পেলেন না।

নীল অপরাজিতা আর রক্তকরবী, ডগডগে গাঢ় সব রং। তবু বড়ো সুন্দর মানিয়েছে। মাঝখানে উঁচিয়ে আছে মুদিতকলি রজনিগন্ধা। গোলাপের পাপড়ি দিয়ে বৃত্তের পরিধি শেষ করলেন অরিজিৎ।

... প্রচণ্ড ঝড় দিচ্ছে চারদিকে। তারই মধ্য দিয়ে দৌড়োতে হচ্ছে। এখন পায়ের ব্যালেন্স কে কতটা ঠিক রাখতে পারে। ... কোন নাটকে ছিল সংলাপটা। কে কাকে বলেছিল? মাথার মধ্যে বোলতা ঘুরছে, ভোঁ ভোঁ। এলোমেলো বাতাস। প্রচণ্ড ঝড়। পা রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাখতে হবে। কোথায়? কোথায় এমন পরিস্থিতি? বোলতাটা এখনও বেরল না। আরও যেন ডেকে আনছে। বোলতার ঝাঁক এখন। আলগা হয়ে যাওয়া মোটা তামার তারের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, 'এত জ্বর! সামলাতে পারছি না। অ্যান্টিবায়টিক দিই মা!'

'দাও।'

জ্বর কমেছে। কিন্তু অরিজিৎ নিস্তেজ, নিথর, প্রেশার নেমে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন ভাব।

ডাক্তার বললেন, 'সেবা-ভবনে নিয়ে যাই মা?'

যাও।

নৈর্ঋত কোণে কী রচনা করেছে অরিজিৎ। মা এসে দাঁড়ায়। নীল, নীল, ঘন নীল। কেন এত নীল? কেন খোকা? পাশে পাশে লালের বুনট। সংগ্রামী লাল। রজনিগন্ধাগুলি খুলে গেছে।

আকাশের দিকে মুখ। মৃদু সুগন্ধে সবাইকে যেন হারিয়ে দিতে চায়। গোলাপের পাপড়িগুলো মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। জমাট। মা দেখতে থাকে। দেখতে থাকে।

সুদেব, সমীর সেবা ভবনে রোজ আসে, যায়। ক্যামেরা খাপে বন্ধ। টেপ-রেকর্ডার চুপ। পাঁচ দিনের দিন অবস্থা সঙিন হয়ে উঠল। ডাক্তার গম্ভীর। কোনো কথাই বলতে চান না। ছ-দিনের দিন সমীরকে চলে যেতেই হয়। মা বললেন,

সুদেব, তুমিও যাও। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।

আমরা ওদিকের একটা ব্যবস্থা করেই আবার . তা ছাড়া বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এতবড়ো একটা প্রতিভা... এভাবে...।

'না, আসতে হবে না। অন্য ব্যবস্থার দরকার হলে করা হবে। তেমন কিছু হলে তোমরাই আগে খবর পাবে। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব রেখে যাও।' চমকে মুখ তুলে তাকায় সুদেব, তাকায় সমীর। মার মুখের একটি পেশিও কাঁপছে না। ভাবান্তর নেই।

নীল ফুলগুলি সব শুকিয়ে, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। করবীর লাল নিশান উড়ছে ঠিক। প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার দণ্ডগুলি ঊর্ধ্বমুখ, সমান সতেজ। গোলাপের পাপড়ি মাটি কামড়ে আছে।

ড্রিপের ছুঁচ যেখানটায় ফোটানো ছিল ইঙ্গিতে সেখানে আঙুল দেখিয়ে অরিজিৎ মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

মা হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে সব তুলে নেওয়া হয়। নাড়ি স্বাভাবিক। প্রেশার স্বাভাবিক। বিছানায় আজ প্রথম উঠে বসেছে অরিজিৎ বিশ্বাস। হাতে ছোটো কাচের গ্লাসে কমলালেবুর রস। মাথার দিকে মা, পায়ের কাছে মা। অরিজিৎ দেখতে পাচ্ছে খানিকটা। বুঝতে পারছে বাকিটা।

'কী হয়েছিল বলো তো ডাক্তার?'

অপ্রতিভ মুখে ডাক্তার বলে, 'যখন কিছুতেই কিছু ধরা যায় না, তখন সত্যি কথা বলতে কি আমাদের একটা স্টক ডায়াগনোসিস আছে।'

কী? কী সেটা?

আমতা আমতা করে লজ্জিত ডাক্তার বলে, 'ভাইরাস। কোনো অচেনা ভাইরাস।'

বাঃ, তাহলে বাঁচালে কেমন করে?

আমি বাঁচাইনি তো? মেডিকাল টার্মসে বলতে গেলে.. আসল কথা, আপনি নিজেই নিজেকে বাঁচিয়েছেন।

বেদির চারধারে মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি অখণ্ড মনোযোগে ফুল সাজাচ্ছে। নানা রকম ফুল, নানারকম নকশা। সাজাতে থাকে। সাজাতে থাকে।

তীর্থযাত্রার চম্পূ

ওরা কিছুতেই যাবে না এবং আমরা প্রবল চেঁচামেচি করছিলাম। দৃশ্য, যমুনার ঘাট। ওরা মানে মাঝিরা, প্রয়াগগামী নৌকার মাঝিরা। মাথায় ফেট্টিবাঁধা এবং না-বাঁধা জোরালো চেহারার প্রচুর মাঝি। ভালো ছইওলা মজবুত নৌকাগুলো সাতশো আটশো দরও হাঁকছিল, অথচ গলা নিখাদে চড়িয়ে সুদেষ্ণা বলল, ও আর অঙ্কুর জাস্ট ছদিন আগেই ... দুশো আরও কিছু উটকো যাত্রী অবশ্য ছিল, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ দুগুণে নব্বইয়েই ঘুরে এসেছে। আসল কথা ওরাই এসেছে প্রথম। ওদেরই নেশা বেশি। পায়ের তলায় সরষে। এসেই সম্মেলনের ইকড়ি মিকড়ি না শুনে ওরা বেরিয়ে পড়েছে। সব সময়েই যেন পরস্পরের থেকে পালাতে চেয়ে ওরা দিগ্দর্শনে মাতোয়ারা হয়। কাঁধে ক্যামেরা, চোখে বাইনোকুলার। কোমরে জিনস। তখন ডিমান্ড ছিল কম। কিছু দেহাতি যাত্রী ছাড়া তেমন শাঁসালো কেউ ছিল না। এখন সম্মেলনও শেষ। হাজারখানেক অতিরিক্ত লোক এখন ওদের খদ্দের। এ দিকে মাঘী মেলার সময়ও হয়ে এল। এখানকার সবচেয়ে বড়ো মেলা। বিখ্যাত। যমুনার দিকে আসতে আসতে বিস্তীর্ণ সব জায়গায় তাঁবু খাটানো হচ্ছে আমরা দেখতে দেখতে এসেছি। শুনে এলাম কেমন সাজো সাজো রব চারদিকে। দেখলাম নানান পসরা সাজানো হচ্ছে অস্থায়ী দোকানঘরে। কাঠের জিনিস। পাথরের জিনিস। হাওয়ায় এখনও কেমন মোচ্ছবের গন্ধ।

এই মেলাই তো ছ ছ বছর অন্তর অর্ধকুম্ভে দাঁড়ায়। আধ হাঁড়ি অমৃত। বারো বছর বাদ পূর্ণকুম্ভ। পুরো হাঁড়ি অমৃত। অমৃত লাভের জন্য কী হুড়োহুড়ি। তাই হাওয়ায় দুর্ঘটনার গন্ধও পেতে থাকি। কেমন একটা শীত-শীত। লক্ষ লক্ষ লোক মিলতে আসে, খুঁজতে আসে, পেতে আসে, নানা অর্থের অমৃত। তাই দিতেও হয়। ভাবলেই কেমন ছমছম করে ওঠে গা।

আপাতত যমুনার জল ঠাসাঠাসি নৌকার গায়ে ছোটো ছোটো হাইফেন। ছলাত ছলাত। সবুজ জলীয় আঘ্রাণে মস্ত্ করে দিচ্ছিল আমাদের। অমৃত এবং মৃত্যুর কথা মনে থাকছিল না। রুক্ষ আকবর ফোর্ট আর টিপি-টাপা দেবতার দল। কড়ির সাজ পরানো রোগা গোরু, উঃ। তার পরেও আমরা রিলিফ চাইব না?

আমরা মানে অঙ্কুর সরসীরঞ্জন।

রমিতা সুদেষ্ণা।

অনীশ মনামি। এবং আমি।

সরসীরঞ্জন এক সময়ে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন। বেশ উঁচুদরের। সুদেষ্ণার সঙ্গে দীর্ঘদিন ফাটাফাটি প্রেম করে, হঠাৎ কীসের থেকে কী হল রোমিকে বিয়ে করলেন। আগে ওঁকে দুর্দান্ত কিছু ভাবতাম। কিন্তু সেই বিয়ের আসর থেকেই ওঁর মাস্টারমশাইত্ব বেমালুম গায়েব হল। জাত হারালেন, নেহাতই রাম-শ্যাম, যদু-মধু-হরি গোছের, নেহাতই গোলে হরি বোল, নেহাতই ফ্যালিবল্ মর্ট্যাল বলে ওঁকে মেনে নিই আমরা সেই থেকেই। পাণ্ডিত্য, ফান্ডা ইত্যাদিকে পাত্তা না দিয়ে, অ্যাদ্দিনের অভ্যেস ছেড়ে, সরসী করে ডাকতে থাকি। সরসী! সরসী!

সুদেষ্ণা অবশেষে 'মাকাল' বলে ডাকলেও, হেলা-ফ্যালা করলেও অঙ্কুর চাইছিল বলে অঙ্কুরকেই। সেই সূত্রে ও মাকালী। আমরা মাকালী মাকালী করে খ্যাপাই। ও বেচারির দ্বিতীয় পছন্দ ছিল অনীশ। মুখে কেউ কাউকে না বললেও মনে মনে আমরা জানতাম অনীশ বরাবর মনামিতে আতত। ওর ধারণা মনামিও তাই। ওদের অন্তত মিউচুয়াল হয়েছে। কিন্তু মনামি আসলে অঙ্কুরকে চাইত। ছোটোবেলা থেকে ভাবের সূত্রে। কেমন যেন কাজিনও ওরা। কিন্তু ও তো মাকাল! মাকাল! মাকালকে আর কে শেষ পর্যন্ত চায়!

আমাদের মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল। বেলাও চড়ছিল। নেহাত শীত বলেই সইছিল। এ দিকে নৌকাঅলারাও গনগনে চোখে, ঝনঝন করে কথা বলছিল।

'থাক পুণ্য করে দরকার নেই'- রোমি ঝাঁঝায়, 'আমাদেব পুণ্য না হোক গে, তুমারি যমনামায়ি তুমলোগকো শাঁপ দেগা, শাঁপ।' .. তর্জনী নাচছিল রমিতার।

তো আইয়ে না মেমসাব। পুন্ কি সওয়াল হ্যায় তো, পৈসা কি জরুরত নহি। আইয়ে, আপ সব কো মুফ্ত হি ঘুমাউঙ্গা।

'মুফ্ত হি, মুফ্ত হি ঘুমা দুঙ্গা', কোরাস গেয়ে ওঠে সবাই। অবশেষে বালিতে বড়ো বড়ো ইয়েতি ছাপ ফেলে, বিশাল বপু আমাদের জেনারেল মানেকশ ব্যাঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ অটোঅলা এগিয়ে আসতে থাকে। হাতের তিন আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাটের কিনারায়। মুখে কথা নেই। ভিরকুটি। 'হিন্দুস্তানি চার্চিল আর কী!' কেউ যেন বলল।

'আইয়ে আইয়ে'—একজন সঙ্গে সঙ্গে রাজি। পুরো নৌকা তিনশো য়। মন্দ কী। ছিপছিপে গৌরাঙ্গর পেছন পেছন আমরা হুড়মুড় করে এ নৌকোর আগ-গলুই থেকে ও নৌকার পাছ গলুই টপকে টপকে ভাসমান ছকে এক্কা দোক্কা, তেক্কা চৌকো—টাল খেতে খেতে গৌরাঙ্গ-নৌকার পাটাতনে পৌঁছে যাই।

এইবার শুরু হয় আসল খেলা।

বাঘের খেলা।

কে কার পাশে বসবে না, সেই খেলা।

পরস্পরের প্রতিমার খড় বেরিয়ে গেছে এখন। প্রেম-ট্রেম সব ভোঁতা। তবু... তবু খড়ের কাঠামো এক আদি অন্তহীন রৌরব। ঘুরে ঘুরে হয়রান সবাই। বেরোতে পারছে না। ছিঁড়ছে, ভাঙছে, কাটছে। কিংবা কে জানে, এদের সবার বেরোবার ইচ্ছেটাই হয়তো মরে গেছে। ইচ্ছের পেছনে ইচ্ছে থাকে। তার পেছনে আরও ইচ্ছে। এ সব কথা কবুল করাটা দুঃসাহস! ইচ্ছের পেছনে দুঃসাহস থাকা চাই। এই টলোমলো নৌকায় তা আর কারই বা আছে।

ফলত, প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের দিকে পেছন ফিরে বসতে চায়। সে এক অদ্ভুত নেগেটিভ হুড়োহুড়ি। শেষ পর্যন্ত উদ্যোগী হয়ে মুখোমুখি করে দিই ওদের।

কেননা শেষ পর্যন্ত তো আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হয়।

পউষের দুপুরের রোদে কুকরি ঝলসায়। তেরছা হয়ে রোদ এসে পড়ে একেবারে অঙ্কুরের মুখের ওপর। ও রোদ আড়াল করবার চেষ্টা করে না। ওকে দেখায় ঠিক দোলের দিনের লালচে মঠের মতো, অনেক ফুটকড়াই আর চিনির মুড়কির মাঝখানে লোভনীয়, রসালো, সলিড .. ।

কিন্তু সুদেষ্ণা মুখ ঝামটে বলল, 'বাবারে বাবা, পুণ্য করতে যাচ্ছি! তখনও তুমি আমার সামনে বসবে?'

আমি কি তবে মূর্তিমান পাপ-টাপ নাকি?

মুখটাকে একটু আড় করে অঙ্কুর ক্যামেরাটা রমিতার দিকে তাক করল। সরসী, এক্স-

মাস্টারমশাই, সেই বিয়ের রাতে যাঁর জমানত জব্দ হয়ে গিয়েছিল, রমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ ছবি, আগে নিশ্চয় অনেক তুলেছেন, আজ যেন আদপেই তুলতে চাইলেন না। অঙ্কুরের ক্যামেরার দিকে পেছন করে, তিনি জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝুঁকে বসে রইলেন। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'চশমার কাচে বড্ড রোদ ঝলসায়।'

রমিতা আর মনামি দীর্ঘদিনের শত্রু বন্ধু পাশাপাশি হতে অথবা না হতে গিয়ে এবং অনীশ ওদের মুখোমুখি অথবা পিঠোপিঠি হতে গিয়ে নৌকা এমন হেলায়। বিপজ্জনক কৌণিক বিপর্যয় থেকে বাঁচতে সবাই একত্র হয়। হাঁ হাঁ করে ওঠে গৌরাঙ্গ, আ্যয়সা মত কিজিয়ে, মত কিজিয়ে অ্যায়সা।'

'উরি বাবারে!' রোমি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ ভাই হাম সবকো লওট দেগা তো?'

'দেখিস বাবা পানি কি অন্দর গোর দিসনি'—মনামি হাসবার চেষ্টা করে।

'মওত সে ডরনা মৎ'—গৌরাঙ্গ গম্ভীর গলায় চাপা গর্জন করে। তার মানে কী? কী বলতে চায় লোকটা। এটা কি ওর ফিলজফি অফ লাইফ। না মৃত্যু সত্যি-সত্যিই আশেপাশেই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য?

আপাতত অথই জল। সবাই নীল বললেও আমরা দেখি সবুজ। একেবারে সবুজ। বঙ্গোপসাগরে এই সবুজ দেখা যায়। তার সঙ্গে নুন গন্ধ থাকে।

যমুনা কখনও নিজে নিজে সাগরে পৌঁছতে পারেনি। তবু সাগরেরই রং মেখেছে। যতই এগোই, রোদ ততই ভিজে যায়, হাওয়া ততই জলে ভেজা তালপাতার পাখার বীজন।

জলের মাতোয়ালা রক্তের গলিতে ঢুকে যায়। জলের রঙিন পিচকিরি ছোটাতে থাকে, কেমন একটা উল্লাস উঠে আসে নাভিপদ্ম থেকে, সোজা উঠে লক লক করে উল্লাসটা, যার ঝোঁকেই হয়তো অনীশ কাব্যি করে বসে :

> হে দিন, সোনালি দিন,
> যার জন্যে গভীর দুপুর
> সোঁদা মাটি টুপুর টাপুর
> যার জন্যে অচিন-অচিন
> তুমি কি দেখেছ সেই সোনার হরিণ?
> দেখেছ সে সোনার হরিণ?

'স্বর্ণমৃগী তোর সঙ্গে খেলতে চাইবে কেন?' রমিতা জলের ওপর গলা তুলে বলল। অনীশ কিন্তু কবিতার শিখর থেকে নামতে পারছে না এখনও। 'দেখেছ কি, দেখেছ কি', করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। এদিকে অদূর-নীলে সাদার ডট। ঘন ঘন সজল ডট। বুটিদার রেশমি শাড়ি নীল যমুনা! পাখি পাখি পাখি। কী বলে ওদের? মাঝি ভাই? 'পংখি! পংখি।' যাযাবর ম্যাটাডর কন্ডর, কত দূরের শরীর সব, কত্ত দূরের মন, মেজাজ। শীতে আসে, গ্রীষ্মে যায়। কোথায় যায়? যেখানে তুষার গলে রিমঝিম তৃণ। বালিহাঁস হয়ে নামে আলিপুরে, প্রতি শীতে, ত্রয়োদশীর চাঁদ সাঁকোয়। মরাল হয়ে, শামুক খোল হয়ে ঝুপ ঝুপ, ঝুপল, ঝুমল—করে নামে, নামতে থাকে জলে—জলায়, বিলে-ঝিলে।

শীতই ওদের বসন্ত।

অনীশ এখন অচিন হরিণ থেকে অচিন পাখির প্রসঙ্গে এসে গেছে। সত্যিই সে স্বর্ণমৃগীর জন্য হন্যে না পাখির জন্যে নাকি দুটোই এক, এখন সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেছে।

অঙ্কুর বলে উঠল, 'সরসী! আপনার দিকের পাড়টা খানিকটা মরুভূমির মতো দেখেছেন? কমপ্লিট উইথ উট বালিয়াড়ি অ্যান্ড অল।'

সত্যিই পাড়টা দু তিনটে টাল খেয়ে উঠে গেছে। ঝকঝকে ইস্পাত আকাশের কোলে একটি চিত্রার্পিত উট। লাগাম ধরে সামনে একজন পেছনে আরও তিন। বালির ভাঁজ স্পষ্ট। ভাঁজে পুতুলগাড়ির মতো একটা ল্যান্ডরোভার। চিক করে একটা শব্দ। অর্থাৎ অঙ্কুর ফটো তুলল।

সুদেষ্ণা প্রায় ভেঙিয়ে বলল, 'তুমি কি কিছুই মনে রাখতে পাব না? সবকিছুরই রেকর্ড .'

'---রাখতে না ব্রেক করতে?' রমিতা চিৎকৃত হাসিতে বলল, ধিক্কার জানিয়ে বিকৃত গলায়।

চিক --আরেকটা।

'আমি নড়ে গেছি, আমরা নড়ে .. উঠবে না। উঠবে না।

উঠবে, ভেংচি সমেত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উটটার সওয়াব নেই কেন?

'সত্যিই তো! সওয়ার নেই।' গলায় ঝোলা বাইনোকুলারটা তুলে মনামি, 'সামনে পেছনে লোক, এ তো দেখছি গ্রিসিয়ান আর্ন!'

'ওটা ঈদের উট।'

'তাই জল পড়ছে চোখ দিয়ে' . অঙ্কুর।

সুদেষ্ণা ঝুঁকে 'উঠবে? চোখেব জলটা উঠবে?'

উঠতে পাবে---চোখের জলটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, উটের চোখের...

খোলাখুলি কমিট করতে চাইছে না অঙ্কুর। মনামিব ছেলের ছবি তুলেছিল মুখেব নালসুদ্ধ। কিন্তু.. চোখের জল? উটের চোখের।

পাশ দিয়ে ওদের দ্বিগুণ ভরতি একটা খোলা নৌকা। রোদে জ্বলছে দেহাতি মেয়ে পুরুষ। কেউ কেউ এ নৌকার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

'হাসিটার মানে কী?'---সুদেষ্ণা বিরক্ত, 'উডন্ত ট্রেন দেখে যেমন দুরন্ত ছেলেরা হাত নাড়ে?'

শহুরেরা গাঁওয়ার দেখে হাসে। গাঁওয়াররা শহুরে দেখে।

সত্যিকার নাগরিক হলে শহুরেরা হাসে না।

মনে মনে হাসে। ভুরু কুঁচকোয়।

আরও একটা নৌকা ভেসে যায়। ভব-ভরতি। নৌকাডুবি হল বলে। নারকোল, ফুল, ধূপ প্রায় প্রত্যেকের হাতে। ভাবছিল ডুববে না। কেননা ধূপ, ফুল.. । এরাও হাসছিল। খুব।

'সরল-সরল চাকর-চাকর দেখতে।' কে যেন বলল মেয়ে-গলায়।

চাকর খাটতে গিয়ে এই লোকগুলোই গোড়ার দিকে সরল-সরল, খুব খাটে পেটে।

... হাঁ-জি হাঁ-জি কথায় কথায়। উঠতে বসতে মাজি মাঈজি। বিনয়ের অবতার একেবারে। কিছুদিন পরেই চুরিচামারি। ছিঁচকে ছিঁচকে, তারপরে শেয়ানা সিঁদেল, তারপর ডাকাত দলের দালালগিরি, ভেতর থেকে দরজা খুলে দেওয়া, সুলুক সন্ধান, চপার, হাতুড়ি, মায় ধর্ষণ-টর্ষণ পর্যন্ত...

এখন দেখাচ্ছে খুব নিষ্পাপ।

কে বলল?

'নিষ্পাপ না হাতি'---রমিতা, 'এসব হদ্দ বোকা, কিন্তু মিটমিটে।'

সুদেষ্ণার দিকে চেয়ে কীভাবে হাসছে! এবা চাউনি দিয়েই, হাসি দিয়েই ... জঘন্য।

ওদের দলে একটি বৃদ্ধ লোক, বুড়ো হনুমানজির মতো, কাঁধগুলো এখনও কী চওড়া! পাকা গোঁফদাড়িতে মুখ ঝুলে পড়েছে। কিন্তু হাতগুলো লোল নয়. জলের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কী বকছিল, মনে হল বলছে, 'গঙ্গা বিটিয়া যমনা বিটিয়া গঙ্গা বিটিয়া যম্‌না বিটিয়া গঙ্গা যম্‌না গঙ্গা যম্‌না গঙ্গা যম্‌না'।

দেখতে দেখতে ঢেউয়ের দোলে হাজার হাঁস ভেসে আসে। খাদ্যসামগ্রী নিয়ে নৌকা যায়। পাঁপর, নিমকি, খাজা।

তিলে খাজা আছে? —মনামি খাবে,

তোর কি মাথা খারাপ?—অঙ্কুর। বইঠা হাতে মাঝি হাঁকে,- -

'পংখিকো খিলাইয়ে মেমসাব, খিলাইয়ে না!'

'এঃ পাখির খাবার?' মনামি হতাশ।

'কেন খা না। চিড়িয়াখানার গেটে বাঁদরের ছোলা-বাদাম কিনে তো নিজেই খাস।'

'তোর বরাদ্দ আমি খেয়ে নিয়েছি? কখন?'

'এঃ এসব পুরোনো জোক, এখন কেউ হাসবে না।'

অঙ্কুর হাঁসেদের দিকে ক্যামেরা তাক করছে। মনামি কিনেছে তিলে খাজা, সুদেষ্ণা পাঁপর টুকরো করে ছুড়ে দিচ্ছে শূন্যে। পাখিগুলো ঝাঁপ দিচ্ছে।

রোমি চেঁচায়, 'আমাকে দে, আমাকে . আমিও খাওয়াব।'

ছাই রঙের সিল্ক লাগানো ডানায় ভরন্ত, নিটোল, কেমন একটা আভাযুক্ত সাদা যেন ফ্রস্টেড ঝালর একেকটা বড়ো বড়ো।

মনামি বলল, 'উঃ আমারগুলো একেবারে খাচ্ছে না। রমিতা আমার থেকে ধার নিল, অথচ ওরগুলোই' ...

বলতে বলতে সে বিপজ্জনক ঝুঁকে খোলামকুচি খেলার মতো খাজার টুকরো ছুড়ে দিল। ছুড়ে দেবার অভিঘাতে নৌকা হেলছে। প্রচণ্ড হেলছে। রোমিকে জড়িয়ে মনামি, মনামিটা . সরসী চেঁচাচ্ছে। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে পণ্ডিতি চোখ।

নৌকা সোজা হয়ে যায় আবার।

গৌরাঙ্গ এখন মাঝদুপুরের রোদে সোনার গৌরাঙ্গ, 'এইসা মত্ করো মেমসাব এইসা মত'!

নারকোল বাড়িয়ে ধরে ভাসমান দোকান, 'নারিয়ল লে যাইয়ে মাজি, সঙ্গমপে পূজা চঢ়াইয়ে।'

গৌরাঙ্গ দু-হাতে বইঠা চালায়। দু-হাতের পেশি ফুলে ফুলে ওঠে আর তালে তালে সে বলে চলে, 'বিটিয়াকো কুছ দেনে পড়েগা মেমসাব, লিজিয়ে, নরিয়ল লিজিয়ে, মিঠাই লিজিয়ে মু মিঠা কর দিজিয়ে বিটিয়াকো। বিটিয়া দুবলি হো জায়েগি।'

সরসী চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বলল, 'আরে বাবা, সব লোগ নারিয়ল, মিঠাই, রুপেয়া পানি মে ডালেগা তো পানি বহোত গন্ধা হো যায়েগা। নদীকি তন্দুরস্তিকে লিয়ে পূজা উজা চঢানা বন্দ করো ভাঁই। নদীকো বুরা হোগা।'

চুপ করে বইঠা বায় মাঝি, মুখে প্রত্যাখ্যানের রেখাভঙ্গ। সরসীর কথাকে ও পাত্তা দেয় না আদৌ।

ওই যে ওই যে দেখো সবাই... সংগম... সংগম... সংগম দেখি।

যমুনার নীলচে সবুজ গঙ্গার গৈরিক ধারার পাশাপাশি চলেছে। নীল সোনালি।

'যমুনে! তুমি কি সেই যমুনে!' অঙ্কুর হাঁকে।

উতরোল কোলাহল জলে জলে, মানুষে মানুষে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে মাথায় জল ঢালছে নারী-পুরুষ।

পানি কমর তক হোগা, যাইয়ে না মেমসাব। আস্নান কিজিয়ে।

সরসী নীচু হয়ে একমুঠো জল তুলে আমাদের মাথার ওপর ছিটিয়েছে।

'ওম্ শান্তিহি, শান্তিহি, শান্তিহি।'

সুদেষ্ণা গান ধরে :

ওরে নীল যমুনার জল
বল রে মোরে বল
কোথায় ঘনশ্যাম .

মাঝি গানে কান না দিয়ে বলে, 'সঙ্গম তির্থ হ্যায়, ইঁহাপে আস্নান সে পুন হোগা, পুন। শান্তি মিলেগি।'

ওং শান্তিহি, শান্তিহি, শান্তিহি, অঙ্কুর নিবিষ্টচিত্তে ফোটো তুলে যাচ্ছে।

দূরে মিলিয়ে গেছে ফ্রস্টেড পাখিদের ঝটাপটি। গঙ্গার দিকের পাড়ে একটা শাড়ি রোদে মেলে দু-কোণ থেকে দু-খুঁট ধরে চলেছে গোটা পরিবার। মা বাবা, ছাগলছানা, ছেলে, হাওয়ায় ফটাফট উড়ছে শাড়ি।

আমার কৃষ্ণ ঘনো ও-ও শ্ শ্যাম

ও পারে নিয়ে চলো না মাঝিভাই—

রমিতা অনুনয় করে। গ্রাহ্যও করে না মাঝি। কখন নৌকো ঘুরিয়েছে বুঝতেই পারিনি।

সরসী সান্ত্বনা দেয়... 'তোমরা সংগম অব্দি আসবে বলেছ, তার বেশি ঘোরাতে ওর বয়েই গেছে, ঠিক যতটার কড়ার ততটাই... যে কোনো যাত্রাই কড়ার অনুযায়ী হয়।'

আহা হা হা, একটুও ফাউ পাওয়া যাবে না—এতই কৃপণ?

কৃপণ বলো কৃপণ, কড়ার বলো কড়ার, প্রোগ্র্যামিংও বলতে পারো...

অঙ্কুর বলল, 'পাওয়া কি আর যায়নি কিছু? সব আমার ক্যামেরায় ধরা আছে।'

'কী?' সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করে, 'নীল? আর সিক্ত-মসৃণ? আর কলনাদ?'

তীরের কাছাকাছি দিয়ে চলেছে নৌকা, পাড়ের খাঁজে সাপের খোলস। চান করতে নেমেছে বেশ কিছু লোক। হঠাৎ দেখি জল নেই, চারদিকে খালি মোষ আর মোষ আর মোষ। মোষেদের পিঠের ওপর দিয়েই নৌকা চলেছে। এ আর জলের নদী নয়। মোষের নদী।

এ কী? এ কী? মোষ অতি ভয়ঙ্কর জীব!

এক্ষুনি নৌকা উলটে দেবে।

তুমি গৌরাঙ্গ বাবাজি বেশ সাঁতরে পালাবে... না?

চেনা লোককে মোষ তো কিছু বলবে না!

আমাদের একেবারে ফুঁড়ে ফেলবে।

আমরা কেউই কি সাঁতার জানি না?

জানি।

কিন্তু সে শৌখিন সাঁতারে এ মোষসংকুল যমুনা পার হওয়া যায় না।
বইঠা বাইতে বাইতে ক্লান্ত স্বরে সে বলল, 'মওত সে ডরো মত্, ডরো মত্।'

খোলা নদীতে এসে পড়েছে নৌকা। অদূরে ফেলে-আসা তীরভূমি। মানেকশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সিগারেট খাওয়া বিপজ্জনক। মওত্ সে ডরো মত্।

সুদেষ্ণা জলের দিকে মুখ, মরিয়ার মতো বলে উঠল :

> মানুষের দলা তীর্থে তীর্থে। তার মধ্যে তোকে খুঁজে ফিরি রুপোর মানুষ। আনত মধ্যাহ্নে জলের মধ্যে দেখি তোর বিম্ব। কফিখানার খয়েরি ধোঁয়া থেকে চুল্লুর গেলাসে ফাটা বাল্‌ব, রকবাজির গড়পার থেকে লোকনাথোৎসবের পঞ্চাননতলা। যুব-ক্রীড়ার তাতা বালি থেকে সেলিমপুরের ব্রিজ, গলি... সব ঘুরতে ঘুরতে—শেষ পর্যন্ত নীল গেরুয়ার সঙ্গমে, দূর থেকে তোকে দেখেও হারিয়ে ফেলেছি।

'এটা কি কবিতা?' অনীশ বলল।

আর কেউ কিছু বলল না।

কিচ্ছু না।

ব্রহ্মহৃদয়

অনেক আছে, তবু কিছু নেই। অনেক লোক তবু যেন খাঁ খাঁ করছে সব। দিনে রাতে কত কাজ তবু মন পাওয়া তো দূরস্থান কাউকে যেন ছুঁতেই পাবি না। বুকের মধ্যেটা কেমন হু হু করে। অথচ বিয়ের আগে সুশান্ত তো সবই বলেছিল। বলত বেশ গর্বের সঙ্গে। একটি কথাও বেচারি মিথ্যে বলেনি। সমস্ত মিলিয়ে নিয়েছি। মফস্‌সল টাউনে বাড়ি হলে কি হবে, নাকি এককালের জমিদারবাড়ি, বিশাল বাড়ি। একশোবার ঠিক। দেউড়ি পেরোলে বিরাট উঠোন। চকমিলোনো। গাড়িবারান্দার কোলে কোলে উঁচু উঁচু ঘর। কিন্তু গঙ্গার ধারে বাড়ি তো! দোতলাতেও তাই নোনা লেগেছে। তারই ওপর নীলচে চুনকাম। ঘরে ঢুকলে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। সুশান্তর বাবারা সাত ভাই। ছ-জন জীবিত। তাঁদের সাত স্ত্রী বর্তমান। তারও আগের পুরুষের রয়েছেন এক পিসিঠাকুমা। সাত ভাইয়ের ছেলেমেয়ে, তাদের ছেলেমেয়ে সব মিলিয়ে সাকুল্যে কত জন হবে গুনতিতে, আমার ঠিক জানা নেই। সবার হদিস এখনও পাইনি। অর্থাৎ জমজমাট সংসার। অথচ সেরকম আড্ডা তো দেখি না, দেখি না জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, পুজো-আচ্চা। হা হা হাসি। হাঁকডাক। ঘরগুলোতে মানুষ যেন চাক বেঁধে বেঁধে আছে। আড্ডার বদলে জটলা। অট্টহাস্যের বদলে গলাখাঁকারি, হাঁকডাকের বদলে ফিশির ফিশির।

হতে পারে আমার এই টাউনে যাকে বলে 'ভাবের বিয়ে', তাই এমনি অভিজ্ঞতা। বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা রেজিস্ট্রি করে লোকাল ট্রেনে চেপে আমি শ্বশুরবাড়ি এলুম। সুশান্তর পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা। পায়ে চটি। আমার পরনে গোলাপি আর হলুদ চেক-চেক দক্ষিণী সিল্ক। কানে মাকড়ি, গলায় সরু সোনার হার, হাতে একগাছি বালা, আর ঘড়ি। পাতলা সুটকেস হাতে নিয়ে যখন সুশান্তর সঙ্গে ভেতর-উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কোনো পুরুষ মানুষকে ত্রিসীমায় দেখিনি। সিঁড়ির নানান ধাপে, এ ওকে ধরে কিছু কৌতূহলী নারী জনতা আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। শাশুড়ি গম্ভীর মুখে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা সোনা-বাঁধানো লোহা পরিয়ে দিয়েছিলেন। একটু রাতে দালানে খেতে বসতে বিরাট কাঁসার বগি থালায় অনেক রকম পদ দেখেছিলুম, দিদিশাশুড়ি কাঁসার ফুলবাটিতে রুইমাছের ল্যাজা আর মুড়ো এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'খেতে হয় মা, খেয়ে নাও।' সে সময়েও গয়নার ঝমঝম, ঘোমটা, খোঁপা, আলতা-পরা পা, আর চোখ ভরতি কৌতূহল আমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছিল। কিন্তু কেউ আলাপ করতে, বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসেনি। কে জানে একে ভাবের বিয়ে, তায় বেজাতের মেয়ে, এইসব ভয় বোধহয় দুর্জয় মেয়েলি কৌতূহলের মুখেও কুলুপ এঁটে দিয়েছিল।

পরে আমার নিজের জায়ের মুখে শুনেছি। অমন অনাসৃষ্টির বউ-বরণ নাকি তারা জন্মেও দেখেনি। সে এসেছিল বেনারসী দলমলিয়ে, গয়না ঝলমলিয়ে, দুধে-আলতায় পা রেখে। চতুর্দিকে উলু উথলে ছিল। শাঁখের আওয়াজে আর সব আওয়াজ ডুবে গিয়েছিল। হাতের মুঠোয় ছটফটে মাছ, কপালে বরণডালা। গালে দিদিশাশুড়ির চুমো, আর সারা বিকেল, সারা সন্ধে, রাত, পরের

দিন সকাল, বিকেল, সন্ধে রাত, খালি জমকালো পোশাকের আসা-যাওয়া আর উপহার, চিবুক ধরে আদর আর 'আহা চমৎকার বউ হয়েছে'।

সুশান্তটা একদম বোকা। আশ্বাস দিয়েছিল, 'আদর না পাও, খাতির পাবে। পল্লে বাড়ির তিনকুলে কেউ ডক্টরেটওয়ালা কলেজ প্রফেসার বউ দেখেনি।' শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর দিন থেকেই আমি যথানিয়মে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলেজে চাকরি করতে যাচ্ছি। সুশান্তর থিসিস শেষ হয়নি। সে ফিল্ড ওয়ার্কের জন্যে তখন বাঁকুড়া চষে ফেলছে। কদিন ছুটি নিয়ে যে মধুচন্দ্রিমা না হোক মিছরি-চন্দ্রিমাও করব সে গুড়ে বালি। দিন পাঁচেক পরে আমার নিজস্ব শাশুড়ি ডেকে বললেন, 'নতুন বউমা, আমাদের যৌথ পরিবার, মোটা ভাত-কাপড়টা এখনও এস্টেট থেকেই হয়। সবাইকেই কিছু কিছু কাজ করতে হয়। তুমি যদি তোমার ভাগের কাজটুকু না করো আমার মাথা কাটা যাবে।'

আমি বললুম, 'বেশ তো, কী করতে হবে বলুন না, নিশ্চয়ই করব।'

সকালটা তো ইস্কুলে বেরোও, বিকেলবেলা জল খাবারের নুচি, রাতে যেটুকু রুটি হয়, তার ময়দাগুলো তুমি মেখো, বেলো।

চারটে, কোনোদিন পাঁচটায় বাড়ি ফিরে, গা ধুয়ে, চুল বেঁধে,—সুতরাং তাল তাল ময়দা মাখি, বেলি। শেষ হতে হতে রাত আটটা তো বটেই। যদি কোনোদিন সন্ধে সাতটা পেরিয়ে যায় ফিরতে, ট্রেনের গণ্ডগোল বা কলেজে মিটিং থাকলে এরকম হয়েই থাকে, শাশুড়ি বলে যান, 'কাল সকালে একটু ভোর-ভোর উঠো। আজ তোমার ময়দার পালা ন-বউমা সেরে দিয়েছে, ওর সকালের চা-জলখাবারটা তোমায় করে দিতে হবে।' পরদিন আমার দশটা পঁয়তাল্লিশে ক্লাস। সাড়ে ন'টার ট্রেনে যেতে না পারলে সেটা হয়ে গেল। রাতে বা ভোরে কোনো পড়াশোনা নিয়ে বসলে, হঠাৎ যদি কোনো কাজ পড়ে, কেউ কেউ বলেন, 'এত পড়ে-শুনেও তাহলে তেমন কিছু শিখে উঠতে পারেনি, এখনও ইস্কুলের পড়া করতে হয়!' তো এই আমার খাতির।

তখন ভাদ্রমাস। প্রচণ্ড গুমোট, রুটি বেলতে বেলতে সাড়ে আটটা বাজল। কোমর ভেঙে যাচ্ছে। দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালুম। ঘামে ভিজে শপ শপ করছি। কিন্তু বিকেলে এক বার গা ধুয়েছি, এখন আবার কলঘরে চানের জল পাওয়া যাবে না। জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। দূর দিয়ে একটা নৌকো চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের গঙ্গা। যেন হালকা কালি মেড়ে দিয়েছে কে নদী আর আকাশের গায়ে। একটা বাঁকা ডালে দেখলুম তিন চারটে শকুন বসে আছে, অন্ধকারে তাদের সাদা গলা ফুটে আছে। কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে চলে এসে বিছানার একপাশে বসে পড়লুম। সুশান্ত টেবিলে কাগজপত্র মেলে লিখছিল। বলল, 'কী হল?'

'কী হবে? কিছু না।'

একটু পরে ও হাতের কলম নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার এখানে ভালো লাগছে না, না?'

আমি কিছু বললুম না। কী হবে, বলে? ও বলল, 'কতকগুলো অসুবিধে আছে ঠিকই। কিন্তু ভেবে দেখো, সুবিধের পরিমাণ কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি। কিছু কিছু কাজ করে দিতে হয়, কিন্তু দায়িত্ব নেই। অসুখবিসুখ করলে আপনা থেকে ডাক্তার আসবে, ওষুধ আসবে। মুখের গোড়ায় ভাত, যত দেরিতে আস, ঠিক পাবে। বেড়াতে যেতে চাও, ঘর ফেলে চলে যাও, সেফ। যদি নিজেদের এত সব করতে হত, ভাবতে হত তবে কি আর এত নিশ্চিন্তে থিসিসটা শেষ করতে পারতুম। না, নাটকগুলোই লিখতে পারতুম।' তারপরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'একবার থিসিসটা জমা দিতে দাও না, দেখবে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়ব দুজনে।'

মাঝে মাঝে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়লেই যে আমার সমস্যার কোনো সমাধান হবে না একথা ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই। মানুষ একচক্ষু। যে দিকটা দেখতে, ভাবতে অভ্যস্ত সেদিকটাই দেখে, ভাবে। অন্য দিকে চোখ ঘোরাতে পারে না। আমার এত অভিমানই বা কীসের? বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বই তো নই, বাবা অবশ্য অনেক আগেই গত হয়েছেন। কিন্তু মা-দাদারা কেউ এ-বিয়ে মেনে নিলেন না বলেই তো এত অসম্মানের মধ্যে দিয়ে আমায় শ্বশুরবাড়ি আসতে হল। সুশান্ত ভেবেছিল পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি আছে বলে, কলেজে পড়াই বলে আমার খাতির হবে। ও জানে না মেয়েদের সম্মান তাদের চাকরি, শিক্ষা, ডিগ্রি এসব দিয়ে হয় না। সমাজের এমন স্তর এখনও অনেক আছে যেখানে এগুলো বরং মেয়েদের অসম্মান বাড়ায়। চাকরি করে?—এ মা। কলেজ? ওই হল। মাস্টারনি। পি. এইচ. ডি.? এম. এ.-র পরেও আরও পড়েছে? বয়সের কী গাছপাথর নেই গা? মেয়েদের সম্মান হয় তাদের রূপে, তাদের বাবা, স্বামী এদের পদমর্যাদায়, আর যৌতুকে। আমার রূপ? নেই। বাবা? চলে গেছেন। স্বামীর পদমর্যাদা? এখনও তৈরি হয়নি। আর যৌতুক? ভাঁড়ে মা ভবানী।

তাই এঁদের বাড়ির সব বউয়ের গুণ আছে, খালি নতুন বউমার কোনো গুণ নেই। বড়ো বউয়ের চোখ ঝলসানো রূপ। সেজো বউটি কেমন সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, টিপটপ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেজো বউমা ছুঁচের কাজে এক্সপার্ট, বড়ো বড়ো শাড়ি, বেডকভার ফুলে লতাপাতায় ভরিয়ে ফেলছে, অবাক মানতে হয়। ন বউমা তো সাক্ষাৎ ষষ্ঠীদেবী, মমতাময়ী জননী, কোলে কাঁখে দেবশিশুর দল। কনে বউমা! হিসেব জ্ঞান টনটনে। কোথাও এতটুকু অপচো করো তো! কনে বউমার চোখে না পড়ে পারে না। নতুন বউমা? সব চুপ।

শাশুড়ি একদিন একগোছা সোনার চুড়ি আর এক্টা মটর দানা দিয়ে বললেন, 'এগুলো পরো বউমা। ন্যাড়া গায়ে ঘোরো ফেরো, আমার বড়ো লজ্জা করে।'

আমি বললুম, 'ট্রেনে, বাসে যাতায়াত করি, এসব তো ডাকাতি হয়ে যাবে মা।'

'তো বাড়িতে ফিরে এসে পরো।' এইভাবে আমার কিছু গহনা বা সম্মান লাভ হল। আদর করে উপহার দেওয়া নয়, দায়ে পড়ে নিতান্ত ব্যাজার হয়ে হাত-উপুড়। তা তা-ই সই। সঙ্গগুণে আমারও কেমন একটা হীনম্মন্যতা জন্মে গেছে। গয়নাগুলো পরে মনে হল জাতে উঠলুম।

জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন দুপুরবেলা দিদিশাশুড়ি বললেন, 'ভাই ভাত-পাতে আগে ঠাকুরের প্রসাদটুকু খেয়ে তারপর অন্যসব খেও।' খিচুড়ি আর পায়েস, একমুঠো। খেয়ে চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'এ প্রসাদ কোথাকার দিদি?'

ও মা, জানো না? বামুন বাড়ির! বামুনকর্তা বারোমাস সমস্ত শক্তি পুজো নিজের হাতে করেন যে। বামুনমা নিজের হাতে ভোগ রাঁধেন।

বড়ো জাকে জিজ্ঞেস করে জানলুম বামুনবাড়ি আমাদের পেছনেই। নাম তারানাথ ভট্টাচার্য। পেশায় পুরোহিত বা পণ্ডিত কিছু নন, কোনো মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভক্তিমান। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই। তাই আজ সারাদিন ধরেই খুব শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ইত্যাদির আওয়াজ পাচ্ছি। এ বাড়ি থেকেও ঠাকুরের পুজো বাবদ শাড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি কীসব গেল। দিদিশাশুড়ি জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'পুজো তো কতই হয় কিন্তু বামুনকর্তার পুজো একেবারে সাক্ষাৎ ঠাকুরের আবাহন করে এনে প্রতিমার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া। এমন জায়গায় পুজো পাঠাতে পারাও অনেক পুণ্যি, অনেক ভাগ্যির কথা।'

ফরসা মতো ছোটোখাটো একজন লালপেড়ে শাড়ি পরা মহিলা আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন বটে এ বাড়ি আসার পর। শুনলুম তিনিই বামুনমা। আর তারানাথবাবুকে আমি মাঝে

মধ্যেই ট্রেনে দেখি। যাওয়ার সময়েই বেশি। আসবার সময়েও কখনও কখনও। ফরসা দোহারা চেহারা, চমৎকার প্রশান্ত মুখ। চুলগুলো বেশিরভাগই সাদা হওয়ায় খুব সৌম্য লাগে। শার্ট-প্যান্ট পরে প্রৌঢ় মানুষ ভিড় ট্রেনে ওঠানামা করেন, সৌম্যদর্শন হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন আঁচ করতে পারিনি তিনি এত ভক্তিমান, কিংবা নিজের হাতে সব মাতৃপুজো করবার মতো শক্তি ধরেন।

খুব কৌতূহল হল। পুজো অর্চনার আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আমার বাপের বাড়িতে খুব একটা রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু আমার ওই ধূপ-ধুনো, শঙ্খ-ঘণ্টা, মন্ত্র পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে আবহাওয়া তৈরি হয় সেটা ভীষণ ভালো লাগে। স্কুল-কলেজে পড়তে সরস্বতী পুজোয় আলপনা দেওয়া, ফল-কাটা, প্রসাদ-বিতরণ, অঞ্জলি বা আরতির সময়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকা—এসব আমার ভালো লাগত।

সরস্বতী পুজোর দিন শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলুম, ভট্‌চায বাড়ির পুজো দেখতে যাব কি না। এ বাড়িতে আবার বড়োদের অনুমতি না নিয়ে পাড়ার কোনও বাড়ি যাবার নিয়ম নেই। উনি সানন্দেই সম্মতি দিলেন। যখন পৌঁছোলুম তখন তারানাথবাবু আরতি করছেন, বিচিত্রভাবে পঞ্চপ্রদীপ নাচিয়ে নাচিয়ে। বামুনমা শাঁখে ফুঁ পাড়ছেন। কাঁসর বাজাচ্ছে ওঁদের নাতি, বড়ো মেয়ের ছেলে, আরও দু-চারজন নাতিনাতনি দাঁড়িয়ে আছে। বড়ো মেয়েও রয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ সত্যিই অপূর্ব।

শুধু ধূপ-ধুনোর পবিত্র ভাবদ্যোতক গন্ধই নয়, মঙ্গলবাদ্যই নয়, গাঁদা ফুলের মালায় সজ্জিত ছোট্ট সরস্বতী বিগ্রহের দেবীভাব, উপস্থিত সকলের মগ্নতা, তারানাথ ভট্টাচার্য মশাইয়ের বাহ্যজ্ঞানশূন্য তদ্‌গত তন্ময় পুজোর ভঙ্গি সব মিলিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দিল।

উপুড় হয়ে প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করে, পুজো শেষ করে এদিকে ফিরলেন ভট্টাচার্যমশাই। আমাকে দেখবামাত্র ওঁর মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে গেল। কেমন একটা উল্লাসের সঙ্গে বললেন, 'জানতুম, আমি জানতুম, মা আমার ডাক শুনেছেন, সশরীরে এসে নিজেই নিজের পুজো নিচ্ছেন সন্তানের হাত থেকে', আমাকে জোড় হাতে নমস্কার করলেন উনি।

এগুলো বয়স্ক মানুষের অভ্যস্ত কথার কথা বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারত, যদি না তাঁর মুখেব সেই দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের ভঙ্গিটা থাকত। বামুনমা বলে উঠলেন, 'উনি ঠিকই বলেছেন মা, তুমি যে একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী। তোমার সব কথা শুনেছি মা আমরা, ঠিক চিনেছি তোমাকে।'

আমার চোখ-ভরতি করে জল এসেছিল, মুখ নীচু করে কোনোমতে বললুম, 'কী যে বলেন কাকিমা, কবে থেকে ভাবছি আপনাদের পুজো দেখব, আজ এসে এত ভালো লাগল।'

ওঁরা তিনজনে স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা আমাকে যত্ন করে বসিয়ে প্রসাদ না খাইয়ে ছাড়লেন না। খিচুড়ি, বাঁধাকপির ডালনা, বেগুনি, কুলের অম্বল, পায়েস। কী অসাধারণ যে সেই প্রসাদের স্বাদ! আমি বললুম, 'এমন রান্না আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।' কাকিমা বললেন, 'নিশ্চয়ই দেব মা। তুমি আবার এসো, তুমি এলে আমরা ভাগ্যি মানব।'

বাড়ি ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কেঁদে ফেললুম। জীবনে অনেক দিন পর, কিংবা বোধহয় এই প্রথম কেউ আমার বড়ো সমাদর করল, বড়ো সম্মান! আমার সব কথা শুনেছেন ওঁরা? কোন্ কথা? অসবর্ণবিবাহ, পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়েরই অসম্মতি, তৎসত্ত্বেও জোর করে কাগজের বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে পড়া, স-ব? চিনেছেন আমাকে? কী চিনেছেন? কী দেখলেন যে অত আদর! আমার এতদিনের মুখের ম্লানিমা, চোখের জল, অন্তরের গ্লানি সব যে একেবারে ধুয়ে গেল। কোন্‌কালে বাবাকে হারিয়েছি। মায়ের মুখখানা দেখিনি কতদিন হয়ে গেল। বাপের বাড়ির কারুর সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হলে চোখ-ফিরিয়ে নেয়। এখানে আমি আছি যেন

অনাহূত অতিথির মতো। আর এই রক্ষণশীল, ভক্তিমান দম্পতি কি না অনায়াসে বলে দিলেন, 'তোমাকে ঠিক চিনেছি। তুমি একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী।' অন্য কিছু না, কত বড়ো মন, কত স্নেহ-গড়া অন্তর হলে তবে কেউ একথা বলতে পারে!

এতদ্দিন পরে আমার বোধহয় একটা জুড়োবার জায়গা হল। মাঝে মাঝেই যাই। ভট্টাচার্য দম্পতিকে কাকাবাবু কাকিমা ডাকি। গল্প করি। আমি আর কী গল্প করব, আমার জগতের লোকই নন ওঁরা। আমি শুধু শুনি। কাকিমার বাপের বাড়ির গল্প। শ্বশুরবাড়ির দেশের গল্প। একটা কোনো সূত্র পেলেই হল, সেটাকে উপলক্ষ্য করে উনি অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন, সব কথা বুঝতে পারি না, তাড়াতাড়ি বলেন, তার ওপর ঢাকাই টান, কিন্তু স্নেহ আর আন্তরিকতা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। একেকদিন কাকাবাবু এসে বসেন, হেসে বলেন, 'কাকিমা তোমার কানের পোকা বার করে দিচ্ছেন, না?' কাকিমা তখন বলেন, 'সত্যি! তুমি কত বিদুষী। তোমার কাছে আমি মূর্খ বকবক করে মরি। কিছু মনে করো না তো মা।' আমি বলি, 'বিদুষী-টিদুষী বলে আমায় লজ্জা দেবেন না কাকিমা।' আন্তরিকভাবেই বলি। বিদ্যার মূল্য কতটুকু? তা যদি ভাব দিতে না পারে?

কাকিমা একদিন বললেন, 'তোমায় প্রথমদিন দেখেই লক্ষ্মীঠাকরুন বলে বুঝতে পেরেছিলাম মা। উঠোনে এসে দাঁড়ালে মুখ নীচু করে কিন্তু কেমন সোজা, কোথাও কোনো মিথ্যে সংকোচ নেই। লক্ষ্মী যে! নিজের সিংহাসনে দাঁড়াতে কি মায়ের মনে সংকোচ আসে?' আমি আর থাকতে পারলুম না। আস্তে আস্তে বললুম, 'কিন্তু কাকিমা আমাকে তো কেউ লক্ষ্মী ভাবে না। আমি তো উড়ে এসে জুড়ে বসা একটা আপদ,—'

'লক্ষ্মী যখন কাউকে দয়া করেন, তখন সব সময়ে তাঁকে চিনতে পারবে, এত সৌভাগ্য মানুষের হয় না মা।' দেখি কাকাবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'লক্ষ্মী কে? লক্ষণ কী? শ্রী-সম্পদ যখন কল্যাণের সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় মা। তোমার শ্বশুরগৃহে সম্পদ ছিল মা, শ্রী ছিল না, কল্যাণ ছিল না, সংযমও ছিল না। এবার হল। আমি মায়ের পূজা করি, টের পাই কখন তাঁর অকারণ কৃপা প্রকাশিত হয়। তোমার মধ্যে দিয়ে সেই কৃপা প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যার সঙ্গে সংযম, বিনয়, সম্পদের সঙ্গে মঙ্গল। তাই বলেছিলাম তোমাকে চিনেছি। তুমি নিজে চেনো না মা নিজেকে। মেয়েদের মধ্যে যখন শক্তির প্রকাশ হয় তাঁরা কি নিজেদের চিনে কাজ করেন?'

কাকিমা আসবার সময়ে বললেন, 'তোমার কাকাবাবু যে তোমাকে কী চোখে দেখেছেন মা! আমাকে সবসময়ে বলেন তোমাকে যেন বিশেষ যত্ন করি।'

আমি হেসে বলি, 'আপনাকে কি যত্ন করা শেখাতে হয় কাকিমা?'

'তা নয়, কিছুই তো পারি না।' উনি বললেন, 'কিন্তু তোমাকে বড়ো ভালো লাগে।'

ধীরে ধীরে ভট্‌চায্যি বাড়ির বিশেষ আদরের হাওয়া আমার শ্বশুরঘরেও লাগল। প্রথমদিককার সেই বিরূপতা, উদাসীনতা, অশ্রদ্ধা এখন যেন আর নেই। বরং জায়েরা মাঝে মাঝে আমার পরামর্শ নিয়ে যান, শাশুড়িও আমার মতামত উপেক্ষা করেন না। দিদিশাশুড়ি কথায় কথায় বলেন, 'বাব্বা, বামুনকর্তা স্বয়ং তোমাকে যা মান্যি করেন নাতবউমা!' বুঝতে পারি ওঁদের মতামতই এ বাড়ির হাওয়া পালটে দিচ্ছে।

কাকা-কাকিমার স্নেহ যে অকৃত্রিম, যে-কোনো কারণেই হোক আমাকে যে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, এ বিষয়েও কোনো সংশয় নেই। খালি একটা কথা আমার মনে বার বার উঠতে থাকে। ওঁরা যেমনি ভক্তিমান, শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কিন্তু নিষ্ঠাবানও বটে। অর্থাৎ আচার-বিচার মানেন। খুব বেশি রকম। অতিরিক্ত আচারপরায়ণতা থেকেই তো মনুষ্যত্বের যত অপমান! আমাকে ওঁরা মা

বলছেন, আমার মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। অব্রাহ্মণ বলে আমার আত্মার অপমান ওঁরা করেননি। ঠিক কথা। এই সহনশীলতা, মমতা, অন্তর্দৃষ্টি যদি ওঁরা ভক্তি থেকে পেয়ে থাকেন তো ওঁরা সত্যিই অসামান্য। কিন্তু আমার পরীক্ষা করে দেখতে খুব ইচ্ছে হয় কতটা উদারতা ওঁদের আছে। আমি যে যুক্তিবাদী! পরীক্ষানিরীক্ষা আর গবেষণাই আমার স্বভাব! তাই একদিন বললুম, 'কাকিমা, আমাকে তো আপনারা যখন-তখন খাওয়ান। আমারও কিন্তু নিজের হাতে আপনাদের খাওয়াতে ইচ্ছে করে।'

কাকাবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'আমি যে স্বপাক ভিন্ন খাই না মা, নেহাত অসুখে-বিসুখে অপারগ হলে তোমার কাকিমা রেঁধে দ্যান।'

কাকিমা বললেন, 'সে-ও কি কম হাঙ্গামা! তসর পরতে হবে। সদ্য চান করে তবে রাঁধতে হবে। রান্নার সময়ে কথা বলতে পারব না।'

আমি বললুম, 'রান্নার সময়ে কথা না বলা, খুবই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। কিন্তু তসর কেন কাকিমা? তসরের শাড়ি কি কেচে নিয়ে পরেন?'

না, তোলা থাকে, পুজো-টুজোর সময়ে বার করে পরি, ময়লা হলে কাচি।

আমি বললুম—'এটার কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পবিত্র মানে যা একেবারে পরিষ্কার। সাবান দিয়ে কাচা কাপড় যত শুদ্ধ, তুলে রাখা সিল্ক কাপড় কি তত শুদ্ধ হতে পারে?' কাকিমা বললেন, 'নাও এবার কী জবাব দেবে দাও। সরস্বতীর সওয়াল এ। শক্ত ঠাঁই।' কাকাবাবু বললেন, 'সুতিবস্ত্রে যত সহজে ময়লা লাগে, তসরে তত সহজে লাগে না মা। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ, ব্যাকটেরিয়ার কথা ভাবতে গেলে পরিষ্কার সাবান-গরম জলে কাচা বস্ত্রই শুদ্ধ। তবে কি জানো মা, শাস্ত্রের অনেক বিধানের পিছনেই কিন্তু যুক্তি আছে। যুক্তিগুলো কালের প্রভাবে হারিয়ে গেছে। আমরা অন্ধের মতো আচার বলে পালন করে যাই সবাই। যেমন তুলসী গাছকে পবিত্র বলা হয়ে থাকে। বাড়িতে তুলসী রাখার নিয়ম। আমি শুনেছি তুলসীর অক্সিজেন উৎপাদন করার ক্ষমতা অন্য গাছের থেকে বেশি। তা ছাড়াও তুলসী ওষধি। বহু রোগের নিরাময়ের উপায় আছে তুলসীর পত্রে, ছালে। বাড়িতে সব সময়ে যদি একটি ওষধিবৃক্ষ থাকে গৃহস্থের কত সুবিধে বলো তো?'

আমি হেসে বললুম, 'বুঝলুম। নিশ্চয়ই তুলসী-ভক্তির পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। কিন্তু আমি যদি চান করে পরিষ্কার শাড়ি পরে, না হয় তসরই পরলুম, আপনাকে রেঁধে দিই আপনার না খাওয়ার কোনো শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক কারণ থাকে কী?'

চোখ বুজিয়ে কাকাবাবু স্মিত মুখে বললেন, 'যা দেবী সর্বভূতেষু অন্নরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। আমি কারও হাতে খাই না মা, শাস্ত্রীয় অন্ধতাই হবে হয়তো, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে, তবে তুমি আমার মা, তোমার যখন এত আগ্রহ নিশ্চয়ই খাব।'

আমার মনের ভেতরটা আলোয় আলো হয়ে গেল। চান করে, বাড়িতে ধোয়া সাদা কাপড় পরে রেঁধে দিলুম, খেতে বসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, না মা?'

আমি শুধু হাসলাম। উনি বললেন, 'আনন্দরূপং যদ্বিভাতি... আনন্দই ঈশ্বর। আমাকে খাইয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও মা, তো সেও একরকম ঈশ্বরকেই পাওয়া। তোমার সেই পাওয়ার উপলক্ষ্য হতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।'

মনে মনে ভাবি আমিও ধন্য, এমন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের দেখা পেলুম যিনি আবেগের বশেই অব্রাহ্মণ-কন্যাকে মানুষের অধিক সম্মান দেননি, মনেপ্রাণে যিনি আচারবিচারের ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে, সত্যিকারের শ্রেয় লাভ হলেই মানুষ এমন হয়। বিজ্ঞানশিক্ষার বাইরেও হয়।

কাকাবাবুর মধ্যে আমি আমার বাবাকে ফিরে পেলুম, কাকিমার মধ্যে মাকে। ওঁরাও আমাকে

মেয়ে বলে মনে করেন। কাকিমার অসুখ করলে আমি ওঁদের বাড়ি গিয়ে যতদূর পারি সেবা-শুশ্রূষা করে আসি। ওঁরা আমার কাছ থেকে সেবা নিতে কোনোরকম কুণ্ঠা করেন না।

শীতকালটাতে কাকাবাবুর হাঁপানি বাড়ে। খুব কষ্ট পান। কলকাতা থেকে আমার এক সহকর্মিণীর চেনা ভালো ডাক্তারকে সেবার আনলুম। তাঁর চিকিৎসায় থেকে উনি খুব আরাম পেলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে বলে গেলেন, 'এতদিন ফেলে রেখেছেন, চিকিৎসা করাননি কেন? এ তো কার্ডিয়্যাক অ্যাজমা। হার্টের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, যে কোনোদিন খারাপ টার্ন নিতে পারে।' ওষুধপত্রর ব্যবস্থা হল, খাওয়াদাওয়ার নিয়ম হল। শিশুর মতো উনি আমার সব কথা মেনে নিলেন। ওঁদের ছেলে নেই। তিনটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়োজন ছাড়া বাকি দুজন খুবই দূরে দূরে থাকে। হার্টের কথা কী করে ওঁদের বলি! মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে কাকাবাবু প্রেসক্রিপশনটা হাতে করে ভালো করে দু-তিনবার পড়লেন। কিছু বললেন না।

আগস্ট মাসের সন্ধেবেলা। সারাদিন মেঘ করে আছে। ভীষণ গুমোট। বিকেলের দিকে ঠিক বেরোবার মুখে ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। গরম কমল না। মাঝখান থেকে রাস্তাগুলো কাদায় কাদা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সবে গা ধুয়ে বেরিয়েছি, বিজলি চলে গেল। গঙ্গার দিকের জানালাগুলো খুলে দিয়ে একটু দাঁড়িয়েছি, আমার এক ভাসুরের মেয়ে বলে গেল, 'ও বাড়ির বামুনমা তোমায় সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করছেন কাকিমা।'

কেন রে?

কী জানি! বোধহয় বামুনকর্তার শরীর ভালো নেই।

মনের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সুশান্তকে বললুম, 'চলো তো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ওঁদের দোতলায় উঠতে কাকিমার গলা পেলুম, 'এখন কেমন বোধ করছ? কথা বলছ না কেন?'

উত্তর নেই। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলুম কাকাবাবুর মারাত্মক টান উঠেছে। চোখ বেরিয়ে আসছে এককেবারের টানে। সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনতে চলে গেল। কাকিমাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কখন থেকে এমন হয়েছে?'

কাঁদো-কাঁদো গলায় উনি জানালেন, কাল রাত থেকে জ্বর, সকালে প্রায় কিছুই খাননি। খালি দুধ। শেষ দুপুর থেকেই টান উঠেছে। কাকিমা ওঁর বুকে মালিশ করে দিচ্ছিলেন। বারণ করলুম, হার্টের ব্যাপার! দেখতে দেখতে টানটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। ওষুধপত্র যা খাওয়ার ছিল খাওয়ালুম, জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, কষ্ট হচ্ছে খুব? একটু ধৈর্য ধরুন, এক্ষুনি ডাক্তার এসে পড়বেন।' বললে কী হবে, দেখছি বুকটা ওঁর হাপরের মতো ওঠানামা করছে। অনেক কষ্টে বললেন, 'জল, একটু জল'। কাকিমা তাড়াতাড়ি গ্লাসে করে জল নিয়ে এলেন। তাঁর হাত কাঁপছে, বললেন, 'আমার বড্ড ভয় করছে শান্তা, তুমিই খাইয়ে দাও।' আমি ফিডিং ক্যাপে জলটা ঢেলে ওঁর গলায় একটুখানি ঢেলেছি কি না ঢেলেছি, হঠাৎ উনি প্রাণপণ শক্তিতে কাপটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। বুকে ভর দিয়ে উঠে বসেছেন। যন্ত্রণায় চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তারপর খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়েই বিছানার ওপর কাত হয়ে পড়ে গেলেন। চোখ আধখোলা, নিশ্চল।

কাকিমা কেঁদে উঠলেন, 'কী হল? কী হল? শান্তা এ কী ওঁর পা এমন ঠান্ডা কেন? অজ্ঞান হয়ে গেলেন, না কী?' কী হল, বুঝতে পারলুম, কিন্তু কোন্ প্রাণে বলি? ওঁকে সান্ত্বনা দিতে নিজের চোখের জল সামলে ঠান্ডা সাদা পা ঘষে ঘষে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। সুশান্ত ডাক্তার এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ফিরল। ডাক্তার ওঁর ডান হাতখানা একবার তুলে ধরেই নামিয়ে রাখলেন।

এমনি করেই শেষ হয়ে গেল কয়েক বছরের সুন্দর সম্পর্কের গল্প। বেচারি কাকিমা! খালি বলেন, 'জল খাবার জন্যে অমন তেড়েফুঁড়ে উঠতে গেল বলেই বোধহয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল, না? জলটা বোধহয় গলায় আটকে গিয়েছিল। না?' কীভাবে শোকার্ত মানুষটিকে বোঝাই যে বিশাল হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো আশাই ছিল না কাকাবাবুর।

শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেছে। কাকিমা একদম একা। ওঁর বড়ো মেয়ে কলকাতায় থাকেন, তিনিই আপাতত ওঁকে নিয়ে যাবেন। বাড়ির বিলিব্যবস্থা হচ্ছে। ওঁর অন্য দুই মেয়েও উপস্থিত। সবাই মিলে গোছগাছ চলছে। আমিও রোজ সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরেই যাই। যতদূর সম্ভব সাহায্য করি। দিন কয়েক পর। পরদিনই কাকিমা চলে যাবেন, মনটা বিহ্বল হয়ে রয়েছে, কাকিমার বড়ো মেয়ে একটা সুন্দর লালপাড় শাড়ি আমার হাতে তুলে দিলেন, কাকিমা বললেন, 'শেষ সময়ে মুখে জল দিলে একটা শাড়ি দিতে হয় মা আমাদের, নাও।' শেষ সময়ে? মুখে জল? সহসা শেষ দিনের শেষ দৃশ্যটা নির্মমভাবে ঝলসে উঠল আমার চোখের সামনে। বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, চোখ ঠিকরে আসছে, কাকাবাবু তাহলে ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন মহাকাল সামনে। বিদ্যুচ্চমকের মতো এক লহমায় আমি সমস্তটা বুঝতে পারলুম। গলা বুজে আসছে, শাড়িটা ফেরত দিয়ে বললুম, 'আপনি ভুল দেখেছেন কাকিমা, শেষ জল দেবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। জলটা উনি নিজে নিজেই খেয়েছিলেন।'

পরলোকের আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গতি সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন আজীবন শক্তির পূজারি। শূদ্রাণীর হাতের জল পান করবার ঝুঁকিটা কিছুতেই নিতে পারেননি।

বাচ্চু কেন ফিরে এল

সুস্মিতার স্বামী অলকেশ যখন স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল, তখন সুস্মিতার বয়স চল্লিশও পার হয়নি। আর বাচ্চু একটা নেহাত বালক। অলকেশ পাঁচ মাসের কাছাকাছি সময় কোমায় পড়ে রইল জীবন্মৃত হয়ে। ডাক্তাররা বললেন ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়নি। নাড়ি জানান দিচ্ছে, শারীরিক ক্রিয়াকর্ম হয়ে যাচ্ছে, শুধু জ্ঞান নেই। তাঁরা খুব সম্ভব জানতেন, এই জ্ঞান আর ফিরবে না। কিন্তু সুস্মিতা বা তার কোনো আত্মীয়স্বজনকেই কথাটা বলা ভালো মনে করেননি। পাঁচ মাস ধরে সুতরাং তিনটে প্রক্রিয়া চলল। প্রথম—সুস্মিতার প্রতিদিন নতুন আশা নিয়ে মিলিটারি হাসপাতালে প্রবেশ করা, আজ নিশ্চয়ই সে অলকেশের চৈতন্যলাভের কোনো-না-কোনো লক্ষণ দেখবে। দ্বিতীয়—আত্মীয়স্বজনদের প্রতিদিন অলকেশের একটু একটু করে শীর্ণ-হয়ে-যাওয়া ছোটো-হতে-থাকা অচৈতন্য শরীরটার দিকে তাকাতে তাকাতে তার মৃত্যু-কামনা করা। কারণ এই শরীরে যদি কোনোদিন সাড় ফিরে আসেও, এ যে কোনোদিন আর স্বাভাবিক হতে পারবে না, দুর্বহ এক বোঝা হয়ে থাকবে—এ কথা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন এবং মৃত্যুশোক উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে যুক্তিপূর্ণ মনোভঙ্গিতে পৌঁছোচ্ছিলেন, সুস্মিতার পক্ষে যেটা সম্ভব ছিল না। এবং তৃতীয়—বাচ্চুর হঠাৎ বড়ো হয়ে যাওয়া।

এই তৃতীয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে অস্বাভাবিক। বাচ্চু প্রতিদিন হাসপাতালে বাবার শয্যার পাশে বসে নির্নিমেষে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। ডাক্তাররা কী বলতেন, তার মা কী বলছে, কাকা-মামা-মাসি-পিসিরা কে কী বলছে, কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে সে কিছুই দেখত না। খালি নির্নিমেষে বাবার মুখ দেখত। মাঝে মাঝে বাবার মুখ-হাত-পা খিঁচিয়ে উঠছে, চোখের ভেতর তারা নড়ছে। অন্য কারও কথা, কারও আশ্বাস বা হতাশার কোনো মূল্যই তার কাছে আর নেই। সে নিজে নিজে বুঝতে চাইছে তার এই বাবা, যে মাত্র কদিন আগে কমাস আগেও অদ্ভুত জীবন্ত ছিল, ছোটো মাসি-মেসোর জন্য দই আনতে গিয়ে যে বাবা লরির ধাক্কায় নর্দমায় পড়ে গিয়ে লোকবাহিত হয়ে ঘরে ফিরল কর্দমাক্ত এবং রক্তাক্ত হয়ে, সেই বাবার কথা-না-বলা, না-হাসা এই নিশ্চুপ-পড়ে-থাকার মধ্যে কী রহস্য আছে। তার মনোযোগের সারাৎসার দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বুঝে নিতে চাইছে।

অবশেষে বাবার হৃৎস্পন্দন থেমে গেলে তাঁর মুখাগ্নি করে বাচ্চু বাড়ি ফিরেই কাছা গলায় পড়তে বসল। তার বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। সে আর সময় নষ্ট করতে পারে না। পাশের ঘরে যখন তার মাকে ঘিরে অন্যান্য মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন, সে হঠাৎই একবার উঠে গেল। দরজাটা খুলে বলল, 'এত শব্দ করলে আমি পড়ব কী করে?' তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে উপস্থিত সবাই চুপ করে গেল। তার আচরণ সবার কাছেই খুব অস্বাভাবিক ঠেকল। সুস্মিতা পাঁচ মাস ধরে নিজের অজান্তেই স্বামীর মৃত্যুর জন্য হয়তো প্রস্তুত হয়ে ছিল, তাই তার নতুন করে ভাবনা হল আকস্মিক আঘাতে বাচ্চুর কিছু হয়নি তো? সে উঠে গিয়ে বাচ্চু যে ঘরে পড়ছিল,

সেই ঘরে পাতা তক্তাপোশের ওপর গিয়ে বসল, বাচ্চু বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও মা। শোও। ঘুমিয়ে পড়ো।'

বাচ্চু সে বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয় অদ্ভুত নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হল। সে যখন পড়ে, এমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে ডাকলে শুনতে পায় না।

অলকেশের মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, তার আত্মীয়রা অর্থাৎ জ্যাঠাকাকারা ক্রমে ক্রমে সুস্মিতার ওপর তাদের দাবি বাড়াতে লাগলেন। এরকম কথা শোনা যেতে লাগল, অলকেশ চিরকাল বাইরে বাইরে থেকেছে, বাড়ির জন্য কিছু করেনি, সুতরাং বাড়ির ওপর তার স্ত্রী-পুত্রের দায় বর্তায় না। বরং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য খরচের টাকাটা তো বটেই, আরও কিছু সুস্মিতা দিক। নানা ছলছুতোয়, সুস্মিতা ও বাচ্চুকে দোতলায় যে ঘরে তারা কলকাতায় এলে থাকতে অভ্যস্ত ছিল, সেখান থেকে একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে নির্বাসিত করা হল। এবং তার টাকাকড়ির হিসেব চাওয়া হতে লাগল। এই নিয়ে অশান্তি ও অপমান যেদিন চরমে পৌঁছোলো, হঠাৎ দেখা গেল বাচ্চু তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে তার চেয়ে বেশ বড়ো একটি বন্ধুকে নিয়ে আসছে। সে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিনা ভূমিকায় বলল, 'মা, তুমি রেডি হয়ে নাও। বাড়ি ঠিক করে এসেছি। মালপত্র নেবার জন্যে টেম্পো আসছে। এই খোকনদা সব ব্যবস্থা করবে, তুমি শুধু জামাকাপড়, বইপত্র গুছিয়ে নাও।'

সুস্মিতার দেওর বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে চ্যাচামেচি করে বলল, 'মনে রেখো এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে আর কোনোদিন ঢুকতে পারবে না—বাড়ির অংশ দাবি করতে এলে দেখিয়ে দেব মজা।'

সুস্মিতা ইতস্তত করছিল। এতটুকু একটা ছেলের কথায় নিশ্চিন্ত না হোক নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া! বাচ্চু তখন এগিয়ে এসে কঠিন হাতে তার হাত ধরল। বলল—'কই, রেডি হও!' সুস্মিতার মনে হল বাচ্চু তার হাত মুচড়ে দেবে তার কথা না শুনলে। বাচ্চুর তখন ঠিক চোদ্দো বছর বয়স।

তারা যেখানে এসে উঠল, সেটা মফস্‌সল। বাচ্চুর এক বন্ধুর মামারবাড়ির একতলা। নতুন বাড়ি। সবকিছুই আলাদা। সদর দরজা পর্যন্ত। বাচ্চু বলল, 'আমরা দিল্লিতে, বরোদায়, কান্‌সভালে ঠিক যেভাবে ছিলাম সেইভাবে বাড়িটাকে সাজাও মা।' সে শুধু বলেই ক্ষান্ত হল না। নিজেও হাত লাগাল। বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে কদিনের মধ্যেই বাড়িটাকে ছিমছাম করে ফেলল। যেখানে ছবি থাকবার ছবি রইল, যেখানে ফুলদান গাছদান থাকবার ফুলদান গাছদান বসাল, টেবিলের ওপর ফোটোফ্রেমে বাবা-মা-বাচ্চুর ছবি শোভা পেতে লাগল।

রাতে হা ক্লান্ত হয়ে শুতে যাবার আগে বাচ্চু বলল, 'মা, তোমার টাকাপয়সা কোথায় কী আছে, কত আছে, কীভাবে আছে একটু বোঝাও তো!'

যতক্ষণ না বুঝল সে কিছুতেই ছাড়ল না। তারপর হিসেব করতে বসল। করে দেখিয়ে দিল বাড়িভাড়া দিয়ে, সংসারখরচ করে, তার পড়াশোনার জন্য ব্যয় হয়েও তাদের ঠিক কত থাকবে। সমস্ত করে-টরে সে মাকে বলল, 'গোয়াবাগানের একতলার খাটালের-গন্ধ-আসা মশা-অলা ঘরটার চেয়ে এখানেই তো আমরা ভালো থাকব। তা ছাড়া গালাগাল, খারাপ কথা, গোলমাল এসবের কোনোটাই আমার ভালো লাগে না।'

সুস্মিতারা চলে আসায় গোয়াবাগানের বাড়িতে এবং পাড়ায় একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জনমত সুস্মিতাদের পক্ষে। 'মা বেঁচে থাকতে বিধবা বউটাকে, নাতিটাকে বাড়ি ছাড়া করল গা, এমন ইতর চামারও তো দেখিনি!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রতিক্রিয়ার ধাক্কাতেই হোক, অনুশোচনাতেই হোক ধীরে ধীরে সুস্মিতার শ্বশুরবাড়ির কেউ-কেউ তার নতুন বাড়িতে আসতে লাগল, পুজো এবং জন্মদিনে বিশেষ করে বাচ্চুর জন্য উপহারাদি নিয়ে। সুস্মিতা বেশ পুলকিত। হাজার হলেও নিজের দেওর, জা, ননদ, শাশুড়ি। হয়তো মনে মনে শ্বশুরবাড়ির ন্যায্য ভাগ পাওয়ার আশাও তার মনে জেগে থাকবে। সে সুগন্ধি চা, জলখাবার ইত্যাদি তৈরি করে তাঁদের আপ্যায়িত করে। এভাবে পুজো গেল, জন্মদিন এল। তাঁরা আবার এসেছেন। হাতে বাচ্চুর জন্য শার্টপ্যান্টের প্যাকেট। বাচ্চু সেদিন বাড়ি ছিল। সে ঢুকে গত পুজোয় দেওয়া জামাকাপড়গুলো টেবিলের ওপর রাখল, শান্তভাবে বলল, 'যেগুলো এনেছ সেগুলো এবং এগুলো নিয়ে যেয়ো। চা-টা খাও, তারপর এগুলো নিয়ে চলে যেও। আর এসো না। আমার অসুবিধে হয়।' তার বয়স পনেরো পূর্ণ হয়েছে। তার ঠাকুমা, জ্যাঠা ও জেঠিমা দেখলেন তাঁদের সামনে যেন ছোটো অলকেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবিকল!

অপমানের চেয়ে বেশি যেন আতঙ্ক নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। অলকেশই কি ছেলের মধ্যে দিয়ে এসে তাঁদের ভর্ৎসনা করে গেল? সুস্মিতা বাচ্চুকে বকতে ভয় পায়। বাচ্চু যেন তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। সে কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'বাচ্চু, তোর চেয়ে আমি তো কম ভুগিনি, আমিও জানি কে কী রকম, তবুও আপনজন, নিজে থেকে যখন আসছে আসুক না। ক্ষতি তো কিছু নেই!'

বাচ্চু সংক্ষেপে বলল, 'আপনজন চিনতে শেখো।'

আস্তে আস্তে বাচ্চুর যেমন নিজস্ব বন্ধুর বৃত্ত গড়ে উঠেছিল, সুস্মিতারও তেমনি অনেক নতুন বন্ধু হল। প্রতিবেশিনী, বাচ্চুর বন্ধুদের মায়েরা। সুস্মিতা ভুলে যেতে থাকল তার নিঃসঙ্গতা, আত্মীয়ের অভাব। তার অনেক গুণ। সে ভালো গাইতে পারে, অভিনয় করতে পারে, রান্নাবান্নায় সে দ্রৌপদীবিশেষ। তাকে ঘিরে আপনা-আপনিই একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব গড়ে উঠল। সুস্মিতা গান গাইছে, গান শেখাচ্ছে, রান্নার বই লিখছে। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে ফাংশন করাচ্ছে। একে একে তিনটে কুকুর হয়েছে। সুস্মিতার ভাবনা-চিন্তা করবারই বা অবসর কই? সর্বক্ষণ সুস্মিতা। সুস্মিতাদি! সুস্মিতা মাসি।

বাচ্চু হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল, সাংঘাতিক ভালো ভালো মার্কস পেয়ে। সে যাদবপুরে ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু থাকে শ্রীরামপুরে, যেতে হবে যাদবপুর। হস্টেলেও আপাতত সিট পাওয়া যাচ্ছে না। কী হবে?

এই সময়ে সুস্মিতার এক জাঠতুতো বোন, তার ছেলেবেলার সখী, বলল, আমি থাকতে ভাবছিস কেন? হস্টেলে সিট পেলেও বাচ্চুর সেখানে থাকার প্রশ্ন উঠছে না। আমি থাকি ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস-এ। সেখান থেকে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কতদূর? আমি থাকতে আমার বোনের ছেলে যাবে হস্টেলে?'

বাচ্চুকে অগত্যা রাজি হতে হল। তার মাসিরা বিশাল ধনী। তাদের প্রাসাদোপম বাড়ি। মাসি মেসো, বিশেষ করে মেসো, বেশিরভাগই ব্যাবসা উপলক্ষ্যে লন্ডনে থাকেন। মাসির দুই ছেলে-মেয়ে বিরাট বাড়িতে একা। দুজনেই লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভালো। বাচ্চুর আলাদা ঘর, সঙ্গে ডবু সি। মাইক্রোওয়েভ আভেনে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না হয়ে যায়। সকালে, বিকেলে, দুপুরে, রাতে মাসির লোকজন বিশেষভাবে দেখাশোনা করে বাচ্চুকে। সকালে যে জামাকাপড় ছেড়ে সে কলেজে যায়, ফিরে সে সেগুলো খুঁজে পায় না। বেশি খুঁজতে থাকলে মাসির লোক এসে বলে, 'কাচা, আয়রন করা সব ক্যাবিনেটে সাজানো আছে।' মাসি বলে, 'যা ছাড়বি সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনে চলে যাবে। ভাবিস কেন? তিনটে ওয়াশিং মেশিন কাজ করছে। ছাড়া জিনিস ভদ্রলোক পরে আর?'

সকালে ব্রেকফাস্ট এনে দেয় বেয়ারা। এত ব্রেকফাস্ট যে দুপুরে খাওয়ার জন্যে পেটে জায়গা থাকে না। এ বাড়িতে কেউ সেভাবে লাঞ্চ বোধহয় খায়ও না। শেষ দুপুরের দিকে খিদে পায়, তখন বাচ্চু কলেজ-ক্যানটিনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে কিছু খেয়ে নেয়।

সন্ধেবেলায় তাড়াতাড়ি খাওয়া। টেবিলে এসে বসে বাচ্চু। মাসির মেয়ে তনিকা, সে বাচ্চুর সমবয়সি, এসে একটা দুটো জিনিস হাতে তুলে নেয়, কামড় দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। বাচ্চু ডাক দিয়ে বলে, 'তনি, বসে খাও না। গল্প করব।' তার এখন আড্ডার মেজাজ। এই সময়েই তার মায়ের সঙ্গে গল্প জমত।

'সময় কোথায়?' তনিকা হেসে চলে যায়। তার নিজের ঘরে ক্যাসেট চালিয়ে এসেছে। কিংবা ভিডিয়ো। সে ঘরে ঢুকে প্রথমে পর্দাটা টেনে দেয়। তারপর দরজাটা বন্ধই করে দেয়।

ছেলেটি বাচ্চুর থেকে ছোটো। সে খেতে খেতে বই পড়ে। বাচ্চু জিজ্ঞেস করে, 'কী পড়ছ?'

মলাট উলটে দেখায় রোহণ, কাফকা। প্রুস্ত।

বাচ্চু এসব লেখকের নামও শোনেনি। কিন্তু সে খুব কৌতূহলী, সাহিত্য-বিষয়েও। সে বলল, 'আমাকে পড়তে দিও। আলোচনা করব।'

'কী দরকার।' ফিরে হেসে রোহণ বলে।

বেশিরভাগ দিনই সন্ধেবেলায় রোহণ বেরিয়ে যায় গাড়িতে। তনিকা ট্রামে-বাসে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে হাসে—উত্তর দেয় না। বাচ্চুর জন্যও সকালে-বিকালে গাড়ি প্রস্তুত থাকে। মাসি বলে, 'খবর্দার, তনির মতো ট্রামে বাসে যাস না বাচ্চু! কত জার্ম, কত নোংরা, তনিটা পাগলি!' মাসি নিজেও সন্ধেবেলায় বাড়ি থাকে না। কিন্তু বাচ্চুর সন্ধেবেলাটাই বাড়ি থাকার সময়।

মাস তিনেকের মাথায় বাচ্চু ফিরে গেল। মাসি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি। দু-দিন তিনদিন পব ড্রাইভার বলল, 'বাচ্চুবাবু তো গাড়িতে কলেজ যায় না। গাড়ি তো গ্যারেজে তুলে দিই।' বেয়ারা তখন বলল, 'বাচ্চুবাবু তো ব্রেকফাস্ট খায় না, ট্রে নিয়ে ফিরে আসি।' মাসি তখন ঘরে ঢুকে দেখল নিভাঁজ শয্যা পড়ে আছে, ওয়ার্ডরোবের কপাট খুলে দেখল বাচ্চুর টি শার্ট, জিনস এসব ঝুলছে না, টেবিলের ওপর বাচ্চুর বইখাতা নেই। মাসি মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'তনি, বাচ্চু কোথায় গেল?'

বাচ্চু? হাউ ডু আই নো?

মাসি ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, 'রোহণ বাচ্চু কোথায়?'

বাচ্চুদাই জানে। আমি কারো পার্সন্যাল ব্যাপারে থাকিনে মা।

গাড়ি নিয়ে মাসি সোজা শ্রীরামপুরে চলে গেল। ভীষণ উৎকণ্ঠিত। পরের ছেলে। সুস্মিতা দরজা খুলে দিয়েই জড়োসড়ো হয়ে গেল।

কীরে সুস্মিতা, বাচ্চু এসেছে নাকি?

হ্যাঁ রে। এই তো তিনদিন আগে, বিষ্যুৎবার। কলেজ থেকে চলে এল সোজা। তোকে বলে আসেনি, না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মাসি বল, 'এল কেন? মায়ের জন্যে হঠাৎ মন কেমন করে উঠল, না কী?'

সুস্মিতা হেসে ফেলল, বলল, 'হবে হয়তো। তোকে বলে আসেনি, বোধহয় তুই আটকাবি বলে। কী পাজি দ্যাখ্! তা ছাড়া তোকে পায়ও নি বোধহয় হাতের কাছে।'

এসব কথা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে উড়িয়ে দিয়ে মাসি বলল, 'সুস্মিতা, ওর কীসের অসুবিধে? কোনো অনাদর করেছি। দ্যাখ, আমি নিজের হাতে না করলেও ওর সবকিছুর ওপর নজর রেখেছি...'

আরে দূর! তুই তো নজর রেখেছিসই। কমাসেই চেহারা পালটে দিয়েছিস।

তবে? ওর অভিমানটা কীসের? ও ফিরে এল কেন?

অভিমান-টান নয়। ও বড়ো খেয়ালি। কিছু মনে করিস না। নে, এখন চা খা তো! বাবা-মরা ছেলে, মাফ করে দিস ভাই।

তা যেন হল। কিন্তু ও ফিরে এল কেন?

জানি না, বলছি না খেয়ালি!

বাচ্চুর মাসি কোনোমতে চায়ে দুটো চুমুক দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। তার ভেতরটা আসলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। তার এমন আতিথ্য, এমন শৃঙ্খলা, হাতে-মুখে এমন সেবা, বাজারের শ্রেষ্ঠ খাবারদাবার। এর আগেও দু তিনটি ছেলেমেয়ে যে তার বাড়িতে থেকে মানুষ হয়নি, তা নয়। কেউ তো এভাবে ফিরে যায়নি! বাচ্চু কেন ফিরে এল? কোনো কিছুকে খুব গুরুত্ব দেবার অভ্যেস মাসির নেই। কিন্তু এ প্রশ্নটা তাকে ভাবাচ্ছে। বাচ্চু কেন...।

সুস্মিতা বোনকে বলতে বাধ্য হল, সে জানে না। কিন্তু আসলে সে জানে। অর্থাৎ জানে না, বোঝেনি সঠিক। কিন্তু বাচ্চু তাকে বলেছে সে কেন ফিরে এসেছে।

শীতের কুয়াশা-ভরা রাত আটটা নাগাদ তার বুড়ো কালো ব্যাগটা নিয়ে বাচ্চু ফিরে এল। কমাসেই তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। দরজা খুলে সুস্মিতা অবাক। আহ্লাদে আটখানা। তারপরই খেয়াল হল, শনি-রবি তো নয়! বিষ্যুৎবার! তা ছাড়া এই ব্যাগ নিয়েও সে আসে না। বাড়িতে তার একপ্রস্ত জামাকাপড় থাকে। অসুবিধে হয় না। সে বলল, 'কী রে, আজ এখন চলে এলি?—কাল কলেজ নেই?'

কেন থাকবে না?

যাবি না?

কেন যাব না?

তা হলে আজ এলি?

'আমি চলে এলাম', ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বাচ্চু বলল।

চলে এলাম মানে?

চলে এলাম মানে চলে এলাম। আর যাব না।

সে কী? কী হল? কী অসুবিধে...

কিচ্ছু না।

কেউ কিছু বলেছে?

না তো!

তা হলে? বাচ্চু, এক এক বাড়ির লাইফ-স্টাইল একেক রকম। তুই... মানে তোর কত অসুবিধে হবে বল তো? এখানে থেকে কলেজ করতে হলে?

বাচ্চু চুপচাপ নিজের ব্যাগের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখতে লাগল মন দিয়ে। তার মা তখনও দরজার কাছে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোছগাছ শেষ করে নিয়ে বাচ্চু হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। সে এগিয়ে এসে মায়ের কাঁধ দুটো ধরল। এখন সে মায়ের থেকে পুরো এক হাত লম্বা। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বলব। কিন্তু তুমি কী বুঝবে?'

বুঝি না বুঝি, বাচ্চু, তুই বল অন্তত। আমাকে তো কৈফিয়ত দিতে হবে!

কৈফিয়ত? আমার কথা থেকে বোধহয় তুমি কোনও কৈফিয়ত তৈরি করতে পারবে না!

তবু বল।

মা, একটা মানুষ বেঁচে আছে, অথচ বেঁচে নেই, এমন অবস্থা দেখেছ? মনে পড়ে?

সুস্মিতা শিউরে উঠল। তার চোখে এখন আর জল আসে না। শুধু একটু শুষ্ক দুঃখ আর ভয় বিকীর্ণ হতে থাকে। সেদিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে বাচ্চু বলল, 'এই ভয়ঙ্কর কোমা দেখে আমি জীবন শুরু করেছি মা। একটা মানুষ হাত-মুখ খিঁচোচ্ছে, তোমার দিকে চেয়ে আছে অথচ সে জানে না সে কী করছে। কোমা যখন একটা দুর্ঘটনার ফল হয় তখন কারও কিছু করার থাকে না। ব্যাপারটা সইতেই হয়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই যখন মানুষ কোমার ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, মলমূত্র ত্যাগ করছে, অথচ অচৈতন্য, হাত-পা খিঁচোচ্ছে ওই গোয়াবাগানের মতো, কিংবা সাড়া দিতে পারছে না ঠিকঠাক, ধরো ম্যান্ডেভিলের মতো, ক্লিনিক্যালি অ্যালাইভ, বাট ডেড.. ডেড ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পার্পাসেস... তখন আমি সেই ভয়াবহ কোমা সইতে পারি না। এর জন্য যদি পৃথিবীর দূরতম বিন্দু থেকেও আমাকে কলেজ যাতায়াত করতে হয়, আমি রাজি আছি।'

বাচ্চু তাই ফিরে এসেছে।

চারপর্ব

তিতুকে আমরা অনেক পরিকল্পনা করে, অনেক অঙ্ক কষে এনেছিলাম। বিবাহবার্ষিকীর পাঁচ বছর পরে। প্রথম বছরটা প্রোবেশন পিরিয়ড। আমার বরই বলেছিল কথাটা।—'বিয়েটা টিকবে কি না বুঝতে দাও!' আমার বুক কাঁপিয়ে বলেছিল আমার বর।

কী করে বুঝবে?

বাঃ, গুরুতর মতবিরোধ হচ্ছে কিনা, বাড়ির আর সবার সঙ্গে মানাতে পারছ কিনা...

মানতে না পারলে?

হাত উলটে ও বলল, 'কী আর করা, আলাদা সংসার ফাঁদতে হবে। আপনি আর কপনি।'

আর গুরুতর মতবিরোধ হলে?

একটু ভাবনার কথা হবে। লাঠালাঠির পর্যায়ে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকলে বা পরস্পরের কম্প্যানি তেতো বড়ির মতো লাগতে থাকলে, চটপট গাঁটছড়াটা খুলে...

থাক থাক, চুপ করো—আতঙ্কে শিউরে উঠি আমি।

ও হাসছিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ভাবটা আমার সেই দিনই উবে গিয়েছিল। কত কষ্ট করে, চোখের জল সামলে, মা-বাবাকে চোখের জলে নাকের জলে করে এই নিরাপত্তাটুকুর জন্যেই তো বিয়ে করা! নিজের ওপর যদি ভরসা থাকত সুজিতদার সঙ্গে ব্যাপারটাই তো চালিয়ে যেতে পারতাম। সুজিত সরকার আমার কলিগ। সব দিক থেকে আমার পছন্দ, আমার উপযুক্ত। চেহারায়, স্বভাবে, গুণে। দোষ শুধু একটাই। মানুষটি বিবাহিত।

যেদিন বাবা-মাকে বললাম 'বিয়ে করব, পাত্র দেখো'। দুজনেরই তো আনন্দে কাঁদবার অবস্থা। কোনোদিন মুখ ফুটে বলিনি, কিন্তু সুজিতের ব্যাপারটা ওঁরা জানতেন, কাঁটা হয়ে থাকতেন।

বলেছিলাম, 'যাকে-তাকে কিন্তু বিয়ে করব না। শতকরা শত ভাগ সলভেন্ট হওয়া চাই। আমি যদি চাকরি করি নিজের ইচ্ছেয় করব, প্রয়োজনে নয়। বাড়ি আধুনিক হবে। দেওর-ননদে আপত্তি নেই।'

আসলে আমি হইচই করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। সব সময়ে একটা হালকা বাতাস বইলে আকাশে মেঘ জমতে পায় না। এমনই আমার বিশ্বাস। বড়ো চাকুরে ইঞ্জিনিয়ার জোগাড় হল। মা-বাবা এবং একটি বোনের সংসার। বাবা এখনও চাকরিতে আছেন। বোন বি এসসি পড়ছে। আলাপ করে ভালো লেগেছিল। মা-বাবা সাধ্যাতীত দিয়েছিলেন। প্রোবেশনের কথায় আত্মারাম আমার খাঁচা ছাড়া। তখন থেকেই আমি তিতুর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলাম।

আমার বর কীরকম আড়ো আড়ো, ছাড়ো-ছাড়ো। কাজের কথা ছাড়া কথা নেই। মন বা হৃদয় যে ওর দেহের কোন্‌খানটায় থাকে আমি খুঁজে পাইনি। অথচ মানুষটা দেখতে ভালো, হাসে, হাসাতে পারে, মিশুক। সবই। তবু তবু কেমন যেন। সুজিত সরকারের আমার জন্যে সেই আর্তি! নাঃ, সুজিতই আমার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে হয়তো। হয়তো এমনিই হয়। দেখে-শুনে বিয়ে মানেই তো ম্যারেজ অব কনভিনিয়েন্স।

চার বছর আমরা উড়ে উড়ে বেড়ালাম। হংকং, জাপান, মরিশাস, ব্যাঙ্কক, ম্যানিলা...।

বাচ্চাকাচ্চা থাকলে কী আর ওর সঙ্গে এভাবে স্বল্প নোটিসে ঘোরাঘুরি করতে পারতাম।

কিন্তু পঞ্চম বছরে আমি একেবারে মরিয়া হয়ে গেলাম। এবং দেখা গেল চিকিৎসা ছাড়া তিতু আসার বাধা আছে। তো চিকিৎসা করানো গেল। এবং তিতু এল। আমার কোল আলো করে। মন ভালো করে। কেউ জানে না আমি জানি তিতু, তিতুই এখন আমার সব। আমার মনের ভাব আমি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি না। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে তিতুকে নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকি।

আমার মা আলো-আলো মুখে বলেন, 'কী রে, এবার সুখী হয়েছিস তো?'

আমি মাকে জড়িয়ে ধরি, 'তুমি এরকম সুখী হয়েছিলে মা? আমাকে পেয়ে? টুলুকে পেয়ে?'

মা কিছু বলেন না, শুধু আমার পিঠের ওপর মার হাতের উষ্ণ চাপটা অনুভব করি। আর তখনই বুঝি—মা আর তার সন্তান, এই-ই সব। আর যা কিছু শুধু আয়োজন। শুধু ভূমিকা। শুধু নান্দীমুখ। আমার নিজের নতুন উপলব্ধি নিয়ে পৃথিবীর দিকে, সংসারের দিকে তাকাই। গোপন অনুভবের তাড়সে হাসি। উষ্ণ, প্রসন্ন, সব বোঝার, সব মানার হাসি। হয়তো শ্বশুর-শাশুড়িরা দুজনে গল্প করছেন। রাস্তায় সন্ধে, ধূসর তারারা আকাশে, আমি তিতুকে খাওয়াচ্ছি। শরীরের মধ্যে থেকে একটা গভীর তরল আনন্দের স্রোত উঠে আসছে। শ্বশুর-শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি, যতই বল আর যতই কর, তোমাদের প্রাসঙ্গিকতা একজোড়া ভূতপূর্ব জনক-জননীর, যারা নাকি আরও একজনকে জনক হওয়ার জন্যে পৃথিবীতে এনেছিল।

আমার বর অফিস থেকে ফিরে কফি খায়, আরামে চোখ বুজে বলে, আরও একটু ওপরে উঠলাম।

আমি ভাবি—তোমার ভূমিকা অর্ধেকের ওপর পালন করা হয়ে গেছে মহাশয়, এখন তুমি অবান্তর। তবে হ্যাঁ। তোমার উপার্জিত অতিরিক্ত টাকাটা, হয়তো অবস্থানটাও তিতুর কাজে লাগবে।

ননদ বলে, 'ওঃ বউদি, কী সর্বক্ষণ বাচ্চা নিয়ে লটপট করো বলো তো! চলো একটা ছবি দেখে আসি। ওকে মার কাছে রেখে চলো।'

আমি রাজি না হতে ও বিরক্ত হয়ে বন্ধুকে ফোন করতে চলে যায়। আমি বলি, আর কদিন? তৈরি হচ্ছ, তোমার জমিও তৈরি হচ্ছে। কত নাচনকোঁদন এখন, ভাবছ তুমি একটা তুমি। ভীষণ আলাদা। ভীষণ একটা ভিন্নতা তোমার। অহম্। জানো না, তুমি তিতুর জন্য পূর্ব হইতেই বলিপ্রদত্ত। বলি কথাটা শুনতে খারাপ লাগে। কিন্তু বলি মানে কি? ভাগ। তুমি তিতুর ভাগে। তোমার জন্ম একজন তিতুর জন্যে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই তিতুদের আনবার খেলা অনন্তকাল ধরে হয়ে চলেছে। তুমি নিমিত্তমাত্র। কিন্তু নিমিত্ত, শুধু নিমিত্ত হওয়ারও কী স্বস্তি! কী আনন্দ।

তিতু হামা দিচ্ছে, বাঘের মতো, বাঘের বাচ্চার মতো। কিছুটা গিয়ে তিতু থুপ করে বসল। কোমর মুচড়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছে আমার দিকে। হাসছে। চোখ দুটো? চোখ দুটো কী? আকাশ? সমুদ্র? না। না। আকাশ সমুদ্রের মধ্যে কেমন একটা রহস্যময় গভীরতা আছে। শিশুর চোখে সেসব থাকে না। শিশুর চোখ ভাবায় না। শুধু ভেতরটা গলিয়ে দেয়। শিশুর চোখ বিশুদ্ধ আনন্দ। তিতুর এই ভঙ্গি ও এই হাসি এই চাউনির দিকে তাকিয়ে আমার সুজিত-সংক্রান্ত ব্যথার কথা মনে পড়ে হাসি পেয়ে যায়। খুব অবান্তর লাগে তিতুর বাবার যত ভয় পাওয়ানো কথাবার্তাও।

তিতুর বাবা বলে, কী ব্যাপার? আজকাল তো তুমি আর নালিশ করো না?

কীসের নালিশ?

বাঃ, ওই যে তুমি বলতে আমার নাকি হৃদয় নেই, মন নেই, মনের খবর তো কই আর নিতে দেখি না।

'তোমার মনের খবর তুমিই রাখো বাবা, আমার কাজ নেই'—আমি হেসে উড়িয়ে দিই।

সে কী? আচ্ছা ধরো, মনটা যদি আর কাউকে দিয়ে ফেলি?

তিতুকে কোলে নিয়েছিলাম। সে দু হাত বাড়িয়ে বাবার কাছে যায়। আর কাউকে মন দেওয়ার কথা জনক বেমালুম ভুলে যায়। কী খেলা! কী খেলা! হাম দিতে গিয়ে তিতু বাবার গাল কামড়ে ধরছে। দাঁত উঠবে, মাড়ি সুড়সুড় করছে বোধ হয়। বাবা হেসে অস্থির।

এই আমার কাতুকুতু লাগছে। কাতুকুতু দিচ্ছিস কেন?

যত অবোধ হাসি ছেলের। তত হাসি বাবার। অর্থাৎ কি না যে মন ছিল না, ফোকলা ছিল মনের জায়গাটা, সেখানে কচি একটা মন গজিয়েছে, মনটা অন্য আর কাকে দেবে? বাবা তিতু সোনাকেই দিয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও তিতুর বাবা বলে, 'আমাকে হয়তো বছর দুয়েকের জন্যে বাইরে পাঠাবে। তুমি, তোমরা যেতে পারবে তো?'

তিন বছরে তিতুকে স্কুলে ভরতি করতে হবে, তার আগে হলে পারব, নইলে...

হুঁ, ওর বাবা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আমি হাসি। যাও এবার কোথায় যাবে!

শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আমার খুব জমে। মানুষটা দার্শনিক প্রকৃতির। একটু শুদ্ধ করে কথা বলবার বাতিক আছে। সেটা ওঁর ছেলেমেয়ের কাছে হাসির জিনিস। স্ত্রীর কাছে বিরক্তিকর। আমার খারাপ লাগে না। সব সময়ে তো বলছেন না। মেজাজ এলে বলছেন।

উনি বলেন, 'আচ্ছা বউমা, এই যে তিতু আসাতে সংসারের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, এটা টের পাও?'

আমি কিছু বলি না, হাসি খালি।

উনি নিজের বলার আনন্দেই বলেন, 'তোমরা ধরো, আর আগের মতো নেই। খুব গৃহকেন্দ্রিক হয়ে গেছ। বা তিতুকেন্দ্রিক হয়ে গেছ। সে কী বাচ্চাটার তোমাদের প্রয়োজন বলে? কক্ষনো না। আসলে শিশুর মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরই নতুন করে পাই। রিনিউ করি। নিজেদের প্রতিচ্ছবি, নিজেদের পুনরাবৃত্তি, নিজেদের চিরায়ণ এটাই গোপন সত্য।'—উনি তো আমার মতামত চান না। নিজের কথা, নিজের উপলব্ধির কথাই বলে চলেন। আমার মত যদি চাইতেন তো বলতাম—প্রতিচ্ছবি, পুনরাবৃত্তি ওসব বাজে কথা। এই যে তিতুটা হয়েছে, ও কি আমার মতো? ওর বাবার মতো? কোনোখানটাও নয়। ওর মধ্যে মাঝে মাঝে আমার ভাই টুলুর আদল দেখতে পাই, মাঝে মাঝে আমার শাশুড়ির আদল দেখতে পাই। শ্বশুরমশাই বলেন তিতু নাকি ওঁর বড়ো ছেলে, তিন বছর বয়সে যে মারা যায় তার মতো দেখতে। তা সেই তিন বছরের পুঁচকে ভাসুরের আমার কোনো ছবিই নেই। তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর আগে মৃত একটি শিশুর মুখ কী ওঁদের সতিাই মনে আছে? আসল কথা, তিতু তিতুর মতো। সব শিশুর যা যা সাধারণ লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণগুলো মিলিয়ে তাকে অন্য কোনো শিশুর মতো লাগতে পারে, কিন্তু ও নতুন। ও আলাদাও।

দুই

তিতান, তিতাই এখানে এসো।

ন্‌না। তুমি দুধ খাওয়াবে।

দুধ তো খেতেই হবে বাবা।

কেন?

ছোটোদের খেতে হয়।

দাদাই কি ছোটো? দাদাই তো খায়। দাদাইকে দাও।

দাদাই তো খেয়েছেন।

তাহলে দিদাই?

দিদাইও খেয়েছেন।

তবে পিয়া?

পিয়াও খেয়েছে?

তবে বাবাই?

বাবাই খাবে, রাত্তিরবেলা।

তুমি?

আমি খেতে ভালোবাসি না তিতু। হাঙ্গামা করো না।

আমিও ভালোবাসি না।

তুমি ছোটো। চকলেট দিয়ে দিচ্ছি খেয়ে নাও।

রবিও তো ছোটো, ওরও তো জামাপ্যান্ট ছোটো, ও দুধ খেতে ভালোবাসে। কী রে রবি, বাসিস না?...

রবি আমাদের ফরমাশের ছেলে। সে চুপ করে থাকে।

দাও, ওকে দাও, ও তো রোগা, আমি তো মোটা, আমার তো ভুঁড়ি আছে।... আমি রাগ করে রান্নাঘরের দিকে চলে যাই। তিতু ছুটে আসছে।

দিলে না? রবিকে দিলে না?

দিচ্ছি। তাহলে তুমি খাবে তো?

আর্ধেকটা মা, ও মা, আর্ধেকটা... নেই-আঁকড়া আবদারের সুর তিতুর গলায়। এক গ্লাস দুধ অতএব দুটো কাপে ভাগ করি, হাতল ছাড়া রবির কাপ, আর তিতুর ফুলকাটা মগ।

রবি খুব কাঁচুমাচু মুখে কাপটা নেয়। এবং সেই মুহূর্তে ওর কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে তিতু চোঁ করে দুধটা মেরে দেয়।

আমি হতভম্ব। রবির মুখ যেন অনেক টাকা চুরি করে ধরা পড়েছে।

তোমাকে তোমার কাপে দিয়েছিলাম। তুমি কেন ওরটা খেলে?

আমার কাপটায় রোজ খাই। রবির কাপটায় আজ খেতে ইচ্ছে হল।...

মস্ত বড়ো ফুটবল বগলে নিয়ে তিতু ছুট লাগায়, 'আয় রবি, রবি আয়।' রেগেমেগে বলি, 'রবি আবার কী? রবিদা বলতে পার না? তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো।'

'রবি তো চাকর। চা করে। চাকরকে আবার দাদা বলে না কি?' তিতু ছুটতে ছুটতেই বলে।

চাকর কথাটা আমাদের পরিবারে ব্যবহার হয় না, তিতু কোথা থেকে শিখল, আমি জানি না। চাকর বলে দাদা বলবে না। কিন্তু ছোটো বলে তাকে দুধ খাওয়াতে হবে। কী অদ্ভুত এলোমেলো বিচার!

তিতুর দিদা দুটো একরকমের মগ কিনে দিয়েছেন। একটা সাদা আর একটা হালকা সবুজ। রবি আর তিতুর সামনে রেখেছেন। 'বল, রবি কোনটা নিবি? তিতু কোনটা নিবি?'

তিতু রবির দিকে তাকায়। রবি চোরা চোখে চায় তিতুর দিকে। রবি বুদ্ধিমান ছেলে, বোঝে সাদাটাই ওর নেওয়া উচিত। ও সাদাটা তুলে নেয়। আমার শয়তান ছেলে অমনি ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে নেয়।

আমি রবিরটা নেব দিদা।

দিদা নিজের নৈরাশ্য চেপে বলেন, 'ঠিক আছে। যে যার পছন্দ করে নিলে। পরে কিন্তু পালটানো চলবে না। আমরা সবাই যে যার কাপে খাই। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কাপ দরকার। কেমন?'...

কাপপর্ব চুকল। কিন্তু রবি পর্ব চুকলে তো!

রবি রান্নাঘরের মেঝেয় বসে খায়। কী মজা! টেবিলে খেতে হয় না। তিতুও মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে খাবে। খাক, তাই খাক। রবিকে টেবিলে তোলার চেয়ে তিতুকে মেঝেতে নামানো ভালো। খালি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি রবির পাত থেকে কিছু তুলে না খায়। স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন শেখাই। রবিকে টুথপেস্ট ব্রাশ কিনে দিয়েছি। নতুন জামাকাপড়। দু-জোড়া জুতো। বাড়িতে রবি চটি পরে চ্যাটাং চ্যাটাং করে ঘুরবে কেউই সইতে পারবে না, সুতরাং তিতুই খালি পায়ে ঘোরে। শ্বশুরমশাই সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলেন, 'পায়ের সঙ্গে মেঝের মাটির কনট্যাক্ট ভালো বউমা, নার্ভের পক্ষে তো বিশেষ ভালো। দেখবে, প্রথম প্রথম সর্দি-কাশি হলেও পরে ইমিউনিটি গ্রো করবে।'

কিন্তু তিতু ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ক্রমশ। নিজের ঘর ছেড়ে সিঁড়ির তলায় রবির বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকবে। কী? না চায়ের দোকানের গল্প শুনবে। রবি কিছুদিন চায়ের দোকানে কাজ করেছিল। কারখানার গল্প শুনবে। কী না, রবি কিছুদিন পেলাস্টিকের কারখানায় কাজ করেছিল। ভিক্ষের গল্প শুনবে। রবি কিছুদিন নাকি ভিক্ষেও করেছিল।

একটা ন বছরের ছেলের কত ঘাটে জল খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাই ভাবি। ওর মা বাবা কী রোগে মারা যায়, রাস্তায় ঝুপড়িতে থাকত। সেই সময়ে ভিক্ষে করত, 'বাবু, আমার মা বাপ মরে গেছে, পঁচিশটা পয়সা দাও বাবু, মুড়ি খাব-ও-ও।'

একদিন তিতু সুর করে বলতে বলতে বলতে ঢুকল। চোখ আধবুজোনো, মুখটা জলে মাখামাখি।

কী করছ, তিতু? ছিঃ, বাবা বলল।

ভিক্ষে করছি তো? আমার বাবা মা মরে গেছে। ওলাউঠো হয়েছিল গো বাবু!

তি-তু!—জোরে চেঁচাই।

ও কি কাঁদছেও?—ওর বাবা জিজ্ঞেস করে।

জল লাগিয়েছি তো মুখে। বাবা মা মরে গেলে কাঁদতে হয়!...

তিতু জ্ঞান দিয়ে সরে পড়ে।

আমার স্বামী বলে—এসব কী?

রবি। রবির থেকে...

তাড়াও, তাড়াও, অবিলম্বে তাড়াও রবিকে।

যদি কিছু হয়?

কী আবার হবে, ও সব চরে খাওয়া ছেলে, গোটা পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা দিয়ে বিদায় করো।

আমি রবির কথা বলছি না। তিতু ওকে খুব ভালোবাসে। ওর যদি...

কিছু হবে না, মনকে শক্ত করো, বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

আমি তা সত্ত্বেও ইতস্তত করি। শিশু মন! কীভাবে যে কী আঘাত করে। কিন্তু রবি নিজেই একদিন চলে যায়। চলে যায় তিতুর অত্যাচারেই। রবিকে পড়তে হবে। ওর সঙ্গে। রবি একদম পড়তে ভালোবাসে না। পয়সার হিসেব করে চমৎকার। ছবি দেখতেও খুব ভালোবাসে। কিন্তু কিছু শেখাতে গেলে ওর মাথায় আর কিছু ঢোকে না। পড়াশোনার মতো বিচ্ছিরি কাজ তিতু একা করবে, রবি পার পেয়ে যাবে, এটা তিতুর পছন্দ নয়। এ ফ' অ্যালিগেটর, বি ফ' বেবুন, সি ফ' ক্যামেল, ডি ফ' ডগ। সে রবিকে পড়াতে থাকে। রবি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, বলে, 'যখন মা-বাবার

সঙ্গে থাকতুম, এইরকম কুমির দেখেছিলুম, সাতটা আটটা, মা বললে কাগচের। কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল।'

তিতু বলে, ভ্যাট, কুমির নয় অ্যালিগেটর।

না কুমির।

তিতু এক ছপটি মারে রবিকে। 'আবার ভুল বলছিস।' পড়াটা রবির কাছে একটু অতিরিক্ত হয়ে গেল। একদিন দোকানে জিলিপি কিনতে গিয়ে আর ফিরল না। নতুন জামাকাপড়, দু-জোড়া জুতো, নতুন ফিকে সবুজ মগ, দুধ, বই, খেলাধুলো সব ফেলে স্রেফ পড়ার ভয়ে রবি পালিয়ে গেল।

তিন

পারিবারিক অবস্থা ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠছে। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, কখন হয়ে গেল আমি বুঝতেই পারিনি। ঝড়ের আগে আকাশে তো লালরং দেখা দেবে? প্রকৃতি থমকাবে? কোনো সূচনাই যদি না থাকে তো মানুষ বুঝবে কী করে যে আবহাওয়াটা খারাপ হতে যাচ্ছে? কীভাবে সতর্কীকরণ করবে কূল উপকূল?... 'সমুদ্রগামী ধীবরদের সতর্ক করা যাইতেছে যে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা...' কিছুই বুঝিনি। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে দেখলাম একটা অপরিচিত বাড়িতে বাস করছি। দুজন অনতিবৃদ্ধবৃদ্ধা আমার সঙ্গে কথা বলেন না, বা বলেন, মেপে মেপে, কেটে কেটে। একটি তরুণী—বাড়িতে প্রায় তাকে দেখাই যায় না, রাতে শুতে আসে, একটি অনতিযুবক অফিস এবং নিজের ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দি থাকে। মুখ গম্ভীর, আর আমি একটি অনতিযুবতি, আমার আবহাওয়াও খুব ভালো না, আমি ঝেঁকে ঝেঁকে কথা বলি। যদি সামান্য হাঁ বা না বলি, তাতেও আমার ক্ষোভ, ক্রোধ ভরা থাকে।

বিয়ের পরে চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার স্বামী বারণ করেছিল। বলেছিল, 'ছাড়ছ ছাড়ো পরে ঠ্যালা বুঝবে। মেয়েরা যত ঘর-বসা হয় ততই প্রবলেম তৈরি করে...।' আমি কিছু না বলে শুধু হেসেছিলাম, আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। তা ছাড়া কর্মক্ষেত্রে যে সুজিত সরকার আছে সে কথা তো আমার স্বামী জানে না! তার আর দোষ কী! কিন্তু আমি একটা অন্ধ গলি থেকে বেরোতে চেয়েছি, চেয়েছি চূড়ান্ত পুরুষকারের সঙ্গে, কাজেই আমি বেসরকারি অফিসের চমৎকার চাকরিটা এককথায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।

এখন বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা থাকি বলেই আমার চোখে পড়ে যায় দাদুর এঁটো চা সসারে ঢেলে তিতু চুমুক দেয়। চোখে পড়ে হাজাঅলা হাতে দিদা তিতুকে ভাত মেখে দিচ্ছেন। এবং কী সর্বনাশের কথা তিতু ছাতে গিয়ে পাশের বাড়ির মজনুকে ইশারা করছে, তার লায়লা অর্থাৎ তিতুর পিয়া অর্থাৎ আমার ননদ মিতালি তাকে ছাতে ডাকছে। মিতালি আর পাশের বাড়ির ইন্দ্রনীলের প্রণয়-কাব্যে আমার পাঁচ বছরের তিতু মেঘদূত। আরও সর্বনাশের কথা আমার স্বামী আজকাল রোজ অফিস থেকে ফিরে মদ্যপান করছে। নেশা বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনে এধার সেধার পার্টিতে গিয়ে গ্লাস হাতে ঘোরাফেরা করাটাই তো কেতা। তা সেই গ্লাসের ভেতরের জিনিস কখন ভেতরে চলে যাচ্ছে, আরও যাচ্ছে...যেতে যেতে প্রয়োজন তৈরি হচ্ছে, পিপাসা তৈরি হচ্ছে, নেশাড়ু তা বুঝতে পারে না। আমার স্বামীও বুঝতে পারেনি। তা ছাড়া মদ্যপান নিয়ে তুলকালাম করা আজকাল একেবারেই অচল। একটু উচ্চঘেঁষে মধ্যবিত্ত বাড়িতেই সন্ধেবেলা গেলে মদ অফার করছে আজকাল। আমার স্বামী যে চোখের বাইরে অন্যত্র খেয়ে আউট হয়ে ফিরছে না, ঘরে বসে

অভিজাত ভঙ্গিতে খাচ্ছে, এবং ঈষৎ টং হয়ে থাকছে, ঈষৎ উত্তেজিত, খুশি-খুশি যেন কোনো টুর্নামেন্ট জিতেছে টেনিস কি ব্যাডমিন্টনে—এই-ই তো আমার অনেক সৌভাগ্য।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুর ফলে যা হচ্ছে তা হল বলতে পারছি না বলতে পারছি না করেও একদিন শ্বশুরমশাইকে বলে ফেলেছি, 'বাবা আপনি এঁটো চা-টা তিতুকে দিলেন?'

কী করে ভাবলে তুমি কথাটা বউমা, আমার কি সামান্যতম সেন্‌সও নেই?

চা-ই বা ওকে দেওয়া কেন?

ছেলেমানুষ বড়োদের জিনিস একটু-আধটু চাখতে চায়, থাক আর কখনও দোব না।

আর দিলেনও না, আমার সঙ্গে উনি আর স্বাভাবিকও হতে পারলেন না। কেমন একটা চাপা ক্ষোভ পুষে রাখলেন।

শাশুড়িকে হাজার কথাটা কিছুতেই বলতে পারলাম না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে মলম কিনে আনলাম। হাতে জল লাগানো বারণ। জল লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলতে হবে। দিনে রাতে তিনবার ওষুধ লাগিয়ে দিই। দেখতে পেলেই জলহাত মুছিয়ে দিই। কিন্তু জল ঘাঁটা বন্ধ করব কী করে? হাত সবসময়ে ভিজে, হাজা সেরে আসে আবার হয়। খোসা-ওঠা-ওঠা হাত। কী ঘেন্না যে করে! ফলে চাপা ক্ষোভটা আমার মধ্যে জমে থাকে। যখন তখন ঝেঁঝে কথা বলি। খাওয়ার সময় এলেই কাঁটা হয়ে থাকি।

তিতু নিজে নিজে খাও—

ন্‌না—দিদাই গরস পাকিয়ে দেবে...

আচ্ছা আমি দিচ্ছি।

তুমি যাও না বউমা। আমি দিচ্ছি।

আপনি গিয়ে বারান্দায় বসুন না, আমি তিতুকে খাইয়ে দিচ্ছি।

কী বললে? আমি সারাদিন বারান্দায় বসে থাকি?

উঃ তা কখন বললাম! বারান্দায় বসতেই তো বলছি।

ওই ঘুরিয়ে বলা হল।

চোখে আঁচল দিয়ে শাশুড়ি চলে গেলেন। আরও বেশি করে জল ঘাঁটতে লাগলেন। বউমা কাজের খোঁটা দিয়েছে কি না। শেষে আমি একদিন চিৎকার করে ফেললাম, 'উঃ, আমি ছেলেকে নিয়ে কোথাও চলে যাব। হাতময় যা করেছেন, সেই হাতে ওকে খাওয়াতে আপনার প্রবৃত্তি হয়?'

আহত পশুর মতো আমার দিকে চাইলেন শাশুড়ি। চোখ ছলছল করছে। মুখে অপার বিস্ময়। আস্তে আস্তে চলে গেলেন। আমার নিজেকে মারতে ইচ্ছে করল। ভালোভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়েও তো বলতে পারতাম! তবে বুঝিয়ে বললেও একই ফল হত, বিষয়টা এতোই স্পর্শকাতর।

মিতালিকে সোজাসুজি বললাম, 'হ্যাঁরে মিতা, তোর লজ্জা করে না পাঁচ বছরের বাচ্চাকে মাঝখানে রেখে প্রেম করছিস। ছি ছি। ওকে মিথ্যে বলতে শেখাচ্ছিস। ইশারা করতে শেখাচ্ছিস।'

মিতালি বেমালুম অস্বীকার করে গেল। বলল, 'বাবাঃ, তোমার ছেলে ওকে যা ভালোবাসে। কাকু কাকু করে অস্থির। আমি কিছুই শেখাইনি, ও নিজের বুদ্ধিতেই ওসব করে। যা পাকা।

আমি চোখ গরম করে বললাম, 'আর কোনোদিনও যেন ওর সামনে এসব না দেখি। পাকা! না? একটা বাচ্চা ছেলের পরকাল ঝরঝরে করছ আবার বলছ পাকা!'

'যাও যাও'। মিতালি বলল। 'তোমার মতো নীতিবাগীশদের ভেতরের কথা আমার জানা আছে। সুজিত সরকারের ছোটো বোন তো আমার সঙ্গে পড়ে!'

আমার বুক হিম হয়ে গেল। কিচ্ছু বলতে পারলাম না। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। পরে মনে

হল চুপ করে গেলাম কেন? কড়া করে আরও দু কথা শোনাতে পারা উচিত ছিল। সুজিতের সঙ্গে যা ছিল তা চুকিয়ে বুকিয়ে তোদের বাড়ি এসেছি। সে নিয়ে কথা শোনাবার কোনও অধিকার মিতালির নেই। কিন্তু কার্যত কিছুই করতে পারলাম না।

বাড়িতে দুটো টিভি সেট। শ্বশুর শাশুড়িরটা বেশিরভাগেই মিতালির দখলে থাকে। নন-স্টপ এম চ্যানেল খোলা থাকে। মিতালি কতটা দেখে জানি না, কিন্তু তিতু দেখে, তিতু নাচে। স্বাভাবিক প্রতিভা ওইটুকু ছেলের, চমৎকার নাচে। মিতালির বন্ধুরা এসে ফরমাশ করে তিতু নেচে দেখায়। আমারও যে একটু-আধটু গর্ব হয় না তা নয়। আরও হয় মিতালির ঘরে। অ্যাকশন ছবি। এ ওকে মেরে দশতলা থেকে একতলায় ফেলে দিল। ও এর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বেলে দিল। দেখে আমি শিউরে উঠি। কিন্তু তিতু হাততালি দেয়। হাসে, বলে, মা দিস ইজ ফান। আমাদের আর একটা টিভি সেট আমাদের ঘরে থাকে। তিতুর বাবা সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে চান টান করে টিভিটা চালিয়ে দেয়। হালকা করে। রঙিন ঘূর্ণি নাচ হতে থাকে। মাথায় ফেট্টি-বাঁধা খালি-গা হুমদো হুমদো ছেলেরা কাঁচুলি-পরা, ঝিলিমিলি মেয়েদের সারা শরীর চাটতে থাকে। মেয়েদের পেট নাইকুন্ডলী সুদ্ধ সাপের মতন দুলতে থাকে। মিলিত হবার নানান ভঙ্গি করে ওরা। তিতু চোখ সরাতে পারে না। ওর বাবার সামনে নীচু টেবিলে হোয়াইট হর্সের বোতল, লিমকা, মাছের কি মাংসের পকোড়া, আলগাভাবে টিভির ওপর চোখটা ফেলে রাখে সে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'দেখবার কি আর জিনিস পাও না? এই একই পেট, একই কোমর দোলানো, একই ঠ্যাং নাচানো রোজ দেখতে হবে?'

ঢুলু-ঢুলু চোখে চেয়ে তিতুর বাবা বলে, 'আরে বাবা দেখছি কি আর? মনটাকে অন্যমনস্ক রাখছি। ভাবতে হয় না, মাথাটা ফ্রি থাকে। সারা দিন যা যায়, জানো না তো আর?'

'তুমি একটা উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, তোমার মাথা ফ্রি রাখতে এই অখাদ্য জিনিস দরকার হয়? তিতু পড়তে বসবে চলো।'—আর কোনো ঘর আমাদের নেই। শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর, মিতালির ঘর, আমাদের ঘর, আর একটা বসবার ঘর। বসবার ঘরে লোক আসে, বারবার দরজা খুলতে হয় বলে ওখানে বসতে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু কী আর করব? ওখানেই বসি। তিতুকে পড়াই। মিতালির ঘরের দরজা, মিতালির দাদার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই।

দেখাও তিতু, আজকে কী হোম-টাস্ক আছে, এ কী! তোমার আঙুলে এমন কালশিটে পড়ল কী করে?

ক্লাসে বাংলা বলেছিলুম বলে আন্টি স্কেল দিয়ে মেরেছে।

চমৎকার! বাংলা বলেছিলেই বা কেন?

আমার যে দাঁত কনকন করছিল মা, আমি যে দাঁত কনকনের ইংলিশ জানি না, উস উস করছিলুম. আন্টি বকল, তাই তো আমি বললুম, 'আমার দাঁত কনকন কচ্ছে।'

আর উনি তোমাকে মারলেন? দাঁত কনকন করা সত্ত্বেও?

ডি-সুজা আন্টি হেভি খচ্চর মা!

তিতু, কী বলছ?

রাজু তো বলে...

রাজু বলুক, তুমি বলবে না, খারাপ কথা। রাজুকেও শিখিয়ে দেবে খারাপ কথা না বলতে।

মা, বাংলা বললে মারে কেন মা? বাংলা বলা খুব খারাপ? বাংলাটা খারাপ কথা মা, খচ্চরের মতো? তোমাদেরও আন্টি মারে! পেরেন্টস ডে-তে?...

আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমার, সত্যি বলছি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—হ্যাঁ হ্যাঁ তোদের ডি-সুজা অ্যান্টি হেভি খচ্চর, কুত্তি একটা, বেজন্মা কুত্তি।

কিন্তু এই নামজাদা প্রেপ-স্কুলে না পড়লে তিতু তো কোনও ভালো স্কুলে ভরতিই হতে পারবে না!

ডিং ডং ডিং ডং।

দরজার ফুটোয় চোখ রাখি। শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধু রাখালবাবু।

আসুন কাকাবাবু—বিনয়ের প্রতিমূর্তি আমি।

বা বা বেশ বেশ, নাতিবাবু, পড়ছেন?

আর পড়ব না। রাখালদাদু এসছে, ভূতের গল্প বলবে। —তিড়িং তিড়িং নাচতে থাকে তিতু।

আর সয় না আমার। সারাদিন ধরে চাপা রাগ পুষছি। এক থাপ্পড় মারি তিতুর গালে।—পড়বি না? ইয়ার্কি পেয়েছিস?

তিতু বিরাট চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

রাখালবাবু বলেন, 'এ হে বউমা মারলে ছেলেটাকে? তুমি পড়ো দাদা। আমি আছি, ভূতের গল্প ভাবতে থাকি, যাবার সময়ে তোমায় ঠিক বলে যাব।'

ভূতের গল্প রূপকথার গল্প এসব আমি পছন্দ করি না। অযথা ভয়ভীতি ঢোকে ছেলেদের মনে। আর রূপকথার গল্প মানেই তো যত গাঁজাখুরি। রাখালবাবুর আবার অভ্যাস আছে সব গল্পই 'দাদুভাইয়ের ঠিক রাজকন্যের মতো টুকটুকে বউ আসবে' দিয়ে শেষ করার। একটা পুঁচকে ছেলের মধ্যে বউ-টউ ঢুকিয়ে দেওয়া একেবারে কুরুচির একশেষ বলে আমার মনে হয়। তা ছাড়া বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কতকগুলো গল্পকথা ছোটো থেকে শুনে শুনেই আমাদের বাঙালি জাতটা এমন হাঁদা ক্যাবলা উটমুখো হয়েছে।

আমি অনুযোগের সুরে বলি, 'কাকাবাবু, ভূতের গল্পগুলো ওর মাথায় আর নাই ঢোকালেন। এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারে না রাত্তিরে।'

রাখালবাবু হা-হা করে হেসে বললেন, 'ওইটেই তো মজা বউমা, ভয়ের টিকে দেওয়া রইল ছোটোবেলায়।'

এবার কড়া গলায় বলি, 'না। ভূতের গল্প বলবেন না, বাজে ওসব। রূপকথার গল্পও বলবেন না। রাজা-রানি যত সব বুর্জোয়া ইম্যাজিনেশেন। রাবিশ।'

'রাবিশ?'—বোকার মতো হেসে রাখালবাবু ভেতরের ঘরের দিকে চলতে থাকলেন।

তিতু গোঁজ হয়ে গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও ওকে পড়াতে তো পারলামই না, খাওয়াতেও পারলাম না ভালো করে। দু-গাল খেয়েই ঘুমে ঢলে পড়ল।

চার

তিতুকে নিয়ে আমার ভাবনা এখন অনেকটাই কমে গেছে। তিতু প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠছে। অঙ্ক আর ইংরেজিতে নীলোৎপল ওকে মেরে দিচ্ছে। ভাইট্যাল দুটো সাবজেক্টই। কিন্তু বাকিগুলোতে তিতু অনেক মার্কস পায় বলে এগিয়ে থাকছে। নীলোৎপল যে কোনোদিন ওকে হারিয়ে দিতে পারে। ওর বাবার কাছে ভাবনা প্রকাশ করতে সে বলল, 'আমার পোলা অঙ্ক ইংরেজিতে খারাপ করবে? হতেই পারে না। আসলে, মন দিচ্ছে না। অঙ্কে কনসেনট্রেশন চাই। আর ইংরেজি? দেখো ওর আন্টিই কতটা জানে? নীলোৎপলের বাবাকে তো আমি চিনি। কেঁদে ককিয়ে পাস করত।

ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।' —আমরা তিতুকে উৎসাহিত করি। 'খাটো, আরেকটু খাটো, নীলোৎপলকে মেরে বেরিয়ে যাও। কিলার ইন্‌সটিংক নেই কেন তোর?'

যাই হোক, তিতুর নাচের প্রতিভা দেখে ওকে আমরা নাচেও দিয়েছি। অনেকের ধারণা ছেলেরা নাচ শেখে না। ছেলেরা নাচ না শিখলে উদয়শঙ্কর, বিরজু মহারাজ এঁরা হলেন কোত্থেকে—তাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। তিতু দারুণ কথক নাচছে। ওকে আমরা যথাসম্ভব এক্সপোজার দিচ্ছি। একটা ট্যালেন্ট সার্চ কমপিটিশন আছে শিগগিরই, নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্র্যাকটিস করাচ্ছি ছেলেকে। শ্বশুর, সাধারণত্‌ আমাদের কথায় থাকেন না, বললেন, 'ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত মর্কট বানাচ্ছ বউমা!'

কী বলব এঁদের। পুরাতাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন, কোনো ইসথেটিক সেন্সই নেই।

তিতু বলল, 'মা, হোয়াট ইজ মর্কট, ইজ ইট রিলেটেড টু মার্কেট?' একবার ভাবলুম মিথ্যে বলি। তারপর কেমন একটা পৈশাচিক আহ্লাদে বললুম, 'তোমার দাদু তোমাকে বাঁদর বলে গেলেন। মর্কট মানে বাঁদর।'

'সিলি ওল্ড ফুল।' —তিতু বলল।

বড়ো আনন্দ হল। বহুদিন ধরে চেপে রেখেছি এঁদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ, ক্রোধ, এঁরা আমার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করেন না, নিন্দেমন্দ করেন আত্মীয়স্বজনের কাছে, কিন্তু তিতু এঁদের যথেষ্ট ভালোবাসে। ভালোবাসুক। তাতে আমি বাদ সাধতে চাই না। কিন্তু বুঝুক ও-ও বুঝুক এঁরা অচল। বুঝুক—এঁরা ওর মাকে শুধু শুধুই অবজ্ঞা হেনস্থা করে চলেছেন।

মিতালির বিয়ে হয়ে গেছে। বেঁচেছি। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে নয়। ওর বিয়ে হল এক এন আর আই ডাক্তারের সঙ্গে। ওর বাবা-মা, এন আর আই-এর সঙ্গে দিতে চাননি। একমাত্র মেয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার হয়ে যাবে। কিন্তু মিতালি নিজেই জেদ ধরল। ইন্দ্রনীলকে এড়াতে চায় আর কি! এ পাত্রর সঙ্গে ইন্দ্রনীল তুলনায় আসে না। মিতালি গদগদ একেবারে। আমার কী? আমার কিছুতেই কিছু যায় আসে না—ইন্দ্রনীলই হোক আর চন্দ্রনীলই হোক। কিন্তু তিতু ওইটুকু ছেলে কী রকম মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলুম—পিয়া চলে যাবে তাই বোধহয় মন খারাপ। কিন্তু সে কথা বলতে ছেলে ঝটকা মেরে চলে গেল। তারপরেই দেখলুম ইন্দ্রনীলের সঙ্গে ঘুরছে। তখনই বুঝেছি। ইন্দ্রনীল আবার ওর কানে কী মন্ত্র দিচ্ছে কে জানে? আমার হয়েছে জ্বালা।

বউভাতে যাব বলে তৈরি হচ্ছি। তিতু বলল, 'যাব না।'

সে আবার কি? ড্রেস করো।

'শী ইজ আ চীট'—তিতু বলল, 'ইন্দ্রনীল শুড কিল হার।' আমি বললাম, 'কী বাজে বকছিস তিতু? পিয়া কাকে বিয়ে করেছে তাতে তোর কী? ওদের মধ্যে কী হয়েছে না হয়েছে তুই জানিস? এসব বড়োদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। জীবনে এ রকম কত হয়। সবচেয়ে যাতে ভালো হয়, সেটাই বেছে নিতে হয়।'

আমার দিকে কটকট করে তাকাল ছেলে। বারো বছরের ছেলে, কী পাকা! পরিপক্ক একেবারে! আজকালকার ছেলেমেয়েরা অন্য ধাতের হয়। হোক বারো বছরের, তার সঙ্গে যে জীবন ও আচরণ সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পেরেছি, এতে আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে আছে। খুব শিগগিরই ও বড়ো হয়ে যাবে। আমার, আমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। ভাবতে খুব আনন্দ লাগে। এখন থেকে ওর সঙ্গে একটু একটু করে সমানে সমান ব্যবহার করব। এতে ছেলেদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। দায়িত্ববোধ বাড়ে, জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা জন্মায়। নানারকম ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে দিয়ে হলেও ছেলেটা আমার মানুষ হতে চলেছে।

ওর যে কত কল্পনাশক্তি, কতটা স্বকীয়তা, স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, সেটা আরও একটা ব্যাপার থেকে বোঝা গেল। ওদের স্কুলের অ্যানুয়াল কনসার্ট হল। পেরেন্টস ডে-তে আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম। ঘোষণা করল, নতুন একটা দল এবার নেচে গেয়ে আসর মাতাবে, দল বা ব্যান্ডের নাম কী? না 'ভ্যাগাব্যান্ড'। একদফা হাসির হররা উঠল। তার পর সাইকেডেলিক আলো জ্বলতে নিভতে আরম্ভ করল। দেখলুম গানে ওদের ক্লাসের রচপাল সিং, পার্কাশনে জমির আলি, ক্যাসিও বাজাচ্ছে টুম্পা হাজারিকা, মাউথ অর্গ্যান নীলোৎপল আর নাচ তিতু ; আমার তিতু। জ্যাকসনের মুনওয়াকিং করছে দেখলুম আমার ছেলে। ব্রেক করছে কী, একদম প্রভুদেওর মতো। মাতিয়ে দিল। হাততালি পড়ছে তো পড়ছেই। পড়ছে তো পড়ছেই।

ওদের প্রিন্সিপ্যাল মি. মাথুর পুরো ব্যান্ডের জন্য একটা দেড় হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তিতুর জন্যে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা হল—কে অঞ্জলি দেওল দেবেন।

ওর বাবা বলল, 'দেখো, তোমার ছেলেকে তুমি স্কলার করতে চাইলে, আমি চাইলুম, ট্রেইনড ম্যানেজার হোক, ও হয়ে গেল শোম্যান। নেভার মাইন্ড। শোম্যানদেরই তো যুগ পড়েছে।'

আমি বললাম, 'আহা হতাশ হচ্ছ কেন? বারো বছর তো মোটে বয়স। স্কলার হবার সময়ও চলে যায়নি। এম.বি.এ. দিগগজ হবার সময়ও যায়নি।'

ছেলে আসতে হ্যান্ডশেক করল বাবা। চাপা গলায় ছেলে আমাকে বলল, 'এখানে যেন বাচ্চার মতো আমাকে ফন্ডল করো না।' আমি হাসতে লাগলাম।

বড়ো শান্ত, নিবিড়, সুখ-সমুদ্র ঘুম ঘুমোই আজকাল। ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে জীবনটা আরম্ভ হয়েছিল। ছা-পোষা বাবা-মা, ভাইটা মিডিয়োকার, আমি নিজেও তাই, কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে একটা ভালো চাকরি জুটেছিল। তা সেখানে গিয়ে একটা বিবাহিত পুরুষের ফাঁদে পড়লাম। অনেক করেও যখন পুরোনো সংসারকে সে গুডবাই জানাতে চাইল না, তখন চোখের সামনে অন্ধকার সমুদ্র দুলছিল। প্রাণপণে চোখ বুজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে ভুল করছি। এ লোক আমার নয়। কেটে তো গেল আঠারো বছর। শ্বশুরবাড়ির পরিজনদের সঙ্গে শীতল যুদ্ধও একসময়ে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমার স্বামী অফারও দিয়েছিল আলাদা সংসার করার। আমি শুনিনি। হেরে যাব কেন? জীবনে সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে বীরের মতো তার সমাধান করবার চেষ্টা করেছি। বুড়োবুড়ি যে আমাদের সঙ্গে আছেন, এতে সামাজিক দিকটা কি কম সহজ হয়ে গেছে? ওদিকে কোনো টেনশনও নেই। এক পিসশাশুড়ি তো একদিন বলেই ফেললেন, 'তোমার বউমা লক্ষ্মী বউমা বউদি। দু-যুগ তো কাটিয়ে দিলে তোমাদের সঙ্গে। আর আমার বউগুলো দেখো! একটা ছেলে পড়াবার নাম করে বালিগঞ্জে বাসা নিলে। একটা বিধবা মায়ের দোহাই দিয়ে বাপের বাড়িতেই বছরভর পড়ে থাকে। আর ছোটোটা তো একেবারে সাগরপার হয়ে গেল। যতই নিন্দে করো বউ তোমার ভালো।'

মনে মনে বলি—কম আত্মত্যাগ করিনি। চাকরি ছেড়েছি। উদ্দাম প্রণয় তা-ও ছেড়েছি। দিনগত পাপক্ষয়, আবেগহীন সংসার জীবন মেনে নিয়েছি। মানিয়ে নিয়েছি রক্ষণশীল শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে, উচ্ছৃঙ্খল, স্বার্থপর, রুচিহীন ননদিনির সঙ্গে। ছেলের জন্যে যা করেছি—তার হিসেব আমার মনে নেই। সে করা বড় আনন্দের করা।

ডিং ডং ডিং ডং... এই দুপুরে আবার কে এল? ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখি তিতুদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি। ভেতরে উনি বসে আছেন। ড্রাইভার এসে বেল বাজাচ্ছে। বুকটা ধক করে উঠেছে।

কী হল? তড়িতের কিছু হয়েছে?

প্রিন্সিপালের মুখ ভাবলেশহীন। বললেন, না, কিন্তু একটা দরকার আছে, আপনি চট করে রেডি হয়ে আসুন মিসেস সিনহা। সম্ভব হলে আপনার হাজব্যান্ডকেও তুলে নেব।'

ওকেও? কেন? কী হয়েছে? বিপদ? তড়িৎ?

তড়িৎপ্রভ ইজ অল রাইট মিসেস সিনহা। বাট দেয়ার হ্যাজ বিন আ ন্যাস্টি অ্যাকসিডেন্ট ইন দা স্কুল।

আমি আতঙ্কে বোবা হয়ে যাই। কী বলছেন এঁরা তিতুর কিছু হয়নি, অথচ নাস্টি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? তিতুর কিচ্ছু না হলে ওঁরা কেন আমায় নিতে এসেছেন? এতই জরুরি যে ওর বাবাকেও নিতে চাইছেন।

পুলিশ। স্কুল-কমপাউন্ড ঘিরে প্রচুর পুলিশ। আমরা দুজনে যাচ্ছি ভিড় ঠেলে। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। একজন ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টরই হবেন, আমি অত কাছ থেকে পুলিশ ইনসপেক্টর কখনও দেখিনি। বললেন, 'মিসেস সিনহা—আপনার ছেলের মধ্যে কোনও ক্রুয়েলটি লক্ষ করেছেন? এ স্ট্রীক অফ নিয়ার ম্যাডনেস?'

না তো! না!

ও গুমরে থাকত না? ভিনডিকটিভ নয়?

কী করে বলব? সেরকম কিছু কখনও দেখিনি। কেন, কী হয়েছে? বলবেন তো? কী আশ্চর্য, বলবেন তো কিছু।

প্রিন্সিপ্যাল ধীরে ধীরে বললেন, 'তড়িৎপ্রভ একটা হার্ড-পেন্সিল সরু করে কেটে লম্বা করে দাঁড় করিয়ে রাখে সীটের ওপরে। ফেভিকল দিয়ে আটকে। ঠিক নীলোৎপলের বসার জায়গায়। নীলোৎপল না দেখে বসতেই পেনসিল আমূল ঢুকে গেছে ওর রেকটামে। শকে মারা গেছে ক্লাসের সেকেন্ড বয়। সঙ্গে সঙ্গে।'

আতঙ্কে নীল হয়ে আমরা ওর বাবা-মা বলি, 'কী সর্বনেশে খেলা। ছি। ছি। ছেলেটা একেবারে মারা...'

ইনসপেক্টর বললেন, 'নো মিসেস সিনহা, ইটস নট জাস্ট এ প্র্যাঙ্ক! ইটস মার্ডার। প্রি-মেডিটেটেড। ক্লাসের ছেলেরা সাক্ষ্য দিয়েছে ফার্স্ট প্লেস নিয়ে-দুজনের মধ্যে বিটার রাইভ্যালরি ছিল। তা ছাড়াও টুম্পা হাজারিকা নামে একটি মেয়েকে নিয়ে দুজনে কিছুদিন ধরেই লড়ছিল।'

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রিন্সিপ্যাল মি. মাথুরের মুখটা ঝুলে পড়েছে।

আমার স্বামী হঠাৎ খ্যাপার মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'এই জন্য? এই জন্য আপনাদের স্কুলে কুড়ি হাজার টাকা ডোনেশন দিয়ে ছেলেকে ভরতি করেছি? এই শিক্ষা দিয়েছেন তাকে? এই শিক্ষা?'

ঝোলা মুখটা সামান্য তুলছেন প্রিন্সিপাল। থেমে থেমে বলছেন, 'ওই একই প্রশ্ন আমিও তো আপনাদের করতে পারি মি. সিনহা?'

রোমান্স

অবসরের জীবনে ধীরে-সুস্থে রয়ে বসে উপভোগ করার মতো জিনিসের অভাব আর যারই থাক, অতীশ ভট্টাচাযি্যর অন্তত নেই। শীতের ঘুম, তৃতীয় কাপ চা, হরেক রকমের বই, পত্র-পত্রিকা, মর্নিং ওয়াক... ইচ্ছে হলে থিয়েটার-সিনেমা, ইচ্ছে হলে বাড়ি বসে যৌবনকালের বাংলা গান কিংবা শুধু টিভির স্ক্রিনে আলগা করে চোখ ফেলে বসে থাকা, কিংবা পুরনো বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা জমানো।

পুরো যৌবনটা কেটেছে ছোটাছুটি করে। একটু বেশি করে বিছানায় গড়ানো সেটাও যেন একটা আলাদা উপভোগের স্বাদ বয়ে আনে। ধরো মাঘ মাসের ভোর ছ-টা। কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে। তা তেমন শীত হতভাগা কলকাতাতে আর পড়ে না। তবু ভোরের দিকটা ওরই মধ্যে একটু জমজমাট। জলযোগের 'পয়োধি' মার্কা হয়ে থাকে। তা এতদিন তো সে পয়োধি চাখবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। অফিসের আগের আবশ্যিক প্রাতঃকৃত্যগুলো তো 'ধর তক্তা মার পেরেক' জাতীয় ছিল। এখন অতীশ ঘাপটি মেরে থাকেন। মাথার অর্ধেকটা অবধি বালাপোশ চাপা দিয়ে জয়া উঠে পড়েছে টের পান। কেমন একটা অবৈধ প্রেমের রোমাঞ্চ নিয়ে বালাপোশের মধ্যে আরও ঘন হয়ে যেতে থাকেন তিনি।

জয়ার উঠে-পড়ার মধ্যে আগেকার সেই তড়াক ভাবটা আর নেই। একবার-দুবার এ-পাশ ও-পাশ করল, হাউমাউ করে গোটা পাঁচেক হাই তুলল, পটপট করে কটা আঙুল মটকাল, তারপর এক পা লেপের ভেতরে, এক পা লেপের বাইরে, ভেতরে... বাইরে, ভেতরে... বাইরে, তুমি কি কুমির-ডাঙা খেলছ? পিটপিট করে চোখ খুলে সোঁদা সোঁদা গলায় অতীশ প্রশ্নটা ছোড়েন।

'আমার দুঃখু তুমি আর কী বুঝবে?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন জয়া, 'অবসর তোমারই হয়েছে, আমার তো আর হয়নি! সমাজ-সংসার, আত্মীয়স্বজন, লোকজন। নিজের ছেলেমেয়ে পর্যন্ত স্বার্থপর। চোখ যতদিন না উলটোচ্ছি, কারও চোখ ফুটবে না। এক্ষুনি গিয়ে রামধনকে তুলতে হবে দুধ আনার জন্যে। কত করে বললুম বাড়িতে দিয়ে যাবে ব্যবস্থা করো। তা ক'টা পয়সার জন্যে... এখন ওই বুড়ো মানুষটা! কদিনই বা আছে? ওকে তুলে পাঠাও, মেয়ে তো নামেই আধুনিকা। আমি মা হয়ে অনুমতি দিচ্ছি তুই দুধ আনতে যা, মুদির দোকানে যা,. কিছু হবে না। না তাঁর মান যায়! মুদির সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করতে করতে সময় জ্ঞান থাকে না। কী না জনসংযোগ করছি, তৃণমূল স্তরে, এ দিকে আড়াইশো চিনি নিয়ে আয় তো রে বললেই শ্রেণিচৈতন্য বেরিয়ে পড়ে। —আচ্ছা, মা, তুমি একটা যুবতী মেয়েকে মুদির দোকানে পাঠাচ্ছ?'—বলতে বলতেই জয়া ঘর পেরিয়ে, দালান পেরিয়ে ওদিকে। কলঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ।

অতীশ আবার বালিশে মুখ গুঁজে জয়ার ফেলে-যাওয়া ভাষণের টুকরোটাকরা শব্দ চাখতে থাকেন। জয়ার আগে এত কথার বাঁধুনি ছিল না, এ বাঁধুনি ছিল জয়ার মায়ের কথাবার্তায়, তিনি চলে গেছেন, ভাষণগুলি মেয়ের কাছে ফেলে গেছেন। 'চোখ না উলটোলে চোখ ফুটবে না', 'ক-টা পয়সার জন্যে', 'মুদির সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প', কেমন লাগসই ছবির মতো শব্দগুলো! দু-তিন

বছর আগে হলে এমন ভোর পার-হওয়া দৌড়ন্ত সকালে বিছানা মুড়ি দিয়ে শব্দের ছবিটা উপভোগ করা যেত?

তবে অতীশের সবচেয়ে পছন্দের জিনিস হল পুরোনো বন্ধুদের আসা-যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে অতীতচারণ।

শীতের বেলাটা ধরো মরে মরে আসছে।

আশপাশের বাড়ির আলসেতে, ন্যাড়াবোঁচা গাছগুলোর গায়ে মরাটে আলো। একেবারে বাসি মড়ার রং। এই সময়টা যতই চায়ের সঙ্গে মুচমুচে মুড়ি-কড়াইশুঁটি রেখে যাক জয়া, মনটা কেমন খারাপ-খারাপ করে। মরা আলোর সঙ্গে কেমন একটা তাদাত্ম্য এসে যায়। আয়না দেখতে ইচ্ছে যায়, মাথার ফাঁকা অংশটাতে আঙুল চলে যায়। নিজের হাত পা ধড় মুণ্ডু সব যেন ধোপার বাড়ি যাওয়ার যোগ্য ময়লা পুরনো কাপড়ের মতো লাগতে থাকে। এই সময়ে, যেমন আজ, বেলটা যদি মধুর সুরে বাজে এবং দরজা খুলে বাসনমাজুনি ঝোল্লার মায়ের বদলে শোভন-শোভনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এক মুখ হাসি নিয়ে, তবে তার চেয়ে খুশির জিনিস আর কী হতে পারে?

বুকটা চিতিয়ে অতীশ বলে ওঠেন, 'যাক রে শোভন এবারের মতো বাঁচিয়ে দিলি. আরেকটু হলেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম।'

'তা, সেইরকম চেহারাই করেছেন বটে। মুখ যেন খ্যাংরা ঝাঁটা। খোক্কসের মতো নখ, ও জয়া তোর কর্তার বোধ হয় নেল পালিশ পরবার শখ হয়েছে রে!' —শোভনা চ্যাঁচাল।

জয়া সিঁড়ির মোড থেকে রেলিং বুকে চেপে ঝুঁকে পড়েন,

'আরে আসুন আসুন...'

'ঠিক বলছ তো? আসব? না চা দেবার ভয়ে নুকিয়ে পড়বে?'

শোভন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খান। কবে জয়া থিয়েটারের টিকিট কাটা থাকায় পাড়ার বান্ধবীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল বহুবার ক্ষমা চেয়ে, এবং দারুণ নাটকটা বাদ দিতে না পারার জন্য লজ্জিত হয়ে, শোভন আজও সে কথা তুলে খোঁটা দিতে ছাড়েন না।

জয়া বললেন—দেখুন অর্ধেকটা প্রকাশিত হয়ে রয়েছি। পুরোটা হলে না হয় আপনার বস্তা-পচা ঝগড়াটা শুরু করবেন। গ্যাসে অলরেডি জল বসিয়ে এসেছি।

সর্বনাশ! সেবার গৃহত্যাগ করেছিলে, এবার কি গৃহদাহ?

এরই মধ্যে নীচের কোনো একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে ঝিলিক হাত নেড়ে বলল, 'ওঃ বাবা মা কাকু, তোমাদের ভল্যুম একটু কমাও, নইলে ওপরে যাও, আমরা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি।'

'ভল্যুম তো বেশ কমিয়েছি রে', শোভন বললেন। 'সাড়ে পাঁচ কেজি কমেছে, ডাক্তার বলছে...'

'আহা বুঝতে পারছ না যেন। দেহের নয়, গলার। নবটা একটু ঘোরাও...' বলে ঝিলিক পরদা সরিয়ে আধো-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

দুই দম্পতি মেয়ের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে ওপরে উঠে গেলেন। জয়া বললেন, 'চলুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। আপনারা বসুন গিয়ে, আমি চা-টা নিয়ে আসছি।'

বারান্দায় ভালো করে গুছিয়ে বসে শোভন বললেন, 'ঝিলিকটা কী এমন রাজকার্য করছে রে? কোচিং ক্লাস খুলেছে নাকি? ঘরের আধা-অন্ধকারের মধ্যে জোড়া জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে বলে মনে হল, যেন বনের মধ্যে বনবেড়ালদের সভা বসেছে।'

'যা বলেছিস।'—অতীশ সায় দিলেন, ওয়াইল্ড একেবারে।

'বলেন কী? চেয়ার-টেবিল ভাঙে নাকি?'—শোভনা ঘাবড়ে গেছেন।

'ভাঙেনি এখনও, তবে ভাঙলেই হল, যা জোরে চাপড়ায়।'

জয়া একটা জাম্বো সাইজের ফ্লাস্ক্ নিয়ে ঢুকলেন। শোভনা গলা নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে জয়া, ড্রাগ-ফ্রাগ খায় না তো! বিশ্রি একটা গন্ধ পেলুম যেন!

জয়া বললেন, 'অতটা বোধ হয় না। ড্রাগ-নিবারণী সমিতি না কী একটা করেছে যে!'

'কী জানি!' 'শোভনা বলে উঠলেন, 'পুলিশেরও তো চুরি-ডাকাতি করার কথা না, মানছে কি? আসলে গাঁজার গন্ধটা একজনের দৌলতে আমার চেনা কিনা!'

'বিয়ে থা দে, বিয়ে-থা দে,'—শোভন দরাজ গলায় বলে উঠলেন। শোভনার গাঁজা প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই কি না কে জানে!

'বিয়ে কি আজকালকার ছেলেপুলেদের কেউ দেয় রে। বিয়ে আজকাল করে।'—অতীশের নিঃশ্বাস পড়ল।

শোভনা বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার মতো আগেকার ছেলেপুলেদের বিয়েই যেন কেউ ঘাড়ে ধরে দিয়েছিল। হেদুয়ার মোড়ে হা-পিত্যেশ, বসন্তকেবিনে আধখানা কবিরাজি কি কফি হাউজে সাড়ে তিন কাপ কফি নিয়ে টানা তিন চার ঘণ্টা, এলিটে 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্', রূপবাণীতে 'জংলী'... এ সব যেন আর আমরা জানি না।'

'জানো তো দেখছি অনেক কিছুই, কিন্তু ম্যাডাম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কি এত ডিটেল জানা যায়?'

অতীশের কথায় জয়া হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, 'খাপ খুলব না কি? শোভনা!'... সামান্য একটু লজ্জা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে শোভনা বললেন, 'সত্যি, দিনগুলো সব কোথায় গেল বলো তো! কী দিনই ছিল!'

'ইট ওয়াজ দা বেস্ট অব টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অব টাইমস, সবার জীবনেই এই প্যারাডক্সিক্যাল দিনগুলো আসে, তারে কয় জৈবন।'

'অতীশ বললেন, আমাদের এসেছিল, আমাদের পিতাদের এসেছিল, আমাদের পিতামহদের এসেছিল, এখন আমাগো পোলাপানদের আইস্যাছে।'

'তা সে যাই বল অতীশ, আমাদের যৌবনকাল যেন একটা বিশেষ রকম ছিল। ঠিক ওই স্বাদটা'... শোভনের গলায় রোমন্থনের আমেজ।

'জিভ বার কর, জিভ বার কর'—এমন করে অতীশ বললেন যে ঘাবড়ে গিয়ে শোভন সঙ্গে সঙ্গে হাঁ করে এক হাত জিভ বার করে ফেলেছেন।

বলি জিভটা কার?

এ আবার কী প্রশ্ন? এ জিভ আমার, আবার কার?

তবে? নিজের জিভে অন্যের জৈবনের স্বাদ পাবি কী করে?

কথাটা খানিকটা ঠিক অতীশ, কিন্তু তবু বলব দিনকাল পালটে গেছে ভাই। আমাদের সময়ের সেই সর্বাত্মক রোম্যান্স আর নেই। চিন্তা করে দ্যাখ, মণিকা আড্ডি আর শান্তনু চক্কোত্তি—কী জুটি রে? মণিকা চার ফুট দশ ইঞ্চি, শান্তনু ঝাড়া ছয় কী আরও বেশি। একটা চুমু খেতে গেলে পর্যন্ত হয় মণিকাকে মই লাগাতে হবে, নয় শান্তনুকে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। প্রেমে কোনো বাধা হয়েছিল? দুজনে কলেজস্ট্রিট দিয়ে গন্ডোলার মতো ভেসে চলেছে, শান্তনুর টাকা পয়সা মণিকার জিম্মায়, মণিকার নোট-পত্তর শান্তনুর ঝোলায়।

'তোমরা আর কী জানো? কতটুকুই বা জানো?'—শোভনা জয়ার দিকে চেয়ে হেসে বললেন,

'জয়শ্রী লাহিড়িকে মনে আছে তো? দারুণ মিষ্টি দেখতে! তোমরা সবাই তো তার জন্যে পাগল ছিলে।'

'কোনকালে? কোনকালে?'—অতীশ চ্যাঁচামেচি করে উঠলেন। শোভন বললেন, 'আরে বাবা বেথুন-বিউটি বলে কথা! একটু আধটু দোলা তো দেবেই। তার ওপর সাজ কী? সব সময়ে ফিলিম-স্টারের মতো সেজে আছে। গালে রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক।'

জয়া বললেন, 'মোটেই না। ওর চেহারাটাই ওই রকম। গালের চামড়া এত পাতলা আর মসৃণ যে লাল ব্লাড ভেসলগুলো দেখা যেত, তাতেই মনে হত কিছু মেখেছে।'

শোভনা বললেন, 'জয়া ঠিকই বলেছে। জয়শ্রীর চোখের পাতাই এত ঘন আর কালো ছিল যে মনে হত কাজল পরেছে, ঠোঁট এমনি এমনিই লাল। কীর্তি জানো ওর? হস্টেলে থাকত তো! একদিন গিয়ে দেখি কপালে হাত দিয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে বললে, ওহ্ ডগ-টায়ার্ড। ক্যান্ডিডেট ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। একই ফিল্‌ম উনিশবার দেখা হল। উনিশজনের সঙ্গে।'

কোথায় এখন জয়শ্রী?

এক বোকা ব্যারিস্টারকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করছে। আচ্ছা... তোদের অরিজিৎদার কথা মনে আছে? অরিজিৎ গোস্বামী!

শোভন বললেন, 'সেই রামস্বামী না কি মেয়েটা লেঙ্গি মারল বলে তো সুইসাইড করতে গিয়েছিল।'

রাইট। লাস্ট মোমেন্টে পেট ওয়শ করে বেঁচে যায়।

শুধু কি প্রেম? বাঁধনহারা, ছন্নছাড়া, ওয়াইল্ড, স্যাক্রিফাইসিং... আরও কত কী ছিল। জলসা ছিল, গড়পাড়ের, বাদুড়বাগানের, শ্রীকৃষ্ণ লেনের, বউবাজারের। বিসর্জনের বাজনা বাজতে না বাজতেই শুরু হয়ে যেত। অতীশ বললেন, 'জলসাগুলো ছিল রোমান্সের আবহসংগীত। মেজাজ তৈরি করে দিত। আহা! ঠিক রাতদুপুর, আসর সরগরম, কানাতের ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে! সতীনাথ সেই হাওয়ায় বিরহ ঢেলে দিয়ে গেলেন।

শুধু বিরহ? অভিমান, আর্তি, আকুতি। তারপর শেষরাতে সেই বিরহের ঘুড়ি কেটে দিলেন দ্বিজেন মুখার্জি তাঁর ব্যারিটোন গলায়—শ্যামলবরণী তুমি কন্যা, ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না... আহা হা ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না রে ভাই, জ্ঞান থাকে না।

এই সময়ে ঝিলিক হাতে একটা বড়ো প্যাকেট নিয়ে এসে বলল, 'কাকু, কাকিমা, তোমরা মোমো খাবে? গরম গরম আছে।'

'হঠাৎ? কোত্থেকে এল?' অতীশ জিজ্ঞেস করলেন।

মুখ টিপে মুচকি মতো হেসে ঝিলিক বলল, 'বনবেড়ালরা এনেছে। এই নাও চায়ের সঙ্গে স্মৃতির সস মাখিয়ে খেয়ে ফ্যালো।' ওড়না দুলিয়ে চলে গেল ঝিলিক। চোখদুটো ভ্যালভেলে করে শোভন বললেন, 'আমাদের বাল্যকালে ছিল কড়াইয়ের চপ, পকৌড়ি, দ্বারিকের শিঙাড়া। দেখতে দেখতে চপ হয়ে গেল'... অতীশ তাড়াতাড়ি বললেন, 'ফ্লপ।'

শোভনা বললেন, 'পকৌড়ি আর বলে না, বলে পাকোড়া।'

জয়া বললেন, 'শিঙাড়াও বলে না, বলে সামোসা। এসে গেছে রোল, মোমো'...

মোমোয় কামড় দিয়ে শোভন বললেন, 'স্মৃতির সস মাখিয়ে খাওয়াই বটে। ঝিলিকটা বলেছে ভাল। আচ্ছা অতীশ, তখন বনবেড়াল বললুম ও শুনতে পেল কী করে বল তো?'

জয়া বললেন, 'ওর মাথার পিছনে দুটো চোখ আছে। রোটেটিং কান। কিছু চোখ কান এড়ায় না।'

তা ঘরের মধ্যে ওগুলো বনবেড়াল, না মন বেড়াল?

অতীশ হো হো করে হেসে উঠলেন, 'বলেছিস ভালো। আমাদের যুগের জয়শ্রী লাহিড়ি যদি উনিশটাকে খেলাতে পারে তো এ যুগের ঝিলিক ভট্টাচার্যই বা কম যাবে কেন?'

না না ঠাট্টা নয়। আচ্ছা জয়া—ঝিলিকের বয়স কত হল? কিছু মনে না করলে বল তো শুনি!

মনে করার কী আছে? ঝিলিক তো আপনার রিন্টুর পরের বছরই হল। আটাশ পার হয়ে গেছে। এম এ হয়ে গেছে এক যুগ হতে চলল।

করছে কী?

কী করছে না তাই জিজ্ঞেস করুন। প্রথমে তো দিব্যি টুক করে কলেজে চাকরি পেয়ে গেল। করল বছর দুয়েক। তার পর একদিন খোঁজ পেলুম কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।

'খোঁজ পেলি মানে?' শোভনা অবাক হয়ে বললেন। 'তোদের সঙ্গে কী তোদের একমাত্র মেয়ের কোনো মানসিক যোগাযোগ নেই?'

আছে বললে আছে ভাই, নেই বললে নেই—জয়া বললেন।

বুঝলুম না—শোভনা হতাশ।

না বোঝার কী আছে?—অতীশ চেয়ার এগিয়ে বসেন, সকালবেলা চা করে দিচ্ছে, বিছানা গুছোচ্ছে, বালিশ রোদে দিচ্ছে, দেয়ালে ঝুল দেখলেই ঝাড়ছে, মাকড়সা দেখলেই মুচ্ছো যাচ্ছে, ওর মায়ের আর ওর শতখানেক প্রসাধনের সামগ্রী নিয়ম করে কিনে আনছে।

জয়া হাঁ হাঁ করে উঠলেন—শতখানেক প্রসাধনের আইটেম মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ?

আরে বাবা ক্রিমই তো খান পঞ্চাশেক। ঠোঁটের ক্রিম, চুলের ক্রিম, নাকের ক্রিম, কপালের ক্রিম, গালের ক্রিম...

শোভনা বন্ধুর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন, 'আহা, ঠোঁটের আর গালেরটা ঠিক আছে অতীশদা। বাকিগুলো আপনার উর্বর মস্তিষ্কের প্রোডাক্ট। কথা বলবার সুবিধের জন্যে মানে আলাপটা বেশ রঙ্গিলা করে তোলবার জন্যে ব্যবহার করছিলেন।'

তোমরা সাইড-ট্র্যাকে যাচ্ছ—শোভন বিরক্ত হয়ে বললেন, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল মা-বাবার সঙ্গে কন্যার মানসিক যোগাযোগ, সেটা...

'হ্যাঁ হ্যাঁ', অতীশ বললেন, 'ওই যা বলছিলুম, সবই করছে, বেরোনোর সময়ে বলেও যাচ্ছে, ইচ্ছে হলে ডেস্টিনেশন এবং ফেরবার সম্ভাব্য টাইমও। কিন্তু 'কোথায়' 'কখন' বললে কী হবে, 'কেন', 'কেমন' এসব বিষয়ে চুপ। ওগুলো নাকি ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'এই এক 'ব্যাক্তিগত' উঠেছে আজকাল', শোভনা ফোঁস করে উঠলেন, 'রিন্টুটাকে নিয়ে আমাদের কত জল্পনা-কল্পনা। ছেলে আমাদের বন্ধু হবে। বাপের বন্ধু, মায়ের বন্ধু। ছেলে তো বাপের ফাজলামি শুনতে শুনতে বড়ো হল। কিন্তু বন্ধু কই? এখন দেখছি সে গুড়ে বালি। 'ব্যক্তিগত'-তে এসে সব ঠেকে যাচ্ছে। 'ব্যক্তিগত'-টা আবার ঠিক কোন্‌খান থেকে আরম্ভ হচ্ছে বোঝা দায়।'

এই সময়ে ঝিলিক আবার এসে ঢুকল। ঝিলিক একটি অতি তন্বী পাঁচফুটি তরুণী। বয়সে যুবতি হলেও তাকে দেখলে আঠারো পার হয়েছে বলে মনে হয় না। রং মাজা। দেখতে সে ঠিক কেমন, সুন্দরী না বান্দরী সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অল্পবয়সের মহিমা তার সর্ব অবয়ব থেকে ঠিকরোচ্ছে। সে একটা ঝোল্লা কুর্তা পরেছে, যার ওপর কতকগুলো কার্টুন ফিগারের অ্যাপ্লিক সাঁটা। সালোয়ারটাও ঝোল্লা। ফলে ঝিলিককে আরও বেঁটে দেখাচ্ছে। কিন্তু তার চোখমুখ, হাঁটাচলা ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় সে এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ঝিলিকের মুখ তেলতেলে। প্রচুর

চুলেও বেশ তেল। মাঝখানে সিঁথি কেটে দু-দিক পেতে আঁচড়ানো। ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক হেসে বলল, 'বসতে পারি?'

শোভন-শোভনা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বসবি বইকি! এ তো আমাদের সৌভাগ্য।'

'কেন? সৌভাগ্য কেন?' —বলতে বলতে ঝিলিক বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'সদর দরজাটা ভালো করে টেনে দিয়ে যাস। এই পটাশ, পরের দিন রেকর্ডগুলো, মনে আছে তো?'

নীচ থেকে কতকগুলো উচ্চ আওয়াজ এল। চার পাঁচটি ছোটো বড়ো চুল ছেলে, চার পাঁচটা এলোমেলো চুল মেয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে চলে গেল।

ঝিলিক এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, কেন? সৌভাগ্য কেন?

'সৌভাগ্য মানে সৌভাগ্য কেন হবে? সৌভাগ্য বই কি!' শোভন-শোভনা আমতা আমতা করতে থাকেন।

ঝিলিক হেসে বলল, 'আসলে আমার কথা আলোচনা হচ্ছিল, খুব ঘাবড়ে গেছ আমি এসে বসতে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। ঠিক? না, না, মিথ্যে কথা একদম বলবে না, মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা কাকু, তোমরা এত পি এন পি সি করো কেন বল তো?'

জয়া রাগ করে বললেন, তুই তাহলে আমাদের পর? তোকে নিয়ে আলোচনা করলে পি এন পি সি?

দেখ মা, তা যদি বল প্রত্যেকটা মানুষই প্রত্যেকটা মানুষের পর। আমার পেট কামড়ালে তুমি বড়ো জোর ওষুধ দিতে পার। ডাক্তার ডাকতে পার, কিন্তু আমার ব্যথাটা তুমি ভোগ করতে পার কি?

অতীশ জোর গলায় বেশ ঘোষণা করার মতো করে বললেন, 'ঝিলিক, আমরা কিন্তু মোটেই তোমাকে নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করিনি, একদম শেষ দিকটায় তোমার সম্বন্ধে, মানে তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সামান্য কিছু আধা-সিরিয়াস আলোচনা হয়েছে। তাকে নিন্দা বা চর্চা কোনোটাই বলা চলে না।'

তা হলে কী আলোচনা হচ্ছিল এতক্ষণ?

'রোমান্স নেই,' শোভন ঘোষণা করলেন, 'প্রেমও নেই, আমাদের সময়ে ছিল, এখন নেই। এই।'

ঝিলিক হাসতে হাসতে বলল, 'খাবারদাবারগুলো এখন কেমন যেন লাগে, না কাকু? সে সবজিও নেই, সে মাছও নেই, সব ভ্যাসকা। সে রাঁধুনিও নেই। কাকিমা রাঁধে, ঢোঁক গিলে ভালো, কিন্তু কাকু তোমার মায়ের মতো শুক্তো করতে কি পারে? বড়ির টক? শাকের ঘণ্ট? বলো? জনান্তিকেই বলো না হয়, কিন্তু বলো! আচ্ছা বাবা, তুমি তো দিবারাত্র হা-হুতাশ করছ—নাই নাই সে-সব গান নাই বলে, তা তোমার বাবা মানে আমার দাদু গান বিষয়ে তোমাকে কিছু বলেননি? দাদু বা দিদা? বলেননি আহা জ্ঞান গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র দে... সব কী গানই গাইতেন, তোমাদের আধুনিক গান সতীনাথ মুখার্জি, শ্যামল মিত্র তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, একেবারে ছ্যা-ছ্যা। বলেননি?'

'কী বলতে চাস তুই?' —অতীশ রে-রে করে উঠলেন, 'আমরাই বুড়ো হয়ে গেছি? আমাদের স্বাদ পাবার ক্ষমতা চলে গেছে আর পৃথিবীর সবকিছুই ঠিক আগের মতো আছে, এই তো?'

'তুমিই বলছ বাবা কথাটা, আমি কিন্তু বলিনি'—ঝিলিক মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'গা জ্বালানো চিড়িক চিড়িক হাসিসনি আর'—জয়া এবার তাঁর কথার বাঁধুনি বার করে ফেলেন, 'আর সব ছেড়ে রোমান্সের কথাই ধর না। রোমান্স আর নেই, সেই সুদূর, সেই বিধুর',... ঝিলিক যোগ করল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ সেই তিয়াস সেই হতাশা, সেই বিষাদ সেই বিরাগ, সেই অনুরাগ সেই অভিমান, সেই সর্বস্বত্যাগ সেই আত্মঘাত ..'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সেই শরীরপাত সেই কুপোকাত—এভাবে বললে কমিক শোনাবেই কন্যে। কিন্তু কথাটা সত্যি। তোমাদের যুগে প্রেম নেই, সবই ক্যালকুলেশন। তোমাদের হচ্ছে 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, পোষালো তো পোষালো, নইলে কাটো'। চুটিয়ে ডেটিং করো, দায়িত্ব নেবার কথা বোলো না, কিছু বলতে হলে শেয়ারবাজারের কথা বলো ব্যাঙ্ক থেকে কত লোন পাওয়া যাবে, কত ইন্টারেস্ট, কতটা ফেরত দিলে কতটা মেরে দিলে চলবে, বাড়ি মর্গেজ, গাড়ি মর্গেজ, ইনস্টলমেন্টের ফার্নিচার, ভাগের মা ভাগের বাবা, ভাগের ছেলেপুলে...' আঙুল নেড়ে নেড়ে বলতে বলতে থেমে গেলেন শোভন।

'কী হল! গাড়ি স্কিড করে গেল কেন কাকু? আগে বাড়ো, ভালোই বলছ।'

অতীশ এইবার সুযোগটা নিয়ে নিলেন, বললেন, 'কথাটা ভালো করে বলার ব্যাপার নয় ঝিলিক। কথাটা হচ্ছে, তুই এখন কী করছিস, ভবিষ্যতেই বা কী করবি? কলেজের চাকরিটা ছাড়লি কেন? বিয়ে-থাই বা করবি কবে? এ সব তো 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখেছিস। আজ শোভনকাকুরা আসতে যদি তুমি চাবি খুললে তো কথাগুলো হয়েই যাক না! আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই'—ঝিলিক এবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার এক নম্বর কৈফিয়ত শুনে নাও বাবা-মা, কলেজের চাকরিতে আজকাল বড্ড বায়নাক্কা, কষ্ট করে এম এ পাস করলুম আটান্ন পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে, তো বললে স্লেট পরীক্ষা দাও, যদি পাস করলুম তো বললে ভাইভা দাও, তা যদি দিলুম তো বললে এম ফিল করতে হবে, পি এইচডি করতে হবে, না হলে কদিন পরে আর ইনক্রিমেন্ট হবে না। এখন স্টাডি লিভ পাবার জন্যে কলেজের টি আর-দের সঙ্গে কনস্ট্যান্ট যোগাযোগ রেখে যেতে হবে, তার ওপর দলাদলি, কে সিপিএম, কে ফরওয়ার্ড ব্লক, কে কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে আবার সিপিএম-এর গোপন আঁতাত। এ সব বুঝতেই তো আমার বছরখানেক ঘুরে গেল। একে আমার অত ঘাড় হেঁট করে পড়তে ভালোই লাগে না, তার ওপর অত তেল খরচা, অত ফিকবাজি, আমার পোষালো না, আমি বিদ্রোহ করলুম। ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে চালাতে পারতুম অনায়াসেই। কিন্তু সেটা ক্ষমতার অপচয় মনে হল, স্রেফ ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।'

'তা হলে তো তুই হার স্বীকার করে নিলি'—শোভন বললেন।

'আমার জীবনটা তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি কাকু। আমি, সবাই যা করে সেই হেঁ-হেঁ-টা করলুম না, সিস্টেমটাও আমার পছন্দ হল না, এটা বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ব্যাপারটা কিন্তু রোমান্টিক। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব যারা করে তাদের দ্বারা হয় না।'

সকলে একটু চুপচাপ। ঝিলিক বলল, 'আচ্ছা কাকু, কাকিমা, আমি একাই কি প্রবেলম চাইল্ড? রিন্টু? রিন্টুকে নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা নেই?'

'তুমি প্রবলেম চাইল্ড কে বলেছে?'—শোভনা জয়া একসঙ্গে বললেন।

শোভনা বললেন, 'কে বলে রিন্টুকে নিয়ে সমস্যা নেই!'

শোভন-শোভনা পরস্পরের দিকে তাকালেন।

'রিন্টু কি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে?' ঝিলিক জিজ্ঞেস করল।

বলিস কী? এই বাজারে ওই চাকরি ছাড়া? তুই মেয়ে বলে পেরেছিস।

কিন্তু ও তো ভীষণ আনহ্যাপি ওখানে, বুঝতে পার না?

সেটাই তো প্রবলেম, মুখটা ম্লান করে থাকে, খেতে শুতে দীর্ঘশ্বাস, রোগা হয়ে যাচ্ছে।

তোমরা ঠিক জানো, চাকরিটাই ওর একমাত্র প্রবলেম?

কেন? আর কোনো প্রবলেমের কথা তো আমরা জানি না।

ঠিকই বুঝেছিলুম, তোমরা ওর কোনো খবরই রাখো না।

'কী করে রাখব! তোমাদের চাবি-দেওয়া ব্যক্তিগত ড্রয়ার আছে না?' —শোভনা ঝংকার দিয়ে উঠলেন।

'তা আর কী প্রবলেম ওর?—শোভন জিজ্ঞেস করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলা, ক্ষুধামান্দ্য—এ সব কীসের লক্ষণ কাকিমা, তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কী বলে?

সে কী রে? ও কি প্রেমে পড়েছে? হুর রে, কী মজা! —শোভনা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠেন আর কি,—তা ভাগ্যবতীটি কে?

তাকেই ভাগ্যবতী হতে হবে কেন? কাকিমা, রিন্টুও তো ভাগ্যবান হতে পারে!

রিন্টু ভাগ্যবান হলে আমাদের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। মেয়েটি কে? যে রিন্টুকে ভাগ্যবান করেছে! আমরা চিনি?

—চেনো।

তুই না কি রে? —শোভনা রই রই করে উঠলেন।

ঝিলিক আবার সেই চিড়িক মারা হাসি হেসে বলল, 'আমি কি পাত্রী হিসেবে খুব ভালো কাকু? একে তো খেয়ালি, তার ওপর ভীষণ গোঁয়ার। রিন্টুর ছ-ফুটের পাশে আমার পাঁচ ফুটই কি খুব মানানসই হবে?'

শোভনা বললেন, 'তুই কি সেই জন্যে মত দিচ্ছিস না? দূর পাগলি। তুই আমাদের চেনাজানা, তোর বাবা-মা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে? আমাদের সময়েও ওরকম লম্বু গুড়গুড়ে জুটি ছিল। ওতে কিছু এসে যায় না।'

অতীশ এই সময়ে বললেন, শুধু একটা মই...

জয়া চোখ পাকিয়ে তাকাতে তিনি চুপ করে গেলেন।

শোভন-শোভনা বললেন, 'রাজি হয়ে যা ঝিলিক। আমরা খুব খুশি হব।'

ঝিলিক বলল, 'ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরো, মেয়েটা আমি নয়।'

'তুই নয়?' —হতাশ গলা শোভনার।

তবে তাকেও তোমরা দেখেছ।

'দেখেছি? কে? কে?' —শোভনা-জয়া একসঙ্গে হইহই করে উঠলেন।

পটাশ।

'পটাশ?' জয়া যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

শোভন বললেন, 'পটাশ না খটাশ? এ রকম আবার কারও নাম হয়? অ, তুই তখন ওপর থেকে বলছিলি বটে পটাশ রেকর্ড আনিস, না কী একটা!'

শোভনা বললেন, 'ওই থ্রি কোয়ার্টার সুতো ঝোলা প্যান্ট আর ফতুয়া পরা মেয়েটা? চোখে বোধহয় সতেরো পাওয়ারের চশমা, দাঁত উঁচু—ওকে আমি প্রথমটায় মেয়ে বলে বুঝতেই পারিনি। আমার রিন্টুর পাশে ওই পটাশ?'

প্রথমত কাকিমা, পটাশ নামটায় আপত্তি হলে ওর একটা পোশাকি নামও আছে। অনন্তযামিনী কৃষ্ণকামিনী সাবিত্রী কৌশল্যা আয়েঙ্গার। এখন উচ্চারণ করতে অসুবিধে বলে আমরা পটাশ

বলেই ডাকি। দ্বিতীয়ত কাকিমা, কে কার পাশে থাকবে সেটা তো আর আয়না ঠিক করে দেবে না। কনভেনশন্যাল, রক্ষণশীল বিয়ে রোম্যান্টিক মানুষেরা কখনোই করে না। মন যাকে চায় তাকেই...

শোভন গম্ভীরভাবে বললেন, 'তা রিন্টুর মন যাকে চেয়েছে ওই পটাশ না পটাশিয়াম সায়নাইডটি কে? কী?'

ও হল গিয়ে গ্লোব-ট্রটার। পর্যটক। ওকে নিয়েই তো এখন ডকুমেন্টারি করছি আমরা। সেই জন্যেই ওর রেকর্ডস আনতে বলছিলুম। সাইকেলে ভারত ভ্রমণ দিয়ে আরম্ভ করেছিল। এখন তো আলাস্কা অবধি চলে গেছে।

ভালো। খুব ভালো। পছন্দ-অপছন্দ তোমাদের খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা কিছু বলতে চাই না। তা রিন্টুর মন খারাপ করার কারণ কী? আমরা ওর পথের কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না। অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি, যা খুশি তাই করুক।

তোমরা অনুমতি দিলে কী হবে? পাত্রী স্বয়ং যে টালবাহানা করছে।

'মানে? পটাশের রিন্টুকে পছন্দ হচ্ছে না?' —জয়া আকাশ থেকে পড়লেন।

কেন?

অবভিয়াসলি পটাশ আরও রোম্যান্টিক বলে। ওর দাবি রিন্টু ওই সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিক। ওরা দুজনে সারা পৃথিবী পর্যটন করে বেড়াবে। ট্রেনে, সাইকেলে, ট্রাকের মাথায়, হিচ হাইক আর কি, যখন যেমন জোটে।

'অন্নবস্ত্র?' —শোভনা হাঁ করে রয়েছেন। শোভন কোনোমতে জিজ্ঞেস করলেন। 'এ সব ব্যাপারে আজকাল কিছু স্পনসর-টর পাওয়া যাচ্ছে কাকু। তবে পটাশ পরোয়া করে না। ওর থিওরি হল দুটো শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে যাদের গোটা হাত-পা আছে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হওয়ার কথা নয়। দরকার হলে মাল বইবে, দরকার হলে হোটেলে এঁটো বাসন ধোবে। মোট কথা'...

অতীশ-শোভন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'রিন্টু একটা ইকনমিকসের এম.এস.সি. আই এ. এস. অফিসার... সে মাল বইবে? এঁটো বাসন ধোবে?'

জয়া বললেন, পটাশের ইচ্ছে হয় সে বাসন ধুগে যাক। তাকে মানাবে এখন।

মজা পাওয়া গলায় ঝিলিক বলল, 'পটাশ কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মা, আর পটাশরা তিন পুরুষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে আছে। ওর বাবা ডক্টর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এখন এডুকেশনের ডিরেক্টর।'

চমৎকার, তা তাঁর মেয়ের এমন মতিগতি কেন? বাসনই যদি মাজবে তো বায়োকেমিস্ট্রি পড়ার দরকার কী ছিল?

পটাশ বলে, জীবনটাকে ঠিকমতো দেখতে শুনতে হলে, বুঝতে হলে, ল্যাবরেটরির বাইরে আসতে হবে। সমস্ত কাজ, সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

'ভালো, তা ঘর-টর বাঁধা, ছেলেমেয়ে মানুষ করা এ সব করবে কবে? বুড়ো হয়ে গেলে?' —শোভনার গলায় ঝাঁঝ।

কাকিমা সে-গুড়ে বালি, পটাশ বলে, পৃথিবীতে যথেষ্ট শিশু আসছে, তাদের আদর হচ্ছে না, তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে ওদের দুজনের আর শিশু আনবার প্রশ্নই উঠছে না। আর ঘর বাঁধা? পটাশ পথকেই ঘর বলে মনে করে। বুড়ো বয়সের নাকি প্রশ্নই নেই। ওর ধারণা এইভাবে পৃথিবী দেখতে-দেখতে ওরা যৌবনেই গত হবে, বৃদ্ধ আর হতে হবে না।

—'বাঃ,' হতভম্ব চার মা-বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

অতীশ বললেন, 'তা এই চিরপথিক চিরনবীন পটাশকেই আমাদের রিন্টু বিয়ে করবে ঠিক করেছে?' —অতীশের গলায় কি শ্লেষ?

ঝিলিক একটু চুপ করে রইল, তারপর মুখ তুলে আলতো করে বলল, 'সেখানেই তো আসল প্রবলেম।'

চারজনেই হাঁ করে আছেন।

ঝিলিক বলল, কাকু, পটাশ বিয়ে করতেও চাইছে না।

মানে?

বলছে বিয়ে-টিয়ে ও সব পুরনো সমাজের পুরোনো অভ্যেস। যতদিন পরস্পরের পরস্পরকে ভালো লাগে ততদিন একত্রে থাকলেই হল।

অর্থাৎ?

রিন্টুর ভালো না লাগলে রিন্টুর ফিরে আসার স্বাধীনতা আছে। পটাশের ভালো না লাগলে পটাশেরও। এই নিয়েই ওদের টানাটানি চলছে এখন। রিন্টু ডিসিশন নিতে পারছে না। বেচারির অবস্থা খুব খারাপ কাকু। পটাশকে ছাড়া ওর জীবন অন্ধকার, পটাশেরও তাই... এ দিকে...

এই সময়ে ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। অতীশ ধরবার জন্যে উঠছিলেন, ঝিলিক তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, বলল, আমার একটা এস টি ডি আসার কথা আছে বাবা, আমি ধরছি।

ওঁরা চারজন বারান্দায় বসেছিলেন পরস্পরের দিকে মুখ করে, বারান্দার কোলে ঘর, ঘরটা ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছে, ঝিলিকের বিস্কুট রঙের পোশাক ঘরের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ওর খোলা চুলের ঢাল দেখা যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নাকের ডগা। সবাই প্রায় একসঙ্গে ঘরের দিকে মুখ ফেরালেন, কেননা—মাউথপিসের মধ্যে ঝিলিক বলছে—আরেকটু চেঁচিয়ে বল রিন্টু, ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না, কেমন একটা ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হচ্ছে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে... ডিসিশন নিয়েছিস। বাঃ, চমৎকার, হ্যাঁ ডিসিশনটাই আসল, তোর চোদ্দো আনা বুদ্ধিবৃত্তি-ম্যাচুওরিটি-জীবনবোধ ওই ডিসিশনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাবে। কী বললি? গুড। ভেরি গুড, আই কনগ্রাচুলেট ইউ, ঘটনাচক্রে কাকু-কাকিমা আজ এখানে। তুই ওদের বল, নিজেই বল... হ্যাঁ ন্যাচার‍্যালি খুশি হবেন।

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে ঝিলিক এদিকে চেয়ে বলল, কে আসবে? কাকু না কাকিমা,. রিন্টু মালদা থেকে ফোন করছে, ডিসিশন নিয়েছে...

জড়বৎ বসে থাকেন শোভন-শোভনা। কী ডিসিশন রিন্টুর, যাতে ঝিলিক তাকে কনগ্র্যাচুলেট করে? কী সেই ডিসিশন যা শুনলে তাঁরা নাকি ন্যাচার‍্যালি খুশি হবেন? বুদ্ধিবৃত্তি-ম্যাচুওরিটি-জীবনবোধ? কী জীবনবোধের বার্তা শোনাবে রিন্টু, তাঁদের নয়নের মণি, একমাত্র আদরের সন্তান?

বুড়ো মানুষ

বাড়ির সামনে চৌকোনা জেন্টস রুমালের মতো একটুখানি লন। দুদিক থেকে ঢ্যাঙঢেঙে লম্বা তিন ঠেঙে বাড়িগুলো জিরাফের গলা বাড়িয়ে আছে। যেন সুবিধে পেলেই লনখানাকে খুবলে খেয়ে নেবে। মোয়ারটা পড়ে আছে এক দিকে অনড় অচল হয়ে। কেউই সেটাকে আর চালাতে পারছে না। কেউ বলতে অবশ্য সিনহাসাহেব তিরাশি, এবং তাঁর কুক-কাম-বেয়ারা-কাম-মালি জগদীশ—সাতাত্তর। সিনহাসাহেব, এক্স আই. সি. এস.-এর যত্নের খাওয়া-মাখা শরীর, বংশগতির কৃপাধন্য শরীরের কাঠামো, রঙের মরা-হাতি- লাখ টাকা জেল্লা, সাদা বাবরি চুলে হেয়ার-ক্রিমের অপিচ্ছিল ঝিলিক। শীতের সকালে-বিকালে ঢোলা পাতলুন আর জোব্বা কিংবা শার্ট-প্যান্ট-পুলোভার পরা থাকলে বেশ জলুসদার বুড়োই মনে হয়। পাশে সাতাত্তর বছরের জগদীশ বেয়ারা কোমর-বাঁকা, পায়ের ব্যথায় প্রায় ডিঙি-মেরে হাঁটনদার। চুল বলতে তিন গাছি, দাঁত বলতে এক পাটি, কিন্তু চাষি বংশের জিনের ঐতিহ্যে জগদীশের স্ট্যামিনা এখনও তিনটে সিনহাসাহেবকে কাত করতে পারে। সুতরাং জগদীশ সিনহাসাহেবের কুক-কাম-বেয়ারা-কাম-মালি, খুঁড়িয়ে হলেও চালিয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ বছরের নোকর। রজতজয়ন্তীরই বছর এটা।

শেয়ালকাঁটা, পাথরকুচি আর দুব্বো ঘাসের বুনটে জংলা হয়ে আছে লনটা। অতএব ডেকচেয়ার পেতে লনে বসার বিকেল-বিলাস, তারও কাল হয়ে এল। সকালের পুবেল রোদ দ্বাদশীর চাঁদ একতলার বারন্দাতে পড়ে। সাজানো, সাফসুতরো এই বারান্দাখানই ইদানীং সবচেয়ে বেশি। আন্দামানি বেতের খানকয়েক শৌখিন চেয়ার, তাতে ঝকঝকে রঙের ভেলভেটের কুশন। তবে এসব চেয়ারে সিনহাসাহেব আর আরাম পান না। তাঁর জন্যে বরাদ্দ আছে ঠাকুরদার আমলের সেগুন কাঠের আরাম চেয়ার। খাঁজ কাটা পেছন দিকে। ইচ্ছেমতো ধাপ-কে-ধাপ হেলানো যায়।

বসেছেন সিনহাসাহেব। এখন ছোটো হাজারি করবেন। পিঠটা নিম সোজা। পাশে ছোটো তেপাইতে ডেনচারের কৌটো। সাহাবের গায়ে ভারী সাটিনের জোব্বা। ভেতরে দু-তিন দফা পোশাক-আশাক আছে। শীত জানান দিচ্ছে। যাযাবর হাঁসের মতো ট্রাঙ্কো-বাকস থেকে বেরিয়ে পড়েছে—উলিকট, ড্রয়ার, সার্জের শার্ট, স্যুট, টাই, স্লিপোভার, পুলোভার, কাশ্মীরি শাল। মায় কুলুর গরম র‍্যাপার। মাসখানেক কি দেড়েক সব সিনহাসাহেবের শীতকাতুরে আদুড় গায়ে ঝুপঝাপ নামবে, বাসা বাঁধবে, ওম দেবে নেবে। তারপর ছশ্‌শ। জগদীশ বেয়ারারই হয় ঝক্কাট। কাচাও রে, রোদে দাও রে, তোলো রে, চোদ্দোবার করে ঝাড়ো, ভাঁজ করো, সোজা হাঙ্গামা নাকি? তবে করবেই বা কে? মেমসাহেব গত হয়েছেন তা আজ বছর দশ না বারো? বারোই হল বোধ হয়। তা সেই তিনিই সকল কাজের কূটকচালি হাতে ধরে জগদীশকে শিখিয়ে চিনিয়ে গেছেন। শিখিয়েছেন, পাখি পড়া করে পড়িয়েওছেন। কেক-পুডিং-শুক্তো-দমপোক্ত-সুপ-ইস্টু রোস্ট, রুপো পেতল ঝকঝকে করার কায়দা, কাঁচ চিনেমাটি সাফ করার কল ; খাট-আলামারি-টেবিল-দেরাজ, পাথর-কাঠ-ধাতু তিন-চার-পুরুষ ধরে টুকে টুকে জমে-ওঠা জিনিসপত্তরের দেখভালের যাবতীয় করণকৌশল।

কাশ্মীরি কাঠের ব্রেক ফাস্ট ট্রে-খানা দু হাতে ধরে নড়বড় নড়বড় করতে করতে জগদীশ কিচিন থেকে বেরিয়ে আসে। সায়েবের পাশ মুখ দেখা যাচ্ছে। চোখে পড়ার চশমা লাগানো, সোনালি চিড়িক মারছে। হাতের ওপর কাগজ, খুলে মেলে ধরেছে।

'ব্রেক ফাস্টো'—চেয়ারের কাঠের হাতলের ওপর মাপ করে ট্রে-টা বসিয়ে দেয় জগদীশ।

চিলিবিলি জোব্বার ঢোলা হাতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে পাকা লোমঅলা লোল হাত। শিরার রংগুলো পর্যন্ত ফিকে হয়ে গেছে। মাটিতে ঝরে পড়া শুকনো ডালপালার আঙুল দিয়ে সায়েব টোস্টে মার্মালেট মাখায়। একটা দুটো কামড় দেয়, তা' পর প্লেটের ওপর আর কিছু আছে কিনা খোঁজে, হাতড়ায়, যেন জানে না আর কিছু থাকবে না। কী যে ঢং রোজ সায়েবের? ডাক্তার তো সিদিনকেও বলে গেল দুটি টোস্ট আর চা, বাস। ছানা খেতে পারো। তার রোজ রোজ কাঁচা ছানা আ-মিষ্টি আ-লুনো তেনার মুখে রুচলে তো? মার্মালেটটা অনেক কষ্টে পারমিট করানো গেছে। এদিকে আবার চড়া প্রেশার ; ডিম-ফিমও চলবে না। তা নয়তো, মেম সাহেবের হুকুম ছিল সকালবেলা সাহবকে রোজ ডিম দেবে। কড়া করে সেদ্ধ করে। রোজ।

'চা-টা ঢেলে দে', বিরক্ত গলায় বলে সাহেব।

কষ্টে কোমর নুইয়ে ফুলকাটা সোনালি বর্ডার বোন চায়নার মধ্যে দু চামচ দুধ ঢালে জগদীশ, তারপর রুপোর পট থেকে চা ঢালতে থাকে। ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে চায়ের লিকর ট্রে-ক্লথে। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে আছে সায়েব। চশমাটা পরা না থাকায় ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে না। জগদীশ একেবারেই দেখে না। তার এক চোখে ছানি।

'এ কি? লুঙি পরেছিস কেন?' —হঠাৎ সায়েবের বিরক্তিটা ফেটে বেরিয়ে পড়ে, —'ডিসগাস্টিং!!'

জগদীশের ওপর-গায়ে উর্দি। অনেক দিনের পুরোনো, সুতো-ওঠা। তবু সাফ। কিন্তু কোমরে জড়ানো বাঁদিপোতার গামছার মতো নিখাদ লুঙ্গি। বাঁকা কোমরের উপর লুঙ্গি কষি টেনে বাঁধে জগদীশ।

পাতলুন আর পরতে পারিনে।

'না পারবি কেন? দিন দিন যেন'... চায়ে আলগা চুমুক দেন সাহেব। জগদীশ জবাব দিল না।

ডিসগাস্টিং! বললেন সিনহাসাহেব, তারপর নাক কুঁচকে আবার চায়ে চুমুক দিলেন।

চিঠিপত্তর কিছু আছে?

উর্দির পকেট থেকে দুখানা অন্তর্দেশীয় পত্র, আর একটা পোস্টকার্ড বার করল জগদীশ।

এভাবে চিঠি দিতে কবে থেকে শুরু করলি? গেল কোথায় স্যালভারটা?

তাতে রুপো আর বার করতে সাহস পাইনে। যা চোরের উৎপাত?

বলি ভোগ করবে কে?—ভ্রূকুটি ক্রমেই ঘোর হচ্ছে সাহেবের।

জগদীশ চিঠিগুলো পাশ-টেবিলে রেখে ব্রেকফাস্ট-ট্রে নিয়ে পাতিহাঁসের মতো নড়বড় নড়বড় করতে করতে চলে গেল। সাহেবের চোখের আড়ালটুকু হওয়ার ওয়াস্তা। মুখ নেড়ে ভেংচে উঠল।

রুপো পালিশ করতে করতে গা-গতরে ব্যথা হয়ে গেল, তবু ছাড়বেনি, সায়েব তো নয় যম।

সাহেবের সম্পর্কে শ্রদ্ধা, সমীহ এই বছরখানেক হল যেন উবে যাচ্ছে জগদীশের। হবেই। সম্পর্কের রজতজয়ন্তী তো। একটা না একটা চেঞ্জ হবেই। তা নয়তো সাহেবের এমন চড়া গলা, তিরিক্কি মেজাজ যেমন সে কল্পনা করতে পারে না, তেমনি আড়ালে হলেও সে সাহেবকে ভ্যাঙাচ্ছে এমন দিন আসবে তা তার ভাবা ছিল না। কত রাশভারী ছিল সাহেব! চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যেত না।

ভুরু কুঁচকে একখানা অন্তর্দেশীয় পত্র তুলে নিলেন সিনহাসাহেব। চিঠি ছেঁড়ার জন্যে পাতলা রুপোর পেপারকাটার আছে একটা, সেটাও বোধহয় সিন্দুকে উঠেছে। ফ্যাড়াং করে চিঠির মুখ ছিঁড়ে ফেললেন সিনহাসাহেব। একটা খামে চিঠি পাঠাতে কি এদের বড্ড বেশি পয়সা খরচা হয়ে যায়।

চিঠিটা একটা বিজ্ঞাপন। ছাপানো লেখা। কারা কাছাকাছি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলছে। যা-যা মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজন হতে পারে স-ব পাওয়া যাবে। চাই শুধু সদাশয় মহাশয়ের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা।

ডিসগাস্টিং। দ্বিতীয় চিঠিটা অধৈর্য হাতে খুলে ফেললেন সিনহাসাহেব।

মহাশয় এই পত্রটি পাইবামাত্র 'জয় মা বালিকা ব্রহ্মচারিণী' এই মন্ত্রটি দশবার লিখিয়া প্রত্যহ দশবার জপ করিবেন। অতঃপর তিন দিনের মধ্যে এই পত্রের ত্রিশটি কপি করিয়া ত্রিশজন স্নেহভাজনের কাছে পাঠাইবেন। জনৈক প্রভাতবাবু পত্র পাইয়া নির্দেশ পালন করিলে সপ্তাহান্তে চার লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েন। জনৈক অধরবাবু পত্র পাইয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার একমাত্র সন্তানের প্রাণবিয়োগ হয়। ...

—রাবিশ!

পোস্টকার্ডটা সবুজ রঙের। হরাল দাসপুর থেকে পরাণ হালদার লিখছে :

সম্বৎসর ফসল ভালো হয় নাই। বাগান জমা দিয়াছি। সুবিধার দর অত্রত্য কেহই দিতে চায় না। মসুরি বুনিব। দুশোটি টাকা পাঠাইবা. ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিনহাসাহেব হাত থেকে ধুলোবালি ঝাড়ার মতো করে পোস্টকার্ডটা ঝেড়ে ফেললেন। জমিজমা বাগান পুকুর সব খাচ্ছিস, আবার দুশোটি টাকা পাঠাইবা!

জগদীশ! জগদীশ! এগুলো সব ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিগে যা...

এই পোস্টোকাটটাও?

আজ্ঞে, পোস্টোকাটটাও!

রোদটা ক্রমে হাঁটু বেয়ে কোলে উঠছে। শরীরে এতক্ষণে একটা আরামের ঝিমঝিমুনি। ঠান্ডা রক্ত কুসুম-কুসুম গরম হয়েছে বুঝি বা। কাগজখানা উলটেপালটে মেলে ধরলেন তিনি। শরীর গরম করার আরেক কল এই কাগজ। দিনদুপুরে এক ডজন লোক মিলে মহিলার কাপড় খুলে নিয়ে তাকে পেটাচ্ছে, সরু গলির মধ্যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঢ্যাঙা বহুতল, ক্যাজুয়ালটি সাতাশ জন। সাতাশ? না সাতাশি? প্রোমোটার মন্ত্রীমশাইয়ের আঁচলের তলায় বসে আছে। আহা স্নেহশীলা জননীমূর্তি। একশো কেন, দুশো অপরাধও ক্ষমা করবেন স্নেহকরুণ মুখে। চৌত্রিশ বছর আগে অবসর নিয়েছেন সিনহাসাহেব তখনও এসব ভাবা যেত না। একটা সভ্য মানুষের দেশ, সভ্য মানুষের শহর ছিল এসব। বিদেশেই বা কী হচ্ছে? এই ক্লিন্টন-দম্পতিটি কী? খানদানি ঘরের ছেলে-মেয়ে? পলিটিক্স তোরা করবি না তো করবেটা কে? কিন্তু হোয়াইট হাউজের স্টাফ মারা যাচ্ছে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে? কদিন আগে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি! ছি, ছি! ছি! হতেন মিসেস সিনহা, দেখিয়ে দিতে পারতেন ফার্স্ট লেডি কেমন হতে হয়। বিজয়লক্ষ্মীর মতো হেয়ার স্টাইল ছিল, লেডি রাণুর মতো ফিগার। নীচের তলার লোকেরা সমীহ করত, ভয় খেত, সমান মাপের লোকেদের থেকেও অতিরিক্ত সম্ভ্রম আদায় করে নিতেন।

জগদীশ পাশ দিয়ে সুট করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছিস?' কাগজের আড়াল থেকে গলাটা তাঁর চাপা গর্জনের মতো শোনাল।

এই একটু বাগানে।

কেন? মোয়ারটা দেখবি নাকি? দেখতে ইচ্ছে হয়েছে?

আজ্ঞে আমার নাতিটা এয়েচে। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আচে।

যাও, তাড়াতাড়ি শুনে এসো, দেখো আবার ভেগে যেও না। ডেকে যেন পাই।

গজগজ করতে করতে বাগানে নেমে গেল জগদীশ। দূরপাল্লার বাসে চড়ে, সাত রাজ্যির ধুলো খেতে খেতে নাতিটা এল, হাতে বোঝা, তা নাকি তাড়াতাড়ি শুনে এসতে হবে। মরণ অমন সায়েবের! সে নিয্যস সময় নেবে। একটা কথা সাতবার শুধোবে। নিজের তো ভিটেয় পিদিম দেখাতেও কেউ নেই। সেবার মেমসায়েব মারা গেলেন তবু একবার কেউ এল না, একজন নাকি থাকে অস্ট্রেলিয়া আরেক জন জার্মানে। ছেলেপুলে, নাতিনাতনি বুড়ো সায়েবেরও কি আর নেই। কিন্তু সায়েবগুলোর সব থেকেও কেউ থাকে না। কেউ নেই বলেই, মেমসায়েবের কথা স্মরণ করে এই অখাদ্য বুড়োর সেবাযত্ন সে করে যাচ্ছে, আজ কত বচ্ছর! রক্তে চিনি, গাঁটে ব্যথা, আদ্দেক জিনিস খাওয়া বারণ, বুকের কষ্ট, প্রেশার, কী নেই। তবু সন্ধেকালে ক পাত্তর ঢুকু-ঢুকু না হলে বাবুর ঘুম হবে না। কাচের বাসনে ছাড়া খাবে না, রুপোর গেলাস, রুপোর পট নইলে চলবে না, বিছানাতে একটি কোঁচ থাকবে না। জামাকাপড় সব টিপ-টপ, যখনকার যেমন তখনকার তেমনি চাই। বুকের ভেতরটা খুঁচিয়ে সে টের পায় মায়াও পড়ে গেছে খানিক। যতই হোক। সাহেবটার সঙ্গে তার নিজের এখন কী-ই বা তফাত! দুজনেই বেতো খুঁতো বুড়ো। সাহেবের কিছু হলে যেমন সে দেখে, তার কিছু হলেও তেমনি সাহেবের হোমিয়োপ্যাথিকের গুলি আছে। বড়ো ডাক্তারের বাড়া হয়েছে এদান্তে সাহেব। এই তো, সকালের কাগজটি বাসি হতে-না-হতেই আতশ কাচ আর হোমিয়োপ্যাথিকের মোটা বইখানা নিয়ে বসবে। দুই বুড়োর দাঁত কনকন, কান কটকট, জ্বর-জ্বারি, কষা পেট, আলগা পেট, তেতো মুখ, গা ম্যাজম্যাজ, মাথা ধরা, সর্দি সব কিছুর দাওয়াই ওই মোটা বইয়ের পেট থেকে বেরোয়।

নাতির কথায় চৈতন্যে ফিরে আসে জগদীশ, 'মা বলছিল, একবার যদি হিমের শুরুতে যাও। রস খেতে যাবে তো সেই হিম পড়লে। নাতিটা ঘ্যানঘ্যান করে।'

কেন রে? এদিকে যে আমি নইলে সংসার অচল। কীসের দরকার তোদের?

পুকুরের মাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে, ফলপাকড় এনতার যে পাচ্ছে নিচ্ছে—মা বেধবা মানুষ! কেউ ভয়-ভীতি করতে চায় না।

অ, তা যাব'খন। খুব ধমক দিয়ে আসব সব ছিঁচকে চোরগুলোকে ডেকে। নাকি রে?

জগদীশের মুখে খুশি খুশি হাসি। কৌতুকটুকু ধরতে পারে না নাতি। বলে, হ্যাঁ চোর-জোচ্চোর আবার ডেকে পাওয়া যায়। তুমিও যেমন ঠাকুর্দাদা!

পেছন দিক দিয়ে খিড়কির দিকে আয় দিকি একবার—জগদীশ বলে, 'আমি সদর দিয়ে যাই। গিয়ে হুড়কো খুলে দিই।'

বারান্দায় উঠে জগদীশ দেখল সায়েব মুখে কাগজ-চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকাচ্ছে বিচ্ছিরি আওয়াজে। নইলে মনে হতে পারত মটকা মেরে আছে। বুড়ো পাজি তো কম নয়। জগদীশ যেন তার বেয়ারা নয়, বিয়ে-করা পরিবার। চক্ষে হারাচ্চে। এই জগদীশ আর সেই জগদীশ। জগদীশ কোথায় যাচ্চে, কতক্ষণে ফিরল—এসব লক্ষ রাখাই যেন তার জেবনের সবচেয়ে বড়ো, কিংবা একমাত্তর কাজ।

কিচিনের জানালা দিয়ে নাতিটাকে বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখল জগদীশ। ঘুরে-ফিরে দেখচে।

দেখার আর আছেটা কী! আসত মেমসায়েবের সময়ে! গোলাপে গোলাপে আলো বাগান দেখতে পেত। এখন ওই বকুল, একটা কলকে, কটা পাতাবাহার শত অযত্ন আছেদ্দাতেও মরে না, আর কিছু ফ্যাকাশে দোপাটি। বর্ষার পরেই শুয়ে পড়ে।

খিড়কি খুলে ইশারা করে সে। নাতিটা ঢুকে আসে। আহা ছেলেমানুষ মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সোজা পথ! ফ্রিজ থেকে অরেঞ্জ স্কোয়াশের শরবত করে দেয় সে। মাছের চপ গড়া আছে, বুড়ো সন্ধেবেলা পাত্তর চড়াবে, তখন লাগবে। তা তার হয়েও বেশি আছে। কখানা ভেজে দেয় সে নাতিকে।

বড্ড ভালো হয়েছে গো ঠাকুরদাদা, তুমি করেচো?

'না তো কি ওই বুড়ো সাহেব করবে?' —নাতি ঠাকুরদাদা হাসতে থাকে দুজনেই।

গাঁয়ে গিয়ে তুমি আমাদের এমনি চপ করে দেবে?

'এমন মাছ কি সেখানে পাব ভাই?'—জগদীশ আক্ষেপ করে। চুনোপুঁটি খয়রা-খলসে কুচো চিংড়ি দিয়ে তো আর চপ হয় না। পলিথিনের ব্যাগে চারখানা আরও মুড়ে দেয় জগদীশ।

'যা ছোটোকাটার জন্যে নিয়ে যা।'

পলি-প্যাক নিজের ঝোলায় পুরে নাতিটা ক্রমে চলে যায়। দু-তিনবার করে ফিরে ফিরে ঠাকুরদাদাকে দেখতে দেখতে যায়। আহা বড্ড মায়া ছোঁড়াটার। বয়সটা এখনই একটু ফাঁকা ফাঁকা আছে, এ সময়টাই বুড়োবুড়িদের একটু কাছ-নেওটা হয় ছেলেপেলে। এ বয়সটা কেটে গেলে, সংসারের জোয়াল ঘাড়ে পড়লে আর চোখ-কানে দেখতে পাবে না। তখন...

রাজির মা ঘর-দোর ঝাড়তে পুঁছতে এয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব না করালে মাঝখান দিয়ে ন্যাতা টেনে চলে যাবে। পেছনে পেছনে দোতলায় উঠতে থাকে জগদীশ।

'আমি করে নিচ্ছি, যাও না গো দাদু, নিজের কাজে যাও'—রাজির মা মুখ ঘুরিয়ে বলে।

'আমার ওপরে কাজ আচে'—গম্ভীর মুখে জগদীশ ওপরে উঠতে থাকে। কে জানে আজকে আবার কিছু সরাবার মতলব নিয়ে এসেচে কি না ! বড্ড যেন উৎসাহ ! ফ্রিজে রাখা দুধগুলো তো খেয়ে খেয়ে সেরে দিলে।

'জগদীশ! জগদীশ!'...সায়েব ডাকচে। ডাকুক, দরকারে তো ডাকচে না। ডাকচে স্বভাবে। এখন সে সাড়া দেবে না।

বারান্দার আরামচেয়ারে পড়ে থাকলে বেলা বারোটা নাগাদ রোদটা হাঁটি-হাঁটি করে উঠে এসে ঠিক কপালের মধ্যিখানে ছ্যাঁকা দেয়। এখন লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। বারান্দার দিকে সেগুন কাঠের পেল্লাই দরজা। এইটি তাঁকে এবার বন্ধ করতে হবে। লম্বা পেতলের ছিটকিনি। ওপরে, নীচে। নীচেরগুলো আর এখন লাগানো হয় না। দরজার কপাট বন্ধ করতে না-করতে ওপরে রঙিন কাচগুলো থেকে বর্ণিল ঝরনা কিলবিলিয়ে পড়তে থাকে বারন্দার কোলে। সাহেবের সাদা মাথায়, রঙিন জোব্বায়। নীল আলো, সবুজ আলো, হলুদ আলো।...সিনহা সাহেবের ছেলেরা। আর্মিতে ছিল একজন। প্লেন ক্র্যাশে মারা গেল। ফ্যামিলি এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। চোখে দেখেননি, কিন্তু নাতি তাঁরও আছে। মেঝের ওপর হলুদ কাচের আলোর মতো। স্পষ্ট, তবু নাতি তো। ছবিতে চেনেন! গত বছর বিয়ে করল, ছবি পাঠিয়েছিল।

রংগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে, বুড়ো বয়সের পাতলা চামড়ায় মেখেজুকে ঘরে গেলেন সিনহাসাহেব। একতলার ঘর বলে আঁধার লাগে, না বাইরের আলো থেকে এসেছেন বলে, বুঝতে পারেন না সিনহাসাহেব। বড্ড যেন ঘোর লাগছে। নইলে নাতি তাঁরও আছে। মুসৌরি থেকে সোজা স্কলারশিপ নিয়ে ক্লার্কে পড়তে গেল, সেখান থেকে জার্মানি। ছোটো ছেলেটা কোনোদিন আর মা-বাবার কাছে

ফিরে আসেনি। ছোটো ছেলের ঘরের ছোটো নাতিটি পাহাড়ে চড়ে। এটাই নাকি তার পেশা। এভারেস্ট চড়তে বছর কয়েক আগে এসেছিল। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যায়। নিজের নাতি বলে কোনো টানই অনুভব করেননি সিনহাসাহেব। চিনতেই পারেননি। পুরোদস্তুর জার্মান সাহেব একটি। কিন্তু যতই হোক তাঁর নাতিই তো! নাতি-নাতনি তাঁরও আছে। ওই বারান্দার মেঝেতে রঙিন আলোর কুচির মতো, ধরতে গেলেই ফসকে যায়।

কষকষে গরম জলে চান করেও, এই দুপুরের দিক থেকে শীত শীত লাগতে থাকে সিনহাসাহেবের। ঘরদুয়োর আটকাঠ বন্ধ তবু যে কোত্থেকে ঠান্ডাটা আসছে ধরতে পারেন না তিনি। দুপুরের খাওয়া খেতে কোনোরকমে রান্নাঘরের সামনে পাতা টেবিলে যান। গরম গরম মুশুর ডালের সুপ, বরান্দের দু খানা রুটি, দু পিস মাছ খেতে থাকেন। একবার কড়া গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কী রে কুক কাম বেয়ারা, বুড়ো চোর, নিজের জন্যেও কি এই পিণ্ডিই রান্না করেছিস?'

আমার তো আর চিনি নেই রক্তে, আমি কেন পিণ্ডি খেতে যাব শুধুমুদু?

তবে? কী করেছিস নিজের জন্যে? বিরিয়ানি, কালিয়া? কোফতা কাবাব?

'বিরিয়ানি-মানি মুখে রোচেই না'...নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল জগদীশ।

তবে?

একবাটি ডাল আর ডুমুরের ঘ্যাঁট সাহেবের পাতের পাশে নামিয়ে রাখল জগদীশ। বলল, 'এই তো।'

এঃ। বাগানের সেই ডুমুরঘণ্ট! বারো মাস ছত্রিশ দিন এই-এ রান্না করবি?

হপ্তায় এক দিন তো বাজার যাই, কত দিন থাকে সবজি? ছ-দিন হল, আবার কালকে যাব। বাঁধাকপি আনব'খন।

কেন ফুলকপি কি করেছে?

প্রেশার চড়ে কেন?

ধ্যাত্তেরি তোর প্রেশার। মাছের চপ করতে বলেছিলুম যে!

সন্ধেবেলায় দেব।

সন্ধেবেলাও খাব, এখনও খাব।

এখন খাবার মতো নেই।

কেন? করলি তো অনেক, কত খাবি একা, ব্যাটা বুড়ো ভাম?

নাতিটা এয়েছিল, গোটা কতক দিয়েচি...

অ, নিজে খাবি, নাতিকে দিয়ে সাবড়াবি, তারপর পাত কুড়োনো যা থাকে কোনোরকমে আমাকে দিবি?

বাঁকা কোমরে যথাসম্ভব তড়বড় করে কিচিনে ঢুকে যায় জগদীশ, দুটো নারকোল দু হাতে ধরে টেবিলের সামনে এনে রাখে। সংক্ষেপে বলে, 'এনেচে।'

আড়চোখে সেদিকে চেয়ে সাহেব বলে, 'বা বা বা। আমার রক্তে চিনির ছুতোয় নারকোলগুলো তো তোর গব্ভেই যাবে। মাঝখান থেকে আমার চপগুলো হাওয়া হয়ে গেল।'

জগদীশ ফুঁসছে। জোরে জোরে তার নিশ্বাস পড়ছে খেয়াল করে, হাসিটা লুকিয়ে ফেলেন সিনহাসাহেব। ফোঁস ব্যাটা ফোঁস। ফোঁস, ফোঁস, ফোঁস।

দিনের বেলায় যেমন তেমন। সুয্যি ডোবার পর থেকেই সিনহাসাহেবের মেজাজ অন্যরকম হতে থাকে। থ্রি পিস স্যুট ওঠে অঙ্গে। কড়কড়ে শার্ট। জব্বর একাখানা টাই। চকচকে মকরমুখো ছড়িটা নিয়ে জুতো মোজা পরে মসমস করে সাহেব বারান্দায় বেড়াতে থাকেন।

কে রে? কে ওখানে?

গম্ভীর গলায় হাঁকডাক।

ঘরে টিউব লাইট জ্বলে। একহারা ইংলিশ খাটটিতে ধবধবে বিছানার ওপর ফুলকাটা সুজনি পাতা, পুরোনো আসবাবগুলি ঝেড়ে পুঁছে ঝকঝক করছে। দেরাজের ওপর কাটাগ্লাসের ফুলদানিতে বাগানের লিলি। ঘরের দরজা খোলা, বারন্দায় টবের গাছগুলি দেখা যেতে থাকে।

টেবিলের ওপর সোনালি পানীয়, লিমকার বোতল, অনেক যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা কাচের পানপাত্র, প্লেটে গরম গরম মাছের চপ। জগদীশ চুল ক-গাছি আঁচড়ে, ধবধবে উর্দি ওপর-গায়ে, মাদ্রাজি লুঙ্গি বাঁকা কোমরে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট্ট ট্রেতে এক গেলাস জল। একটা ওষুধ খাবেন সাহেব।

ওষুধটা খেলেন। জল খেলেন এক ঢোঁক। তারপরেই মেজাজটা কী রকম তিরিক্ষি গোছের হয়ে গেল। বাকি জলটা জগদীশের উর্দি লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন। ফোঁস ব্যাটা, ফোঁস, ফোঁস।

এ কী? এ কী? কী করছেন?

যা যাঃ, নাতির কাছে যা...

মুখের লালচে রঙটা আরও ঘোর। বোতল গেলাস ঘেরা, স্যুট-টাই পরা যেন একটা শয়তান বসে আছে।

'দূর। দূর এ বুড়ো যমের কাচে কাজ করা ঝকমারি' বিড়বিড় করতে করতে উর্দির বুকের কাছটা উঁচু করে ধরে ঘর থেকে ছিটকে গেল জগদীশ।

কী বললি? কী বললি?

বলচি—এই বুড়ো যমের ভীমরতি হয়েচে—এখানে থাকা ঝকমাবি, —চেঁচিয়ে খিচিয়ে উঠল জগদীশ।

যা যা তবে ... নাতির কাছে যা ... ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাতে লাগলেন সিনহাসাহেব।

নিজের ঘরে গিয়ে উর্দি ছাড়তে ছাড়তে রাগে গরগর করতে লাগল জগদীশ। বেতো শরীরে শীতের সন্দেয় জল, আবার এঁটো জল। সে সাঙঘাতিক চটে গেছে। মদো বুড়োর লালা মাখা জল। ছি ছি ছি। ঘেন্নায় গা শিরশির করছে তার। মরো এখন সন্ধের ঝোঁকে চান করে। মরি বাঁচি করে সে গায়ে জল ঢালতে থাকে। জল ঢালতে থাকে, জল ঢালতে থাকে।

মাঝরাত্তিরে একবার সিনহাসাহেবের মনে হয়েছিল তিনি জেনারেল মানেকশ, যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছেন। আশেপাশে বোমার স্প্লিন্টার। লাশের গাদায় তিনি পড়ে আছেন। তাঁকে মৃত ভেবে চলে গেছে সব। প্রাণপণে একটা নিরাপদ জায়গায় যাবার চেষ্টা করেন তিনি সে সময়ে। পা দুটো যাচ্ছেতাই ভারী। মাথাটা তুলতে পারছেন না। তবু, বীরপুরুষ তো। এক সময়ে তাঁকে নিয়ে তাঁদের নিয়েই কাব্য লেখা হত, ছবি আঁকা হত। শত্রুশিবিরের সীমানা থেকে আহত শরীর নিয়ে পালিয়ে আসতে থাকেন তিনি। দৈত্যের চোখের মতো আলো জ্বলছে একখানা। তার সামনে নিয়ে পালানো চাট্টিখানা কথা নয়। তবু তিনি পালান। কিন্তু শেষরক্ষা সম্ভবত হল না। কারণ যতই এগোন, সেই একই কাঁটাতারের বেড়া, একই দানোচোখো আলো। একই বোমার স্প্লিন্টার চারদিকে ছাড়িয়ে থাকে। অবশেষে প্রবল আওয়াজ করে শত্রুপক্ষের জিপগুলো তাঁর দিকে গড়িয়ে আসতে থাকলে 'জেনি জেনি' বলে চিৎকার করতে করতে তাঁর ঘুম ভাঙে। তিনি বুঝতে পারেন কেউ প্রাণপণে বাইরের দরজা ধাক্কাচ্ছে।

লিমকার বোতল, হুইস্কির বোতল ভেঙে গড়াচ্ছে, পানীয়ের তরল মিশেছে তার সঙ্গে; ঘরময় তীব্র অ্যালকোহলের গন্ধ। সকাল, কিন্তু টিউব লাইটটা দগদগে ঘায়ের মতে জ্বলছে।

সিনহাসাহেব কোনোমতে নিজেকে টানতে টানতে বারান্দায় দরজায় এনে ফেললেন, দরজা খুললেন। রাজির মা।

মাথায় কাপড় টেনে, কোমরে কাপড় গুঁজে রাজির মা অবাক চোখে সায়েবের দিকে তাকিয়ে ঢুকে এল।

সিনহাসাহেব দেখলেন—তাঁর অঙ্গে থ্রি পিস স্যুট, জুতো মোজা...কোটময় বিশ্রী সব দাগ। মুখের অবস্থাও নিশ্চয়ই তথৈবচ। রাজির মা ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি বালতি আনল। ভাঙা কাচ, আধ ভাঙা বোতল তুলছে, ঝাড়ছে ঘর, পুঁছছে। বিছানাটা নিভাঁজ নিপাট হয়েই আছে, তবু একবার টেনেটুনে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেয়ারাদাদু কোথায় গেল আবার?'

কে জানে কোথায় বেরিয়েছে!

খিড়কির দোরে তালা মেরে বেইরেচে দেখচি।

চমকালেন সিনহাসাহেব।

রাজির মা বলল, 'আপনি চানে যান, আমি দেখচি।'

অনেকক্ষণ ধরে চান করে, ওয়ার্ডরোব খুলে ধবধবে পাজামা, গরম পাঞ্জাবি বার করে পরলেন সিনহাসাহেব। পরতে পরতে মনে হল স্বপ্নটা স্টালিনগ্রাড, ফেয়ারওয়েল টু আর্মস, ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই—এইসব ছবির তালগোল জগাখিচুড়ি। কী যে দেখেছিলেন! কেন দেখেছিলেন কে জানে! 'জেনি জেনি' বলে চেঁচাচ্ছিলেনই বা কেন? কেউ যদি শুনে ফেলত! জেনি বলে কাউকে তিনি বাস্তবিকই চেনেন না।

গায়ে কুলুর র‍্যাপার জড়িয়ে, চুল আঁচড়ে ভদ্রলোক হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখেন রাজির মা ভীত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বেয়ারাদাদু চলে গেছে গো সায়েব।

মানে?

ওর ঘরে, বাক্স-টাক্স কিচ্ছু নি। দেয়ালের হুকে নুঙি, গামছা ঝুলত, সব ফাঁকা, ফর্সা। আপনাকে কিছু বলেনি?

মাথাটা শুধু নাড়ালেন সিনহাসাহেব। তিনি বারান্দার আরামচেয়ারে বসলেন। সামনের দরজা খোলা। অকেজো লন মোয়ারটা পড়ে আছে।

রাজির মা টোস্ট দিল, চা দিল, দুধ দিল। দুপুরবেলা দুধ পাঁউরুটির ব্যবস্থা করে দিল। বাড়ি থেকে ছুটে ছুটে এসে বিকেলের চা দিয়ে গেল। রাত্তিরেও দুধপাঁউরুটি ঢাকা রেখে দিল। সিনহাসাহেব নিজে ওষুধ বার করে করে খেলেন।

রাজির মা বলল, 'দেখি একটা লোক জোগাড় করতে পারি কি না'—

ঢ্যাঙা বাড়িগুলোর মাথায় রোদ টলটল করছে, লনে ছায়া। যদ্দুর পারে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে রাজির মা চলে গেল।

দুদিন কি তিনদিনের মাথায়, তখন প্রথম শীতের অকাল গোধূলি। সিনহাসাহেব বারান্দায় বসে বসে দেখলেন গোধূলি মাখানো পথটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে একটি শিশু আসছে। শিশু? না বালক? বালকই, কিন্তু সিনহাসাহেবের কাছে শিশুই। শিশু তেমন করে তিনি জীবনে দেখেননি। শিশুতে বালকে তফাত তাঁর বৃদ্ধ মগজের গলিঘুঁজির মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তিনি দেখলেন, গোধূলির জমাট অংশটি দিয়েই নিটোল হাত-পাগুলি গড়া। জলের মতো চোখ, ঘাসের মতো চুল, মোয়ার দিয়ে ছাঁটা ঘাস। দু-চার গুছি অবাধ্য দুর্ব্বোঘাসের মতো গিঁটগ্রস্ত হয়ে কপালের দিকে বেড়ে এসেছে। হাতে পুঁটুলি, গোধূলি শিশুটি বারান্দায় উঠে এল।

'তুই কে?' —যেন স্বপ্নের ঘোরে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব।

আমি ঝড়ু।

কোত্থেকে এসেছিস?

ওই তো—একটা দিক সে দেখাল ঠিকই, কিন্তু সেটা কোন্‌দিক, কোনো বসতি নির্দেশ করছে কি না, সিনহাসাহেব ভালো বুঝলেন না। তাঁর মনে হল শিশুটি বুঝি ওপর দিকে আঙুল দেখাল। এখন, তার কী মানে হতে পারে, তিনি জানেন না, গ্রাহ্য করেন না।

তোর পুঁটুলিতে কী আছে?

পুঁটলির গিঁট খুলে ফেলল সে। ভেতরে একটি রংচঙে জামা, একটি লংক্লথের দড়ি পরানো ইজের, একটি লাট্টু-লেত্তি, একটি চাকা এবং দুটি মুড়ির মোয়া।

তোকে কি রাজির মা পাঠিয়েছে?

হাঁ করে চেয়ে রইল।

দুর হাবলা ছেলে, কাজ করবি কী করে?

এটা কী?—ঝড়ু হাত সোজা করে সামনে বাড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল।

পিয়ানো। একে কটেজ পিয়ানো বলে। এই দেখো।

সামনের টুলে বসে চাবি টিপলেন সিনহাসাহেব। দু হাতে।

ঝড়ু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

থরো থরো অনভ্যাসের আঙুল থেকে ক্রমে শীত ঝরে যায়। বসন্ত আসে। ভুলে যাওয়া সুরগুলো মগজ থেকে হৃদয় পেরিয়ে আঙুল বেয়ে ঢুকে যায়, পিয়ানোর চাবি থেকে অবিশ্বাস্য স্থৈর্য আর মিষ্টত্ব নিয়ে বেরিয়ে আসে।

মোৎজার্ট-বল মোৎজার্ট...

'মোদজাট'—ঝড়ু বলে, জলের চোখে তাকায়।

ওটা কী?—

ঝড়ুর আঙুল এখন ওপর দিকে।

শ্যান্ডেলিয়র। ঝাড়বাতি।

বাতি? জ্বলে না।

বাল্‌ব নেই সব। দেখি। সুইচ টেপেন সাহেব। কয়েকটা বাতি জ্বলে ওঠে। যথেষ্ট ঝলমল করতে থাকে। ঝড়ু মুখ উঁচু করে তাকিয়ে থাকে।

দেরাজের ওপর ফটো। সে দিকে তাকিয়ে ঝড়ু বলে, ওটা কে?

ওটা জেনি—মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলেন সিনহাসাহেব। তিলোত্তমা সিনহার ছবিটাও তাঁর দিকে তাকিয়ে যেন হাসিটা ফিরিয়ে দেয়।

কী বোঝে ঝড়ু কে জানে, কিন্তু একবার সাহেবের দিকে তাকায়, একবার তিলোত্তমার ছবির দিকে তাকায়। সে-ও হাসে। জলের মতো হাসি।

রান্না করতে পারিস?

হ্যাঁ—আ—আ।

অ্যাত্তোবড়ো করে মাথাটা হেলায় ঝড়ু।

কী রান্না করবি?

ছেলেটাকে নিয়ে রান্নাঘরে যান তিনি। আনাজপাতি কিছু কিনে রেখে গেছে রাজির মা। বলেন আমি কেটে দিচ্ছি, গ্যাস জ্বেলে দিচ্ছি—তরকারি করতে পারবি তো?

এইবার ছেলে বলে, মা পারে।

মা পারে, তুই পারিস না?

দিদি পারে।

অর্থাৎ পারে না, কিন্তু কবুল করবে না কিছুতেই। ভাঙবি তবু মচকাবি না! বটে!

সিনহাসাহেব, পেঁপে আলু পেঁয়াজ টোম্যাটো ফুলকপি সব ড্যাবা ড্যাবা করে কাটেন ছুরি দিয়ে। গ্যাস জ্বালেন। প্যান বসিয়ে তাতে ডেলা ডেলা মাখন গলান তারপর আনাজের টুকরোগুলো দিয়ে নাড়েন চাড়েন, নুন দেন, জল দেন, মরিচ দেন, একটু ময়দা গুলে দেন দুধে। ফ্রিজ থেকে বার করে দুধ গরম করেন। টোস্টারে টোস্ট বসান।

ছেলে হাঁ করে দেখে পপ পপ করে তৈরি টোস্ট বেরিয়ে আসছে।

'ওর মধ্যে কী আছে?'—সে আঙুল দিয়ে টোস্টারটা দেখায়।

'দানো আছে।'—সিনহা হাসেন।

ছেলেটা বোঝে ঘণ্টা। কিন্তু হাসে, সে-ও হাসে।

টেবিলে ম্যাট পেতে, দুটি প্লেট, দুটি বাটি, দুটি চামচ, দুটি গেলাস সাজান সিনহা, বলেন, 'দেখছিস?'

ঘাড় মস্ত করে হেলিয়ে ঝড়ু নীরবে জবাব দেয়। সে দেখছে।

শিখছিস?

হ্যাঁ—অ্যা—অ্যা।

কাল টেবিল সাজাতে বললে পারবি?

হ্যাঁ-আ-আ।

আস্বা তো খু-উ-ব। হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা। দেখা যাক কী পারিস আর কী না পারিস। কী কী রান্না করলি আজকে?

পাঁউরুটি টোস, দুধ, ঝোল।

বাস বাস বাস। খুব রেঁধেছিস। এখন খেতে বোস।

ঝড়ু দু হাতে দুধের গেলাস ধরে খায়, ঠকঠক করে। ঠোঁটে দুধ লেগে যায়। তারপর দু হাতে কামড়ে কামড়ে টোস্ট খায়। সবশেষে স্টু খায়। একটা চমক লেগে থাকে তার দু চোখে।

ভালো রেঁধেছিস?

ফুলকপির ফুলের দিকটা কামড়ে ধরে, ঘাড় হেলিয়ে জবাব দেয় সে, ভালো।

খাসা?

খাসা।

কালকে পারবি?

হুঁ-উ।

জগদীশের ঘরটায় রাত্তিরে ছেলেটাকে নিয়ে যান সিনহাসাহেব। ঠিক হবে কি না বুঝতে পারেন না। তক্তপোশটা দেখান।—'এইখানে শুবি রাত্তিরে, পারবি?'

হ্যাঁ।

এবার হ্যাঁ-টা অত লম্বা নয় লক্ষ করেন সিনহা। জগদীশের কম্বল খুলে ছেলেটার গায়ে জড়িয়ে দেন।

ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

শীত করছে না?

না।

তবে আমি যাই?

হুঁ-উ!

কিন্তু রাত্তিরবেলা ঘুমের খুব ব্যাঘাত হল সিনহাসাহেবের। মাঝে মাঝেই মনে হতে লাগল ছেলেটা ভয়ে কাঁদছে। তিনি উঠে উঠে দেখে এলেন। সে এক হাঙ্গামা। ঘর থেকে ঘর, তারপর দালান, তারপর খাবার জায়গা, তার ওপাশে জগদীশের ঘর। সুইচ জ্বালতে জ্বালতে যাওয়া, নেবাতে নেবাতে আসা। দু বার উঠেছিলেন, দু বারই দেখলেন অগাধে ঘুমোচ্ছে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে। গোল গোল হাত পাগুলো সব লম্বাটে হতে আরম্ভ করেছে, কী মসৃণ! হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। বুকের ওপর কান পেতে ধুকপুক শুনলেন। তবু ঘুম ভাঙল না ছেলেটার। ছেলেমানুষের ঘুম! ন্যাতা হয়ে গেছে একেবারে। কিন্তু আরও একবার কান্না শুনলেন তিনি। ঘুমের ভেতর। স্বপ্নের কান্না। স্বপ্নে শুনলেন, স্বপ্নেই সমাধান করলেন। সকালবেলা আর সেসব বৃত্তান্ত মনে রইল না।

পরদিন সকাল থেকেই ঝড়ু নিজের মতামত, ইচ্ছে-অনিচ্ছে বেশ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে লাগল। যেমন ভোরবেলা উঠে সে তাঁর বারান্দার আর্মচেয়ারে শুয়ে দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়ে। সিনহাসাহেবের ডাকে ঘুম ভেঙে চোখ কচলে প্রথমটা সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর বেশ সপ্রতিভভাবে উঠে এসে ঘোষণা করে ঘরের মধ্যে গরম জলের কল খুলে সে চান করবে। সেইমতো চান করে পুঁটলির থেকে রঙচঙে জামা ইজেরটি সে পরে এবং সেই মুড়ির মোয়ার একটি সাহেবকে দিয়ে অন্যটি নিজে খেতে থাকে, সাহেব যখন বললেন তাঁর দাঁত নেই, সে টেবিলের ওপর থেকে ডেনচারের কৌটো নিয়ে আসে দৌড়ে। এটাই সম্ভবত সাহেবকে তার প্রথম সেবা। তা সত্ত্বেও যখন মোয়া সাহেব খেতে পারেন না, তখন সে সেই কামড়ানো এঁটোকাঁটা মোয়া অবলীলায় খেয়ে নেয়।

রাজির মা বেলায় এলে মুচকি হেসে সাহেব জিজ্ঞেস করেন, 'কোথা থেকে জোগাড় হল এত কাজের ছেলে?'

রাজির মা অবাক। তারপর দেখেটেখে বলল, 'ও মা! এ কী কাজ করবে গো সায়েব, এ যে দুধের ছেলে?...এই। তোকে কে পেটিয়েচে?'

ঝড়ু বারান্দার এক কোণ থেকে আর এক কোণে চাকা গড়াতে থাকে ; কোনো জবাবই দেয় না।

কেউ আপনার অসুবিধের খবর পেয়ে পেটিয়েচে মনে হয়। এক হিসেবে ভালো হল। সঙ্গে থাকবে। দেখুন হয়তো বেয়ারাদাদুই পেটিয়ে দিয়েচে।

সে বাজার এনে দেয়। মুরগি, মাছ, পাঁউরুটি। রুটি গড়ে দিয়ে যায়। ঝড়ু বলে, 'ভাত খাব।'

ওরে ছেলে! তোমার জন্যে এখন আমায় ভাত বসাতে হবে। বলে বটে, কিন্তু একবাটি ভাত সে করে রেখে যায়।

ঝড়ু বলে, 'ওপরে কী আছে? ওপরে যাব।'

আমি আর ওপরে যেতে পারি না।

চলো না, আমি ধরে নিয়ে যাব।

অনেকদিন পরে সুতরাং দোতলায় ওঠেন সিনহাসাহেব। ঘরগুলো খোলেন একটার পর একটা। উঁচু উঁচু পালং। আলমারি। দেরাজ। টেবিল। সিন্দুক। সিঁড়ি বেয়ে পালঙ্কে উঠে যায় ঝড়ু, একটু শুয়ে নেয়। সাহেব অপেক্ষা করেন।

এর মধ্যে কী আছে?

জামাকাপড় ... ফটো ...

কার?

জেনির বোধহয়।

দেখব।

অগত্যা তিনি আলমারি খোলেন। থরে থরে শাড়ি, জামা, ন্যাপথলিনের ওষুধ-ওষুধ গন্ধ ছাড়ছে। ফটো অ্যালবাম খুলে ছবি সব দেখাতে হয় ঝড়ুকে। দেরাজের দিকে আঙুল দেখায় ঝড়ু।

ওতে?

দরকারি কাগজপত্র, দলিল, দস্তাবেজ...

দেখব—

একটা ড্রয়ার খুলে কাগজের পাহাড় দেখান সাহেব। দেয়ালে-টাঙানো ছবির দিকে তাকায় ঝড়ু। ওরা কে?

ওটা বুদ্ধদেব।

হাঁসটাকে আদর করছে কেন?

লেগেছে, তির ছুড়েছে কেউ।

ওটা কে?

ওটা রামকৃষ্ণ ঠাকুর।

হাত অমন করছে কেন?

ধ্যান করছেন, ধ্যানে অমন হয়।

তুমিও করো ধ্যান, করো, করো।

সিনহাসাহেবকে দাঁড়িয়ে চোখ আধবোজা করতে হয়, ডিঙি মেরে মেরে তাঁর হাতের মুদ্রা ঠিক করে দেবার চেষ্টা করে দিতে থাকে ঝড়ু। দোতলার বারান্দায় পৌঁছে তার আহ্লাদের সীমা থাকে না। দূরে বড়ো রাস্তার যানবাহনের ছবি একটুকরো দেখা যায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি পাঁচিল টপকে টপকে। ঝড়ু ঘোষণা করে, 'বিলেত দেখা যাচ্ছে।'

মোয়ারটা এবার চলছে। একটু মোবিল দরকার ছিল। দিতেই সরসর করে চলছে। দুজনে মিলে লনটা পরিষ্কার করে ফেললেন। যতক্ষণ না রোদ বুকে ওঠে ততক্ষণ একখানা বই কিংবা ম্যাগাজিন নিয়ে এখন লনে বসে থাকা যাবে। ঝড়ুটা ততক্ষণ করুক না হুটোপাটি। চাকা নিয়ে, বল নিয়ে, কিংবা নিছক নিজেকে নিয়ে, একটা ছানা বেড়ালের মতো!

এবং এ ভাবেই তাঁকে দেখে, অবাকতর অবাকতম হয়ে আবিষ্কার করে জগদীশ বেয়ারা। হাতে বাকসো, পরনে হেঁটো ধুতি, পিরান, আর ঘুঘু রঙের গরম চাদর, জগদীশ ফিরে আসছে। গলিতে ঢুকতেই অন্ধ গলির শেষে গেট দেখা যায়। গেটের ফাঁক দিয়ে দিয়ে উপচে পড়ে বনের সবুজ, সেগুন কাঠের পাট পাট দরজা। মাথায় রঙিন কাচের আলপনা। জগদীশ দেখে ছাঁটা ঘাসের ওপর ক্যাম্প চেয়ার পাতা, ঢোলা পাজামা, গরম পাঞ্জাবি পরে, কাশ্মীরি শাল লুটিয়ে, মুখে সিগারেট, বইয়ের পাতা উলটোচ্ছেন সিনহাসাহেব। পাকা চুলের কেশর, ঘাড় অবধি পড়ে কুঁকড়ে উঠেছে, কিন্তু ক্ষৌরি করেছেন। বেশ জলুসঅলা বুড়ো। পাকা আমটির মতো হয়তো নয়, তবে পাকা পেয়ারাটির মতো নির্যাস। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে এল জগদীশ।

কেমন আছেন?

যেমন দেখছিস। দেশঘরের যত্ন আত্তি খাওয়া হল?

তা হল, —পায়ের কাছটিতে বাকসো আর থলে নামিয়ে বসে পড়ে জগদীশ, কুক-কাম-বেয়ারা-কাম-মালি। বুড়ো, কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে এখনও।

ফিরলি যে?

'ও মা যাব কোতায়? আর মন টেকে? লনের ঘাস কে ছাঁটল?'—অবাক অবাক, খুশি-খুশি গলা।

এদিক ওদিক তাকালেন সিনহাসাহেব।

ঝড়ু আর আমি।

কে ডাকল, রাজির মা?

কাকে?

ওই ঝড়ু মিস্তরিকে?

দূর—মিস্তিরি-ফিস্তিরি নয়, ও একটা ছোট্ট ছেলে, আমার কাছে থাকে। এই তো, ঝড়ু-উ, ঝড়ো-ও কোথায় গেলি?

এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝড়ুকে তিনি দেখতে পেলেন না।

এই তো এখানে খেলছিল। দেখ দিকিনি, দেখ। এগিয়ে গিয়ে দেখ।

কিছুক্ষণ পর জগদীশ ফিরে এল।

সারা বাড়ি ঘুরে দেখে এলুম। ছোটো ছেলে-ফেলে কোথাও নেই।

বলিস কি রে?

ছড়িটি পাশে শোয়ানো। তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকেন সিনহাসাহেব।

ঝড়ু-উ-উ। ঝড়ো-ও-ও-ও।

বাগানের এক কোণে তার জামা ইজের শুকোচ্ছিল, নেই। চাকা গড়িয়ে খেলছিল বারান্দায়, দাগটুকুও যেন কে সযত্নে পুঁছে নিয়েছে।

জগদীশকে সঙ্গে করে দোতলার আনাচকানাচও খুঁজে এলেন সিনহাসাহেব। সব ঘর খুলে খাটের তলা, আলমারির পেছন দেখে এলেন।

ঝড়ু একটা সাবানের বলের মতো উবে গেছে।

জগদীশ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। বললে, 'স্বপন দেখেছেন।'

ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভালো করে রাগ করতেও ভুলে যান সাহেব, ভাবিত গলায় বলেন, 'তোকে দেখে ভয় পেয়েছে, ব্যাটা বুড়ো ভাম...'

তারপর আবার দুশ্চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসে—রাস্তায় বেরিয়ে যায়নি তো? গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তা...

ভীষণ সন্দিগ্ধ চোখ সাহেবের দিকে চেয়ে থাকে জগদীশ। চেয়েই থাকে। কিন্তু রাজির মা এসে যখন সাহেবের কথায় সায় দেয়?

দুধের ছেলে গা। পুঁটুলি নিয়ে এয়েছিল, কেমন সাজানা পুঁটুলি গা! যেন মা নিজে সাজিয়ে দিয়েছে। ভাত খেতে চাইলে, আমি রেঁধে দিই। সায়েব তাকে নিয়ে কত খেলা খেলেন, কত বাজনা শোনান, এটা কী ওটা কেন, ওমা! ক-দিন ঘরদোর মাত করে রেখেছিল যে! স্বপ্ন হবে কেন?

জগদীশ ভালো করে সব শুনল, বলল, 'তা হলে ভূত। ভূতে পেয়েছিল তোদের।'

ওমা কী অলুক্ষুণে কথা! —রাজির মা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে গেল।

তখন জগদীশ দোতলার বারান্দার গ্রিল, সিঁড়ির, খিড়কির কোল্যাপসিবল সব লাগায়, তালা

টেনে-টুনে দেখে। রোদ চড়তে না চড়তে সে উদ্‌ভ্রান্ত সাহেবকে বারান্দায় তোলে, সব বন্ধ ছন্দ করে দেয় বেলাবেলি। বিমূঢ় সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, 'খুব সময়ে এসে পড়েচি যা হোক।'

ক্রমে বেলা গড়ায়, মেঝের কাচ-ঠিকরোনো আলোর ছায়া নাচে, চান হয়, লাঞ্চ হয়, দুপুরের এক টিপ ঘুম তাও হয়ে যায়। সন্ধেবেলা বোতল গেলাস সব সাজসরঞ্জাম রোজ দিনের মতো বার করতে যায় জগদীশ বেয়ারা। হাত নেড়ে না করেন সাহেব। পিয়ানোয় গিয়ে বসেন। অপটু হাতে পিয়ানোয় বিঠোফনের ঝড় তোলেন। অবশেষে নিত্যকার পাঁউরুটি-দুধের ডায়াবিটিক বরাদ্দ গলাধঃকরণ করবার পর শুতে যাবার সময় হয়। অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করবার পর বৃষ্টি আসার মতো ঘুম আসতে থাকে ঝরকে ঝরকে। কোথাও কি কেউ কাঁদছে? ছোটো ছেলের কান্নার আওয়াজ শুনে মাঝ ঘুমে উঠে বসেন সিনহাসাহেব। উপবৃত্তাকার সব দালান বারান্দা পার হয়ে যান কান্নার খোঁজে। প্যাঁচানো প্যাঁচানো সিঁড়ি ওঠেন নামেন, মাঠের মতো অন্ধকার ছাদ, আগাছায় ছাওয়া বাগান সব পার হয়ে যান। কিছুতেই দিক ঠিক করে উঠতে পারেন না। শেষে না পেরেটেরে স্বপ্নের মধ্যে গুমরে গুমরে কাঁদেন। ছেলেমানুষের জন্যে বুড়ো মানুষের কান্না।

শতাব্দী এক্সপ্রেস

হ্যাঁরে বদ্যিনাথ, দাদা কি চলে গেছেন?

হ্যাঁ বউদি, এই তো মিনিট দশ হল।

মায়া রান্না করে খেতে দিয়েছে, বদ্যিনাথ চানের জল দিয়েছে। সে চলে গেছে। ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা। তাকে এত কামড়ায় কেন? সে তো এমনটাই চেয়েছিল। ভালো তত্ত্বাবধায়ক সে, সবাই বলে, সে নিজেও জানে। গুছোনো পরিচ্ছন্ন সংসার। এদিকের জিনিস ওদিক হতে পায় না। আলমারির পাল্লা খুললেই হ্যাঙারে পরপর শার্ট প্যান্ট ঝুলছে, বার করে নিক যেটা ইচ্ছে। বাথরুমের আয়না খুললেই দাড়ি কাটার সরঞ্জাম পরপর। র‍্যাকে পাটভাঙা তোয়ালে। জুতোর র‍্যাকে চকচকে জুতো। খেতে বসার দু মিনিট আগে টেবিলে তিন পদ রান্না সাজানো, যা চাও তাই। ঘি খাবে না মাখন খাবে? বেশ তাই। রোজ নয়? মাঝে মাঝে? ঠিক আছে, সপ্তাহে একদিন কি দুদিন। নিমপাতা ভাজা আলু দিয়ে মেখে একদিন, বেগুন দিয়ে একদিন? একদিন নিমঝোল? ঠিক আছে। মাছ গরম গরম ভাজাটাই সকালে ভালো লাগে? সব দিন ভাত নয়? অর্ধেক দিন রুটি! তবু যদি মন না ওঠে? ঠিক এই সময়টাই যে আমার চানের সময় স্বরূপ, নইলে চুল শুকোবে না। চুল না ভিজোলে বড়ো মাথা ধরে। ভিজে চুল নিয়ে বেরোবার প্রশ্ন নেই। তবে কি চুলটাই কেটে ফেলব! ডান হাতে যেন নাচের মুদ্রা করে পেছনের চুলের গোছা সামনে আনল শাওনি। খানিকটা কেটে ফেলেছে। কিন্তু যা আছে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে বেশ সচেতন সে। যতখানি সম্ভব যত্ন নেয়। এই চুল কেটে ন্যাড়া বোঁচা? আজকাল অর্ধেক মেয়েই এরকমই। সেই জন্যেই আরও জেদ তার। চলতি ফ্যাশনের পেছনে সে ছোটে না। তার হল স্টাইল—এমনই একটা ধারণা তার আছে। খুব অমূলক কি? ছোটো চুলেরাই তো উচ্ছ্বসিত হয়, 'ইস শাওনিদি, কী সুন্দর তোমার চুল! দেখলে হিংসে হয়।'

হিংসে হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিজেরাও রাখতে পারতে অনায়াসেই। ফ্যাশন করবার জন্যেই মাথা মুড়িয়েছ।

আজকাল সব দরকারের ফ্যাশন, সুবিধের—তা জানো তো শাওনিদি? চুল ছোটো হতে হতে আর আছেটা কী? সামনেটাই একটু ঝাঁপালো। পেছনটা তো টিকটিকির ল্যাজ। তা ছাড়া বিচ্ছিরি কোঁকড়া?

বিচ্ছিরি কোঁকড়া? কী যে বলো? কোঁকড়া চুল দেখতে তো পাগল হয়ে যেতাম আমরা। ন্যাচারাল কার্লস! তার তুলনা আছে?

ধ্যাৎ, একরকম, সব সময়ে মাথাটা একরকমের দেখাতে থাকবে। বোরিং টু দা পাওয়ার ইনফিনিটি। ভালো হল সোজা চুল, বা সামান্য ওয়েভি। তোমারটায় সেই সামান্য ওয়েভ আছে। চুলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই মুগ্ধ পুরুষের সময় কেটে যাবে। ....

এইবারে কঠিন হয়ে যায় শাওনির ঠোঁটের রেখা। চোখের পাতা। চোয়াল চিবুক। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। কী লাভ! পুরুষ! পুরুষ! পুরুষ! সবাই যে যেখানে আছে ঠারেঠোরে

বলে যাচ্ছে পুরুষের মনোযোগই মেয়েদের সব, পুরুষ একবার তাকালে মেয়েরা কৃত-কৃতার্থ হয়ে যাবে। বিজ্ঞাপন বলছে, সিনেমা বলছে, লোভনীয় মোহনীয় চিত্রভাষ্যে বলে যাচ্ছে। পুরুষেরও নারীর মনোযোগই কাম্য, টেক্সটাইল কোম্পানি, মদ বিক্রেতা এরা সে কথাও বলছে। হোক সে নারী ডাক-মেয়ে, পার্টি-প্রজাপতির ছদ্মবেশে পণ্যস্ত্রী। কিন্তু এই মনোযোগটা স-ব এমন কথা বলতে চাইলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কেউই গুরুত্ব দেবে না এমন ভাবনাকে। অথচ এই মেয়েগুলো! ত্রিশ-ছুঁই-ছুঁই কিংবা সবে-ত্রিশ-পার, যৌবন যাদের এখন কস্তুরী মৃগের মতো করে রেখে দেবার কথা! তারা কারণে অকারণে পুরুষের মনোযোগের কথা বলে। যদি না বলে তো ভাবে অন্তত পক্ষে। ডিসগাস্টিং।

কী হল শাওনিদি, রাগ করলে?

তোদের ওপর রাগ করে লাভ?

কেন, তুমি স্বরূপদার মনোযোগ চাও না?

স্বরূপদার মনোযোগ আর পুরুষের মনোযোগ এক হল?

আচ্ছা বেশ, তুমি পথ-চলতি পুরুষের প্রশংসার চাউনি চাও না? একটু অ্যাপ্রিসিয়েশন? একটু মুগ্ধতা? খুব খারাপ? সেটা? একটা সভা-সমিতি কি উৎসবে সাজগোজ করে গেছ, কেউ তোমার দিকে চাইল না, চোখ দিয়ে কেউ বলল না দাউ আর্ট বিউটিফুল, খুব খুশি হবে তুমি শাওনিদি? সত্যি কথা বলো তো?

তোরা মুড়ি-মুড়কির, রসবড়া-রসগোল্লার ডিফ্‌রেন্স করতে পারিস না, কী-ই বা বলব তোদের? তবু চেষ্টা করছি বোঝাতে, শুধু পুরুষ কেন, মেয়েরাও কি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে জানে না? তারা করলেও আমার তৃপ্তি। আর যে পুরুষ আমাকে ছেড়ে আমার চেহারার দিকে চেয়ে থাকবে, তাকে তোরা মুগ্ধই বলিস আর হ্যাংলাই বলিস সে আমার চোখে ছোটো হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে আমি আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে দুদণ্ড ভাবব কী ছিল সেই সাজগোজে যা আমার নিজেকে আড়াল করে দিল?

ওঃ শাওনিদি প্লিজ, ফিলজফিক্যাল কথাবার্তা বোলো না। তোমার রসবড়া-রসগোল্লার তফাত কজন ধরতে পারে গুনে দেখো তো।

আর বেশি কথা বলে না শাওনি। কী দরকার বাবা? এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে শাওনিকে নিয়ে হাসাহাসি ফাজলামি করবে হয়তো। কাউকে প্রভাবিত করবার নেত্রীসুলভ বা গুরুসুলভ ইচ্ছা বা ব্যক্তিত্ব কোনোটাই নেই তার। নিজের ধারণামতো নিজে চলতে পারলেই সে যথেষ্ট মনে করে। নিজে ..আর...আর... সে যাকে জীবনসঙ্গী বলে পছন্দ করেছে, যে তাকে জীবনসঙ্গী বলে পছন্দ করেছে। পারস্পরিকতায় সে স্বীকৃত, সেই সে যদি তার ধারণাগুলোকে মান দেয় তাতেই সে খুশি থাকবে বর্তে যাবে। আর কী চাওয়ার আছে জীবনে? একখানা ফ্রস্টফ্রি রেফ্রিজারেটর, একটা চার চাকার যান, একটা কাপড়কাচা কল, একটি বিদেশি প্রযুক্তির টেলিভিশন সেট এগুলো তো ঠিক চাওয়ার জিনিস নয় জীবনে। এগুলো জীবনযাত্রার উপকরণ। যে মনে করে লাগবে, না হলেই চলবে না, তার কাছে উপকরণ হিসেবে এগুলোর দাম বেশি। যার মনে হয় না হলে চলে যায়, তার কাছে এগুলো অবান্তর। শেফালি সমাদ্দার বলে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার একবার মধ্যপ্রদেশ বেড়াতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। তিনি জ্যোৎস্নারাতে নর্মদাবক্ষ থেকে মার্বলরকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বলে উঠেছিলেন, 'খুব সুন্দর, না মিসেস সরকার? কিন্তু জীবনের উচ্চাশার কতটা এর জন্যে স্যাক্রিফাইস করেছি, তা জানেন?'

'কতটা?'—চোখ মার্বলরকে গচ্ছিত রেখে শাওনি আলগা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

বোনচায়নার একটা ডিনার সেট, কমপ্লিট উইথ কাটলারি। অবশ্যই রূপোর। সেটটা বিদেশি। উফফ—ভাবলে ভেতরটা যেন কেমন হয়ে যায়। হল না। মেয়ে, আমার ওই হাইস্কুলে-পড়া মেয়ে জব্বলপুর আসবেই। আসতে হবেই। আরে, ধৈর্য ধরে স্টার টিভিটা দ্যাখনা, কত প্রোগ্রাম করছে আজকাল দেশ-বিদেশের ওপর। না, যাবই। লাইভ দেখব। তা দ্যাখ, জোছনাও প্রতি শুক্লপক্ষে ঝরছে, আর মার্বলরকেরও পাখা নেই। যে কোনো সময়ে দেখা যাবে। চার বছর পরে বিয়ে লাগিয়ে দেব, হনিমুনে যাস না হয়। কিন্তু অমন ড্রেসডেন চায়না? আর কি পাব?

শাওনির মনে হল ভদ্রমহিলা যে ফোঁস করে নিশ্বাসটা ফেললেন সেটা গাড়ির একজস্ট দিয়ে বেরনো কালো কার্বন মনোক্সাইডের মতো। নর্মদার জোছনাকে কালো করে দিচ্ছে। সুজিত বলে এক বন্ধু আছে শাওনির। খুব ভগবানে বিশ্বাস করে। সে প্রতিদিন ঘুমোতে যাবার সময়ে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, আমার যেন একটা ফোর হুইলার হয়।

সুজিত-টুজিতের কথা বলে লাভ কী? খোদ শাওনির ঘরেই এই জাতীয় একজন মজুত আছে। প্রোমোশনের সঙ্গেই আসল গাঁটছড়াটা বেঁধেছে মনে হয়। বারো বছর আগে যখন ঘর বেঁধেছিল? মনে হয়েছিল...না, মনে হওয়ার কথা ভেবে কোনও লাভ নেই। মনে হওয়া জিনিসটা এত ব্যক্তিগত যে তার ওপর নির্ভর করে জীবনের কিছুই চলে না। কিন্তু...কত কোমল ছিল তখন স্বরূপের মুখ। কত ভাবুক ছিল তার চাউনি। কত আদর ছিল দু হাতে। সুবিচার ছিল ব্যবহারে। স্বরূপ তখন শাওনিকে তার প্রিয় বন্ধু ভাবত। এখন? এখন ভাবে না। শাওনির সম্পর্কে ভাববার তার সময় নেই। যদি বা ভাবে তাহলে শাওনি এখন তার স্ত্রী। ঘরনি-গৃহিণী। খুব খারাপ লাগে খারাপ কথা বলতে, ভাবতে কিন্তু...কিন্তু শাওনি এখন স্বরূপের মেয়েমানুষও কি?

একটা সীমাহীন অন্ধকারে ভরে যেতে থাকে ভেতরটা। অন্ধকার, গ্লানি। শিক্ষা...বুদ্ধি...সতর্কতা...ভালোবাসা কিছুই শেষপর্যন্ত কাজে লাগে না জীবনে। তারা কি পরস্পরকে বোঝেনি? সে আর স্বরূপ? দুজন প্রাপ্তবয়স্ক, ডিগ্রিধারী, চাকুরিপ্রাপ্ত যুবক যুবতি? স্বরূপ বলেছিল, 'তোমাকে আমি সুখে রাখব, শাওনি। তুমি আমাকে প্রেমে রেখো।'

'আর তুমি? তোমার বুঝি আমাকে প্রেম দিতে লাগবে না?'—শাওনি হাসছিল। কত বিশ্বাস তখন জীবনে।

'প্রেম প্রথম শাওনি, তারপর সুখ।'

'আমিও তোমাকে সুখে রাখব। দুধে-ভাতে।' এই দেওয়া কথার অর্ধেকটা তারা রেখেছে। পরস্পরকে তারা সুখ দিয়েছে।

স্বরূপ প্রথম দিল টেলিভিশন সেট। দামি। রঙিন। তারপর দিল ফ্রিজ। প্রশস্ত, দু-কপাট, সুন্দর। তারপরে দিল ভি.সি.পি। তারপরে একটা চমৎকার সাততলার ফ্ল্যাট। তারপর তেজি স্কুটার। মিক্সি, মাইক্রোওয়েভ আভেন, ওয়াটার পিউরিফায়ার, ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন...শাওনি? শাওনি দিয়েছে পুষ্টিকর, রুচিকর, নিত্য নতুন খাদ্য, ধবধবে জামাকাপড় হাতের কাছে, মুখের কাছে চা, কফি, মশলা, চকচকে জুতো, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের জন্য আপ্যায়ন, ইদানীং দিচ্ছে ড্রিংকস নরম এবং কড়া। দিচ্ছে না শুধু যান্ত্রিকভাবে নিজেকে। স্বরূপ বুঝতে চায় না প্রাণের টানে, প্রেমের টানে যে চাওয়া, সে চাওয়া চাইতে পারলেই শাওনি আছে। আছে নিবিড়, ভরাট অথই দিঘির জলের মতো, আছে উর্বরী মৃত্তিকার পেলব অভ্যন্তরের মতো, অনন্ত কুয়োর জলে পড়ে থাকা চাঁদের মতো।

সম্ভবত এসব আর চায় না স্বরূপ। তার বড্ড তাড়া। তা ছাড়া সে জানে দাম দিলাম কিনলাম এনে ফেললাম। ব্যাস। আবার কী? এক জিনিস যেমন বার বার কেনার পরিশ্রম সয় না, এক

মানুষকেও তেমনি বার বার জয় করা লাভ করা এসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সে। ঠিক আছে। তাহলে বদ্যিনাথ চানের জল দিক, মায়া খেতে দিক, আলমারির পাল্লা খুললেই পরপর শার্ট, ট্রাউজার্স টাই, র‍্যাকে ব্রাউন, র‍্যাকে কালো জুতো পালিশে নিশপিশ করছে। তা ছাড়া এ তো কোনো প্রতিশোধ নয়। এটা একটা সুবিধের বন্দোবস্ত। এর মধ্যে শাওনির কোনো রাগ নেই। এমন নয়, সে লোকজনের হাতে স্বরূপকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। এ একটা আবশ্যিক ব্যবস্থা। সে-ও তো একটা চাকরি করে। প্রোমোশনে প্রোমোশনে ছয়লাপ না হলেও ভালোই চাকরি। সৃষ্টিসুন্দব, সন্তোষজনক। এ নিয়ে স্বরূপের সঙ্গে তার কোনো প্রতিযোগিতা নেই। স্বরূপ হয়তো বলতে পারে—তোমার বেরোবার সময় বরাবর একই ছিল। আমারও। তখন তুমি আমার সঙ্গে খেয়ে নিতে। মাঝে মাঝে যেমন বেণী তেমনি রবে-র অত্যাচার তোমার সইত। তুমি চুল ভিজোতে না। তা হলে? কিন্তু এ কথা বলার অধিকার কি স্বরূপের আছে আর? অধিকার তো আলাদা কথা, মানসিকতা? মানসিকতা আছে তার এ কথা বলার? যদি বলে তবে সেটা হবে না কি চূড়ান্ত হিপক্রিসি।

সে কি বলে না শনিবার ব্যান্ডেল লোকাল ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়ার সেই আনন্দ একটা অপ্রয়োজনীয় রোমান্টিক ভাববিলাস! শনিবার তাকে হিতেশের বাড়ি ছুটতে হবে। হিতেশের একটা পি. সি. আছে বলে। বহু কাজ, বহু কাজ এখন দুজনে মিলে করবে। ডিগ্রিতে যা নেই, কাজের আগ্রহে, দক্ষতায় তা পুষিয়ে দিতে হবে তাকে। হবেই। নইলে নেক্সট প্রোমোশন ফসকে যাবে।

এদিকে সুসময় যে ফসকে যাচ্ছে। জীবন যে ফসকে যাচ্ছে সে চেতনা ওর আর নেই। সন্তান ও চায় না। একদম গোড়ার দিকেই বলে দিয়েছিল বাচ্চাকাচ্চা ও সব ভুলভাল ব্যাপার। সেটাতেই এখনও সেঁটে আছে ও।

শাওনি অবশ্য বাচ্চা না থাকাটা বা থাকাটাকে তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা ইস্যু করে তুলতে চায়নি কখনও। পত্রিকাটা হোক ছোটো। তবু তার সহ-সম্পাদিকার কাজটার মধ্যে তাব মনে এমন একটা মুক্তি সে এখনও পায় যে নিজেকে সার্থক মনে করতে অসুবিধে হয় না। বাড়িতে দুজনেই চাকরি করলে বাচ্চা আনাটা বাচ্চার প্রতি অবিচার এই ধারণাটাও ছিল তার খুবই শক্তিশালী। নিজের ছোটোবেলাব কথা স্মরণ করে। তবু তো তার মা কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। দশটা পাঁচটা নয়! কিন্তু যতক্ষণ বাড়িতে একা, লোকের কাছে ততক্ষণ সে যে কী অসহায়বোধ! স্কুলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যদি বা সেটা কাটত, বাড়ি ফিরে মা-হীন বাবা-হীন বাড়িতে ঢোকবার কথা মনে হলেই গা ছমছম করত। শাওনি চায়নি আর কোনো বাচ্চা তার মতো কষ্ট পাক। তারপর স্বরূপ? স্বরূপের এই চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি তাকে বাবা হবার অধিকারচ্যুত করেছে। একেবারে নিশ্চিতভাবে। পাঁচ বছরের শাওনির ধুন্ধুমার জ্বর, ডাক্তার সন্দেহ করেছেন এনকেফেলাইটিস। বাবা ট্যুরে। সাতদিনের আগে আসবেন না। বেশিও হতে পারে। দুপুর রাত। একটা লোক নেই। টেলিফোন ডেড। মা পাশে জলের গ্লাস রেখে বাড়ি চাবি দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাক্তারের বাড়ি ছুটে যাচ্ছে. সেই ঘটনার আর কি পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত তার জীবনে?

চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাচ্চার জন্যে প্রস্তুত হতে পারত সে। কিংবা বাচ্চা জন্মাবার পর অসুবিধে বুঝে চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু স্বরূপ-শাওনি সরকারের বাচ্চা না হলেও ভারতবর্ষের চলে যাবে—খাবার একটা মুখ, চাকরির একটা উমেদার কম থাকবে এটা যেমন শাওনি ভুলতে পারে না, তেমনই ভোলে না সন্তান তাকে পূর্ণতা দেবেই এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। তার অধ্যাপিকা মা, সেলসম্যান বাবা তো দৌড়োদৌড়ি করে তাকে মানুষ করেছেন, কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে পঞ্চান্ন বছরের পরিশ্রমজীর্ণ মাকে কি তার বুড়ো মনে হত না? মনে হত না মা গত যুগের

মানুষ, ক্রমেই রক্ষণশীল হয়ে যাচ্ছে, স্বরূপকে মায়ের তেমন পছন্দ হয়নি বলে সে কি মায়ের ওপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেনি? বাবা গত হয়েছেন, মা একলা এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকতেন শেষটায়। যেত, মাঝে মাঝেই যেত, কিন্তু তাদের দুজনের সংসারে কি মাকে ঠাঁই দিতে কখনও ডেকেছে। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি থাকা ভালো না, স্বরূপের এই নীতিতে কি সে সায় দেয়নি? আর স্বরূপের ব্যাপার তো আরও খারাপ! স্বরূপের বাবা-মা দুজনেই জীবিত। এই শহরেরই প্রান্তে থাকেন, ভাইঝির বাড়ির একতলায়। স্বরূপ সেই খুড়তুতো দিদি জামাইবাবুর ওপর মা-বাবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। টাকা-পয়সা পর্যন্ত দেয় না। বাবা-মার তো যা হোক কিছু সঞ্চয় আছে, পেনশন আছে, কী দরকার! যেন দরকারই সব। দরকারের ওপরে কিছু নেই। বিশেষ বিশেষ সময়ে মনে করে উপহার, স্বরূপের মনেও থাকে না। সে তো শাওনিই দেয়।

অবশ্য এসব কথা তার সম্প্রতি মনে হয়। বিবাহের বারো বছর পর। শ্বশুর-শাশুড়ি এখন দূর গ্রহের মানুষ। নিজের মা মরে বেঁচেছেন। ছেলেমেয়েদের থেকে তাঁদের কিছু পাওয়া হয়নি এগুলো এখন, আজকাল মাঝে মাঝে জ্বলন্ত লোহার ছ্যাঁকার মতো বুকের মাঝখানে লাগে। জ্বলতে থাকে বুকটা। এসব ভুলের ক্ষমা নেই। শুধরে নেওয়ার উপায় নেই। সে শুধু বুঝতে পারে ছেলেমেয়ে তাকে পূর্ণ করবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। নতুন কোনো ব্যথা-বেদনার উৎস তৈরি করে কী লাভ! উপরন্তু স্বরূপের সাধা, ইচ্ছে, স্বরূপের সঙ্গে সম্পর্কের চরিত্র এগুলোর ওপর তার বিশ্বাস খুব পোক্ত নয়, এটা সে বুঝতে পারে। আর স্বরূপ বোধহয় এখনও তার নিজের মানসিকতার স্থির। বাচ্চাকাচ্চা ও সব ভুলভাল ব্যাপার।

অফিসে বেরোবার সময়ে বলে বেরোও না কেন? কথাটা বলেই শাওনির মনে হল সে ভুল করল। জিজ্ঞাসার ফ্রেমে না রেখে অন্যভাবে বলা যেত কথাটা। বলে বেরোলে পারো—এটা বললেই ভালো হত। সোজাসুজি জিজ্ঞাসাটা যেন একটা দ্বৈত সমরে আহ্বান।

'বলেই তো বেরোই।' —স্বরূপ টি.ভি-র পর্দায় চোখ রেখে বলল। সিগারেটটা মুখের একপাশে চালান দিয়ে।

কখন আবার বলো?

চান করলুম, জামাকাপড় পরলুম, খেলুম, জুতো পরলুম—বলা আবার কেমন হবে? ... যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর, যেমন কর্ম তেমন ফল—শাওনি ভাবল। পত্রিকাটার পাতায় তার চোখ, কিন্তু সে কিছুই পড়ছে না।

চুমু-টুমুও খেতে হবে না কি—পার্টিং কিস?

আপাদমস্তক রাগে লাল হয়ে গেল শাওনি। এত তিক্ততা? এতটা সিনিক এই লোকটা? বারান্দায় দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে এল; শীত শীত লাগল। পাখা বন্ধ করে দিল। খুবই স্পষ্ট যে সে আঘাত পেয়েছে। কিন্তু স্বরূপ সরকার একবারও ডাকল না, একবারও এল না, বারান্দায় বা ঘরে। নিজের ভঙ্গি বদল করল না। ঠিক যেমনভাবে সিগারেট হাতে-মুখে টি.ভি দেখছিল ঠিক তেমনভাবেই দেখতে লাগল। জঘন্য-জঘন্য বিজ্ঞাপন, তাদের অসম্ভব রূপকথাসদৃশ সুখের প্রলোভন। আদিখ্যেতা এবং মাঝে মাঝে যতিচিহ্নের মতো সিরিয়াল, নতুন বোতলে পুরনো মদ। একই, সেই একই একঘেয়ে আখ্যান, একই চরিত্র, একই চরিত্রহীনতা।

খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কোনোরকম দেখানেপনা তার অসহ্য। তাই সে উঠল। চোখে-মুখে জল দিল। অভ্যস্ত যত্নে খাবার পরিবেশন করল। তারপর রোজকার মতো দুখানা রুটিকে আট টুকরো করল দুহাতে ছিঁড়ে। চারটে টুকরো দুধের বাটিতে ফেলল। আর চারটে টুকরো আলুকপির ছেঁচকি দিয়ে মুড়ে মুখে পুরতে লাগল একের পর এক, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু খাবারে

তার কোনো স্বাদ লাগল না। ডাল নেবে কি না, মাছের কোন্ টুকরোটা তাকে দেওয়া হবে— এই সব টুকটাক প্রশ্নও সে রোজকার আলগা ভঙ্গিতে করল তার বরকে। কিন্তু তাতে ছিল না কোনো অন্তরঙ্গতা, না কোনো প্রাণ।

রাতে শুতে যাবার সময়ে সে ইচ্ছে করে অনেক দেরি করল। পড়ার ঘরে পত্রিকা স্তূপীকৃত হয়েছে। খাবারের কাগজগুলোর রবিবারের পাতা। একটার পর একটা খুলে সে পড়তে লাগল দাগিয়ে দাগিয়ে। এটা তার দরকার হয়। একটা ডায়েরির পাতায় সামান্য কিছু নোটও করল সে। ঘড়িতে একটা বাজতে তার খেয়াল হল। দুজনের একমাত্র শোবার ঘরে গিয়ে দেখল সবুজ আলোয় মাখামাখি হয়ে স্বরূপ ঘুমোচ্ছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যেও এইভাবেই প্রথম বিচ্ছেদ সম্ভব করল শাওনি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কোটি-কোটি দম্পতি হয়তো এভাবেই থাকে, এভাবেই সম্ভব করে এসব। অন্তত এতকাল করেছে ভারতের মতো দেশে। সম্প্রতি আর করতে চাইছে না। উপায় বেরিয়েছে কিছু। একবিংশতিতে হয়তো আর কেউই এসব সহ্য করতে চাইবে না। বিশেষত সন্তানের দায় না থাকলে।

স্বরূপ বদলে গেছে। খুব বদলে গেছে। আগেকার প্রতিজ্ঞা সংকল্প এসব আর তাকে মনে করিয়ে কোনো লাভ নেই। সেভাবে আর ওর মনে পড়বেও না। কতকগুলো কথা মনে পড়াই তো আর মনে-পড়া নয়। তার পেছনে বা তার সঙ্গে যে আবেগ থাকে, অনুভূতির যে জটিল ঐশ্বর্য থাকে সেগুলোও মনে পড়তে হবে। নইলে নিতান্ত নিছক কতকগুলো কথার স্মৃতিতে বিশেষ কিছু নেই।

সে? সেও কি বদলেছে? বদলেছে বইকি? পঁচিশ বছর আটত্রিশ হয়েছে। সে স্থির হয়েছে। হৃদয়ের কথা বলবার সেই ব্যাকুলতা তাকে ছেড়ে গেছে। প্রেম? আগে না পেলেও দিতে পারত। উপছে পড়ত অতিরিক্তটুকু। উপছে-পড়ার আনন্দে মাতোয়ালা থাকত। কড়ায়-গন্ডায় ফেরত পেলে কি না গ্রাহ্যই করত না। এখন করে। না পেলে আর দিতে ইচ্ছে করে না। এমন নয় যে তার হাতের অঞ্জলিতে প্রেম ভরা আছে, সে মুঠি বন্ধ করে রাখছে। আসল কথাটা হল, উসকে না দিলে প্রেম আর জন্মাচ্ছে না। ঠান্ডা জল জমা রয়েছে বুকে। তাকে তোমার উত্তাপে তাপিত করো তবে সে টগবগ করে ফুটবে, আর তখনই জন্ম হবে সেই রঙিন বাষ্পের। অধরা-মাধুর্যময়, বায়বীয় তবু বুকের মানিক, নয়নের নিধি সেই ভালোবাসা।

ভালোবাসা কী? ভাবে আজকাল শাওনি। কী সে জিনিসটা? ভাবটা? সত্যিই ভাব তো? বিশুদ্ধ, বিমূর্ত? পাত্র-ব্যতিরেকে সে থাকে? এই যে সে ভেবেছিল স্বরূপকে না হলে তার চলবে না, এটা তো ভুল। স্বরূপ কিংবা অরূপ কিংবা বিশ্বরূপ যে-ই হোক না কেন, তার রুচির পরিধির মধ্যে থাকলে বাকি ঘটনাগুলো পর পরই ঘটত। এখন তো স্বরূপের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই তার জীবনে। স্বরূপের জীবনে শাওনিরই বা তাৎপর্য কী? কিচ্ছু না! কিচ্ছু না! ভালোবাসা কি যৌবনেরই ধর্ম, আরও পরিষ্কার গদ্য করে বলতে গেলে শরীর রসায়ন? হরমোন-সম্ভব? স্বরূপের হরমোনেরা কি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে, মাত্র এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে? শাওনির হরমোনেরা কি বিরূপ? বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাবে না কি তারা? প্রেমের জন্যে? গেলেই ডাক্তার জিজ্ঞেস করবেন, 'নর্ম্যাল লাইফ লিড করছেন তো?'

উত্তরে বলতে হবে, না, মানে হ্যাঁ। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার কোনো অভাব নেই। স্বরূপের তো নয়ই। সে একটা রোবোট-মানুষের মতো কলকবজা নাড়ে। শাওনিরও নেই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে তার স্বরূপের আগেকার রূপ, আগেকার চেহারা মনে করতে হয়।

স্বরূপ, স্বরূপ তুমি অমন করে চেয়ো না।

তুমি অমন করে এলে কেন? নি! নি! তুমি কী পরেছ? কি করেছ আজ?

কই বিশেষ কিছু তো পরিনি, কিছুই করিনি।

তাহলে? তাহলে আমার ভেতর-অন্দর থেকেই যদি অমন চাউনি উঠে আসে...

কী দেখছ তুমি? কী দেখতে পাচ্ছ?

নি, আমার বলবার শক্তি নেই। এক প্রবল অনুভূতির তোড়ে সব হারিয়ে গেছে, সব ঘুরছে।

কালবৈশাখীর মতো?

অনেকটা। অনেকটা...হোল্ড ইয়োর ট্যাং ওহ ফর গডস্ সেক...

কতদিন স্বরূপ তাকে 'নি' বলে ডাকে না। ডাকলেও বোধহয় ন্যাকা-ন্যাকা শোনাবে এখন। টাং হোল্ড করতে অবশ্য এখনও বলে। বলে কর্কশ, রূঢ় গলায়। আমি চলে যাব—ভেতর থেকে একটা স্বতঃস্ফূর্ত কান্নার মতো উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এলো কথাগুলো। 'আমি চলে যাব।' কাকে বলল শাওনি? স্বরূপ তো সামনে নেই! সে এখন দিল্লি গেছে। কিন্তু এই ঘরে, বাড়িতে স্বরূপ আছে। আছে দেয়ালে, জানলায়, কড়িকাঠে, আছে আলমারিতে, ছবিতে, শয্যায়, চেয়ারে, টেবিলে, সোফায়, মোড়ায়। আলমারির পাল্লা খুলে সারি-সারি ঝুলন্ত পোশাকগুলোকে শাওনি বলল, 'চলে যাব।' টেবিলের ড্রয়ার খুলে তাড়া-তাড়া কাগজপত্র নাড়তে চাড়তে বলে উঠল, 'যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি শিগগিরিই।' চান করতে করতে শাওয়ার খুলে, উর্ধ্বমুখে জলের তরল আঘাত নিতে নিতে। জোরালো গলায়, চারণ কবি মুকুন্দদাসের কিংবা নজরুলের দেশপ্রেমমূলক গানের প্রদীপ্ত সুরে বলে উঠল,

> যাব, আমি চলে যাব। যাচ্ছি আমি যাচ্ছি চলে, সকল ফেলে সকল ভুলে, যাব যাব, সব হারাব, ফিরব না আর ফিরব না গো, যাবই যাব।

চান সেরে বেরিয়ে, শাড়ি পরতে পরতে, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, শূন্য ঘরে ঘুরতে ঘুরতে, অন্যমনস্কভাবে ভাত খেতে খেতে শাওনি দেখল, বা বুঝল এই বাড়ির সর্বত্র যেমন স্বরূপ আছে, তেমনই সে-ও আছে। কোণে কোণে। ছবিতে, শয্যায়, চেয়ারে, টেবিলে, সোফায়, মোড়ায়, জানলায়, দরজায়, পর্দায়, পাপোশে...সর্বত্র। শাওনিকে 'চলে যাব' বলতে তার গলা আটকে গেল। ফিসফিসানির বেশি উঠল না গলাটা।

কিন্তু এমনই ভেতরে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছিল সে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা শাওনির মুখোমুখি হবার জন্য, যে মিনিবাসে অফিস যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'যাব।' একটু পরে আরও জোর গলায়। পাশের ভদ্রলোক চমকে ফিরে তাকালেন। একটু গুটিসুটি মেরে বসলেন। একটু সংযত সতর্ক হয়ে গেল সে। কিন্তু লজ্জা পেল না। মানুষ যখন তার জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোর মোকাবিলা করে তখন লজ্জা-সংকোচ এসব অতি তুচ্ছ মনে হয়। কী এসে যায় মিনিবাসের সহযাত্রী যদি তাকে ছিটগ্রস্ত ভাবেন? কিচ্ছু না।

ক'-দিন ধরেই রাস্তা পার হচ্ছিল সে যান্ত্রিক অভ্যাসে। লাল আলো, হলুদ আলো, সবুজ আলো সমস্তই চেতনার ভেতরে জ্বলে, নেভে। ধাবমান, গর্জমান যান-মিছিল পার হয়ে, অফিসের দরজায় পৌঁছে চড়াৎ করে সে জ্ঞানে ফিরে আসে। সে কী? কখন সে রাস্তা পেরোল? বাস থেকে ঠিকঠাক স্টপে নামল কী করে? কখন কীভাবে সবটাই তার অজ্ঞাতে ঘটে গেছে। হঠাৎ শিউরে ওঠে সে। যদি কোনো গাড়ি ওস্তাদ খেলুড়ের মতো তাকে হেড মারত? শূন্যে লাফিয়ে উঠে ফুটপাথের শানে কিংবা অন্য খেলুড়ে গাড়ির সামনে পেছনে, নাকে মাথায় আছড়ে পড়ত! না, না অমন সমাপ্তি সে চায় না। না, সতর্ক হতে হবে। অমন হারিয়ে গেলে চলবে না।

এই মেজাজেই কাঠের পার্টিশন-করা মাঝারি অফিসঘরে ঢুকে সে শুনল মালিক জয়ন্ত শেঠ বলছেন, 'না, না, মিসেস সরকারকে আমি এ প্রস্তাবটা দিতে পারি না। একে মহিলা, তার ম্যারেড।

হতেপারে একটা কাগজ চালাচ্ছি। তার মানে হৃদয়টাও কাগজের মতো হতে যাবে? সুবীর তুমি একটু ভাবো...'

'কী প্রস্তাব?' —শাওনি সতর্ক চড়া স্বরে বলল এগোতে এগোতে।

'কুপ্রস্তাব নয়, ঘাবড়াবেন না'—সুবীর বলল হেঁকে!

আজ পনেরো বছর স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সঙ্গে কাজ করছে, শাওনির এসব ইয়ার্কি গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিশেষত সুবীর ছেলেটা খুব ভালো, মজাদার। কিন্তু জয়ন্তবাবুর সামনে? এদের মাত্রাজ্ঞান আর কবে হবে?

জয়ন্তবাবু হাসলেনও না, কথাটা শুনেছেন বলেও জানতে দিলেন না। কেজো গলায় বললেন, 'আসলে উড়িষ্যাতে ছোট্ট করে একটা ব্রাঞ্চ খুলছি। লোক্যাল লোকই নেওয়া হবে. কিন্তু অভিজ্ঞ কারও যাওয়া দরকার। আপনার মতো। অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, এক্সপার্ট যাকে বলে। এই সব চ্যাংড়াদের কাজ নয়।'—সুবীর ইত্যাদির দিকে নজরটা ঝাঁটা বুলিয়ে নিলেন তিনি, 'কিন্তু আপনি ভাববেন না। আমরা ভাবছি। আরও ভাবছি।'

যাব। আমি যাব।

বলছেন কী মিসেস সরকার? অফকোর্স ইটস আ প্রোমোশন! অ্যালাউয়েন্স বাবদও ভালোই দেওয়া হবে। বাসস্থানের ব্যাপারে মহিলা গেলে আমরা একস্ট্রা কেয়ারও নেব। কিন্তু...এটা...মানে চট করে ফেরত আসতে পারবেন না।

যাচ্ছি, আমিই যাচ্ছি। প্লিজ ডু দ্য নিডফুল।

নিজের ছোটো কিউবিকলে ঢুকে গেল শাওনি।

'হোয়াট?'—আপাদমস্তক নাড়া খেয়ে চমকে থমকে বলে উঠল স্বরূপ।

প্রোমোশন। পুরোনো লোক নইলে নতুন ব্রাঞ্চ কে সামলাবে?

তাই বলে...আর কেউ ছিল না?...তুমি রাজি হয়ে গেলে?

কী করব? চাকরি... তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। এরা ওয়েল-ট্রেনড্। ঘাড়ে ধরে তাড়িয়ে না দিলে কাজ ছাড়বে না।

স্বরূপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বলল না। একটু পরে বলল, 'কতদিন লাগবে ব্রাঞ্চটা চালু করতে?'

শাওনি বুঝল ও ভেবেছে ব্যবস্থাটা সাময়িক। সে কিছু ভাঙল না। বলল, 'দেখা যাক।'

চুপচাপ টি.ভি দেখা। এ. টি. এন। অবিশ্রান্ত উদরী নাচ, নিতম্ব নাচ, অবিশ্রান্ত তাল হ্যাঁচকা খিচুড়ি গান। স্বরূপ দেখছে। দেখুক। শাওনি প্যাকিং করবে। জামা-কাপড়, প্রসাধনী, ওষুধ-বিষুধ, টিনের খাবার, বিস্কুট মশলা। যথাসম্ভব কেটেছেঁটে। সামান্য কিছু বই কাগজপত্র। একটা বাজল। ঘড়ি জানান দিচ্ছে। ভোর সাড়ে চারটের সময়ে উঠতে হবে। সন্তর্পণে একেবারে পা টিপে টিপে সবুজ আলোর ঘরে শয্যার ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়ল শাওনি।

নি, নি তুমি কেন যাচ্ছ? কেন রাজি হলে? কেন? নি, তুমি হারিয়ে যাচ্ছ, তুমি যাবে না, যেয়ো না শাওনি, যেয়ো না...নাঃ স্বরূপ সরকার অঘোরে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। বিয়ার-ঘুম কিংবা হুইস্কি-ঘুম। অনেকক্ষণ বিশুষ্ক চোখে জেগে জেগে কখন ঘুম এসে গেছে। পাঁচটা বাজার শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শাওনি। পাশে স্বরূপ নেই। বাথরুমের দরজা খুলে যাচ্ছে। পরিষ্কার-দাড়ি কামানো, স্নাত স্বরূপ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরা।

আমি চট করে একটু কফি খেয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বেরোচ্ছি।

চান করার তেমন সময় আর নেই। চুল বাঁচিয়ে কাক-চান। সিনথেটিক কাপড়ের সালোয়ার কামিজ। চুলে বেণী বাঁধা। এই ভালো হল, যেমন বেণী তেমনি রইল, চুল ভিজল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে হয়েছে লাগেজ। কপালে কালো টিপ আটকাতে আটকাতে আয়নার দিকে তাকাল শাওনি। আটত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে। আঠারো বছরেও মনে হত আ-ঠা-রো? এখন মনে হয়, একদিন আটাশ ছিলুম। মনে হয় যখন আঠারো ছিলুম! কিন্তু আয়নায় কিছু বোঝা যায় না। না-পাওয়ার ভার, না-দেওয়ার ভার, কিচ্ছু না। যুবতী এক, নরম কপালে তারার মতো টিপ পরছে। শুধু চোখ দুটোয় ভালো করে চোখ ফেললে বোঝা যাবে সেখানে বাদামি কনীনিকার পেছনে ক্লান্ত সংকল্প ধূসর পর্দা মেলে রয়েছে। চুলের রঙে একটা খয়েরি ছোপ, খড়ের মতো শুষ্কতা যা যত্নের অপেক্ষায় আছে।

এতগুলো?—স্বরূপ।

আমি দুটো নিচ্ছি—শাওনি।

তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো—স্বরূপ।

বাস্কেটটা নিচ্ছি—শাওনি।

জল কই?—স্বরূপ।

মিনার‍্যাল ওয়াটার নিয়ে নেব—শাওনি। স্বরূপ চুপ। শাওনি চুপ।

ভোরবেলা। ভোর। ময়লার গাড়ি। ময়লা। বাতি টিম টিম। সেলোফেনে সূর্য মোড়া। শুকতারা এখনও। ফিকে। ফালি চাঁদ। শুকিয়ে যাচ্ছে। টুপি মাথায় বৃদ্ধ। ভোরের হাওয়া। কাঁপ-ধরা ঠান্ডা। ভিখারি। বেরোচ্ছে। পা নেই। ঠ্যালাগাড়ি। চাকা-অলা। ঠেলছে। ঠান্ডা স্ট্র্যান্ড রোড থরথরে। থরথর...থরথর। হাওড়া ব্রিজে টিনোসেরাসের পিঠ। কাঁপছে। ফেলে দেবে? গঙ্গা। ময়লা। গমগম গমগম। স্টেশন। জটলায় জটলায় পুঁটলি-পাঁটলার যাত্রীদল। গ্রুপে গ্রুপে নরম, শক্ত ল্যাগেজ নিয়ে ফিটফাট প্যাসেঞ্জার। সরসর সরসর। খবর্দার! খবর্দার! যাত্রী ভেদ করে ঠ্যালাগাড়ি। অমুক আপ উইল ডিপার্ট ফ্রম তমুক প্ল্যাটফর্ম অ্যাট অমুক আওয়ার। টু জিরো টু ওয়ান আপ...টু জিরো টু ওয়ান আপ...কোচ সেভেনটিন...সেভেনটিন। সিট ফর্টিওয়ান...থার্টিএইট নয়? বিয়াল্লিশ নয়? ফর্টিওয়ান?

এই যে, জলটা ধরো।

বেল দিচ্ছে।

কাচের বাইরে স্বরূপ। ভেতরে শাওনি। দেখা যায় না। কাচের গায়ে স্বরূপ নিজেকেই দেখতে পায়। শুকনো চুল। এলোমেলো। উঁচু কলার। কাটা দাগ ভুরুর ওপর। কাচের ভেতরে শাওনি। বাইরে দৃষ্টি। বোঝা যায়, দেখা যায় না। কাচের গায়ে শাওনি নিজেকেই দেখতে পায়। গেরুয়া কাঁধ। রুদ্রাক্ষের গলা, কপালের মাঝখানে কড়া কালো, দু-কানে বাসি রক্তের ফোঁটা। ছটা উনপঞ্চাশ। শতাব্দী এক্সপ্রেস ছাড়ছে। রাইট টাইম। স্বরূপ, স্বরূপ তুমি কি আমাকে ডাকছ? ডাকো স্বরূপ...একবার ডাকার মতো ডাকো...শাওনি, শাওনি তুমি কি ফিরে আসছ? ফেরো শাওনি...একবার ফেরার মতো ফেরো...শতাব্দী এক্সপ্রেস ছেড়ে যায়।

গন্ধ

দূরে সরে বসলে কেন?

এমনি।

এমনি? আমায় ভয় করো? আমার স্পর্শ বাঁচাচ্ছ? অচ্ছুত আমি?

না তো।

তাহলে কি আমি উঠে যাব?

প্লিজ না।

তাহলে? কাছে এসে বোসো। দেখছ না কী সুন্দর সবুজ জল টলটল করছে, জলের ভেতর পদ্মপাতা, পদ্মপাতার মধ্যে পদ্মের নাল, তার ওপর পদ্ম ফুটেছে, লাল পদ্ম, যাকে বলে কোকনদ!

তার ভেতরে মধু, মধুতে ভোমরা, ভোমরায়...

ঠাট্টা করছ? ঠাট্টা করে আসল কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছ।

আসল কথা আবার কী?

ওই—এমন দিনে কাছে আসা যায়।

আচ্ছা, সঞ্জু তুমি কি সত্যিই জানো না কেন তোমার কাছে বসছি না?

না সত্যিই না, কেন? জিজ্ঞেস করছি তো?

কস্তুরীমৃগ তো শুনেছি আপন গন্ধে পাগল হয়।

হঠাৎ? কস্তুরীমৃগ?

সঞ্জু সঞ্জু। ডোন্ট মাইন্ড, তুমি এই টেরিলিনের শার্ট পর কেন? ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরোয় ঘামের। তুমি কি সত্যিই পাও না?

এই কথা? টিভির বিজ্ঞাপন? ঘামের গন্ধ পৌরুষের গন্ধ তা জানো?

তুমি কি তাই ভেবে সান্ত্বনা পাও? ঘাম, রক্ত, স্বেদ, এইসব এইভাবে ভাবো? আমি কিন্তু ওভাবে ভাবি না। পৌরুষ হল নিজেকে শুদ্ধ সুরভিত করা।

অর্থাৎ আফটার শেভ লোশন। চামড়ায় গন্ধঅলা পারফুম, ও ডি কোলন...

না সঞ্জু, নিজেকে শুদ্ধ সুরভিত করা মানে এই গরমের দিনে অন্তত চারবার অ্যান্টিসেপটিক সাবান দিয়ে চান, সুতির পোশাক পরা, গায়ে কষে প্রিকলি হিট পাউডার...

আবার টিভির বিজ্ঞাপন? স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভোসিন, ট্রিংংংলিং।

সঞ্জু, ঘামের গন্ধ মানে কিন্তু সত্যিই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ! সত্যিই কিন্তু তার থেকে বাঁচতে হলে চান চাই, সাবান দিয়ে, লেবু-গন্ধ-অলা হলে ভালো হয়।

সামান্য ঘামের গন্ধের জন্যে আমাদের প্রেম আটকে থাকবে?

গন্ধকে তুমি সামান্য বলছ সঞ্জু? রক্তের গন্ধে লেডি ম্যাকবেথ যে পাগল হয়ে গেলেন। বারবার ধুয়েও সে রক্তের গন্ধ তাঁর অন্তঃনাসা থেকে কিছুতে গেল না।

সে তো আসলে রক্তের গন্ধ নয়। পাপের গন্ধ।

ঠিকই। কিন্তু পাপের চেতনা প্রকাশ পাচ্ছিল রক্তের গন্ধের ভেতর দিয়ে। সঞ্জু আমি আজ যাই।...

টিলটিল এত দ্রুত চলে গেল যে সঞ্জু তাকে নিবৃত্ত করবার উদ্যোগই নিতে পারল না। খোলামেলা পার্ক-জাতীয় জায়গায় কারও পশ্চাদ্ধাবন করাটা খুব গণ্ডগোলের দেখাবে—এটা তার খেয়ালে ছিল। কিন্তু মনে মনে সে দৌড়োচ্ছিল। মরিয়ার মতো। ওই টিলটিল চলে যায় টিয়ে রঙের বসন গায়ে। চলার তালে টিলটিলের একটা হাত দুলছে, যেন হাতির দাঁত দিয়ে গড়া। না হাতির দাঁত নয়, সে তো শক্ত ব্যাপার, ময়দা—ধুর সে তো সাদা থ্যাসথেসে। তবে? তবে? তবে? নাঃ পাওয়া গেল না। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে টিলটিলের দোল-খাওয়া চুল। সোজা, প্রপাতের মতো নেমে এসেছে মুসৌরির কেম্পটি ফলস। ধ্যাত কেম্পটি দুটো সরু সরু বিনুনির মতো। টিলটিলের বিধাতা কি অত কৃপণ নাকি? তবে কি উশ্রী? না বাবা উশ্রীর মধ্যে একটা বন্য উদ্দামতা আছে, যাই বলো। এ কেমন কেশ, যাকে কেশ বলে মনে হয় না? ধুনুচির ধোঁয়ার মতো! শীতের ভোরের কুয়াশার মতো! এ যেন টিলটিলের টিলটিলত্বেরই একটা নাটবল্টু।

এমন করে বুঝি টিলটিলকে কখনও দেখেনি সঞ্জীবন। যেন তার জীবনের, তার সমস্ত সত্তার, সমস্ত প্রার্থনার নির্যাস একটি আঁকাবাঁকা টিয়া রঙের রেখা হয়ে চলে যায়। ঝুলির ভেতর থেকে দ্রুত স্কেচবুক বার করে সে, বেছে বেছে একটা দশ/বারো নম্বরের নরম পেন্সিল। ক্ষিপ্র আঙুলে এঁকে ফেলে তার প্রার্থনার প্রস্থানরেখা। দুটো তিনটে স্কেচ করে। তাই টিলটিল যে পুব ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল, এক ঝিলিক হাসল, সেটা সে দেখতে পেল না। পেলে হয়তো স্কেচ কয়েকটা বাড়ত। এগুলো বাড়ি গিয়ে জলরং আর ক্রেয়ন মিশিয়ে আঁকতে হবে। ক্রেয়নে জল ধরবে না। কিন্তু ক্রেয়ন আর জল রঙের সম্মিলনই হবে সেই মাধ্যম এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়ে যায় বাগানের ঘাসের দিকে চেয়ে। কেন না ওই ঘাসগুলোর মধ্যে যেমন একটা খাড়া খাড়া ব্যাপার আছে, গোটা গোটা গোছা-গোছা ব্যাপার আছে, তেমনি আবার আছে একটা দ্রবীভূত ছাপকা ছাপকা ব্যাপার, যেন ব্লটিং পেপারের ওপর কালি ছেপে উঠেছে। টিলটিলের চুল জলরঙের। তার শাড়িটা জলরঙের। দুলন্ত হাতটি ক্রেয়নের কিন্তু হাতের ভঙ্গিতে জলরং কিছু নেমে এসেছে। এই আর কি?

তা এখন তৃতীয়বার সঞ্জু চান করছে। চতুর্থটা শোবার আগে করবে। চান করে সঞ্জু সাদা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে ভালো করে গা মুছে পাউডার ঢালে অকৃপণ হাতে। ঘাড় থেকে পাউডার মুছে নেয় সযতনে। ঘাড়ে-পাউডার-তরুণ সে দেখতে পারে না। খাদির এই পাঞ্জাবিটা নতুন কিনেছে সে, বেশ আলগা আলগা, জিনস না, পায়জামা, পপলিনের, নতুন। বউদিকে অনেক খোশামোদ করে এই পোশাকটা জুটেছে, শেষ মাসে পকেটে কিছু বিশেষ ছিল না।—

দাড়ি ধুয়েছিস? —বউদি।

হ্যাঁ।

আঁচড়েছিস?

আজ্ঞে।

বউদি ফট করে একটা কী যেন তার সারা গায়ে স্প্রে করে দিল। এত দ্রুত যে সে নিবৃত্ত করবার সময় পেল না।

লাইফটা হেল করে দিলে।

নিজের বুকে হাত দিয়ে বল। হেল-হেল লাগছে না হেভন-হেভন লাগছে?

যাও যাও, বেশি দিক কোরো না।

বড়ো ভালো লাগছে দিনটা আজ। বিকেলটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। অবিরল—মাইটি ট্রেড উইন্ডস ব্লোয়িং। সেই হাওয়া পাঞ্জাবির ভেতরে ঢুকে সদ্যস্নাত ত্বককে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এত আরাম যে খলবলিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জীবন। প্রচুর মানুষের বিপরীতমুখী স্রোতের উজানে চলে যায় সে স্বেচ্ছায়। ঘাম, স্বেদ, রক্ত ; যদিও ঘাম আর স্বেদ একই তবুও কেমন একটা জোর আসে যেন দুটোকে আলাদা আলাদা ব্যবহার করলে ; এসব আপাতত তার উলটো দিকে। কে কাকে খিঁচিয়ে উঠল,

'কী দাদা, চোখে দেখতে পান না? পেল্লাই জুতোপরা পা-টা আমার হাঁটুতে তুলে দিলেন! ছি ছি!'

দেখে দেখে দিয়েছি বোধহয়? ভিড়টা এমনই যে আপনিও কাজটা করতে পারতেন।

আবার উলটো চাপ দিচ্ছেন...

সঞ্জীবন পেরিয়ে যায়। বাসে সে উঠবে না। রবীন্দ্রসদন চত্বরে সে হেঁটে হেঁটেই যাবে। তাবও পা একজন মাড়িয়ে দিল। বেশ লাগল। চটিতে যথেষ্ট ধুলোও। সে শুধু বলল, 'এ হে হে হে।'

আরে দাদা, মাফ করে দিন। বড্ড ভিড়।

সঞ্জীবন পেরিয়ে যায়—পার্কস্ট্রিটের মোড়ে তো লালবাতির জন্যে আধঘণ্টা দাঁড়াতে হল। এপারে অপেক্ষারত একটা গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত এক ভদ্রলোক, মানে বেশ টাই পরা ভদ্রলোক, বললেন, শ্ শালা! চান করেছেন কোন্ সকালে। বড়ো বড়ো অফিসে তো ভালো টয়লেট থাকে। শাওয়ার থাকে না? চানটা করে বেরোলেই পারতেন ভদ্রলোক, একটা চেঞ্জ রেখে দিতেন অফিসে—চান করে টাটকা জামা-কাপড় পরে এক কাপ চাফি খেয়ে নিয়ে বেকলে এই ট্রাফিক জ্যামটার মোকাবিলা করতে পারতেন। থিয়েটার রোডের ওখান থেকে রাস্তাট ক্রস্ করে নিল সঞ্জীবন। ও-ফুট দিয়ে গেলে আর মোড়ে অসুবিধে হবে না। কেমন ইচ্ছে করল চার্চের পাশ দিয়ে, চার্চ নয় ক্যাথিড্রাল, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর পাশ দিয়ে যাবে। একটু ঘুর হবে—টিলটিলকে হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে। তা হোক। টিলটিল সে সময়টা রাগ-টাগ না করেই কাটিয়ে দেবে এখন। অ্যাকাডেমির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সঞ্জীবনের মনে পড়ল বছর তিনেক আগে এখানেই তাদের বিপ্লবী শিল্পী সংঘের প্রদর্শনী হয়েছিল। খুব সফল হয়েছিল সেটা। তার পাঁচটা ছবির একটা সিরিজ ছিল। সব বেনারসের বিভিন্ন ঘাট। সুদ্ধু রঙের ফুচকি (ফুটকি বেশ গোল একটি বিন্দু, কিন্তু বিন্দুটা যদি সুগোল না হয় ব্লচ মতো হয়, ত্যাড়াব্যাঁকা বা রং ছেটকানো, তাহলে সেটা ফুচকি < সঞ্জীবন) দিয়ে আঁকা দশাশ্বমেধ ঘাটের ছবিটা খুব প্রশংসা পেয়েছিল। বিক্রি হয়েছিল সবারই দু-একটা করে, শুধু অনন্ত ঘড়াইয়ের একটাও বিক্রি হয়নি। ঘড়াই বিড়ি খেত, ভাঁড়ে চা পছন্দ করত, তার গুরু-পাঞ্জাবির কলার সদাই ফাটা। এবং বোতামপটির ফাঁকা লম্বাটে ত্রিভুজ দিয়ে তার আশ্চর্য ঘন রোম বিশিষ্ট সরু বুক এক চিলতে দেখা যেত। সেই থেকে ঘড়াই তাদের বিপ্লবের প্রতীক হয়ে গেল। হাতে চায়ের গনগনে গরম ভাঁড় নিয়ে যে চা না চলকে হা-হা অট্টহাস্য হাসতে পারে, যার পায়জামার বড়ো বড়ো ঘেরের মধ্যে পা কোথায় বোঝা যায় না, অথচ যে না-ঠোক্কর খেয়ে যেন শূন্যে ভেসে যাওয়ার মতো চলে যেতে পারে, সে নেতা হবে না তো কী? ঘড়াইয়ের ডেরায় ঘাম, স্বেদ, রক্ত, আবার সেই ঘাম স্বেদ, তা ছাড়া গাঁজা-বিড়ির ধোঁয়ায় একটা ক্রিয়েটিভ নরকস্বর্গ কি তৈরি হত না?

বাঃ। তুমি তো এসে গেছ?

গেলাম। কোনো অসুবিধে হল?

না অসুবিধে কী? ফোয়ারা দেখছিলাম।

এখানেই বসব, না কী?

এখানে আধঘণ্টা বসেছি, একটু ঘোরা যাক না।

একটু বসা যাক না, সেই ব্লকম্যান স্ট্রিট থেকে এই অবধি হেঁটে এলাম।

সে কী? কেন?

এই সময়ে কি বাসে ওঠা যায়? যা ঠেসাঠেসি! গরম! ঘাম! দুর্গন্ধ!

ও মা, তুমি তো আজ চান করে এসেছ মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ কাছে বসতে না পারো, পাশাপাশি হাঁটতে অন্তত পারো। মানে বোধহয়।

ও মা কী সুন্দর চুল পাট করে আঁচড়ানো। দাড়িতে কি শ্যাম্পু দিয়েছ? ফ্রেশ ফ্রেশ লাগছে, পাঞ্জাবিটা কি নতুন?

ইয়ার্কি হচ্ছে?

ও মা, ইয়ার্কি হবে কেন? জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে কেউ ইয়ার্কি করে? দাদু হলেও বা কথা ছিল। তোমার বসা হয়েছে?

নাহ্। তবে তোমার যখন হয়ে গেছে তখন আমার হতেই হবে।

এ কথার মানে?

মানে তো বোঝাই যাচ্ছে। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম।

বাবা! বাবা! বসছি। তোমার বিশ্রাম হলে বলবে। ওমা লেবু লেবু গন্ধও তো বেরোচ্ছে? দাঁতও যেন সদ্য সদ্য মাজা।

নখও কাটা। হাতের এবং পায়ের।

যাতে হেমচন্দ্রের মতো লাথি কষালে নখের খোঁচা টোচা লেগে গিয়ে টেল-টেল টিট্যানাস না হয়!

টেল-টেল টিট্যানাসটা কী?

আঁচড়ের দাগটাই তো লাথির গল্পটা বলে দেবে, টিট্যানাসের কারণ নির্ণয়ের জন্যে ডাক্তারকে বেশি খোঁচাখুঁচি করতে হবে না। কবে পড়ে গিয়েছিলেন? কোথায় লাগল? কীসে কেটে গিয়েছিল? ইত্যাকার।

অফ অল থিংস হেমচন্দ্রের লাথিটাই মনে পড়ল কেন এ রহস্যটা...

এমনি। ওটা আমৃণালিনী নারীসমাজের মনের মধ্যে এমন একটা ক্ষত সৃষ্টি করে রেখেছে যে প্রেমিক দেখলেই মনে পড়ে।

অ! সঞ্জীবন টিলটিলের প্রেমিক বুঝি?

আমার তো তাই ধারণা!

সেইজন্যেই সঞ্জীবন টিলটিলের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসুক এবার।

তা বসুক, কিন্তু দাড়ি-অলা মুখখানা অত এগিয়ে আনবার কী দরকার?

এইজন্যে যে তাক বুঝে টুক করে একটু খেয়ে নেব।

টিফিন এনেছ পকেটে করে? তা খাও না! খেতে আবার লজ্জা কী? মেয়েরাও আজকাল পাবলিকে খেতে লজ্জা করে না।

খাব? খাব?...খাই?

কী খাবে? সর্বনাশ! আমি চললাম।

টিলটিল দিস ইজ ভেরি ভেরি আনফেয়ার।

লোক দেখিয়ে খাবে?

সেটুকু সেন্স আমার আছে, ওই কর্নারটা টার্ন নেবার সময়ে এদিক ওদিক দেখে ছোট্ট একটু।

ওটা একটা সাংস্কৃতিক জায়গা, সেটাকে অশুচি করার কথা তোমার মনে এল?

অশুচি? আই বেগ টু ডিফার দিদিমণি। কত সাহিত্য কত গান এই চুম্বন বেজড। সেইসব সাহিত্যের গানের চর্চা হচ্ছে এখানে...

তাই চুম্বন-চর্চাও হবে?

না, তা আমি বলছি না। অতটা বলতে পারা যাবে না। তাহলে আরও অনেক রকম চর্চাও হবে। তা নয়, অশুচি কথাটাতে আমার আপত্তি।

'অশুচি' কথাটা তুলে নিচ্ছি, আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম 'অনৈতিক', 'অসামাজিক'।

প্রত্যেকেটা শব্দই বেশ প্রগাঢ় তর্কের মধ্যে এসে যাচ্ছে। ও পথে হেঁটে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং চলো তোমায় পৌঁছে দিই। একটি নির্জন ট্যাক্সি করে।

তার চেয়ে চলো একটা হোটেলে ঘর বুক করি।—রাগে, শ্লেষে, ক্ষোভে কষকুটে শোনাচ্ছে টিলটিলের গলা।

দিস ইজ ভেরি ভেরি অনফেয়ার টিলটিল। আমি যদি ওই লোকেদের দলে পড়তুম, তুমি তাহলে অনেক আগেই টের পেতে। আ অ্যাম আ ম্যান অব অনারেবল ইনটেনশনস।

তা হলে চলো ট্যাক্সি করো।

তোমার কাছে কত টাকা আছে টিলটিল?

আমার কাছে? আমার কাছে টাকা থাকবে কেন?

ট্যাক্সির জন্যে।

তুমি আমাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেবে, তার জন্যে টাকা দেব আমি? কী বলছ সঞ্জু? আমার তো...আমার তো মনে হবে তুমি আমার একজন 'রক্ষিত'।

আমি ভাড়া দিলেই তা হলে তুমি রক্ষিতের স্ত্রীলিঙ্গ?

না, কখনোই না, কখনো না। ছেলেদের দায়িত্ব হল মেয়েদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া। চিরদিনের সামাজিক দায়, নটউইথস্ট্যান্ডিং নারীমুক্তি। আমি চললাম। বাসে মিনিবাসে। ন্যাচর্যালি।

খুব ক্ষিপ্রপদে টিলটিল চলে যায়। অন্ধকারে তার শাড়ির হলুদ সামান্য চমকায়। রেখা আপাদমস্তক দেখা যায় না যেন একটা ঝিলিক, তারপর অন্ধকার। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নন্দন। চারপাশে সংস্কৃতি-সচেতন মানুষের ভিড়। প্রাকৃতিক অন্ধকারের সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোর মেশামেশিতে বেগুনি কুয়াশা।

সঞ্জীবন দৃশ্যটির দিকে মুখ করে স্থাণু থাকে।

রাত।

সিগারেটের টুকরোর পর টুকরো জমে যাচ্ছে। পায়চারি করে করে চটির তলা ক্ষয়ে গেল। অন্ধকারে জ্বলছে নিভছে ও কী? সিগারেটের মুখ? না সঞ্জীবনের চোখের আগুন?

আমি যেমন আমাকে তেমনিই নিতে হবে।
আমি স্বেদে স্বেদে দুর্গন্ধ

রাজপথ ছেড়ে বেছে নিই খানাখন্দ
দাড়িতে দাড়িতে দাড়িয়াল
আমি কাটি না নখর রাখি স্বাক্ষর
কাদাতে মাটিতে মাটিয়াল
আমি চলি না কারুর মতে
হাত বুলোই না নিজেরও হৃদয়ক্ষতে
আমি ধিক্কার হানি, ধিক! ধিক!
বিদ্রোহী আমি নির্ভীক
আমার দাড়ি ওড়ে ঝোড়ো বাতাসে
আমি পড়েছি এবার সাতাশে
আমি শ্রেণি-সংগ্রাম মানি
পাতিবুর্জুয়া মাস্টারদের ঘোরাবই আমি ঘানি
যাব না তোদের মঞ্চে
আমার ক্যানভাস গ্রামে গঞ্জে
আমি যেমন আমাকে পারলে তেমনই নিক
শত টিলটিল গারদের
আমি পালাব বাঁকায়ে শিক।

একদম শেষরাতে যখন সন্ধ্যাতারা ভোরের শুকতারা হয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারছে তখন ইজেলে ক্যানভাস চড়ায় সঞ্জীবন। টেম্পারায় অন্ধকার। অন্ধকারে বেগুনি আভাস, কেমন আভাসিত অন্ধকার। অন্ধকারে নন্দনের সত্যজিৎকৃত অলংকৃত পার্পেন্ডিকুলার। ফ্রস্টেড লাইটের আয়োজন সব যেন ইউফোর মতো ঘুরছে। তাদের ডাঁটি নেই। অন্ধকারে ভূতেদের আনাগোনা, কালোর মধ্যে আরও কালো, কিংবা ছাই-ছাই, কিংবা ধুপছায়া, কিংবা বেগুনির মধ্যে অতিবেগুনি বিন্দু সব। খালি একটা হলুদ বিদ্যুৎ চমকাতে চমকাতে যাচ্ছে। সাত দিনের একটু বেশি লাগল শেষ হতে। সোয়া সাত দিন ধরো। এ কদিনে চর্ব্য শুধু পাঁউরুটি আর ডিম, চোষ্য শুধু নিজের হাতের আঙুল, লেহ্য সিগারেট, পেয়—চা এবং দিশি।

শেষ হয়ে গেলে চান করে, ভাত খেয়ে, ঘুম।

ঘুমের মধ্যে কোন দূর বিদেশ থেকে যেন আই, এস. ডি এসেছে। বউদি ডাকছে সঞ্জু, সঞ্জু, ফোন, ফোন।

খুনখারাবি চোখ মেলে সঞ্জু বলে—আহ!

কী মুশকিল, ফোনটা তোমার, টিলটিল।

ঘুমের মধ্যে আমরা অতীতে থাকি। কিংবা ভবিষ্যতে। সেই অনাগত বিধাতার দেশ থেকে এক ঝাপটা আকুলতার বৃষ্টির মতো টিলটিল নামটা এল।

আধঘুমন্ত সঞ্জু লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে যায়। বউদি উঠতে সাহায্য করে। গা হাত-পা যেন প্যারালাইজড হয়ে ছিল।

কে?

বউদিকে তো বললাম আমি টিলটিল। তোমার গলা এত ভারী কেন? আবার গাঁড়ি খাচ্ছ? ...

গাঁড়ি হল গাঁজামেশানো বিড়ি।

দুম করে অন্ধকার ভেদ করে টর্চলাইটের মতো বর্তমান ফিরে এল। ফোনটা রেখে দিতেই যাচ্ছিল সঞ্জীবন কিন্তু ওদিক থেকে ভেসে এল,

কতদিন তোমায় দেখি না।

ব্যস্ত ছিলাম।

তা তো থাকবেই। নতুন কিছু কাজ হল?

হচ্ছে।

আমাকে একটুও সময় দিতে পারবে না?

সময় চিনেবাদাম বা ঝালমুড়ি নয়।

সে তো জানি। আসলে আমার ভীষণ হিট ফিভার হয়েছিল। এখন জ্বরটা গেছে কিন্তু খুব দুর্বল। তাই।

ব্লাড-প্রেশার কত?

ষাট-একশো।

যাঃ

অন গড। সুগার সত্তর। পুরো এক মাসের ছুটি নিয়েছি।

আচ্ছা রেস্ট নাও, আসছি।...

বিদ্যুৎ আর নেই। আকাশ থেকে নেমে এসে এখন মাটিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। করুণ বিভঙ্গে। মাচা নেই, কোনো বনস্পতি নেই যার খাঁজটাজ আশ্রয় করে দাঁড়াবে। আরামচেয়ারে সেই ছিন্নভিন্ন আলোকলতা রক্তহীন, তেজহীন, নিঃস্ব পলকা পড়ে রয়েছে। আরামচেয়ারের হাতলে এক কাপ দুধ।

সঞ্জু তুমি দেখো তো যদি খাওয়াতে পার। কখন নিয়েছি। এখনও যেমন কে তেমন।—অনাথা লতার দিদি বলছেন।

খেতে কি আমার অসাধ? বমি পায় যে!

একটু একটু করে খাও। —সঞ্জীবন কাপটা মুখের কাছে ধরে।

চুমুক দেবার একটা মৃদু শব্দ হয়। পেটের মধ্যেটা কেমন শিরশির করে সঞ্জীবনের সেই শব্দে। একটু দুধ যে চলকে পড়ল? যাঃ গলার কাছে ছাপা কাফতানের বেশ খানিকটা ভিজে গেল।

ওই যে কুঁজো রয়েছে, গেলাসে করে জল আনো, এখুনি এটা ধুয়ে ফেলি, নইলে চটচট করবে।

জ্বরের ওপর জল?

এ তো হিট ফিভার? জলেই তো নিরাময়

তুলো নাও, হ্যাঁ তুলোটা ভিজিয়ে দাও।... তুলো ভিজিয়ে সঞ্জীবন নিজেই দুধেভেজা কাফতানের গলা মুছে নেয়।

ওয়াক, ওয়া, ওয়াক-

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল সঞ্জীবন, সোজা হয়ে যায়।

কী হল?

দাও, শিগগিরই

প্লাস্টিকের একটা গামলা দেখতে পায় সঞ্জীবন। ধরে মুখের কাছে।

হোয়াক, হোয়া হোয়াক।

নাঃ, কোঁতানিই সার, বড়ো ভয় হচ্ছিল দুধটা না বেরিয়ে যায়। তা বেরোল না।

দুধ খেলেই কি তোমার এমন হচ্ছে?

কাঠ-বমির কষ্টে চোখ দুটো ছলছল, টিলটিল বলল, সব সময়ে না। এখন তো নাই-ই।

তবে?

কী জানি, এমনি।— বড্ড দুর্বল গলা। চোখ বুজে আসে টিলটিলের। কিছুক্ষণ পর করুণ চোখের পাতা খুলে যায়। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'তুমি কি...তুমি কি গাঁড়ির সঙ্গে তাড়িও—' আর বলতে পারে না, চুপ করে যায়, চোখ দুটো আবার বুজে আসে।

আমি কাছে এলেই যদি এত গন্ধ লাগে টিলটিল তাহলে...

টিলটিল চুপ।

কাজ করার সময়ে এগুলো তো আমার খেতেই হবে টিলটিল।

টিলটিল চুপ।

আর খেলে তো গন্ধ আসবেই, যতই চান করি আর পাউডার মাখি আর এলাচ চিবোই।

হোয়াক—একটা তীব্র বমির শব্দ কোনোক্রমে ঠেকায় টিলটিল। তারপর কোনোমতে বলে, 'সরি সঞ্জু। বমি একটা বিশ্রী ব্যাপার। এই অসুখবিসুখ এসব বিশ্রী, তুমি যাও। তোমার সামনে আমার কেমন লজ্জা করছে।'—এতটা কথায় সে হাঁপায়।

আমি কিন্তু বাস্তবকে ঘৃণা করি না টিলটিল। অসুখ আমাদের সবারই করে। অসুখ করলে বমিটমি খারাপ ব্যাপার থাকেই। সেগুলো থেকে পালাবার বা মুখ ফিরিয়ে থাকবার বিন্দুমাত্র কাপুরুষতা আমার নেই। এগুলো জীবনের মৌলিক কষ্ট। মৌলিক বিপদ।

কিন্তু তোমার গন্ধগুলো তো তোমার মৌলিক গন্ধ নয় সঞ্জু।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

এবার অন্যরকম প্রস্থানপর্ব। যে সাধারণত প্রস্থিত হয় সে শুয়ে আছে, তার অসুখে রোগা সাদা শরীরে একটা আতুর সমর্পণ, একটা ঘুমন্ত জেহাদ, আবার একটা বাধ্যতামূলক আত্মত্যাগের উদ্যোগ। যে যাচ্ছে সে পুরুষ, তার জীবনের প্রয়োজন অপ্রয়োজনগুলোর একটা সঠিক হিসেব-নিকেশ সে এইমাত্র পেশ করেছে। সেই ঔদ্ধত্য, সেই রিলিফ তার চলায় ফেরায়। শুধু একটু ভুল হল। ঘরটা পার হবার পর সঞ্জীবন একবার, একটিবার মাত্র মুখ ফিরিয়ে তাকাল:

টিলটিল তাকিয়ে আছে। তার দিকে। অপলক। দু চোখ দিয়ে সরু ধারা।

আলো জ্বলছে। সারারাত। এ বিলাসিতা তাদের মানায় না। সঞ্জীবন জানে। দাদা কয়েকবার দেখে গেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল শেষবার। বউদি একটা ফ্লাস্ক দিয়ে গেছে তাতে চা।

একটা দীর্ঘ গাঁড়ি ধরাল সঞ্জীবন। ক্যানভাসের দিকে চাইল। অমনি ক্যানভাসের ওপর একজোড়া বোজা চোখ ফুটে উঠল। গাঁড়িটা টিপে নিবিয়ে দিল সঞ্জীবন। জল ঢেলে দিল অ্যাশট্রেতে। ফ্লাস্ক থেকে অস্থির হাতে চা ঢালল। কাঁপছে আঙুলগুলো। ভেতরের কী একটা ছবির আবেগ তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, এক চুমুক চা, আর এক চুমুক, গুল পাকানো চায়ের কেমন একটা বদ্ধ ডোবার গন্ধ, তার মধ্যে মাদার ডেয়ারির দুধ ভেসে আছে। না মাদার ডেয়ারি না, বহু চর্চিত বহু বিজ্ঞাপিত এভরি-ডে-টে হবে। তেলে জলে যেমন মিশ খায় না তেমনি। তৃতীয় চুমুকের পর চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখল সঞ্জীবন। প্রথম টান—সুদীর্ঘ এক চোখের ওপরপাতা। লাইফ সাইজকে অন্তত দশ গুণ করে দিলে যতটা হয়।

ক্ষীণ অতি ক্ষীণ একটি ঢেউতোলা রেখা। তার ওপর দিকে সেই চোখ বা চোখের পাতা, যার মণি নেই, পাপড়ি নেই, মুখের রেখা নেই, দিগন্ত-ছোঁয়া এক আঁখি শুধু একটি মাত্রই এবং

ক্যানভাসের বাকি অংশটা প্রায় সবটাই সাদাটে ধোঁয়াটে এক মুখ যার মধ্যে কোথাও নাক কোথাও কানের অস্পষ্ট রেখা বোঝা যায় আবার সেগুলো অর্থহীন তালগোল পাকানো রঙের পুঁটলিও। আবার প্যানডোরার বাক্সের মতো তার থেকে বেরিয়ে পড়ে দুধের গ্লাস, চলকে পড়া দুগ্ধ ধারা, ফিনকি দিয়ে যেন সাদা রক্ত বেরোচ্ছে, ওষুধের শিশি, প্ল্যাস্টিকের গামলা...।

ভোর রাতে ওয়াশ করে করে, ওয়াশ করে করে যেন নিজের অস্পষ্ট অনুভবকে ধরে রাখতে চাইল সে। তারপর চান, পাটভাঙা জামাকাপড়, কেমন যেন অস্বস্তি লাগে না হলে। বোতলটা আজকে শেলফের এক কোণে পড়ে রয়েছে। মার্জারিন দিয়ে ছ স্লাইস পাঁউরুটি আর দুটো শুঁটকে কাঁটালি কলা দিয়ে বোতলটা শেষ করে মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সঞ্জু সঞ্জু ওঠো। তোমার কাছে লোক এসেছে দেখা করতে। ওঠো। সঞ্জু।

জাহান্নমে যাও...।

প্লীজ সঞ্জু। অনন্ত ঘড়াই আর...

হুড়মুড় করে উঠতে গিয়ে সঞ্জীবন ধপাস করে পড়ে যাচ্ছিল। বউদি ধরল।

এইজন্যে তোমাকে নাম বলতে চাই না। নাম বললেই ধপাস। আশ্চর্য। ...

ঘড়াই ঢুকে আসছে।

আর্টিস্টের স্টুডিয়ো আর ব্যাচেলর্স ডেন এ দুটোর কোনো প্রাইভেসি নেই বুঝলেন দুনিবাবু।

তক্তাপোশ—তাতে বাসি বিছান.। শূন্য বোতল গড়াগড়ি। অ্যাশট্রে জলে ভাসছে। আধ খাওয়া চায়ের কাপ। মুখ-খোলা ফ্লাস্ক। ইজেলের ওপর ছবি চড়ানো। চোখ লাল, দাড়িয়াল, কুঁচকোনো পায়জামা গেঞ্জির শিল্পী, চোখ কচলাচ্ছে। হাই চাপছে।

বাহ্—দুনিবাবু বললেন—তা এটা দুই-ই। সোনায় সোহাগা। একটা স্টিল লাইফ করে নেবেন সঞ্জুবাবু।

সঞ্জু, তোর দশাশ্বমেধটা ইনি কোন্ ফিল্‌ম প্রডিউসারের বাড়িতে দেখেছেন ওঁকে একটা করে দিতে হবে।

ইনি কে?

ইনি? ইনি দুনিলাল বাজাজ। চিনতে পারছিস না?

ফেমাস আর্ট-ডিলার—বউদি চৌকাঠ থেকে বলল, সঞ্জীবন কটমট করে তাকাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এবার বোধহয় সেই মজা ডোবার গন্ধ-অলা চা-টা আনবে।

সাদা ভুঁড়ির ওপর ফিনফিনে সাদা ধুতি। মোটা সোনার চেন। মাথার দু-চারগাছি পাতলা চুল ছাড়া সারা শরীরে আর কোথাও কোনো চুল নেই।

সঞ্জীবন বলল, নিজেরই ছবির কপি করতে হবে?

কপি কেন করবেন। ফ্রেশ আঁকবেন, যেমন হবে তেমনি নেব।

হয় না। 'দশাশ্বমেধ' মুড আমার চলে গেছে।

এটা? ফিনিশড? ইজেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বাজাজ।

আপনার কী মনে হয়?

কোথাও কিছু একটা বাকি আছে। ছোট্ট কিছু। এই স্যাডনেসের কারণ যদি লিউকিমিয়া হয়, সুদ্ধু লিউকিমিয়া—তা হলে কেমন ক্লিনিক্যাল হয়ে যায় ছবিটা।

লিউকিমিয়া নয়, লিউকিমিয়া কেন? হিট ফিভার...মাথার চুল আঁকড়াতে আঁকড়াতে সঞ্জীবন বলল।

কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন বাজাজ। তারপরে বললেন, 'আই সি, পার্সন্যাল লাইফ? তা আরও কিছু আছে?'

বাকিগুলো সে বার করে দিল।

গোটা চারেক বেছে নিলেন দুনিলাল। দশ হাজার করে এক একটা।

ইনি আমাদের বিপ্লবী শিল্পী সংঘকে প্রোমোট করছেন।

বউদি ভারী বুদ্ধিমতী। চা আনেনি।

ক্যাশ চল্লিশ হাজার কোলে নিয়ে বসে রইল। বউদি ঢুকতে বলল, নাও।

সমস্ত নিয়ে নেব?

আমাকে হাতখরচটা দিয়ো।

টিলটিল যে রাগ করবে?

টিলটিল রাগ করে একমাত্র গন্ধ পেলে—বলতে যাচ্ছিল সঞ্জীবন, সামলে নিল।

বলল, আপাতত তুমিই আমার টিলটিল, তুমিই আমার ক্যাশ, আমার ক্যাশিয়ার। বউদির গালে একটা চকাস করে চুমু খেল সঞ্জীবন।

তারপর তাড়াতাড়ি চান, তাড়াতাড়ি দাড়ি গোঁফ ছাঁটা, তাড়াতাড়ি পাউডার, তাড়াতাড়ি পায়জামা পাঞ্জাবি। সাতবার করে মাউথ-ওয়াশ দিয়ে কুলকুচি। এবং দৌড়।

না লিউকিমিয়া নয়। না লিউকিমিয়া নয়। না...

টিলটিল স্কুলে গেছে। বাঁচা গেল। তবু একবার থরো চেক-আপ।

দিদি, টিলটিলের ফ্যাকাশে ভাবটা গেছে?

নাইন্টি পার্সেন্ট বাঙালি মেয়ে অ্যানিমিক সঞ্জু, ফ্যাকাশে ভাব কি চট করে যায়?

কী কী যেন খেতে হয়?

মাটন লিভার, বিটরুট, গাজর, বেদানা, অভাবে ডালিম, লিভার এক্সট্র্যাক্ট ইঞ্জেকশন, চিকেন স্যুপ, টনিক আয়রন-অলা। খিদে বাড়াবার কিছু। হাওয়া বদল মনের স্ফূর্তি।...

'মাটন লিভার' থেকে 'খিদে বাড়াবার কিছু' পর্যন্ত দিদি আপনি ব্যবস্থা করবেন, বাকি দুটো আমি দেখছি। —বলে পাঁচশো টাকার দুটো নোট দিদির হাতে গুঁজে দিতে যায় সঞ্জু।

এ কী? এ কী? আমার হাতে কেন?

তবে কি আপনার পায়ে দেব?

ইয়ার্কি হচ্ছে? খুব যে ফুর্তি? চাকুরি পেলে? না ছবি বিক্রি হল?

চাকুরি তো আগেই পেয়েছি দিদি, ও চাকুরি হামি করবে না।

তবে ছবি?

আবার কী?

হাতে পেয়েই সব খরচ করে দেবার ধান্দা? উড়নচণ্ডে একেবারে।

উড়নচণ্ডী নয় দিদি উড়ন শিব, মানে নটরাজ, মানে শিল্পী।...

ধাঁ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে সঞ্জীবন।

দিদি তাড়াতাড়ি পথ আটকায়।—না, না, সঞ্জু আমার কাছে টাকা দেবে না। তোমাদের অসীমদা ভীষণ রাগ করবেন তাহলে। তুমি এগুলো কিনে এনে দিয়ো বরং।

আমি যে চিনি না, দিদি।

চিনতে তো হবেই একদিন না একদিন সঞ্জু—

তাহলে আপনি চলুন সঙ্গে।

আচ্ছা চলো, বারোটার সময়ে মিনি ফিরবে। তার আগে কিন্তু ফিরতে হবে।

ওরে বাবা, এখনই তো সাড়ে দশ। শিগগিরই চলুন।

এত কিনছ কেন সঞ্জু? এত তো লাগবে না।

বাঃ, টিলটিল কি একা খেতে চাইবে নাকি? আপনি খাবেন, অসীমদা খাবেন, মিনি খাবে।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

মাথাটি আমার ঠিক হয়ে গেছে। এই দেখুন না দাদা বউদির জন্যেও নিচ্ছি। আপনাদের সবার কাছ থেকে তো খালি নিয়েই গেছি, নিয়েই গেছি ···

উড়নচণ্ডী।

চণ্ডী নয় চণ্ডী নয়, চণ্ড, চণ্ড ভৈরব—সঞ্জীবন সংশোধন করে দেয়। আর অমনি 'চণ্ডভৈরব' তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। সে কী রং? কী অসম্ভব সব দেহভঙ্গি। চোখে যদি ওজঃ মুখে তবে হাসি, হাতে যদি বরাভয়, পায়ে তবে সব দলিত মথিত করবার মহামুদ্রা। কেশে তার ঝড়, বুকে তার প্রেম, উদরে ক্ষুধা, কে এই চণ্ডভৈরব? এঁকে কি কোনো শাস্ত্রে পাওয়া যাবে? দেখবে কী? পুরাণ খুলে খুলে? নাঃ চণ্ডভৈরব ভেতরে নাচছেন, উলটোচ্ছেন, পালটাচ্ছেন, তাঁকে এক্ষুনি লিপিবদ্ধ করতে না পারলে তিনি উবে যাবেন। দিদিকে বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে সেই ট্যাকসিতেই ছুটল সঞ্জীবন।

একের পর এক চণ্ডভৈরব এঁকে যায় সঞ্জীবন। সব ভঙ্গি এক ক্যানভাসে ধরা যায় না। সব রং কী করে এক জায়গায় উজাড় করে? অনেক আয়োজন চাই। জলে তেলে মোমে, পেনসিলে, স্টেনসিলে, এচিং-এ, অ্যাক্রিলিকে। শুধু ভৈরব তো নয়, ক্রমে তাঁর বুকের পাঁজর থেকে তৈরি হয় ভৈরবী। তাঁর হাতের মুদ্রা থেকে আসে সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁর লিঙ্গোত্থান থেকে আসতে থাকে শিশুভৈরব শিশুভৈরবীরা। সে বুঝতেও পারে না কবে তার ঘরে উত্তরের মহার্ঘ আলো অফুরান প্রবেশ করে, কবে পালটে যায় শয্যার আস্তরণ, ঠান্ডা ঘরে অজস্র গাছের টবের বিন্যাসের মধ্যে বসে সে অনিয়ন্ত্রিত ভৈরব-পরিবার এঁকে যায় আর আনমনে টিলটিলের গালে, অধরে উদরে চিবুকে চুমু খেয়ে যায়। এক সময়ে হাতের তুলির মতো সযতনে শুইয়ে দেয় টিলটিলকে। আর চোখে স্বেদ, টিলটিলের গালে রক্ত। ক্যানভাস ঘামতে থাকে। কেন না এখন কোনো গন্ধ নেই।

লিখন

ব্রজকিশোরবাবু মধ্যম দৈর্ঘ্যের গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার মানুষ। বেশ গোঁফ আছে। চাপ গোঁফ। বেশি কথাও বলেন না। আবার কম কথাও বলেন না। অর্থাৎ কারও কারও সঙ্গে বেশ কথা বলেন, কারও কারও ব্যাপারে হাঁ হাঁ করে সেরে দ্যান। আপিসে বড়োবাবু ছিলেন। কোনো কোনো সমবয়সি সহকর্মী, কোনো কোনো অধস্তন ছেলেছোকরার সঙ্গে বেশ জমাট আলাপ ছিল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে, 'ভালো আছো তো? জামাই বাবাজি এল না কেন? কাজ পড়েছে? ভালো ভালো।' নাতিনাতনিদের সঙ্গে 'কী দাদুভাই পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?' 'দিদিভাই একটু সকাল-সকাল করে বড়ো রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবে।' গিন্নির সঙ্গে অবশ্য সম্পর্কটা একটু আলাদা রকমের। চল্লিশের আগে পর্যন্ত ব্রজকিশোরবাবু গিন্নির সঙ্গে দোলনায় দুলেছেন। এক পানের বাটা থেকে দুজনে এ ওকে ও একে পান খাইয়েছেন। রঙ্গ-রসিকতা করেছেন আর দুলে দুলে হেসেছেন। খেলাধুলোর জন্যে লুডো, তাস আর চাইনিজ চেকার সদাসর্বদা ঘরে মজুত থাকত। সাপ লুডোটাই যদিও সবচেয়ে পছন্দ ছিল দুজনের। তিন মাস অন্তর মাইনের টাকা থেকে জমিয়ে ব্রজকিশোরবাবু গিন্নিকে একটি জব্বর শাড়ি কিনে দিতেন। হাতি পেড়ে, কি গঙ্গা যমুনা পাড়, কি পাছা পেড়ে। গিন্নি বেঁটে মানুষ, রং টকটক করছে, নাকটি বড়ির মতন, চুল কালো কুচকুচে তৈলাক্ত মসৃণ। সেই খাটো, মোটাসোটা শরীরটিতে লাল-কালো গঙ্গা যমুনা পাড় শাড়িখানা পরে ঝনাৎ করে যখন পিঠের পেছনে চাবিটি ফেললেন, নাকের হিরেটিতে আলো ঝলকে উঠত, তখন ব্রজকিশোরবাবুর ভেতরটা কী করত তা একমাত্র ব্রজকিশোরবাবুই জানেন। আমরা জানি না।

বয়স পশ্চিমে হেলতে থাকল, ব্রজকিশোরবাবুর ব্রজকিশোরীও ক্রমশ বউমাদের রান্নাঘরে, আঁতুড়ঘরে সেঁদোতে লাগলেন। দোলনায় ছেলে-বউকে টপকে নাতিনাতনিরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে দুলতে লাগল। পান খাওয়া কমে এল। খেলাধুলোর গিন্নি ক্রমশই আরও খেলুড়ি সংগ্রহ করতে লাগলেন। বড়ো নাতি দুলাল বলে, 'আমি কিন্তু লাল নেব।' নাতনি শীলু বলবে, 'আমি, নীল।' সবাই সব নিয়ে-টিয়ে ব্রজকিশোরবাবুর পড়ে থাকবে ম্যাটমেটে, অলুক্ষুনে হলদে। রোজ। রোজ। একদিনও তো মানুষ বুড়োমানুষটাকে লাল দেয়। তাঁর ঘর। তাঁর লুডো। হয় নাতি, নয় নাতনি লাল নিয়ে বসে আছে। তার ওপর কোথা থেকে শিখে এসেছে কেঁচে খেলা। ঘুঁটি উঠে গেল। তারপর আবার সেখান থেকে দান মতো নেমে কুচ কুচ করে দাদুর ঘুঁটি কাটছে। আ গেল যা। কয়েকদিন খেলে খেলায় জন্মের মতো বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রজকিশোরবাবু বললেন, 'দুত্তোর ছাই, খেলব না, তোরা খেল গে যা।'

তিনজনে খেলা হয় না কি? অ দাদু এসো না!

নাঃ।

গিন্নি কটাক্ষে চেয়ে বললেন, বাবুর বুঝি রাগ হল?

'হ্যাঁ রাগ হল।' ব্রজকিশোরবাবু বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। হাতে খবরের কাগজ।

আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি এই ব্রজকিশোরবাবুর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হলে কিংবা স্ত্রীবিয়োগ হলে কি বিপদ হবে। তাই হল। এবং একসঙ্গে হল। সেপ্টেম্বর মাসে তিন বছর এক্সটেনশনের পর ব্রজবাবু রিটায়ার করলেন। মালা ও চন্দন, ছাতা-ছড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি, শাল নিয়ে। শালটি ঈষৎ বেগুনি আভার। আসল পশমিনা। আদর করে গিন্নির গায়ে জড়িয়ে দিলেন। অক্টোবর মাসে পুজোর সপ্তমীর দিন অষ্টমীর বাজার করে আনলেন স্বামী-স্ত্রীতে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, কুমড়ো, টম্যাটো, প্যাকেটের ময়দা, ভালো ঘি, নৈনিতাল আলু, এক নম্বর ছোলার ডাল, কিসমিস, বেগুন। সন্ধে বেলায় গৃহিণী ঘুরে পড়লেন। পড়লেন তো পড়লেন। আর উঠলেন না। নার্সিংহোম ঘুরে একেবারে কেওড়াতলা চলে গেলেন।

সবকিছু চুকে-বুকে গেলে, বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত, মাথা ঝুঁকিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখে, বড়ো বউমা, মেজো বউমা, ছোটো বউমা এসে বলল, 'বাবা, বাবা, আমরা তো আছি।' একটু দূরে তিন ছেলে। বড়ো হয়ে অবধি বাবার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা অভ্যাস নেই—কী ইশারা করল যে যার বউকে। বড়ো বউ বলল, 'বাবা, আপনি আরাম করুন', মেজো বলল, 'কোনো ভাবনা নেই।' ছোটো বলল, 'আমরা সবাই আছি।'

ব্রজকিশোর বললেন, 'হুঁ।' বলে ঘরে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। থাকো বাবা, সবাই থাকো। কিন্তু ওইখানে থাকো। ওই চৌকাঠের বাইরে। ঘরে যদি থাকি তো আর কাউকে মনোমতো না পেলে আমি আমাকে নিয়েই থাকব। তোমরা তোমাদের সংসারে। আমি আমার সংসারে। চারবেলা চাট্টি খেতে দিয়ো। ব্যস।

বাড়িখানি ব্রজকিশোরবাবুর ঠাকুরদার করা। তাঁর বাবা, তিনি, ছেলেরা, যে যেমন পেরেছে বাড়িয়েছে, সারিয়েছে। ব্রজবাবুর ঘর বরাবরই দক্ষিণ-পশ্চিমে, দেয়ালগুলোতে কী মশলা কী ইঁট ব্যবহার করেছিল মিস্তিরি কে জানে, বর্ষার পর দেওয়াল বিশেষত পশ্চিমের দেয়াল কেমন ভেপসে ওঠে, চুনকাম অসমান, ছোপ-ছোপ হয়ে যায়। ঘরের একদিকে একটি সেকেলে পালঙ্ক। পালঙ্কের তলায় গিন্নির সেলাই মেশিন, গরম জামাকাপড়ের ট্রাঙ্ক বাক্স। ঘরের উলটোদিকে কাজ-করা আয়নাঅলা মেহগনির আলমারি, পাশে আলনা, তার পাশে টেবিলে আয়না বসানো। সামনের চেয়ারে বসে কাজকর্ম করাও চলে, আবার দাড়ি কামানো, চুল বাঁধা, সাজগোজ এসবও চলে, চলে মানে চলত। ড্রয়ারের মধ্যে এখনও একটাতে গৃহিণীর ফিতে-কাঁটা-চিরুনি মজুত। আরেকটাতে চিঠি লেখার সাজসরঞ্জাম—খাম, পোস্টকার্ড, লেটার প্যাড, কলম ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের একদিকের দরজা দিয়ে দোতলার দালানে যাওয়া যায়, আরেক দিকের দরজা দিয়ে সরু জাল ঘেরা বারান্দায় যাওয়া যায়। বারান্দায় একটি কাপড়ের ইজিচেয়ার পাতা আছে। একটি টিয়ার খাঁচা থাকে, আর একটি আড়াআড়ি তারে ব্রজবাবুর জামাকাপড় অর্থাৎ লুঙ্গি, ফতুয়া, গেঞ্জি, রুমাল, গামছা শুকোয়।

এই ঘরেই, এই পালঙ্কেই পূর্বে মাথা পশ্চিমে পা ব্রজবাবু শোয়ার সময় শুয়ে থাকেন। কাজের মানুষ। আলস্য, কুঁড়েমি, কোনোদিনও অভ্যেস নেই। কিন্তু মুখ ফুটে বউমাদের বলতে পারেন না, 'আমাকে বাজারটা করতে দাও।' এক-একদিন এক-এক ছেলে—চা খেয়েই পাঁই পাঁই করে বাজারে ছোটে। ঘড়ি দেখতে দেখতে উদ্বিগ্ন মুখে ফিরে আসে কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মাথায়। সরু চিলতে বারান্দায় নিজের কাপড়ের আরামচেয়ারে বসে বসে তিনি দেখেন। এক দিন দেখলেন, দু-দিন দেখলেন, সাত দিন দেখলেন, তারপর আর পারলেন না। অষ্টম দিনের সকাল সাতটায় বড়ো বউমা চান করে কাপড় মেলছে। মেজো বউমা ভাত বসাবার চাল ধুচ্ছে, ছোটো চা ঢালছে কাপে কাপে, ব্রজবাবু থলি হাতে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিলেন। মেজো বউ চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ব্রজবাবুর গলা খাঁকারির মানে 'আমায় বাজারের টাকাটা দাও বউমা।' মেজো বউমা বলল, 'ওকি বাবা, আপনি কেন থলি হাতে?' ছোটো বউমা বলল, 'এখনও চা খাওয়া হল না!' বড়ো বউমা বলল, 'বাবা, আপনি ওপরে যান। শিবু আপনাকে চা দিয়ে আসছে, ছি ছি রিনি। কত দেরি করলি বল্ তো!' ব্রজকিশোরবাবুর এদের সঙ্গে এত কথা বলা সাত জন্মেও অভ্যেস নেই। তবু বললেন, 'বাজারটা আমিই করে দিচ্ছি। ওদের তাড়া আছে। চা খেয়ে যাচ্ছি।'

ছোটো ছেলে রবি ছুটে এল। থলেটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, 'না, না, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? বলুন আপনার কী খাওয়ার ইচ্ছে, আমি নিয়ে আসব।'

ব্রজকিশোর বুঝলেন, এরা তাঁর বাজার করার উৎসাহের অন্য ব্যাখ্যা করেছে। মনে করেছে তাঁর বিশেষ কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। তাই বাজার যেতে চাইছেন। তিনি একবার কেশে নিয়ে বাজারের থলি ছোটো ছেলের হাতে সমর্পণ করে প্রস্থান করলেন। চিলতে বারান্দায় বসে বসে চা খেতে খেতে বুঝলেন এ সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি আর কারও কোনো কাজে লাগবেন না। বেচারি অবসরপ্রাপ্ত বিপত্নীক। সেদিন দুপুরে ভাত পাতে কচুর শাক, ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি এবং ধোঁকা একসঙ্গে দেখে তাঁর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এইসব খাদ্যগুলি তাঁর প্রিয়। তাই এরা ভেবেছে তাঁর এগুলি খেতে মন গেছে। বহু কষ্ট করে সবগুলো একদিনে জড়ো করেছে। বেচারি ওপারের নোটিশ পাওয়া বুড়ো শ্বশুর! কদ্দিন আর বাঁচবে? খাইয়ে-মাখিয়ে নাও যে কটা দিন বাঁচে। পাতে খাবার পড়ে রইল। কচুর শাক রাঁধা প্রথমত একেলে কলেজে পড়া মেয়ের কর্ম নয়, কাঁটা চচ্চড়িও তাই। এত ঝাল দিয়েছে যে, নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ধোঁকাটা করেছে ভালোই, কিন্তু গিন্নির নানারকম নিজস্ব তাগবাগ ছিল। ধোঁকায় সামান্য একটু কুমড়ো কি বাঁধাকপি, কি ফুলকপি মিশিয়ে দিতেন, জিনিসটা নরম এবং সুস্বাদু হত। এ ধোঁকা সে ধোঁকা নয়। কিন্তু ব্রজকিশোরবাবু এত হৃদয়হীন নন যে, সব তাতেই এরকম দোষ ধরবেন। তাঁর আসলে বড্ড লেগেছিল এইজন্য যে, এরা তাঁকে অকেজো, লোভী, পেটসর্বস্ব বৃদ্ধের দলে ফেলে দিচ্ছে।

সেইদিন বিকেলবেলাই ব্রজবাবু প্রথম লেকের ধারে গেলেন। বাড়ির থেকে দু-এক গলি পেরিয়ে বড়ো রাস্তার ওপারে দিব্যি পার্ক। তার মধ্যে টলটলে জলের লম্বা একটি পুকুর। পাড়ে কয়েকটি বেঞ্চি ফেলা। এই হল লেক। ব্রজকিশোরবাবু লুঙ্গি বদলে ফর্সা ধুতি পরলেন, গেঞ্জি পাঞ্জাবি, একটি হালকা দেখে চাদর গায়ে ফেললেন, হাতে ছড়িটি নিলেন, জলের ধারে একটি বেঞ্চি পুরো বুড়োদের দখলে। ব্রজকিশোর গিয়ে একটু গলা খাঁকারি দিলেন। নড়ে-চড়ে বসে অবিনাশবাবু বললেন, 'আরে ব্রজ এসো এসো, খাঁকরাচ্ছ কেন, আমাদের পার্টিতে ভরতি হবে তো মুখ ফুটে বললেই তো হয়। কি বলো বিভূতি!'

বিভূতিবাবু বললেন, 'তাই তো, আচ্ছা ব্রজ, তুমি চিরকেলে রসিক না হয় মানছি, তা রস কি এখানেও পকেটে করে আনবে? আমাদের বুড়ো হাড়ে আর কত সয়?' বিভূতিবাবু চোখ টিপলেন। তাঁর চোখের ইঙ্গিত অনুসরণ করে ব্রজবাবু দেখলেন অদূরে বটগাছের ঝুরির আড়ালে একটি আঁচল ও একটি পাঞ্জাবির পাশ পকেট দেখা যাচ্ছে। ব্রজবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বিভূতি, অবিনাশ এবং তৃতীয় ব্যক্তি রাসু এমন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল যে বটগাছের আড়াল থেকে ছেলেমেয়ে দুটি হঠাৎ উঠে চিনেবাদাম খেতে খেতে সামনে দিয়ে চলে গেল। ছেলেটি মেয়েটিকে বলল, 'কালে কালে হল কি রে মন্দিরা, ঘাটের মড়াতেও প্যাঁক দায়?'

ব্রজবাবু সবচেয়ে ধারে বসেছিলেন, তাঁর দিকে চেয়েই ছেলেটি বলল। ছেলেটি মুখ-চেনা। মনের ভাব মুখে দেখাবার পাত্র ব্রজবাবু নন, কিন্তু মনে মনে তিনি মরমে মরে গেলেন। এরপর

ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে সে যে এই ধরনের তাচ্ছিল্যকর মন্তব্য আবার করবে না, তার কোনো স্থিরতা আছে?

রাসু বলল, 'যাক বাঁচা গেল। তারপর তোমার বাড়ির খবর বলো। ছেলেরা কবে ভেন্ন হচ্ছে? অ্যাদ্দিন তোমাতে-গিন্নিতে টেনেছ। তিনি হেঁসেল টেনেছেন, তুমি বাজার টেনেছ। এবার তো ভাই হাতা-বেড়ি উঠেছে হাতে, তোমার পেনশনটুকু বই সঞ্চয় নেই। কী? আছে?'

ব্রজবাবু উঠে পড়লেন। একটু কেশে, মুখে বললেন, 'ঘুরে আসি।'

'হ্যাঁ, এসো, তাই এসো গে। বয়সটা তো খারাপ ভায়া। ষাটের গাঁটটি উতরেছ। পঁয়ষট্টিতে আর একটি গাঁট চলছে। চলে ফিরে যন্তরগুলোকে সচল রাখো। নইলে ...'

ততক্ষণে ব্রজবাবু হনহন করে হাঁটা দিয়েছেন। এর দু-এক দিনের মধ্যেই ব্রজবাবু লাইব্রেরিতে ভরতি হলেন, মানে সদস্য হলেন, কড়কড়ে কুড়ি টাকার নোটখানি দিয়ে। লাইব্রেরিয়ান মানুবাবু 'প্রিয় বান্ধবী' বলে একখানা বই দিলেন, মুখ গম্ভীর করে ব্রজবাবু বললেন অন্য একখানা দেখি, মানুবাবু এবার দিলেন। 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধু সঙ্গ', ব্রজবাবু এবার বললেন, 'ছেলেদের বই নেই?'

মানুবাবু বললেন, 'না দাদু, ছেলেদের বই মেয়েদের বই আমরা আলাদা করি না। ওসব একসঙ্গেই থাকে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'ছেলেমানুষদের বই নেই? বাচ্চাকাচ্চার?'

মানুবাবু বললেন, 'তাই বলুন। ভুটুর জন্যে নেবেন, আচ্ছা এই দুখানা নিয়ে যান। আগেকারের পুজোবার্ষিকী সব, সমান ওজনের সোনার দাম দাদু।'

মানুবাবুর পুরো গোঁফ পেকে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি ব্রজবাবুকে দাদু বললেন। যাঁর নাকি গোঁফ কাঁচা, মাথার পাকা চুল হাতে গোনা যায়, দাঁত, পানের ছোপ ধরা হলেও পুরো পাটি আস্ত। ভালো। বলো বাবা বলো। বিপত্নীক হয়ে পড়েছেন তার ওপরে রিটায়ার, এরা তাঁকে জোরজার করেই রওনা করিয়ে দেবে মনে হচ্ছে।

ক্ষুণ্ণ মনে ব্রজবাবু বই দুখানা প্যাকেটে ভরে বাড়ি ফিরলেন। রাতের রুটি তরকারি খেয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ব্যাস। নিজের ঘর, নিজের সংসার। দরকার নেই তোর বাজার। দরকার নেই অমন বুড়োটে কুচুটে ছ্যাঁচড়া আড্ডার। ব্রজবাবুর যদি মনোমত সঙ্গী না-ই মেলে তো ঘরের মধ্যে তিনি থাকবেন তাঁর নিজেকে নিয়ে। দূর করো যত্ত বাজে জঞ্জাল।

দু-একখানা গল্প পড়তে পড়তে কখন মজে গেছেন ব্রজবাবু নিজেই জানেন না। সারাদিন শুয়ে বসে থাকা, এমনিতে ঘুম আসতে চায় না। গল্প পড়তে পড়তে ব্রজবাবুর ঘুম আরও পালিয়ে গেল। ভূতের গল্প, মজার গল্প, ইতিহাসের গল্প, আচ্ছা আচ্ছা গল্প বানিয়েছে তো এরা। রাত দুটো পর্যন্ত পড়ে, বইটিকে মুড়ে ব্রজবাবু এক গ্লাস জল খেয়ে পাশ ফিরে শুলেন। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে গপ্পো। সেই সব গপ্পোই তাঁকে সে রাত্তিরে মাথা চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াল।

এমনি নেশা লেগেছে যে পরদিন বারোটা থেকেই ব্রজবাবু চান-টান সেরে নিয়ে গলা খাঁকারি দিচ্ছেন।

বড়ো বউ বলল, 'বাবার সময়জ্ঞানটা গেছে।'

মেজো বউ বলল, 'এইভাবেই সব যাবে আস্তে আস্তে।'

ছোটো বউ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার দাদুরও ঠিক এইভাবে গিয়েছিল দিদিভাই। সব থেকে আগে সময়জ্ঞানটাই যায়। এরপর দেখো খেয়ে বলবেন খাইনি তো। রাতে বলবেন, সকাল হল চা দিলি না? এ আমার নিজের চোখে দেখা আছে গো।'

বড়ো বউমা নিজে হাতে করে ভাত নিয়ে এল। কোনোমতে খাওয়া সেরে, আঁচিয়ে ঘরে দোর দিলেন ব্রজকিশোর।

আয়নার সামনে টেবিলের ওপর বই পেতে গালে হাত দিয়ে বিভোর হয়ে পড়তে লাগলেন। আজ ব্রজবাবু একখানা গল্প পড়ছেন, তার নাম 'হৃদয় রঞ্জনের সর্বনাশ'। লেখক বুদ্ধদেব বসু। পড়া শেষ হয়ে গেলে তিনি আরেকটা আরম্ভ করলেন না। উঠে পায়চারি শুরু করলেন। এই হৃদয় রঞ্জনটি অদ্ভুত মানুষ তো! তাঁর মতো একলা। মেসের ঘরে থাকত—ঘরের দেয়ালে স্যাঁতা ধরে নানান ছবি হত হৃদয় রঞ্জন সে দেখে সময় কাটাত, একবার কোথায় গেছে। এসে দ্যাখে মেস ম্যানেজার ঘর চুনকাম করিয়েছে, দেয়ালের ছবি সব অদৃশ্য। মেস ম্যানেজারকে সে এই মারে তো সেই মারে। ভাবতে ভাবতে ব্রজবাবু শুয়ে পড়লেন। অদ্ভুত লোক তো এই হৃদয় রঞ্জনটা। একাচোরা টাইপের। দেখতে পেলে তিনি ভাব করতেন ঠিক। দেয়ালের হাল? অ্যাঁ দেয়ালের ... বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি গেল তাঁর নিজের ঘরের পশ্চিম দেয়ালে। আচ্ছা তাঁর ঘরেও তো ছাপছোপ রয়েছে। দেখা যাক তো কোনো ছবি ছাবা হয় কিনা। ইলেকট্রিক ওয়্যার সমকোণে বেঁকে গেছে সিলিং-এর দিকে। কৌণিক বিন্দুতে একটি পোর্সিলেনের লাইট-শেড, ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব ঝুলছে। তার ওপর দিকটায় সিলিং ঘেঁষে একটা বেশ বড়ো ছোপ, নীল-নীল, সাদা-সাদা যেমন হয়। দেখতে দেখতে ব্রজবাবু আপন মনেই বললেন, 'ধুর।' আর সঙ্গে সঙ্গে সিলিং থেকে অদ্ভুত দর্শন একটা লোক তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল। লোকটার নাক প্রকাণ্ড। ধনেশ পাখির ঠোঁটের মতো। ঠোঁট জোড়া আড়াআড়ি শোয়ানো একটা বাংলার পাঁচ। চোখের চারপাশ নীল। মাঝখানে মস্ত বড়ো মণি জেগে রয়েছে। মাথাটা টাকে ভরা খালি কিনারে কিনারে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল সাদা চুল।

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে আছে দেখে ব্রজবাবুর হাসি পেল। বললেন, 'দূর টাকলু।' বলে লক্ষ করলেন লোকটার এইরকম চেহারা হলে কি হবে—যাকে বলে রাম বোকা। চোখটা ভেড়ার চোখের মতো। কেমন মায়া হয়। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় সমবয়স্ক, কিন্তু রাম বোকা একটা লোক যদি ঘরের মধ্যে সারারাত জেগে থাকে তো কিছু করার নেই। কাল আবার দেখা হবে।

খুব ভোরবেলায় ব্রজকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বেশ ঝরঝরে তরতরে লাগছে শরীরটা। সূর্য এখনও ওঠেনি। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। ব্রজবাবু উঠে পড়ে মুখ-টুখ ধুয়ে ফেললেন। জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লেন। এত ভোরে পার্কে কেউ কেউ বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু আড্ডা দেবার মেজাজে কেউ নেই। হনহন করে হাঁটছে সব। প্রাণের দায়ে। ব্রজবাবুও হাঁটতে লাগলেন, ধীরে সুস্থে, পাখির ডাক শুনতে শুনতে, ভোরের হাওয়া খেতে খেতে, গাছের পাতার আড়ালে সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে। রোদ একটু চড়া হতেই তিনি পকেট-ঘড়ি বার করে দেখলেন সাড়ে ছ-টা, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে খিলটি তুলে দিলেন। ছেলে-বউরা জাগলেও এখন সব যে যার বাথরুমে। কারুর নজর পড়েনি, বাইরের দরজা খোলা ছিল। ব্রজবাবুর মনে হল পরদিন তিনি তালা দিয়ে বেরোবেন।

সকালবেলাই তাঁকে এমন ভব্যিযুক্ত দেখে বড়ো বউ মুখ তুলল, 'বাবা কি কোথাও বেরিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ এই মানে একটু দরকার ছিল।' ব্রজবাবুর স্বভাবটাই এমনি। যা সত্য কথা, সেটাকে কিছুতেই বলতে পারেন না। পারেন না মানে, এদের কাছে পারেন না। একটু ঘুরিয়ে বলেন।

'বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, প্রাতর্ভ্রমণে গিয়েছিলুম' এ ধরনের কথা বলতে যেন ভীষণ লজ্জা।

তবে দু-চার দিনের মধ্যেই বাড়ির সবাই ধরে ফেলল। মুখ টিপে হেসে মেজো বউ বলল, 'বাবা এরকম গুজগুজে স্বভাবের কেন বলো তো দিদি?'

বড়ো বউ বলল, 'মা ছাড়া আর কাউকে বাবা ঠিক কথাটা বলতে অভ্যস্ত নন। লক্ষ করে দেখো। স্বভাব।'

পান মুখে ব্রজবাবু বিছানায় কাত হয়েছেন। পুবে মাথা পশ্চিমে পা। হাতে বই। আগের বই দুটি আদ্যোপান্ত শেষ হয়ে গেছে। ফেরত দিয়ে ব্রজবাবু আরও দুটি 'ছেলেদের' বই এনেছেন। এনেছেন ভুটুকে লুকিয়ে। ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রাখেন। নইলে ও ছেলের হাত থেকে আর বই উদ্ধার করতে পারবেন না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ব্রজবাবু হাসি হাসি মুখে পশ্চিমে দেয়ালে সিলিং ঘেঁষে তাকালেন,—'কী হে টাকলু, রামপাখি!' ওমা, টাকলুটা তো নেই। তার গাধা-বোকা চোখ নিয়ে টাকলুটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে, চশমা মুছে, এদিক-ওদিক চারদিক থেকে ঘাই মেরে মেরেও ব্রজবাবু লোকটার হদিস করতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ শক খেয়ে ব্রজবাবু বিছানায় চিত হয়ে পড়লেন। সিলিং-এর কোণ থেকে এক সাংঘাতিক মেয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। টিকোলো নাক, ইয়া লম্বা লম্বা চোখ, চোখের পাতা। লম্বা নিটোল ঘাড়। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, চোখে কটাক্ষ, ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। ঘাড় পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায়, তারপর আস্তে আস্তে সব কেমন আবছা হয়ে গেছে। ব্রজবাবু কোনোদিন গিন্নি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। এখন গিন্নি নেই। জানতে পারলে তিনি কী মনে করবেন? কিন্তু ব্রজবাবুর উপায় নেই। চোখ খুললেই সামনে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসছে মেয়েছেলেটি। আ গেল যা কী বেহায়া রে বাবা। ব্রজবাবু বেশ শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন, পাশ বালিশটি জড়িয়ে। এক মিনিট, দু-মিনিট, পাঁচ মিনিট। তিনি আবার চিত হলেন। বইটি তুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। তারপর যেই পাতা উলটে ওপর দিকে তাকিয়েছেন অমনি দেখলেন মেয়েটা নাচছে। গলার তলায় যেখানটা আবছা আবছা মতো ছিল সেখানটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। মুখটা চেনা চেনা। অনেক ভেবে তিনি মনে করতে পারলেন গিন্নি যে কী সব সিনেমা পত্রিকা নিতেন তারই কোনোটাতে মেয়েটিকে দেখে থাকবেন তিনি। গিন্নি ঘরে না থাকলে ড্রয়ার থেকে বার করে উলটেপালটে দেখতেন, পায়ের শব্দ শুনলেই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতেন আবার। খুব কৌতূহল হল। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে মেয়েটাকে দেখতে থাকলেন তিনি। ঝিরি ঝিরি বাকলের মতো গাছের পাতা দিয়ে করা একটা খাটো ঘাগরা পরেছে। নিটোল পা দুটি নাচের ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে। হাতে কি একটা মুদ্রামতো। ঠিক নাচ নয়, অঙ্গভঙ্গি, এমন অঙ্গভঙ্গি, নাঃ। ব্রজবাবুর রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে। তিনি চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, ভালো করে দেখতে দেখতে কেমন একটা অসহ্য পুলকে অবশ হয়ে আসতে লাগলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না।

কিছুদিন এমন হল ব্রজবাবুর আর ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না। দালানে ভাত খেতে যান, বারান্দায় একটু রাস্তা দেখেন বসে বসে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কতক্ষণে ঘরে ঢুকবেন, কতক্ষণে দরজা বন্ধ করবেন, যেন তিনি হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন। এত আগ্রহ, এত পুলকও যে তাঁর সাতষট্টি বছরের শরীরে মনে ছিল তা তিনি জানতেন না। বউরা বলাবলি করতে লাগল, 'বাবাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।' ছেলেরা বলল, 'কোনো নির্দিষ্ট কমপ্লেন নেই, ডাক্তারে কি করবে?' বউরা বলল, 'নাই থাক। থাকলেও তো বলবেন না। আমরা বাবা পরের বাড়ির মেয়ে, লোকে পাঁচ কথা বলবে কিছু হয়ে গেলে।' অগত্যা ডাক্তার এলেন। একগলি পরে বসেন। ছোটো ছেলে ডেকে আনল।

ব্রজবাবু বিকেলে বারান্দায় বসে আছেন। ডাক্তার এল। —'কী খবর দাদু?'

এই ডাক্তার তাঁর ছেলের বয়সি ঠিকই। মেসোমশাই বললে আপত্তি ছিল না। কিন্তু আজকাল

কেউই তাঁকে দাদু ছাড়া ডাকছে না। ডাক্তারের কোলকুঁজো চেহারার দিকে তাকিয়ে ব্রজবাবুর হাসি এল। এরপর তাঁর নিজের ছেলেরাই না তাঁকে দাদু ডাকে।

ব্রজবাবু বললেন, তুমি এদিকে কি মনে করে? এদের কারও শরীর-টরীর খারাপ না কি?

ডাক্তার বলল, খারাপ? না, না। আপনাকেই একটু চেক আপ করতে এলুম।

চেক আপ? আমাকে? কেন? আমার হয়েছেটা কী?

চেক আপের আবার হওয়া-হওয়ি কী?

ভালো করে দেখে শুনে ডাক্তার বলল, বাঃ। ভালো আছেন তো! খুব চনমনে। খিদে হয়?

দিব্যি।

ঘুম?

চমৎকার।

কোনো অসোয়স্তি?

উঁহু।

ঠিক আছে। প্রেশারটা একেবারে মার্জিনে আছে। ও কিছু না। পাতে নুনটা খাবেন না।

যাবার সময় কোলকুঁজো ডাক্তার ছেলেদের ডেকে হেসে বলে গেল, 'আপনাদের বাবা আপনাদের চেয়ে অনেক ভালো আছেন।'

ক-দিন ধরে ব্রজবাবু সিলিং-এ আর সিনেমার মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন না। মনটা খারাপ হয়ে রইল দু-তিন দিন। তারপর হঠাৎ নিজেই নিজে বললেন, 'ধুত্তেরি, এই বয়সে আর অত ধকল সয় না। গেছে তো বেঁচেছি।'

ব্রজবাবু আবার ভোরবেলা উঠে, সদরে তালা দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতে লাগলেন। ছেলেরা নিশ্বাস ফেলল। বউরা বলল, যাক।

দুপুরে ঘুমোলে আজকাল আর ব্রজবাবু রাতে ঘুমোতে পারেন না। তাই দুপুরটা প্রাণপণে বই নিয়ে, পত্র-পত্রিকা নিয়ে জেগে থাকেন। যদিও ভাত খাবার পর একটা ঢুল আসে। যাই হোক, দুপুরে জেগে থাকার জন্যেই বলা যায়, রাতের ঘুমটা নিশ্ছিদ্র হয়। ঠিক দশটা থেকে পাঁচটা। সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ব্রজবাবু বাথরুম গেলেন, জল খেলেন, তারপর চটিটি পাপোশের ওপর খুলে চিত হয়ে শুলেন। পুবে মাথা পশ্চিমে পা। চোখ তুলতেই ব্রজবাবু ভিরমি গেলেন। পশ্চিমের দেয়ালে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের পাটা, ঝাঁকড়া চুল, তার শেষ কোথায় দেখা যায় না। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ভীষণ রুষ্ট চোখে। ভয়ে ব্রজবাবু চোখ বুজলেন। কিন্তু বুজলে কী হবে? সেই মুখ সারাক্ষণ ভাসছে চোখের মধ্যে। ব্রজবাবু উঠছেন, জল খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বসছেন, স্বস্তি পাচ্ছেন না। বারান্দায় দিকের দরজা খুলতে সাহস হচ্ছে না। যদি ওইরকম রাক্ষসের মতো কোনো চোর বা ডাকাত ...। হঠাৎ মনে পড়ল, বারান্দা তো রটআয়রনের জালি ঢাকা। ব্রজবাবু তড়াক করে উঠে বারান্দায় চলে গেলেন, ঘরের দরজাটিতে শেকল দিলেন। আরাম চেয়ারটা পাতলেন। বাকি রাত সেখানেই আধশোয়া হয়ে কাটিয়ে দিলেন।

সকালবেলা তাঁকে বারান্দায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে, বড়ো বউ বলল, 'কাল যা গরম গেছে, দিল্লি লখনউকে হার মানায়।'

কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ব্রজবাবু বারান্দায় রাত কাটালেন। দুপুরবেলা ঘরের দরজা খোলা রাখেন, বই পড়েন, কোনোদিকে তাকান না কিন্তু রাত্তিরে শুনসান, প্রচণ্ড ভয়ে ব্রজবাবুর মতো লোকও দিশেহারা হয়ে যান। চতুর্থ দিন মাঝরাত্তিরে বৃষ্টি এল। পুবে ছাট। জালের মধ্যে দিয়ে ছাট এসে ব্রজবাবুর জামাকাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল। বুড়ো বয়সে কি ব্রজবাবু শেষে

নিউমোনিয়ায় পড়বেন? বুক ভরে একটা দম নিয়ে ব্রজবাবু বীরপুরুষের মতো ঘরে ঢুকলেন, গামছা দিয়ে গায়ের জল মুছলেন, ফতুয়া বদলালেন, তারপর শুয়ে পড়লেন, প্রথমে তাকালেন না, মনে মনে বললেন, 'হ্যাঃ। একটা ছায়া তার চেয়েও কম, একটা ছোপ—ক-দিন পরই পালটে যাচ্ছে, তাকে আবার ভয়! তুমিও যেমন।'

পুরো চোখ খুলে সিলিং-এর দিকে তাকালেন ব্রজবাবু। কিছু নেই। সিলিং দিয়ে লম্বা রেখার জল পড়েছে। ভয়ানক মুখ মুছে গেছে। কিছু সাদা, কিছু নীল, অর্থহীন দেয়াল। ব্রজবাবু খুব নিরাশ হলেন। কিছু না থাকার চেয়ে কি ভয় থাকাও ভালো? সেই রাত্তিরে ব্রজবাবু ঘুমোতে পারছেন না কারণ সব শূন্য। তাঁর দেয়ালে কোনো লিখন নেই। অবশেষে তাঁর ঘরের ভেতর থেকেই কে যেন তাঁকে প্রশ্ন করল, 'বেশ তো ব্রজ, কী তুমি দেখতে চাও? বলো? ওই দানব, ওই সিনেমার মেয়ে, না ওই বোকা? না কি আর কিছু, বল বল, বলে ফ্যালো।'

ব্রজবাবু বললেন, না না। ওসব তো দেখা হয়ে গেছে। নতুন কিছু দেখাও। নতুন কোনো মুখ। আমার নিজের মুখ, সেটা আমি এখনও দেখিনি। আয়নায় একরকম দেখি। গিন্নির চোখে একরকম দেখতুম। ছেলে-বউ, নাতিনাতনিদের চোখে আবার আরেক রকম দেখি। বাইরের লোকের ডাকে আমি সাড়া দিতে পারি না। তারা কাকে ডাকে আমি আদৌ বুঝতে পারি না। দেয়ালের ওপর যদি একবার আমার সঠিক মুখটি ফুটে উঠত।'

ঘরের মধ্যে থেকে স্বর বলে উঠল, 'এতদিন তো তাই-ই তোমায় দেখাচ্ছিলুম।'

ব্রজবাবু চমকে উঠলেন, 'কে? কে ওখানে? কে একথা বললে? সাড়া দাও।'

কেউ সাড়া দিল না। ব্রজবাবু খাটের তলা, আলমারির পেছন, টেবিলের তলা সব ভালো করে খুঁজে এলেন। কোথাও আবার কেউ না লুকিয়ে থাকে। নাঃ। নেই কেউ। তখন তিনি আবার চটি খুলে, পা মুছে, ফতুয়াটি দ্বিতীয় বার বদলে, কেন না খোঁজাখুঁজিতে ফতুয়া ঘামে ভিজে গেছে, পালঙ্কে এসে শুলেন। পুবে মাথা। পশ্চিমে পা। বললেন, 'তা হলে তোমাকেই দেখাও। তুমি কে! তোমাকেই দেখি।'

ব্রজবাবু কী দেখেছিলেন জানি না। কিন্তু পরদিন মুখের মৃদু মধুর হাসিটি দেখে সবাই বলল, 'বেশ গেছেন। সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতেই গেছেন। পুণ্যবান লোক তো সবসময়ে জীবন দিয়ে চেনা যায় না, মৃত্যু দিয়েও কখনও কখনও চিনতে হয়।'

গৃধ্রকূট

বোধগয়া থেকে ছেষট্টি কিলোমিটারের মতো অ্যামবাসাডরে। তিনটি জাপযুবক, একটি বাঙালি দম্পতি। জাপানিদের তীর্থযাত্রা, দম্পতির মধুচন্দ্রিমা। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শৈলগিরিতে ঘেরা পাঁচ-পাহাড়ি এই বৌদ্ধ তীর্থে দু-ধরনের যাত্রা কী অনায়াসে মিলে যায়।

ডিসেম্বরের দাঁত-কাপানো কুয়াশার ভেতর থেকে রোদ-ঝলমলে সকাল আস্তে আস্তে ফুটে বেরোচ্ছে। নরম রোদ। শালুক ফুলের মতো নম্র, নরম।

পাঁচজনের মধ্যে অন্তত চারজন কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। বুদ্ধে বুদ্ধে ছয়লাপ। তিব্বতি বুদ্ধ, থাই বুদ্ধ, নেপালি বুদ্ধ, ভুটানি বুদ্ধ, আর জাপানি বুদ্ধ মন্দিরের সেই আকাশচুম্বী বুদ্ধিমূর্তি।

বুলা জন্মেছে জুরিখে। এক পৃথিবীচর পরিবারের মেয়ে সে। বাবার সঙ্গে ছোটোবেলায় কত যে ঘুরেছে। ভারতবর্ষ তো বটেই, ভারতের বাইরেও।

নৈনিতাল, রানিক্ষেত্র, কৌশানি?

হ্যাঁ।

কুলু-মানালি-চম্বা?

হ্যাঁ।

মুসৌরি-দেরাদুন!

কতবার।

পূর্ণিমায় তাজমহল, মার্বল রক্‌স।

অবশ্যই।

অজন্তা-ইলোরা-ঔরঙ্গাবাদ-গোয়া?

সব। সব।

সবই বুলার যাওয়া, দেখা, কোনো কোনোটা একাধিকবার। অমন যে বিশাল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি—তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তার দেখা।

তাহলে তো তোমাকে হংকং নিয়ে যেতে হয়।

হংকং তো বাজার-নগরী। বিয়ের বাজার তো ওখান থেকেই করলাম। না হলে তোমার নাইকন ক্যামেরা, লেটেস্ট মডেলের রোলেক্স ঘড়ি, অ্যামস্টারডামের হিরের আংটি, সার্জিয়ো ভ্যালেনটাইনোর শেভিং কিট, ম্যানিকিয়োর সেট কোথা থেকে আসত?

তবে কি সুইজারল্যান্ড? সে তো আমার ক্ষমতায় আর ইহজীবনে কুলোবে না!

এই জায়গায় বুলা সতর্ক হয়ে যায়। ইচ্ছা প্রকাশ করলে যে বাবা সুইজারল্যান্ডের ব্যবস্থাটাও করে দিতে পারেন এ কথাটা কি বলা যায়? এতে তো কুমারেশের অমর্যাদা! কুমারেশের হলে অমর্যাদাটা তারও হয়। এই কথাটুকু ধনীর দুলালি হলেও সে মোক্ষম বোঝে। মলম-মাখানো গলায়

সে বলে—'আহা! সুইজারল্যান্ড কেন? অরোরা বেরিয়ালিস দেখতে নিয়ে যাওয়াও হয়তো একদিন তোমার হাতের পাঁচ হয়ে দাঁড়াবে! কে বলতে পারে?'

'নাঃ'—কুমারেশ মনমরা গলায় বলে।

কেন যে ও ওরকম নঞর্থক চিন্তা করে? বুলা তো সমানেই উৎসাহ দিয়ে যায়।

সে অগত্যা বলে, 'দূর, জায়গাটা সুন্দর হলেই হল। আর নতুন। নতুন হলেই ভালো হয়। ব্যস।'

বিদেশি ইলেট্রনিক্স গুডস-এর লোক্যাল এজেন্ট কুমারেশকে তার বিয়ে করার কথাই নয়। এ নিয়ে অশান্তি কি কম হয়েছে?

একটা স্ট্রোকের পর বাবা এখন অবসর নিয়েছেন। একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করেন। বলেছিলেন, 'কী পরিচয় ওর আমি দেব?'

মা বলেছিলেন, 'আহা, এম. কম. ডিগ্রিটা তো আছে? উদ্যমী হলে ওইখান থেকেই ও উন্নতি করবে। আমি ও দিকটা ভাবছি না। ছেলেটার আপনজন বলে কেউ নেই। কুটুম বলে কিছু থাকবে না?'

'ওটা একটা কথা হল? যত আপনার জন থাকবে ততই কমপ্লিকেশন বাড়বে। আপনার জন তো আমরাই হতে পারি। ছেলে তো বড়ো বংশেরই। হাটখোলার দৌহিত্র বংশ। কিন্তু আসল যে উদ্যমের কথা বললে, সেটাই ছেলেটার নেই। লোক তো কম চরালাম না জীবনে! আমরা বুঝতে পারি।'

'একশোবার', মা বলেছিলেন, 'তবে এ কথাও সত্যি যে মেয়েকে যদি কাছে রাখতে চাও তো এর চেয়ে ভালো পাত্র পাওয়া শক্ত। স্বাস্থ্য ভালো, চেহারা তো রূপকথার রাজপুত্র!'

'ওই দেখেই তো বুলাটা ভুলেছে।'

বুলার সামনেই আলোচনা হচ্ছিল। সে এই সময়ে ফোঁস করে ওঠে, 'তুমি ভোলনি? মা ভোলেনি? 'কী চমৎকার কথাবার্তা! রাজপুত্রের মতো চেহারা!'—বলোনি?'

'তা বোধহয় বলে ফেলেছি, আবছাভাবে হলেও মনে পড়ছে'—বাবা স্বীকার করেছিলেন। মা স্মিত মুখে চুপ।

'তবে? দোকানদার শুনেই চুপসে গেলে?'—বুলা বেশ চোখা চোখা কথা ব্যবহার করতে ভালোবাসে।

বাবা হেসে ফেলেন, 'সত্যিই তোর এত পছন্দ? হাবুডুবু খাচ্ছিস? না কী?'

খাচ্ছিই তো!

আর ও? ও কী খাচ্ছে?

ও বিষম খাচ্ছে। বলছে কোনোদিন যদি উন্নতি করতে পারে, আ চেন অফ শো রুমস ইন অল দা বিগ সিটিজ অফ ইন্ডিয়া, সে দিনই ও আমাকে প্রোপোজ করার কথা ভাবতে পারে!

কথাটা তো ঠিকই বলেছে। কাণ্ডজ্ঞানটা তাহলে আছে।

হয়তো বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ, সরি, মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাইয়ে দোকান-শৃঙ্খল ওর হবে বাবা। তবে তখন আর আমি বিবাহযোগ্য থাকব না। আমিও তখন তোমারই মতো রিটায়ার্ড।

মেয়ের কথার ধরনে বাবা-মা হেসে ফেলেছিলেন। একমাত্র সন্তান, কত আদরের। তার কথা কি শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেন?

তা জামাই দেখে সব ধন্য-ধন্যই করেছিল। বুলাও খুব জ্বলজ্বলে চেহারার মেয়ে। দু-তিন পুরুষে ধনীর ঘরে যেমন হয়। ফর্সা রং, বড়ো বড়ো চোখ, চোখা নাক। কিন্তু কুমারেশের রূপ একেবারে অন্য গোত্রের।

বেড়াতে বেরোতে ওদের একটু দেরিই হয়ে গেল। প্রথমত কুমারেশ তার বিয়ের যৌতুক পাওয়া ল্যান্সডাউনের শো রুমটা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়ত প্রচণ্ড গরম। ডিসেম্বরের গোড়া এখন। যখন দেখা গেল ভারতের সব বিখ্যাত রূপমহলই বুলার দেখা, তখন কুমারেশ এই চমৎকার ভ্রমণসূচিটি তার মাথা থেকে বার করে।

'গিরিডি গিয়েছো? ফুলডুংরি? রাজরাপ্পা? রাজগির?'

এত কাছে, অথচ বুলা যায়নি। সুতরাং সব ঠিকঠাক করে গর্বিত হাসি হেসে কুমারেশ বলে, 'চলো যাই বিহারে।'

নির্জনতার খোঁজে সে তার বউকে নিয়ে অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর জায়গায় ঘুরবে। বুনো ঝোরার ধারে ছিন্নমস্তার মন্দির, শাল-মহুয়া-পলাশ-পাইনের জঙ্গলে ছাওয়া ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট যেখানে ভালুকের ভয় আর সূর্যোদয়ের রোমাঞ্চ দুটোই সমান উপভোগের, পাহাড়ের ঢালে পাখির কলকাকলিতে ভরা নিঃসঙ্গ লেক..

কিন্তু আশ্চর্য কথা উশ্রী ফল্‌সে ওরা অভীষ্ট নির্জনতা পেলই না। ফল্‌সটাকে ঘিরে কত যে পিকনিক পার্টি। কত যে রকম-বেরকমের পোজ আর সেই সঙ্গে ক্যাসেটের কী যে মস্তানি! তবে কুমারেশের মতো গোমড়া মুখে বুলা বসে থাকেনি। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পিকনিক পার্টিদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, উশ্রীর এলোচুলের ধারায় চান করে যথাসম্ভব মজা করে নিয়েছে! উশ্রী বড়ো ভয়ংকরী। ওখানে চানটান করা বিপজ্জনক। ওরা দেখেছিল সেই স্পটটা যেখান থেকে পা ফসকে পড়ে বোল্ডারের পর বোল্ডারের ধাক্কা খেতে খেতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেসে গিয়েছিল একটি বেপরোয়া ছেলে মাত্র মাস তিনেক আগে।

তবু বুলা তাকে নামিয়েছিল, নিজে তো নেমেছিলই। একবার নামবার পর কুমারেশেরও নেশা ধরে গিয়েছিল। আর একটা, আরও একটা পাথরে যাবার জন্য ছটফট করছিল সে।

এই সময়ে একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'অনেক হয়েছে দাদা, খুব বীরপুরুষ আপনি, আর এগোলে নিজে যদি বাঁচেনও, বধূহত্যার দায়ে পড়বেন নির্ঘাত।'

কুমারেশ ভয় পেয়ে যায়, 'প্লিজ বুলা এবার ফেরো।'

'ওঃ, তুমি এক ভীতু!' —বুলা ঝাঁকিয়ে ওঠে।

কিন্তু বুদ্ধগয়ার সেই অশোকের-আরম্ভ-করা কানিংহামের-শেষ-করা মন্দির, শ্রীলঙ্কা থেকে আনা বোধিবৃক্ষের ছায়া আর আকাশছোঁয়া বুদ্ধমূর্তি দেখে ও কেমন ঘোরে আছে। জাপানি ছেলেগুলির মধ্যে তোসিকোই একমাত্র একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে, দু-দিন বোধগয়ার আই.টি.ডি.সি-র হোটেল অশোকে থাকাকালীন বুলা ওর কাছে থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক জাপানি জ্ঞান সঞ্চয় করছিল এবং ওকে তথ্য দিচ্ছিল।

'ওই দেখো ওই গৃধ্রকূট'—ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল বুলা।

ড্রাইভার বলল, 'বহি গৃধ্রকূট, মেমসাবনে ঠিক বোলি।'

'তুমি চিনলে কী করে?'—কুমারেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। বুলা হাতটা মাছি ওড়াবার ভঙ্গিতে নেড়ে বলল, 'দেখলেই তো বোঝা যায়। শকুনের পিঠের ঢালটা তার পর মাথার গোল আর বাঁকানো ঠোঁটের শেপ দেখলেই চিনতে পারা যায়। লম্বা গলাটা নেই।'

তোসিকোদের যতই দেখায় সে, তারা চিনতে পারে না, কুমারেশ তো নয়ই।

রাজগিরের টুরিস্ট বাংলোয় বুকিং ছিল। পা দিয়েই কুমারেশ খুশি হয়ে উঠল। সারা দোতলাটায় এক বৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি ছাড়া কেউ নেই। জাপানি তিনজন নীচে। ব্যাস।

'এই নাও তোমার নির্জনতা।' —কুমারেশ হেসে উঠল।

আমার নির্জনতা মানে? লোকজন হইচই আমার সবসময়ে ভালো লাগে। নির্জনতা তোমারই বেশি দরকার মনে হচ্ছে। এমন করছ যেন কোনোদিন আর আমাকে একা পাবে না।

ভ্রূভঙ্গি করে বুলা কুমারেশের কাছে ঘেঁষে আসে। তার মাথা কুমারেশের কাঁধ ছাড়িয়ে, মুখটা উঁচু করে সে আয়নার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'দেখো দেখো!'

আসল তোমাকে দেখব, না তোমার ছায়া দেখব?

আমাকেও না, আমার ছায়াও না, খাজুরাহোর ওই মিথুন-মূর্তি দেখো আয়নার বুকে।

এমন একটা মুগ্ধ আকুলতার সঙ্গে সে কথাগুলো বলে যেন সত্যিই কোনো শিল্পকৃতি দেখছে, যেন এক দম্পতির ক্ষণ-মিলনের দৃশ্য থেকে সত্যিই সে শাশ্বত মিথুনের কোনো দর্শনে পৌঁছে গেছে।

'মনে হচ্ছে না আমরা অনেক আগের যুগে ফিরে গেছি?' —বলতে বলতে শিউরে ওঠে বুলা।

...'রাজগৃহ থেকে রাজগির। রাজগিরের পথে-পথে পায়ে-পায়ে ইতিহাস।' গাইড বলছিল, 'অজাতশত্রু রাজা এই শহরের নাম দেন গিরিব্রজ।'

'না তো!' বুলা বলে, 'গিরিব্রজই আগেকার নাম। জরাসন্ধের সময়ে মানে মহাভারতের কালেই গিরিব্রজ নাম ছিল। রাজগৃহ নাম তো বিম্বিসারের সময় থেকেই।'

জাপানিদের সে বুঝিয়ে দেয়। ওরা পাঁচজনে এই গাইডের শরণ নিয়েছে।

'এই হল অজাতশত্রুর দুর্গ' পথের আশেপাশে ভগ্ন প্রাচীন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে গাইড বলে।

'না তো! অজাতশত্রুর দুর্গটা পাটলিপুত্র মানে পাটনায়। বৈশালীর ঠিক উলটো দিকে স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে দুর্গটা করেন অজাতশত্রু। এ দুর্গ তো মহারাজ বিম্বিসারের কবা। অজাতশত্রু তাতে হয়তো কিছু যোগ করেন।'

'ইউ সিম তু নো লত্ হিসত্রি?' তোসিকো শ্রদ্ধার চোখে তাকায়,

'ইউ স্তাদি?'

বুলা হেসে মাথা নাড়তে থাকে। না না, সে কিছুই জানে না। ক-টা কথা বলেছে বলেই এরা তাকে পণ্ডিত ঠাউরে নিয়েছে।

'মূল রাস্তা তো দুটো? ওমা ওই তো বেণুবন, ঢুকব না আমরা?' সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

গোছা গোছা বাঁশগাছ ফোয়ারার মতো আকার নিয়ে ওপরে ঠেলে উঠছে, ঠিক, ওটাই বেণুবন।

তবে যে বললে রাজগিরে আগে আসোনি? —কুমারেশ জিজ্ঞেস করে।

আসিনিই তো।

হয়তো পড়েছি। হয় তো পড়িনি...মুখে রহস্য মেখে কুমারেশের দিকে তাকায় বুলা।

মস্ত বড়ো ফলকের ওপর বেণুবনের পরিচয় লেখা :

এই বেণুবন বা বেলুবন ছিল লর্ড বুড্ঢাকে মহারাজ বিম্বিসারের প্রথম উপহার। জীবনের বারোটি বছর বেণুবনে দেশনা করেন লর্ড বুড্ঢা। অনুপম সৌন্দর্যের জন্য বেণুবন ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।

'বাঁশগাছগুলো গোছা গোছা করে লাগিয়ে মন্দ দেখাচ্ছে না অবশ্য। কিন্তু এমনকী সৌন্দর্য আছে এর, বুঝলাম না'—কুমারেশ বলে।

'তুমি কী মনে করেছ শুধু বাঁশগাছ দিয়ে বেণুবন সাজানো ছিল? বেণুর সৌন্দর্য অনুভব করে বিম্বিসারের বনবিভাগ বেণুর একটু প্রাচুর্যই রেখেছিলেন অবশ্য। কিন্তু আরও বহুরকম গাছ ছিল এ বাগানে। ফুলের তো সীমাসংখ্যা নেই। এত সুন্দর ছিল এ বাগান যে বিম্বিসার তাঁর এক রানি ক্ষেমাদেবীকে বেণুবনের সৌন্দর্য দেখাবার ছল করেই বুদ্ধদর্শনে নিয়ে এসেছিলেন।'

'কেন? ছল করে কেন?'—কুমারেশও বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছে।

'রানি ক্ষেমা যে গোড়ার দিকে বুদ্ধের ওপর হাড়ে চটা ছিলেন। ওই রানিই এই বেণুবনে বুদ্ধকে প্রথম দেখবার পর এমনই প্রভাবিত হন যে প্রব্রজ্যাই নিয়ে ফেলেন। এই যে এইখানে রানি ক্ষেমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের প্রথম দেখা হয়েছিল।' —নাটকীয়ভাবে বুলা একটা অশ্বত্থ গাছের দিকে আঙুল দেখায়।

সে মিটিমিটি হাসছে। সেদিকে তাকিয়ে তোসিকো বলল, 'ক্র? অর নো ক্র?'

কুমারেশ বলল, 'শি'জ জাস্ট কিডিং।'

'কিদিং? কিদিং?' —ওরা তিনজনেই তিরস্কারের চোখে বুলার দিকে তাকাল।

পরে কুমারেশ বুলাকে সাবধান করে দেয়, 'দেখো, ওরা কিন্তু বৌদ্ধ। বুদ্ধকে ওরা ভগবান বলে মানে। ওদের সামনে ওভাবে বুদ্ধকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা কোরো না।'

'তুমিই তো ঠাট্টার কথা বললে। আমি তো ঠাট্টা করিনি।' বুলা অবাক হয়ে বলল, একটু পরে বলল, 'আমি যদি বলি ওইখানেই সেই স্পট যেখানে ক্ষেমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে দেখেছিলেন বুদ্ধকে, এর বিপক্ষে তুমি কোনো প্রমাণ দিতে পারবে?'

'আড়াই হাজার বছর আগে কোথায় কী ঘটেছিল সে প্রমাণ আবার কেউ দিতে পারে না কি?' কুমারেশ বলল বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই।

প্রমাণ না পেলে আর ইতিহাস রচনা হচ্ছে কী করে?

তা অবশ্য। কিন্তু বুলা, তুমি যে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস এত জানো সেটা আমি জানতাম না।

জানিই তো!

জেদি মেয়ের মতো বুলা বলে, 'ধরো যদি বলি আজ যেখানে এই ট্যুরিস্ট বাংলো সেইখানেই বিম্বিসার রাজামশায়ের কোষাধ্যক্ষর কোয়ার্টার্স ছিল। যদি বলি এইখান দিয়ে, এই করিডর দিয়ে নূপুরের নিক্কণ তুলে হেঁটে যেতাম তখন গরবিনির মতো!' বুলা তখন নূপুর মেঝেতে ঠুকে ঠুকে বাজায়। ছুন ছুন ছুন শব্দ হয়।—'যদি বলি এক ভীষণ দস্যি আবদেরে মেয়ে ছিলাম আমি, বাবা-মা আমাকে সামলাতে পারতেন না! যখন যা ধরব, তা-ই চাই!'

'সে তো এখনকার কথাই বলছ। এর জন্যে আড়াই হাজার বছর আগে যেতে হবে কেন?'—কুমারেশ হেসে বলল।

দু-জনে বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে বসেছিল। সামনে বিস্তৃত লন। ধারে ধারে ফুলগাছ। সন্ধের ছায়ায় এখন সব আবছা হয়ে এসেছে। বুলা বলল, 'ওই তো সেই জানলা, যেখান দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে এক-দিন তোমায় দেখতে পেলাম। লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। কিছু একটা শয়তানি করেছিলে, বুঝলে? তোমাকে তখনকার পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

বুলা হেসে উঠল। কুমারেশ বলল, 'তখন পুলিশও ছিল?'

ছিল বইকি, নইলে একটা রাজ্য চলে?

তো তারপর?

তারপর আমি আবদার ধরলাম, তোমাকে আমার চাই। তখনও নিশ্চয়ই এখনকার মতো লালটুস দেখতে ছিলে। বাবা বলে-কয়ে জরিমানা দিয়ে তোমাকে রাজরোষ থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর ঘটাপটা করে বিয়ে হল।

'তারপর কাল শুনো এখন ভীষণ খিদে আর ঘুম পাচ্ছে', —বুলা হাই তুলল একটা, মুখে হাত চাপা দিয়ে আলগা করে, চোখে জল এসে গেছে।

এরই মধ্যে ঘুম?

বাঃ, কত হেঁটেছি, কত পাহাড় চড়েছি বলো তো? ব্রহ্মাকুণ্ড দেখে পুরো জরাসন্ধ কা বৈঠক পর্যন্ত উঠে গেলাম। সপ্তপর্ণী গুহা তো তারপর ঘুরে, আবার নেমে যেতে হয়। তুমি তো গেলেই না।

তোমাকেই বা কে যেতে বলছিল?

বাঃ, প্রথম বৌদ্ধধর্মসঙ্গীতির অকুস্থল! দেখব না? জানো তো ত্রিপিটক ওইখানেই প্রথম সংকলিত হয়। বিনয় পিটকের এডিটর ছিলেন একজন নাপিত, তাঁর নাম উপালি। ভাবতে পারছ?

উঃ, তুমি তো দেখছি একেবারে ইতিহাসের দিদিমণি হয়ে গেলে?

কবে যে জানতাম! ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে এসে মনে পড়ে যাচ্ছে,—বুলা আবার হাই তুলল।

মাঝরাত্তিরে কুমারেশকে ডেকে তুলল বুলা, বলল, 'মনে পড়েছে, ওই মেয়েটার নাম ভদ্রা, আর ওই লোকটার নাম সম্বুক।'

'কোন মেয়ে?' —কুমারেশ ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে, যে মেয়েটা এখানে থাকত, আর যে লোকটাকে সে জানলা থেকে দেখল!' —বলে বুলা আবার ধপাস করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

'যা বাবা। স্বপ্ন-টপ্ন দেখল না কী?' কুমারেশ উঠে বারান্দার দিকে জানলা খুলে একটা সিগারেট ধরায়।

শৈলগিরি। গৃধ্রকূট যার শিখর। রোপওয়েতে করে দুলতে দুলতে পৌঁছে যাওয়া। চমৎকার দুপুরে জাপানি বুদ্ধমন্দির শান্তিস্তূপ। পৃথিবীর যাবতীয় কলুষকালির উপর বাটি উপুড় করে দিয়েছে কেউ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জাপানের গড়া। শান্তিস্তূপ। বাইরেও অনুপম বুদ্ধমূর্তি। ভেতরেও। ধ্যানস্থ। তিনটি জাপ যুবক, একটি বাঙালি যুবতি নতজানু। বাঙালি? না মাগধী? 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলছে না কি তোসিকো? 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি', বলছে মগধিনী? ধর্মের শরণই আবার নেবে নাকি?

জাপানিরা স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে গেল। মধ্যদিন পার হয়ে যায় যায়! ছায়া পড়ে যায় যায়। গৃধকূট। গৃধ্রকূট! গৃধ্র চঞ্চু ক্ষয়ে গেছে কালের প্রকোপ। বাইরে থেকে চেনা যায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে বুঝি আজও সেই গৃধ্রকূট।

মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ। ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে যায়। আজ অনেক ঘোরা হয়েছে। শুধু আজই বা কেন? এই ক-দিন? এ যাত্রায়। ফেরবার সময়ে রাঁচি, রাজরাপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির। বেড়াতে বেড়াতে দু-জনে রুক্ষ পাথরের উপর অদৃশ্য পায়ের ছাপে পা রেখে রেখে কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত রাজগৃহ নগরটা দিনান্তের রোদে ঝিমিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে বিম্বিসারের কারাগৃহ, সোন ভাণ্ডার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটি প্রায় সমান্তরাল পথ নগরীর দৈর্ঘ্য ফিতে দিয়ে মাপছে।

বুলা হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'আর কোথাও যাব না বুঝলে? এই রাজগৃহর স্মৃতি নিয়েই এবার ফিরব।'

সে আবার কী? টিকিট কাটা, বুকিং রয়েছে।

তাতে কী? আমার আর ইচ্ছে করছে না।

যতটুকু চিনেছে বুলাকে কুমারেশ জানে এই ওর শেষ কথা। ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে যদি না করে ভগবানের বাবার সাধ্য নেই, ওকে দিয়ে সে কাজ করায়। অতএব এই রাজগির, এই গৃধ্রকূট, এই ই শেষ। নির্জন গিরিপ্রান্ত। গাছের আড়াল। কোথাও কেউ নেই। চোখে মোহ নিয়ে কুমারেশ ডাকে, 'এসো, এসো বুলা। এসো।'

বুলা ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় কুমারেশের বুকে। পরক্ষণেই একটা আর্ত চিৎকার গিলে নেয় গৃধ্রকূট। পাথরে ধাক্কা খেতে, খেতে, বাতাসে ওলট পালট হতে হতে নীচে পড়তে থাকে কুমারেশ। নীচে পড়তে থাকে।

বুলা তার ওড়না কোমরে গুঁজে নেয়। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। ও ভেবেছিল বুলা ওর বুকে ঝাঁপাতে গেলেই ও সরে যাবে। ও জানে না বুলা কত সতর্ক খেলোয়াড়। দিয়েছে একটা বিদ্যুৎগতিতে আপার কাট। এখন সে বুঝতে পারছে উশ্রীতে যে বোল্ডারটার দিকে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল লোকটা, সেটা কত পেছল, কত গড়ানে, পা দিলে আর দেখতে হত না, সঙ্গে সঙ্গে হড়াস, পাথর-ভরতি উন্মাদ জলে, যেখানে সাঁতারশিক্ষা কোনো কাজে লাগে না। এখন বুঝতে পারছে ট্রেন যখন হু হু করে ছুটছিল, তখন বারবার কেন খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল লোকটা। স্রেফ তাকে লোভ দেখাবার জন্যে। যাতে ওর দেখাদেখি সে-ও গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর সেই আকস্মিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

'চলন্ত ট্রেন থেকে দুঃসাহসিনী যাত্রিণীর পতন ও মৃত্যু।' তদন্ত কি আর হত না? হত। কিন্তু এ ক-মাসে বাবা-মার স্নেহ ভালোবাসা ভালোই আদায় করেছে লোকটা। না হলে বাবা বিশাল খরচ করে ল্যান্সডাউনের শো-রুমটা এত তাড়াতাড়ি...

আর সেই ফোন? দানাপুর জংশন থেকে শান্তিনিকেতনে বাবা-মাকে এস.টি.ডি?

বুলা বলছে...'চমৎকার আছি মা। দারুণ এনজয় করছি। একদম ভাববে না।'

তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কুমারেশ বলেছিল, 'চমৎকার ঠিকই। তবে মেয়েকে সামলাবার জন্যে আপনাদের আসা উচিত ছিল মা। ট্রেনের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো চাই, উশ্রীর জলে কেউ চান করে না, ওর করা চাই-ই।'

মা বলছেন, 'সে কী? বুলা বেপরোয়া সাহস ভালো না। কুমারেশের কথা শুনো।'

মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে গিয়েছিল। কোথায় বেসুর বাজছে, খচখচ করছে। প্রথমটায় সে বুঝতে পারেনি। ট্রেনের দরজায় ও তো দাঁড়ায় না, দাঁড়ায়নি। কুমারেশই তো দাঁড়ায়। সিগারেট মুখে নিয়ে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে। তবে?

রাজগিরের মাটিতে পা দেবামাত্র বুলা বুঝতে পারে। ভদ্রা, ভদ্রাই ওকে বলে দেয়। আড়াই হাজার বছর বয়সের এক সুন্দরী তরুণী, ভদ্রা। মগধ রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের একমাত্র আদুরে-আবদেরে মেয়ে। সে এক সুন্দর চোরের মোহে পড়ে। বাবা-মার সম্মতি আদায় করে বিয়েও করে। সবই দিয়েছিল তাকে—সুন্দর বরতনু, গরবিনি মন, সুউচ্চ উদার হৃদয়। কত সেবা, কত বিলাস, সৎ সুন্দর জীবনযাপনের কত আয়োজন। কিন্তু জাতচোরের স্বভাব যাবে কোথায়? একদিন পুজোর ছলে ভদ্রাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সমস্ত অলংকারে মুড়ে নিয়ে সম্বুক চড়ল গৃধ্রকূটে। তার পর বলে কি না, 'সব অলংকার খুলে দাও, অলংকারের জন্যই তোমায় বিবাহ করেছি।' ভদ্রা তীক্ষ্ণধী মেয়ে। বুঝেছিল শুধু অলংকার নিয়েই ক্ষান্ত হবে না দুর্বৃত্ত। তাকে হত্যা করবে। তাই সে অশ্রুমুখী সেজে শেষবার সালংকার আলিঙ্গনের প্রার্থনা জানায়, আর সেই ছুতোয় দুর্বৃত্তকে ঠেলে ফেলে দেয়।

গল্পটা কেমন করে যে তার জানা ছিল, কোথায় যে পড়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না বুলা। এখন এই মুহূর্তে তো নয়ই। এখন বুক কাঁপছে। ভীষণ দুঃখ। ভীষণতর হতাশা, ভীষণতম ভয়।

কিন্তু না, সে ভদ্রার থেকে আড়াই হাজার বছরের ছোটো হলেও আসলে তো আড়াই হাজার বছরের বড়োই। তখন ভদ্রা নিশ্চয় রাজদ্বারে সুবিচার পেয়েছিল। বিম্বিসার ধরতে পেরেছিলেন,

পারতেন, কে প্রকৃত অপরাধী, কে নয়। এখন সে রাজদ্বার নেই, সে বিচারক নেই। নেই সে জনগণ। এখন চলবে দিনের পর দিন খবরে-কাগুজে বিচার। স্টোরির খোঁজে পাপারাৎজি গল্পের মধ্যে গল্প খুঁজবে, উদ্দেশ্যর মধ্যে উদ্দেশ্য। জনগণ হয়তো চ্যাঁচাবে, 'মৃত্যুদণ্ড চাই, পতিঘাতিনীর মৃত্যুদণ্ড চাই!'

আলুথালু বসনে চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে বুলা শান্তিস্তূপের উদ্দেশে যেখানে তোসিকো আর তার দুই বন্ধু পরম শ্রদ্ধাভরে স্তূপ প্রদক্ষিণ করছে। আছড়ে পড়ে সে পাথুরে জমিতে।

'হোয়াত রং? হোয়াত রং?'—চকিতে তিন জাপ যুবক ঘুরে দাঁড়ায়। খসা টালি যত্ন করে বসাচ্ছিল জাপ কারিগর। ভেতরে ছিল মন্দিররক্ষক জাপ কর্মচারীকুল। সব বৌদ্ধ। ছুটে আসে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু যথেষ্ট।

'আমার স্বামী পাহাড়ের ওপর থেকে পা ফসকে পড়ে গেছেন। ফর লর্ড বুদ্ধ'জ সেক সেভ হিম। বাঁচান, বাঁচান ওকে।'

ছুটোছুটি পড়ে যায়। আতঙ্কিত ছুটোছুটি। সান্ত্বনাহীন কান্না কাঁদতে থাকে ভদ্রা।

আড়াই হাজার বছরেও লোকটার স্বভাব শোধরাল না?

ওতুলের প্রতিদ্বন্দ্বী

ওতুল নিজেকে গুঁই বলে না, ইংরেজি বানান অনুযায়ী বলে গুইন। এতে ওতুলের বাবার আপত্তি আছে যথেষ্ট, কিন্তু গুইন হিসেবে ছেলের দাপট অর্থাৎ সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে তিনি এ বিষয়ে আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। কেউ মি. গুইনকে ডাকতে এলে এখন তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই কবুল করেন এই মি. গুইন তাঁরই কুলপ্রদীপ, তিনি দেখছেন সে বাড়ি আছে কি না, ভারি ব্যস্ত মানুষ তো! ওতুল মস্তান নয় কিন্তু। সে নিজেকে বলে মস্তানের বাবা। অর্থাৎ তাদের এলাকার মস্তানরা—খেঁদা, ন্যাড়া, বীরু এরা ওতুলদার পরামর্শ ছাড়া এক পা চলে না। খেঁদা-ন্যাড়াদের কবজায় রেখে ওতুল পুরো এলাকাটাকেই কবজায় রেখেছে বলা চলে। এই প্রতিপত্তি অবশ্যই একদিনে হয়নি। এমনি এমনিও হয়নি। প্রথমত, ওতুলের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক যে তুলনায় দশাসই, ঠিক সেই তুলনায় মোলায়েম তার গলার স্বর এবং আচার-ব্যবহার। যে পাবলিক রিলেশনস প্রতিভা তার বাপ-ঠাকুরদা খদ্দের চরাতে চরাতে বহু জেনারেশন ধরে আয়ত্ত করেছেন, সেই দুর্লভ জনসংযোগক্ষমতা একরকম জন্মসূত্রেই তার হাতের আমলকী। অতি কৈশোর থেকে সে প্রথমে তার পাড়ার, তারপর তাদের এলাকাব, তারপরে আরও বৃহৎ এলাকার যাবতীয় ঝগড়া-কাজিয়া মেটানো ইত্যাদি অভিভাবকগিরি করে এসেছে অত্যন্ত সফলভাবে। প্রথম প্রথম পাড়ার বড়োরা তাকে 'জ্যাঠা ছেলে' বিশেষণে বিশেষিত করতেন। পরে ঠিক তাঁরাই বলতে আরম্ভ করেন, 'ওতুল বড়ো বিচক্ষণ ছেলে।' তাঁদের কারও ছেলে ঘোঁতন, কারও নাতি ট্যাঁপা, কারও মেয়ে বুঁচি এদের কেসগুলো ওতুল সমুদয় জট ছাড়িয়ে একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিত। সুতরাং প্রতিপত্তি ওতুলের হবে না তো কি সুবিকাশ সরখেলের হবে? এর ওপরে ওতুলের একটা সাংস্কৃতিক অ্যাঙ্গল আছে। সে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তো বটেই। উপরন্তু গান করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, এমনকি কলমের জোরও তার আছে। বিশাল কালীপুজো এবং সরস্বতীপুজো হয় তাদের পাড়ায়। দুটি পুজোরই জাঁকজমক এবং পরবর্তী সাংস্কৃতিক উৎসবসূচি আপনার আমার চোখ ট্যারা করে দেবার মতো। বিশ ফুট কালীপ্রতিমা বিসর্জনের সময়ে ওতুল যখন তার প্রকাণ্ড সাদা কপাল তেল-সিঁদুরে চর্চিত করে, সিল্কের পাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে লাল, রোমশ বক্ষপট বিদ্যুচ্চমকের মতো দেখাতে দেখাতে শার্দুলবিকৃত ছন্দে চলে, এবং তাকে কেন্দ্র করে খেঁদা, ন্যাড়া, বীরু ও সম্প্রদায় প্রবল বিক্রমে স্ট্যাম্প-মারা বিসর্জনি নাচ নাচতে নাচতে তার সঙ্গ নেয়, তখন বিশফুটি কালীপ্রতিমাই পুজ্য ছিলেন, না হলুদ সিল্কের ওতুলকৃষ্ণই সত্যিকারের পুজ্যপাদ ছিল বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

তবে কোনো মানুষের পক্ষেই সব মানুষের মন রাখা সম্ভব নয়। জনপ্রিয়তার বত্রিশপাটি হো-হো হাসির মাঝেমধ্যে দু-একটা ফোকলা দাঁতের ফাঁকি থেকেই যায়। কিছু হিংসুটে মানুষ বিসর্জনি মিছিলে সিল্কের বুকখোলা পাঞ্জাবি-পরিহিত ওতুলকৃষ্ণকে পুতুলকৃষ্ণ, বিপুলকৃষ্ণ ইত্যাদি বিকৃত নামে ডেকে নিজেদের মধ্যে মজা পেয়ে থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ঝুলবারান্দা থেকেই সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত নারী-জনতা বাবা-মা, জ্যাঠা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে ওতুলদার এই উদ্দণ্ড নত্যপর শ্রীচৈতন্যরূপ

বা প্রভুপাদরূপ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। এই সময়টায় জেগে এবং ঘুমিয়ে তারা কতরকম স্বপ্ন দেখে। সেসব কিশোরী তরুণীস্বপ্নের গোপনীয় ডিটেলের মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভালো।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা জলসার সময়ে ঘোষক বা ঘোষিকা অফ বম্বে ফেম থাকে, জনপ্রিয়তম লোকসংগীত গায়ক থাকে, নেচে নেচে গান-গাওয়া বিখ্যাত গায়িকা, সুন্দরী আবৃত্তিশিল্পী, সুকণ্ঠ শ্রুতিনাট্যনট ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা পাড়ার উঠতি প্রতিভাদের ওতুল এই সময়টায় সুযোগ করে দেয়। সুচন্দ্রা সান্যাল যে অবিকল আশা ভোঁসলেকে নকল করতে পারে, ট্যাপা ওরফে অরুময়কে যে কুমার অরু নাম দিয়ে অনায়াসে নামকরা আধুনিক-গাইয়েদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ছোট্ট গেনি যে জাত-বাউলদের মতো নাচতে এবং গাইতে পারে এসব ওতুলকৃষ্ণরই আবিষ্কার। সুচন্দ্রা সিনেমায় চান্স পেল বলে, গেনি তো সেই কবেই চিচিংফাঁক-এ ঢুকে বসে আছে। কুমার অরু 'তরুণদের জন্য'র জন্যে শিগ্‌গিরই অডিশন দেবে।

এই মরশুমটাতে এনতার প্রেমও হয়। পাড়ার কিশোরী-তরুণীরা পুজোয় বাবার বোনাস ভাঙানো মহার্ঘতম শাড়িটি পরে। রঙে-চঙে সুন্দরতম হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তারপর পরম অবহেলায় আয়রন-করা চুল দুলিয়ে, পিন-করা আঁচল উড়িয়ে ওতুলদা, ন্যাড়াদা, বীরুদাদের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে চলে যায়। মতামতের আদানপ্রদান হয়, জলসার নানা কাজের ভার পায় এরা, আর্টিস্টদের মনোরঞ্জন, খাবারদাবার এগিয়ে দেওয়া, অটোগ্রাফের খাতা দফায় দফায় সই করানো, পেল্লায় দায়িত্ব সেসব। এবং এইসব চলতে চলতে আঙুলে আঙুল ঠেকে, কাঁধে কাঁধ। শাড়ির আঁচল খসে, কোমরের রুমাল থেকে উৎকট সুগন্ধ বার হতে থাকে। পাটভাঙা কাগজের পোশাকের মতো কড়কড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি, পেখমধরা, ঘাড়ে কেয়ারি চুল, দু আঙুলের ফাঁকে পৌরুষব্যঞ্জক সিগারেট। ওতুলদা তখন আড়চোখে কার দিকে চাইল রে? রূপার দিকে। ধ্যাত্, ও তো সোমালির দিকে। টিঙ্কু কিছু বলছে না। মুখ টিপে টিপে হাসছে। সে, একমাত্র সে-ই জানে ওতুলদা, ন্যাড়াদা, ইত্যাদিরা কার দিকে চাইল। কার দিকে আর চাইবে? এমন ফিগার, এমন ঠোঁট, এমন কাজলপরা চোখ আর এ শহরে দুটো আছে নাকি? টিঙ্কু আয়নায় নিজেকে যতই দেখে ততই নিজে নিজেই মস্ত্ হয়ে যায়। তাই বলে কি আর পাড়ার সব ছেলে মেয়েগুলির পাড়ার মধ্যেই বিলিব্যবস্থা হয়ে যায়? তা হয় না। তা হবারও নয়। এসব হল মরশুমি প্রেম। নতুন শীতের হাওয়ার কারিকুরি। কার সঙ্গে বিয়ে হল? না ন্যাড়া-গুণ্ডার সঙ্গে। মিসেস ন্যাড়া গুণ্ডা! ছ্যাঃ। মেয়েরা আজকাল আগের মতো রাম-বোকা আর নেই।

অনেকদিন খালি পড়েছিল শম্ভু উকিলের জরদ্গব বাড়িটা। অতবড়ো বাড়িটায় দুটি মাত্র মানুষ। খালি পড়ে থাকা ছাড়া একে আর কী বলে? শম্ভু উকিল মারা যাবার পর একতলা বাড়িটাতে রইল সুদ্ধু শম্ভু উকিলের আইবুড়ো বোন ধিঙ্গি দুগ্‌গা, বা দুগ্‌গা দিদি, আগেকার দিনে হলে যাকে ইন্দির ঠাকরুনের মতো দুগ্‌গা-ঠাকরুন বলে ডাকা হত। তো এই দুগ্‌গা ওতুলের সঙ্গে লড়ে গেল। অনেকদিনের নজর ছিল ওতুলের বাড়িটার ওপর। অনায়াসে একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা যায়। বিঘেখানেক জমির ওপর একটেরে একতলা। চার পাঁচখানা বড়োসড়ো ঘর। লাইব্রেরি, ইনডোর গেমস্, আড্ডা ও অফিসঘর, সব এক ছাতের তলায় হতে পারবে। খোলা জমিটা সাফসুফ করে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ব্যায়ামগার, পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ড্রিল-টিল, দরকারমতো জলসার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সবই এক জায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কত সুবিধে বলো তো? শম্ভু উকিলের ক্যানসারের যন্ত্রণা যতই বেড়ে ওঠে, ওতুলকৃষ্ণদের হৃদয়ও ততই আশা-উদ্‌বেল হয়ে উঠতে থাকে। ঠাকুরপুকুরে নিয়ে যাওয়া, শেষমেশ হিন্দুসৎকারের গাড়ি, ঠোঙাভরতি খই-পয়সা, সাদা পদ্মের রিদ সবই ওরা করল। পাড়ায় বিরাট করে শোকসভা হল। কনডোলেন্স। শম্ভু

উকিল যে কত বড়ো মহামানব ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জনের মতো গুপ্তযোগী, দেশপ্রাণ, মহাপ্রাণ সেসব কথা জ্বালাময়ী ভাষায় ওতুল সবাইকে বুঝিয়ে দিল। অনেকেরই চোখে জল। কারও রুমাল ভিজে সপসপ করছে, কেউ থাকতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলছে, খালি দুগ্‌গা মুখ বেঁকিয়ে, পানের পিক ফেলে বললে, 'ঢ-অ-অ-ং। বক্তিমে শুনে আর হেঁসে বাঁচিনে।' সুতরাং দুগ্‌গার হাত থেকে শম্ভু উকিলের বাড়িটা চটপট উদ্ধার করা আর হয়ে উঠল না। শম্ভু উকিলকেও মরণোত্তর পল্লিরত্ন, কি দানবীর উপাধি দেওয়া গেল না।

দুগ্‌গা রক্ষিত আবার আরেকটি কম্মো করলে। একঘর ভাড়াটে এনে বসালে। ওতুল কত করে বোঝালে আজকালকার দিনে সব আইন ভাড়াটেদের পক্ষে। ভাড়া-বসানো আর খাল-কেটে কুমির আনার মধ্যে কোনোই তফাত নেই। ওই ভাড়াটে দুগ্‌গাদিদি শেষ পর্যন্ত ওঠাতে পারবে না। এই বাজারে লাখ-লাখ টাকার জমি দুগ্‌গাদিদির হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুগ্‌গা রক্ষিতের ওই কথা, 'তোদের গভ্‌ভে যাওয়ার চেয়ে বরং ভাড়াটেতেই গিলুক। তোরা আমাকে দূর করে দিবি। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবি। তাস পিটে, টাসা পিটে হল্লা করে নরক গুলজার করে তুলবি। তার চেয়ে ভদ্দরলোক তার পুত-পরিবার নিয়ে শান্তিতে থাকুক। নিজের ঠেঁয়ে নিজের মতো। অকালকুষ্মাণ্ডর দল, তোদের তাতে কী? দাদা নেই, আমার এখন নিজের খরচ-খর্চা নিজেরই চালাতে হবে। বুঝলি? যা এবার পালা।' ওতুল যাদেব দাঁতে কাঁকরের মতো ফুটে থাকে সন্দেহ নেই দুগ্‌গা রক্ষিত তাদেরই একজন।

ভাড়া তো হল। ঝাঁকড়া চুল, মোটা চশমা পরা ধারালো চেহারার এক যুবক, তার পেছন পেছন মেরুদণ্ড সিধে এক-বিনুনি-করা এক রোগা যুবতি এবং দুটি প্রায় এক সাইজের ভারী-ভুরি বাচ্চা এক টেম্পো মাল নিয়ে এসে নামল। দু-চার দিনের মধ্যেই শুনতে পাওয়া গেল—এ ভদ্রলোক যে সে নয়। উদীয়মান কবি আর্যশরণ ঘোষ। কবি আর্য ঘোষের আবার প্রধান বৈশিষ্ট্য সে নাকি লড়াকু মানুষ। শুধু পদ্যই লেখে না, নানারকম সমাজসেবামূলক কাজকম্মো করে থাকে। যুবতিটি তার স্ত্রী নয়, বোন। আর্য ঘোষ আসবাব কয়েক মাসের মধ্যেই শম্ভু উকিলের বাড়ির সংলগ্ন জমির চেহারা ফিরতে লাগল। ওরা নাকি ফুল ভালোবাসে। মাথাভরতি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে আর্যশরণ আর তার বোন যখন চুবড়ির মতো ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকার দেখাশোনা করে, পাঁচ রকমের জবা আর সাতরকমের গোলাপ গাছে সার দেয়, তখন কাছাকাছির ঝুলবারান্দায় উঁকিঝুঁকি চলে। রূপা বলে, 'ফ্যানটা, বল টিঙ্কু!' টিঙ্কু বলে, 'কোনগুলো? ডালিয়া না ক্রিসেনথিমাম না গ্ল্যাডিয়োলাস?' রূপা মুচকি হেসে বলে, 'তোর মাথা।' টিঙ্কু বলে, 'আই সি।' দুজনেই দুজনকে বোঝার মজায় হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকে যায়।

সেবার কালীপুজোর ফাংশনে সভাপতি করা হল আর্যশরণ ঘোষকে। ওতুলই করল। ওতুল বড়ো উদার চরিত্রের ছেলে। একথা বলতেই হবে। সে গুণের আদর করতে জানে। তা সেই সভার সভাপতির ভাষণ, এলাকাকে কাঁপিয়ে দিল। সে কি কবিতা, না জ্বলন্ত ফুলঝুরির মতো শব্দঝুরি, সে কি উপদেশ না অনুপ্রেরণা পাড়ার লোক ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু তারা একেবারে বোওল্ড হয়ে গেল। এমন অপরূপ করে যে কেউ শক্তিপুজোর ব্যাখ্যা করতে পারে, এমন কাব্যময় ভাষায় অনর্গল বলে যেতে পারে কাউকে মুহূর্তের জন্যেও 'বোর' না করে, বলবার সময় কারুর চেহারা যে এমন প্রদীপ্ত মশালের মতো হয়ে উঠতে পারে, এলাকার লোকের অভিজ্ঞতার মধ্যে এসব ছিল না। সেবার কালীপুজোয় যা হবার হয়ে গিয়েছিল। সরস্বতীপুজো হল একেবারে অন্যরকম। স্থানীয় আর্টিস্ট সুকেশ মিস্তিরকে দিয়ে কাগজের প্রতিমা হল। বাসন্তী রঙের মণ্ডপ হল। পলাশ গাঁদায় ছেয়ে গেল বেদি। আলপনা হল মনে রাখবার মতো। পুষ্পাঞ্জলি দিতে এল দফায়

দফায় সব্বাই। সরোদ, সেতার, বাছা বাছা গান, এবং সন্তুর ছাড়া আর কিছু বাজল না, তা-ও মৃদুস্বরে। শ্বেতপদ্মাসনা দেবী স্তোত্র গানের মধ্যে দিয়ে শান্তভাবে ঘটবিসর্জন হয়ে গেল। সবার মনে হল এমন পুজো আর কখনও হয়নি, আবার হবে কি?

পাড়ার সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান ওতুলকৃষ্ণ। তাই বলে স্থায়ী নয়। একেবারে গণতান্ত্রিক উপায়ে, সবাইকার মতামত নিয়ে ব্যাপারটা হয়, তবু জানা কথাই ওতুলই প্রেসিডেন্ট হবে। এবার আশ্চর্যের বিষয়, পাড়ার কিছু মাতব্বর ব্যক্তি বললেন, 'আর্যকে করা হোক না কেন? ছেলেটার এলেম আছে।' ততোধিক আশ্চর্যের বিষয়, ন্যাড়া, মস্তান ন্যাড়া, ওতুলদার ডান হাত ন্যাড়া, যাকে বেপাড়ায় ন্যাড়া গুণ্ডা বলে উল্লেখ করা হয়, সেই ন্যাড়া এতে সায় দিল, 'সত্যিই তো ওতুলদা কদ্দিক সামলাবে? তবে হ্যাঁ, ঝামেলা পোয়াতে হয় সেক্রেটারিকে, আর্যদা না হয় সেক্রেটারি হোক, ওতুলদা যেমন প্রেসিডেন্ট ছিল প্রেসিডেন্ট থাক।' সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেল। ক্লাবের খাতা-পত্তর, বিল বই, অডিট-রিপোর্ট, সুভেনির এভরিথিং চলে গেল আর্যশরণের খপ্পরে।

সমস্ত ঘটনাটার পর ন্যাড়াকে ডেকে রক্তচক্ষে ওতুল বলল, 'এর পর ফের ওতুলদা আজকে একটু মাল খাওয়াও বলিস, বলতে আসিস।'

ন্যাড়া অবাক হয়ে বলল, 'যাচ্চলে, তুমিই তো প্রেসিডেন্ট, মানে সব্বেসব্বা রইলে। আর্যদা খালি খেটে মরবে। আসলে কি জানো, পাবলিক যা চায় মাঝেমধ্যে তা দিতে হয়, নইলে শালা ডেমোক্র্যাসিও মচকে যাবে, পাবলিকও খচে যাবে। রূপা-টিঙ্কুরাও আর্যদাকে চাইছে। দাওই না চান্স একবার মাইরি।'

মাসখানেকের মধ্যে খাতা-তহবিল সব মিলিয়ে-টিলিয়ে আর্যশরণ একদিন ওতুলকৃষ্ণকে ডেকে পাঠাল। বেশ সুগন্ধি চা খেতে খেতে, খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, 'আচ্ছা ওতুল, তুমি কী করো?'

'কী করি? মানে? দেখতে পান না কী করি আর কী না করি?'

'এগজ্যাক্টলি। দেখতে পাই। ওতুল, আজকালকার দিনে কেউ আশা করতে পারে না একটা মানুষ দিবারাত্র আর পাঁচজনের জন্যে বিনামাশুলে খেটে যাবে। দিস ইজ টু মাচ। তুমি ন্যাড়া, খেঁদা, বীরু এবং আরও যারা ক্লাবের বিভিন্ন কাজ সারাবছর ধরে করে যাও, অথচ যাদের কোনো আয় নেই, তাদের একটা লিস্ট করে ফেলা যাক। জনা ছয় সাতের বেশি হবে না বোধহয়। আমার প্রস্তাব তাদের প্রত্যেককে ক্লাবের হোলটাইমার হিসাবে কিছু মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করা যাক।'

ওতুল বলল, 'দে দ্দেখুন আর্যদা, এটা আমাদের অপমান করা। ন্যাড়া বীরুদের অপমান করা। আমরা যেটা করছি সেটাকে বলে মানবসেবা, কথাটা শুনেছেন?'

আর্যদা প্রশান্তমুখে বললেন, 'শুধু মাসোহারা নয়, পুজো বাবদ সুভেনির ইত্যাদির জন্য যে যত বিজ্ঞাপন আনবে তার কিছুটা পার্সেন্টেজও কমিশন হিসাবে তোমাদের দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক। হিসেবের খাতায় যে বিরাট বিরাট গরমিলগুলো রয়েছে সেগুলোকে তোমাদের প্রাপ্য বকেয়া বলে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া হবে। তাহলেই হল। নইলে এইসব খাতাপত্তর, সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকার থেকে ট্যাক্স নিয়ে তৈরি তহবিল, এসব প্রহসন হয়ে যায় ওতুল।'

আর্যশরণের পরের চালটা এল আরও সংঘাতিক। সে কালীপুজোর প্রস্তুতিপর্বে বলল, 'বিশ ফুট প্রতিমা করে প্রতিবছর বিসর্জনের সময় ওভারহেড তার-কাটা সে বড়ো বিশ্রী। দশ ফুট প্রতিমা আরও অনেক সুন্দর হবে। কুমোরটুলির নারায়ণচন্দ্র পালকে দিয়ে করাও, অপূর্ব শ্যামামূর্তি করে দেবেন। আর রাস্তা আটক করে লরি, টেম্পো, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, রিকশা এদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় কোরো না। মানুষকে এভাবে প্রেশারাইজ করা ঠিক না। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে

না। কিন্তু আমি জানি গতবছর মুদির দোকানের তারাশংকরকে সাড়ে চার হাজার টাকা চাঁদা দিতে বলেছিলে বলে সে বেচারির স্ট্রোক হয়ে যায়। এগুলো ঠিক না।'

কালীপুজোর রাতে একটি জমজমাট কারণসভা বসত। সেটাও এবার বসল না।

ওতুল যেমন উদারতায় বশিষ্ঠ, তেমনি বুদ্ধিতেও আবার সত্যি-বৃহস্পতি। সে সাপের লেজে পা পড়ার অপেক্ষাটিতেই ছিল। খ্যাঁদা, বীরু, ন্যাড়ার সঙ্গে তার গোপন বৈঠকগুলো ঘনঘনই বসতে লাগল।

টিঙ্কুর বাবা রতনমণি ঘটক, রূপার বাবা সারদাচরণ সরকারকে ডেকে বললেন, 'সারদা, এসব কি শুনছি?'

সারদাচরণ বললেন, 'শুনেছ? তুমিও শুনেছ তাহলে? ছোকরা ভদ্দরলোকের মতন থাকে...' রতনমণি বললেন, 'শুনব না মানে? পরস্ত্রী ফুসলিয়ে এনে বোন সাজিয়ে সবার চোখের ওপর বাস করবে, আর শুনব না?'

'কী কেচ্ছা, কী কেলেঙ্কারি, শেষকালে কি সেই লিভিংটুগেদার না কী বলে, সেসব ব্যভিচার এইখানে, এই পাড়াতেই আরম্ভ হল?'

সুচন্দ্রার মা একদিন শম্ভু উকিলের বাড়ির ভেতর গিয়ে কখানা শোবার ঘর দেখে এলেন। রিপোর্ট হল, একটা ডবল বেড। আর একখানা তক্তপোশ। বেশ লম্বা চওড়া, ইচ্ছে করলে দুজনেও শোয়া যায়।

এক রবিবার সকালে হতভম্ব আর্যশরণ দেখল তার বাড়ির সামনের বাগান তছনছ করতে করতে এগিয়ে আসছে বেশ বড়োসড়ো একটা মারমুখী জনতা। তাদের মুখে অসন্তোষ, ঘৃণা, জিভে অকথ্য গালাগাল। একেবারে সামনে কিছু প্রৌঢ়, গুটিকয় বৃদ্ধ। তাঁরা বললেন, তাঁদের চক্ষুলজ্জা মানসম্ভ্রম ইত্যাদি অনেক কিছুর বালাই আছে। হঠকারিতা তাঁরা প্রাণ গেলেও করতে পারেন না। তাঁরা তাকে কিছুই বলবেন না। শুধু এই ভদ্রলোকের পাড়া ছেড়ে আর্যশরণ অন্যত্র উঠে যাক। যেসব জায়গায় এসব চলে, যাক না সেখানে। সাতদিনের মধ্যে যদি না যায়, তাহলে পরিণামের জন্যে তাঁরা দায়ী থাকবেন না। ছেলেপুলে নিয়ে ভদ্রপাড়ায় ঘর করেন কি না সকলে। ছেলেদের এডুকেশন, মেয়েদের বিয়ে সবই তো তাঁদের ভাবতে হবে। জনতার মধ্যে ওতুল, কিংবা তার শাকরেদরা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল।

আর্যশরণ ঘটনার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু দুগ্‌গা এ পাড়ারই মেয়ে। সে ঠিকঠাক বুঝেছিল। ভাঙাবাড়ির ন্যাড়া ছাতে উঠে সে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'জানিস, অলপ্পেয়েরা গীতুকে গীতুর শ্বশুরবাড়ি থেকে যতুকের জন্যে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল, ওর বাপ-জ্যাঠা অনেক কষ্টে উদ্ধার করে এনেছে, জানিস রাস্তায় দু-দুবার অ্যাসিড-বাল্‌ব ছুড়েছে, ফস্‌কে গেছে তাই। আর্য ওর পিসির দ্যাওর, যদি বিপদের সময়ে মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে তো বেশ করেছে, খুব করেছে, ডাইভোর্স মামলা হয়ে গেলে যদি ওকে বিয়ে করে তো বেশ করবে, খুব করবে। আমার বাড়ির মানুষ, সে কী রকম আমি জানি না তোরা জানবি ঘোড়ার ডিমের দল? এক্ষুনি এখান থেকে বিদায় হ, আমার সম্পত্তির ক্ষেতি করিছিস, আমি শম্ভু উকিলের বোন, হরিহর উকিলের বেটি, তোদের নামে মামলা রুজু করব। ক্ষেতিপূরণ দিতে তোদের ইয়ে বেরিয়ে যাবে।'

জনতা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। দুগ্‌গা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে, 'এসব ওই ওতুল হতচ্ছাড়ার কাণ্ড। কালীপুজোর ফন্ড্ নিয়ে সোমবচ্ছর নেশাভাঙের ব্যবস্থা চলছিল। আর্য সেটি বন্ধ করেছে কি না...।'

পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। কোনো জনতাকে মারমুখী করে তুললে, সে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তো

আরেকটি লক্ষ্য সে বেছে নেবেই। শক্তিটার খরচ হওয়া চাই তো! জনতার মধ্যে শুধু সারদা-রতনমণির মতো প্রৌঢ়ই ছিল না, বেশ কিছু তাগড়া জোয়ানও ছিল যারা কুৎসা শোনবার আগে আর্যশরণের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। এরা ফিরে গিয়ে চাঁদমারি করে ওতুলকে। আর্য এবং তার বউদির ভাইঝি গীতা মাঝে পড়ে না থামালে ওতুলকে হাসপাতালে যেতে হত? আপাতত সে শুধু নাক-আউট হয়ে ছাড়া পেল।

কিন্তু আর্যশরণ দুগ্‌গাদিদির শত অনুরোধেও, পাড়ার মাতব্বরদের হাজার ক্ষমাপ্রার্থনাতেও ও পাড়ায় আর রইল না। বলল, 'গীতার ছোটো ছোটো ছেলে দুটির পক্ষে অভিজ্ঞতাটা বড়ো মারাত্মক হয়েছে। গীতাও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।' একদিন সকালে শম্ভু উকিলের শূন্য বাড়ি যেমন হঠাৎ ভরে উঠেছিল চায়ের গন্ধে, ফুলের শোভায়, উৎসুক যুবক-যুবতিদের কলকণ্ঠে, বাচ্চাদের খেলার আওয়াজে, আর একদিন সকালে তেমনি আবার পূর্ণ বাড়ি শূন্য হয়ে গেল। বাগানময় শুধু সটান শুয়ে রইল কিছু মরশুমি ফুলগাছের মৃতদেহ। পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়া থ্যাঁতলানো টম্যাটো আর বেগুন। ঘরগুলোর মধ্যে দু-চারটে ছেঁড়া পাতা, ফেলে-যাওয়া ক্ষয়াটে অ্যালুমিনিয়মের ঢাকনি, খালি শিশি বোতল, ফাটা বল আর ডাঁই করা খবরের কাগজ।

অনেক অনে-ক দিন হয়ে গেছে। প্রতিভাবান ওতুল তার পাড়াতে আবার আগের প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছে। যদিও কালীপুজোর সমারোহের দিন আর কখনোই সেভাবে ফেরেনি। ন্যাড়া, খ্যাঁদা এখন সোজাসুজিই রাজনৈতিক নেতাদের মাস্‌ল্‌ম্যান। বীরু একটা বহুতলের কেয়ারটেকার। ওতুল তার বাবার গয়নার দোকানে নিয়মিত বেরোচ্ছে। বেশ জমাট প্রতিপত্তিঅলা ভবিষ্যুক্ত ধনী ভদ্রলোক। বাবার আমলের রাক্ষুসে তেলখাওয়া অ্যামবাসাডরটাকে বিদায় করে সে একটা ঝাঁ-চকচকে তন্বী মারুতী-ভ্যান কিনেছে। ধবধবে সাদা। বর্ধমানের ভেতর দিকে গাঁয়ের চাষবাস দেখতে গিয়েছিল, ফেরবার সময় কাইতির কাছাকাছি একটা মাঠে দেখল প্রচুর ভিড় জমেছে এবং ভিড়ের মধ্যে থেকে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে সাদা সুতোর ছড়াছড়ি এক পরিচিত চেহারার ভদ্রলোক মোটা ফ্রেমের মধ্যে অন্যমনস্ক চোখ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। গাড়ি থামিয়ে ওতুল তার গিলে করা পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নেমে এল। সে ভারি উদার স্বভাবের মানুষ।

'আর্যদা না? কেমন আছেন?'

হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'আরে চেনা-চেনা লাগছে খুব, প্লেস করতে পারছি না তো ঠিক....।

আমি ওতুল! সদর বক্‌শির ওতুলকৃষ্ণ গুইন।

'ওতুল! ওতুলকৃষ্ণ? ওহো, সেই লাইব্রেরি করতে তেত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন না?' বড়ো বড়ো চোখ করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন আর্যশরণ। আত্মগত বলতে থাকেন, 'টাকার অ্যামাউন্টটাই বড়ো কথা নয় ওতুলবাবু, দেবার ইচ্ছের মূল্যটা টাকার মূল্যের থেকে অনেক বেশি। আমি আজকের পথনাটকে এটাকেই আমার থিম করেছিলাম। গ্রামের লোকে বেশ নিল কিন্তু! ভারি এনজয় করল, দেখি আবার আমার ট্রুপের ছেলেমেয়েগুলো কোথায় গেল।... আসছি।'

ওতুল দেখল, আর্যশরণ ঘোষ তাকে এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ঘটনাবলি বেমালুম ভুলে গেছেন!

অনিকেত

অদ্ভুত একটা কিনকিন কিরকির আওয়াজ করতে করতে দেয়াল ঘড়িতে ভোর চারটে বাজল। অনেকক্ষণ আগেই জেগে গিয়েছিলেন অনিকেত রায়মহাশয়। তিনটে বাজাও শুনেছেন জেগে জেগে। অনিদ্রার রাতে এইসব ঘড়ির আওয়াজ যে কী গা-শিরশিরে হতে পারে অনিকেতবাবুর চেয়ে ভালো তা কেউ জানে না। তবু কী একটা মায়ার বশে ঘড়িটাকে তিনি অবসর দিতে পারেননি। তাঁর দাদামশায়ের ঘড়ি। চমৎকার চলে এসেছে চিরকাল। ঘড়ির এইরকম চলে আসাটাকে কোনো ব্র্যান্ড-নেমের গৌরব মনে করার কোনো কারণ নেই। কত সুইস, কত জার্মানই তো এল গেল। কে ফাস্ট যাচ্ছে, কে স্লো, কার টাইম বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ প্রলাপ বকছে। কিন্তু অনিকেতবাবুর দাদামশায়ের ঘড়ি টিকটাক ঠিকঠাক চলছে। সাত জার্মানি জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে। এ কৃতিত্ব জগাইয়েরই। আসল কথা কোনো কোনো ঘড়ি যন্ত্র হলেও ঠিক যান্ত্রিক থাকে না শেষ পর্যন্ত। প্রাণটান গোছের কিছু একটা পেয়ে যায়। জগাই পেয়েছে। এটাকে একটা মির‍্যাক্‌ল্ বলা যায়। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অনিকেতবাবু খসখসে গলায় বললেন, 'তুই যদি পারিস জগাই তো আমিই বা পারব না কেন? পেরে যাব ঠিক। কী বল!'

'টিক টক'—জগাই বলল।

'টিক টক? ঠিক কথা বলছিস?' ... অনিকেতবাবু বললেন, 'তা হলে পারি? পেরে যাই?' বলতে বলতে সজোরে কম্বলটা সরিয়ে বিছানার বাইরে এক লাফ মারলেন অনিকেতবাবু। পা দুটো ঝনঝন করে উঠল। কিন্তু ওইটুকুই। ফাটা, ভাঙা এসব কিছু হল না। হৃষ্ট মুখে কনকনে ঠান্ডা মেঝের ওপর সোজা পায়ে ল্যান্ড করলেন অনিকেতবাবু।

'ডাক্তারেরা কিন্তু বলে থাকে ঘুম থেকে উঠে হুটোপাটি করবেন না। ধীরে সুস্থে কয়েকটি আড়মোড়া ভাঙবেন। ডান কাতে শোবেন, বাঁ কাতে শোবেন, তারপর হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে উঠে বসবেন, পা ছড়াবেন। এক পা এক পা করে মাটিতে নামবেন। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে আরও একটি পেল্লাই আড়মোড়া ভাঙবেন। তারপর...'

'কে বলছে? কে বলছে কথাগুলো?'

অনিকেতবাবু চারদিকে তাকিয়ে হদিস করতে পারলেন না। টিপটিপে বুকে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বুঝলেন এই এস. সি. ডি বা সুপার কমপ্যাক্ট ডিস্ক বাইরে কোথাও নয়, তাঁর নিজের বুকের ভেতরেই বাজছে।

বছর চারেক আগে স্ত্রী গায়ত্রী যখন খুব অসুস্থ , হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন জোর করে, সেই সময়ে গায়ত্রীর নাম করে নিজেও একবার ভালো করে ডাক্তারি চেক আপ করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ডাক্তারই বলেছিলেন, 'আরে দাদা, আপনার হাইপারটেনশন নেই, রক্তে চিনি নেই, ব্লাড কোলেস্টেরলও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হার্ট চলছে চমৎকার ল্যাবডুব ঝাঁপডুব ছন্দে। জোয়ানের মতো আপনি বাঁচবেন না তো বাঁচবে কে? তবে হ্যাঁ...

ডাক্তার এক ঝুড়ি কর্তব্য ও অকর্তব্যের কথা বলেছিলেন। সেগুলো সযত্নে মখস্থ করে রেখে

দেন অনিকেতবাবু। কষ্ট করে মুখস্থ করতে হয়নি। কানের ভেতর দিয়ে একবার ঢুকতেই মরমে পশেছে। তাই তাঁর শরীর মনে না রাখলেও মন সেগুলো মনে রাখে, মনে করিয়ে দেয়।

বিছানা গোছাতে লাগলেন অনিকেতবাবু। সবাই-ই হয়তো নিজের কাজ নিজে করে কিন্তু করে দায়ে পড়ে, দায়সারা করে। অনিকেত করেন যত্ন করে মেথডিক্যালি। বালিশটা থুপে থুপে ঠিক জায়গায় রাখলেন। কম্বলটা দু-হাতে তুলে নিলেন। খুব ভারী লাগল। ভালো করে দেখতে গিয়ে রায়মহাশয়ের বুক হিম হয়ে গেল। এ কী? দুটো কম্বল কেন? জানালা বন্ধ। পায়ে মোজা। গায়ে উলিকট। একটা কম্বলই তো যথেষ্ট? দুটো কেন? এ কি দার্জিলিং নাকি? কিংবা নিদেনপক্ষে বর্ধমান, চাতরা, নবাবগঞ্জ? আরে বাবা এ যে শহর কলকাতার গাদাগাদি মধ্যিখান? কম্বলটা দিলে কে? কে এমন ষড়যন্ত্রনিপুণ, নিষ্ঠুর অন্তরালবর্তী বিভীষণ আছে যে মাঝরাতে তার ঘরে ঢুকেছে এবং গায়ে দিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় কম্বল? নাঃ সুপ্রতীকের কথা তিনি আর শুনবেন না। এবার থেকে দরজা বন্ধ করে শোবেন। তিনি নিশ্চয়ই রাতে কুঁই কুঁই করেছেন। বেশ সশব্দে। বলা যায় না হয়তো কেঁদেছেন, অচেতনের ওপর তো হাত নেই! ছি ছি! সেই কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রতীক অথবা আরও ভয়াবহ। রুমিই হয়তো। কী ভাবল।

চটপট করে বাথরুম সেরে মাথা গলা কান-ঢাকা টুপিটা মাথায় গলিয়ে নিলেন তিনি। গায়ে চাপালেন ওভারকোট। পায়ে উলের মোজা। এ সবই সিমলাতে কেনা হয়েছিল অন্তত বিশ বছর আগে। সিমলায় সে বছর ভালো বরফ পড়েছিল। এখন সেই সিমলাই আয়োজন কলকাতিয়া জানুয়ারিতে গায়ে চাপাচ্ছেন তিনি। আয়নার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'অ্যাবমিনেব্‌ল স্নোম্যান!' বলেই চমকে উঠলেন কারণ কে যেন সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'অ্যাবমিনেব্‌ল ওল্ড ম্যান।' চারদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিলেন অনিকেত রায়মহাশয়। তাঁর দীর্ঘশ্বাসে আয়নার পরিষ্কার গায়ে একটা দলা-পাকানো বাষ্পের দাগ হল। সিনথেটিক সোলের জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে এবার নিঃশব্দে লম্বাটে সরু দালানটা পার হওয়া, দরজাটা টেনে দিয়ে নিজেই এলিভেটর নামিয়ে সদরে পৌঁছোনো, তারপর নিজের ইয়েতি সদৃশ আকারটি নামিয়ে দেওয়া। রাত-দারোয়ান গলা বাড়িয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করল, 'কে যায়?'

'দুশো তেইশ।'

কচ্ছপের মতো গলা গুটিয়ে নিল ব্যাটা।

খোলা গালের ওপরে এসে বিঁধছে মাঘের ধারালো ছুরির মতো হাওয়া। একবারটি শিউরে উঠলেন অনিকেতবাবু। তারপর হনহন করে পা চালালেন পুবের পার্কটার দিকে। দু-চারটে রাত-কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শীতে পা টেনে ধরেছে, কিন্তু তাকে ওই রাত কুকুরগুলোর মতোই পাত্তার মধ্যে আনতে চাইছেন না তিনি। নির্ভীক পদক্ষেপে তিনি পার্কের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

রাস্তায় এখনও দাপটের সঙ্গে জ্বলছে পরাক্রান্ত পথ-বাতিগুলো। যেন বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে কে যায়, কারা যায়। খোকা না বুড়ো, বুড়ো-খোকা না বুড়ো-বুড়ো, দেখছে এবং হিসেব রাখছে। মাথা নীচু করে ওভারকোটের দু-পকেটে হাত ভরে রাস্তাটা পার হলেন তিনি। হনহন করে হেঁটে পার্কে পৌঁছোতে পাঁচ মিনিট। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন আরও কিছু কিছু মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে আশেপাশে। মাথা-গা-কম্বল-শাল মুড়ি দেওয়া, কেউ কোট-প্যান্টালুন হাঁকড়েছে। মাথা ঢেকে নিয়েছে মাফলারে! নানান মূর্তি। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। প্রাণপণে হাঁটছে।

'হাঁটবেন, হাঁটবেন, ভোরে একবার, সন্ধেয় একবার করে হাঁটবেন। হাঁটাই এখন একমাত্র ব্যায়াম...বুকের ভেতরে এস. সি. ডি.-টা খনখনে গলায় বলে যেতে লাগল। আশপাশ দিয়ে

জড়পুঁটলির মতো হন্টনকারীদের দেখে মনে হয় তাদের বুকের মধ্যেও ডিস্‌কটা বাজছে... 'হাঁটবেন। হাঁটবেন.....ভোরে....সন্ধেয়....হাঁটাই এখন একমাত্র ব্যায়াম...।'

আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হল অনিকেত এইভাবে বেরোলেন। সুপ্রতীক জানে না, রুমি জানে না। ওরা ওঠবার আগেই আবার নিঃশব্দে ফিরে যাবেন তিনি। পকেট থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলবেন। ওই সময়ে একটা দমকা কাশি আসতে চায়, সেটাকে কোনোমতে চেপে টয়লেটের মধ্যে গিয়ে মুক্ত করে দেন তিনি। বালতির ওপর কলটাকে পুরো প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে দেন। ছড়ছড় করে জল পড়তে থাকে। খক খক ঘঙ ঘঙ ঘঙ আখ্‌খা আখা আখ্ খা আখা, অনিকেত মনের সুখে কাশতে থাকেন। ঘরে গিয়ে এক চামচ ওষুধ খাবেন ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে, একটা থ্রোট লজেন্স মুখে রাখবেন তারপরে।

রুমি যখন ঘুমচোখে বসবার ঘরে এসে কাগজ খুঁজবে তখন সে কাগজ পড়ে ভাঁজ করে টেবিলে রাখা, বিজয়ীর ভঙ্গিতে অনিকেতবাবু বাঁ পায়ের ওপর ডান পা রেখে তাকে মৃদুমন্দ নাচাতে নাচাতে সিগারেট খাচ্ছেন। রুমি যদি ভালো করে লক্ষ করত তো দেখতে পেত অনিকেতবাবুর সিগারেট থেকে বিশেষ ধোঁয়া উঠছে না। ঠোঁটে ওটা আলতো করে ধরে রেখেছেন তিনি। রুমি কাগজের মোটা খবরগুলোতে চোখ বুলোবে : ইকোয়েডরে আবার ভূমিকম্প, কিয়োটোতে জলপ্লাবন। না ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি। সুপ্রতীক আসবে, চেঁচিয়ে খবরগুলো পড়বে তখন রুমি।

সে কি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি? আশ্চর্য!

'হলেই বা এখানে কী!' রুমি আলগা গলায় বলবে, 'আমাদের আছে সাইক্লোন আর পথ দুর্ঘটনা।'

রুমি এবার উঠে যাবে। সুপ্রতীক বাবার সিগারেট থেকে নিজেরটা জ্বালিয়ে নিতে চাইবে, সেই সময়টার জন্যে সামান্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেন অনিকেতবাবু। তুষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে সিগারেটের মুখ। ধোঁয়াটা পুরো ছেড়ে দিয়ে দু-আঙুলের ফাঁকে সেটাকে সন্তর্পণে ধরে রেখে কোনো একটা হাজারবার পড়া জার্নাল আবার পড়বেন অনিকেতবাবু। সুপ্রতীকের মুখচোখ কাগজে আড়াল। সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

টি-মেশিন থেকে প্রত্যেকে এক এক কাপ চা নিয়ে মুখোমুখি বসবেন এবার। মৌজ করে। চমৎকার শান্তিময় আবহাওয়া। পারিবারিক প্রভাত।

রুমি আজকাল প্রায়ই জিজ্ঞেস করছে, 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো বাবা?' গতকাল এ প্রশ্ন শুনে বড়ো বড়ো সরল চোখে তাকিয়ে ছিলেন অনিকেতবাবু, 'ঘুম? মানে? ঘুম হবে না কেন?'

'না তাই বলছিলাম।'

জিজ্ঞেস করার সময়ে রুমির চোখ দুটো চায়ের কাপের ওপর থেকে আধখোলা হয়ে ভেসেছিল। ঝিনুক-ঝিনুক চোখ। দেখেও যেন দেখলেন না সেই ঝিনুকের পেটের মতো দৃষ্টি।

সুপ্রতীক পরশু বলল, 'তুমি এবার সকালের দিকে চা-টা বন্ধ করে দাও বাবা। একটু গরম দুধ খেলে শরীরটা ঠিক থাকবে।'

অনিকেতবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেছিলেন, 'দুধ? দুধ মানে? ও দু-ধ! দুধ কথাটা জীবনে প্রথম শুনলেন অনিকেতবাবু।'

'অন্তত পক্ষে চায়ে চিনিটা খেয়ো না'—সুপ্রতীক তাঁর দিকে চেয়ে বলেছিল।

'চিনি দুধ না হলে তাকে আর চা বলে না মাই চাইল্ড?' —বেপরোয়া [illegible]হসের সঙ্গে সুপ্রতীকের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'মাই চাইল্ড' বলতে পেরে একটা অদ্ভুত ত[illegible]প্রস[illegible]। সুপ্রতীক তাঁর ছেলে যদি চাইল্ড হয়, তা হলে তিনি কী? আর যাই হোন, নিশ্চয়ই দুগ্ধমাত্রসার দ্বিতীয় শৈশবগ্রস্ত নন।

চা-টা শেষ করে স্প্রিং-এর মতো উঠে দাঁড়ান অনিকেত।

'চলি রুমি, চলি রে সুপ্রতীক। আমাকে আবার লেখা-টেখাগুলো নিয়ে বসতে হবে।' কেউ কোনো সাড়া শব্দ করে না। এই নীরবতা এক হিসেবে স্বস্তির। মাথা খুঁড়ে কোনো আইডিয়া-টিয়া বার করতে হয় না তাঁকে। আবার অস্বস্তিরও। তবে কি ওরা তাঁর লেখা-টেখাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না? নাকি বিশ্বাসই করছে না! ভেতরে ভেতরে দমে গেলেও তিনি চেহারার ওপর সেটা ফুটতে দ্যান না। স্প্রিং-এর মতো চলনভঙ্গিটা বজায় রেখে তিনি ওদের সামনে দিয়ে চলে এলেন। ওরা আড়াল হতে একটু আলগা দিলেন। নিজের ঘরে এসে পর্দাটা টেনে দিয়ে সোয়াস্তি।

জানলার পাশে আরামকেদারা। এই আরেকটা দাদুর আমলের জিনিস। ভাঙে না, মচকায়ও না। কুচকুচে আবলুশ কাঠের জিনিস। নরম গদি দেওয়া। সেই গদির গায়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জানলার বাইরে চোখ রাখলেন তিনি। তাঁদের পনেরো তলা, পাশের ব্লকটা সতেরো তলা। সতেরো তলা টপকে আকাশরেখা দেখতে পেলেন অনিকেত। দেখতেই থাকলেন। দেখতেই থাকলেন। কী সুন্দর। কী অপূর্ব সুন্দর! কী চমৎকার এই জীবন ব্যাপারটা। আর কিছু না। শুধু সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকাটাই একটা...কী দুর্লভ সৌভাগ্য?

পাশের ব্লকটাতে ওরা ছাদ-বাগান করেছে। একটা করবী গাছ। সরু সরু বাঁকা কুকরির মতো পাতার মধ্যে থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে থাকে। সবুজে লালে নবীন। এখন, এই শীতেও সবুজ জাগিয়ে রেখেছে গাছটা। একটু খুঁজলে দেখা যাবে দুটো ব্লকের মাঝখানের জমিতে গজিয়ে ওঠা তিনটে বট্‌ল পাম। দুধ সাদা গা। ওপর থেকে সেসব দেখা যায় না। কিন্তু স্মৃতিতে ভাসে মাথায় সবুজ পালক। গাছেরা কখনও বুড়ো হয় না। ওরা যতদিন খুশি আকাশ দেখে, মাটি থেকে খাদ্য নেয়, বাতাস থেকে শ্বাস নেয়, এবং অতি মূল্যবান অক্সিজেন পৃথিবীকে দিতে থাকে। দেয় বলেই না গাছপালার এতো দাম, এতো আদর। এই যে সব গগনচুম্বী বাড়ি। তাদের প্রতি গুচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৃক্ষ আছে। আছে ঝোপ জাতীয় গাছ। ঝকঝকে তকতকে। ছোটো চারা যখন পোঁতা হয় তখন চারদিকে বেড়া দেওয়া হয় ভক্তিভরে। গাছ সবসময়ে জীবন দিচ্ছে, তাই গাছ দেবতা। দিতে হবে সবসময়ে কিছু-না-কিছু দিয়ে যেতে হবে। 'বি প্রোডাকটিভ, অনিকেত! বি প্রোডাকটিভ।' বুকের ভেতরে ব্যাটাচ্ছেলে এস. সি. ডি-টা আবার বলছে। চমকে প্রায় আরামকেদারার আশ্রয় থেকেও পড়ে যাচ্ছিলেন অনিকেতবাবু।

তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মোটা নোটবই। লাইব্রেরি থেকে আনা রেফারেন্স। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা। ভেতরে মার্কার দিয়ে সব ওলটানো আছে। বিশ্ব রাজনীতির ওপর জনসংখ্যার প্রভাব নিয়ে একটা তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখছেন তিনি। লিখছেন মানে ছেলে-বউয়ের কাছে বলেছেন যে লিখবেন। আসলে কলম চিবোচ্ছেন। ভালো লাগছে না মোটেই।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর নেবার পর ঠিক পনেরোটা বছর কেটে গেছে। গোড়ায় গোড়ায় অনিকেতবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে লেখাজোকা ধরেছিলেন। বিজ্ঞাপনসংস্থার সঙ্গে কাজ কারবার করতে হত, তাই চেনাশোনা ছিল কিছু কিছু। লেখার অভ্যেস। আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যেস এগুলোও ছিল। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। ছাপত। রোজগারও হত। আত্মতৃপ্তিও হত। পেনশন তো পাঁচ বছর অন্তর শতকরা দশভাগ করে কমে যায়, কাজেই এই উপরি আয়ে নাতির জন্য দামি খেলনা, রুমির জন্য একটা ভালো পারফিউম কি সুপ্রতীকের জন্য একটা শৌখিন সিগারেট লাইটার—এই জাতীয় উপহার কিনে বাড়ির হাওয়ায় খুশির ঝলক এনে দেওয়া হত। এমন ছোটাছুটি করে দোকান বাজার করতেন, হইহই করে আড্ডা মারতেন ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে, দুপুরবেলাও কাজে-কর্মে বেরিয়ে থাকতেন যে, ছেলে-বউ-নাতি প্রতিবেশীরা কেউই বুঝতে পারত

না তাঁর বয়স হচ্ছে। মাঝে মাঝে সুপ্রতীকের বন্ধু অর্বুদ বলত, 'কাকাবাবু আপনার চুলগুলো কাঁচাপাকা না হলে কেউ বুঝতেই পারত না আপনি অবসর নিয়েছেন। আপনি আমাদের থেকেও জোয়ান।'

তা সে যাই বলুক, বললেই তো আর তিনি জোয়ান হয়ে যাচ্ছেন না। কঠিন সত্য হল এই : তিনি অবসরপ্রাপ্ত, দেশের সাম্প্রতিকতম নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চান্ন বছরেই। তাঁর রাজনৈতিক অধিকার নেই, অর্থাৎ তিনি ভোট দিতে পারেন না, কোনো আদালতে বিচারও চাইতে পারেন না। তিনি ঠিক নাগরিক যাকে বলে তা নন পুরোপুরি। যেটুকুও বা নাগরিকত্ব আছে ক্রমশই খোয়াচ্ছেন, খোয়াতে থাকবেন। এখন যে-কোনোদিন, বুড়ো অকর্মণ্য বলে বোঝা গেলেই সরকারি বৃদ্ধনিবাসের টিকিটটি তাঁকে কেউ ধরিয়ে দেবে। ছেলে বউই দেবে, ওরা যেমন প্র্যাকটিক্যাল! আর ওরা না দিলেও প্রতিবেশী আছে, বন্ধুবান্ধবের ছেলেপুলে আছে, পুলিশ আছে। নেই কে?

কিন্তু আজকাল অনিকেতবাবুর এই দৌড়ঝাঁপ আর ভালো লাগছে না। রাতুলটা যতদিন ছোটো ছিল, ভালো জমত। কিন্তু দেখতে দেখতে সেও এখন সতেরো আঠারো বছরের হয়ে গেল। তারও বাইরের জগৎ হয়েছে, গোপনীয়তা হয়েছে। তার নিজের জগতের মধ্যে আর চট করে প্রবেশ করা যায় না। করার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারেন সুর বাজছে না।

'কী রে রাতু, কী পড়বি ঠিক করলি? মেডিসিন?'

'কোন্ মেডিসিন?' —রাতুল মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে। ছোট্ট রাতুল তাঁর চিকিৎসা করতে খুব ভালোবাসত। ড্রপার দিয়ে ইঞ্জেকশন দিত। পিপারমিন্টের ট্যাবলেট খেতে দিত। অকেজো প্লায়ার্স বুকে পিঠে বসিয়ে হার্ট বিট দেখত।

'কোন্ মেডিসিন মানে?' —অনিকেতবাবু ওর কথা বুঝতে পারেন না।

'মিলিটারি না সিভ্ল না পুলিশ?'

'আজকাল এইসব আলাদা বিভাগ হয়েছে বুঝি?'

ততক্ষণে রাতুল তাঁর চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। যাবার সময়ে ছুড়ে দিয়ে গেছে সে কমটেক পড়বে।

কিংবা!

'কী রে দাদু আজকাল কার সঙ্গে স্টেডি যাচ্ছিস?' খুব মাই-ডিয়ার দাদু হতে চেষ্টা করেন তিনি।

'দিয়া, চই আর দাভিনা।'

'তিনজনের সঙ্গে?'—অনিকেত কেমন ভোম্বল মতো হয়ে যান।

'হ্যাঁ!' —রাতুলের অবাক উত্তর। 'ওসব তুমি বুঝবে না দাদু।'

ইদানীং অনিকেতবাবু দুপুরবেলা আর লাইব্রেরি যান না। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখা লেখা খেলা করেন। রুমিরা জানে তিনি একটা বিশাল বই লিখবেন। প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ ছাড়াও। বিশাল বই যা নাকি সমাজতত্ত্বের কাজে লাগবে। এ রকম বই লিখতে পারলে আলাদা করে গ্র্যান্ট পাবেন লেখক। প্রোডাকটিভ কিছু করলে সরকার নানারকম সাহায্য দিয়ে থাকে। সন্দীপন দেশাই বলে এক ভদ্রলোক পরের পর বই লিখে যাচ্ছেন। অর্থনীতির ইতিহাস। এদেশীয় অর্থনীতি, বিশ্ব অর্থনীতি। আশির কাছে বয়স হল ভদ্রলোকের। এঁর সঙ্গে অনিকেতবাবুর একসময়ে খুব আলাপ ছিল। খুব সম্প্রতি এঁকে এঁর শেষ বইটির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ফ্যাক্স করেছিলেন তিনি। দেশাই তার জবাব দিলেন খুব ছোট্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক। 'হোপ আই'ল ডাই ইন মাই ওন বেড।'

কিন্তু অনিকেতবাবু দরজাটা বন্ধ করে দেন দুপুরে। সন্তর্পণে জানলার পর্দাটা টেনে দ্যান। পাশের ব্লকের যে ভদ্রলোকের জানলাটা তাঁর মুখোমুখি? মনস্বী না কী যেন? বড্ড ইয়ে। কদিন আগেই

গায়ে পড়ে বলেছিল, 'কাকাবাবু আপনার যেন কত হল? দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার রিটায়ারমেন্টের ইয়ারটা.....

অনিকেতবাবু ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে হাত ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'সিনেমা যাবে নাকি মনস্বী। বেশ ভালো একটা অ্যাডভেঞ্চারের ছবি এসেছে। *লুনার পার্ক*। বলো তো টিকিট কাটি। তুমি আমি আর রাতুল।

জানালার পর্দা টেনে দিয়ে একটা ভীষণ গর্হিত কাজ করতে থাকেন তিনি। দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকেন : ধবধবে চুলের এক বৃদ্ধ। বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সময়টা ফাল্গুন চৈত হবে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে, তার বাইরেটা গরম ভেতরটা ঠান্ডা। হাওয়ায় বৃদ্ধের এলোমেলো চুল আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হাফ পাঞ্জাবি হাওয়ায় ফুলে ঢোল। বৃদ্ধবয়সের পাতলা চামড়ার ওপর বসন্তের হাওয়ার স্পর্শ, বড়ো সুন্দর! ছোট্ট একটি ছেলে বল লাফাতে লাফাতে এল।

দাদু তুমি বল খেলতে পারবে?

না ভাই।

তাহলে কুইজ? কুইজ করব?

পারব না ভাই।

আচ্ছা তাহলে 'বসে আঁকো'।

তাও পারব না।

তবে তুমি পারবেটা কী?

মৃদু হেসে বৃদ্ধ বলেন, 'মনে মনে পারি। এখনও এসবই মনে মনে পারি।' চোখ বুজে ঘুম ঘুম এসে যায়। স্মৃতির ওপর এক পর্দা কাপড়। ক্ষীণভাবে অনিকেতবাবুর মনে হয়, কে? কে এই বৃদ্ধ?—তাঁর দাদু বোধহয়। আর গুন্ডা ছেলেটা? তিনি, তিনিই নিশ্চয়। একাশি বছর বয়সে তাঁর এগারো বছর বয়সের সময়ে খুব সম্ভব মারা গিয়েছিলেন দাদু। এই আরামচেয়ার, ওই ঘড়ি তাঁর। অন্য এক পল্লির অন্য এক বহুতলের তিনতলায় থাকতেন তাঁরা। আবার ঘোর এসে যায় অনিকেতবাবুর।

রুমি, সুপ্রতীক, গায়ত্রী আর তিনি। রাতুলকে নিয়ে লম্বা পাড়ি দিয়েছেন। মোটরে। সুপ্রতীক চালাচ্ছে, রুমি তার পাশে। পেছনে বাকিরা। দু-পাশে পাহাড়ি গাছ। সরল, দেওদার...এটা কোন্ জায়গা...দার্জিলিং? শিলং? মুসৌরি? হঠাৎ গাড়িটা ঘ্যাচ ঘ্যাচাং করে থেমে গেল। সুপ্রতীক নেমে পড়ে অনেকরকম চেষ্টা চরিত্তির করল। এমন কি রাতুলও। কিন্তু কিস্যু হল না। গাড়ি যেমন নট নড়ন-চড়ন তেমনি হয়ে আছে। তখন অনিকেতবাবু নামলেন। জাস্ট পাঁচ মিনিট। হাতের সাদা রুমালটা কুচকুচে কালো হয়ে গেল অবশ্য কিন্তু গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। রাতুল বলছে, 'তোমার হাতে জাদু লিভার আছে নাকি দাদু।' রুমি বলছে, 'বাবা না থাকলে এই বিশ্রী জায়গায় রাত হয়ে আসছে...কী ঠান্ডা।'

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে রুমি। এটা বড়ো প্রিয় দিবাস্বপ্ন অনিকেতবাবুর। কখনও ঘটেনি। কিন্তু যদি ঘটে! এমন কেন সত্যি হয় না আহা! এ ছাড়াও আরও কত ভালো ভালো দিবাস্বপ্ন আছে অনিকেতবাবুর। কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখবেন? দেখতে দেখতে জমাট দুপুর ঘুম এসে যায়। ফুরফুর ফুরফুর করে নাক ডাকতে থাকে। হঠাৎ নাকে ফঁৎ করে একটা বেয়াড়া মতো আওয়াজ হতেই তিরবেগে উঠে বসলেন অনিকেতবাবু। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। জানালার পর্দা টানা আছে তো ঠিক? দরজাটা বন্ধ? হ্যাঁ। আছে। আছে।

অর্থনীতির ওপর প্রবন্ধ! হুঁ। রাজনীতির ওপর লোকসংখ্যার প্রভাব। মাথার মধ্যেটা রাগে চিড়বিড়িয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। লিখতেই যদি হয় তিনি রম্যরচনা লিখবেন। আবার ফর্মের দিক থেকে রম্য হলেও তা হবে রুদ্র রচনা। মনের যাবতীয় ক্ষোভ, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা সব প্রকাশিত হবার জন্যে তাঁর মাথার মধ্যে ফাটাফাটি হুটোপাটি করে চলেছে। কিন্তু এরকম কিছু লেখা মানে নাহক নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। ঠিক আছে না-ই বা প্রকাশ করলেন, শুধু নিজের তৃপ্তির জন্যেই তিনি লিখবেন। এই সংকল্প মনের মধ্যে উঁকি দেবামাত্র—রায়মহাশয় তাঁর কম্পিউটারে কাগজ ভরলেন। একটু ভাবলেন, তারপর লিখলেন :

জীবন সুন্দর, পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু মানুষ কুৎসিত, সমাজ কুৎসিততর, শাসনযন্ত্র কুৎসিততম। যৌবনও কুৎসিত। যত বয়স হইতেছে, বুঝিতেছি যৌবনও কুৎসিত। কারণ, হ্যান্ডসাম ইজ দ্যাট হ্যান্ডসাম ডাজ। যে যৌবন বৃদ্ধের আত্মত্যাগের মূল্যে ফূর্তি কিনিয়া বাঁচিয়া থাকে তাহাকে ধিক। যে যৌবন বৃদ্ধের জীবন হইতে 'বসন্তের অধিকার' ছিনাইয়া লয় তাহাকে ধিক। যে সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতি, প্রাযুক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার সামাজিক পরিকাঠামো তোমরা প্রস্তুত করিতে পার নাই, সে সকলের সঙ্গে তাল মিলাইবার চেষ্টা তোমাদের হাস্যকর। কারণ তাহা করিতে গিয়া মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি তোমরা ছিনাইয়া লইতেছ। এগুলি তোমাদের বেতালা বেসুরো আসুরিক কাণ্ড। জনসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে। তো আমরা কী করিব? আমাদের কাহার ঘরে একটি দুটির বেশি সন্তান আসে না। কোথায় বাড়িতেছে, কেন বাড়িতেছে খোঁজ আর লইবে কি! ভালো করিয়াই জানো সব। দারিদ্র্য, অপরাধ, অধিকার, কুশিক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি সকলই তো পুষিতেছ? আর খাঁড়াটি তাক করিয়াছ সিনিয়র সিটিজেনের গলদেশ তাক করিয়া? যে নাকি সারাজীবন ধরিয়া তিল তিল করিয়া দিয়াছে?

ছাপা কাগজটার দিকে চেয়ে রইলেন অনিকেতবাবু। ভাষাটা যে দাদামশায়ের বেরোল। দাদামশায় কেন কে জানে এই ভাষায় চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর কাছে রয়েছে কয়েকটা। ভাষাটার কেমন একটা বুড়ো বুড়ো বিজ্ঞ বিজ্ঞ গন্ধ। তাঁর মধ্যে কি দাদামশায়ের ভূত ঢুকল? ঢুকুক, তাই ঢুকুক। রাজনীতির ভূত ঢোকার চেয়ে তা শতগুণে ভালো।

অস্থির হয়ে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন তিনি। গত পঞ্চাশ বছরে মৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। শেষ এপিডেমিক এসেছিল এড্‌সের। এ শহরের সমস্ত হাসপাতাল, নার্সিংহোমের ব্লাড-ব্যাংক, ইনজেকশনের ছুঁচ এডসের ভাইরাসে ভরে গিয়েছিল। সেসময়ে ইউ. এন. ও.-র শাখা ডাবলু. এইচ. ও হাসপাতালগুলো অধিগ্রহণ না করলে কয়েক কোটি মানুষ মরে যেত। কিন্তু ডাবলু. এইচ. ও. তখন থেকে শক্ত হাতে হাসপাতালগুলো পরিচালনা করে চলেছে। সংক্রামক ব্যাধি এখন প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। দেহযন্ত্র বিকল হলে চোখ থেকে শুরু করে হার্ট, কিডনি লাং সবই পাওয়া যাচ্ছে। চোখ থেকে মজ্জা পর্যন্ত সব কিছু ট্রানসপ্লান্ট হচ্ছে। মৃত্যুর হার তাই কমে গেছে। এদিকে জন্মের হার কমছে না। তা-ও আবার বিশেষ বিশেষ পকেটে বাড়ছে। কতকগুলি পল্লি থেকে কজন মানুষ বেরোয় হাতে গোনা যায়, আবার কতকগুলি পল্লি থেকে পিলপিল করে মানুষ বেরোয়। দারুণ সস্তা হয়ে গেছে টেলিযন্ত্র। বেশির ভাগ মানুষের সাংস্কৃতিক খাদ্য এখন হিংস্র, কামোত্তেজক এন চ্যানেল। স্কুলকলেজে ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়ছে। বেকারভাতা এসে গেছে। ভোটাধিকারের বয়স ক্রমেই কমছে। আঠারো থেকে ষোলো হল, এখন পনেরো।

বেলা তিনটের সময়ে অনিকেতবাবুর খিদে পেল। তিনি আভেনের হটচেম্বার থেকে বিরিয়ানি বার করে খেলেন। এই এক ঢং হয়েছে. সব কিছু নিউট্রিশন একত্র করে পনেরো মিনিটে স্বাস্থ্যপ্রদ এক পদ রান্না। চাইনিজ খিচুড়ি, থাই পোলাও, বিরিয়ানি আলা ফ্রাঁস। কোল্ড চেম্বার থেকে কাঁচা সালাড বার করলেন তিনি। আজকাল আর একদম কাঁচা খেতে পারছেন না। সালাড-ড্রেসিংটা

মেয়নেজ মনে হচ্ছে। সেটুকু চেঁছে পুঁছে খেয়ে তিনি হাজার স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাটটা পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

রাত্রে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন দেখে রুমি জিজ্ঞেস করল, 'বাবার কি শরীরটা ভালো নেই!'

আজ অনেক বেলায় খেয়েছি, খিদে নেই।

তোমাকে কতবার বলেছি টাইমটা মেনটেইন করো। রেগুলারিটিই হল গিয়ে আসল—সুপ্রতীক থমথমে গলায় বলল।

গ্রাহ্য করলেন না, অনিকেতবাবু। গম্ভীরভাবে বললেন, 'লিখতে লিখতে খেয়াল ছিল না।' এ কথায় কেমন হৃষ্ট হয়ে উঠল দুজনেই। রুমি এবং সুপ্রতীক।

রুমি বলল, 'খেতে ভালো না লাগে নাই খেলেন। একগ্লাস ট্রাংকুইলেট খেয়ে নেবেন শোবার আগে'...

'ওসব তোমরা খাও'—বলে অনিকেতবাবু বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, অন্যমনস্ক হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। আজ যেন কাউকেই গেরাহ্যি করছেন না তিনি।

এরা দুজনে অর্থপূর্ণভাবে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল শুধু।

অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারলেন না অনিকেতবাবু। কিন্তু জেদ করে কোনো ওষুধ বিধুযও খেলেন না। ট্রাংকুইলেট নামে পানীয়টাও না। মাঝরাত পার করে দু-এক ঘণ্টার জন্যে ঘুমটা এসেছিল, তারপরই তাঁর দাদামশায় তাঁকে জানিয়ে দিলেন টং টং টং টং।

অনিকেতবাবু উঠে মুখ ধুলেন, ধড়াচুড়া চাপালেন। একটা আলোয়ান মুড়ি দিলেন সবার ওপর। তারপর নিঃশব্দে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, এলিভেটর চালিয়ে নীচে নেমে এলেন। রাত-দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে। শুনসান মাঘের রাস্তায় একেবারে হিমমণ্ডলে ডুব দিলেন অনিকেতবাবু। শীতে আড়ষ্ট হয়ে থাকা পা বাড়ালেন পার্কের দিকে।

কোণটা সবে ঘুরেছেন, নিঃশব্দে একটা ঢাকা ভ্যানমতো এসে দাঁড়াল তাঁর পেছনে, নিঃশব্দে লাফিয়ে নামল দুজন আপাদমস্তক য়ুনিফর্ম-পরা লোক। একজন ডান দিকে, একজন বাঁ দিকে অনিকেতবাবুর। তিনি ভালো করে কিছু বোঝার আগেই ভ্যানের ভেতরে চালান হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে একটা ঘেরাটোপ গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'কে তোমরা? কী চাও? কী চাও?' তিনি বৃথাই চেঁচাতে লাগলেন। কেউ কোনো উত্তর দিল না। সামান্য পরে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মুখে যে ঘেরাটোপটা দেওয়া হয়েছে সেটা সাউন্ড প্রুফ। এবং তিনি ধীরে ধীরে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। এইভাবেই তাহলে ওরা অনিচ্ছুক বৃদ্ধদের বৃদ্ধাবাসে নিয়ে যায়!

যখন জ্ঞান হল, অনিকেতবাবু দেখলেন তিনি একটি চমৎকার আলোকিত ঘরে শুয়ে। তাঁর শয্যাটি মাথার দিকে এমন করে তোলা যেন তিনি আরামকেদারাতেই বসে আছেন। তাঁর চারপাশে বেশ কিছু ভদ্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। দেখলে যেন মনে হয় ডাক্তার। সকলেরই হাসিমুখ। ঠিক এমন পরিবেশ অনিকেতবাবু আশা করেননি।

এখন কেমন বোধ করছেন?

ভালো—অনিকেতবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন।

খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

কেন?

রাস্তার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।

তাই? —অবাক হয়ে অনিকেতবাবু বললেন—আমি তো...আমাকে তো...

হ্যাঁ আমাদের হেল্‌থ স্কোয়াডের ভ্যান ভাগ্যে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল!

'তাই?' অনিকেতবাবু দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো ভাবলুম...আচ্ছা আমার ছেলে বউ সুপ্রতীক আর রুমি রায়মহাশয় তেত্রিশের বি...

'আহা হা ওঁদের খবর দেওয়ার তো আর দরকার হবে না।'—একজন স্মিতমুখে বললেন, 'আপনি তো ভালোই হয়ে গেছেন। জাস্ট একটা ব্ল্যাক আউট হয়েছিল। আমরা সব চেক-আপ করে নিয়েছি। আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

একলা একলা মানে একটা গাড়ি...

সব ব্যবস্থা আছে, আমাদের ভ্যানই যাবে।

একটা প্রেসক্রিপশন মানে ব্ল্যাক-আউটটা...

ভদ্রলোকেরা স্নেহের হাসি হাসলেন, পৌঁছে যাবে, ভ্যানে আপনার সঙ্গেই পৌঁছে যাবে।

কোমরের কাছে চওড়া বেল্ট দিয়ে শয্যার সঙ্গে বাঁধা ছিলেন অনিকেতবাবু। তার থেকে অনেক তার বেরিয়েছে।

'হ্যাঁ একটা কথা', হাসিমুখে একজন বললেন, 'আপনি যদি কাইন্ডলি একটা কাগজে সই করে দ্যান।'

সামনে মেলে ধরা কাগজটায় অনিকেতবাবু দেখলেন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর কিডনি, হার্ট এসব দান করেছেন। আপত্তি কী? চোখদুটো তো আগেই দান করে রেখেছেন।

তিনি হেসে বললেন, জ্যান্ত থাকতে থাকতে আবার খুবলে নেবেন না যেন।

কথা শুনে ভদ্রলোকেরা সবাই হাসতে লাগলেন। একটা রসিকতা করেছেন বুঝে অনিকেতবাবুও হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই সই করে দিলেন।

ব্যস্‌ আপনি মুক্ত। বেল্টটা ধীরে ধীরে খুলতে লাগলেন একজন।

উঠতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন অনিকেতবাবু। তিনি তো আর জানতেন না তাঁর হার্ট, কিডনি, সব আগেই বার করে নেওয়া হয়ে গেছে। এসব এখন কাজে লাগবে কোনো অসুস্থ কিন্তু ভোটপ্রদানক্ষম তরুণের। এতক্ষণ তাঁকে যা বাঁচিয়ে রেখেছিল তা হল তাঁর মাথার কাছে রাখা যান্ত্রিক হার্ট, যান্ত্রিক কিডনি। তাঁর মুক্তির মুহূর্তেই সেগুলোর সুইচ অফ্ করে দেওয়া হয়েছে। এরা নিতে পারেনি শুধু তাঁর বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ ব্রেইনটা। নেবার কৌশল এখনও আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি, পারবে কি না তা-ও বলা যাচ্ছে না। এমন কি পারলেও নেবে কি?

জীবনের শেষ ধ্বনি অনিকেতবাবু শুনতে পেলেন সন্দীপন দেশাইয়ের গলায়। সহ্যের অতীত ডেসিবেলে আওয়াজ তুলে বলছেন, 'হোপ আই'ল ডাই ইন মাই ওন বেড।'

কাকজ্যোৎস্না

এই পাখিটাকে বোধহয় কেউ পছন্দ করে না। কেউ না। পাখি বলে মনেই হয় না এটাকে। জমাদার পাখি তো জমাদারই। জঞ্জাল সাফ করতেই পয়দা হয়েছে। পাখি এখনও নয়। 'পাখি' শব্দটার মধ্যে কেমন পাখি-পাখি ভাব আছে না একটা? আহা-আহা করে মন! আয়রে পাখি ন্যাজঝোলা, খেতে দেব ঝাল ছোলা, খাবি দাবি কলকলাবি খোকনকে নিয়ে বেড়াতে যাবি!

আদর করে প্রতিশ্রুতির বোল বানাও, যেন শিশুও যে, পাখিও সে। শিশুতে পাখিতে, শিশুর আদরে পাখির আদরে এক হয়ে যায়।

পাখি যখন আচমকা উড়ে যায়? ডানার তলায় লুকোনো রঙের সওগাত দিয়ে যায়। যদি কাছের ডালে এসে বসে? ডাল দুলবে আবেশে, আয়েসে, ছন্দে, আনন্দে। মাছরাঙা-টাঙার মতো শাঁ-আঁ-আঁৎ করে যদি এক লপ্তে ঝাঁপ দিয়ে চলে যায় এতটা? তবে রোদ্দুরে নীলা, রোদ্দুরে চুনি, রোদ্দুরে পান্না। তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা...

পাখি, আহা পাখি-রে!

আয় বেনেবউ, বসন্ত বৌরি...ময়ূর ময়ূরী...পানকৌড়ি!

মরি! মরি!

রূপের বাহার যার নেই তার দ্যাখো নামের বাহার! ভঙ্গির বাহার!

টপাস টপাস করে ডিগবাজি খাচ্ছে ড্যাহুক জলের ওপর? ব্যাপারটা হল শিকার ধরা। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। কিন্তু কেমন একটা, আস্ত ছেলে-ভুলোনো কমেডি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কিংবা ছড়া। ছড়ার ছন্দ।

টপাক টপাস
গপাক গপাস।

আর ঘুঘু। কী অসামান্য ওর ধূসর কোমলিমা! ওর মৃদু ময়ূরকণ্ঠী কণ্ঠ, পেলব রেখায় আঁকা সুগোল মুণ্ড, ওর টলটলে ফোঁটা-চোখ!

ডাকটা! ডাকটা! ঘুঘুর ডাক!

তুমি বসে আছ। তোমার ভেতরে ভালো খবর, পানাহারে বেশ তৃপ্ত তুমি, আপনজন পাশে বসে রয়েছে। মুহূর্তে সব লুপ্ত হয়ে যাবে গোধূলি-সন্ধির আবছায়ায়। না না, সে নেই। কোনো দিনও ছিল না। স্বপ্নে ছিল হয়তো। তার বেশি কোথাও নয়। পাওয়া তোমার হয়নি নটরাজ। কোন সুদূর, অনাগত আগামীর দিনে-রাতে পাওয়া তোমার অনাসন্ন হয়ে এলিয়ে আছে।

কঃ! খব ঃ!

জানলার পাটের ওপর ছরকুটে পায়ে দাঁড়িয়ে, চোখ টেরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে ডাকছে কাকটা।

ওরে কাক, এখানে তোর কাঁটা-পোঁটা-তেল পটকা ওইসব কুৎসিত আমিষগুলো থাকে না, থাকে না। এখানে বই, এখানে খাতা, এখানে কলম। এসব তুমি বুঝবে না বাপা!

ওহ, তাই বল্। চুরির তালে? এই স্নিগ্ধ স্লিম নীল জটারটার দিকে চোখ পড়েছে তাহলে? না ওই তন্বী শুভ্রা পেপার কাটার? কোন্‌টা তোর নোংরা বাসায় নিয়ে যেতে চাস?

হুশ, হুশ হু-উশ্!

বেশ একটা আমেজ এসেছিল, চলে গেল ঝপ করে। ফিউজ। নটরাজ ফিউজ। নটরাজ সিন্‌হা বেকার। তিন বছর হল। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ? হয়েছে হয়েছে, কার্ড হয়েছে। সি. এস. সি.? আবেদন গেছে। খবর নেই। কোনো খবর নেই, দৈনিক কাগজ দেখে বিজ্ঞাপনের জবাব? প্রচুর, প্রচুর। পোস্ট আপিসের ফালাও কারবারটা নটরাজ সিন্‌হার জন্যেই চলছে। সর্ববৃহৎ কাস্টমার, পোস্ট আপিসের।

আত্মীয়-প্রতিবেশীদের মাথায় স্বভাবতই ঝুড়ি। ছোটো বড়ো। রাস্তায় ঘাটে, বাসে ট্রামে দেখা হলেই হন্তদন্ত হয়ে ঝুড়ি নামিয়ে দিচ্ছে। উপদেশের ঝুড়ি,

'আরে কম্প্যুটার শেখ, কম্প্যুটার শেখ। কিছু না হোক হাতখরচাটা উঠে যাবে!'

'কেটারিং। এখন কেটারিং টেকনলজির যুগ। একটু মন দিয়ে লেগে থাক। লাগে তাক না লাগে তুক।'

'তোর তো বেশ লেখার হাত ছিল নট। একটা ছোটোখাটো কাগজ দিয়ে কেরিয়ার আরম্ভ করতে পারতিস! ছুঁচ হয়ে ঢুকতিস আর ফা—ল হয়ে বেরোতিস! বুঝলি তো?'

উচ্চস্তরের গাম্ভীর্য বিকীর্ণ করতে করতে ওই চলে যাচ্ছে শৌভিক। সদ্য সদ্য চাকরি পেয়েছে। আফটার শেভের গন্ধ ভুরভুর করছে। নটরাজের থেকে দু-বছরের জুনিয়র। বাপী! রথতলার বাপী! ইয়ুথ ক্লাবে সবচেয়ে বেশিক্ষণ থাকত, ফাইফরমাশ খাটত! আজকাল আসে না, খাটে না, চলার ছাঁদ বদলে গেছে। ও-ও পেয়ে গেছে। এমনকি রেমির বোন রিয়া, যে সর্বক্ষণ ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকত? সে-ও হাত উলটে কবজি ঘড়ি দেখে বলছে, 'ওহ্ সময় নেই নটদা, অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলি...।'

ইতিমধ্যে বাড়ির অভিবাবক দাদা বলছে কঃ, খবঃ। অফিসে বেরোতে বলছে অফিস থেকে ফিরে বলছে, চান করে মাথা মুছতে মুছতে, খেয়ে দেয়ে আঁচাতে আঁচাতে, ঘুম পেলে হাই তুলতে তুলতে, চোখ টেরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, ছরকুটে হয়ে দাঁড়িয়ে, গলার ভেতর থেকে অচেনাতর, অচেনাতম গমক বার করে বলছে কঃ বলছে খবঃ। অর্থাৎ খুব খুব খারাপ। আর দাদার শ্রীমতী বউদি? বউদি মুখ ফুটে কিছু বলছে না অবশ্য। ভাতের পাশে ডাল, ডালের পাশে থোড়, থোড়ের পাশে বড়ি, বড়ির পাশে খাড়া—অক্লান্ত নিয়মানুগত্যে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দুবেলা। থালার পাশে এক চিমটি ছাই। দেখতে পাচ্ছে নটরাজ। তৃতীয় চক্ষু দিয়ে। দূর দূর ছেই ছেই, শুনতে পাচ্ছে তৃতীয় কর্ণ দিয়ে। চা-পাউরুটি টোস্ট নিয়ে সকালে সাত তাড়াতাড়ি দরজার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বউদি রোজ। কিছু বলছে না। চুপচাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে সড়সড় করে চলে যাচ্ছে তেঁতুলে বিছে। বলছে না কিছু। কিন্তু তার হয়ে জানলার পাটে বসে থাকা ওই কাক না কাকিনী, শকুনি না গৃধিনীটা বলে দিচ্ছে, খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।

সন্ধে। আলো জ্বলে। ওপরেও আলো। নীচেও আলো। জড় আলো, যার ব্যবস্থা মাইকেল ফ্যারাডে করেছিলেন। আর চেতন আলো, যার ব্যবস্থা করেছে বা করেছেন অজ্ঞেয় ঈশ্বর স্বয়ং। বাচ্চাদের মিস। আলো যাচ্ছে ঘরের বাইরের সরু বারান্দা দিয়ে, শুক-শারিকে পড়াতে। দাদার ছেলেমেয়ে। আলো যাচ্ছে, পর্দা তুমি উড়ে যাও, কপাট তুমি খুলে যাও, চশমার লেন্‌স্ তুমি টেলিস্কোপের লেন্‌স্ হয়ে যাও। হলুদ ডুবে শাড়ি ঝলকে গেল, চমকে গেল। ক্ষুরধার বারান্দা-পথে বিজুরি-আখর।

গেছে, গেছে। পর্দা উড়ে দরজার মাথায় লটকে গেছে, খোলা কপাট। চৌকাঠে আলো। চোখে সোনালি ফ্রেম। পোরো না আলো, ও ফ্রেম পোরো না। নাকের দু-পাশে ডোব-ডোব গর্ত হয়ে যাবে। শেল পরো আলো, সাধারণ শেল।

এ কি? এমন করে চুপচাপ বসে আছেন যে?

পা নেই।

পা নেই? কী হল? মচকেছেন?

উদ্‌বেগ, স্নেহ, শঙ্কা। বাঃ! এভাবেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে শামুক এগিয়ে যাবে।

হেসে ফেলেছে।—ওহ্ পা মানে দাঁড়ানোর পা, পারেনও বটে আপনি—তো হবে? শিগগিরই হয়ে যাবে।

বলছেন?

বলব না কেন? সবারই তো হয়!

লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার। সবারই তো হয়! বললেই হল!

হয়ে যায় তো দেখি! অন্তত যাদের হয়, তাদের দলে আপনি।

বাঃ প্রফেসি? না উইশফুল থিংকিং?

দুই-ই।

ধন্যবাদ। সুক্রিয়া। —আজকাল হিন্দিটা বেশি চলছে।

চলে যাচ্ছে আলো। আবার সব ফিউজ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বউদির ঘরে, শুক-শারির পড়ার টেবিলে আলো জ্বালতে চলে যাচ্ছে।

আধা-ফরসা রংটা। ভালো খেতে টেতে পেলে, দু চার টিউব ক্রিম-টিম মাখতে ফাখতে পেলে এই রঙেই মার্বেলের গ্লেজ দেবে। অতএব ক্রিম মাখে আলো। খেতে পায়। জামতাড়ার বাংলোর হাতায় দুটো বেতের চেয়ারে দুজনে বসে থাকে। নীল-গোলাপি ম্যাকসির লেসের পাড় আলোর মার্বেল পায়ের পাতা ছুঁয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে। বেয়ারা ফ্রায়েড চিকেন আর চিকিত চিকিত করে কাটা আনারসের চাকতি রেখে গেল। কোথায় যেন এই কম্বিনেশনটার কথা শোনা গেছিল। পালিশ-করা আঙুলে একটাই লাল-কমলা পাথর। কী ওটা? কী আর! পাথর নয়, প্রবাল। সমুদ্রের তলায় থাকে। মাঝে মাঝে উঠে আসে আলোরা সাজবে বলে। ফিগার আঁকড়ে ধরে থাকে, কী যেন বলে ওই শাড়িকে? ধনেখালির মোড়ক ছাড়িয়ে সেই কী যেন বলে শাড়ি স্বপ্নরঙিন নেশায় মেশা সে উন্মত্ততা আলোর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে নটরাজ। বেগুনি না গোলাপি কী বলে এ রংদের? এরা কোনো চেনা-জানা নামের খাঁচায় ধরা পড়তে চায় না। বনের পাখি এসব রং, এসব শাড়ি, বলে, 'খাঁচায় ধরা নাহি দিব।' বলে, 'কেবলি বনগান গাব।' তাই মোটা কালো বিনোদ বেণি ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে এলিয়ে যাচ্ছে। কাঁধ পিঠ সমস্ত ঢেকে চেয়ারের আশেপাশে পেছনে সামনে লুটিয়ে যাচ্ছে রাজকন্যের মেঘবরন কেশ। ঝড়ের দোলা লাগল মেয়ের আলুথালু বেশ গো। আলুথালু...। ছুটছে আলো, ছুটছে। ঝড়ই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। দুরন্ত বাসনার ঝড়। কার বাসনা? কার আর? নটরাজের।

আলোর মুখের কাট গ্রিসিয়ান। স্লিম, মডেলমার্কা আজকালকার রমণী নয়। চিরকালের। দীর্ঘ, কিন্তু অতি-দীর্ঘ নয়। সুডৌল। চোখের তারা দুটো সামান্য ওপর দিকে করে দাঁড়াও আলো! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এথিনা, গ্রিক দেবী এথিনা।

এথিনা রান্নাঘরের ফোড়নগন্ধী ইঁদুরে অন্ধকারে পিঁড়ি পেতে বসে ডেঙ্গর ডাঁটা চিবোচ্ছে। ভাবা যায়? লুঙ্গি, গামছা, দাঁত মাজনের লাল পাউডার, পোড়া কড়া, পোড়া চাটু, ডাল-ঝোল তেল

ব্যাড়বেড়ে হাতা-চামচ, টিনের দরজা, ধরা জল খরচের কিপটে আওয়াজ, ধপাস ধপ ধপাস ধপ, কাঁথাকানি কাচিতং, ধরে গেল, হাফ লিটার সবে ধন মাদার ডেয়ারি ধরে গেল। ধর ধর ছোটো খোকাটাকে ধর, যাঃ মুখে পুরে দিল। জ্যান্ত আরশুলাটাকে মুখের ভেতর...ম্যাগো! খোল। খোল মুখ! ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। ভাবা যায়?

এথিনা, তোমাকে আমি নিয়ে যাব তোমার স্ববেদিতে। আক্রোপোলিস। বেশি নয়, একটি ভক্ত একান্ত থাকবে তোমার। তুমি শুধু বীরাঙ্গনা মুদ্রায় দাঁড়িয়ে প্রেমকরুণ শুভদৃষ্টিটা তার দিকে পাঠিয়ো। আরও থাকবে ভক্ত। মনুষ্য ও দেবগণ। কিন্তু তারা বাহ্য। তারা তোমার ভঙ্গি দেখতে পাবে। অঙ্গ দেখতে পাবে না। দেখতে পাবে ঘুরে ঘুরে চূড়াকার কেশের বাহার, দেখতে পাবে না চোখের নিভৃত নজর।

কিংবা তুমি ওড়ো, আলো ওড়ো। তোমায় আমি ওড়ার পোশাক পরিয়ে দিলুম। বেশি দূর উড়ান দিতে হবে না, ময়ূর আমার! বেলেপাথরের স্থাপত্যের পটভূমিটা খুঁজে পেতে যা দেরি। তারপর পেখম মেলে দাঁড়াও। ঝর ঝর ঝর ঝর আওয়াজ তুলে নাচো, ময়ূর নাচো। বাঁচো।

আপনি এখনও ওইভাবেই বসে? পা খুঁজে পাননি?

ধ্যান করছি।

বাঃ ধ্যান খুব ভালো জিনিস। কিন্তু টিউশনি আরও ভালো। হাতে আছে কটা। ভালো টাকা দেবে। করবেন?

তো আপনি করছেন না কেন?

আমি স্পেশালাইজ করেছি বাচ্চাদের লাইনে।

তা এরা কি বাচ্চার বাপ?

উঃ, পারেনও। বাপ না হোক, দাদা-দিদি। বি. এ. হনস, এম. এ. আপনার তো প্রচুর নোটস আছে।

সেসব নোটস আমি একজন ছাড়া কাউকে দেব না।

দিতে যাবেন কেন? ব্যবহার করবেন।

সেই একজন যে কে জিজ্ঞেস করলেন না তো?

জানি। আমার পরীক্ষার পড়া করার সময় নেই। সকালে তিনটে, সন্ধেয় দুটো রোজ। জোড়া জোড়া বাচ্চা সব। কখন পড়ি বলুন? ...

হুশ্। পাখি উড়ে গেল।

কিন্তু, কী বারতা রেখে গেল ও? বি. এ. অনার্স. এম. এ., ছাত্রছাত্রী? ভালো টাকা? সত্যিই তো? প্রচুর ভালো নোটস আছে। রয়ে গেছে। চাকুরি যখন হচ্ছে না, উপার্জন করতে দোষ কী? এটা কেন এতদিন মাথায় আসেনি?

অতঃপর নটরাজ দিনের পাখি। রাতের পাখি। পুরাতন সাইকেলটা কাজে লাগছে, কাঁহা কাঁহা মুলুকে চলে যাচ্ছে নটরাজ। মাস গেলে পকেটে কড়কড়ে কাঁচা নোট। মাস গেলে বউদির হাতে সেভন হানড্রেড থোক।

দাদা মুখ ধুচ্ছে।—খ্ খি?

বিশেষ কিছু নয় দাদা, টিউশনি।

বউদি বলল, 'তা হোক। লক্ষ্মীর আবার জাত কী? মা সদাই মা।'

আপন খাঁচায় ফিরে এসে এবার নটরাজের খি-খি করার পালা। হাতের নোটগুলো সাজায় আর হাসে, 'মা? অ্যাঁ? তোরা শেষ পর্যন্ত মা বনে গেলি? যা ব্বাবা।'

ক্রমশ দশ হাজারি হয়ে তবে দম নেয় নটরাজ। সেবন্তীর বাড়ি জনা দশ একত্রে পড়ে। নিয়াজ হাসানের বাড়ি আরও দশ। রাজিন্দর সুরানার ঘরটা আরও বড়ো। ওদের সব ঘরই হলঘর। ওখানে একসঙ্গে বারো জন। আর নটরাজের মাটি ভাপাবার সময় নেই। কে বলল খ, কে বলল খা, শোনার সময় নেই। লাইব্রেরি যাচ্ছে রেগুলার। জিরক্স করছে তাড়া তাড়া। বিতরণ হবে। মোটর সাইকেল কিনেছে, লাল হেলমেট, কোচিং যাবে। ফেল্টপেনের সেট। খাতা কারেকশন করবে। নটরাজ একাই একখানা চলমান ইউনিভার্সিটি।

ভালো উপরিও আছে প্রফেশনে। রেজাল্ট বেরোলে উপহার আসতে থাকে নানান কিসিমের। চিত্রাংশু দিয়ে গেল 'মিথ্‌স্‌ অ্যান্ড লেজেন্ডস্‌', সুমনা এনেছে বিদেশি কলম, মাইকেল জ্যাকসন নিয়ে হাজির সুশোভন, মিতারা দশজনে মিলে কিনে এনেছে এনসাইক্লোপিডিয়া ছ-ভল্যুম। সুরানা রবীন্দ্র রচনাবলী রাজসংস্করণ।

ফুরফুরে চুল সাবধানে আঁচড়ে তাম্রলিপ্ত জিনস্‌ আর ক্রিম টি শার্ট পরিধান করে অতএব নটরাজ সেবন্তীর বাবার বাড়ি যায়। শ্রেষ্ঠ উপহারটি তিনিই দেবেন। দশহাজারি টিউটরের লালচে গাল, কালচে চুল, চকচকে খোলনলচে, ধুন্ধুমার মোটর সাইকেল, কথাবার্তায় সাবলীল দখল সেবন্তীর মতো সেবন্তীর বাবাকেও টানে। নামি বিজ্ঞাপন কোম্পানির দামি চাকরি তাঁরই সৌজন্যে হাঁকড়ায় নটরাজ। এবং শেহ্‌নাই বাজে।

নটরাজ সিনহা, যে একদিন নিজের পা খুঁজে পাচ্ছিল না, বাম্পার ড্র-এর ফার্স্ট প্রাইজখানাই সে পেয়ে গেছে লটারিতে। সে এখন শ্বশুরপ্রদত্ত সুবিশাল যোধপুরি ফ্ল্যাটে থাকে। মামাশ্বশুর প্রদত্ত কনটেসা হাঁকায়। ঘরে ঘরে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রাগুলি পিসিশাশুড়ি মাসিশাশুড়িরা যুক্তি করে উপহার দিয়েছেন। সেইখানে চিনে মিস্ত্রির তৈরি সেগুন কাঠের ফার্নিচারে অঙ্গ রেখে অফিসান্ত কাজকর্ম সাঙ্গ করেন বাদশাহ। চেহারায় আরও চেকনাই। চুলে আরও গ্লেজ। চলনে আরও উড়ান। বলনে আরও পালিশ।

কোনো কোনো উইক্‌-এন্ডে বাদশা-বেগম সামাজিক হয়ে যান। বেলিয়াঘাটার পুরোনো পাড়ায় যান। পুরোনো বাড়ির চটা ওটা ফাটা-চাতালে দুটি চাতক পক্ষী। চাতক? না গায়ক?

দাদা ডাকেন, কুহুঃ।

বউদি ডাকেন, পিউ কাঁহা।

প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে ডাকেন, খাবার তুলতে তুলতে ডাকেন, চা করতে করতে ডাকেন, সেই একই বউদি, যিনি অসামান্য প্রতিভায় টাকাকে 'মা' বলেছিলেন। পাড়ার জ্যাঠামশাই এসে যান। এসে চেঁচিয়ে বলেন, 'তিনি বরাবর জানতেন নট এলেমদার ছেলে।' খাটো গলায় আবার বলেন, 'অন্তত হাজার পাঁচেক যদি...বাড়িটা বড্ড আটকে গেল কি না...।'

পাড়ার ঝগড়াটি ধনেশগুলো কী মন্ত্রে সব শিস দেওয়া বুলবুল-দোয়েল হয়ে গেছে। গেরস্থ পায়রাগুলো যারা নিজেদের থাকত, কদাচ গণ্ডির বাইরে পা ফেলত না, তারা সব কুতুহলী শালিখ হয়ে কদম কদম বেড়ে আসছে। নটরাজের অভিমুখে।

শুক-শারিকে ব্যাটবল নিয়ে মাঠ থেকে ফিরতে দেখে দপ্‌ করে মনে পড়ে গেল।

তোরা আজকাল টিউটরের কাছে পড়িস না?

পড়ি তো! টিউটোরিয়্যাল হোমে।

বউদি বলল, 'এক-এক সাবজেক্টের এক-এক টিচার রাখবার সংগতি নেই ভাই আমাদের। অগত্যা টিউটোরিয়াল।'

কোথাও কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া নেই। কারুর মনে কোনো সন্দেহ, ঘুণাক্ষরেও দানা বাঁধেনি। তবু...তবু জিজ্ঞেস করা গেল না। কেমন বাধো বাধো ঠেকল।

বউদি নিজেই কী ভেবে বলল, 'তা ছাড়া আলোকে দিয়ে হায়ার ক্লাসটা ঠিক হয় না। ওর তো দাদাটি আবার মারা গিয়ে বসে আছে। বাপের সংসার, দাদার সংসার সমস্ত ওর ঘাড়ে। অগুনতি টিউশনি করে।'

দেখা হবার কথা নয়। অগুনতি টিউশনি করে যখন। তবু একদিন দেখা হয়ে গেল। বাই-পাস ধরে এসে বিজন সেতু দিয়ে গড়গড়িয়ে নেমেছে কনটেসাটা, বালিগঞ্জ স্টেশনের মুখে দু নম্বর থেকে নেমে এল আলো। মোটা ফ্রেমের চশমা। পুরু কাচের ওধারে চোখ গলে গেছে। শিঁটোনো। কেমন কালিঝুলি মাখা। শাড়িটা যেন বড্ডই বড়ো হয়েছে। কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এসে অর্ধেক আলোকে ঢেকে দিয়েছে। কেমন উড়োখুড়ো।

এ কি আলো? এখানে? চিনতে পারো?

চশমাটা বারবার ঠিক করে অবশেষে ঘাড় ঝাঁকিয়ে এক চোখে তাকিয়ে রইল আলো।

বলল—কঃ।

আমি নটরাজ। নটরাজ সিন্‌হা।

কঃ, কঃ, হক্ক।

এ কী? এত কাশছ? ওষুধ খাও!

খাই তো! চলি, খুব দেরি হয়ে গেছে।

আলো আঁটসাঁট করে বড়ো কাপড়টা জড়িয়ে পরেছে। চটিটাও বোধহয় বড়ো। কেমন ঘষড়াতে ঘষড়াতে চলে গেল।

অনেক রাতে সেবন্তী ঘুমে, বাড়ির কাজের লোকগুলি ঘুমে, সেবন্তীর ছেলে ঘুমে। কা! কা! কা! বিস্মিত, ব্যথিত, বিপন্ন ডাকাডাকি চরাচরে। ঘুম চটে যায় নটরাজের। জানলা থেকে ফিকে জোছনার প্রপাত দৃষ্ট হয়। অগত্যা নিশি ডাকে বারান্দায়। সৌর প্রকৃতির জাদুদণ্ড জোছনার গায়ে ভোরালো আলো-আঁধারি ছুঁইয়ে দিয়েছে। আর, বুঝি দুখনিশি ভোর—এই বিভ্রমে পাগলের মতো ডেকে ডেকে ফিরছে কাকেরা। সেই কাকই তো? ছরকুটে পা...কালিঝুলি...উড়োখুড়ো...?

কা? কা? কা?

কাকের গলায় এমন আর্দ্র, সুদূর, মন-শূন্য করা জিজ্ঞাসা আগে কখনও শোনেনি সে। কাক না ঘুঘু। তফাত করা যায় না।

বলাকা

সত্যপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ওরফে কর্নেল চ্যাটার্জির বয়স আটান্ন পার হল দুই হপ্তা আগে। কেউ বলবে না। চোখের দৃষ্টি তিরের মতো, পড়ার জন্যে ছাড়া চশমা লাগে না। দাঁড়ান সটান, চলেন সোজা, কপালে একটি, একটিমাত্র ভাঁজ। অনুভূমিক, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। চোখ বা ঠোঁটের পাশে কাকের পা নেই। পঞ্চাশ পার হয়েছেন কিনা সন্দেহ হয়। ষাটে জীবনে দ্বিতীয়বার অবসর নেবেন।

ইতিমধ্যেই নানান জায়গা থেকে আগাম ডাক আসছে, তারই মধ্যে যে-কোনো একটাকে বেছে নেবেন। নিজের সময় এবং পছন্দমাফিক। যৌবনের তেজ আর কর্মক্ষমতা, প্রৌঢ় বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা এসবের প্রয়োগের দিন শেষ হতে তাঁর এখনও অনেক দেরি। এ কথা তিনি একাই বোঝেন না, বোঝে যারা আশেপাশে অর্থাৎ সংসারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে, কাছাকাছি রয়েছে তারাও। ছিলেন মিলিটারিতে। চিন-ভারত যুদ্ধে একটানা দু-মাস নিঁখোজ থাকার পর ফিরে এলে মায়ের কান্নাকাটি, ঠাকুরমার টানা তিন দিন 'জল স্পর্শ করব না' ইত্যাদির পরও সেই রোমাঞ্চকর চাকরিটি ছাড়েননি। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাঁর রক্তে। এখন আছেন বাণিজ্যিক সংস্থায়। এখানকার অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আলাদা। অনেকটা দাবা খেলার মতো। এখানে কর্নেল মনের সাধে ঘোড়ার চালে কিস্তি মাত করে চলেন। কিন্তু জীবনযাপনের কায়দায়, চলায় ফেরায়, সর্বোপরি শিকারের নেশায় কর্নেল চ্যাটার্জি এখনও মিলিটারির লোক রয়ে গেছেন। হাতটা কেমন নিশপিশ করে। এখনও লক্ষ্য স্থির আছে তো? নিশানা? কিছু করতে পারবেন এখনও দরকার হলে? ঘুমের মধ্যে তির ছোড়েন। বন্দুক বাগিয়ে ধরেন। ঘুমের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তির, বন্দুকের গুলি, প্রায়ই পাশের মানুষটির বুকে পিঠে গিয়ে বিঁধত।

'উঃ! উঃ! কীরে বাবা।' ঘুমের মধ্যে সে কাতরে উঠত। কর্নেলের ততক্ষণে হয় ঘুমটা একেবারেই ভেঙে গেছে, তিনি পাশের মানুষটির আঘাত লাগা জায়গাটা ডলে দিতে দিতে বলছেন, 'এইটুকুতেই জখম হয়ে গেলে? আরে বাবা, সম্মুখসমরে তো কখনও যাওনি, যাবেও না!' আর আধো-ঘুম অবস্থায় থাকলে তিনি মটকা মেরে পড়ে থাকতেন। কিছুটা ঘুম ফিরিয়ে আনার জন্য, কিছুটা বা লজ্জায়। এখন পাশের জায়গাটা শূন্য। খুব আশ্চর্যের কথা, এখন কর্নেলের ঘুমের মধ্যে তির-ছোড়ার রোগটা সেরে গেছে। গত দেড় বছরে একবারও, অন্য কারণে হলেও এই কারণে জেগে ওঠেননি। চাঁদমারি নেই বলেই কী? কথাটা মনে করে দুঃখের মধ্যেও কর্নেলের হাসি পেল। চাঁদমারিই বটে! শেষ দিকটায় অতসী কঞ্চির মতো রোগা হয়ে গিয়েছিল। শুধু বক্ষ এবং নিতম্ব সামান্য গুরুভার। ছোট্ট মুখটা ভরাট। কপালে একটা নীল শিরা। কেউ বলত অলক্ষণ, কেউ বলত রাজরানি হবার লক্ষণ। কোনোটাই মেলেনি। অলক্ষণ? অর্থাৎ বৈধব্য? তিনি এখন বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। সে-ই বরঞ্চ অত্যন্ত অসময়ে তাঁকে যেন একটু অস্বস্তিতে ফেলে চলে গেল। আর হবোহবো করেও তিনি কিছুতেই কোম্পানিতে এক নম্বর হতে পারলেন না। চেয়ারম্যান সাহেবের স্তাবকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি বাঙালি হওয়ার দরুন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কর্মক্ষমতা, মৌলিকত্ব ইত্যাদি বহুজনের ঈর্ষার বস্তু হয়ে পড়েছিল। কাজেই রাজা, যবরাজ হওয়া আর হয়ে

উঠল না। তবে এ-যুগের বাণিজ্য সংস্থার চেয়ারম্যান যদি বিক্রমাদিত্য হন, তাহলে তাঁর নবরত্নসভার একজন তিনি। নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে হয়েই আছেন। কিন্তু বরাহমিহিরের স্ত্রীকে তো আর কেউ রাজরানি বলবে না। সুতরাং অতসীর কপালের নীল শিরাটা জ্যোতিষীদের সবরকম গণনাকে হারিয়ে দিয়েছে, বা বলা ভালো, ভুল প্রমাণিত করেছে। ক্ষীণতার কারণে ইদানীং কর্নেল স্ত্রীকে 'অতসী' না বলে 'বেতসী' বলে ডাকতেন।

কলকাতা নামক বিকট শহরটির থেকে অন্তত একশো কিলোমিটার দূরে এই নির্জন বনবাংলা বানিয়েছেন তিনি। মাসের দুটো সপ্তাহান্ত অন্তত কাটিয়ে যান। বাংলার গ্রাম যেরকম হয় তার চেয়ে একটুও কম বা বেশি ভালো না জায়গাটা। কিন্তু সবরকম ময়লা, আবর্জনা, অগোছালোপনা, দৈন্য ঢেকে যায় সবুজে। শীতের ক-টা দিন ধরণী মলিন, কিন্তু আকাশ অথই নীল। যেন প্রশান্ত মহাসাগর। রোদ যেন কাঁচা হলুদ বাটা। বাটি উপুড় সেই নীল চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে থাকো, দেখবে খুশিয়াল মেঘদের পশ্চিম-মেঘ পর্ব। আর দেখবে পারাবতের খেলা। বিকেল বেলার ছাদে দিনশেষের রাঙা মুকুল আকাশ দেখতে এলে আরও দেখবে টানা কুন্দফুলের একটি মালা সমানভাবে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। যাযাবর হাঁস না বকেদের দল—বকের পাঁতি। কর্নেলের বনবাংলোর থেকে সোয়া কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ঝিল। এলোমেলো তার তটরেখা। কোথাও বাঁধানো পাড় নেই। কচুরিপানার দল কখনও কখনও ভেসে আসে। আবার ভেসে চলে যায়। ধোপায় কাপড় কাচে, জেলেতে মাছ ধরে ; কিছু কিছু লোক চান করে, কিন্তু গাগরিভরনে কাউকে যেতে দেখা যায় না। দূরবিন চোখে নিয়ে কর্নেল দেখেছেন অনেক সময়ে কচুরিপানার দামের পাশ কাটিয়ে তরতর করে পানসি চলেছে। কোমর জলে নেমে খ্যাপলা জাল ফেলে প্রচুব কুচো মাছ তুলছে অল্পবয়সি জেলের ছেলে, কুচকুচে হাতে জ্যান্ত রুপোর কুচিগুলো তুলে পরখ করছে। তারপর সবসুদ্ধ কাঁধে ফেলে চলে যাচ্ছে খুশকদমে। শহরে কর্মজীবনের এবং জীবনযাত্রার একটা ধনুকের ছিলার মতো টানটান ভাব আছে। সবসময়ে শরীরে স্নায়ুতন্ত্রী চড়া সুরে বাধা থাকে। যাকে বলে টেনশন। সব সময়ে গেল গেল ভাব। গাড়ি চালাতে চালাতে সামনে 'বাবু, দিন না' এসে গেল। ঘ্যাঁচ ব্রেক, সেই সঙ্গে দরদর ঘাম, অরেকটু হলেই চলে গিয়েছিল লোকটা চাকার তলায়, গাড়ির চালক জনগণের হাতে, গাড়ি পুলিশের হেপাজতে। ট্যাঁ ট্যাঁ ফোন—'শিগগিরই চলে এসো, মিঠু, হ্যাঁ মিঠুর...বোধহয় গ্যালপিং হেপাটাইটিস।' 'চেষ্টার ত্রুটি হবে না', 'নাঃ তোমার তো ডক্টর দাশগুপ্তর সঙ্গে খুব জানাশোনা।' 'আরে বাবা পেলে তো! সব সময়েই ডাক্তাররা আজকাল কনফারেন্সে বিদেশে... দেখছি...।' বুকের মধ্যে টিপটিপ, মিঠু...মিঠু বড়দার একমাত্র নাতনি, ঝুলঝুলে চুল, তুলতুলে মুখ, গ্যালপিং...হে...পা টাইটিস! 'হ্যাললো চ্যাটার্জি' 'কে?' 'হিতৈষী। কংগ্র্যাচুলেশনস।' 'হোয়াট ফর?' 'ফর রিমেইনিং ; হোয়্যার ইউ ওয়্যার।' শিট! ফোনটাকে এবার শোবার ঘর থেকে দূর করে দেবেন।

দুধে গন্ধ কেন রে? এই গোবর্ধন!

কৌটোর দুধ সাহেব। বাজারে দুধ নেই।

কেন? গোরুমোষরাও স্ট্রাইক করেছে নাকি?

খাটাল হঠাও আন্দোলন হচ্ছে না সাহেব! গোয়ালারা তাই...

...'দমাদ্দম আওয়াজ কীসের, শেষ রাত্তিরে?' জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ছ তলাটার ওপর থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে। ডেমলিশন অর্ডার হয়ে গিয়েছিল, অনেকদিন। ফ্লু-এ ঠিক যেদিন তাঁর সারারাত মাথায় বোমা পড়েছে আর শেল ফেলেছে, সেই রাতের পর ভোরে প্রথম ঘুমঘোরের সময়টাই ডেমলিশন অর্ডার কার্যকরী করা শুরু হয়ে গেল। এরই নাম শহরে

টেনশন। তাঁদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির হাতা বেশ খানিকটা। তারপর গাড়িবারান্দা। ভেতরের ঘরগুলো উঁচু উঁচু বড়ো বড়ো, তবু সে সমস্ত পেরিয়ে, দীর্ঘদিনের অপরিষ্কৃত আবর্জনাস্তূপের গন্ধ, মিছিলের স্লোগান, রাজনৈতিক বক্তৃতা, পুজোটুজোর হইহল্লা সবই প্রবেশ করে। তাই এই নির্জন বনবাংলা। শরীর-মন শিথিল, চিন্তাভারমুক্ত, শহুরে ক্লেদ-বর্জিত থাকে কিছুক্ষণ। অতসীরও খুব পছন্দ হয়েছিল বাংলোটা। বিশেষত এই ঝিলের জন্য।

আরও একটা শরীর-মন ঠান্ডা করার, চাঙ্গা করার জায়গা আছে তাঁর। সল্টলেকে। রীমা তরফদারের বাড়ি। রীমা আর রীতা দুই বোন একসঙ্গে একা থাকে। তাদের বাড়ি কর্নেল চ্যাটার্জি চাঙ্গা-ঠান্ডা হতে যান মাঝে মাঝে। কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। হঠাৎ একটা ফোন করে দেন আগে থেকে। না হলে ওরা অপ্রস্তুতে পড়তে পারে। অন্য কেউ যদি চাঙ্গা হতে এসে থাকে! রীমা রীতা কর্নেলের অনেক দিনের অভ্যাস। যেহেতু মেজাজসাপেক্ষ এই দেখাশোনা, তাই রোমাঞ্চটা এতদিন পরেও চলে যায়নি। কবে রীতা আর কবে রীমা এটাও একটা মেজাজ অনুযায়ী শেষ মুহূর্তের নির্বাচনের ব্যাপার। সেখানেও তাই রোমাঞ্চ। এক পাশে রীমা, দোহারা সুন্দরী, সপ্রতিভ, বাক্‌পটু, কিন্তু যাকে বলে গ্রেসফুল, অন্যদিকে রীতা, অনেক অল্পবয়স্ক, উচ্ছল, অশ্লীল, মাদক, সুন্দরী নয়, কিন্তু উত্তেজক। ওখানে ঝিল নেই, আছে মরশুমি ফুলের কেয়ারি-করা বাগান, সুইমিং পুলে স্ট্রিপটিজ।

আকাশে ঝটপট ডানার শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকালেন কর্নেল চ্যাটার্জি। বকের পাঁতি। খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন আর কুন্দফুলের মালা নয়। গলার লম্বা, পেটের ফোলা, ডানার ঢেউখেলানো চওড়া—সবই দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট 'ক্লাক ক্লাক' ডাক অবধি শোনা যাচ্ছে। কর্নেল অবাক হয়ে দেখলেন প্রথম মালার পেছনে আরও মালা আসছে, আরও আরও, ছেঁড়া মালা, গোটা মালা। তারপর অদূরে ঝিলের চারপাশটায় সাদা সাদা ফোঁটা পড়তে শুরু করল। ঝিলের একধারটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। বকগুলো কোন্ সুদূর থেকে এসে তাঁর বনবাংলোর সংলগ্ন ঝিলের চারদিকে নেমে পড়েছে। আশ্চর্য তো! তিন বছরের ওপর এ বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, এ দৃশ্য তিনি এখনও দেখেননি। এই বছর এই প্রথম এরা এখানে এল, না কী? বাইনোকুলার চোখে লাগালেন কর্নেল। ঝিলের ওপরে এখনও বকের দল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি। এখনও বেশ প্যারেডের ভঙ্গিতে আছে, কেউ কেউ অতি মনোহর ভঙ্গিতে শরীর লম্বা করে ডানা ঝাড়ছে। রোটারি ক্লাব বছরে একবার করে আন্তঃস্কুল পি টি প্রতিযোগিতা করে। মেম্বার হিসেবে এগুলো তাঁকে দেখতে হয়, দেখতে খুব ভালোও লাগে। সাদা গেঞ্জি আর মেরুন শর্টস পরে ছেলেরা মাটিতে সহস্রদল পদ্ম হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন ফর্মেশন। ভারতবর্ষের মানচিত্র। মেয়েরা বেঁটে বেঁটে ডিভাইডেড স্কার্ট আর আলগা ব্লাউজ পরে পিয়ানোর সুরের তালে তালে লাল বলটা এক জনের থেকে আরেক জনের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছে। পায়ে নাচের ছন্দ। হাত আর মাথা একদিকে বেঁকিয়ে পাঠাচ্ছে বলগুলো, মাঝে মাঝে একেকটি মেয়ে লাফিয়ে ধরছে বল, ব্লাউজের হাতা উড়ছে পাখনার মতো, অবিকল ওই বক না হাঁসগুলোর মতো। মাথার ওপরে আবার আওয়াজ 'ক্লাক ক্লাক'। চোখ তুলে তাকালেন কর্নেল। ইউনিফর্ম-পরা একদল স্কুলের মেয়ের মতো উড়ে যাচ্ছে বলাকা। ছাই-সাদা ইউনিফর্ম।

হঠাৎ বহুদিন আগে দেখা এইরকম এক ঝাঁক স্কুল-গার্লের কথা মনে পড়ে যায়। তুলনাটা আজ এতদিন পর একটা বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে এল। তখন মনে হয়নি। সিক লিভে বাড়িতে। প্রতিদিন এই রকম একটা ঝাঁক রাস্তা পার হত। প্রথমে মনে হত সবগুলো এক, আস্তে আস্তে আলাদা করতে পারলেন। কোন্‌টা রোগা, কোন্‌টা মোটা, কোন্‌টা দোহারা, কোন্‌টা বেঁটে, কোন্‌টা মাঝারি, কোন্‌টা লম্বা। কেউ দোদুল বেণি, কেউ বব-কাট, কেউ ফরসা, কেউ কালো, কেউ শ্যামলা। দেখতে দেখতে

দেখতে দেখতে চোখ আটকে গেল। আর নড়তে চাইল না। অনবদ্য অনুপম।—'অতসী, এই অতসী, তোর জোগ্রাফির খাতাটা আমায় একবার দিবি?

নে না! এতে আর বলবার কি আছে?

মুখার্জি আঙ্কল বকবেন না তো।

বকবেন কেন?

উনি কপি করা পছন্দ করেন না। শেষকালে যদি ভুগোলেতে গোল।

ধুত্ আমার বাবা, আমি বুঝব, তুই নে।

দু চারদিন বন্ধুদের স্কুল-ফিরতি হাস্যালাপ থেকে ধরে ফেলা গেল অতসী মুখার্জি, মেয়ে স্কুলের ভূগোলের সার অমলেশ মুখার্জির মেয়ে। তখন মার কাছে গিয়ে হ্যাংলাপনা, 'দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।' মার চোখ ড্যাবডেবে খুশিতে। সংলাপ আরম্ভ হয়।

অমলেশ মুখার্জি, দেখুন, অতসী আমার একমাত্র সন্তান।

মিসেস চ্যাটার্জি, শি ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট, দিস স্কুল হ্যাজ এভার প্রোডিউস্ড্।

অমলেশ মুখার্জি, মাতৃহীন সন্তান। প্রাণপণে মানুষ করছি। আমার ইচ্ছে ও ডাক্তার হয়। কিংবা অ্যাডমিনিস্টেটিভ সার্ভিস। এখনই বিয়ে....

মিসেস চ্যাটার্জি, বেশ তো। ও স্কুলটা পাস করুক। আমাদের বাড়ি থেকেই পড়তে পারবে। মা নেই, মা পাবে। আপনিও ছেলে পাবেন।

সুবিখ্যাত চ্যাটার্জি বংশের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জি কন্যা প্রার্থনা করছেন জোগ্রাফির টিচার অমলেশ মুখার্জির কাছে, যিনি স্ত্রীলোকহীন সংসারে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, উচ্চাশী কিশোরী কন্যাকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে ব্যতিব্যস্ত। নিজের বা মেয়ের বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলেই ঘর্মাক্ত হয়ে যান দুর্ভাবনায়, অসুখ করলে অসহায়। নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন। অনেক ভেবেছিলেন। মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অনেক কথা। যতই বুদ্ধিমতী হোক, যতই উচ্চাশী হোক, সপ্তদশী বই তো নয়। সুতরাং মিসেস চ্যাটার্জির জয়। কর্নেল চ্যাটার্জির জয়। অভিজাত, বনেদি পরিবারের জয়। বৈভব এবং আভিজাত্য ছিল বংশের, বুদ্ধিবৃত্তি এবং সত্যিকারের সৌন্দর্য যোগ হল। এতদিন বাড়িতে রমণীকুল বলতে সোনা এবং হিরেয় মোড়া আলুসেদ্ধ ছিল, এবার এল স্নিগ্ধ তন্বী দীপশিখা। বিয়েবাড়িতে হইচই পড়ে গেল। কর্নেল চ্যাটার্জির বুক ক্রমশই ফুলছে। উচ্চমাধ্যমিকে একগাদা লেটার। ন্যাশনাল স্কলারশিপ। জয়েন্টে দুটোতেই সুযোগ ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং।—'তুমি তো বরোদা চলে যাচ্ছ, আমি মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হয়ে যাই?'—'আমি কি একা থাকব, বরোদায়? দু বছর? ছুটি পাব না, তার পরই ফ্রন্ট।'—'কিন্তু আমি তাহলে কী করে পড়ব?' 'আরে বরোদায় কি আর কলেজ নেই? ভরতি হয়ে যাবে।' 'ডাক্তারি? সম্ভব হবে কী করে?' চোখের আলো দপ করে নিবে গেল।

সপ্তদশী অষ্টাদশীদের কুমারী শরীর নতুন জাগে। ঠিক ফোটার পূর্ব মুহূর্তের কুঁড়ির মতো। সোহাগে, অভ্যস্ত, শিক্ষিত, নিপুণ হাতের যত্নে সেই দীপশিখা জ্বালাতে কতক্ষণ। 'বলো, বলো তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?' অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠের গোঙানি 'আমি যে কী করি? কী করি? চার পাঁচটা তো বছর...' 'চা-র, পাঁ-চ বছর নাহ্ অতসী তুমি আমায় একটুও...' পেছন থেকে মুখের ওপর হাত চাপা।

বরোদা। মিলিটারির জিপে করে অতসী কলেজ যাচ্ছে। ইতিহাস পড়ছে। টুকটাক শিখে নিচ্ছে, বাংলো সাজাবার কায়দা, এনটারটেইন করার কায়দা, অফিসার্স ক্লাব, উইমেনস ক্লাবের পার্টি। 'হ্যালো মিসেস চ্যাটার্জি, য়ু আর সো চা-র্মিং, লেটস হ্যাভ এ ডান্স।' দূর থেকে সকৌতুকে

দেখছেন কর্নেল। উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন না। ওর নাকের ওপর এখন নিশ্চয় চিরঞ্জীব সুদের হালকা হুইস্কি আর কড়া তামাক মিশ্রিত নিশ্বাস। খুব অনিচ্ছুকভাবে পা ফেলছে অতসী। তাঁর সঙ্গিনী মিসেস তলোয়ারকর অবশ্য খুব স্মার্ট। শি ইজ এনজয়িং হারসেলফ। তাঁর নিশ্বাসের গন্ধ মাদাম তলোয়ারকরের ভালো লাগছে। তীব্র পুরুষালি গন্ধ।

গ্র্যাজুয়েশন হতে না হতেই গোল্ডি এসে গেল। সোনালি রঙের বাচ্চা। তাই চম্পক। সে মা যে নামেই ডাকুক না, বাবার আদরের নাম গোল্ডি। 'আহ্ কী বিশ্রী একটা কুকুরের মতো নামে ডাকো।' 'কিস্‌সুই জানো না, অতসী, আমি ঠিক একেবারে সঠিক নামে ডাকছি।' গোল্ডি সাইকেল চড়ছে, গোল্ডি এয়ার গান চালাচ্ছে, গোল্ডি মারপিট করছে, গোল্ডির মা তার নানান স্বপ্নের কথা বলে চলেছে, রূপকথার মাধ্যমে, উপকথার মাধ্যমে। সোনালি রঙের গোল্ডি বলে, 'এই ট্র্যাশ গল্পগুলো তুমি কোথায় পেলে মাম্মি। গোস্টস? হাঁড়ি উপুড় করলেই মিষ্টি ঝরবে? মারমেইড, এ সমস্ত আজগুবি'—'কেন? তোর জিরো জিরো সেভেন, টিনটিন এসব আজগুবি নয়?' 'আজগুবি কেন হবে? ডিফিকাল্ট; কিন্তু অসম্ভব নয়।' বাবা ছেলে একসঙ্গে বলে ওঠে। কর্নেল চ্যাটার্জি বিজয়ীর হাসি হেসে বলেন, 'গোল্ডি ইজ হিজ ফাদার্স বয়, নট হিজ মাদার্স বেবি।' গোল্ডি চলে গেল দেরাদুন। চোখ ভরতি জল, অতসী বলল, 'আমি কী করব, বলে দাও'—'সোশ্যাল সার্ভিস করো, মিসেস তলোয়ারকর যেমন করেন।' 'ধুত্ ওকে সোশ্যাল সার্ভিস বলে? আমাকে একটা মেয়ে দাও।' মেয়ে কি ইচ্ছে করলেই দেওয়া যায়। অনেক কিছু ইচ্ছে করলেই কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও কিছু কিছু জিনিস দেওয়া যায় না। কর্নেলও দিতে পারলেন না। দুবার নষ্ট হয়ে গেল। শেষেরটা আকার পেয়ে গিয়েছিল একটা। ফরসা, গার্লচাইল্ড। অতসীর সে কী বুক ফাটা কান্না। সেই একবারই। তারপর অতসী শুকোতে থাকল। অতসী ছায়াময়ী হতে থাকল। মিলিটারি থেকে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে যখন তিনি এই শহরে, উঁচুর দিকে ওঠার কাজে ব্যস্ত, তখন অতসী বালিগঞ্জ প্লেসের বিশাল বাড়িতে প্রেতিনীর মতো প্রায় কায়াহীন শূন্য চোখে ঘুরে বেড়ায়। রাজ্যের কুকুর আর বেড়াল জড়ো করেছে, রাস্তার ভিখারি বাচ্চা ডেকে ডেকে খাওয়ায়। বিশেষত মেয়ে দেখলেই। অতএব রীমা রীতার দরকার হল। গোল্ডি ছুটিতে এসে বলে, 'মা, কুকুর পুষবে তো ভালো কুকুর পোষো, পেডিগ্রি দেখে, কোত্থেকে এই খেঁকি-নেড়িগুলো জড়ো করেছ?' শান্ত, কিন্তু কেমন একরকম দৃঢ় চোখে চেয়ে অতসী বলে, 'আমি যদি থাকি ওরাও থাকবে।' গোল্ডি গার্ল ফ্রেন্ডকে হিরো হন্ডার পেছনে বসিয়ে হু হু করে ছুটে চলে যায়। মাঝরাত্তিরে সামান্য মাদকের গন্ধ মুখে নিয়ে কর্নেল বাড়ি ফেরেন। অতসী, ক্ষীণা, অস্বাভাবিক সাদা বেতসী শোবার ঘরের দরজা খুলে কেমন একরকম চোখে তাকায়, তারপর সযত্নে কর্নেলের জামাকাপড় খুলে বাথরুমের বালতিতে ফেলে এসে, নাইট সুট পরিয়ে দেয়। শুইয়ে দেয়। দরজাটা বন্ধ করবার শব্দ পান কর্নেল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে বুঝতে পারেন পাশটা সারা রাত খালিই ছিল।

'অতসী-ই বেতসী-ই' কর্নেল চ্যাটার্জি ডাকছেন। নিঃশব্দে চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে অতসী। টাইয়ের নটটা নিজে নিজেই বাঁধতে বাঁধতে আয়নার মধ্যে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুখে নির্মল হাসি নিয়ে কর্নেল বলছেন, 'মদ্য তো আমি আগেও পান করেছি, তখন তর্ক-বিতর্ক করতে, তোমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কে আমি কখনোই পারতাম না, আফটার অল ইউ ওয়্যার দা ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্ট ইয়োর স্কুল হ্যাড সো ফার প্রোডিউসড। কিন্তু এত রাগ তো করতে না!'

আয়নার মধ্যে দিয়ে অতসী চেয়ে আছে। কোনো কথা বলছে না।

'কী হল? কিছু বলো? দাও-দাও, টাইটা ঠিকঠাক করে বসিয়ে দাও তো!' আফটার শেভের বোতলটা হাতড়াচ্ছেন কর্নেল। মুখ তুলতে তুলতে বলছেন, 'কই দিলে না?'

কাকে বলেছেন? আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'অতসী! অতসী!' রোববারের মরা মরা দুপুর। অতসী চৌকাঠে।

'চলো আজ তোমার বাবাকে দেখে আসি। চট করে তৈরি হয়ে নাও। সাবিরকে গাড়ি বার করতে বলে দিয়েছি।' অতসী চৌকাঠে এখনও দাঁড়িয়ে।

কী হল? যাও!

আমি গতকালই ঘুরে এসেছি।

সে কী? বলনি তো! সাবির বলেনি তো!

সাবিরকে নিইনি।

সে কী? তোমার এই শরীর, কীভাবে গেলে। ট্যাক্সিতে?

বাসে।

সে কী? কেন?

'বৃদ্ধাবাসে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে লজ্জা হয়'—অতসী আর দাঁড়ায়নি।

বাবা যখন অথর্বপ্রায়, শাশুড়ি মৃত, এত বড়ো বাড়িতে কর্নেল, তাঁর পত্নী এবং ভৃত্যকুল ছাড়া আর কেউ নেই, সে সময়ে কর্নেল-পত্নী বাবাকে এখানে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। কর্নেল হেসে বলেছিলেন, 'এই জন্য তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না অতসী, সংসারে থার্ড পার্সন কখনও আনবে না। বাইরে, অন্য বাড়িতে রেখে তুমি বাবার যত খুশি সেবাযত্ন কর না! টাকার অভাব হবে না।'

কাচের মতো চোখে চেয়ে অতসী বলেছে, 'আমার তো কোনো টাকা নেই!...বাবার একমাত্র আমিই আছি...'

'তোমার টাকা নেই! তোমার টা...নাহ্ অতসী, আই অ্যাম ড্যাম্‌ড।'

শহরতলির কোনো বৃদ্ধাবাসে জায়গা হয়েছে ভূগোল-শিক্ষক মিস্টার অমলেশ মুখার্জির। তাঁর নিজের সংগতিমতো।

এ সপ্তাহে দেখে গেলেন। পরের সপ্তাহে প্রস্তুত হয়ে আসবেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে, ডানায় হাওয়া কাটার একটা মোহময় সু উ শ্ শ্ শ্ শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলেন কর্নেল। অনেক অনেকদিন শিকার হয়নি, কোনো লক্ষ্যভেদ হয়নি। বন্দুকগুলোয় মরচে ধরছে। সাফ করতে হবে ভালো করে। নাকি তির ধনুক? আর্চারি? এই বিশেষ খেলাটিতে তাঁর বড্ড সুনাম ছিল এক সময়ে। সব সময়ে এক নম্বর।

ফেরবার সময়ে হাইওয়েতে পড়ে মাথায় এল কথাটা। দুইয়েরই পরীক্ষা হয়ে যাক। তিরন্দাজ এস. পি. চ্যাটার্জি আর বন্দুকবাজ এস. পি. চ্যাটার্জি। সাবিরকে বলতে হবে ওর বউকে নিয়ে আসবে। হাঁসের মাংস পাকায় চমৎকার! একবার খাইয়েছিল। অবশ্য খাওয়াটা জরুরি নয়, জরুরি হল নিশানার পরীক্ষা। গোল্ডিটাও খুব ভালো করছে। ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ একদম ঠিকঠাক লেগে গেছে সব। যেখানে যা লাগবার। গোল্ডিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, মরা বিকেলের আলোয় ছাদে রিভলভিং চেয়ার নিয়ে বসলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। পাশে তাঁর পরিষ্কৃত পাখি মারা বন্দুক, আর গোল্ডেন রিট্রিভার। সাড়ে চার বছর বয়েসের দুর্দান্ত আর একটি গোল্ডি। বাচ্চাটাকে দেখে প্রথমেই তাঁর অতসীর কথা মনে পড়েছিল। 'কী একটা কুকুরের মতো নামে ডাকো ছেলেটাকে!' আহা, একেও গোল্ডি বলতেই ইচ্ছে করে তাঁর। কিন্তু

ছেলে বাড়ি ফিরে বাবার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করতে পারে। যতই যুক্তিনিষ্ঠ, যতই প্র্যাকটিক্যাল হোক! কর্নেল চ্যাটার্জি একে 'স্কাড' বলে ডাকেন, যদিও মনে মনে বলে ফেলেন, গোল্ড, গোল্ডি। ওই চলে গেল প্রথম সারি। ওরা গিয়ে বসবে ঝিলের ধারে, গাছের ওপর বাসা বাঁধবে, ছোটো ছোটো টিলা সাদা করে বসে থাকবে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিলেন কর্নেল—ডোন্ট কিল এ সিটিং বার্ড। পাখিগুলো অর্ধবৃত্তাকারে উড়ে যাচ্ছে। তাদের কাজল পরা চোখের মতো ডানায় এখন নীচের দিকে টান। একটা...দুটো...তিনটে...চারটে...দলছুট... চতুর্থটা সামান্য দলছুট। তাতেই নিশানার সুবিধে হয়ে গেল। বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌...ঘুরতে ঘুরতে লাট খেতে খেতে পড়ছে। যতই নীচে নামছে গতিবেগ বাড়ছে। একদম অব্যর্থ লক্ষ্য। কোথায় লেগেছে গুলিটা তিনি এখনও জানেন না। লক্ষ্য ছিল পেটটার ওপর। ওই জায়গাটাই সবচেয়ে নধর তো! স্কাড ছুটছে, ছুটুক। তিনি তির-ধনুক তুলে নিয়ে পেছন পেছন ছুটেছেন। পরনে শর্টস, হাফ-হাতা সোয়েট শার্ট, পায়ে হ্যান্টিং শু। ঝিলের কাছটা কাদা জলা। ওখানে এখন পাখিদের মেলা বসে গেছে। ওরা বোধ হয় বুঝতেই পারেনি ওদের একজন সঙ্গী কম পড়ে গেছে। এখন ঝিলের পানা, শ্যাওলা, গেঁড়ি, গুগলি, কুচো মাছ খেতে ভারি ব্যস্ত। কাদার মধ্যে 'ক্লাক ক্লাক' করছে মেলাই।

কিন্তু এখানেও তিনি বসা পাখি মারবেন না। সেই যে শরীরটাকে লম্বা করে দিয়ে অসম্ভব সুন্দরভাবে ডানা ঝাপটায়। সেই সময়ে, সেই সময়ে ছুটে যাবে অর্জুনের তির। একটা বিশাল তেঁতুল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে শরসন্ধান করলেন কর্নেল, উঠছে, একটা পাখি উঠছে, টানছেন, তিনি ছিলা টানছেন, হঠাৎ কনুইয়ে টান পড়ল, চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক।

'কী করলেন? কে আপনি? হাউ ডেয়ার য়ু?' কর্নেল চ্যাটার্জি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টকটকে লাল হয়ে গেছেন।

'আমিও আপনাকে ওই একই প্রশ্ন ফিরিয়ে দিতে পারি। হাউ ডেয়ার ইউ?' সংযত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক।

'এই নির্জন ঝিলের ধারে শামখোলগুলো কতদূর থেকে এসে জিরোতে বসেছে। ঝিলের সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য, আপনারও অশেষ ভাগ্য যে এমন দৃশ্য দেখতে পেলেন। ওরা যেমন চায়, তেমনভাবে হাসতে দিন, খেলতে দিন, বাসা বানাতে দিন, বিশ্রামান্তে নতুন শাবক-দল নিয়ে দূরে আরও দূরে উড়ে যেতে দিন, যেখানে ওদের প্রাণ চায়। কী রাইট আছে আপনার ওদের হত্যা করবার?' ভদ্রলোকের চোখমুখ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে। কর্নেল কিচ্ছু বলতে পারছেন না।

'এ ঝিলে হঠাৎ শামখোল আসছে, সরকারের কাছে খবর চলে গেছে। শিগগিরই পাহারা বসবে।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন। নইলে দেখতে পেতেন স্কাড তিরবেগে ছুটে এসে কর্নেলের পায়ের কাছে মৃত পাখিটাকে ছুড়ে দিচ্ছে। সাদা লম্বা গলা। যৌবনাগমে ধবধবে বুক, বক্র চঞ্চুসমেত মুখটা ডান দিকে নেতিয়ে আছে। ডানা দুটো দুদিকে অসহায়ভাবে ছড়ানো, একটা ভেঙে ঝুলছে। ওইখানেই তাহলে লেগেছিল গুলিটা। খুব সামান্য এক ফালি রক্তের ধারা ডানায়। কর্নেলের চোখে কেমন ধাঁধা লেগে গেল। সাদা শাড়ি পরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে এক বিদ্ধ নারী। এক হাত ছড়ানো, আরেকটা লাল-মাদুলিপরা হাত কনুই থেকে ভাঁজ। দুটি পায়ের পাতা দুদিকে। শেষ শয়ন।

মিসেস তালুকদারের বন্ধু

মিসেস তালুকদারের কোনো বন্ধু নেই। কী করেই বা থাকবে? বন্ধুতা করতে গেলে নিকটত্ব চাই। ঘনিষ্ঠতা যদি নাও হয়, অন্তত পক্ষে একটা ন্যূনতম নিকটত্ব। কিন্তু মিসেস তালুকদারের সঙ্গে কারুর নিকটতাও নেই। অনেক দাম্ভিক, অনেক স্নব দেখা গেছে কিন্তু ওঁর মতো...। বিরাট নাকি কী কাজ করেন। ফরেন ব্যাঙ্কের বড়ো অফিসার-টার জাতীয়। চুল বাচ্চা মেয়েদের মতো বব-ছাঁট। চোখে রে-ব্যানের সান-গ্লাস। ঠোঁটে সবসময়ে লিপস্টিক, সরু ধনুক ভুরু। স্লিভলেস ব্লাউজ। একেক দিন একেক শাড়ি। মিসেস মুখার্জি, সোম, দস্তুর, অগ্রবাল, সানিয়াল, ডাট, চক্রবর্তী, বাসু, ঘোষদস্তিদার, ঢ্যাং, ভট্চারিয়া, চ্যাটার্জি, সেনগুপ্তা, রে সব্বাই একমত। হবে নাই বা কেন! এই সেন্ট অ্যালয়শাস স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভরতি করেছেন কেউ নার্সারির থেকে কে-জি থেকে। কারুর সন্তানের সেভেন। কারুর এইট হতে যাচ্ছে। এত বছর স্কুলে বাচ্চা নিয়ে আসা-যাওয়া। অনেকে আসেন দূর থেকে। বাচ্চা পৌঁছে স্কুল কম্পাউন্ডের একটা ছায়া-ছায়া কোণ দেখে বসে পড়েন। ক্রমে আরও দু-চার জন আসেন। গল্প জমে যায়, দারোয়ান বাহাদুরকে বকশিস করেন সবাই। তাকে ধরে-টরে গেট খুলিয়ে ফুচকা, ঝালমুড়ি, চটপটি আসে। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত কেটে যায়। কাটাতে যখন হবেই ...।

'তবু যদি রূপ থাকত।' মিসেস সোম মন্তব্য করেন।

যা বলেছ! অত সেজেগুজে থাকে তাই তবু দেখা যায় নইলে—

গোরি সি হ্যায় না? ইসলিয়ে ইতনা ঘমন্ড্—মিসেস অগ্রবাল মন্তব্য করেন।

ফরসা হলে কী হবে মুখখানা তো ভেটকি মাছের মতো। —মিসেস সেনগুপ্ত ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, পুরু ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক যা মানায়, আহা?

গলায় পুঁতির মালা, লম্বা তিলকের মতো টিপ যেন ধিঙ্গি বোষ্টুমি। ... মিসেস দস্তুর কৌতূহল প্রকাশ করেন, হোয়াট ইজ ধিঙ্গি বোষ্টুমি?

মায়েদের দলে একটা হাসির রোল পড়ে যায়।

বারোটা বাজছে। নার্সারি কে-জি-র ছুটি হল। পুঁচকি পুঁচকি বাচ্চাগুলো খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো হাত মেলে দৌড়ে আসছে। ছেলেমেয়েদের দলের মধ্যে একটি ছেলে অন্যদের চেয়ে লম্বায় বড়ো, ধবধবে ফরসা, কোঁকড়া চুল, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখে চারদিকে। তারপর বাহাদুরের কাছে গিয়ে কী বলে, মুখের মধ্যে আঙুল পোরা।

দ্যাখ যেন ন্যালাখ্যাপা।—মিসেস সোম।

বাচ্চাগুলোর মধ্যে দেখায় কীরকম? যেন লিলিপুটদের মধ্যে গালিভার।

নার্সারিতে দু'বার কে-জি-তে দু'বার ফেল্ করেছে, তাহলেই বোঝ বয়সটা কী!

বাহাদুর এই সময়ে হুড় হুড় করে গেট খুলে দেয়। মিসেস তালুকদারের গাড়ি ঢুকছে। গাঢ় সানগ্লাস। বেগুনি রঙের শাড়ি, মেরুন লিপস্টিক।

ব্লাউজ দেখে গা টেপাটেপি করেন মিসেস মুখার্জি ও মিসেস সোম।

ওটুকু না পরলেই পারত?

লেকিন ফিটিং এক্সেলেন্ট হ্যায়। কঁহা সে বনাতি? —মিসেস অগ্রবালের চোখে মুগ্ধতা, লোভ।

সত্যি, গায়ের চামড়ার ওপর যেন এঁকে দেওয়া মনে হয়।

সুপার, ... মিসেস দস্তুরেরও প্রসংশাবাক্য শোনা যায়।

নামলেন, গটগট করে ছেলেটির কাছে গেলেন, ছেলেটার গোঁজ মুখ। কিছু চাইছে, আইসক্রিম কেনা হল। ছেলের হাতে দিয়ে, তাকে একরকম কোলে করেই গাড়ির পেছনে তুললেন। কোনোদিকে না চেয়ে উঠে গেলেন! ব্যস, হুস।

মিসেস সোমের দুই মেয়ে। একজন সেভেনে, অন্যজন এইটে। প্রতি বছর ফার্স্ট হয়। কৃতিত্বটা শুধু মেয়েদের নয়। মায়েরও। ভোর চারটের সময়ে উঠে মিসেস সোম মেয়েদের ডেকে দেন। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে শীতকালের দিনে চানের গরম জল করে একেবারে রেডি। নিজে চট্ করে চান করে মেয়েদের পড়ার টেবিলের পাশে বসেন। পেনসিল বেড়ে দেওয়া, হাতের কাছে খাতা বই জুগিয়ে দেওয়া, পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট বসে বসে খাওয়ানো, এগুলো শেষ করে পুজো। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, গণেশের পট। লক্ষ্মী ধন দেবেন, সরস্বতী বিদ্যা সবরকমের, কালী বিপদে আপদে। গণেশ সাফল্যের জন্যে। ভক্তিভরে পুজোটা সারেন মিসেস সোম। ইতিমধ্যে কাজের লোক এলে তাকে দিয়ে রান্নাটা করাতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের এবং নিজের লাঞ্চ-প্যাক। স্কুল বহুদূর, মিসেস সোম তিনজনের খাবার হটকেসে ভরে, বেতের বাস্কেটে করে সঙ্গে নিয়ে নেন। একেবারে মেয়েদের সঙ্গে বারোটায় লাঞ্চ খেয়ে তিনটের স্কুল ছুটি হলে তাদের নিয়ে বাড়ি। যদি বলো, সেভেন এইটে পড়ে, মেয়েদের তো একা ছেড়ে দিলেই হয়। ছ-টার সময়ে ডিম-কলা-রুটি মাখন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে বাড়ি থেকে বেরোয়। আটটায় স্কুল শুরু। শেষ তিনটেয়। ভাতটা খাবে কখন? সেই কোন্ সকালে সামান্য জলখাবার তারপরও যদি স্কুলে লুচিফুচি টিফিন দেওয়া যায় শরীর থাকবে? বাঙালির মাছে-ভাতে শরীর। কোনোটাই গরম ছাড়া খাওয়া যায় না। তাও মিসেস সোম মাছ হোক মাংস হোক ভাতের সঙ্গে মেখে, মাছের কাঁটা মাংসের হাড় ছাড়িয়ে আর উনুনে বসিয়ে গরম করে হটকেসে ভরেন। বারোটার সময়ে দুই মেয়ে আসবে খিদেয় ছটফট করতে করতে। দুজনের হাতে দুটি তৈরি বাটি তুলে দেবেন মিসেস সোম। শেষকালে একটা আপেল কামড়াতে কামড়াতে মেয়েরা আবার ক্লাসে ছুটবে। তিনটে পর্যন্ত আবার গুলতানি। দিবানিদ্রা নেই, পত্রপত্রিকা পড়ার অবসর নেই, কোথাও যাওয়া নেই, এই চলেছে মিসেস অঞ্জলি সোমের। মায়ের আত্মত্যাগ না হলে কি আর সন্তানের মঙ্গল হয়? চাই আত্মত্যাগ।

মিসেস পিঙ্কি অগ্রবাল একটি কচি মারোয়াড়ি মা। তাঁর ছেলে বান্টি দুর্ধর্ষ দুরন্ত। পড়াশোনায় মন নেই। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র মায়ের কাছে থেকে বল নিয়ে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মা তার পেছনে ছুটে ছুটে তাকে খাওয়ান। অন্যান্য মারোয়াড়ি তনয়রা-তনয়ারা বাড়ি থেকে টিফিন আনারও ধার ধারে না। টিফিনের সময়ে ফুচকা, চটপটি, দহি-বড়া, আইসক্রিম এইসব খায়। মিসেস মুখার্জি গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা ভাই পিঙ্কি, তোমাদেব ছেলেমেয়েদের অসুখও তো করে না। বারো মাস তিরিশ দিন এই খাচ্ছে।'

সত্যি এক-একজনের স্বাস্থ্য কী? গাঁট্টাগোঁট্টা, কেউ কেউ আবার ইয়া মোটা।

পিঙ্কি অগ্রবাল বাঙালিপ্রধান এক মাল্টিস্টোরিড-এ থাকেন, বাঙালিদের মতো হয়ে গেছেন, তাঁর একটি গোপন বাসনাও আছে, মিসেস মুখার্জির মেয়ে বান্টির সঙ্গে পড়ে, যথারীতি ফার্স্ট হয়। আর বান্টির কোনো ঠিক নেই। আজ থার্ড হল তো কাল লাস্ট বাট ওয়ান। একবার ফেল করতে করতে বেঁচে গেল। তা পিঙ্কি অগ্রবালের গোপন বাসনা হল, মিসেস মুখার্জির মেয়ে ঈশিত

মুখার্জির খাতা। খাতাগুলো যদি একবার পান! তাই তিনি এই বাঙালিনি সংঘের সভ্য হয়ে গেছেন, সব কথাতেই সায় দ্যান।

মিসেস মুখার্জির বিস্ময়ের উত্তরে তাই তিনিও বিস্মিত হন, 'মেরি সমঝমে তো নহি আতা বহিন। বাল্টিকো তো ম্যায় সেরভর ভঁইস কা দুধ পিলাতি, ভুজিয়া ভি উও বহোৎ পসন্দ করতা, চাবল থুক থুককে ফেক দেতা। রোটি একঠো উসকো অন্দর জায় তো পূজা চড়াতি ম্যায় হনুমানজিকো। চল তো যাতা উনকি আশীরোয়াদ সে।'

এইভাবেই মায়েদের সাধনা চলে। বা বলা চলে তপস্যা। এই তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল মিসদের সঙ্গে ডাইরেক্ট কানেকশন। পারস্পরিক আদানপ্রদান। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাসাগর সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া এবং সারাদিনের মজলিশ। আড্ডা।

রোমাঞ্চকর ঘটনাও ঘটে। যেমন মিসেস তালুকদারের ছেলে বেধড়ক পিটুনি খেতে খেতে বেঁচে যায়। অনেক চেষ্টা করে ক্লাস ওয়ানে উঠেছে ছেলেটা। সাধারণত তার আদত মুখে আঙুল পুরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা। কিন্তু ওয়ানে পড়া বাচ্চারা প্রায় সবাই যুযুধান টাইপের। তারা তাকে তেমন থাকতে দেবে কেন? কেউ তার চুলে ফড়িং বেঁধে দেয়। কেউ তার পিঠে 'ডঙ্কি' লিখে দ্যায়, কয়েকজনে মিলে চারদিক থেকে 'হুক্কা হুয়া' করতে থাকে। সমবেত মায়েরা ব্যাপারটা দেখে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়েন।

'পারেও ছেলেগুলো'...মিসেস সোমের মন্তব্য। হাসিতে তাঁর শ্বাস আটকে যাবার অবস্থা।

খালি মিসেস দস্তুর, ডিগডিগে রোগা, বুক পিঠ সমান ফ্যাকাশে ফরসা মিসেস দস্তুর বলেন, 'দিস ইজ ন'ট প্রপার। দে শুড ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট।'

কিন্তু এই 'দে' যে কারা সে সম্বন্ধে তিনি কোনো ইঙ্গিত দ্যান না।

মিসেস মুখার্জি বলেন, থামুন তো। এই করতে করতেই দেখবেন ছেলেটা স্মার্ট হয়ে উঠবে।

স্মার্ট না হলেও প্রতিক্রিয়া হল। মিসেস তালুকদারের ছেলে একদিন রাগে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সামনে ছিল রোগা দুবলা কৌশিক। দড়াম করে মাটিতে পড়ে, তার মাথা ফেটে কাঁচা রক্ত।

মায়েরা সব দৌড়ে কেউ জল আনলেন। কেউ অফিসে, কেউ প্রিন্সিপালের কাছে খবর দিলেন। ছেলের দল ফরসা। খালি মিসেস তালুকদারের ছেলে মুখে আঙুল পুরে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে. তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিসেস সোম বললেন, 'শয়তান একটা।'

মিসেস রে বললেন, 'আজ তোমার হবে!'

প্রিন্সিপালের আদেশে ক্লাসে যাওয়া এখন বন্ধ ওর। তিনি হসপিট্যাল থেকে কৌশিক ফেরার অপেক্ষায় আছেন।

মায়েরা দারুণ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বসে আছেন। কেনিংটা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে হবে না সর্বসমক্ষে এই স্কুল কমপাউন্ডেই হবে এই নিয়ে গবেষণা চলছে।

এমন সময়ে বাহাদুর সরসর করে গেট খুলে দিল। মিসেস তালুকদারের গাড়ি।

নেমে ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বোধহয় একটু অবাক হলেন। গালে একটা আঙুলের টোকা দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

প্রিন্সিপ্যাল কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন, মিসেস তালুকদার বললেন, 'আপনাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আর একটা চিঠি দিতে এলাম আমার ওয়ার্ডের ব্যাপারে।'

দেখি।

চিঠি এবং সার্টিফিকেট পড়ে প্রিন্সিপ্যাল সামান্য নরম চোখে চেয়ে বললেন, 'ইটস আ স্ট্রেঞ্জ

কয়েনসিডেন্স মিসেস তালুকদার। আপনার ছেলেকে আমি আর একটু হলেই পাবলিক কেনিং করতে যাচ্ছিলাম। এই চিঠিটার ফলে...'

শিউরে উঠে মিসেস তালুকদার বললেন, 'সে কী কেন?'

ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে ক্লাস ফেলোর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ইটস্ আ ন্যাস্টি ক্র্যাক...

ও তো এরকম...

হি ইজ আ ক্রুয়েল টাইপ। আমি আগেও রিপোর্ট পেয়েছি।

এরকম কিছু তো আমি জানি না। দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন সাম গ্রেভ প্রোভোকেশন। আপনি প্লিজ খোঁজ করুন। ...

খোঁজ কবাতে ক্লাস ওয়ানের মিস ডি সুজা, ক্লাস ক্যাপটেন চিত্রেশ রঙ্গনাথন এবং কমপাউন্ডে বসে থাকা মায়ের দল মিসেস অগ্রবাল আদি একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, ইয়েস হি ইজ আ ক্রুয়েল টাইপ। ডি সুজা ক্লাস টিচার সবেচেয়ে খারাপ রিপোর্ট দিলেন। মিসেস তালুকদারের ছেলে নাকি অন্যদের চিমটি কাটে, পেনসিলের খোঁচা দেয় যেখানে-সেখানে, ব্লেড দিয়ে হাত পা কেটে দেয়। শুনতে শুনতে মিসেস তালুকদারের মুখ পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছিল। সানগ্লাসটা কিন্তু একবারও নামাননি। কাজেই চোখের ভাব পালটেছে কি না দেখা গেল না।

খটখট করে হাই-হিল বেরিয়ে এল, ছেলের হাত ধরল গাড়িতে উঠে গেল। হুশ্‌শ্।

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, 'ভাঙবে তবু মচকাবে না।'

ওদিকে ছেলেকে বাড়িতে রেখে মিসেস তালুকদার আবার অফিসে ফিরে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ব্যাপাবে উতলা হয়ে অফিসের কাজের ক্ষতি যে করা চলে না এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান টনটনে। কিন্তু ব্রাবোর্ন রোডে উড়াল থেকে নামতে গিয়ে তিনি আরেকটু হলে একটা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন। মাবমুখী পুলিশ জনতা সব ঘিরে এসেছিল।

কানা না কি? চোখে দেখতে পান না?

সকালবেলাই মদ গিলেছে। এসব ধরনের মেয়ে লোক...

যে মুটেটি পড়ে গিয়েছিল তাকে একশো টাকাব একটা নোট বার করে দিলেন মিসেস তালুকদার। কিছু হয়নি। তিনি শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষেছেন। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েই লোকটা রাস্তাব পাশে পড়ে গেছে। সামান্য একটু ছড়েছে হাঁটুতে। পুলিশটি তর্ক করতে করতে ওঁর গাড়িতে উঠল। কিছুদূব গিয়ে তাকেও একটা বড়ো নোট দিলেন মিসেস তালুকদার।

চোখ থেকে কালো চশমাটা নামালেন মিসেস তালুকদার। টেবিলের ওপর রাখলেন ব্যাগ, কালো চশমা। টয়লেটে গেলেন। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলেন। মেক-আপ উঠে যাওয়া মুখখানা ফুটে উঠেছে আয়নায়। তিনি প্রসাধনের নানান সামগ্রী বার করে মুখে-চোখে ফ্যাশন, অহংকার, উচ্চপদস্থ গাম্ভীর্য, যান্ত্রিক নির্লিপ্তি সব এঁকে নিলেন। শুধু চোখদুটোকে কিছুতেই পালটানো যায় না। তাই ঘরে কেউ এলেই তিনি কালো চশমা পরে নেন।

ইয়েসস্ হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু..।

বাড়ি ফিরতে সন্ধে। তিনখানা টিপটপ সাজানো শূন্য ঘর। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে ঢুকেছেন মিসেস তালুকদার। তাঁকে কফি তৈরি করে দিয়ে তাঁর কম্বাইন্ড হ্যান্ড শান্তি চলে গেল। কফি পান করে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। একেবারে নিস্তব্ধ, স্থাণু, পা দুটো সামনে ছড়ানো, মাথাটা সোফার গায়ে হেলে আছে। চোখ দুটো বোজা।

দরজায় টুকটুক করে ঘা। প্রথমে উপেক্ষা করেছিলেন, আবার টুকটুক টুক। মিসেস তালুকদার দরজার চোখে চোখ লাগিয়ে দেখলেন একটি বেশ বেঁটে দীন চেহারার মহিলা, যদিও পরিপাটি

করে ছাপাশাড়ি, লাল ব্লাউজ পরা। তিনি কালো চশমাটা পরে নিলেন, দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন, 'কী চাই?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না বউদি? আমি লক্ষ্মী।'

'ভেতরে এসো। কে বলো তো?'

ভেতরে ঢুকে, আঁচল দিয়ে গলাটলা মুছে লক্ষ্মী বলল, 'আমি সেন্ট অ্যালয়ের আয়া। পুজোয় অত বখশিস করতেন আর চিনতে পারলেন না?'

এতক্ষণে চিনতে পারলেন মিসেস তালুকদার। বললেন, 'ও, তুমি লছমি না?'

'ওই হিন্দুস্তানিরা লছমি লছমি করে ডাকত। আমার নাম লক্ষ্মী, বউদি।'

লক্ষ্মী বা লছমি কেন এখানে তাঁর বাড়ি এসেছে মিসেস তালুকদার বুঝতে পারলেন না। আর একটা বড়ো নোট খোয়াবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হলেন। তাঁর পরিচিত জগতের সর্বত্র মিসেস তালুকদার নিজের অজ্ঞাতে যেন ক্ষমার অযোগ্য সব অপরাধ করে ফেলেছেন। গুনগার দেবার জন্যে তাঁকে সবসময়ে প্রস্তুত থাকতে হয়।

বউদি খোকন কোথায়?

ঘুমোচ্ছে।

ভালো, ঘুমুক, ঘুমিয়ে নিক। বড়ো ধকল। বড্ড ধকল ওর ওপর দিয়ে যায় বউদি। ... কত চাইছে এই লক্ষ্মী? কেন চাইছে?

বউদি, আপনি একবার ভালো করে খোঁজ করলেন না?

কীসের খোঁজ করব!

ওই যা সব ডি সুজা, ছেলেরা, গার্জেনরা বলল খোকার সম্পর্কে? বিশ্বাস করে নিলেন।

মিসেস তালুকদার চুপ করে রইলেন।

সেই ছোট্ট থেকে তো ওকে দেখে আসছি বউদি। ভগবান দয়া করেননি। এমনি করেই ওকে গড়েছেন বউদি। ওকে আপনাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবেন বলে। ছেলেগুলো এইটুকুন টুকুন ছেলে সব কী পাজি। কী নিষ্ঠুর। ওর ওপর কী অত্যাচার করে ভাবতে পারবেন না।

মিসেস তালুকদার নড়েচড়ে বসলেন।

হঠাৎ লক্ষ্মী কেঁদে ফেলল, 'ও তো ঘুমুচ্ছে, আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওর পিঠের জামাটা ভালো করে তুলে দেখুন দিকি বউদি। কোথায় সে? আসুন।'

লক্ষ্মী নিজেই বাড়ির কর্ত্রীকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

অকাতরে ঘুমোচ্ছে খোকন।

সন্তর্পণে পিঠের দিকে জামাটা তুলল লক্ষ্মী। ফিসফিস করে বলল, 'টর্চ আনুন, টর্চ আনুন একটা।'

সারা পিঠময় আঁচড়ের দাগ। পুরোনো, নতুন, উরুতে, আঙুলেও।

এসব কী বউদি? দেখেননি?

আমি ভাবি মারামারি করেছে। পড়ে গেছে—এইসব।

না, না—লক্ষ্মী প্রতিবাদ করে উঠল—ওকে পেনসিল দিয়ে খোঁচায়, ব্লেড দিয়ে পিঠে কেটে দেয়, আঁচড়ে দেয়, অন্য অত্যেচারের কথা না-ই বললাম।

'ক্লাস টিচার জানে?' —কেঁপে উঠে বললেন মিসেস তালুকদার।

ওই ডি সুজা? হাড় হারামজাদি বজ্জাত। সব জানে। ওকে দেখতে পারে না তো। প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে লাগায়। সেই নার্সারি থেকে লাগাতার এই চলে আসছে।

ও তো আমায় কোনোদিন বলেনি? কেউ তো বলেনি।

'কে বলবে? ওইসব গার্জিন মায়েরা? ওদের কি মা বলে? না মানুষ বলে! ওই সোমগিন্নি তো প্রিন্সিপালের পায়ে পড়েছিল। কী না ছোটো মেয়ে থার্ড হয়ে গেছে। সে নাকি ফার্স্ট না হলে দুঃখে আত্মঘাতী হবে। বেরাকেটে ফার্স্ট করিয়ে তবে ছাড়ল। ওদের কথা ছাড়ুন। আর কে বলবে? আপনার খোকন? হা ভগবান তিনি কি ওদের বলবার মুখ দিয়েছেন? কে মারছে। কে গাল দিচ্ছে। কিচ্ছু বলবে না, বলতে পারবে না। আমি জানি বউদি। আমার যে ঠিক এমন একটি আছে। কত ওষুধপালা, কত ওঝা, কত পিরের থান করলুম বউদি, ওই একই ধারার রয়ে গেল। যত বড়ো হচ্ছে ততই আরও খারাপ। আমি পেটের ধান্দায় বেরিয়ে আসি, আশেপাশের ছেলেরা ওকে মেরে ছেঁচে দেয় বউদি। বাড়ি গিয়ে দেখি দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখ নীল, জামাকাপড়ে নর্দমার কাদা ..' বলতে বলতে লক্ষ্মী ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

বউদি গো। আমি জানি আপনার চাদ্দিকে এই যে অ্যাতো সামিগ্রি এতো পয়সা টাকা শাড়ি-জামা এসব কিচ্ছু না কিচ্ছু না। মনে সুখ নেই। ভয়ে, কষ্টে, লজ্জায় কাঁটা হয়ে আছেন। আমি সব বুঝি গো সব বুঝি।

মিসেস তালুকদারের কালো চশমা হঠাৎ খুলে যায়। বেরিয়ে পড়ে মার খাওযা কুকুবেব মতো দুটি চোখ। সন্ধ্যা ঘন হয়। আকণ্ঠ ওষুধ খেয়ে খোকন ঘুমোয়। বাড়ির কাজের লোক শান্তি পেছনেব কারখানার লেদম্যানের সঙ্গে তুমুল প্রেম কবে। শব্দ করে ট্রাক যায়, ট্রাক আসে। চিৎকার করে কোথাও তীব্র কামোত্তেজক স্বরে বাজতে থাকে, 'মোকাবলা মোকাবলা লাযলা।' মিসেস তালুকদাব আর লক্ষ্মীমণি দাস মুখোমুখি বসে গুমরে গুমবে কাঁদতে থাকেন। সান্ত্বনাহীন।

পরমায়ু

কুঞ্জ মাঝির চক্ষু দুটি গেল। পুরোপুরি নয়। রোদ থাকলে চোখে একটা লালচে আভা ঠাহর হয়। মানুষজনের চেহারার আদলটুকুও ধরতে পারে।

কে গেলি? নারান? উঠে আয় দিকি একবার!

সুবুচনীর মা নাকি গো? বউমার কাছে এয়েচ? বেশ বেশ।

এই পর্যন্ত। সম্পন্ন চাষি। ঘরে চিঁড়ে, মুড়ি, সরষের খোল অপর্যাপ্ত। চিকিৎসার ত্রুটি হতে দেয়নি ছেলে। সদরে যেতে হলে নদী পার। সেভাবেই একে একে দুটি চোখেরই ছানি অস্ত্র হল। প্রথমে কালো ঠুলি, তারপর বেশি পাওয়ারের চশমা উঠল নাকে। কালো ডাঁটির। চলল ওইভাবে বছর ছয়েক। তারপর ধীরে ধীরে আবার সব আবছা হচ্ছে। দিনের বেলাতেই যেন মনে হয় সাঁঝ নেমে গেছে। ভুরুর ওপর হাত দিয়ে মানুষ ঠাহর করতে করতে সে বলে, 'কইরে রানি, বিমলি! গেলি কই? পিদ্দিম দিলি নে যে বড়ো!'

'পিদ্দিম দোব যে পাখপাখালির ডাক শুনতে পেয়েছ? বলি অ ঠাকুদ্দা।'

'তা পাইনি', ডিমের মতো চুকচুকে হয়ে আসা মাথাটি নাড়তে নাড়তে কুঞ্জ বলে। রান্নাশালের পেছন দিক থেকেই আরম্ভ হয়েছে তার ন কাঠা সাত ছটাকের বাগান। সন্ধের ছায়া নামলেই তার আম জাম জামরুল পেয়ারা গাছ সব ঘরফিরতি পাখির প্রচন্ড কলরোলে ঝমঝম করতে থাকে। তা সেও যেন আজকাল রূপনারায়ণ, কংসাবতী, মুণ্ডেশ্বরীর জল পার হয়ে তার তীব্রতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে তবে আসছে কুঞ্জ মাঝির ভোঁ লাগা কানে। কান দুটি তার আগেভাগেই গেছে। মেয়ের ঘরের নাতি সুজন বেশ লেখাপড়া করেছে, সে বলে ইস্টোন ডেফ।

যে ডাক্তার ছানি অস্তর করেছিল সেই দেখল আবার, দেখে-টেখে হাতের যন্তর নামিয়ে বলল, 'চোখের নার্ভ সব শুকিয়ে গেছে তোমার বাবার। জরায়, বার্ধক্যে, বুঝলে কিছু?'

'এজ্ঞে, তার কোনো চিকিচ্ছে বার হয়নি?' পঞ্চাননের ভাবটা যেন চিকিচ্ছে বার হয়ে থাকলে সে তার বাপকে জেনিভা-টেনিভা পাঠাবে।

ডাক্তার বললে, 'না। বার হয়নি। নার্ভগুলির পরমায়ু ফুরিয়ে গেছে। আর পঁচানব্বুই তো পার করল তোমার বাবা, অনেক তো দেখলও। দেখবে যে, এখন আর দেখবার আছেটাই বা কী? যেদিকে তাকাও খালি দুঃখ, দুর্দশা, দুর্নীতি।'

পঞ্চা বিড় বিড় করে বলে, 'দেখতে চাচ্ছে যে! বড্ডই দেখতে চাচ্ছে ডাক্তারবাবু। বুঝেন না কেন, হাত বুইলে বুইলে মুখের চামড়াগুলো আমার তুলে নিচ্ছে বুড়ো।'

পঞ্চা! পঞ্চা! তুই পঞ্চুই তো রে!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার সন্দ হুচ্ছে কেন আজকাল?

কানে শুনিনে বাবা। তোর ছেঁয়াটা গলা ভারী করে আমাব ঠেঁয়ে টাকা পয়সা নিয়ে যায়। আজ এক কুড়ি, কাল দু-কুড়ি...।

ভোলো কেন? তার মুখ বুলোও?

বুলুই তো!

আমার যে খাটা-খোটা ফাটা বুড়োটে চামড়া, আর তারটা যে মিহ্নি টের পাও না?

কুঞ্জ এইবার রেগে ওঠে। 'তুই কতো বড়োটা হলি যে বুড়োটে চাম হবে? শুখো চাম তোর শত্তুরের হোক।'

এত দুঃখেও হাসি আসে পঞ্চাননের। যে বাপের পঁচানব্বুই পার হতে যায় তার ছেলের চামড়া এখনও কিশোর ছেলের মতো হবে? আবদার মন্দ নয়।

পঞ্চানন ঠাকুরের দোব-ধরা ছেলে। চারটি পর পর নষ্ট হয়ে অনেক কষ্টের ওই একটিই ছেলে কুঞ্জর। পাঁচ পাঁচ খানি ধুমসো ধুমসো মেয়ের পরে। মড়ুঞ্চে পোয়াতি বলে সে সময়ে পঞ্চুর মা-র কী অচ্ছেদ্দাটাই না হয়েছিল। চাঁদপানা মুখ দেখে বিয়ে দেওয়া ; সেই বউ যদি পাঁচ ছ বছরেও গর্ভ না ধরে কি মরা ছেলের জন্ম দেয় তো তার খোয়ার কুঞ্জ কেন ধম্মোঠাকুরেব বাবা এলেও আটকাতে পারবে না। তারপর যদি বা হল, হতেই থাকল। ধুমবো ধুমবো মেয়ে সব। একটু একটু করে বড়ো হয় আর গাছকোমর বেঁধে নাকে নোলক, কপালে টিপ, কই মাগুরেব মতো খলবলিয়ে খেলে বেড়ায়। কতখানি বয়েস পর্যন্ত কুঞ্জ মাঝির একাব হাতে জমি, জিবেত, খেত, খামার, হেলে-বলদ, গাই-গোরু। চারটে-পাঁচটে মুনিষ দিনরাত হাঁ-হাঁ করছে। মুরুক্ষু সুকুক্ষু মানুষ খাটুনির ভাগটুকু না হয় সামলাল, কিন্তু ধরিত্তির মা যে তুষ্ট হয়ে সোনা তুলে দিচ্ছেন হাতে তার হিসেবপত্তর সে রাখে কী করে? কোমরের গেঁজেতে পয়সাকড়িগুলো তার শুধু ঠুসে বাখাই সার। চালানের অভাবে কত আনাজপাতি তার ফি বছ্‌ব নষ্টই হতে থাকত। এখন দেখো, কেমন সব গোনা-গাঁথা। লাল খেরোর খাতা, কানে কলম, কড়া-ক্রান্তি হিসেব ছেলের, এক কানি এদিক ওদিক হবাব উপায় নেই।

কুঞ্জ মাঝির শব্দহীন বর্ণহীন ভুতুড়ে জগতে পঞ্চুই একমাত্র মানুষ। মানুষটি মাঝে মাঝে তাব মানসপটে দেবতাই হয়ে ওঠে। এক জমির থেকে তিন তিনটি ফসল অবলীলায় ওঠায় যে, ভ্যানগাড়ি কিনে বাগানের ফুল-ফুলুরি নিজ হাতে চালান দিয়ে মুঠো মুঠো টাকা আনে আব বাপের গেঁজে ভরতি করে যে, সে ছেলে দেবতা নয় তো আর কী? কোমর ভরতি টাকা, তা হোক না কোমর ভাঙা, চৌদিকে এমন টাল হয়ে থাকা সবুজ, না-ই বা চোখে দেখল এত সুখ শরীরে সইলে হয়। দুগ্‌গোপুর থেকে জল ছাড়লে দাওয়ায় উঠে আসে, সত্যি কথা। কদিন নৌকোর ওপর দোল-দোল দুলুনি। গরমেন্টের রিলিফ সবকার এসে বলে গেল, 'আপনারা এ গ্রাম ছাড়ুন, এসব জল-নিকেশি জায়গা। আমাদের কিছু করবার নেই।' পঞ্চা গাঁয়ের পাঁচজনকে একত্তর করে বোঝাল, নিজের হাতে গড়া ভুঁই কেউ ছাড়ে?

এখন গরমের দিনে বউমা ঘন দুধের মধ্যে বাড়ির ভাজা ডবকা ডবকা মুড়ির ধামি উপুড় করে দেয়, তাতে কলমের আমের ঘন রস, গন্ধে নীল ডুমো মাছি ওড়ে। দুই নাতনি দু-দিক থেকে ঝাপটে ঝাপটে বাতাস করে। গ্রাস মুখে তুলে কুঞ্জ মাঝি হাপুসহুপুস মা লক্ষ্মীর পেসাদ পায় যেন। লক্ষ্মী তো নয় গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরটি তার মানুষের রূপ ধরে দাওয়ায় পায়ের খসখস শব্দ তুলে উঠে আসে, গামছা ঝাড়ে, বলে, 'কী গো বাবা? খাচ্ছ ক্ষীর-মুড়ি? খাও, খাও বেশ করে খাও।'

রানি, বিমলা দুধার থেকে খিল খিল করতে থাকে।

'হাসির কী হল? বলি, হাসির কী হল রে ছুঁড়ি? হ্যাঁ গো বাবাকে জামরুল দিলে না যে বড়ো! অমন ডাঁশা ডাঁশা জামরুল, চুবড়ি ভরতি সব সাজানো রইল যে!'

মাথায় ঘোমটা, রানি বিমলার মা বেরিয়ে এসে বলে, 'তারপর পেট কামড়ালে?'

'অবাক করলে, দাঁতে একটা ফুটো নেই, ফাটা নেই, বাটি বাটি ক্ষীর সাবড়ে দিচ্ছে, জামরুল খেলে পেট কামড়াবে? ছিটেলের ঘরের মেয়ে দেখছি?'

হিণ্ডেলের বাটি ভরতি জামরুল এনে বউ বসিয়ে দিয়ে যায়।

'এক ছিটে জল দে রে রানি। মুখ কুলকুচি করি। নইলে মিষ্টি মুখে জামরুলের সোয়াদ পাবনি।'

কুলকুচি করে ঢকঢক গেলাস খানেক জল খেয়ে কুঞ্জ জামরুলের গায়ে হাত বুলোয়। আহা কী চিকন গো, এই নাতিনদের মুখের মতো। কামড় দিলেই রসের ফোয়ারা ছুটবে। তার দাঁতগুলি সব অটুট। দু-চারটি কশ ছাড়া ওই সব যাকে বলে একেবারে বিদ্যমান। সারাজীবন দাঁত দিয়ে আখ ছুলে চিবিয়ে খেয়েছে, মাংসের হাড চিবিয়ে ধুলোগুঁড়ি করে দিয়েছে সে কি অমনি-অমনি। দাঁতের বাহার দেখলে এই বয়সেও লোকের চোখ ঠিকরে যাবে। চোখ দুটি আর কান দুটি কেন গেল? সেই সঙ্গে শালোর কোমর, তা কুঞ্জ আজও বুঝতে পারে না। আর একটি জিনিস বোধের অগম্য তার। কার্তিক পড়তে না পড়তেই জাড় অমন জেঁকে বসে কেন? পোষ-মাঘে সে রেজাই গায়ে দিয়ে ঘরে আংরা রেখেও শীতে ঠকঠক করে কেঁপে সারা হয়। জামা-কাপড়-শয্যে সব যেন জলে চুবিয়ে এনেছে। অথচ এই সিদিনের কথা, অঘ্রানমাসের সন্ধেবেলায় মাঠের কাজ সেরে সে গাঙে ডুব দিয়ে এসেছে। নাতি এক বাঁদুরে টুপি এনে দেয় শহর থেকে। সেইটে পরে এখন জাড় খানিকটা সামলেসুমলে আছে। এ ছাড়াও হচ্ছে তলপেটে একটা খামচানি ব্যথা। ডাক্তার বললে এ রোগকে বলে হার্নি। অস্ত্র করতে হবে। 'অস্তর! আবার অস্তর!' হাঁউ মাউ করে উঠেছিল সে, 'চোখের ওপর ছুরি চালিয়ে তো তার দফা নিকেশ করে দিলে, এবাব পেটে ছুরি বসিয়ে আমারই কম্মো কাবার করতে চাও নাকি গো, ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন, 'কম্মো কাবার হবে না। কিন্তু যদি হয়ই, তো কি খুড়ো? অনেকদিন তো জীবনটা চেখে চেখে বাঁচলে। আর এই ঘিনঘিনে ব্যথা নিয়ে বাঁচতে ভালো লাগবে?'

কুঞ্জ অর্ধেক কথা শুনতে পায় না। এগুলি ঠিক শুনেছে। পঞ্চুকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকে, বলে, 'পঞ্চু আমাকে খবরদার টেবিলে তুলবিনি। বাড়ি নিয়ে চ। ঘিনঘিনে বাথা সে আমার, আমি বুঝব, ও শালোর ডাক্তারকে বুঝতে হবেনি।'

পঞ্চু হাসে, 'জোর করে কে তোমাকে টেবিলে তুলছে?'

ডাক্তারের পরামর্শমতো নীচ-পেটে পরবার বেল্টো কিনে দিয়েছে পঞ্চু, ঘুমের সময় আর প্রাতঃকৃত্যের সময় ছাড়া পেট সাপটে থাকে। এই তো সবেরই সুসার আছে, শুধু শুধু ছুরি-কাঁচি ইসব কী? শরীর থাকলেই রোগ-বালাই। তা যেমন রোগ তার তেমন ওষুধ! ঘাবড়ালে চলে? বুনো ওলের জন্যে চাই বাঘা তেঁতুল, নয় কী?

দুপুরবেলা দুই নাতিন বেশ করে তেল ডলে দেয়। পিঠটা বড্ড রুখু হয়ে যাচ্ছে। কুঞ্জ পিঠে তেল থাবড়ে দেয় হাত বেঁকিয়ে। পঞ্চুর বউ রাঁধে ভালো, তাকে বলে, 'পুঁইডগা আর লাউ দিয়ে চিংড়িমাছ অনেক দিন রাঁধো না তো বউমা। বেশ চনকো চনকো চিংড়ি।'

বউ বলে, 'চিংড়ি কই! পোকা মারার ওষুধে চিংড়ি হবার উপায় আছে?'

'গুগলির ঝোল সে-ও তো অনেক দিন খাওয়াওনি; খেলে পরমাই বাড়ে তা জানো?'

রানি-বিমলা হাসির বেগ সামলাতে পারে না। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। রানি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, 'কার পরমাই বাড়ার দরকার পড়ল গো অ ঠাকুরদা?'

'কেন রে ছুঁড়ি? তোর, তোর বাপের, মায়ের, আমার...'

'ওইটেই আসল কথা। তোমার পরমাইটাই আরও একটু নাম্বা করা দরকার।' রানির মা চোখ রাঙিয়ে তাকায়। তাদের বাবা ঠাকুরদার সঙ্গে এ ধরনের তামাশা পছন্দ করে না। বলে, 'জানিস আমি বাবার কত বয়সের ছ্যালা। ও তো আমারই ঠাকুরদার মতন!'

কুঞ্জ তেল-টেল মেখে আবার বলে, 'আজকাল কি ছাতু আর হচ্ছে না বউমা! প্যাঁজ, রশুন,

নংকা দিয়ে বেশ করে একদিন ছাতু রাঁধো তো! তোমার শাউড়ি রাঁধত। এক থাবা ছাতু দিয়ে এক থালা ভাত উঠে যেত।'

রানির মা বিরক্ত হয়ে সামনে থেকে সরে যায়। তিন॰ ॰ায়ে এককাল ঠেকেছে, কোথায় ধম্মোকথা কইবে তা না পুঁই-চিংড়ি, গুগলির ঝোল, ছাতু। ঘোব ক॰লি একেই বলে। বুড়ো মানুষেব মনেও ধম্মো নেই।

পঞ্চানন বুঝদার মানুষ। সে স্ত্রীকে বোঝায়, 'বুঝো না কেন বউ। চোখ নাই, কান নাই যার, তার পরানের সবটুকুখানিই যে জিবে এসে ঠেকেছে গো! এর সঙ্গে ধম্মো অধম্মোর সম্পক্ক কি? কুঞ্জমাঝি কোনোদিন অধম্মো করে নাই বুড়ো বয়সে নাই বা ভেক নিল।'

বউ গজগজ করে, স্পষ্টই বোঝা যায়, ধর্ম-অধর্মের ধারণায় সে তার স্বামীর মতে মত দিতে পারছে না। সে অসন্তুষ্ট গলায় বলে, 'যত অনাচ্ছিস্টি কাণ্ড।'

ফাগুন চোতে আকাশ যেন রক্ত-পলাশ! কাছে ভিতে জঙ্গল, বাগান, চরের মাটি, নদীর পাড়, এমনকি মেঠো হেটো রাস্তার দুধার অবধি সবুজে সবুজ! ন্যাড়া গাছের ডালে ডালে দ্যাখ-না-দ্যাখ কচি পাতা তিড়িং বিড়িং নেচে নেচে বার হয়ে যাচ্ছে। দুই বোনেব এক লগ্নে বিয়ে দিয়ে সারল পঞ্চানন। বলল, 'বাবা, তোমার একটুখানি খালি খালি লাগবে। তোমার বউমার তো শতেক কাজ! তার মাঝে তোমার নাতিনদের মতো হাতে-হাতে মুখে মুখে তো বেচারি পারবে না। একটু বুঝো!'

যার বলবার কথা সে বলল। এখন যাব শোনাবাব কথা সে তো শোনেওনি। এমন দিনে বানি-বিমলা দুই বোন ঠাকুর্দাদার দুই পাশ থেকে পাকা চুল তোলবার ভান করত, 'ও মা, মা, ঠাকুরদা, কোথায় যাব গো! তোমার যে কাঁচা চুল উঠছে গো', খুশি হয়ে উঠত কুঞ্জ, অবাক নয় কোনোমতেই। এটাই যেন স্বাভাবিক।

কটা? কটা? গুনে দেখ তো দিদি!

একটা ছিঁড়ে তোমায় দেখাব?

'উ হু হু' প্রবল প্রতিবাদ তুলত কুঞ্জ, 'পাঁচ কুড়ি পুন্ন হলে নতুন পাতার মতো নতুন চুলও গজায় রে, শরীল নতুন হয়ে ওঠে। দেখছিস না গাছপালায় সব পাতাপুতি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে!'

তুমি দেখতে পাচ্ছ?

তা একরকম পাচ্চি বইকি! বলরামচুড়োয় কেমন কালচে সবুজ পাতার টুপি এসেছে। মানুষেরও অমনি হয়!

'হবেই তো' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় কুঞ্জর, 'আবার কোমর সোজা করে দাঁইড়ে লাঙল ধরবুনি? ছেঁয়াটা তো সদরে দোকান দিচ্ছে, না পয়সা জলে দিচ্ছে! পঞ্চার পাশে কে দাঁড়ায় দিদি! পঞ্চাটা আমার খেটে খেটে হেলে গেল।'

হেলে কিন্তু পঞ্চানন যায়নি। চোত মাসের সকাল ন-টা থেকেই কাঠ ফাটে। ভাঁটরোব গ্রামাঞ্চলটুকু সবুজে সবুজ, তবু একটুখানি ছায়া ছায়া। কিন্তু ভ্যানগাড়ি নিয়ে বাজাব হাটে বেসাতি করতে গেলে নৌকোয় নদী পেরিয়ে আগে পড়বে মাঠ। তাতে আদিগন্ত কোথাও জিরেন নেই, বাস রাস্তায় একবার ঠেলে উঠতে পারলে ভ্যানগাড়ি শনশনাশন চলবে, তখন কোনো বড়োসড়ো গাছের ছায়ায় দুদন্ড গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেয়ে নেওয়াও যেতে পারে। পঞ্চার গাড়িতে কাঁচকলার কাঁদি, কাঁটালি কলা, এঁচোড়, থোড়, পাকা পেঁপে, কাঁচা পেঁপে, সজনে ডাঁটা, বেগুন, লঙ্কা, নেবু! সব কুঞ্জর বাগানের।

সন্ধে ঘুরে গেল। তুলসীতলার পিদিমটি নিবুনিবু। অন্ধকার ঘোর হচ্ছে। আনাচে কানাচে ঝিঁঝির

প্রবল প্রতিপত্তিতে ঝিনিঝিনি খঞ্জাল বাজাতে শুরু করে দিয়েছে. কুঞ্জ বলল, 'পঞ্চা যে এখনও এল না বউমা।' ছেলে বাড়ি না থাকলেই সে সন্ধে থেকেই কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘর বার করে।

বউ বললে, 'বেরুতে একটু বেলা তো হল, মাংসটা কাটল, কুটল, রাঁধল, তবে না বেরুনো। গাড়ি চুড়ো করে আনাজপাতি নিয়ে গেছে বাবা। ভাঙা হাট অবধি না দেখে কি আর সে আসছে! তুমি খেয়ে নাও।'

খাব কী গো? ছোঁয়াটা আসুক।

সে যদি আসে এখন তেতপ্পরে। চান না করে ভাতেও বসবে না। তুমি বুড়ো মানুষ। এখনই তো ঢুলছ দেখছি ...

তালে দিয়েই দাও। মাংসটা আছে তো?

মুখ টিপে হেসে বউ বলে, 'আছে গো আছে, আর কারুর না থাক তোমার আছে। তা চোতের গরমে দু'বেলা মাংস, খাবে তো?'

চোতের গরম? কোথায়? সাঁঝ হতে না হতেই তোমার চোত পালিয়েছে, ফুরফুর করে গাঙের হাওয়া দিচ্ছে এমন! ...

দাওয়ায় পাতা করে বুড়োকে এনে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে যায় বউ। কাঁসার বড়ো বাটিতে মাংস। আজ অনেকদিন পর গাঁয়ে খাসি কাটা হল, পঞ্চা তার নিজের ভাগ পাতা মুড়ে নিয়ে এসে নিজেই টুকরো টুকরো করেছে, নিজেই রেঁধেছে, কষে ঝাল দিয়ে। খেতে খেতে ঝালে টকাটক আওয়াজ তোলে কুঞ্জ। চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিন্তু সোয়াদ কী? মুখ যেন ছেড়ে গেল।

ভাত-টাত ঝোল মেখে শেষ করে সবে দাঁত বসিয়েছে একখানা হাড়ের ওপর জুত করে, বাইরে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া গেল। লণ্ঠন তুলে বউ সদরে আলো দেখায়। চার পাঁচজন জোয়ান লোক ভ্যানগাড়ি থেকে পঞ্চাকে নামিয়ে দাওয়ায় রাখলে। মাঠের মধ্যেই নাকি ভ্যানগাড়ি থেকে উলটে পড়েছিল। হাটফিরতি লোক দেখতে পেয়ে তক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে গেছে, ডাক্তার দেখে বলেছে, ইস্টেরোক। হাসপাতালে ভরতি করার জায়গা নেই। ওষুধ পত্র দিয়ে, ছুঁচ ফুঁড়ে, যা করবার করে ছেড়ে দিয়েছে। এখন কী কী খাওয়াতে হবে না হবে গোপাল কর্মকার পঞ্চার বউকে সব বুঝিয়ে বলছে।

হাড়টা এতক্ষণে ভালো করে ভাঙতে পেরে গেছে কুঞ্জ। ভেতরের রসটুকু জিভ সরু করে চুষতে চুষতে বলছে, 'পঞ্চা এলি? সঙ্গে কে র‍্যা! নিধু নাকি? শালো খচ্চর তুমি খাসির রাঙের লোভে লোভে কুঞ্জ মাঝির ঘরে রাত দুপুরে সেঁদিয়েছ। তোমায় আমি চিনি নে?'

নিধু বললে, 'খুড়োকে আর ভেঙে কাজ নেই।'

গোপাল বললে, 'রাখ, রাখ সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছে, এখন আর হ্যান নেই ত্যান নেই ছাড়। বল্ বুড়োকে। হাড় ছেড়ে উঠুক। পঞ্চাদার অবস্থা একদম ভালো নয়। দেখলি না চোখের পাতা টেনে টর্চ মেরেই ডাক্তার ছেড়ে দিল। রাত কাটবে না। সুজন, পরাণ সব খবর দে।'

ভোর রাতের দিকে পঞ্চানন অজ্ঞাতলোকে যাত্রা করল। বেচারির জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। সরু-মোটা গলার হাহাকারে গগন ফাটছে। কুঞ্জবুড়ো দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রয়েছে। সারাদিন একই ভাব। পাড়া ভেঙে সান্ত্বনা দিতে এল সব। মেয়েরা পড়েছে কুঞ্জর বউকে নিয়ে। বুড়োরা পড়েছে কুঞ্জকে নিয়ে। মাধব ঠাকুর পুরুতও বটে, জ্যোতিষীও বটে, বললে, 'মুখ তোলো কুঞ্জ, কোমর সোজা করে তোমাকেই তো এখন দাঁড়াতে হবে গো!' কুঞ্জ কোনোমতে দুই ঠ্যাঙের মধ্যবর্তী গহ্বর থেকে ডিমের মতো মাথাটি তুলে বলে. 'হাত পা আমার পাতা-পাতা হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর, বুকের মধ্যেটা ঘোর যনতন্না, শরীলটা আর বশে নেই গো!'

'আহা, অমন জলজ্যান্ত ছেলেটা ঠিক দুক্কুরে...গেল, শরীর আর বশে থাকে কুঞ্জ! তবে ছেলে তোমার দুপোয়া দোষ পেয়েছে। বিহিত করো, নইলে বাড়িতে আরও ক-টা অমঙ্গল অপঘাত কেউ আটকাতে পারবে না।'

বিকেল নাগাদ মড়া-পোড়ানিরা সব ফিরে এল। মটর ডাল দাঁতে কেটে, নিম ছুঁয়ে, আগুন ছুঁয়ে যে যার মতো ঘরে গেল। পঞ্চুর ঘরে বাতি জ্বলছে। বউ মেঝে আঁকড়ে শুয়ে। মাথার কাছে মেয়ে দুটি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুজন পরাণ দুই নাতি অনেক রাতে খুটখুট শব্দ পেয়ে ভূমিশয্যা থেকে উঠে দাঁড়াল। শোকাতাপা শরীর, ঘুম তো সহজে আসে না। যদি-বা আসে একটু আওয়াজেই খান খান হয়ে যায়। পরাণের ওপর আবার নতুন দায়দায়িত্বের দুর্ভাবনা। চাষবাসের বিশেষ কিছুই সে জানে না। তা বলে খুটখুট শব্দ এরই মধ্যে? চোর-ডাকাত সব বোধহয় জেনে গেছে, এখন থাকার মধ্যে এক অথর্ব বৃদ্ধ, এক সন্তপ্ত বিধবা আর এক উঠতি বয়সের অকালকুষ্মাণ্ড যে নাকি বাপ-পিতেমোর ধারাও নেবে না, অন্য ধারা নিতে গিয়েও খালি মার খাবে। কুঞ্জমাঝিব ভাষায় 'ছেঁয়া'।

দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে আসে, লোহার ডান্ডা থাকে ঘরের কোণে, সেটাকে হাতে তুলে নেয় পরাণ। খুটখাট আওয়াজ আসছে দক্ষিণেব দাওয়া থেকে। কুঞ্জর ঘরেই যতেক কাঁচা টাকা। নজর ওদিকেই হবে। দাওয়া ঘুরে পেছনে যেতেই দেখল চাঁদ চালেব বাতা ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। দাওয়া ফরসা। ঠাকুরদাদার ঘরের চৌকাঠে চোব হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার বেঢপ ছায়া পড়েছে দাওয়ার ওপর।

'তবে রে!' বিকট হাঁকড়ে উঠল সুজন।

চোরের কানে শব্দ পৌঁছেছে ঠিক। কিন্তু যতটা জোব হাঁক ততটা জোরে নয। হাত থেকে ঠক করে কী যেন দাওয়ায় পড়ে গেল।

সুজন-পরাণ নীচু হয়ে বলল, 'একি। কী করছ গো ঠাকুদ্দা, এই দুপুব রেতে।'

ফ্যালফেলে দৃষ্টি মাঝির্র দৃষ্টিহীন চোখে। ধরা পড়ার গলায় বলল, 'এই যে দাদা দুটো ঘোড়ার নাল, বেশ কালো কালো খয়াটে। ঠাকুরমশাই বলে গেল কিনা তোর বাপ দোষ পেয়েচে, দিষ্টি পড়বে, তাই দোরে নাল দুটো বাবলার আটা দে সেঁটে দিচ্ছিলুম।'

অবস্থান

'ওয়াজিদ? ওয়াজিদ আলি শা? খিদিরপুরে থাকেন বললেন না?' কেমন উৎসাহিত উত্তেজিত গলায় বলল খুকিটা। ছুটে গিয়ে আজকালের সব টেপটাপ হয়েছে, সেই একখান চালিয়ে দিল, 'বাবুল মেরা নৈহার ছুট হি জায়', ঘুরে ঘুরে মিহ্নি সানাইয়ের সুরে বাজতে লাগল টেপটা।

'ভালো লাগছে? আপনার ভালো লাগছে এই গান?' জ্বলজ্বলে চোখে খুকি বলে।

কী করবে? মাথাটা তালে তালে নেড়ে দেয় সে। ভালো আসলে লাগছে না ততটা। কিন্তু অত উৎসাহের আগুনে ফুস করে জল ঢালা যায় কি?

খুশি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

'আপনার পূর্বপুরুষের লেখা গান। জানেন তো? নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শা। ঠিক আপনার নাম। একেবারে হুবহু।'

এত উৎসাহ, উত্তেজনা, গান-ফানের কিছুই বোঝে না সে।

'ওয়াজিদ নয় খুকি, আমার নাম ওয়াজির, ওয়াজির...। আলি নয়, শা নয়, মোল্লা'—থেমে থেমে বলে সে। গলার আওয়াজটা বড়ে গোলামের মতো না হলেও বেশ জোয়ারিদার।

'মোল্লা? ওরে বাবা' খুকি যেন চমকে ওঠে।

কেন? 'ওরে বাবা' কেন?

'সে আমি বলছি না' জেদি ঘাড় দোলায় খুকি।

'আমি বুজতে পেরেছি' ওয়াজির মোল্লা দাড়ির ফাঁকে হাসে।

'বুঝতে পেরেছেন তো?' খুকির গলায় সোয়াস্তি। বস্তুত দুজনেই হাসে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রীর হাসি।

কিন্তু আপনাকে ওয়াজিদ আলি শা সাহেব বলেই ডাকব। কেমন?

'এটা কিন্তুক বুজলুম না খুকিসাহেব।' ... ওয়াজির মোল্লা মন দিয়ে পাকা পুডিং, রজন জ্বাল দেয়। নুটি ঠিক করে মার্কিনের টুকরোর মধ্যে ঝুরো তুলো ভরে।

'খুকিসাহেব?'—খুকিটি ভীষণ হাসি হাসতে থাকে। লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে একেবারে।

এত হাসি! ওয়াজির মোল্লা তার পালিশের নুটি নিয়ে প্রস্তুত। এত কিছু মজাদারি আছে নাকি কথাটায়! নাকি সিরেফ জওয়ানি। যৌবনই এমন বাঁধভাঙা হাসি হাসায়।

খুকির বাবা একটুকুন আগে অফিস চলে গেছেন। এবার মা যাচ্ছেন। লাম্বা লাম্বা ইস্ট্রাপের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে খুটখুট করে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো, না না ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হতে যাবেন কেন? কত বড়োমানুষ! এতগুলিন সামানে ল্যাকর পালিশ দিবেন। ব্যাপরে। সেন্টের গন্ধে ভেসে যাচ্ছে চাদ্দিক। চকচক কচ্ছে চামড়া। কত ল্যাকর কত জলুসের জান! ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া কেন হতে যান! ইনি হলেন গিয়ে ভালো জাতের রেসের ঘুড়ি। যেমনটি কুইনের পার্কের পাশে ঘোড়দৌড়ের বাজির মাঠে দেখা যায়! অতটা লাম্বাই-চওড়াই নেই। তা না-ই থাকল।

উনি বললেন, 'অত কী বকবক করছিস খুকি। কাজটা হবে কখন?'

আমার হাত কামাই নেই দিদিসাহেব। —নুটি চালাতে চালাতে মোল্লা বলে।

তা হোক, খুকি, বড্ড বিরক্ত করছ!

না মা। ইনি একজন বিশেষ মানুষ। হিস্ট্রির লোক। এঁর নাম জানো? ওয়াজিদ, ওয়াজিদ আলি শাহ্। খিদিরপুরে থাকেন।

'তা-ই-ই?' ভীষণ অবাক আবিষ্কারের দৃষ্টিতে কর্ত্রী তাকালেন। 'চেহারাটাও দেখেছিস!'

খুকি আবার হাসতে থাকে! 'তুমি তো আমজাদের চেহারার কথা ভেবে বলছ। আসল মানুষটা তো নয়! তোমার যা হিস্ট্রির সেন্‌স।'

আহা, আমরা লেম্যান তো ওইভাবেই জেনেছি! এ মিলটাও কি কম আশ্চর্যের!

ওয়াজির মোল্লা জানে না, কেন এই আশ্চর্য, কেনই-বা আবিষ্কার। কীসের মিল। কেন মিল। ভুল নাম নিয়ে কেনই বা এত কচলাকচলি। তবে সে আব শুধরে দেয় না। কী দরকার! রুজি যাদের কাছে, একটু-আধটু ভুলভাল বলে তারা যদি খুশি থাকে, থাক।

আমার মাকে দিদিসাহেব ডাকলেন কেন?

কর্ত্রী চলে যেতে খুকিটি আবার জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নের তার শেষ নেই।

কেন? ভুল হয়েছে কিছু?

না, ভুল নয়। সবাই তো মা, বউদি এসব বলে। ও, আপনাদের 'বউদি' নেই, না?

ওয়াজির মোল্লা কাঁধের কিনার দিয়ে চিবুক চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে থাকে।

তাই তো? দিদিসাহেব কেন? এই ডাকগুলান মুখ দিয়ে আপ্‌সে বেরিয়ে যায়। এখন তার কার্যকরণ বাতলাও এই কৌতূহলী বালিকার কাছে। মাথায় সিন্দুর নাই। ঘোমটা নাই। খাটো চুল গুছি গুছি পিঠ ঝেঁপে আছে। ঝুলঝুলে দুল। গলায় ঝুটো পাথরের দেখনাই হাব। হাতেই-বা কী? একটা হাতঘড়ি। একটা কাঠ না কিসের বালা। এমন ধারা শো হলে মা ডাকটা ঠিক হয় না। দিদিই ঠিক। কিন্তু এসব কথা খুকিকে বলা যাচ্ছে না। সে খানিকটা প্রশ্নের উত্তর বেমালুম উড়িয়ে-এড়িয়ে বলে 'সাহেব মানে একটা মান, একটা সন্‌ভ্রম, বোঝেন তো?'

খুকি আবারও প্রচুর হাসে। 'সন্‌ভ্রম? কী বললেন? সন্‌ভ্রম?'

খুকি বলতে ঠিক যতটা বাচ্চা হওয়া দরকার, এই খুকি কি ততটা? উলিথুলি চুল। চক্ষু দুটি ডাগর। তাতে ভাসে কৌতুক, কুতূহল, কোশ্চেন, ছোট্টখাট্ট, সবই ঠিক। কিন্তু খুকি খুকি শো থাকলেও এঁর সোমত্থ বয়স হয়েছে। ঢলঢলে কামিজ তবু বোঝা যায়। তা ছাড়াও, চলনবলন ছোটন-দাঁড়ান, কাজকম্মের একটা গোছ ধরন সবই ওই কথাই বলে।

তুমি ইস্কুলে যাবে না?

আমি কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার।

ওরে বাবা! সেকেন কেলাস একেবারে? তবে তো খুব ভুল হয়ে গ্যাছে খুকিসাহেব? তা আপনি কলেজে যাবেন না?

টেস্ট হয়ে গেছে, এখন আর যেতে হয় না।

বা বা—বাহবাটা কেন দিল মোল্লা তা জানে না।

শীতের বাতাসে বেশ আঁচ লেগেছে। শুখুটে শুখুটে দিনগুলো। পুরোনো সামান সব ঘষেমেজে, বাটালি দিয়ে চেঁছে ফেলে, নতুনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে-গুনিয়ে কাজ। দরজার এড়ো, ক্যাবিনেটের পাওট্ সব নতুন করে বাদাম কাঠ মাপসই করে করা। এখন আর সব মিস্তিরি জব্বর, গোপাল, মুন্না—সব কটিকে বিদেয় করে দিয়েছে। একটু একটু করে সাজিয়ে তুলতে হবে এখন সব। একা একা। অভিনিবেশ চাই তো না কি? শীতের শুখো থাকতে থাকতে সারতে হবে।

যবে থেকে একলা কাজ করছে আপন মনে, খুকিটি সেই ইস্তক সেঁটে আছে। অবিশ্যি সেঁটে বলতে ঠিক সেঁটে নেই। মাঝে মাঝে একেবারে অদর্শন হয়ে যায়। তারপর ঘুরছে ফিরছে, কাছে এসে বসছে, এটা ওটা নাড়ছে চাড়ছে। আর ফুলঝুরির মতো কোশ্চেন।

আরে সববনাশ, ও ঢাকা খুলেন না, খুলেন না।

কেন?

ইস্প্রিট সব ভোঁ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে পানি। জল।

জল? স্পিরিটে জল?

একটু আধটু ভেজালি এই লাইনে সবাই দিচ্ছে খুকি, কাকে ফেলে কাকে ধরবেন?

কী করে বুঝলেন জল আছে?

'এই দ্যাখেন', নিজের মোটা মোটা খসখসে আঙুলগুলি মেলে ধরে ওয়াজির!

চামড়া কেমন কুঁকড়ে উঠেছে দেখেছেন? এই হল গিয়ে পানির নিশানি। ... মনোযোগ দিয়ে দেখে খুকি।

স্পিরিট শুদ্ধ থাকলে কী হত?

পেলেন থাকত চামড়া। —স্পিরিটের মধ্যে গালা ঢালে ওয়াজির।

কী দিলেন ওগুলো?

গালা, কুসমি গালা খুকিসাহেব।

কুসমি? কুসমি কেন?

ডিমের কুসুম দেখেন তো? তলতলে কাঁচা-সোনা বর্ণ? সেইমতো হল গিয়ে বাজারের সেরা গালা। ফার্নিচারে মারলে কাঠের ওরিজ্ন্যাল রংটিই ধরবে। এমন ঝিলিকদার হবে যে, এদিক থেকে লাইট মারলে ওদিকে পিছলে পড়বে।

তা অ্যাত্তো সব হাঁড়ি-কুঁড়ি বাটি-ঘটি নিয়ে কী করছেন?

খেলা করছি। রান্নাবাড়ি—ছোটো ছেলেরা খেলে না?

খেলাই তো!

খেলা, কিন্তুক কেমন জানেন? পরানপনের খেলা।

কেন এর মধ্যে আবার প্রাণপণের কী হল?

ও আপনি বুঝবেন না খুকিসাহেব। এ হল গিয়ে রং ফেরাবার খেলা। একেকটি খোরায় জানের একেকটি ধরে রাখছি।

দেখি দেখি কেমন আপনার জানের রং।

তো দ্যাকেন, এই রং মেহগনি, ডার্ক ব্রাউনের সঙ্গে ভুষো কালি, একটু এই অ্যাতেটুকু সিন্দুর...

সিন্দুর?

বাঃ, আপনারা সাজেন আর আপনাদের ফার্নিচার সাজবেন না। সিন্দুরে, আলতায় কাজলে, সুর্মায় সাজবেন বইকি! তারপর কাপড় পড়বেন ঝাঁ চকচক!

'কী কাপড়? সিনথেটিক তো? নাইলন।' ... এতক্ষণে খুকি খেলাটা ধরতে পেরেছে।

না খুকিসাহেব, ওরে কি কাপড় কয়? পরবে বেনারসি, তসর, মুগা, বিষ্ণুপুরের বালুচরি।

ওরে বাবা! কই বেনারসি, তসর এসব কই?

বানাচ্ছি। খাপি মিহ্নি খোর্লে। এমন গ্লেজ দেবে যে সিল্কের সঙ্গে তফাত করতে পারবেন না। চোখে ঝিলিক মারবে।

সবই তো দেখছি একরকম!

আরে সাহেব, সবই একরকম হলে কি আর এত ছাবাছোবার দরকার হত? এই দ্যাখেন এরে কচ্ছে ওয়ালনাট। বড়ো বড়ো হৌসে এই রং লাগায়। আই. সি. আই, আই. টি. সি., টাটা স্টিল...। ওয়ালনাটেরই কি আর একরকম? তিন-চার রকম আছে খুকি। আপনারা হয়তো দেখে কইবেন মেহগনি। যে জন জানে সে জন বুঝবে।

খুকি একটা কাঠের টুকরো তুলে নিল, বলল, 'বাঃ, খুব সুন্দর তো ধরিয়েছেন রংটা।'

ধরাব না? আপনার মা-বাবা এসে স্যাংশন দিবেন তবে না? কাঠের পিসে সবরকমের ধরতাই দিয়ে রাখছি।

এতে কী দিয়েছেন?

কিচ্ছু না, কুসমি গালার রসের সঙ্গে এই অ্যাট্টুকুনি বেগনি রং।

তাতেই এই টিন্টটা এসে গেল?

তাতেই। তারপর আছে ঘষামাজা। আপনার মাথা ঘষেন না? একবার দুবার। তারপর মুখে কিরিম দাও, মোছো, আবার মাখো, আবার মোছো...এই সুন্দরীদেরও তেমনি। মাখবেন, তুলবনে, মাখবেন, তুলবেন। তবে না গ্লেজ আসবে। মুণ্ডু ঘুরবে দেখনদারের। এই তো সাইডটায় হাত দিয়ে দ্যাখেন।

সত্যি তো! কী স্মুথ করে ফেলেছেন।

আরও করব খুকিসাহেব। তারপর ফেরেঞ্চ চক মাখাব। পাউডার মাখবেন সোহাগি আমার।

তেমন তেমন লাগসই উপমাগুলো ওয়াজির মোল্লা খুকির সামনে বলা উচিত মনে করে না। 'যত্ত চিক্কনচাকন হবে দেহখানি বিবির পালিশ তো তত্ত খুলবে! না কী?'

তা এইটুকু শুনেই খুকির মুখ সামান্য লাল হয়। সে বলে ওঠে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার চা-টা হল কি না দেখে আসি।'

বড়ো গেলাসের চায়ে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে তৃপ্তি করে খায় ওয়াজির মোল্লা।

এ মা, বর্ডারগুলোতে কালো দিলেন কেন?

উ হুঁ হুঁ। কালো নয়। কালো বলেন না। ও হল ডার্ক মেহগানি। যত শুকোবে তত খোলতাই হবে। হাসতে থাকবে। এই যে ভেতরে? সব ওয়ালনাট ফিনিশ দিইছি। দেখে ন্যান, ধারে ধারে একটু অন্যতম রং চাই, বুজলেন? অন্যতম কিছু। আবার ধরেন আপনাদের শয়নের ঘরে একরকম, তো বসার ঘরে বিকল্প চাই। সবখানেই ওয়ালনাট মেহগনি হলে হবে না। রোজউড দেব ক্যাবিনেটটাতে, দেখবেন চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে থাকতে চাইবে। একেবারে বিকল্প।

খুকি অনেকক্ষণ ধরেই হাসছিল,বলল, 'আপনি লেখাপড়া জানেন, না?'

কই আর জানলুম খুকি।

খুকির বাবা এসে ডাকেন, 'মিস্ত্রি।'

জি।

নতুন রং করা চেয়ারে বসলাম, গ্লেজ তো উঠে গেল।

তা তো যাবেই সাহেব।

সে কী! তাহলে এত কষ্ট করে খরচা করে পালিশ করার মানে কী!

আহা এখনও তো ফিনিশ হয়নি। শেষ অস্তে ল্যাকার পালিশ চড়াব। চক্ষে ধাঁধা লেগে যাবে।

গ্লেজ?

উঠবে না সাহেব। দশটি বচ্ছর চোখ বুজে থাকতে পারবেন।

'পারলেই ভালো।' সাহেব গটমট করে চলে যান।

'হ্যাঁ কী যেন বলছিলেন!' খুকি সুযোগ পেয়ে কাছিয়ে আসে।

কী আবার!

ওই যে অন্যতম, বিকল্প ...ভালো ভালো কথা বাংলা রচনা বই থেকে?

ওই সেই কথা? এই যেমন ধরুন, খুকিসাহেব আপনারা আজকালের মেয়েরা সব ম্যাচিং দ্যান না? ফলসা রঙের শাড়ি, তো সেই রঙের সায়া, সেই রঙের জামা! মনে কিছু করবেন না, সরবো চেহারা লেপেপুঁছে খেঁদিবুঁচি লাগে।

খুকি আর হাসি সামলাতে পারে না।

আপনি হাসছেন? আমি যখন একেকটি ফার্নিচার সাজাই, তাকে জামা পরাই, সায়া পরাই, কাপড় পরাই, তকন আমার ওই লেপাপোঁছা মনে ধরে না। একটা কিছু অন্যতম খুঁজি। কেমন জানেন? লাহা বাড়িতে কাজ করতে গেছলুম। সে কি আজকার কথা! সে এক অন্যতম কাল! তা সে বাড়ির মেয়েরা সব ছবি রূপসি। আশি নম্বর একশো নম্বর কাগজ দিয়ে ঘযে ঘযে ঘযে তবে তেমনতরো তেলা চামড়া হয় খুকি, তারপর খালি সবেদা দিয়ে সাদা গালার পোঁচ, সর-হলুদ বাটা আর কমলালেবুর খোসা,—গ্লেজ কী! চোখ পিছলে যায়।

'পিছলে যায়? আটকে থাকে না?' খুকি হাসি চেপে দুষ্টু প্রশ্ন করে।

উঁহু, রজন পাইল দিলে চিটে হবে, ওইখানেই তো পালিশের সরবো কারিগরি।

আহা পালিশ নয়, ওই লাহা বাড়ির সুন্দরীদের কথা কী যেন বলছিলেন?

ও হ্যাঁ, তা ওনারা পরতেন ধবধবে সাদা খোলের কাপড়। তাতে ভোমরাকালো, কিংবা খুনখারাবি লাল রঙের পাড়। জামা পরতেন ছিটের। লালের মধ্যে হলুদ কালো সবুজ চিকিমিকি। আর সায়াটি থাকত ধোয়া গোলাপি।

এ মা! কী বিচ্ছিরি!

হাঁ হাঁ করে ওঠে ওয়াজির মোল্লা। 'না না। একেবারে বিকল্প। ওই যে সবটি লেপাপোঁছা, হল না, অন্যতম রঙের খোয়াব রইল, তাতেই রূপগুলি বিকল্প হয়ে উঠত। এই যে বর্ডার দিচ্ছি, একটা জমিনকে আলে আলে বেঁধে দিচ্ছি, এতে করে আপনার আপন হয়ে যাবে দ্রব্যটি। উদোম মাঠ নয়, যেটা বারোয়ারি। একটা ধরুন শস্যক্ষেত্র। কেমন? নয় কি?'

খুকি এখন আর হাসছে না। অভিনিবেশ সহকারে শুনছে। একটু পরে সে উঠে গেল।

বাড়িটি চমৎকার সেজে উঠেছে। ওয়াজির মোল্লাসাহেব দেখছেন। ঘরের মধ্যে যেন চাঁদনি। এমনধারা চাঁদনিতে মানুষের প্রকৃত মুখটি এই ধরা পড়ে, তো এই পড়ে না। একঘর আলো, তা বুঝি তার কতকগুলান উঁচার দিকে মুখ। মানুষগুলিকে মনে হয় খোয়াবে দেখা ছবি পরি জিন জাদুকর। হ্যাঁ জাদুকরও আছে। মোল্লাসাহেব বড়ো আয়নায় দেখছেন, তিনি নিজেই যেন জাদুর মানুষ। ভুষো কালি আর শ্বেত গালাতে মিলেমিশে ছোটো দাড়ি। হাতের কালচে চাম ইস্প্রিটের অ্যাকশনে উঠে উঠে যাচ্ছে, কাজের লুঙ্গি আর গেঞ্জিটি আলাদা করে রাখলেও ছাপছোপ পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। পেন্টুলে একটু আধটু নানা রঙের পোঁচ লেগেছে। হলঘরটি যেন সিনেমা হল। তার মধ্যে ফার্নিচারে আলো ঠিকরোয়, ভালো গোমেদ পাথরের কাটিং যেন।

দুটো হাঁড়ি ওপর ওপর বসানো। ফরসা পুরোনো কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছেন কর্ত্রী।

মিস্ত্রিসাহেব, ছেলেমেয়ে বিবিদের দেবেন গিয়ে।

'কী আছে মা এতে?' ... দাত্রী রমণীকে আজ মা ডাকতে ইচ্ছে যায়।

লেডিকেনি আছে। আর রসগোল্লা...ভালোবাসেন তো?

হ্যাঁ মা...চমৎকার ভালোবাসি সব।

সন্ধে হয়ে গেল আজ শেষ দিনে আপনার...আর এই শাড়িখানা...পছন্দ হয়?

'আপনার পছন্দ হয়েছে মা'—ওয়াজির চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, দেখান।

খু-ব। আবার দরকার পড়লে ডাকব আপনাকে।

খোদা করুন, ডাকবার দরকার না হয় মালিক। বিশ বচ্ছরের কাম ফতে করে গেছি। রাখতে যদি পারেন। পানি আর রোদ্দুর এই দুই হল পালিশের দুশমন। পাতলা কাপড় দিয়ে মোলায়েম করে মুছে দেবেন, বাস। আর পাড়া-পড়োশন, ভাই-বহেন এঁদের কাছে যদি সুপারিশ করেন তো...আজকাল তো পালিশ লোকে করায় না, সব তেল রং আর পেলাস্টিক রং, হাউহাউ চিৎকার করছে। পালিশের কদর ওই বনেদি বাবুরাই করেন। বিকল্প কিছু...।

শাড়িটা প্যাকেট থেকে খুলে বার করেন মোল্লাসাহেব। ছাপের কাপড়। নানান রঙের হোরিখেলা। বিবি পরবেন ভালো। মোল্লাসাহেবের তত মনোমতো হয় না। কিন্তু তিনি বলেন, 'সুন্দর, চমৎকার। হেসে উঠছে কাপড়, আপনার এই বাড়ির মতো। সালাম, সালাম। কাঁধে ঝোলাঝুলি নিয়ে নীচে নেমে যান মোল্লাসাহেব।'

'ও ওয়াজিদ আলি শা সাহেব...একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।' হাঁফাতে হাঁফাতে ছোট্ট জমি দিয়ে ছুটে আসে খুকিসাহেব।

ঘাসের জমিতে সবুজ টিলটিল করছে। বেগুনি আভা সাঁঝের গায়ে। মিহি কাঞ্চন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে খুকি। চওড়া জাম রঙের পাড়। ভেতরে জরির সুতো, কালো সুতো চমকাচ্ছে। আর জামাতে বেশ খলখলে হাসকুটে কালো, কালো না মেহগনি, বুঝি খুকিও ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। কোনো উৎসবে যাবে বোধহয়।

'অন্যতম' হয়েছে? ...

হাসি দাড়ি বেয়ে টাপুর টুপুর ঝরে।

হয়েছে, হয়েছে।

আর 'বিকল্প'?

চতুর্দিকে হাতড়ান মোল্লাসাহেব। 'বিকল্প'টি কি ঠিক হল? 'বিকল্প' বলে কি তিনি সবসময় এক কথাই বোঝাতে চান? 'বিকল্প' মানে এখন, এখানে 'অবিকল্প'। সেরকমটি? হয়েছে কি?

খুকি রিনরিন করে হাসে। বোঝার চোখে তাকায়।

বিকল্পটা ঠিক হল না, না শা সাহেব?

'হল না কি?'—হাঁ হাঁ করে ওঠেন ওয়াজির মোল্লা—'এখন এক্কেবারে বেগমসাহেবা। হানডেড পার্সেন।' দুজনেই ষড়যন্ত্রীর মতো হাসতে থাকেন। একটা যে রঙ্গ হয়ে গেল সেটা উভয়েই বুঝেছে। শিল্পীর চোখে বিকল্প অর্থাৎ অবিকল্প? তাও কি সম্ভব?

আচ্ছা চলি বেগমসাহেবা...

আবার আসবেন ওয়াজিদ আলি শা সাহেব...

ওয়াজির মোল্লা কিছু দূর চলে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ান।

'ওয়াজিদ নয় কিন্তুক। ওয়াজির...ওয়াজির মোল্লা। খিদিরপুরে বাস নয়, কাজকাম করি ওখানে, নাহারবাবুদের ফ্যাকটরিতে। সাকিন ন'পাড়া বাগনান, সাউথ ইস্টার্ন রেলোয়ে।'

নিজস্ব শিল্পভাবনার অবিকল্প নিশানখানা কাঁধের ওপর প্রশান্ত গর্বে তুলে ধরে নতুন পাড়ার দিকে রওয়ানা দেন ওয়াজির মোল্লা। কোনো ইতিহাস, পুরাণ কিংবদন্তির সঙ্গে অন্বিত হতে চান না। কিছুতেই।

পঁচিশ শো-র এঞ্জেল সিটিতে

এঞ্জেল সিটির ফর্টিসেভেনথ স্ট্রিটে অর্থাৎ শহরের প্রায় প্রাণকেন্দ্রে কালকন বা কালী কনশাসনেসের অফিস, কনফারেন্স হল, টেম্পল। সবই একটি বহুতলের পঁয়যট্টিতলায়। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় অফিসে বসে কার্যনির্বাহী সমিতির কয়েকজন সদস্যের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। এরা হল যুবশাখার কর্মী। বেশিরভাগ কাজকর্মই করে এরাই। যদিও গেরেম্ভারি ওপরওলারাও আছেন।

অনন্থই প্রথম তুলেছিল কথাটা। শুধু বলেছিল 'শেম'।

'কার কথা বলছ? কেন?' রুয়ু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল।

'ক্রিসকন যেভাবে জুলন সেলিব্রেট করল...'

'কেন, চমৎকার হল তো! গর্জাস! পাপেটস বলো ড্রেস বলো... ফ্যানটাসটিক!'

'রিং-এর মধ্যে পুরো শো-টা স্লো মোশনে ঘুরে যাওয়ার আইডিয়াটাও বেশ। আচ্ছা রিং-এর মাঝখানে ক্রিসমাস ট্রি-র মতো ওটা কী ছিল বলো তো?' —রিকি জিজ্ঞেস করল।

অনন্থ বলল, 'কদম গাছ। লর্ড কৃষ্ণার ফেভারিট ট্রি।'

আর্ভিন বলল, 'গর্জাস অ্যান্ড ডেলিশাস! চমৎকার ভেজ ফ্রসাড ছিল। ম্যাক ফার্সনস-এর সুপারফাস্ট ফুডগুলো খেয়ে খেয়ে আমার জিভ থেকে লিভার পর্যন্ত সব পচে গেছে। মার্ভেলস অ্যান্ড ডেলিশাস ওদের ওই ম্যালপুয়া। আ উইশ আ কুড হ্যাভ মোও। আমার মাম্মি বলছিল, মনে হচ্ছে গুড ওল্ড ক্যালকাটায় ফিরে গেছি।'

'শিট! তোর মাম্মির মাম্মি কখনও ক্যালকাটায় গেছে?' ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল লিজ।

'তোর মাম্মিজ মাম্মি গেছে নাকি?' আর্ভিনের গলায় যথেষ্ট রাগ।

'স্টপ ইট। আমাদের কারুরই বোধহয় চোদ্দপুরুষ ক্যালকাটায় যায়নি। তাতে কী? আর্ভিন ক্যালকাটা কালচার, ক্যালকাটা অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলছে। সত্যি, ক্রিসকন একটা কাজের মতো কাজ করছে। সারা বছর জুলন, ডোল, রথ ইয়াত্রা কতরকম সেলিব্রেট করে আমাদের ঢার্মা অ্যান্ড কালচার বাঁচিয়ে রেখেছে—' অনন্থ মহা খেদের সঙ্গে বলল।

'করেছে ভালো করেছে, তো আমরা কী করতে পারি?' লিজ এখনও গোঁয়ার। 'পাঁচ পাঁচ দিনের গর্জাস ফেস্ট করার স্কোপ আমাদের আছে—' অনন্থ দৃঢ় গলায় বলে, 'তোরা গডেস ডুর্গার নাম শুনেছিস?'

আর্ভিন বলল, 'ওহ শিওর। কিন্তু ডুর্গার সঙ্গে কালকন-এর সম্পর্ক কী?'

অনন্থ বলল, 'সম্পর্ক এই যে কালীও মাদার গডেস, ডুর্গাও তাই।'

'কিন্তু কালী জেট ব্ল্যাক...ডুর্গা....?'

'রেড বা ইয়োলো। সো হোয়াট? গডেস কালীর জিভ বেরিয়ে আছে টু ব্যালান্স দ্য ফোর্সেস অফ দা ইউনিভার্স। ডুর্গার? জিভ ভেতরে আছে। মে বি টু এক্সপ্রেস দা ইনার হার্মনি অফ দা ইউনিভার্স।'

'বাট হোয়াটস ইন আ জিভ? আফটার দুজনেই ওয়ারিয়র গডেস। দুজনকেই মা ডাকা হয়। দুজনেই শকটি। এখন আর কী কী মিল বা অমিল আছে দুজনের সেটা একটু উদ্যোগ নিলেই আমরা জানতে পারি। মনে রেখো ফাইভ ডে লং ফেস্টিভ্যাল, গর্জাস ইমার্শন অ্যান্ড ডেলিশাস ফ্রসাদ। নন ভেজ।'

অনন্থকে যুবশাখার সকলেই একটু বিশেষ খাতির করে। কারণ, প্রথমত অনন্থের প্রপিতামহই কালকন স্থাপন করে হিন্দু অ্যামেরিকানদের নতুন করে নিজেদের বহুমুখী ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ইউ.এস.এ.-র বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো শহরে কালকনের অফিস ও মন্দির আছে। প্রতিবছর সুবিধেমতো সময়ে ধুমধামসহকারে কালীপুজো হয়। মেডিটেশন, সেমিনার ইত্যাদিও বসে। নিয়মিত। দ্বিতীয়ত অনন্থের ভারতীয় নাম। অনন্থ গর্ব করে বলে থাকে আর সবাই ভুললেও তাদের ফ্যামিলি কখনও নিজেদের রুটস ভোলেনি। তাই তার নাম অনন্থ, ইনফিনিটি। নামটা প্রথমে সবাই অ্যানাস্থ উচ্চারণ করত। এখন অনেক ঘষে মেজে 'অ' উচ্চারণটা আনা গেছে। যেমন কালীকেও ক্যালী হওয়ার দুর্গতি থেকে রক্ষা করা গেছে।

একুশ শতকের গোড়ার দিকে চতুর্থ প্রজন্মের ভারতীয়রা টিউটনিক নাম নেওয়া পছন্দ করছিল। বিল বাসু, হার্বার্ট বিলিমোরিয়া, ডিক চ্যাটার্জি ইত্যাদি। কিন্তু তারপর থেকেই তারা এক ধরনের স্বরূপ-সংকটে ভুগতে থাকে এবং ক্রমশ নাম তথা সংস্কৃতিসচেতন হতে আরম্ভ করে। নবজাতকের নাম ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারেই হয়। এমনকি যে দম্পতিব একজন ভাবতীয় অপরজন ভিনদেশি তাঁরাও অনেকেই সন্তানের নাম ভারতীয় রাখতে আপত্তি করেননি। যেমন রূপা গলব্রেথ, শ্যামল ক্লিন্টন, সূর্য বুশ...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু লোকেব মুখে মুখে নামগুলো এত বিকৃত হয়ে যায় যে আর ভারতীয় বলে চেনার উপায় থাকে না।

যেমন অর্ভিন—অরভিন্দ—অরবিন্দ। লিজ—ল্যাজা-লজ্জা। রুা—রুক। রিকি—রিকট্যা—রিক্তা। লজ্জার লিজ আর এলিজাবেথের লিজে কোনো পার্থক্যই বোঝা যায় না। কিন্তু অনন্থ খুব সাবধানে নিজের নামের উচ্চারণের বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে।

দেখা গেল কালকনের ভারতীয়-আমেরিকান সভ্যদের চেয়ে ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান, জার্মান-অ্যামেরিকান, জাপানি-অ্যামেরিকান সভ্যদেরও দুর্গাপূজার ব্যাপারে উৎসাহ কিছু কম নয়। কালকনের সর্বপ্রথম অধিবেশনের আলোচনাচক্রে যেসব বক্তৃতা হয়েছিল সেগুলো ওরা রিপ্লে করে মন দিয়ে শুনল। ইশিকো সামুরি, আলিওশা সিং, জোহান উইটেনগেনস্টেন, স্তেফান আমুন্দসেন প্রভৃতি যুবশাখার সদস্যারা অনেকেই উপস্থিত ছিল। বরিস চাকিনস্কি নামে এক তুলনামূলক ধর্মের গবেষক বলেছেন : 'রিলিজনের প্রধান কাজ হল ভীত মানুষের মনের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগানো। কিন্তু এই পঁচিশ শো শতকের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুরুক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফেরা মানুষরা জানি নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তাবোধও কত ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। (প্রসঙ্গত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে চাকিনস্কি মহোদয় যা বুঝিয়েছিলেন তা কিন্তু সামরিক স্তরে লড়া হয়নি। হয়েছিল বাণিজ্যিক স্তরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি নিয়ে অনেক কচলাকচলির পর সুপার পাওয়ারদের তৈরি গাউম্স্ চুক্তি বা গ্লোব্যাল এগ্রিমেন্ট রিগার্ডিং আনকনডিশন্যাল মার্কেট-সারেন্ডার চুক্তির পর পৃথিবীর ধনীতম দেশগুলি পর্যায়ক্রমে তাদের সর্বগ্রাসী আমদানি-রফতানি নীতি দরিদ্রতর দেশগুলির ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ওই দেশগুলির অর্থনীতি একেবারে বেহাল হয়। ওইসব দেশের ধনকুবেররা অর্থাৎ ফিল্ম স্টার, রাজনৈতিক নেতা, বড়ো ব্যাবসাদার, বড়ো ঠগ ও মস্তানরা সব সুইজারল্যান্ডে ইমিগ্রেট করে যান। বাকিদের খবর বিজয়ী মিত্রপক্ষ আর জানে না, জানবার প্রয়োজনই বা কী?)। যাইহোক, এখন আমরা দেখছি রিলিজনের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

আছে। সেটা হল নানান পুরাণ, প্রতিমা, ভাবসম্পদ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের কল্পনা-দীন জাতি-মানসকে চাঙ্গা করা। এবং এদিক দিয়ে সমৃদ্ধতম রিলিজন হচ্ছে হিনডুইজম (এইখানে চচ্চড় চচ্চড় করে হাততালি)। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে হিনডুইজম আমাদের নিরাপত্তাবোধ তো দিচ্ছেই। নীতিবোধ ও কল্পনাশক্তিকেও সক্রিয় করছে। কালী হলেন হিনডুইজমের একজন কী গডেস। প্রতীকধর্মী। এই প্রতীকের একেক রকম ব্যাখ্যার ওপর একেকটা দর্শনতত্ত্ব দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়াও কালী হলেন সংবৎসবের দেবী। এঁর আবার মরশুমি রূপও অনেক আছে। যেমন চাণ্ডী, ডুর্গা ইত্যাদি।' এই পর্যন্ত শুনিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুল তুলে শততম প্রজন্মের লেজার ডিসক প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিল অনন্থ। বলল, 'শুনলে?' 'ও খে, বোঝা গেল। পেরিনিয়্যাল কালীর সীজন্যাল রূপ হচ্ছে ডুর্গা। ঠিক আছে ডুর্গাপূজার সম্পর্কে লেটেস্ট খবরাখবর নেওয়া যাক।'

ইস্ট কোস্ট কালচার্যাল নেট ওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা 'দুর্গাপূজা ইন দ্যা স্টেটস' ফাইলটা কালকনের কম্পিউটারে আনল। জানা গেল—দ্বাবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডনের ভারতীয় বিশেষত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে দুর্গাপূজা হয়েছে। তবে একেক জায়গায় একেক দিন। কেউ যদি সেভেনথ্ ডে বা সপ্তমী পালন করল তো কেউ করল এইটথ ডে অষ্টমী। তবে টেন্থ ডে-টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই দিনেই ইমার্শন আর তারপরে গেট-টুগেদার। ইমার্শনে অবশ্য একটা সমস্যা ছিল, কেন না বড়ো বড়ো জলাশয়ে বিসর্জনের সরকারি অনুমতি মিলত না। যাঁরা নিজেদের জমিতে পুকুর রাখতেন, তাঁরা বিসর্জনের জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে দিতেন। পরে পরিষ্কার করাবার খরচটা নিয়ে। কাপড়ের মূর্তি করাই সবচেয়ে সুবিধে ছিল। মূর্তি আঁকা কাপড়টি ভাঁজ করে তুলে ফেললেই হল।

এরপর প্রতিমার রূপ। লেটেস্ট দুর্গাপূজা, যা নিউজার্সিতে হয়েছিল তারই ছবি কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠল।

জোহান ভালো করে দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'আচ্ছা গডেস কি ওপর দিকে না নীচের দিকে?'

রিকির রাগ হয়ে গেল, বলল, 'তার মানে? নীচের দিকে তো একটা পশু!'

জোহান বলল, 'ভালো করে দেখো অর্ধেক পশু ঠিকই, কিন্তু অর্ধেক মানুষও। তোমাদের গনেশও তো এমনি, স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশন। গ্রিকদের প্যান যেমন।'

রু্য বলল, 'স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশন হলে তুমি। দেখতে পাচ্ছ না ওই হাফ হিউম্যান ইমেজটার একটা মস্ত বড়ো গোঁফ হয়েছে! আমাদের তো গডেস।'

রিকি বলল, 'শুনলেই তো, ইনি হচ্ছেন কিলার অব দা বাফেলো ডেমন। বাফেলোর ধড় থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এসেছে ওটাই ডেমন। ওর বুকে একটা লানস বিঁধে আছে। গডেস ওকে হত্যা করছেন।'

তখন ইশিকো বলল, 'দেখো রিকি, আরও একটা পশু কিন্তু রয়েছে। বাফেলো-ডেমনের থাইয়ের ওপর থাবা বসিয়েছে। ওটাই গডেস। পশু দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মাদারও পশু হয়েছেন। ওপরের দিকে ওসব ডেকোরেটিভ আর্ট।'

অনন্থ গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমরা কিছুই বোঝনি। ওটা হল লায়ন। গডেস ডুর্গার বাহন মানে মাউন্ট।'

'লায়ন? সে তো কোন্ কালে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম ওটা একটা ডবারম্যান পিনশার।'

অনন্থ যতই বলে, 'লায়ন এই সেদিন পর্যন্ত আফ্রিকার সংরক্ষিত অরণ্যে ছিল, এবং পৌরাণিক

কালে লায়ন ইন্ডিয়ায় মেষের মতো চরে বেড়াত,' তার কথা কেউ মানতে চায় না। শেষ পর্যন্ত গণভোটে ঠিক হল দুর্গার মাউন্ট হিসাবে একটি হিংস্র ডবারমান কুকুরকেই মডেল করা হবে।

কিন্তু মুশকিল হল আসল দেবীকে নিয়ে। কেউ এ মূর্তি মানতে চায় না, বলে, 'এ কী? আটটা পা-অলা এ কী স্পাইডার না ক্র্যাব না অক্টোপাস?'

অনন্থ প্রাণপণে ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'তোমরা গডেস কালীরও তো চারখানা হাত দেখেছ। এই গডেসের আট নয়, দশ হাত। পা লংড্রেসে ঢাকা বলে দেখা যাচ্ছে না। দশ হাতে দশ রকম অ্যান্টিক ওয়েপনস। শিল্পী একটু বাড়াবাড়ি করেছেন ঠিকই, হাতগুলোকে মুখের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, বডি বলতে কিছু রাখেননি। কিন্তু...'

কেউই মানতে চাইল না। রিকি, রুয়, আর্ভিন পর্যন্ত না।

সত্যিই, একটা ফ্রেমের আধখানা জুড়ে বাফেলো-ডেমন এবং লায়ন না ডবারমান। বাকি আধখানারও আধখানায় দেখা গেল কয়েক রকম পৌরাণিক পাখি—ময়ূর, পেঁচা এবং রাজহংস যারা অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। পরিষ্কার চেনা গেল একমাত্র র‍্যাট মহোদয়কে। ইনি এখনও আছেন বহাল তবিয়তে। মাঠে-ঘাটেও আছেন। ভাষাভঙ্গিতেও আছেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মীকেও ওরা খুঁজে বার করতে পেরেছিল। লক্ষ্মীকে তাঁর পিগি ব্যাংক দিয়ে আর সরস্বতীকে দ্য গ্রেট রবিশঙ্কর সিটার দিয়ে।

অবশেষে ঠিক হল দেবী যখন প্রতীকী, তখন বিমূর্তভাবেই তাঁকে কল্পনা করা হবে। ফ্রেমের তলার দিকে থাকবে মহিষ ও ডবারম্যান। দুদিকে যথাক্রমে ইঁদুর-পেঁচা ও ময়ূর-হংসরাজ। গ্রাফিকস টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখিগুলো স্কেচ করে নেওয়া হবে। ওপর দিকে দুর্গার প্রতীক হিসেবে থাকবে একটি লানস। লক্ষ্মীর প্রতীক পিগি ব্যাংক ও সরস্বতীর প্রতীক দা সিটার। স্থানীয় শিল্পী লিন চ্যাং হালদার এরকম একটি বিষয়বস্তু পেয়ে দারুণ উল্লসিত। মরা গাছের ডাল এবং গুঁড়ি, টয়লেট ব্রাশ, ফেলে দেওয়া রঙের টিউব, সিনথেটিক কেন, কাঠকাঠরা, রবার এবং এক ধরনের প্লাস্টার দিয়ে তিনি একটি নতুন ধরনের ভাস্কর্যের পরিকল্পনা করেছেন। বিমূর্ত হতে পারে, কিন্তু লুপ্ত প্রজাতির পশু, পাখি, পুরাণ, ইতিহাস, শিল্পবোধ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাস্কর্যটি দর্শকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন চিন্তা ও ঔৎসুক্য জাগাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জমজমাট ভাস্কর্যই হল। গোল ফ্রেমের মধ্যে পশু-পাখি-যন্ত্র-বাদ্য সব মিলিয়ে একটা ভয়-বিস্ময় জাগানো সংহতি। কেন কে জানে এই পুজো মাইক্রো পুজো বলে খুব খ্যাতি পেল। আকারে যথেষ্ট বড়ো, সেদিক থেকে মাইক্রো হতে পারে না। চিন্তার ওয়েভ-লেনথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো কম্পন জাগিয়ে দিয়েছে কি না তা-ও কেউ বলতে পারল না। কিন্তু সবাই বলতে লাগল মাইক্রো-পূজা, মাইক্রো-পূজা। যেন একটা হুজুগ।

খ্যাতি হল। কিন্তু মূল সভ্যদের মনে অশান্তি আর যেতে চায় না। ওল্ড এজ হোম থেকে অনন্থের ঠাকুর্দার বাবা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে সেলুলার ফোন মারফত বিপ বিপ করে তাঁর অসন্তোষ জানাচ্ছেন। অতিবৃদ্ধ মানুষটি কিছুই প্রায় করতে পারেন না। খালি মাথাটা এখনও মোটামুটি পরিষ্কার আছে। এইভাবেই তিনি তাঁর ঘনীভূত অসন্তোষ জানাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত নাইনথ ডে-তে ওরা ঠিক করল আসল ক্যালকাটার পুজো একবার ওরা দেখবে। অন্তত পক্ষে ইমার্শনটা যেন ঠিকঠাক হয়। এঞ্জেল স্যাট ফোর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওরা কলকাতা দেখবার চেষ্টা করল। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধ তমস। এ কি রে বাবা! খুব নাকি আলোর কারসাজি হয় ওখানে পুজোর সময়ে? সে সব কই? বারে বারে চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করে, বারে বারে শুধু ওই একই দৃশ্য ফিরে ফিরে আসে। নিস্তরঙ্গ ঘন কালো জল।

অবশেষে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওরা ইস্ট কোস্টের সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক খবরাখবর কেন্দ্রের প্রাচ্য-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সেখান থেকে যে সংবাদ কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠল তা হচ্ছে এই ; বিংশ শতকের শেষ দশক থেকে কলকাতা মেগাসিটির পতন খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। এক সময়ের প্রাসাদ-নগরী, মিছিল-নগরী, হুকার-নগরী ক্রমে প্রচণ্ড জনসংখ্যার ভারে বস্তি-নগরী হয়ে যায়। পথবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের মূত্র-পুরীষের দুর্গন্ধ প্রবাহের জন্য এ নগরী এক সময়ে প্রস্রাব-নগরী আখ্যাও পেয়েছিল। জঞ্জাল-নগরী নামকরণের কিছুকাল পরে আবর্জনার পাহাড় যখন প্রায় সমস্ত নগরীকে ঢেকে ফেলেছে তখন অতি ভয়ানক মহামারিতে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল সব মহাশ্মশানে পরিণত হয়। তারপর কালক্রমে তার ওপর ভেঙে পড়তে থাকে একটার পর একটা বহুতল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হয় জমিয়ে রাখা নানা ধরনের বোমার বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড চাপে কলকাতার আশেপাশে যত নদী ও জলাশয় ছিল তার জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে কলকাতা মেগাসিটিকে ঢেকে দেয়। এই জলও সাংঘাতিক কলুষিত। কলকাতার নাম এখন ক্যালহোল। কৃষ্ণ বিবর। ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ অংশই ক্রমশ এরকম কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হচ্ছে। এর ধারে কাছে গেলেও এই কালো গর্তের মারাত্মক বিষ যে-কোনো জীবিত প্রাণীকে মৃত্যু-আকর্ষণে টেনে নেবে। প্রকৃতপক্ষে, মুমূর্ষু কলকাতার অদম্য সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যই এই সময়ে নিউইয়র্কের নতুন নাম হয় নিউ ক্যালকাটা।

ওরা এতক্ষণে বুঝল শুধু দুর্গাপ্রতিমা নয়, গোটা ক্যালকাটারই বিসর্জন হয়ে গেছে বহু বহু কাল আগে। বিশেষজ্ঞরা ছাড়া বাকি পৃথিবীর, এমনকি এক সময়ের কলকাতাবাসীরাও আর তার খবর রাখেন না।

সেই লোকটা

লোকটাকে সে প্রথম খেয়াল করে হুগলির ডি. আই অফিসে। আগেও দেখেছে। কিন্তু সে ভাবে লক্ষ করেনি।

বাবা স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর হয়ে গেল। কিছুই হাতে পাননি। না পেনশন, না গ্র্যাচুয়িটি, না জি. পি. এফ। কোনোটার কাগজপত্র রেডি হয়নি, কোনটার ফাইল হারিয়ে গেছে। কোনোটা আবার ট্রেজারি রিলিজ করছে না। বাবা বললেন, 'দুটো বর্গের জ-ই আমার খয়ে গেল রে...জুতো আর জীবন। এবার তুই দ্যাখ যদি পারিস।'

তা সেই তার বাবার কর্মক্ষেত্রের গোলকধাঁধায় প্রথম প্রবেশ। পাঁচ বছর সময় যতটা কম মনে হয়, ততটা কম নয় দেখা গেল। কেননা বাবার কর্মক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাবার সময়ের হেডমাস্টারমশাই রিটায়ার করেছেন। সেই সময়কার ক্লার্ক মারা গেছেন। কাগজপত্র সাত বাঁও জলে। বর্তমান ক্লার্কের কাছে বর্তমান হেডমাস্টারমশাই যেদিন তাকে চতুর্থবার পাঠালেন সেদিন ক্লার্ক কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন। বললেন, 'পেন্ডিং কাজ যে করব ইনসেনটিভ কই?'

এখন, কাজ কখন পেন্ডিং-হয়? যখন তোমরা তাকে পেন্ডিং রাখো, তাই না? তো তার আবার ইনসেনটিভ কী?—সে এইভাবে ভাবল। কিন্তু সে একটু ভীতু প্রকৃতির। উপরন্তু খুব বুঝদার। সবসময়ে অন্যের কথা ভেবে কাজ করার অভ্যাস। তাই সে দ্বিতীয় চিন্তা করল—সত্যিই। এঁদেরও তো বাঁধা সময় আছে। তার বাইরে কাজ করতে গেলে সেটা অন্যত্র হলে ওভারটাইম হত। আগের ক্লার্ক যে কাজ ফেলে রেখে বে-আক্কেলের মতো মারা গেলেন, তার জন্যে বেশি সময় খরচ করার কী দায় এঁর পড়েছে। হলই বা এটা সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের গ্রাসাচ্ছাদনের মরণবাঁচনের ব্যাপার।

স্কুল লাভক্ষতির কারবার করে না, সে ইনসেনটিভ দেবে কোত্থেকে? পঞ্চম দিনে সুতরাং সে এক বাক্স নলেন গুড়ের ভালো সন্দেশ নিয়ে গেল। ইনসেনটিভ নয় এটা। কিন্তু তার আগাম খুশি আগাম কৃতজ্ঞতা সত্যিই ভারি কৃতজ্ঞ হয়ে জানিয়ে রাখছে সে—পেনশনেচ্ছু পিতার কৃতজ্ঞ ছেলে।

কাগজপত্র নড়েছে সংবাদ পেয়ে সে যখন বিজয়গর্বে বেরিয়ে আসছে তখন বাবার স্কুলের দরজার পাশ দিয়ে কালোমতো কে একটা যেন সরে গেল। গেল তো গেল, সে খেয়াল করেনি।

তারপর সে জানল তাকে ডি. আই অফিসে ধরনা দিতে হবে। কেননা সতেরো বছর আগের প্রাপ্য একটা ইনক্রিমেন্ট নাকি যোগ করা হয়নি, ভুলভাল হয়ে গেছে।

ডি. আই অফিসের রংচটা বাড়িটাকে মাঠের মাঝখানে হেঁপো রুগির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তার মনটা দমে গিয়েছিল। করিডর দিয়ে যেতে যেতে সে দু পাশের ঘরে ফাইলের পাহাড় এবং ধুলো লক্ষ করে। এবং সেই লোকটাকে করিডরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কাজটা তার দু তিনবার হাঁটাহাঁটি করার পর হয়ে যায়। অবশ্য 'ইনসেনটিভ' লাগে।

এইভাবে অবশেষে সে বাবার পেনশন উদ্ধার করে যেদিন বাড়ি ফিরছে, তার মনে হল কে

যেন তাকে অনুসরণ করছে। পকেটে পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সার খুচরো এবং একঠোঙা কাবুলিমটর— সে খুব ভালোবাসে, পায়ে শুকতলা খয়ে যাওয়া ঝ্যালঝেলে হাওয়াই চটি, দু দিনের বাসি দাড়ি গালে এবং ছোটোভাইয়ের চেকশার্ট আর নিজের ব্লু জিনস তার পরনে, তার ভয় করার কিছু ছিল না, তবু সে নির্জন গলিগুলো এড়িয়ে যায়। একটা রাস্তা বাঁক ফেরবার মুখে কায়দা করে সে পেছনের লোকটাকে দেখেও নেয়। ওহ্। তেমন কেউ না। সে আশঙ্কা করেছিল শার্টের কলার-তোলা, চোয়াড়ে-মুখে ব্রণ, মিঠুন-ছাঁটের চুলওয়ালা সাইকেলের চেন হাতে, ভোজালি-পকেটে কোনো মস্তানকে দেখবে। সেসব নয়। সেই লোকটা যে ডি. আই অফিসের করিডরের এক কোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, এবং যে খুব সম্ভব বাবার স্কুলের দরজার পাশ দিয়েও সড়াৎ করে সরে গিয়েছিল।

এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, একটা নতুন শোনা জীবনমুখী গান ভাঁজতে ভাঁজতে বাকি পথটা দিব্যি হেঁটে মেরে দেয়, হাওয়াই চপ্পলটা মাঝরাস্তায় জবাব দিলেও সে কিছু মনে করে না।

লোকটাকে সে দ্বিতীয়-তৃতীয়বার দেখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে। তার মায়ের যেবার অ্যাকসিডেন্ট হল সেই বার। তাদের আসলে একটা বাড়ি আছে। দেড়কাঠা জমিতে ঠাকুর্দা একতলা করেছিলেন। বাবা উদয়াস্ত কোচিং করে করে সারাজীবন ধরে দোতলাটা তোলেন, কিন্তু ছাদের পাঁচিলটা আর শেষ করতে পারেননি। তিন ইঞ্চি ইঁটের যে নীচু গাঁথনিটা পাঁচিলের জায়গায় ছিল, পলেস্তারা পড়েনি বলেও বটে, সিমেন্টে মাটি মেশানো ছিল বলেও বটে, সে গাঁথনিটা কমজোরি হয়ে গিয়েছিল, ভেতরে ভেতরে আলগা হয়ে গিয়েছিল। যেমন হয় আর কি। হবি তো হ, তার মা আলসে থেকে তার একটা উড়ে-পড়ে-যাওয়া গোলাপি ব্লাউজ ঝুঁকে তুলতে যান। তার মতো অতবড়ো বেকার ছেলের মায়ের গোলাপি ব্লাউজের ওপর ঝোঁকের বে-আক্কেলেমিতেই হোক আর যা-ই হোক, পাঁচিলটি ধসে যায়, ফলে মা পড়ে যান, যে ঘটনাটুকু নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলা যায়, 'একটি গোলাপি ব্লাউজের জন্যে' নাম দিয়ে।

মাকে সে হাসপাতালে ভরতি করতে পারছিল না। ডাক্তারবাবুরা, বেশ ইয়ং ছেলে সব, এই বয়সেই এত অ্যাকসিডেন্ট আর মৃত্যু দেখেছেন যে কারও রক্তাক্ত থেঁতলানো দেহ নিয়ে তাঁরা খুব ব্যস্ত না হয়ে প্রচুর কাজের ফাঁকে একটু মৃদু ফষ্টিনষ্টি করে নিচ্ছিলেন, এবং যে নার্সটির সঙ্গে করছিলেন না তার মেজাজ খাট্টা হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে সেই লোকটাকে নজর করে সে। একদম অপরিচিত প্রাণীদের চিড়িয়াখানায় একটিমাত্র চেনা মুখ দেখে সে হয়তো অসহায় চোখে তাকিয়েছিল, লোকটি এগিয়ে আসে। হাত পাতে, সে তার কাছে যা ছিল দিয়ে দেয় এবং তার মা ভরতি হয়ে যান।

তবে তারপরে হয় আর এক ফ্যাচাং। দেখা যায় কম্মো কাবার। মা এতটা ধৈর্য ধরেননি, বিরক্ত হয়েই হয়তো বালতিতে লাথি মেরেছেন। ডাক্তারবাবুরা ভীষণ নিয়ম মানেন, তাঁরা জানেন একটা লাশকে এনে যদি কেউ চিকিৎসার দাবি করে, সেই দাবিকে সন্দেহের চোখে দেখা ডাক্তারবাবুদের কর্তব্য। আগে লাশ বানিয়ে তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি না এ সন্দেহ নিরসন করতে ময়নাতদন্ত করতে হবে।

মা আর মা রইলেন না, ঝামেলায়-ফাঁসানো এক লাশ হয়ে গেলেন, তো সেই লাশ ছাড়াতে যখন সে ডোমেদের সঙ্গে দরাদরি করতে থাকে, সে এসব জানে না বলে বন্ধুজনদের তার বোকামিতে মজা পাওয়া হাসি শুনতে শুনতে, তখন সেই লোকটাকে তৃতীয়-চতুর্থবার সে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে মুশকিল আসান হয়ে যাবে। ঠিক তাই। চারশো থেকে দুশোয় নেমে যায় ডোম। তার মড়াখেকো চেহারা দেখেই হয়তো এবং সেই দুশো টাকা বন্ধুবান্ধবের পকেট থেকে

আপাতত উধার পাওয়া যায়।

এখন এই লোকটিকে যদি সে দেবদূত বলে মনের মধ্যে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? যাদের বাবারা এই রকম পেনশন পান না, ঠাকুরদারা বাড়ি শেষ করে যেতে পারেন না, মায়েরা গোলাপি ব্লাউজ তুলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা যান এবং মর্গে চালান হয়ে যান তাদের জীবনে একটা দেবদূতের কি দরকার হয় না? একটা দেবদূত কত কাজে লাগে বলুন তো? সাহস দিতে, মুশকিল আসান করতে, ভরসা জাগাতে জীবনটা সবটাই বরবাদ নয়—তার ভেতর কিছু একটা নেই-নেই করেও আছে এই বোধ উসকে দিতে একটা দেবদূত বড্ড কাজে লাগে। তারও লেগেছিল।

কিন্তু মানুষের ধর্মবিশ্বাস বড্ডই প্রয়োজননির্ভর। তাই এত কাণ্ডের পরেও সে দেবদূতকে ভুলে যায়। দেবদূতের প্রয়োজনটা পর্যন্ত ভুলে যায়। কেন না তার ভাববার সময় ছিল না। মা মারা যাওয়ার ফলে সে রান্না করতে এবং তার ছোটো ভাই কাপড় কাচতে বাধ্য হওয়ায়, বাবা শোকগ্রস্ত জরাগ্রস্ত ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ায়, জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির বনিবনা না হওয়ায়, একটি মেয়ে সুদ্ধু দিদি এসে পড়ায়, দিদির খোরপোশের জন্য মামলা করতে টিউশানির সব টাকাগুলি উকিলকে গাঁটগচ্চা দিতে হওয়ায়, একটি রামবোকা ছাত্রী তার প্রেমে পড়ার কারণে ছাত্রীর দাদার ভাড়া করা গুন্ডাদের হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ায় সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাবার অবসর পায়নি। কোনো কল্পনা, কোনও স্বপ্ন, আশা-নিরাশার দোদুলদোলা এসব তার অভিধান থেকে বেমালুম লোপাট হয়ে যায়।

সে অথই নদীর জলে পড়ে গেছে। সাঁতারের স জানে না, কিন্তু তাকে বাঁচতেই হবে সুতরাং সে যেমন পারে হাত পা ছোড়ে, ছুড়তে ছুড়তে ভেসে থাকতে শিখে যায়, শুধু ভেসে থাকা নদীতে জোয়ার আসলে সে একদিকে হড়কে যায়, আবার ভাটার সময়ে আরেক দিকে হড়কে যায়, এই সময়ে আবার ভরা কোটালে বান আসে। তিনতলা সমান উঁচু জলস্তম্ভ তাকে তুঙ্গে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয়, তারপরে সে অদূরে ঘূর্ণিপাক দেখে, প্রাণপণে বিপরীত দিকে টানতে থাকে নিজেকে। কাজেই তার দেখা হয় না কোথাও কোনো কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি নেই।

তবে এইভাবে আনাড়ি সাঁতার দিতে দিতে সে একটা কুটো পেয়ে যায়। কুটো নয়, কেরোসিন কাঠের টুকরো, কেরোসিন কাঠের টুকরো নয়, ভাঙা নৌকো, আগে থাকতে জেনে শুনেও সে সেই ভাঙা নৌকোয়ই চড়ে, সেটি একটি বোবা মেয়ে যার বুদ্ধি আছে এবং টাকাও কিছু আছে।

এইবারে সে সাবধানে, খুব যত্নে কিছু বিকিকিনি শুরু করে। সস্তায় কেনে, একটু বেশি দামে বেচে। ঘুরে ঘুরে প্রাণপাত করে, কোথায় কোন্ জিনিস একটু সস্তায় মেলে, কোথায় কোন্ জিনিসের অগাধ চাহিদা, খোঁজখবর করে সেই খোঁজখবরকে কাজে লাগায়। এদিকে জামাইবাবুর কাছ থেকে দিদি ও তার মেয়ের জন্যে একটা চলনসই খোরপোশ মেলে, বাবা শয্যায় মারা গিয়ে তাকে মুক্তি দেন, ছোটো ভাই এক ইয়ুথ কয়্যার-এ ভিড়ে গিয়ে এখানে ওখানে কল শোতে মেতে থাকে এবং খুব একটা রোজগারপাতি না হলেও ভারি খুশি মেজাজে থাকে। সে বাড়িটা সারায়, বাড়ির পাঁচিল তোলে, স্নো-সেমের রং লাগায় বাড়িতে, তার পরে বিয়ের পাঁচ বছর পরে হনিমুনে যায়। বেশি দূরে কোথাও নয়। দিঘায়।

সমুদ্র দেখবি তা গোয়ায় যা। সুন্দরী সুন্দরী সি বিচ। মিরামার, কলাংগুট, কোলবা সব একেক জন একেক রকম সেজে বসে আছে। ঘুরে আয় মুম্বই, সমুদ্রটা তেমন কিছু না হলেও, লঞ্চে চেপে এলিফ্যান্টাটা সেরে আসা যায়। কিংবা চলে যা কন্যাকুমারিকায়। তিন দিক থেকে কেমন তিন রঙের সমুদ্র মিশেছে দেখতে পাবি, দেখতে পাবি ওই সিন্ধুর টিপ বিবেকানন্দ দ্বীপ, দেখবি কুমারী দেবী কেমন অনন্ত প্রতীক্ষায় থমকে রয়েছেন। যেতে পারা যায় চেন্নাইয়ের দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভে,

পন্ডিচেরির সবুজ সমুদ্রে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমটাও দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা অতদূর না-ই হল, গোপালপুর? চাঁদিপুর নিদেনপক্ষে পুরী? পুরীতে তো তামাম বাঙালিস্তানের লোক হনিমুন করতে যাচ্ছে। তা না দিঘা!

তা তা-ই সই। পুকুরের মতো নিথর টাইপের সেই সমুদ্দুরে লম্বা ফেনার গুড়িমারা বেঁটে ব্রেকার দেখেই তার বোবা স্ত্রী আনন্দে নাচতে থাকে। তার চোখ ভরে যায়। মন ভরে যায়। গলার কাছে একটা ব্যথা ডেলা পাকায়। আহা, বাবা দেখতে পেল না, মা-টা গোলাপি ব্লাউজ তুলতে গিয়ে খামোখা মারা গেল! আহা দিদিটা? দিদিটার মধুযামিনীর সুখ হল না জীবনে। দিদির মেয়েটার হবে তো? হবে হবে নিশ্চয়ই হবে। সে তো চেষ্টা করছে প্রাণপণে। বোবা বউ তার বড়ো লক্ষ্মী! এই শান্ত দিঘার মধুযামিনীকেই সে আনজুনার জৌলুসের জোয়ার দেবে।

গা ভরতি শান্তি মেখে সে ফিরে আসে। দিদি দরজা খুলে দেয়, ভাই হাত থেকে সুটকেস নেয়, হাঁড়ি ভরতি মিষ্টি সে দিদির মেয়ের পিতৃহীন হাতদুটিতে তুলে দিতে পেরে বড্ড আরাম অনুভব করে। দিদি বলে, 'তোর সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আর এক দিনও ঘুরে গেছেন। বোধহয় খুব দরকার...।'

তার তথাকথিত বৈঠকখানায় ঢোকে সে। বাবার পুরোনো তক্তপোশের পাশে তার নতুন কেনা সোফায় বসে আছে—সেই লোকটা। এতদিনে সে লক্ষ করে লোকটা ঠিক কালো নয়, কেমন কালিময়, ঠিক মোটা নয় কেমন ফোলা ফোলা, জুলফি বেয়ে কাঁচা কলপ ঘামে গলে নেমে এসেছে। সিনথেটিকের জামায় আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা নাক কুঁচকে ছোটো হয়ে আছে, তবু সে টের পাচ্ছে না। লোকটা বলল, 'আমি বুঝলেন, আয়কর অফিসে আছি। আপনার যা কাগজপত্র দেখলুম ওরা ইচ্ছে করলেই কেসে ফাঁসাতে পারে। না, না তেমন কিছু না। আমি তো রয়েছি। বিজনেস ব্যাপারটা আসলে...না না সেসব কিছু নয়...' বলতে বলতে তার বাঁ পকেটের পাশ থেকে লোকটা ছোট্ট করে হাত বাড়াল।

এখন সে কী করবে? কী করতে পারে সে? খুব বেশি ভাববার সময় নেই। প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে। তিনটে বিকল্প আছে মোট। এক লোকটাকে খুন করা। সে ক্ষেত্রে তার ফ্যামিলি ভেসে যাবে ; দুই নিজেকে খুন করা, সে ক্ষেত্রেও তার ফ্যামিলি ভেসে যাবে। সে অতএব তৃতীয় বিকল্পটা নিল।

হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে সে
লোকটার ভেতর
ঢুকে গেল।

একটা ছোটো মেয়ে

লোকে বলে আমি একটা ছোটো মেয়ে। 'এ তো বাচ্চা!' এইভাবে বলে, কিন্তু আমি জানি আমি মোটেই বাচ্চা-টাচ্চা নই। বারো ক্লাসে উঠলুম। সতেরো বছর বয়স হল—আবার বাচ্চা কী? আসলে আমি বেঁটে, চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি মোটে হাইট। মোটাসোটা নই। তাই আমাকে ছোটো লাগে। আমার বন্ধু দেবলীনার মা বলছিলেন, 'হঠাৎ দেখলে তোকে লীনাদের থেকে অনেক ছোটো দেখায়, কিন্তু মুখটা ভালো করে দেখলেই যে কেউ বুঝবে।'

দেবলীনা মজা পাওয়া হাসি হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তবে কি ঋতুর মুখটা পাকা-পাকা, মা?'

'না, পাকা নয়',—ঢোক গিললেন দেবলীনার মা—'মানে ওই ম্যাচিয়োর আর কী!'

সেই মুখই এখন দেখছি আমি। গালগুলো ফুলো ফুলো। চোখ দুটো গোল মতো। পাতা নেই। নেই মানে কম। ভুরু খুব পাতলা, ঠোঁটের ওপর দিকটা সামান্য উঁচু। হেসে দেখলুম দাঁতগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে, কিন্তু বাঁ দিকের ক্যানাইনটা উঁচু। একটু বড়ো বড়োও দাঁতগুলো। আমার চিবুকে একটা টোল আছে। আমার আর এক বন্ধু রুবিনা বলে, 'তোর এই টোলটাই তোকে বাঁচাবে ঋতু।'

কেন একথা রুবিনা বলল, তার মানে কী, বুঝতে হলে আমার বন্ধুদের কোনো কোনো আলোচনার মধ্যে ঢুকতে হবে।

ভুরু প্লাক করা নিয়ে কথা হচ্ছিল একদিন। দেবলীনার ভুরু খুব সরু, বাঁকানো। বৈশালী বলল, 'এরকম ভুরু আজকাল আউট অব ফ্যাশন।'

রুবিনা বলল, 'না থাকলে করবেটা কী? যা আছে তার মধ্যেই তো শেপ আনতে হবে। এই যেমন ঋতু। ভুরু বলে জিনিসই নেই, তার প্লাক।'

অমনি আলোচনাটা দেবলীনার থেকে আমার দিকে ঘুরে গেল। যেটাকে আমি ভয় করি। এবারে ওরা আমাকে নিয়ে পড়বে।

'ঋতুর অ্যাট লিস্ট ব্রণর সমস্যা নেই।' বৈশালী বলল।

'হ্যাঁ, কালো হলেও ওর স্কিনটা খারাপ না'—রুবিনা বলল।

'এই ঋতু, স্কিনের জন্যে কী করিস রে?'

আমি ক্ষীণ গলায় বললুম, 'তুই কী করিস?'

'আমি? আমার তো হাজার গন্ডা ব্রণ, কোনো ক্রিম মাখার জো নেই। রেগুলার মুগুর ডাল বাটা আর চন্দন মাখতে হয়। বৈশালী কী করিস রে?'

'আমার আবার মিস্কড স্কিন, জানিস তো। নাক চকচক করবে, কপাল চকচক করবে, আর গাল দুটো শুকিয়ে বাসি পাউরুটি হয়ে থাকবে। আমার অনেক জ্বালা। কোথাও ভাপ লাগে, কোথাও বরফ। কোথাও মধু, কোথাও চন্দন। সে অনেক ব্যাপার, মা জানে।'

'তুই একটা মিস সামথিং না হয়েই যাস না।' দেবলীনা খ্যাপাল।

'তবু মন খুলে মিস ইউনিভার্সটা বলতে পারলি না তো?' বৈশালী চোখ ছোট্ট করে হাসছে। 'মিস ইউনিভার্স হোস না হোস মিস সেন্ট অ্যানথনিজ তো তুই হয়েই আছিস।'

আমি বৈশালীর দিকে তাকালুম। শীতকালে ওর গাল দুটো একটু ফাটে। লালচে ছোপ পড়ে। এমনিতেই একটু লালচে ফরসা রং ওর। মুখটা এত মিষ্টি যে চোখ ফেরানো যায় না। লম্বা, দোহারা, ফুলহাতা লাল সোয়েটার আমাদের স্কুলের ইউনিফর্ম, পরেছে ব্লু স্কার্টের ওপর। ওকে দেখাচ্ছে যেন স্নোহোয়াইটের গল্প থেকে নেমে এসেছে। এখনও মিস সেন্ট অ্যানথনিজ আখ্যা ও পায়নি, কিন্তু টিচাররা ওকে আড়ালে 'ব্লাডি মেরি' বলে ডাকেন। ইতিহাসের ওই কুখ্যাত রানির নামে ওকে ডাকা হয় কেন আমরা ভেবে পেতুম না। দেবলীনাই জ্ঞান দিল। ওটা একটা ককটেলের নাম। ভোদকার সঙ্গে টম্যাটো রস পাঞ্চ করে নাকি ব্লাডি মেরি হয়। দারুণ খেতে।

রুবিনা বলল, 'ঘাবড়া মৎ ঋতু, তোর চিন-এর টোলটাই তোকে বাঁচাবে, মানে কাউকে ডোবাবে। ইটস ভেরি সেক্সি।'

আমি এখন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখছি। মস্ত বড়ো আয়না। মাঝখানে একটা, দু-পাশে দুটো। তিনটে ছায়া পড়েছে আমার। ভুরু নেই, গোল গোল চোখ, দাঁত উঁচু, বেবি ফেস, বেঁটে, কালো, সোজা সোজা চুল ; সুদ্ধ-মাত্র চিবুকের টোল সম্বল। একটা গরম তরল কিছু উঠে আসে ভেতর থেকে। আমি শৌনককে চাই। কবে থেকে চাই। প্রেপ থেকে পড়ছি ওর সঙ্গে। ও আমার খাতা নিয়েছে, আমি ওর খাতা নিয়েছি। এক সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি, ওর বাড়ি আমার একটু আগে। একটা বড়ো বড়ো ছায়াঘেরা গলিতে ওকে বেঁকে যেতে হয়। ওর ওপর যেন আমার একটা জন্মগত অধিকার জন্মে গেছে। কিন্তু ও সেটা বুঝলে তো? ও আমাদের স্কুলের সেরা অ্যাথলিট। ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন। মিক্সড ডাবলসে ব্যাডমিন্টনে ওর পার্টনার দেবলীনা। শৌনকের চোখ কিন্তু সবসময়ে বৈশালীকে খোঁজে। এসব আমি বুঝতে পারি। খেলাধুলোয় আমি নেই। একটুআধটু টেবিল টেনিস খেলার চেষ্টা করি। ছোটো থেকে নাচ শিখছি, ফুট-ওয়ার্ক ভালো হওয়া উচিত, কিন্তু রুবিনা আমার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক চৌখশ। নাচ শিখছি বলে যে স্কুল কনসার্টে হিরোইনের রোল পাই, তা-ও না। সেখানে বৈশালী আমার চেয়ে অনেক খারাপ নেচেও হিরোইন। আমি সখীদের দলে। বৈশালীকে খুঁটিনাটি স্টেপিং শেখাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফিরলে মা বলে, 'কি রে শ্যামার রোলটা পেলি?'

না, মা। এই ফিগারে শ্যামা?

সে কী? তবে? বজ্রসেন?

কী যে বল মা, চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চিতে বজ্রসেন হয়?

মা যেন এই প্রথম আমাকে দেখে। ভালো করে তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়। যেন মা বলতে চাইছে, 'সত্যি? এই ফিগারে হয় না বুঝি? ও তোর হাইট কম বুঝি? তাই তো... তাই তো...'

মায়েরা স্নেহান্ধ। নিজের মেয়েকে প্রত্যেকেই হয়ত অপ্সরি ভাবে।

'অত ভালো করে ভরতনাট্যমটা শিখলি! কোনো কাজেই...' দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে মিলিয়ে যায় শেষ কথাগুলো।

মাকে আমি বুঝতে পারি। আমি একমাত্র মেয়ে, একমাত্র সন্তান। আমার একটা ভাই হয়েছিল। হয়েই মারা যায়। মা বাবা কেউই সেই শোক কাটাতে পারেনি। কেমন বিষণ্ণ, সবসময়ে যেন ভাবিত, মনের মধ্যে কী একটা ভার বইছে। আমাকে নিয়ে মা-বাবার অনেক আশা। ছোট্ট থেকে মা বাড়ির সব কাজ সামলে আমাকে নিয়ে সাঁতার, নাচ, ছবি-আঁকার স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, আসছে। আমার একটু গা গরম হওয়ার জো নেই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও ভীষণ সাবধান। ব্যালান্সড্ ডায়েট, ব্যালান্সড্ ডায়েট করে দুজনেই পাগল। তা ছাড়াও আমাদের

সব কিছু ছকে বাঁধা। মাসে একদিন মামার বাড়ি, দুমাসে একদিন জেঠুর বাড়ি, বছরে একবার বড়ো বেড়ানো, একবার ছোটো বেড়ানো।

মাধ্যমিক পর্যন্ত বাবা-মা মোটামুটি আমার লেখাপড়া দেখিয়ে দিয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত আমি বেশ ভালোও করেছি। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক থেকে আর কূল পাচ্ছি না। বাবা-মাও না। তিনজন টিউটর এখন আমার। নশো টাকা আমার টিউটরের পেছনে খরচ, নাচের স্কুলে দেড়শো, এখন স্পেশ্যাল কোচিং নিতে হয়। এ ছাড়াও আছে নাচের পোশাক, নাচের ট্রুপে এখানে-ওখানে যাওয়ার খরচ। আমার মা তো চাকরি করে না, বাবা একা। আমার একেক সময়ে খুব খারাপ লাগে। দেবলীনা বা বৈশালীদের মতো আমরা ধনী তো নই! ওরা আমার বন্ধু বলেই বাবা-মা কয়েক বছর ধরে ভি সি আর, ওয়াশিং মেশিন কিনল, এবছর জন্মদিনে আমাকে একটা নতুন মিউজিক-সিস্টেম কিনে দিয়েছে। সি ডি প্লেয়ার পর্যন্ত আছে। জন্মদিনে বন্ধুরা এসে ওটা দেখে হুশ হাশ করছিল।

দেবলীনা বলল, 'ইশ্‌শ্‌ মাসি, আমি যে কেন ওনলি চাইল্ড হলাম না। দাদাটা সব মাটি করল।'

আমার মা হাসতে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'কত ভাগ্যে একটা দাদা পেয়েছ তা যদি জানতে। ঋতুটা বড্ডই একা।'

বৈশালী বলল, 'দাদা তবু স্ট্যান্ড করা যায়, কিন্তু দিদি?'

রুবিনা বলল, 'যা বলেছিস।'

শৌনক বৈশালীর দিকে চেয়ে বলল, 'যাক্ বাবা, দাদা স্ট্যান্ড করতে পারিস। তাহলে অন্তত তুই ফেমিনিস্ট নোস।'

জন্মদিনের উৎসবের শেষে কেমন মনমরা লাগল। মাকে বললাম, 'কেন যে এত দামি উপহার দাও।'

মা বলল, 'তোকে আরও কত দিতে আমাদের সাধ যায়!'

আরও? মা, আর কত দেবে? আমি কী করে তোমাদের এতসব ফেরত দেব? —মনে মনে বলি।

মা একটু দ্বিধা করে বলল, 'তুই যেন নিজেকে কারও থেকে ছোটো, কারও থেকে কম না ভাবিস।'

কিন্তু মা ওয়াশিং মেশিন, ভি সি আর, মিউজিক সিস্টেম এই দিয়েই কি আমি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব? হতে পারব বৈশালীর মতো সুন্দরী, দেবলীনার মতো খেলোয়াড়, রুবিনার মতো চৌখশ, বিদিশার মতো ব্রিলিয়ান্ট?

অনেক করে বাবা-মাকে বুঝিয়েছিলাম আমি সায়েন্স নেব না, অঙ্ক আমার বাঘ। খেটেখুটে মাধ্যমিকে পাঁচাত্তর পার্সেন্ট পেয়েছি বটে কিন্তু ভয় আমার ঘোচেনি। কেমিস্ট্রি আমি মুখস্থ করতে পারি না, ফিজিক্স আমার মাথায় ঢোকে না, বায়োতে প্র্যাকটিক্যাল করতে আমার ঘেন্না করে। আমি বোঝালাম। বাবা বলল, 'তুই একটা স্টার পাওয়া মেয়ে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রিতে লেটার পেলি, জিয়োগ্রাফি আর ম্যাথসে সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য লেটার মিস করেছিস। তুই সায়েন্স পারবি না? এটা কি একটা কথা হল?'

মা বলল, 'তাহলে কি তোর ভালো লাগে না?'

'ভালোও লাগে না, কঠিনও লাগে মা, কেন বুঝতে চাইছ না?'

'কিন্তু আমরা যে কবে থেকে ভেবে রেখেছি, তোকে এঞ্জিনিয়ার করব!'

বাবা বলল, 'জানিস তো, আমি হেলথ পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি বলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারলাম না।'

মা স্বপ্ন-ভরা চোখে বলল, 'নিতু মাসিকে মনে আছে তো? আমার মামাতো বোন? মনে আছে?'

হ্যাঁ। এখন তো কানাডায় থাকে।

শুধু থাকে? কত বড়ো এঞ্জিনিয়ার ; আমার সমবয়সী বোন, সে মন্ট্রিঅলে বসে বড়ো বড়ো মেশিনের ডিজাইন করছে। আর আমি? আমি বোকার মতো সায়েন্স পড়লুম না, ফিলজফিতে দিগ্‌গজ হয়ে এখন দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছি।

কিন্তু মা, সায়েন্স পড়লেই যে আমি জয়েন্ট পারব, পারলেও যে নিতু মাসির মতো ব্রিলিয়ান্ট হব, তা কে বলল?

'কে বলতে পারে কে কী হবে?' মায়ের চোখ যেন শূন্যে স্বপ্নের পাহাড় দেখছে।

বাবা বলল, 'ঠিক আছে ঋতু ; তোর যা ভালো লাগে পড়। আমরা কোনো চাপ দেওয়ার ব্যাপারে নেই। তোর যা ইচ্ছে। তবে তুই যে মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস এটা আমি তোকে বলতে পারি। ঠিক আছে ডিফিডেন্টলি কিছু করা ঠিক না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাপাচাপি আমি পছন্দ করি না।'

বলল বটে, কিন্তু বাবার মুখে কোনো আলো নেই। মার মুখ করুণ।

তা সে যাইহোক, একবার যখন বাবা-মা'র মৌখিক অনুমতি আদায় করতে পেরেছি আমি আর্টসই পড়ব। পাখির মতো উড়ে যাচ্ছি। স্কুলে যাবার পথেই দেবলীনা, তারপর শৌনক। ওরা দুজনেই সায়েন্স। আমি আর্টস নিচ্ছি বলতে দুজনেই থেমে গেল। তারপর শৌনক বলল, 'ঋতু স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। তুই ডাক্তারের কাছে যা, ওই যে ডাক্তার কাঞ্জিলাল।'

'দূর ওঁর কাছে গিয়ে কী করব? উনি তো .'

'পাগলের ডাক্তার, তা তুই কি ভেবেছিস তোর মাথাটা ঠিক আছে?'

দেবলীনা বলল, 'হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়ে তুই কী করবি? কেরিয়ার তো একটা তৈরি করতে হবে।'

এই সময়ে রুবিনা আর বিদিশা এসে আমাদের সঙ্গে মিশল। রীতেশ আর সৃঞ্জয়ও আসছে দেখলাম।

দেবলীনা বলল, 'শুনেছিস? ঋতু আর্টস নিয়ে পড়বে। হিস্ট্রি, লজিক, এডুকেশন, পল সায়েন্স...।'

বিদিশা বলল, 'কী ব্যাপার রে ঋতু? আমাদের এবার থেকে অ্যাভয়েড করতে চাইছিস, নাকি? 'আমার এ পথ/তোমার পথের থেকে অনেক দূরে'?'

বিদিশাটার আসলে আমার ওপর একটু দুর্বলতা আছে। সব সময়ে আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকি। বা বলা যায় পেছন পেছনে থাকি। বিদিশা ফার্স্ট গার্ল, সৃঞ্জয় সেকেন্ড, আমি থার্ড আসি, কখনও কখনও ফোর্থও এসে যাই। মাধ্যমিকে সেকেন্ড এসেছি। বিদিশাকে ছুঁতে পারিনি। আমাকে বিদিশা ওর সহচরী বলে মনে করে। ল্যাংবোট আর কি! আমি আশেপাশে থাকলে ওর প্রতিভাটা আরও খোলে। মাধ্যমিকে সেকেন্ড এসেও আমার মান বিশেষ বাড়েনি। বিদিশাই বলে, 'টেন্যাসিটি থাকলে কী না হয়? ঋতুকেই দ্যাখ না।'

'ঋতুর মতো দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা আমার দ্বারা হবে না বাবা'—দেবলীনা ঘোষণা করল। বেশি না খেটেও দেবলীনা স্টার পেয়েছে।

ফর্ম নিলাম। লিখতে যাচ্ছি, শৌনক একলাফে এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো পিছমোড়া করে ফেলল। বিদিশা লিখল, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স। আমার দিকে তাকাল। 'ফোর্থ সাবজেক্ট কী নিবি বল্, এইটা তোর পছন্দমতো দেব।'

আমি বললাম, 'সাইকো'।

সই করতে হাত ব্যথা করছিল, এমন জোরে ধরেছিল শৌনক। সই করার আগে শৌনকের দিকে তাকালুম, বিদিশার দিকে তাকালুম, 'দায়িত্ব কিন্তু তোদের।'

'ঠিক হ্যায় ভাই। কাঁধ চওড়া আছে।' শৌনক শ্রাগ করল।

মা-বাবা বলল, 'আমরা কিন্তু জোর করিনি ঋতু, নিজের ইচ্ছেয় সায়েন্স নিলি! ভাবিস না। টিউটর, বইপত্র, লাইব্রেরি যা লাগে সব বলবি হয়ে যাবে।'

সেই দৃশ্যটার কথা মনে করে আমার চোখ জ্বালা করছিল। আজ এইচ এস শেষ হল। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের চণ্ডীগড়, কুলু-মানালি বেড়াতে যাবার কথা। কিন্তু আমি কি উপভোগ করতে পারব কিছু? ম্যাথস আমার যাচ্ছেতাই হয়েছে। কেমিস্ট্রিতেও বোধহয় অনেক ভুল করেছি। এইচ এস যে এত টাফ হবে, আমি কেন আমার বন্ধুরাও বুঝতে পারেনি। কেউ খুশি না।

শৌনক বলল, 'আগে থেকেই তোদের গুডবাই জানিয়ে রাখছি।'

'কেন, কোথায় যাচ্ছিস? স্টেট্‌স? টোয়েফল-এ বসলি নাকি?'

'খেপেছিস?' শৌনক বলল, 'ড্রপ-আউট। স্কুল ড্রপ-আউট বলে একটা কথা আছে জানতাম। শৌনক বিশ্বাস কথাটা এবার রিয়্যালইজ করতে চলেছে। বাবাকে বলেছি একটা ফোটোকপি মেশিন নিয়ে বসব। কোর্টের পাশে জায়গা দেখুক।'

বৈশালী বলল, 'ভ্যাট, তুই তো স্পোর্টস কোটাতেই যে-কোনো জায়গায় পেয়ে যাবি। আমারই হবে মুশকিল।'

শৌনক শুকনো মুখ করে বলল, 'পাস কোর্সে বি. এসসি পড়ে কী হবে, বল্?

সুমিত বলল, 'আগে থেকে অত ভেঙে পড়ার কী আছে? আমিও তো ফিজিক্সে গাড্ডু খাব মনে হচ্ছে। তো কী? জয়েন্ট তো আছে এখনও। এ বারে না হয় পরের বছর।'

শৌনক বলল, 'জয়েন্টে তো স্পোর্টস কোটা নেই।'

বৈশালী আঙুল চিবোচ্ছিল। বলল, 'ঋতু তুই কি জয়েন্টে বসছিস?'

'বসতে তো হবেই। না হলে বাবার মুখ থেকে আলো নিবে যাবে। মায়ের চোখদুটো...না না সে আমি সহ্য করতে পারব না।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সরে এলুম। শুনতে পেলুম বিদিশা বলছে, 'ঋতুটার পরীক্ষা আসলে খুব ভালো হয়েছে। বুঝলি?'

ঠিক সতেরো দিন বাদে জয়েন্ট। শেষ হলেই মনে হল মায়ের গর্ভ থেকেই যেন পরীক্ষা দিতে দিতে আসছি। কবে যে নিবে-আসা দিনের আলোয় পড়িনি, রাত জেগে লেখা প্র্যাক্টিস করিনি, কবে যে টেনশন ছাড়া, প্যানিক ছাড়া দিন কাটিয়েছি, মনে করতে পারছি না। এত দিনে কি শেষ হল? জয়েন্টে যদি এসে যাই, তো চার বছর এঞ্জিনিয়ারিং, সে মেক্যানিক্যাল থেকে আর্কিটেকচার পর্যন্ত যেটা পাই। তারপর ওঁ শান্তি। সার্টিফিকেটটা মা-বাবাকে ধরিয়ে দিয়ে বলব, কী? খুশি তো? খুশি? আর কিছু না। কিছু পারব না। থিসিস না, বিদেশ না, নিতু মাসি দীপু কাকারা নিজেদের মতো থাক, আমিও আমার মতো থাকব। একটা চাকরি তো পেয়ে যাবই। তারপর দুমদাম করে বড়ো হয়ে যাব। টিউটরদের মুখ আর দেখতে হবে না। নাচটাও ছেড়ে দেব। ধু-র ভাল্লাগে না। কী হবে আর?

আজ রেজাল্ট বেরোবে। জয়েন্টরটা আগেই বেরিয়ে গেছে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ছিঁড়ল কোথায়? বিদিশা, শৌনক দুজনেরই কিন্তু হয়ে গেছে। এত দিন ছিল শৌনক-বৈশালী জুটি। এবার বোধহয় শৌনক-বিদিশা! দুজনেই ওরা বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং-এ যাচ্ছে।

এল্ সিক্সটিন আসছে। এই বাসটা পয়া। চড়ে পড়েছি। স্কুল স্টপে নামতেই সৃঞ্জয় একদিক দিয়ে দেবলীনা আরেক দিক দিয়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'দেবলীনা! এই লীনা! কী রকম হল?'

দেবলীনা কাঁচুমাচু মুখ করে একটা বাসে উঠে পড়ল। লীনার কী ভালো হল না? সেকেন্ড ডিভিশন হয়ে গেল নাকি? সৃঞ্জয়ের দিকে তাকাই। কোথায় সৃঞ্জয়।

ভিড় ঠেলেঠুলে ঢুকতে থাকি। বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটেই বাবা কি মা কি আর কাউকে সঙ্গে করে এনেছে। আমার মাও আসতে চেয়েছিল। কদিন মায়ের জ্বর হয়েছে। আমি বারণ করলাম। আজকে জাস্ট রেজাল্ট বেরোচ্ছে, আসল বাঘের খেলা মার্কশিটের দিনে। সে দিন মাকে আনব।

আমাদের নোটিস বোর্ডটা বড্ড উঁচুতে। তার ওপর কাঁচে আলো ঝলকাচ্ছে, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

'বলো, বলো তোমার রোলটা বলো, আমি দেখে দিচ্ছি।' বাবা-জাতীয় একজন বললেন।

এফ এইচ এ থ্রি টু সেভেন ওয়ান।

এফ এইচ এ থ্রি টু কী বললে?

সেভেন ওয়ান, ওয়ান, এই তো, সেভেন টু। নাঃ সেভেন ওয়ান তো নেই!

সে কী? এফ এইচ এ থ্রি টু সেভেন ওয়ান! দেখুন না!

আমি সরে যাচ্ছি, মাই গার্ল, তুমি নিজেই দেখো।

আমার পায়ের তলাটা হঠাৎ সমুদ্রের বেলাভূমি হয়ে যাচ্ছে। বালি সরছে, বালি সরছে, আমার রোল নাম্বার নেই, নেই। সত্যিই নেই। এ কী? এরকম হয় নাকি? এ রকম ঘটে? আমার...আমি...আমার ক্ষেত্রে ঘটছে এটা? ঋতুপর্ণা মজুমদার... আমার... রোল নম্বর নেই?

আমার দুপাশ থেকে সমুদ্রের তীরে বালির মতো ভিড় সরে যাচ্ছে। আমি ডান হাত বাড়িয়ে পথ করে নিচ্ছি। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সামনে চলেছি ঠিক। চোখে জল? না, না জল নয়। কেমন একটা ধোঁয়াশা, যা এই সাতসকালে থাকার কথা নয়, বুকের মধ্যেটা কেমন স্তব্ধ। আমার হৃৎপিণ্ডটাও সৃঞ্জয় আর দেবলীনার মতো ছিটকে সরে যাচ্ছে।

রাস্তা, রাস্তা...অনেক পরে খেয়াল হল আমি রাস্তা পার হচ্ছি। যন্ত্রের মতো জেব্রা ক্রসিঙে এসে দাঁড়িয়েছি। যন্ত্রের মতো পার হচ্ছি রাস্তা। আমি কোন্‌দিকে যাচ্ছি? বুঝতে পারছি না' আমাদের গলিটা যেন কেমন? দূর, শরীর যখন আমায় এতদূর টেনে এনেছে বাকিটাও টেনে নিয়ে যাবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া না কি একটা বলে যেন! আমি ভাবব না। ভাবছি না তো! চলছি। চলছি শুধু। আমার হাতে এটা কী? ও এটাকে বোধহয় পার্স বলে। এর ভেতরে কী থাকে? টাকাপয়সা। টাকাপয়সা মানে কী? কত টাকায় কত পয়সা হয়। কত পয়সায় কত টাকা হয়?

আরে! এই বাড়িটা তো আমি চিনি। উঁচু বাড়ি। দশতলা বোধ হয়। তুমি দশ গুনতে জানো ঋতু, যে দশতলা বললে? আচ্ছা গুনে দেখি তো? লিফ্‌টে যাব না। আমি গুনতে গুনতে উঠব। সেই কারা যেন কী গুনতে গুনতে গিয়েছিল? দোলা, ছ পণ, হ্যাঁ হ্যাঁ দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই।

আস্তে আস্তে উঠছি আমি। এইটাই কি আমার বাড়ি? না তো! এটা বোধহয় আমার বাড়ি না। কিন্তু এটাতে আমি আসি। রোজ আসি না। শনি-মঙ্গলবারে আসি। শনি মঙ্গলবার...এসব কথার মানেই বা কী? এই তো পেতলের নেমপ্লেটঅলা দরজাটা। ওহ, এটা সেই অঙ্ক-ফিজিক্সের স্যারের বাড়ি। এখখুনি দরজাটা খুলে যাবে, স্যার চশমা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করবেন।...

আমি পড়ি কি মরি করে ওপরের দিকে ছুটতে থাকি। এতক্ষণ পরে আমার দেহে গতি এসেছে।

ছুটতে ছুটতে আমি চলে যাই ছাদের শেষপ্রান্তে। তারপর নিজেকে ছুড়ে দিই শূন্যের কোলে। হে শূন্য আমায় কোল দাও।

আর ঠিক সেই সময়ে যখন আর ফেরবার কোনো উপায়ই নেই, তখনই পৃথিবী তার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দেয় মেয়েটির কাছে। জীবন উজাড় করে দেয় তার সমস্ত নিহিত মানে।

রোদ দেখে সে জীবনে যেন এই প্রথমবার। বুঝতে পারে রোদে এই সেঁকা হওয়া, উলটে পালটে ঘরবাড়ি গাছপালা গোরুছাগল মানুষটানুষ সমেত...এইটাই জরুরি ব্যাপার, পরীক্ষার ফলাফলটা নয়। গাছও দেখে সে। একটা গুলঞ্চ, তিনটে বটল পাম। তার জ্ঞাতি এরা, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদের সঙ্গে তার, তাদের পারস্পরিক টান। একশো ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা থেকে পড়তে পড়তে তার হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসে মাধ্যাকর্ষণ ও হাওয়ার অমানুষিক চাপ তবু সে উলটো দিকের এগারো তলা বিল্ডিঙের সাততলার আলসেয় বসা একজোড়া ঘুঘুব গলাব চিকন ময়ূবকণ্ঠি রংটা পর্যন্ত দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈশালী বা শৌনক নয়, নিজেবই মুখেব অনন্য সৌন্দর্য আর একবার দেখবার জন্য ব্যস্ত হয় পড়ে।

সমস্তটাই ভগ্নমুহূর্তের একটা ঝলক। একটা বোধ শুধু। এমনই আলোকসামান্য এই বোধ যে এর জন্য জীবন দেওয়াই যায়। কিন্তু মুশকিল এই যে জীবনটা চলে গেলে বোধটারও আব কোনো মানে থাকে না।

স্বৈরিণী

থলে দুটো দাও, বাজার যাব

একটু কুচো চিংড়ি এনো আর পেঁয়াজকলি। কলি কিন্তু, শাক নয়। সাদা পাঁপড় দেখো তো!

লিস্ট করো, লিস্ট করো, ফরমাশগুলো এলোমেলো ছুড়ে মারলে হবে না।

লিস্ট করার কি আমার সময় আছে এখন? জিনিসগুলো তো রিলেটেড। মনে রাখতে অসুবিধে কি?

তক্কো করো না, তক্কো ভালো লাগে না সাতসকালে, মেয়েমানুষ মানেই তক্কো।

কথা শুনলে মনে হয় কথা কইছে কোনো উপমন্যু নয়, নির্জলা এক উপীন। উপেন্দ্রনাথ, দেবশর্মা-টর্মা, এক্ষুনি শরৎচন্দ্রের চরিত্রদের গলায় বলে উঠবে, 'তোমার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।'

শরৎচন্দ্রের ডায়লগ মনে করতে রিনার হাসিই পেয়ে গেল। ডাল ধুতে ধুতে সে ফিক করে হেসে ফেলল। শরৎচন্দ্র পড়তে দেখলেই মা রাগ করত। বলত, 'অন্য কিচ্ছু না, গুছিয়ে ঝগড়া করতে শিখবি, আমার ওপরেই শিক্ষাটা ফলাবি সবার আগে', দাদা বলত, 'শুধু ঝগড়া নয়, প্রেমালাপ করতেও শিখবে মা, বেশ গুছিয়ে প্রেমালাপ, 'দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?'

'তোরই তো কণ্ঠস্থ মুখস্থ দেখছি।' রিনা ঠাট্টা করত।

কিন্তু না, শরৎচন্দ্রের প্রেমালাপ রসালাপ নয়, উপীন প্রমুখদের বুড়োটে সেকেলেমিতেই উপমন্যু সব্বাইকে টেক্কা দেবে মনে হয়। আর কী নীরস! কী নীরস! টাকা-আনা-পাই কিলো-মিটার-লিটার ছাড়া কিছু বোঝে না কিচ্ছু না।

ধরো, বন্ধুর বিয়েতে ভালো করে সাজল রিনা। একটা নতুন তাঞ্চোই শাড়ি, গয়না, প্রসাধন, আয়নায় নিজেকে দেখতেও দারুণ লাগল।

'কেমন লাগছে গো?'—উপমন্যুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ করে অতঃপর জিজ্ঞাসা।

উত্তর হল, 'ন্যাকামি রাখো। তাড়াতাড়ি নাও।'

'ন্যাকামি', 'ঢং' এই কথাগুলো যেন শুধু রিনাকে নয়, রিনার আত্মাকেও অপমান করে। ভেতরটা কুঁকড়ে যায়। মনে হয়, সে নিজেকে যা ভাবছে তা সে নয়, সে যত দূর সম্ভব অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। আর উপমন্যুও তার জানাবোঝা মানুষ নয়। সে অন্য। একেবারে অন্য। ভয়-ভয় চোখে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। ওই তো খাটের ওপর জয়পুরি বেডকভার বিছানো। ভেবেছিল ওটা তারই, তাদেরই খাট কিন্তু তা বোধহয় নয়। ও আর কারও খাট, ওখানে অন্য কেউ শোয়, ওই আলমারি, বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, খাটের পাশে লম্বা এক ফালি কার্পেট চিনে লণ্ঠনের মতো ওই আলোর শেডটা অনেক শখ করে যেটা লাগিয়েছিল, মেমসাহেব-নাচা ঘড়ি যেটা তার রাঙাকাকু বেলজিয়াম থেকে এনে দিয়েছিলেন—এ সমস্তই চূড়ান্ত ন্যাকামি অর্থাৎ ভান, অর্থাৎ মিথ্যা।

কানে 'ন্যাকামি' শব্দটার অপমান প্রত্যাখ্যান নিয়ে রিনা বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দিকে

চোখ পড়ে। স্টিলের কয়েকটা বাসন দেখা যাচ্ছে। ঝকঝক করছে। ক্রিসমাস কার্ডের মতো একগুচ্ছ ফুল-আঁকা সাদা উনুনটা, ভীষণ প্রিয় রিনার। খুব যত্ন করে ব্যবহার করে। এগুলো? এগুলোও কি ন্যাকামি? ওই রান্নাঘরের তাক গোছানো, পেতল পালিশ করা, সোডা সাবান দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার করা ঘষে ঘষে...? না, সম্ভবত এগুলো ন্যাকামি নয়। খুব কেজো গেছের ব্যাপার এসব। কাজ করো, খাও দাও ঘুমোও, কাগজ পড়ো। দু-চার খানা বই পড়ো, আর হ্যাঁ রাত্তিরবেলা ডাক পড়লে সাড়া দিয়ো। নির্ভাঁজ, নির্ভেজাল প্রকৃতির ডাক কিন্তু।

কেন? কেন এমন হল? বাচ্চারা এল না বলে? কিন্তু সে-ও তো তার অপরাধ নয়। ডাক্তারদিদি বলেই দিলেন, 'কোনো অসুবিধে নেই, কারওই কোনো ডিফেক্ট নেই। স্পার্মগুলো যে কেন কোনো ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে পারছে না, তা ভগবানের বাবারও সাধ্য নেই বলার। মিস্টার দত্ত আপনি একটু টেনশন কমান তো! মিসেস দত্ত আপনি যেমন ভালো লাগে তেমন করে দিন কাটাবেন, যেমন খুশি থাকবেন, ধরুন ইচ্ছে হল মাথায় একটা ফুল গুঁজলেন, ইচ্ছে হল একদিন রান্না করলেন না, দোকান থেকে খাবার আনিয়ে চালিয়ে দিলেন। অনেক সময়ে বড্ড গতানুগতিকতার মধ্যে বাঁধা পড়ে যান আপনারা। প্লিজ...লেট ইয়োরসেল্ফ গো। ইট ক্যান মেক আ গ্রেট ডিফারেন্স। তা নয়তো...আমি ডাক্তার হয়েও শনাক্ত করতে পারছি না ভাই আপনাদের স্টেরিলিটির কারণটা।'

ডাক্তারদিদি পারেননি, কিন্তু রিনা বোধহয় পারে। ওই যে উপমন্যুর স্পার্ম? ওরাও তো উপমন্যুরই মতো? একই ডি এন এ কোড মেনে তৈরি হয়েছে। সেই লক্ষ লক্ষ স্পার্ম রিনার গুটিকয় ডিম্ব বেচারির দিকে বাঁকা হেসে তেড়ে যায়, বলে, ইয়েস একটা বাচ্চার বডি তৈরি করতে রাজি আছি ঠিকই, কিন্তু খবর্দার নো ন্যাকামি। তার ভেতরে ওভামদের কুঁকড়ে যাওয়াটা আজকাল টের পেতে শুরু করেছে রিনা। তাই কেন তার ঘর শূন্য এ নিয়ে রিনার মনে খেদ থাকলেও কোনো প্রশ্ন নেই।

রুটিনমাফিক খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফুস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় একটু কাত হল উপমন্যু। এটা ওর উত্তর-চল্লিশ সাবধানতা। ডাক্তারের পরামর্শ। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সিগারেট আর মদ্যও বারণ, সে বারণটা অবশ্য সে শোনে না।

এইবারে চানে ঢুকবে রিনা। চুল খুলতে খুলতে আড়চোখে দেখল উপমন্যু উঠে পড়ছে। যাক এইবার বেরোবে, বেরিয়ে যাবে, আঃ বেরিয়ে যাচ্ছে। মস্ত বড়ো একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রিনা উপমন্যুর পরিত্যক্ত সোফাটায় বসে পড়ল। শুধু চুলের বিনুনই খুলছে না। যেন সারা শরীরে তার অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গ বিনোনো ছিল, স্নায়ুতে স্নায়ুতে জড়িয়ে গিঁট পড়ে গিয়েছিল, সেইসব গিঁট খুলছে সে সযত্নে, জট ছাড়াচ্ছে, বিলি কাটছে। কী আরাম! কী অসহ্য মুক্তির আরাম! অনাবশ্যক একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রিনা। চুলের ভেতর দিয়ে চিরুনি চালাতে চালাতে আরামে চোখ বুজে আসে। কিন্তু সেই কুঁড়েমিকে এক ভ্রূকুটিতে তাড়িয়ে সে বাথরুমে ঢুকে যায়। লাল বালতিটাকে কলের তলায় বসায়। তারপর ম্যাচিং লাল মগটা গবগব করে ডুবিয়ে এনতার জল ঢেলে যায় গায়ে। সাবান লাগাতে লাগাতে যতক্ষণ না সাদা ফেনায় গোটা শরীর ভরে যায় ততক্ষণ সাবানটা ছাড়ে না। চন্দনের গন্ধে বাথরুমটা ভরে যায়। নিজের ঈষৎ নত বুক তুলে ধরে সাবান দিয়ে ধোয়ার নামে অনেকক্ষণ আদর করতে থাকে সে। অঞ্জলিটা ঝটপট মুঠো করে পদ্মকলির মতো আকার করে দেখে, নাঃ বেশ সুললিত সাবলীল আছে মুঠো, গিঁটপড়া শক্ত আড়ষ্ট হয়ে যায়নি। এখনও।

তেমন গরম এখনও পড়েনি, তাই চুলটাও তেমন করে ভেজায়নি সে। সরু একটা সিঁদুরের রেখা আর একটা কুমকুমের টিপ পড়লেই মুখখানা বেশ হেসে ওঠে। সামান্য একটু ক্রিম ঘষে নেয়। পাটভাঙা একটা হালকা কমলা রঙের ছাপা শাড়ি পরতে পরতে নিজেকে ভীষণ ভালো

লাগতে থাকে তার। মনে হয় আদর করুক, কেউ তাকে একটু আদর সোহাগ করুক। নিজেই নিজের মুখটাকে চুমো খাবার জন্য অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ ফিরে বৃথা চেষ্টা করে সে। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে এক কাপ দুধ খায় চকলেট দিয়ে। ঠান্ডা ঠান্ডা। ঢালা উপুড় করে করে ফেনা ওঠানো। গান চালিয়ে দিতে হবে এখন তাকে। মাস্ট। অখিলবন্ধু ঘোষের ক্যাসেটটা বাছে সে, তারপর একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে সোফাটায় পিঠ এলিয়ে বসে। নীচু একটা বেতের মোড়া টেনে আনে সামনে, পা দুটো তুলে দেয় তার ওপর। তারপর বইয়ের পাতায় চোখ রাখে। এখন গানের দিকেই তার মন পুরোটা চলে যাবে, না গল্পের বিবরণে মন হারাবে সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ গায়ক আর লেখকের আপেক্ষিক কেরামতির ওপর। তবে সত্যি কথা বলতে কি, সুরও নয়, সাহিত্যও নয়, আসলে তার মন ডুবে যায় একটা মনোরম অনুভূতির সাগরে। সুর তাল আর সাহিত্যরস দিয়ে তৈরি তার জলরাশি। কী পড়ল, কী শুনল সেগুলো তার মনে থাকে আবছাভাবে, শুধু হৃদয়ের ভেতরটা কূলে কূলে ভরে যায়।

হৃদয়ের এইরকম টইটম্বুর অবস্থাতেই দরজার ঘণ্টাটা সেদিন পাখির গলায় ডেকে উঠল, 'কুব কুব কুব কুব, কুব কুব কুব কুব।' ম্যাজিক আইতে চোখ রেখে কাউকে দেখতে পেল না রিনা। অগত্যা ছিটকিনি খুলে একটু ফাঁক করতেই হল দরজাটা। প্রথমেই একটা সাদা ঝলক। বাইরের সকাল দশটার প্রখর আলো আর সাদা শার্ট, সাদা প্যান্টের সুহৃৎ ঝলক।

'তুমি? তুমি এখানে? তুমি হঠাৎ?' আশ্চর্য হয়ে, আনন্দের তুঙ্গে উঠে গিয়ে রিনা কোনোমতে বলল।

কোনো কথা না বলে, প্রাণখোলা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে ও ভেতরে ঢুকে এল। হাতের ব্রিফকেসটা দেখিয়ে বলল, 'ভালো বিজনেস হয়েছে আজ। এখন আমি একটু বিশ্রাম এবং এক কাপ ভালো দেখে ধোঁয়া-ওঠা চা অর্জন করেছি। তোমার হাতের।'

'কী আশ্চর্য, বসো না, বসো আগে—' আহ্লাদে কিশোরীর মতো শরীর মুচড়ে রিনা বলল।

ও বসে আছে। আধা-অন্ধকার বসার ঘরটায় আলো জ্বলছে বলে মনে হয়। ওর হাত-পা নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা হালকা অ্যাথলেটিক ভাব আছে। যে কোনো মুহূর্তে উঠে দাঁড়াবে। সরে এক সোফা থেকে আর এক সোফায় যাবে, কি এক লাফে পৌঁছে যাবে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। এই লঘুতা ও পেয়েছে যোগ থেকে। যোগ করত রোজ।

'এখনও চালিয়ে যাচ্ছ?'—গ্যাসে চায়ের জল বসিয়ে দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল রিনা।

কী?

যোগ।

বাঃ, ওটা তো আমার প্রকৃতির দ্বিতীয় অংশই হয়ে গেছে। সেকেন্ড নেচার। চালাব না! যোগ বাদ দিয়ে আমার দিন শুরুই হয় না।

খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছে। খড়মড় খড়মড় শব্দ হচ্ছে একটা। ওর ছোঁয়াচেই যেন রিনার পদক্ষেপেও কেমন একটা হালকা ভাব এসে যায়। ভেতর থেকে কী একটা ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তার মনে হয় না ন-বছর বিয়ে হয়ে গেছে। আগের চেয়ে ভারী আর আলগা হয়েছে শরীর। শাড়িটা অগোছালো। ভুলে যায়, সে পুরো মানুষটাই, যত চেষ্টাই করুক, আগের মতো লাবণ্যময় হতে পারে না কিছুতেই।

ধোঁয়া-ওঠা দু কাপ চা একটা সাদা ট্রেতে।

এই দ্যাখো কেমন তোমার সঙ্গে ম্যাচ করা ট্রে, ম্যাচ করা কাপগুলো...

'আরে, তাই তো!' খুশি ছড়িয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গে। বলে, 'আসল কথাটা বলছ না কেন? একদম আসল কথাটা?'

কী!

তুমি নিজেই যে আমার সঙ্গে ম্যাচ করা। তাই বাকিগুলো আপনিই ম্যাচ হয়ে যায়।

'ধুত।' দেয়ালে টাঙানো গোল আয়নার দিকে তাকাবার চেষ্টা করল রিনা। দেখতে পেল না। কিন্তু আয়নার দিকে তাকাবার দরকার কী? নিজের বোধ দিয়েই তো নিজেকে চিনে নেওয়া যায়। ভাঙাচোরা থ্যাঁতলানো ধামসানো দাবড়ানো এই রিনা কি ওর সঙ্গে মানানসই হতে পারে?

হঠাৎ কয়েকটা লাল গোলাপ ঝলসে ওঠে ওর হাতে।

'দ্যাখো তো এগুলো ম্যাচ করে কি না!'

গোলাপের আরক্ত সংরাগ ওর হাত থেকে তার হাতে, ক্রমে তার সর্বাঙ্গে চারিয়ে যাচ্ছে বুঝে রিনা কাছে, ওর আরও—আরও কাছে চলে যেতে থাকে। ঘন, আরও ঘন হয়ে যায় দুজনে।

ধরা গলায় রিনা বলে, 'ছাড়ো, এবার ছাড়ো।'

'মনে আছে সেই সব দিন? রিনঠিন রিনরিন দিন? যখন কলেজের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে তুমি আর ডাক্তারদের চেম্বার পালিয়ে আমি...মনে আছে সেই রোদের গন্ধ, বাতাসের রং, ভিক্টোরিয়ার পুকুরের সেই যমুনা-যমুনা জল?'

রিনা মন্ত্রমুগ্ধর মতো বলল, 'মনে আছে সেই অনন্ত চিনেবাদাম, আইসক্রিমের সেই ক্ষণ-মধুর, উট্রামের গোলঘরের সেই মহাকাশ? মনে আছে?'

'আর ঘাসের তবকে মোড়া মাঠের উষ্ণতা, মেঘের তবকে মোটা দুপুরের দুপুরালি! হিমের তবকে মোড়া...'

রিনা দেখল, ওর চোখ চকচক করেছে। ওরা পুরুষ, কখনও কাঁদে না, ওদের নাকি কাঁদতে নেই। কিন্তু সে তো মেয়ে, নেহাতই মেয়ে, তাই তার চোখ উপচোচ্ছে। উপচোতে দিল সে। আর তখনই এল সেই চুমো যা সকাল থেকে সে নিজেকে নিজে দিতে চাইছিল, ব্যর্থ হচ্ছিল বারবার। জলের ফোঁটাগুলো গাল বেয়ে নেমে এসে ঠিক যেখান থেকে গালের কিনার বেয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কিনারে, এ কিনার থেকে ও কিনারে চোখের পাতায়, কানের লতিতে, তারপর? তারপর ঠোঁটের কূল থেকে মুখের গভীরে ক্রমশ প্রবিষ্ট হয়ে যেতে থাকে...ক্রমশই।

শেষ বিকেলে সমস্ত প্রকৃতি আবির মাখে। ছাতে না উঠলে প্রকৃতি দেখা যায় না এখানে। কিন্তু কেমন করে যেন তার নজরে একটা টেলিস্কোপ, পেরিস্কোপ জাতীয় কিছু এসে যায়। সে দেখতে পায়। ওপরে এবং নীচে সব। গোটা পরিপার্শ্বই যদি হোলির রঙ্গভূমি হয়ে যায় তো না দেখে উপায়?

আসলে প্রেমই আমাদের দিয়ে যায় অন্য ধরনের সুস্বাস্থ্য, যাতে করে শরীরটা থাকে সতর্ক, সব সময়ে চনমনে, প্রেম আরও দেয় এক অদ্ভুত অভিনিবেশ। গোটা পৃথিবীর অন্তর্নিহিত খেলাটা পরিষ্কার বোঝা যায় যেন। হঠাৎ যেন একটা শক্ত পাটিগণিতের অঙ্ক সোজা হয়ে গেল। বেশ হেসে হেসে ভালোবেসে বেসে সেইসব প্রতিদিনের কর্তব্যকাজগুলো করতে থাকে রিনা যেগুলো ভূতুড়ে রকমের বিশ্রী লাগত আগে। যেমন বালিশের ওয়াড় পরানো, মশলাপাতির কৌটো পরিষ্কার করা, ন্যাতা ফুটিয়ে কাপ, অ্যাশট্রে পরিষ্কার করা...এবং এবং এবং।

'হঠাৎ টিপ পরেছ যে?' বাঁকা চোখে উপীন।

'হঠাৎ এ সময়ে এত সাজ?' ভুরু কুঁচকে উপীন।

আশ্চর্য! টিপ না পরাটা কোনোদিন চোখে পড়েনি। পরাটাই চোখ পড়ল। টিপ? কপালে হাত চলে যায়। তাই তো! টিপই তো! কালচে ম্যাজেন্টা রঙের একটা টিপ! ঠিক আছে, টিপ লাগিয়েছি। কিন্তু সাজ? সাজ কই? সেই একই কলকা ছাপের সুতির শাড়ি। সেই একই ব্লাউজও সামান্য একটু মাড় পড়েছে কী? ইস্ত্রি চলেছে।? হবেও বা। অন্য মনেই এসব করে গেছে রিনা। তবে এগুলো কিছু না। আসলে ভালোলাগার রং লেগেছে গায়ে হোলির সন্ধেবেলার আবিরের মতো। খুশির প্রসাধনীতে মুখ-হাতের চামড়া মসৃণ হয়ে উঠেছে। ওসব শাড়ি-টাড়ি টিপ-ফিপ কিছু নয়।

'কেউ কি এসেছিল?'—কেমন একটা সন্দেহের ছোঁয়া উপীনের গলায়।

'কে এসেছিল আজ?'—ক্রমশ আরও জোরালো আরও নিশ্চিত হতে থাকে প্রশ্ন।

কে আবার আসবে?

না। তাই জিজ্ঞেস করছি। ঠিক যেন মনে হল আমি ঢুকবার দু-মিনিট আগেও কেউ ছিল। কেউ এসেছিল।

অনেক কথা বলে ফেলেছে। চটপট সে মোজা ছাড়ায় পা থেকে। জুতোর মধ্যে ঢোকায় মোজাগুলো, বাড়ির চটিতে সন্তর্পণে পা গলায়, তারপর কুকুরের মতো হাওয়ায় নাক ঢুকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে শোবার ঘরে চলে যায়।

চা করতে করতে হেসে ফেলে রিনা। টের পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু যার জন্য নাক ফোঁস ফোঁস করা সেই কাটালিচাঁপা যে তার বুকের খাঁজে, কেমন করে তার সন্ধান পাবে ভদ্রলোক?

এসেছিল, সত্যিই তো এসেছিল। উপমন্যুর অনুপস্থিতির সময়টাই ওর 'প্রেজেন্ট প্লিজ' করবার সময়। তবে, কবে, কখন, ঠিক কোন্ মুহূর্তে ও আসবে সেটা বলা থাকে না, জানা যায় না। সত্যি কথাই, ও-ও তো ইচ্ছেমতো আসতে পারে না, কাজের মাঝে সময় করে ওকে আসতে হয়। কবে সে সময় পাবে সে কথা কি ও-ই জানে?

হয়তো কোনোদিন একটা শিরশিরে মতো হাওয়া বইল। চৈত্রের শেষের দিকে কী শরতের গোড়ায় যে রকম একটা মন-কেমন-করা হাওয়া দেয়। রিনরিন, রিনঠিন দিন। হয়তো সারা সকাল ধরে নিজেকে প্রস্তুত করল রিনা। প্রস্তুত মানে কী? সাজগোজ? দূর! ঘরদুয়ার গুছোনো, লেপা-পোঁছা? ধুর! ভালো-ভালো টি. ভি-তে শেখানো খাবারদাবার করা? ধুত্তোর! ওসব কিছুই লাগে না। চোখের কাজল ও দেখে না, দেখে চোখের ভেতর, বাড়ির সাজসজ্জার মধ্যেও কিছুই দেখে না, দেখে যেটা তার নাম ছটা। প্রভা, দ্যুতি। রিনার। রিনা নামক মানুষীর বিশেষ রিনাত্বের যে ছটা তার মধ্যে থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটাই, সেটাই ওর অনুভব করে আনন্দিত অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠার অবলম্বন। আর কিছু লাগে না। আর খাবারদাবার? পাছে রিনার কষ্ট হয় অসময়ে খাবার খুঁজতে তাই ও পেট ভরিয়ে আসে, আর তেমন ভালো-ভালো জিনিস খেলে নিয়ে আসে রিনার জন্যে।

ছি ছি ছি, এমন এক গোছা অর্কিডের পাশে তুমি তেলেভাজা নিয়ে এলে?

আ রে! তেলেভাজা বলে কি ফেলনা? কাচের কেসের মধ্যে রাখে আজ্ঞে। কড়া থেকে ঝুড়িতে পড়তে পায় না, এমন কাটতি।

তা হলে শো-কেসে কোন্‌গুলো যায় শুনি?

শো-কেসেরগুলো বিককিরির না, ওগুলো বিজ্ঞাপন, তা তুমি যদি বলো তো ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বেগনি অর্কিডের ফুল দেখেই তোমার খিদে মিটুক।

ইসস্ ঠোঙাটা দেখি একবার, গরম আছে কি না।

তেলেভাজার সঙ্গে চা-টাই জমে। কিন্তু তৈরি করতে একটু দেরি লাগবে, একটু হাঙ্গামা বলে—

কফির জেদই ধরবে ও। এমন করবে যেন কফির জন্যে প্রাণটা কাতরাচ্ছে ওর। কফি ছাড়া অন্য কোনো পানীয় যেন ওর চলে না।

তুলনা করছে না রিনা, কিন্তু উপমন্যু? উপমন্যুকে কিছু তৈরি করে দিতেও ভেতরটা ভয়ে টিপটিপ করে, কিংবা বিরক্তিতে গা-টা কিসকিস করতে থাকে।

চা-টা কে করেছে?

আমি, কেন?

চিনি নেই।

রুটিটা কে সেঁকেছে?

আমি। আবার কে?

চামড়া।

আলুর দমটা কে রেঁধেছে?

কেন?

নুন বেশি। আলু আর একটু সেদ্ধ হত।

কোনো হোটেলে ফুড-টেস্টারের চাকরি নিক না তার চেয়ে। প্রতিটি খুঁটিনাটিতে এত খুঁত ধরবার বাতিক যদি! এতই কি খারাপ রান্না করে রিনা? ধরে বেঁধে কোনোদিন রান্না শেখেনি হয়তো। কিন্তু দেখে দেখে শুনে শুনে শেখাও তো শেখা! ভয়ের চোটে না চেখে রান্না নামাতেই পারে না রিনা। চেখে মনে হয় এই রে নুনটা একটু বেশি হয়ে গেছে, ঝপ করে একটু চিনি দিয়ে দেয়, আবার চাখে, এই রে মিষ্টি একটু বেশি হয়ে গেল, দে একটু জল ঢেলে, যা পাতলা হয়ে গেল ঝোলটা, শেষে একটু ময়দাগোলা, একটু ঘি, একটু গরমমশলা দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে যে জিনিসটা নামায় সেটাকে যদি উপীন যাচ্ছেতাই একটা নামে ডাকে, তাকে দোষ দেওয়াও যায় না। ভয়, আসল কথা, স্নায়বিক ভয় একটা কাজ করে তার কাজকর্মের পেছনে। অথচ ভয় পাওয়ার তো কথা নয়, টানা তিন বছর পরিচয়ের পরেই তো বিয়ে হয়েছে তাদের। তখন তো মনে হয়নি এমনি ভয় হবে। তা ছাড়া এমনি এমনি যখন সে নিজের ভালো লাগায় শখে কিছু রান্না করে, ছোলার ঘুগনি, কি বাঁধাকপির কোফতা, দিব্যি তো হয় জিনিসগুলো।

'তুমি করেছ? দা-রু-ণ!' ও তো বলে।

আমি করেছি বলেই দারুণ নাকি?

আরে আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি করেছ।

আমার বাড়িতে আমি করব না তো কি বড়ো হোটেলের শেফ এসে করে যাবে?

তা কেন? ওই সব হারুর মা নাড়ুর মা থাকে না? ভাবলাম হয়তো তেমনই কেউ... তা সে যে-ই করুক, ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে। আর একটা দেখি!

আর একটা আর একটা করতে করতে দুজনে মিলে সব সাবাড়। ফুড টেস্টার মশাইকে দিয়ে আর যাচিয়ে নেওয়া হয় না জিনিসটা সত্যি সত্যি উতরোলো কি না।

পয়লা এপ্রিল যে রিনার জন্মদিন সেটা ও ছাড়া পৃথিবীর আর সব্বাই ভুলে মেরে দিয়েছে। সেই কবে মা জন্মদিনে ঠাকুরবাড়ি পুজো পাঠাত আর পায়েস রাঁধত। একবার সাত-আটজন বন্ধুকে শখ করে নেমতন্ন করেছিল সে, মাকে কত সাধাসাধি করে। ভালো ভালো রান্না হল, দোকান থেকে কেক-টেকও এল, আইসক্রিম পিঙ্ক নতুন ফ্রক পরে রিনাও রেডি। হায় রাম। একটা বন্ধুও এল না। মা তো রেগে লাল। 'ভালো করে বলতে পারিসনি, আমাকে নাহক এত খাটালি, এত্ত খাবারদাবার, কী হবে এখন?' তার যে অপমানে অনাদরে চোখ ফেটে জল এসে গেছে সে খেয়াল

মায়ের নেই। পরদিন স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে আর এক ফ্যাসাদ।—'সে কি রে? আমরা ভেবেছিলাম এপ্রিলফুল করছিস। সত্যি-সত্যি তোর জন্মদিন পয়লা এপ্রিল। সত্যি-সত্যি নেমতন্ন করেছিলি? এ মা! ভাগ্যিস।'

ভাগ্যিস কেন? না আটজনে মিলে ঠিক করেছিল একটা টুপি পাঠাবে। ফুল'স ক্যাপ আর কি। তা শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। এমন বিদঘুটে জন্মদিন কে মনে রাখে!

কিন্তু একজন, সেই একজন ঠিক সেই মভ রঙের চমৎকার সিল্কের শাড়ি নিয়ে এসেছে! জন্মদিন তো তবু একরকম। বিবাহবার্ষিকীতেও মনে করে এক গোছা লম্বা লম্বা ফুল, আর সেই চমৎকার জয়পুরি মিনের গয়না নিয়ে এসেছে। ঠিক ওই গয়না, ওই শাড়িই রিনার সাংঘাতিক পছন্দ ছিল। উপমন্যুর এক বন্ধুর বিয়েতে উপহার কিনতে গিয়ে দেখেছিল। এক এক সময়ে এমন হয় না, যে মনে হয় ওই জিনিসটা না পেলে মরে যাব, জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে? এ সেই রকম চাওয়া। কিন্তু মুখ ফুটে উপমন্যুকে বলতে ইচ্ছে হয়নি। ওর টাকা ওর রোজগার ওর হিসেব। আর ওর খেয়াল—ও-ই বুঝুক।

উপমন্যুকে বলা হয়নি, কিন্তু ওকে কি বলা হয়েছিল? রিনার মনে নেই। কত কথাই তো গলগল করে বলা যায়। হিসেব থাকে কি? কিন্তু বিবাহবার্ষিকীর উপহার নিয়ে রিনা খুবই রাগারাগি করেছিল। 'এমন করছ যেন বিয়েটা তোমার সঙ্গেই হয়েছে!' মুখটা বেচারির একটু ম্লান হয়ে গেল, কিন্তু হারবার পাত্র তো নয়, অমনি ঝলমল করে বলে উঠল, 'আমার না হোক তোমার তো বটে! আর বিয়ে একটা আনন্দের, একটু বেশ শুভ ব্যাপার! উপহার দিতে ইচ্ছে হল, চোখ চকচক, ঠোঁট তুলতুল দেখতে ইচ্ছে হল!'

বলল আর রিনা অমনি গলে জল হয়ে গেল।

'হারুর মা, কেউ কি এসেছিল, আজ দুপুরে?'—উপমন্যুর ভাবটা যেন এই হঠাৎ কথাটা মনে হয়েছে তাই এমনিই জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ভেতরটা তার উৎকর্ণ-উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

হারুর মা-ও তেমন, হেঁকে বলল 'অ বউদি দুপুরে কেউ এয়েছিল নাকি?' বাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আমার তো পেটে ভাত পড়লেই ঘুম ধরে গো বাবু।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে—' বিরক্ত গলায় বাবু বলেন।

অবশেষে নিজেরই এক বন্ধুকে কাকুতি-মিনতি করে উপমন্যু। কিন্তু কিন্তু করে বলেই ফেলে। খুব ছোটো লাগে নিজেকে। কিন্তু কি করা যাবে, এ যে প্রাণের দায়।

বারীন, প্লিজ, তোর কলেজে সকাল সকাল ছুটিও তো হয়, একটু আমার বাড়িটা ঘুরে যাস।

সে আবার কী? দুপুরবেলা তুই কোথায়?

আমি না-ই থাকলাম, ও তো থাকে?

ও কে? তোর স্ত্রী? রিনা?

হ্যাঁ।

তা আমি হঠাৎ তোর অনুপস্থিতিতে তোর শ্রীমতীর কাছে যেতে যাব কেন? আচ্ছা পাগল তো!

না, মানে এই, অনেকক্ষণ একা থাকে তো! বুঝতেই পারছিস একেবারে যুবতি মেয়ে...একলা।

পাহারা দিতে পাঠাচ্ছিস?

বলতে পারিস।

ব্যাপারটা ঠিক কী বল তো?

না মানে, ওকে আজকাল কেমন কেমন লাগে, যেন মনে হয় ওর লাইফে অন্য কেউ, মানে অন্য কারও প্রবেশ ঘটেছে।

তাই বলো। টিকটিকি লাগাচ্ছ আমাকে। তারপরে আমাকেই সন্দেহ শুরু করবে। মাফ করতে হল ভাই, এসব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই। তা ছাড়া, রিনাই বা কী মনে করবে তোর অ্যাবসেন্সে গেলে?

কথাটা সত্যি।

তবু বন্ধুর পীড়াপীড়িতে রাজি হয়ে যায় বারীন।

ভর দুপুরবেলা রিনায় বেল বেজে ওঠে 'কুব-কুব-কুব-কুব।' খুলে 'আরে আপনি? কী ব্যাপার?'—আলুথালু রিনা বলে ওঠে।

'আর বলবেন না, সাংঘাতিক জ্যাম। এক ঘণ্টা বাসে বসে বসে তিতিবিরক্ত হয়ে ঘেমে-নেয়ে নেমে পড়লাম, কোথায় একটু কাটিয়ে যাই ভাবতে ভাবতে উপমন্যুর কথা মনে পড়ল। প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু। এক গ্লাস ঠান্ডা জল খাওয়াবেন?'

'কী আশ্চর্য বসুন বসুন।'—পাখা চালিয়ে দেয় রিনা।

ঠান্ডা জল আনে, চা করবে কি না জিজ্ঞেস করে, মিষ্টান্ন বার করে। তারপর বারীনের আপত্তিতে আবার ঢুকিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর বারীনও কথা খুঁজে পায় না, রিনাও না। বারীন বলে, 'দেখি, জ্যামটা ছাড়ল কি না।'

না রে উপমন্যু, ঠিক দুপ্পুরবেলা গেলাম, এক্কেবারে দি টাইম ফর দি অ্যারাইভ্যাল অফ পরকীয়, তো পৌনে দু ঘণ্টা ছিলাম, কেউ এল না তো, তোর বউকে দেখেও মনে হল না কারও প্রতীক্ষা করছে। খুব সভ্য, ভদ্র বউ তোর, যাই বলিস।

বন্ধুর প্রশংসায় খুশিও হয় উপমন্যু, আবার কোথায় যেন একটু আহতও হয়। বলে, 'এ উপকারটা কর প্লিজ, একটু লেগে থাক।'

'আর একবার গেলে কিন্তু ও আমার সম্পর্কে খুব খারাপ কিছু ভাববে।'

রিনা কিন্তু কিছুই ভাবল না। কারণ বারীনের বেচারি-বেচারি অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত বিরস মুখখানা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে উপবোধে ঢেঁকি গিলছে। খুবই অস্বস্তিতে আছে।

'আজকেও জ্যাম তো?'—রিনা হাসিমুখে বলল, অর্থাৎ ছুতোটা ও-ই জুগিয়ে দিল।

'অসুবিধেয় পড়লে চলে আসবেন বইকি!'—জল এল, শরবত এল। বিকেল গড়াতে চা এল, সঙ্গে ডালমুট, রসগোল্লা, সয়াবিনের ঘুগনি...

তৃতীয় দিন জল শরবত এসব সরবরাহ করে রিনা বলল, 'আপনার জন্যে কতকগুলো পত্রিকা এনেছি, যদি আমি ভেতরে একটু বিশ্রাম করি গিয়ে, কিছু মনে করবেন?'—সে হাতের পাতা দিয়ে একটা হাই আড়াল করল।

চতুর্থ দিন হাজার কাকুতি-মিনতি করেও উপমন্যু বারীনকে আর পাঠাতে পারল না। তবু তো সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে বারীন বিষয়ে রিনার মন্তব্যগুলি শোনায়নি।

'আজ দুপুরে হঠাৎ তোমার বন্ধু বারীনবাবু এসেছিলেন। নাকি ট্রাফিক জ্যামে আটকে হাঁফ ধরছিল।'

একটু চুপ। তারপরে, 'তাই ভদ্রলোক আমাদের বসার ঘরটা জ্যাম করে দিয়ে গেলেন। হাঁফও ধরালেন ফাউ হিসেবে।'

'কেন? তোমার কি কেউ আসার ছিল?' উপমন্যুর ধারালো প্রশ্ন।

'আসবার আর কে থাকবে ভুবন ছাড়া? তা ভুবন তো আর বসবার ঘরে বসে না, বসে কলতলায়। বাসনের পাঁজা নিয়ে।'

আজ না তোমার বারীন-বন্ধু আবার এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প হল, জানো? তুমি ওঁর থেকে নাকি অঙ্ক টুকেছিলে স্কুলে পড়তে, এ মা! তুমি টুকলি?

উঃ আবার বারীন, বুঝলে? তোমার বন্ধুর কি আমাকে মনে ধরল না কি বলো তো! নিজে ঘরে বউ আনলেই তো পারেন, পরের বউয়ের কাছে ঘুরঘুর কেন?

ছি, ছি। বারীন আমার ছোট্টবেলার বন্ধু তা জানো?

ছোট্টবেলার বন্ধুরাই বন্ধুদের বউ নিয়ে বেশি হ্যাংলামি করে।

ইস, নিজেকে ভাবো কি?

কী আবার ভাবব, আমি যা তা-ই। স্রেফ একজন পরের বউ!

এ হেন প্রতিক্রিয়ার পর বাল্যবন্ধুকে টিকটিকিগিরি করতে পাঠানোটা ঠিক বন্ধুজনোচিত কাজ বলে মনে হয় না।

তখন উপমন্যু নিজেই হঠাৎ ভীষণ শরীর-খারাপের অজুহাতে দুপুর আড়াইটের সময় বাড়ি ফেরে। দরজা খুলে দেয় হারুর মা, —বলে ভালোই হয়েছে বাবু আপনি এসে গেছেন, বউদি ভীষণ বমি করতেছে। যা খাচ্ছে উগরে দিচ্ছে, যা খাচ্ছে উগরে দিচ্ছে।

সে কী? কখন থেকে?

কখন মানে? কদিন থেকেই এমন করেতেছে। ধুন্ধুমার বমি।

কী খেয়েছিল? ফুচকা-টুচকা? আলু-কাবলি?

কই, আমি তো দেখিনি বাপু। দেখো এখন ঘরে যাও।

রিনার চোখের কোলে গভীর কালি। যেমন শীর্ণ দেখাচ্ছে। বুকের সামনের কাপড় ভিজে টুসটুস করছে।

কী ব্যাপার তুমি?

তোমারই বা কী ব্যাপার?

বিকেল হতে না-হতেই ডাক্তার মিসেস কারনানি। বললেন, ওহ, অ্যাট লং লং লাস্ট, মি. দত্ত আপনার একটা ছোট্ট অণু পরিমাণ স্পার্ম প্রচণ্ড ফাইট করে তার কাজটি করতে সফল হয়েছে। এখন সাবধান। বিয়ের অনেকদিন পরের কনসেপশন তো!

কালিপড়া চোখ, কিন্তু উদ্ভাসিত, যেন রাজ্যজয় করেছে। উপমন্যু আড়ে আড়ে দেখে। তার বুকের ভেতর পাথর। পাথরগুলোকে ডিনামাইট বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে পারছে না, কিছুতেই পারছে না।

অবশেষে যথাসময়ে একটি সুস্থ, সবল আট পাউন্ডের পুত্রসন্তান প্রসব করে রিনা। কোনো জটিলতা নেই। খুব সহজ নির্গমন। আজকাল চট করে এমনটা দেখাই যায় না। বিশেষ করে এত পরের জাতক। বাচ্চাটার কান্নাটাও অদ্ভুত! যেন কাঁদছে না। গমক দিয়ে দিয়ে হাসছে।

উপমন্যু যখন শোনে তার পত্নীর প্রসবক্লান্তি কেটে গেছে তখন সে কেবিনে যায়। অস্বস্তিতে নাড়াচাড়া করে উপহারের রজনিগন্ধা। তারপর নীচু হয়ে স্ত্রীর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রাখে। কঠিন অনম্য স্বরে এতদিনের পুষে রাখা প্রশ্নটি করে, 'কে বাবা? বাচ্চাটার?'

চমকে ওঠে রিনা, কিন্তু পরক্ষণেই সরিয়ে নেয় শিশুটির জাতবস্ত্রের ঘোমটা, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চোখে লাফিয়ে ওঠে নির্ভুল প্রতিবিম্ব, তার নিজের।

জিজ্ঞাসা-মুছে-যাওয়া বোকা-বনে-যাওয়া সেই মুখের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকায় রিনা, ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'কে আর? এক মিথ্যে-মিথ্যে-মিথ্যে-উপমন্যু!' এমন করে বলে যেন একই সঙ্গে তার পুত্রলাভ ও পতিবিয়োগ হল।

নাফা

শামতাপরসাদ। না, যাঁকে শান্তাপ্রসাদ তবলিয়া বলা হত, তিনি নন। ইনি নেহাতই শামতাপরসাদ কালোয়ার। বঙ্গালিলোগ শান্তাপ্রসাদ বললে তিনি কখনও কখনও শুধরে দেন। তাঁর ছেলে কামতাপরসাদ সাউ। তাঁরও ছেলে ওম্‌পরকাশ নামের 'ওম'টুকু গ্যাংগ্রিনগ্রস্ত প্রত্যঙ্গের মতো বাদ দিয়ে সে জায়গায় আনল একট আস্ত সুস্থ ইস্পাতশানিত 'জয়', 'পরসাদ'ও সে আর থাকল না, 'পরকাশ' হয়ে গেল। জয়প্রকাশ গুপ্তা।

এরা ফৈজাবাদের লোক। সেই যে উত্তরপ্রদেশ, অযোধ্যার কাছাকাছি ল্যাংড়া-লুলা, হতদরিদ্র ফৈজাবাদি গাঁও। সেই। আর কালোয়ার? কালোয়াররা খুচরো লোহার বেওসা করে। রেসিডেনশাল এরিয়ার মধ্যেই কুচি কুচি অন্ধকার কুলুঙ্গির মতো গোঁজা এক একখানা বে-সহবত নাঙ্গা দোকান, তার ভেতর থেকে ভিখিরির অপুষ্ট পুরুষাঙ্গর মতো রাশি রাশি লোহার রড বেরিয়ে আছে। একখানা পাথরের খণ্ডর ওপর টকটকে লাল একটা জিনিস রেখে উলটেপালটে যাচ্ছে এক যমদূত, আর একজন পেল্লাই হাতুড়ি দিয়ে তাকে পেটাচ্ছে। এরকম ছবি প্রাগৈতিহাসিক সময়ের ছবিতেও আমরা হিস্ট্রি বইয়ে আকছার দেখেছি। তা জিনিসটা কী? অবাধ্য আত্মা-টাত্মা না কি? উহুঁ, নেহাত ছেলেমানুষেও জানে ওটা লোহা। লোকদুটোও যমদূত নয় স্বভাবতই, কালোয়ারের ভাড়া-করা মজদুর, খিদমতগার, কখনও বা কালোয়ার নিজেই। লোহা পিটিয়ে পাত বানানো হচ্ছে। রাস্তাটা জনগণের সব্বাইকার, সুতরাং জনগণের প্রত্যেকেরও, আপনারা জানেন বোধহয়। সেই রাস্তার ধারে দেখা যাবে লোহার পাতের জায়গায় জায়গায় কী যেন একটা যন্তর ধরা হচ্ছে। শোঁ শোঁ আওয়াজ, গাঁক গাঁক নীল আলো, না না, কোনো রামদিন বা আলাদিনের দৈত্য নয়, ওটা অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস, লোহার সঙ্গে লোহা জোড়া হচ্ছে। ওয়েল্ডিং।

তা, এই লোহার বেশিরভাগটাই আবার চোরাই। অনেক রাতে শামতা-কামতাপরসাদের কুলুঙ্গি দোকান ও তৎসংলগ্ন টিনের চালের ঘরের সামনে শোনা যাবে ঝনঝনঝনঝন ঝনঝনঝনঝন, আগে পিছে চলন্ত হেভি ট্রাকের মুখ চেপে ধরা গোঁয়ার আওয়াজ। কী রে বাবা? পড়ছেটা কী? আলিবাবার মোহর? তার আওয়াজ তো আর একটু মিঠে হওয়ার কথা! উহুঁ! মোহর নয়, কিন্তু মোহরের কাছাকাছি কিছু তৈরি করবার উপায়। ওগুলোই চোরাই লোহা। কিছু পয়সা খেয়ে লরি-ড্রাইভার খানিক লোহা ফেলে দিয়ে যায়। ড্রাইভারেরও কিছু হল, কালোয়ারেরও কিছু হল। ভেজনেওয়ালা, লেনেওয়ালা উভয়েই জানে কিছু মাইনাস ধরতেই হবে, এমনটা হয়ে আসছে, এমনটাই হওয়ার কথা। লিভ্ অ্যান্ড লেট লিভ্। খারাপ কিছু?

কিন্তু বালক বয়সেই জয়প্রকাশের এই দুপুররাতের ঝনঝনানি সাক্ষাৎ কুম্ভীপাক নরকের আওয়াজ বলে মনে হতে থাকে। কারণ, প্রথমত তার অ্যাংলো-স্যান্সক্রিট স্কুল, আর দ্বিতীয়ত তার প্রতিবেশী গৌতম সরকার, তার চেয়ে কিছু বড়ো এক বালক, বা কিশোর, তার মতো খাঁটি গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু চোখেমুখে কথাবার্তায় খুব ধার। পরদিন সকালে উঠেই সে জয়প্রকাশকে

জিজ্ঞেস করবে কি না, 'কী রে জয়? কাল রাত্তিরে তোর ঠাকুর্দার গো-ডাউনে আবার চোরাই মাল এল? বেশ ঘন ঘন আসছে দেখছি, এবার তোদের টিনের চালি পাকা হয়ে যাবে, দ্যাখ।' বলতে বলতে ফিচকে হাসি হাসবে গৌতম।

একটা বোবা রাগে তখন জ্বলে জয়প্রকাশের তনুমন।

'তাজ্জব কি বাত? চোরাই? চোরাই হতে যাবে কেন?'

'মাঝরাত। বুঝিস না? আমাদের এ রাস্তা দিয়ে ট্রাক চলে? পুলিশকেও কিছু দিয়ে ঢুকেছে। আর কিছুই যদি না বুঝিস, তো দাদুকে জিজ্ঞেস করিস, বাবাকে জিজ্ঞেস করিস! আব্‌বার কয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজছিস?' এক তাড়া দেয় গৌতম।

কয়লাগুঁড়ো! কলোয়ারের বাড়ি কয়লার গুঁড়ো ছাড়া আর কিছুই দাঁত মাজবার জন্য সরবরাহ করবেন না জয়প্রকাশের দাদা বা বাপজি। এক যদি লোহাচুর দেন। জয়প্রকাশ নয়, জয় জয়, জয়। গৌতমদাদার শত ধিক্কার অবজ্ঞা, খামখা নাক গলানো, গালাগালি সব সে মাফ করে দিতে পারে ওই নামটুকুর জন্যে। জয়! কী মধুর! কী সম্মানের। যেন অন্য কোনো সাফসুতরো জগতের অন্য কোনো দেবোপম বালকের নাম। কয়লাগুঁড়ো দিয়ে দাঁত মেজে মেজে যার দাঁতের চটা উঠে যায়নি, যার বাড়ির চালি জন্ম ইস্তক পাকা। রীতিমতো দোতলা হাবেলি, যার বাড়ির সামনে অন্ধকার কুলুঙ্গির মতো দোকান নেই, আর...আর যে দোকানে রাত্তিরে ঝনঝনঝনঝন লোহা পড়ে না। চোরাই কিংবা অ-চোরাই।

সুতরাং এই ছেলে যে শুধু জয় গুপ্তা না হয়ে জয়প্রকাশ গুপ্তা হয়েছে এই-ই তার তিন চোদ্দং বিয়াল্লিশ পুরুষের ভাগ্যি। দাদাজি অর্থাৎ শামতাপরসাদ গোড়ার থেকেই তাঁর বউমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'বহু, পোতাটাকে বড়োলোকের বাড়ির লড়কাদের সঙ্গে মিলতে মিশতে দিয়ো না ওরা আমাদের ছোটো নজরে দেখে।'

সাত হাত ঘোমটার ভেতরে থেকে কাঁসার কাঙ্গন বাজিয়ে বহু বলত, 'দিলে কী হয়? এক ইস্কুলে যায়, বড়ো হাভেলির লড়কা হলে হবে কি মোটেই ছোটো নজরে দেখে না। কতরকম শিখায় আমাদের লড়কাটাকে। এক টিব-পুরা মাজন কিনে দিয়েছে ওকে তা জানেন? বলেছে যতদিন তোর দাদা তোকে না কিনে দেন, আমি দেব। আমাদের লড়কার রকমসকম বদলে গেছে, ভদ্দর আদমি বলে মনে হয়।'

এখন সেটাই তো সবচেয়ে শঙ্কার কারণ জ্ঞানবৃদ্ধ শামতাপরসাদের। পড়ালিখা কিছু শিখতেই হয়, নইলে বেওসায় ঠকে যেতে হবে, নুকসান। সহবতও কিছু শিক্ষণীয়। সে অবশ্য তাঁদের আছেই। আসতে নমস্তে, যেতে নমস্তে। হাত জোড়। মুখে দরবিগলিত হাসি। এ সমস্তই মন্তর। তা এসব তো ছেলেকে, পোতাকে ছোট্ট থেকে তাঁরা শেখানই। কিন্তু এরপর যদি বলে এ লোহা কি দুকানে বসব না, অন্য কাম করব! দেখেন তো এ মুলুকের ছেলেপিলেদের। বাপ-মায়ের প্রাণান্ত খরচ করিয়ে এতগুলি পাস দেয় এরা, তারপর দু পয়সার কেরানিগিরির জন্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করে। সে নোকরি পেলে আবার গলায় টাই-মাই ঝুলিয়ে হাতে ব্রিফ-বাক্স, দশটা পাঁচটা করে। নিজেদের বলবে—অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেলস এগজিকিটিব। তিনি মনে মনে হাসেন, ঘাসে তো আর মুখ দিয়ে চলেন না। তাঁর খাটিয়ার তলায়, কোমরের গেঁজেতে অমন হাজার হাজার টাকা গোঁজা আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি এ কোঠির টিনের চালি সরিয়ে ঢালাই ছাদ বানিয়ে নিতে পারেন, এমন একখানা দুখানা হাবেলিই কি পারেন না? কিন্তু তাঁর এতেই চলে যায়। লোহার কালো গুঁড়ো আর রাস্তার ধুলো মাখা ময়লা ধোতি, চোখের কোণে পিচুটি, সব্বাইকার চোখের সামনে

বসে তিনি মজুর খাটান, একটা পয়সা বেশি কাউকে দিতে কালঘাম ছুটিয়ে দেন। সবার সামনে এই দড়ির খাটিয়াতেই তার দুপুরের খানা আসে—পিতলের কাঁসিতে চার-পাঁচখানা গেঁহু কি চাপাটি আর মোটা মোটা সিমলাই লংকার আচার। তাঁর মজুরদের থেকে বেশি কিছু না। লোটা ভর পানি পিয়ে নেন। বাস মহাপ্রাণী শান্ত। আবার কী চাই? ইনকামট্যাক্সঅলারা দূর থেকে পালায় এখন। গেঁজের টাকার কথা ঢালাইয়ের ছাদ বানিয়ে জানান দিলেন আর কি। বাস করেন যে কোঠিতে তা ছিল এক বুড়টি বেওয়ার, বেনারস থাকত। সেখান থেকেই ভাড়া করে আসেন। যতদিন বেঁচেছিল ভাড়া গুনেছেন, সে মরে যেতে তার ভাইপো-ভাগ্নেদের এখানে দাঁত ফোটাতে দেননি কিন্তু। কার্যত সুতরাং এ কোঠি তাঁর। কে কতদিন টিনের চালির গো-ডাউনের উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়া করবে, সব কেটে পড়েছে। একটা পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় না। কর্পোরেশনের খাতায় এ কোঠির কোনো অস্তিত্বই নেই। জল ফ্রি, বিজলি নিয়েছেন রাস্তার তার থেকে হুক করে। তা-ও সবসময় জ্বলে না, বলেন, 'বিল উঠবে, বিল উঠবে।' বহু বা পোতা অতশত জানে না, তাড়াতাড়ি করে রসুই, পড়ালিখা সব সেরে নেয়। কিন্তু ছেলে তো জানে। সে একটু অবাক হয়ে তাকায়। 'বিল উঠবে? ক্যা বিল? কিসকা বিল?' পরক্ষণেই তার মুখে একটা বোঝার হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। বাপজি এই বুঢ়াপাতেও তাকে কত কিছু শিখলাচ্ছেন, সাব্বাশ পিতাজি। যে বিজলি বিল উঠবে করপোরেশনের, কিংবা কোনো অজানা কোঠির কোঠিয়ালের সেই বিলের দোহাই পেড়ে তিনি লোককে এবং আপন পরিবারকে জানাচ্ছেন তাঁর বিজলি খরিদ করা বিজলি। মাঙনা নয়, আবার সংসারে খাওয়া-পরা-শোয়ারও একটা ডিসিপ্লিন আনছেন। ওয়াহ্, ওয়াহ্।

তা, শাম্‌তা বা কাম্‌তা কেউই এসব কথা বহু বা জয়পরকাশকে বলতে যান না। বলেন, 'মছলিখোর বঙ্গালি, মছলি খেতে শিখবে, নাস্তিক বঙ্গালি, ভগোয়ানকে মেনে চলবে না। বুঢ়া বাপ-মা-দাদার কদর সম্মান করবে না।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? বহুও না পোতাও না। বহু দুপুরবেলা অর ঘুংঘট খুলে রসুইঘরের চাতাল থেকে গৌতমের মা-জেঠিমাদের সঙ্গে লংকার আচার আর ভিসিটিব্‌ল চপের রেসিপি দেওয়া-নেওয়া করে। নাকের বেসর খুলে রাখে। প্রথমে বলে নাকে লাগে, পরে বলে শরম লাগে। আর জয়পরকাশ—গৌতমদাদার দেওয়া টুথপেস্টে মেজে, ওরই মতো ঝকঝকে হয়ে ইস্কুলে যেতে যেতে সম্পূর্ণ বাঙালি টোনে বলে, 'গৌতমদা লেফ্‌ট হ্যান্ডার ব্যাটকে রাইট হ্যান্ডার বোলার দিলে কার সুবিধে কার অসুবিধে হয় আমাকে বুঝিয়ে দাও তো!'

কিংবা,

কাল অঙ্ক সার আমায় এমন কড়কালেন এক ক্লাস ছেলের মধ্যে! সুদ্ধু বাবার জন্যে। কিছুতেই আমাকে ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স কিনে দেবেন না।

আমি তোকে আমার পুরোনোটা দিয়ে দিতে পারি।

উহুঁ, তা কেন? আমি কেন তোমারটা নেব? কেনবার ক্ষমতা না থাকলে আলাদা কথা...

গৌতম বলে, 'আমার আর একটা নতুন আছে। এটা এক্সট্রা, আগেকার। তবে তোর যদি মনে লাগে জয়, লাগতেই পারে, তা হলে আমার বলার কিছু নেই। আসলে কী জানিস, এ তো গরিবের ভিক্ষা নেওয়া নয়, বড়োরা অবুঝ হলে, ছোটোদের পরস্পরকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেই হয়।'

জয়, জয়, জয়। কী সুন্দর। কী মধুর। কী ভদ্র। এভাবেই জয়পরকাশ হয়ে ওঠে জয়. পি. গুপ্ত। এভাবেই স্কুলফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারি, বিকম সে পাস দিয়ে ফেলে। খুব ভালোভাবে না হলেও খারাপভাবেও নয়। জয়. পি. গুপ্ত। সে যখন বি. কম পাশ করছে তখন তার দাদাজি পঁয়ষট্টি বছর

বয়সে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় দেহ রেখেছেন, বাবা বাড়িটাতে আর. সি. সি.-র ছাদ তৈরি করে ওপরে ছেলের জন্য একটি কামরা এবং নাহা-কামরা বানিয়ে দিয়েছেন। তাতে বিজলি বাতি, ফ্যান, টি.ভি.—সব এবার সি.ই. এস. সি-র নিয়মমাফিক। সে বাঙালিদের মতো মাছ-মাংস খেতে ভালোবাসে, খায়। তবে বাড়িতে নয়। তার ছোটোবেলাকার বন্ধু সেই গৌতমদারা আর এখন পাশের বাড়িতে নেই। শরিকি বিবাদে তাদেরই কাছে বাড়ি আধা দামে বিক্রি করে কোথায় চলে গেছে। কিন্তু জয়ের অনেক ইচ্ছে সত্ত্বেও কামতাপরসাদ সে বাড়িতে উঠে যাননি। খালি বলেন, 'পাপ হোবে, পাপ হোবে।' বাড়িটা তিনি ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। বাড়িভাড়ার পুরো টাকাটা এখন জয়ের হাতখরচ।

কেন ও বাড়িতে থাকতে যাবেন না এর সপক্ষে যুক্তির জন্য ছেলে কিন্তু তাঁকে কচ্ছপের মতো কামড়ে থাকে। উঠতে বলে, বসতে বলে, শুতে বলে। অবশেষে জেরবার হয়ে কামতাপরসাদ ইতস্তত করে বলেই ফেলেন কথাটা। তাঁদের বসতবাড়ি ও গো-ডাউন গৌতমের ঠাকুরদার কাছে বাঁধা রেখে অনেক টাকা ধার করেছিলেন একসময় শামতাপরসাদ। তাতেই তাঁর কারবার বিশেষরকম ফলাও হয়। কিন্তু তার পরেই আসে সাংঘাতিক মন্দা। তিনি সে টাকা আর ফিরিয়ে দিতে পারেননি। শামতা তা পারেনইনি, কামতাও পারেননি। অবশেষে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে গোরুচোরের মতো মুখ করে কামতা যান গৌতমের ঠাকুরদা সেই দ্বিজুবাবুর কাছে।

'বাবু, আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন।'

দ্বিজুবাবু ইতিমধ্যে তিনবার সময় দিয়েছেন কামতাকে। কামতা একটা পয়সাও ঠ্যাকাননি। আজ হাজারখানেক এনেছিলেন।

ময়লা গেঁজে থেকে টাকা বার করতে দ্বিজুবাবু সেগুলো হাতে নিয়ে বলেন, 'এ যে লাখ টাকার পনেরো বছরের এক বছরের ইনটারেস্টও হয় না হে!'

'তা হলে?', কামতার বুক গুরগুর করছে।

'তা হলে এই।' দ্বিজেনবাবু তাঁর সিন্দুক থেকে বন্ধকি কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজের ফাইলটা এনে কামতার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, 'তুমি আমার কতকালের পড়শি কামতা, তোমার ভিটেমাটি চাটি করে আমি কি নরকে যাব?' যাও, এ সব নিয়ে যাও। তোমার ও টাকা আমি ছেড়ে দিলাম। বিপদের দিনে পরস্পরকে যারা দেখে তারাই হল পড়শি। আমি যেমন তোমার, তুমিও তেমনি আমার।

টাকা না নিয়ে যে দলিল ছেড়ে দিলেন এ কথা দ্বিজুবাবু নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বলেননি। ছেলেদের তো দূরের কথা। তিনি তার কিছু পরেই মারা গেলেন। ক্রমে তাঁর স্ত্রীও মারা গেলেন। ধীরে ধীরে ওদের পার্টিশনের ব্যবস্থা হল। কামতা দরাদরি করে বাড়িটা আধাদরে কিনে নিলেন। তখন সরকারবাড়ির সব ভিন্ন হবার জন্য ব্যস্ত। পৈতৃক সম্পত্তি কত দামে গেল সে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কামতা বলেন, 'বাড়িটা তো পুরোনো হল কি না, পঁয়তাল্লিশ বছর ভরে গেল, ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে আর কী আছে? বাড়ির তেমন ভ্যালু নেই। ভাঙতে বরং খরচা। জমিটুকুরই যা দাম। তা পাঁচ কাঠার উচিত মূল্যই আমি দেব। পড়শি বলে আপনারাও একটু কনসিডার করুন।'

বাস, মার্বেলের মেঝে, সেগুন কাঠের দরজা জানলাসুদ্ধ পুরনো বাড়িটা আধা দরে কামতার হয়ে গেল।

এত কথা খুলে অবশ্য তিনি ছেলেকে বললেন না। শুধু বন্ধকি কাগজপত্র ফেরত পাওয়ার কথাটাই বললেন। ও কোঠিতে থাকলে বুঢ়াবাবু আমার উপর গুসসা হোবেন। আমার কোঠি তিনি

ফিরিয়ে দিলেন, তিরিশ বছর আগেকার সেই লাখ টাকা এখন সুদে আসলে কত হয় কে জানে বাবা, ও বাড়িতে আমরা থাকতে যাচ্ছি না।

ছেলের কাছ থেকে ঘেন্না, কিছু রি-অ্যাকশন, অন্তত কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেসব কিছু এল না। জয় পি. গুপ্তর গম্ভীর মুখ দেখে তার ভাবান্তর অন্তত কামতাপরসাদ সাউ কিছুই ধরতে পারলেন না। ভয়ে ভয়ে যখন ও বাড়ির সাড়ে চার হাজার টাকা ভাড়াটা ছেলের হাতে হাতখরচা বলে তুলে দিলেন, তখনও সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। হাত পেতে নিল টাকাটা। এবং নিয়েই যেতে লাগল চুপচাপ। এবং ঠাকুরদাদার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করে সে কিছুতেই সেই লোহার দোকানে বসল না।

ঠাকুরদার অন্য ভবিষ্যদ্বাণীটাও সত্য হয়েছিল। কিন্তু কামতাপরসাদ সে কথা জানতেন না। জয়প্রকাশ চাকরি খোঁজা শুরু করে দিয়েছিল। সেই কণ্ঠ-ন্যাঙট বাঁধা—হাতে বই বাক্‌সো-টাইপের চাকরি। কিন্তু ভালো কোথাও সে কিছু পেল না। সাড়ে চার হাজার টাকা যে হিসেবহীন মাসোহারা পায় তার তো খুব অল্পস্বল্পের চাকরি পছন্দ হবার কথা নয়। সরকারি অফিসের তো কথাই নেই, এক্সচেঞ্জ ছাড়া সেখানে ঢোকাই যায় না। কেতাদুরস্ত মার্চেন্ট অফিসগুলোও তাকে ফেরাল। মারোয়াড়ি ফার্মে সে পেয়ে যেত, যদি মারোয়াড়ি হত। কিন্তু সে তো ফৈজাবাদি, উত্তরপ্রদেশীয়। এরা ও মারোয়াড়িরা পরস্পরকে তাচ্ছিল্য ও অবিশ্বাসের চোখে দেখে। সে রোজগার ছেড়ে অন্য ধান্দায় মন দিল।

তার, সত্যি কথা বলতে কি, এখন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। চারদিকে কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। নবনীত কোমল। কত রকম। পাকা ধানের রং, কাঁচা ধানের বং, গেঁহুর মতো, জওয়ানের মতো, চিনেমাটির ফুলদানির মতো, জ্যান্ত একেবারে জ্যান্ত। ধরতে চাইলেই ধরা যায়। সাড়ে চাব হাজার তো হাতেই, তা দিয়ে কিনতেও পাওয়া যায়। কিন্তু তার অত দুঃসাহস নেই। অসুখের ভয়েই হোক, আর ধরা পড়ার ভয়েও-হোক সে ব্লু ফিল্‌ম এবং স্বমেহনেই ক্ষান্ত রইল। হুইস্কির পেগে চুমুক দেয়, নীল ছবি দেখে, আর শরীরের নিম্নাঙ্গে তার হাত চলে যায়। কিছু বন্ধুবান্ধবও জুটল। তারাও একই পথের পথিক। একসঙ্গেই সব কিছু উপভোগ করে।

শেষে একদিন তার মা কপাল চাপড়ে সাশ্রু নয়নে কামতাপরসাদকে বললেন, 'আমাদের বহু কি আনবে না? বেটা যে হয় যোগী নয় জাহান্নমবাসী হতে চলল।'

শাদি? কামতা আকাশ থেকে পড়লেন। শাদি আর এমন কি ব্যাপার? তিনি হাত ঝাড়া দিলে অমন একশোটা শাদি হয়ে যাবে। তো ছেলেকে রাজি করাও। তাঁর ধারণা ছিল রাজি হবে না। ছেলে কিন্তু দু-চারবার নিয়মরক্ষার 'না, না'করেই রাজি হয়ে গেল, খালি মাকে বলল, 'কুৎসিত মেয়ে সে শাদি করবে না। সুন্দর চাই।'

তো তারই বা অভাব কী? ফৈজাবাদি আওধওয়ালিদের মধ্যে কী সুন্দর নেই? একেবারে দেশঘরের আসলি ঘিউয়ের মতো আসলি সুন্দরীই জোগাড় হল। খোসা ছাড়ানো ঘিয়ার মতো রং। কুচকুচে কালো চুল। গালের ভাঁজে নাক-চোখ দুই-ই ডোবে, ডোবে। চোখের তো দরকার নেই। তিন হাত ঘোমটা। আর নাক তো গহনা পরবার জন্য, নাকে নথ উঠল, হিরের নাকছাবিও উঠল। হাতভরতি কাচের চুড়ি। সুহাগ রাতের সুহাগের অত্যাচারে সেই সুহাগনের কাচের চুড়ি যখন মটমট করে ভাঙল তখন ফরসা রঙে রক্তের ফোঁটাগুলো চুনির মতো জ্বলছে দেখে বাসনায় জে. পি. গুপ্তর শরীরে আগুন। কিন্তু হায়, ও আগুন তো বারবার জ্বলে না। জড়সড় একটি কাপড়-গহনার পুঁটলি, তিন হাত ঘোমটা, একটি মোটাসোটা তাকিয়া ছাড়া জয়প্রকাশ আর কিছুই পেতে

পারল না। না দুটো কথা, না একটা সলাহ্, একটা দুটো শায়রি কি গানা, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। খালি বছর বছর পয়দা হতে লাগল নাকে পোঁটা, যেখানে-সেখানে পিসাবকরনেওয়ালা, ন্যাংটা হ্যাংলা, ভোঁদাটে ছেলেপিলের পাল। তাদের মধ্যে মেয়েগুলোকে দেখলে জয়প্রকাশের আরও ঘিন্না লাগে। এগুলোও তার কাছ থেকে কাপড়-গয়নার পুঁটলি হয়ে আর কারও ঘরে যাবে, চিত হবে আর আরও একপাল শূকর শূকরী পয়দা করবে।

কিন্তু শাদিসুদা মানুষ, তার ওপরে বাপ হয়েছে, কামে-কাজে তো যেতেই হয়। অতএব কামতা ও কামতানির ইষ্টসিদ্ধি হল। জে. পি. গুপ্ত বাপের ভাঙা লোহার কারবারে গিয়ে বসল। তবে তার চেহারা বদলে দিল সে। এখন লোহার গুদাম আলাদা, অফিসঘর আলাদা, অফিসঘরে সানমাইকা-ঢাকা টেবিল, রিভলভিং চেয়ার। ভেপার ল্যাম্প জ্বলে। আরও নানান [illegible] [illegible] করতে লাগল সে। এই ভাঙা চোরাই লোহার খাঁচা থেকে তাকে বেরোতেই হবে, হতেই হবে নিয়মনিষ্ঠ ভদ্র ব্যবসায়ী, খানদানি ভদ্রলোক। মানিয়ে নিচ্ছে সে, মানাতেও বাধ্য করছে ক্রমাগত। তার মা ঘুংঘট ছেড়েছেন, খোঁপার ওপর আর তা ওঠে না, বাপ ভদ্র পোশাক পরিচ্ছদ পরছেন। সেই পড়ে-পাওয়া কোঠাবাড়ি এখন হয়েছে মোজেইক করা দোতলা, দোতলায় শুধু তার বসবাস। একতলায় খাবার টেবিল, গ্যাস, ফ্রিজ, গ্যারাজে মোটর সাইকেল, আধুনিক জীবনের সকল অনুষঙ্গে সে ভরিয়ে দিচ্ছে বাড়ি। তবু বাড়িতে ঢুকলেই তার মাথায় খুন চাপে। একটি জড়পুঁটলি এগিয়ে এসে জুতো খুলে দেবে, মোজা খুলে পাটসাট করবে, ফ্যান থাকা সত্ত্বেও কোথা থেকে একটা ঝালর দেওয়া গোলমতো দেশোয়ালি পাখা এনে একটি হাত বার করে হাওয়া করবে যেন একহেতে পেতনি। শূকরের পাল—নোংরা, সর্দিঝরা নাকে কেউ উলঙ্গ, হামা দিতে দিতে কেউ টলটল করতে করতে, কেউ আবার দিব্যি ছুটে কিংবা হেঁটে বাপকে তাদের দৈনিক আদর সোহাগ জানাতে আসবে। তাদের মা তাড়া দেবে, কিন্তু তারা নড়বে না, অবশেষে তার পকেট থেকে লজেন্সের ঠোঙা বার হলে একটা একটা নিয়ে পশ্চাদপসরণ করবে।

যাচ্ছেতাই একটা গালাগাল সে চাপা গলায় উচ্চারণ করবে, তার স্ত্রী পাখাধরা হাতটা একটু জোরে জোরে নড়বে। স্বামীর পৌরুষে সে ভীত এবং প্রীত। ওদিকে মা তাঁর হনুমানজির পরসাদসমেত লাড্ডু-কচৌরির ভোজনের থালি নিয়ে এসেছেন এবং বহুর দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন। যেন মা না দিয়ে বহু দিলে খাবারগুলোর বিশ্রীত্ব একটুও দূর হবে।

রাত্তিরে পুঁটলিটি খানিকটা পদসেবা করবে তার, তারপর পরম কর্তব্যবোধে পতিদেবতার বুকের কাছটিতে আরও পুঁটলিকৃত হয়ে শুয়ে পড়বে। কী বলবে, জয়পরকাশের মনে হয় লাথ মেরে ওই পুঁটলিকে সে খাটের বাইরে ফেলে দেয়। কিন্তু কী করে, সে তো খানদানি হতে চাচ্ছে কিনা, তা ছাড়া ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলেই একসময়ে জ্বলবেই, বহুদিন আগে মহাজনরা বলে গিয়েছেন।

তবে ধীরে ধীরে লোহার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার সেই উচ্চাকাঙক্ষা তার ফলতে লাগল। পুরোনো জিনিসই। কিন্তু এখন সে কেনে পুরোনো জাহাজ। কেনে আর তাকে ভেঙে তার লোহা, কাঠ, নাটবল্টু স-ব বেচে দেয়। এই কেনাবেচা করতে করতে ক্রমে তার মাথা এমনি পাকা হয়ে উঠল যে সে জলের দরে জাহাজ কিনে ফেলতে লাগল। একটার পর একটা। কামতাপরসাদ গোড়ার দিকে ভয় পেয়েছিলেন, এ কলেজে পড়া বেটার দ্বারা বেওসা হবে কি না হবে। তারপর যখন সে জাহাজ কেনা ধরল আতঙ্কে তাঁর মহাপ্রাণী খুবই লম্ফঝম্প করেছিল। কেননা টাকাপয়সা একগাদা লগ্নি করেই বেওসা করবে তো তোমার নাফা হবে কেন? তাঁর ক্যাপিটাল থাকত প্রায়

শূন্য। তাই নাফার পরিমাণ আর পার্সেন্টেজ হত চমৎকার। প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট। তা বেটা তো তাঁর নয় দেখা যাচ্ছে, কোনো সাধুসন্তের হবে। সে তো চোরাই জিনিস ছোঁবে না।

এই সময়ে একদিন জে. পি-র বন্ধুস্থানীয় এক সুরজলাল তাকে বলল, 'বড়ো বড়ো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। বাড়ি তো নয় প্রাসাদ। তা সেসব বাড়ির জানলা, দরজা, ইটালিয়ান মার্বেল, টাইলস, মূর্তি, ফার্নিচার...সবই আচ্ছা আচ্ছা চিজ। সে যদি কিনে নেয় এক লটে তো বহোৎ নাফা আসবে। কথাটা জয়পরকাশের মনে ধরল। সুরজ তার বন্ধুলোক। চাটার্ড অ্যাকাউন্টেট-এর কাম করে, কিন্তু মার্কিট সম্পর্কে তার ধারণা খুব ভালো।

এইরকম এক বাড়ির মাল কিনতে গিয়ে ক-দিন তার এক অদ্ভুত দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাঙা বাড়ির রাশীকৃত জঞ্জালের মধ্যে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন! ভদ্রলোক ফরসা, ভদ্রমহিলা আধা-ফরসা। ভদ্রলোক অনেকটা লম্বা। ফুট ছয়েক হবেন, আদ্দির পাঞ্জাবি আর কুঁচোনো ধুতি পরা। মহিলাও তাঁর সঙ্গে মানানসই, এত সুন্দর কুঁচি দিয়ে কালো পাড় একটি হলুদ কি নীল শাড়ি পরেন যে জয়প্রকাশের একটা অদ্ভুত সম্ভ্রম বোধ হত। একদিন, দুদিন, তিনদিন, সে সেদিন একাই ছিল, একটু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নমস্তে, আপনারা কি কুছু খুঁজছেন?'

ভদ্রলোক তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'আপনি...মানে তুমি, জয় না?'

'জয়' নামটা বহু বহুদিন পর শুনল সে। সুরজরা তো শুধু পরকাশ বলেই ডেকে থাকে।

সে এবার বলল, 'আপনি আমাকে চিনেন?'

বাঃ চিনব না? গৌতমের কত বন্ধু ছিলে। দিনরাত তো আমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতে।

আপনি?

আমি গৌতমের বড়দা, এখনও বুঝতে পারছ না?

ও হো হো, আপনি সেই দুশমনদা, হায় হায়!

জয় নীচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি হাত দুটো ধরে নিলেন। হা-হা করে হেসে বললেন, 'শুনছ, আমার নাম এরা কী দিয়েছিল? দুশমন! গৌতমটা এত শয়তান ছিল! ওর শয়তানি সব আমি কাকাবাবুর কাছে ফাঁস করে দিতাম, মাস্টারমশাইদের বলে দিতাম কিনা তাই আমাকে ও দুশমনদা বলত! তা জয়, তুমি তো বাংলা বুলি বেশ ভালোই বলতে!'

'জয়' সম্বোধনে পুনঃপুলকিত হয়ে জয় বলল, 'এখনও তো বলি। বলতে পারি। তবে বলবার সুযোগ তো হয় না! বাঙালিরাও আমাদের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে কথা বলেন। তা দর্শনদা, কী ব্যাপার?'

সুদর্শন বললেন, 'আগে তোমার বউদিদির সঙ্গে পরিচয় করো। শিপ্রা, এ হল সেই জয়, তোমাকে বলতাম না আমাদের পাশের বাড়ি থাকত। আমাদের পুরানো বাড়ি গো...সেই যখন যৌথ...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ' হাসি-হাসি মুখে ভদ্রমহিলা বললেন।

জয়প্রকাশ বুঝতে পারল দর্শনদা কোনোদিনই তার বা তাদের কথা স্ত্রীকে বলেননি। বলবেনই বা কেন? ওঁরা অনেকদিন ওখান থেকে চলে গেছেন, অনেক বছর পার হয়ে গেছে। তা ছাড়া তার বন্ধু ছিল গৌতমদা, সে হলে হয়তো তার স্ত্রীকে বললেও বলতে পারত। কিন্তু এই ভাবিজি স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে অমন বড়ো করে হ্যাঁ হ্যাঁ করলেন।

সে জিজ্ঞেস করল, 'গৌতমদা কোথায়?'

'সে তো বহুদিন ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছে। সেখানেই ডাক্তারি করে, সেখানেই বিয়ে শাদি করেছে। আসে মাঝে মাঝে...'

তা আপনারা এখানে? কী ব্যাপার দাদা?

আর বলো কেন? শিপ্রার বাবার বাড়ি এটা। বিক্রি হয়ে গেল।

শিপ্রাভাবি যেন কেমন একরকম করে দাদার দিকে চাইলেন। পুরো চোখে চেয়েই আবার চোখটা ফিরিয়ে নিলেন।

তা সে যাই হোক, এসো আমার বাড়ি একদিন...ভালো কথা তুমি এখানে কেন?

আমি এই ভাঙা বাড়ি কিনেছি দাদা।

'আচ্ছা!' —অবাক হয়ে উনি বললেন, 'কিনেছ!'

আজ্ঞে।

কী করবে?

এই সব কাঠকাঠবা, জাফরি, মার্বেল সব আলাদা আলাদা দামে বিক্রি হবে দাদা।

ভাবি তখন দাদার দিকে চেয়ে মিনতির সুরে বললেন, 'তা হলে ওঁকে বলো না!'

'কী হবে?' দর্শনদা হাত উলটোলেন।

কী ব্যাপার? বলুনই না!

দর্শনদা বললেন, 'আরে ওঁর কিছু প্রিয় ছবি ছিল বাড়িতে। সে ছবিগুলো তো উনি বিক্রি করেননি। কিন্তু প্রোমোটাররা সবসুদ্ধ নিয়ে নিয়েছে। ভেঙে চুরে একাকার সব। আমারা ছবিগুলো খুঁজতে আসি। এটা ওটা সরিয়ে, যদি পাওয়া যায়।'

জয়প্রকাশ দেখল ভাবি অন্য দিকে চেয়ে আছেন। খুব সম্ভব, সজল চোখ দুটো আড়াল করবার চেষ্টা করছেন।

আপনি কীভাবে বেচেছিলেন দাদা?

আরে ভাই আমি কি অত কূটকচালে জানি? তবে 'অ্যাজ ইজ হোয়ার ইজ' বেচিনি। বেচেছি 'উইথ ফিটিংস অ্যান্ড ফিক্সচার্স'। এখন তুমিই বলো না ছবি কি ফিটিংস এর মধ্যে পড়ে? ও তো হুক থেকে খুলে নিলেই হয়ে যায়। সে কথা প্রোমোটারকে বলতে বলল, আমি তো বাড়ি কিনেই ভাঙার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। কোথায় কী ছবি আমি জানি না। তো এখন দেখো, তুমি যখন ভাঙার কনট্রাক্ট নিয়েছ, ছবিগুলো তুমি উদ্ধার করতে পার কি না। মামলা-টামলা করাই যায়। কিন্তু এখন আর এর জন্যে মামলার খরচ চালাতে আমি রাজি নই। মানে ক্ষমতা নেই।

'দেখি কী করতে পারি ভাবিজি'—জয় বিনীতভাবে বলল, 'তবে ভাঙার কনট্রাক্ট আমার না। তার জন্য অন্য লোক আছে। আমি ভাঙার পর এইসব মাল কিনেছি। যদি খুঁজে পাই নিশ্চয় আপনাকে দিয়ে আসব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

সল্টলেক পূর্বাচলে সুদর্শন সরকারের ফ্ল্যাট। বেশ প্রশস্ত, সুন্দর। তাতে পুরোনো বাড়ি থেকে কিছু কিছু ফার্নিচার রেখেছেন ভাবি। যেমন ডাইনিং চেয়ার। সেসব কবেকার, কোন্ আমলের ফার্নিচার কিন্তু গ্লেজ দিচ্ছে কী? আলমারিটা অবশ্য বেডরুমে। একবার পর্দা সরিয়ে ভাবি বেরোবার সময়ে এক ঝটকা দেখা গেল। যেমন বিরাট, তেমন সুন্দর।

দর্শনদা বললেন, 'বেশিরভাগই এত বড়ো আর এত ভারী যে আমাদের ভাই সাধ্যে কুলোল না যে রাখি। তোমার ভাবির এজন্য অবশ্য খুবই নালিশ আমার কাছে।'

আকাশি রঙের ডুরি শাড়ি-পরা ভাবি চা দিচ্ছিলেন। এক গোছা চুল হাত দিয়ে সরাতে সরাতে শুধু বললেন, 'আমি কিন্তু আনরিজনেবল নই জয় ভাই। একেবারেই না।'

আচ্ছা দাদা, মনে কিছু করবেন না, আপনি আজকাল করেন কী? এঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন না?

ভাবি তাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে সে তো অনেক দিনের কথা। বিচ্ছিরি ধরনের লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস হল, উনি কাজ ছাড়তে বাধ্য হলেন।'

কোনো চিকিৎসা নেই এর?

চিকিৎসা তো হচ্ছেই, হয়েই চলেছে, কিন্তু রোগটা বাড়ে কমে, একেবারে সারে না।

দু-চারদিন আসাযাওয়া করেই জয়প্রকাশ অবশ্য বুঝে গেল। এই কাজ না করে করেই শ্বশুরের বাড়িটি ফুঁকে দিয়েছেন ইনি। সম্ভবত ওই বাড়ির মূল্য দিয়েই এই ফ্ল্যাট কেনা এবং কিছু আমানত করা—তাতেই এঁদের চলে। ছেলেপুলের কথা তুলতেই দুজনে উদাস হয়ে যান। এ কথা জয়প্রকাশ কিছুতেই বুঝতে পারে না তার পুঁটলি পত্নী যদি তাকে বারো বছরে ছটি সন্তান উপহার দিয়ে থাকতে পারে তা হলে এই পরিপাটি চমৎকার চাঁপা রঙের ভাবিটি কেন এতদিনে একটিও...না, না এসব ভগবানের খেলা।

চিৎপুরের বাড়ির চিত্রের খোঁজও চলেছে, এদিকে জয়প্রকাশও সুদর্শন সরকারের বাড়ির নিয়মিত অতিথি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু না, এই চমৎকার কারুকার্যের নীচু টেবিল সামনে নিয়ে আরামদায়ক মেরুন সোফায় হলুদ কালো কুশনে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকা, মাছের চপ, কি মাংসের কাটলেট রেস্তোরাঁর মতো, কি তার চেয়েও ভালো বানান শিপ্রাভাবি আর চা-টা তো দার্জিলিঙের ফ্লেভারে ভরা। ঢাললে গোটা ঘরটাই সুগন্ধে ভর ভর করে। আর কিছু নয়, হলুদ কিংবা গোলাপি কিংবা আকাশি কিংবা সাদা শাড়ি পরা একজন সভ্য সুশ্রী মহিলা, যাঁর গলার স্বর, ভাষা, চলনের ধরন সবই মানুষকে নেশায় ফেলে দেয়। নেশাও নয় ঠিক। একটা শান্তি, শান্তি দেয় মানুষকে, সেই তাঁর সমীপে বসে নিজেকে শান্ত, সুস্থ, স্বস্তিমান করে তোলা, আর সেইসঙ্গে সেই ছেলেবেলার অমল দিনগুলো, গৌতমদার সঙ্গে অচ্ছিন্ন অভিন্ন খেলাধুলোর খেলাভোলার দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা।

এই সময়েই সে খবর পেল প্রোমোটার রামলগন বৈদ মুম্বই থেকে ফিরে এসেছে। রামলগন তার বন্ধু না হতে পারে, চেনাশোনাও খুব না থাকতে পারে, কিন্তু দেশোয়ালি তো! বলা-কওয়া কিচ্ছু না করে জয়প্রকাশ একদিন প্রায় প্রত্যুষে রামলগনের কোঠিতে হাজির হয়ে গেল। রামলগন তখন লোটাভর ভইসের দুধ গিলছে।

'আরে আরে জয়পরকাশজি, আপ ইৎনা সবেরে!'

কোনো ভূমিকা না করেই জয়প্রকাশ বলল, 'ধান্ধে মে আয়া ভাই। পেইন্টিং হ্যায় না ও চিৎপুর কী কোঠির? উও সব নিকলাইয়ে।'

'কাঁহা তসবির? ক্যা তসবির।' —রাগ-রাগ মুখ রামলগনের। কিন্তু জয়প্রকাশের কঠিন দৃষ্টির সামনে সে ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে তা বুঝতে জয়প্রকাশের দেরি হল না।

'উইথ ফিটিংস অ্যান্ড ফিক্সচার্স' কিনেছেন শুনছি, তা তসবির 'ফিটিংস' না 'ফিক্সচার্স' কোন ক্যাটিগরিতে পড়ে রামলগনজি?'—তার গলা উত্তরোত্তর কড়া হচ্ছে, 'সুদর্শন সরকার আর তার মিসেস আপনার বিরুদ্ধে কেস করবেন। খাস গাওয়া আমি আনব। বাস, হয়ে যাবে আপনার মাল্টিস্টৌরিড, বারোটা বেজে যাবে আপনার রিয়্যাল এস্টেটের কারবারের।'

'আরে, ভাই বৈঠেন। এই কে আছিস রে? জয়পরকাশজির জন্যে মসালা চায় আর কচৌড়ি নিয়ে আয়। বসুন ঠান্ডা হয়ে, তবে তো কথা করবেন!'

রামলগনের চেয়ে জয়প্রকাশের ব্যক্তিত্ব বেশি দেখা গেল। ছবির কথাটা সে বেশিক্ষণ অস্বীকার করতে পারল না। তবে কিছুক্ষণ পরেই তার চোখদুটো অন্য কোনো মতলবে চকচক করে উঠল। সে আসলে এই বিশেষ কাজেই মুম্বই গিয়েছিল, সেখান থেকেই বুঝে এসেছে কত গেঁহুর দানার কত আট্টা। ছবির বান্ডিলটা সে বার করে আনল। ভাবির দেওয়া লিস্টটা আজকাল জয়প্রকাশের পকেটেই ঘোরে। লিস্টে আসলে মেলানো শুরু হয়।

১ নম্বর—রাজা নল দয়মন্তীর কাছে হংসদূত পাঠিয়েছেন। থামের ওপর সেই হংস, সামনে থামে কনুই রেখে দময়ন্তী।

২ নম্বর—দ্রৌপদী স্বয়ংবর। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করছেন। দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্নর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন বরমাল্য হাতে।

৩ নম্বর—নীলচে সাদা জলের টইটম্বুর সরোবর। ভেতর থেকে উঠে আসছেন গোলাপবর্ণ দেহত্বকের এক লাবণ্যময়ী সিক্তবসনা সুন্দরী।

৪ নম্বর—সাদা-কালো আরও কিছু গাঢ় রঙের আলোছায়ায় নকশা মতো। যেন ভূতের-বাড়ি।

৫ নম্বর—খোয়া-ওঠা গর্ত-অলা লালচে মাঠ। গোরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাখাল। সময় গোধুলি শেষ।

৬ নম্বর—একটা লম্বা টেবিলে বারোজন আলখাল্লা পরা শিষ্য বসে আছে। মাঝখানে যিশু। রুটি ভাগ করে দিচ্ছেন।

৭ নম্বর—কাটা ছেঁড়া মানুষের হাত পা ঘোড়ার মুণ্ডু—এসব দিয়ে এক আজব নকশা।

রামলগন বলল, 'সমঝলেন না জয়পরকাশজি। এই ছে আর সাত হল ছবির প্রিন্ট। বিলাইতি ছবি, ছেপে ছেপে বিক্রি করা। এগুলোর তেমন কোনো দাম নেই। কিন্তু বাকি পাঁচটা এক্কেবারে আসলি চিজ। এসব আর্টিস্টদের নিজের হাতে আঁকা, কেউই আর জিন্দা নেই। আজকাল ছবির বাজার গরম। এসব পুরোনো পেইন্টিং কোনোটা লাখ, সওয়া লাখের কম হবে না। এসব ফিরৎ দিব কেন? আপনি আমি শেয়ার করে লিবো।'

কথা না বার্তা না। বাঁধানো ছবির বান্ডিলটা জয়প্রকাশ তুলে নিল। তার মুখ থমথম করছে। রামলাল হাঁ হাঁ করে উঠতে না উঠতেই সে কড়া গলায় বলল, 'চোরির মতো গন্ধা কামে আমি আপনাকে মদৎ করবো সোচছেন তো ভুল সোচছেন রামগলনজি। হয় এ ছবি ফিরত, নয় মামলা। ওঁরা আমার বন্ধুলোগ।'

'দেখেন উ সব মামলা-উমলা আমি থোড়ি ভয় পাই।'—রামলগন বলল, খালি ডেট লিব, খালি ডেট লিব। ও বাঙ্গালিবাবুকে আমি চিনি, ও সির্ফ হ্যারাস হয়ে ছেড়ে দিবে।' লেকিন, আপনি যখন বলছেন আপনার বন্ধুলোগ, তো ঠিক হ্যায় জি, এক কাম করুন, ও পাঁচটার মধ্যে থেকে একটা অন্তত আমায় দিন।'

ঝুলোঝুলি করে প্রথম ছবিটি আদায় করে নেয় রামলগন।

অতঃপর ছবির বান্ডিল নিয়ে একদিন সুদর্শন সরকারের ফ্লাটে গিয়ে ভাবিজির পায়ের কাছে পুষ্পার্ঘ্যের মতো সেগুলো নামিয়ে রাখে জয়প্রকাশ। শিপ্রাভাবি ভীষণ আগ্রহে, ভীষণ স্নেহে খুলছেন ছবির মোড়ক। কাচ একটু আধটু ফেটেছে, ধুলোর দাগ কাচের ওপর।

'আর? আরগুলো? রবি বর্মা, হেমেন মজুমদার, আমার গগনঠাকুর, যামিনী গা,...' কথা শেষ করতে পারেন না শিপ্রাভাবি। গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'এইসব মানুষদের পোর্ট্রেট ছিল বুঝি? আপনাদের আপনজন? তা এসব তো আপনার লিস্টে ছিল না ভাবিজি।'

শিপ্রা কোনো মতে বলেন, 'না, না, পোর্ট্রেট নয়, ওঁদের আঁকা ওগুলো।'

এ দুটো অনেক কষ্টে রাবল-এর মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছি ভাবিজি। দেখুন না সিসা কেমন ফেটে গেছে। রামলগন আপনার প্রোমোটার বলছে বাড়ি কিনেই সে ভাঙতে দিয়ে খালাস, আর কিছু জানে না।

ফ্যাকাশে মুখে চা ঢালতে লাগলেন হলুদ শাড়ির ভাবি। হাত থরথর করে কাঁপছে। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা করছেন তিনি। নেহাত বাইরের মানুষ যেন বুঝতে না পারে তাঁর ক্ষতির পরিমাণ, আবেগ, কষ্ট, হতাশা। চোখ ভরে সেই বেপথুমতীকে দেখতে থাকে জয়পরকাশ, নাক ভরে নিতে থাকে বাস আর ভাবতে থাকে যদি লাখ দেড়েক করেও হয় গড়, তা হলে চারটেতে সে পায় ছয় লাখ। আর একটু কমিয়ে ধরলে পাঁচ। পিতাজি বলেন, 'আমি আর আমার বাবুজি জিরো ক্যাপিটাল থেকে এত বড়ো কারবার বানিয়েছি বেটা—এই মকান, হাবেলি এই গাড়ি। আর তুমি খালি টাকা লাগাচ্ছ, টাকা লাগাচ্ছ।'

জয়পরকাশ একটু হাসে। এখন এটাকে পিতাজি কী বলবেন? জিরো ক্যাপিটালই তো? আর নাফা?

সুরূপা-স্বরূপা

জ্ঞান হয়ে থেকে আমি আমার মাকে দেখিনি। শুনেছি, আমি জন্মেছি বলেই মা মারা গেলেন। দুদিন যায়—তিন দিন যায়, আমার ঠাম্মা চোখ গোল্লা গোল্লা করে বলেন, 'তা'পর আমাদের চোখের সামনে অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা বউ আমার চোখ বুজল।' আমি বলি, 'তাহলে ব-পিসি হবার সময় তুমি কেন চোখ বোজনি?'

ঠাম্মা টোক গেলেন, ভুরু কুঁচকে বলেন, 'বাপ রে, মেয়ে তো নয় উকিল-ব্যারিস্টারের বাপ। নাও, এখন বোঝাও। আরে তোর মায়ের যে আগে থেকেই একটা বুকের দোষ ছিল!' আমার ধাঁধা লেগে যায়। তা হলে সেই বুকের দোষটাই তো মাকে মেরেছে, আমি তো মারিনি। তবু কেন সকলে আমাকে মা-খাকি বলবে! কেন বাবা আমার ছায়া মাড়াবেন না!

আমি কালো, আমার গায়ে খড়ি, আমার চুল খ্যাংরাকাটির মতো। আমার চোখ হাতির চোখ, নাক বড়ি, ঠোঁট যেন দশ পয়সা। আমি একটি টিপসি। পিঁপড়ে কামড়ালেও চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করি, কথা শুনি না, যেটা বারণ করা হবে সেটাই আমি করব, অবাধ্য, অসভ্য, আমাকে আদব শেখানো আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা। তার ওপর আমি ঝগড়াটি, এতটুকু সহ্য নেই। কেউ একটা কথা বললে আমি দশটা কথা শুনিয়ে দিই, কেউ যদি একটা চড় মারে, আমি তাকে শুইয়ে ফেলে তার ওপর চড়ে বসি, ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে দিই বুকের মাংস ঠিক যেন ভীম, দুঃশাসনের রক্তপান করছি। হ্যাঁ এই একটা জিনিস আমার আছে, প্রচণ্ড গায়ের জোর। রাগলে না কি আমার হাতির চোখই ভাঁটার মতো হয়ে যায়, জ্বলতে থাকে, তখন আমি যা সামনে পাব ভাঙব চুরব ফোঁস ফোঁস করে ফুঁসব, যেন জাত-গোখরো।

সবাই বলে অমন মায়ের যে এমন মেয়ে কী করে হয়! তার সাত চড়ে রা ছিল না, মুখে সবসময়ে হাসি, মিষ্টিমধুর কথাবার্তা! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত!

তা সে তো আমি দেয়ালে টাঙানো ফোটো-ফ্রেমের মধ্যে, টেবিলের ওপর সবসময় দেখি। ঠিক যেন ঠাকুর দেবতা! আমার দিম্মা পাঁশকুড়োয় থাকেন, বলেন, ফোটোর বাইরের মা ফোটোর মায়ের চেয়েও সুন্দর ছিলেন। মাটিতে পা ফেললে মনে হত পদ্মফুল ফুটে উঠল। কথা কী! যেন মধু ঝরছে! আমার মাসিরাও ফরসা, পিসিরাও তো কালো নয়, কিন্তু মায়ের কাছে সবাই কালো। পিসিরাই বলে মা যখন বউ হয়ে এসে দুধে-আলতায় পা রাখলেন, দুধে-আলতার থেকে মায়ের পা আলাদা করা যায়নি। পিসিরা সব মুখ লুকিয়ে ফেলেছিল। জেঠু, যিনি সবসময়ে টেবিল-চেয়ারে পড়াশোনা করেন তিনি বলেন, 'পুটু কাউকে বোলো না, বেশি খাটো নয়, বেশি লম্বা নয়, মোটা নয়, রোগা নয়, তোমার মা ছিলেন পদ্মিনী নারী। পদ্মপলাশের মতো চোখ, পাখির ডানার মতো ভুরু, বাঁশি-হেন নাক, মুক্তা-জিনি দাঁত, জ্যোৎস্নার মতো হাসি। ওঁরা স্বর্গের পরি, দেখলে আমাদের মতো মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। মানুষ ওঁদের ধরে রাখতে পারে না।' চন্দননগরের বড়োমাসি বলেন, 'তোর মা শুয়ে থাকলে মনে হত ভোরের প্রথম সূর্যের আলো পড়ে রয়েছে, বসে থাকলে মনে হত রূপকথার পাতা থেকে একটা ছবি কেটে বসিয়ে

দেওয়া হয়েছে। চলত না যেন হালকা হাওয়ায় পাখির মতো উড়ত, আর চুল? সে এক ঢেউ-খেলানো মিশমিশে কালো জলপ্রপাত।'

বড়োমাসি আর দিদিমা বলাবলি করতেন, ভেবেছিলুম কোনো রাজবাড়িতে বুঝি রানি হয়ে যাবে। তা আমাদের মতো লোকের কপালে আর...!

মা নাকি ছিলেন ভদ্র, বিনীত, হাসিমুখ, সবার কথা ভাবতেন, সবাইকে সুন্দর দেখতেন, ভালোবাসতেন, তাই সব আত্মীয়স্বজন কুটুম পাড়াপড়শিও ছিল তাঁর আপনজন। কোনোদিন মুখের ওপর কাউকে একটা কথা বলতেন না। আমার একেবারে উলটো।

যে যখন মায়ের কথা বলত এমনিভাবেই বলত। আর তখনই একমাত্র আমি শান্তশিষ্ট হয়ে বসে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, সেসব কথা শুনতুম। সমস্ত দুষ্টুমি, দস্যিপনা, অবাধ্যতা ঘুচে যেত। আসলে আমার চোখের সামনে থেকে তখন অদৃশ্য হয়ে যেত যেন ঠাম্মা-পিসি-কাকা জেঠুদের, দিম্মা-বড়োমাসি-দাদু সব্বার মুখ। বাড়ির দরজা জানলা-দেওয়াল যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে কোথায় মিলিয়ে যেত। মেঘ করে আসত চারদিক থেকে, ঘন নীল মেঘ, আর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো এক অপূর্ব মূর্তি ঝলসে উঠত সেখানে। আমার চোখ, মন, সব স-ব দিয়েও আমি সে মূর্তির স্পষ্ট চেহারাটা দেখতে পেতুম না। মনে মনে বলতুম, মা আমি কেন তোমার মতো নয়? আমি কি কোনোদিন তোমার মতো হতে পারব না? অনেক সময়ে সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করে ফেলতুম।

দিম্মা, আমি কি কোনোদিনও মায়ের মতো হতে পারব না? যখন অনেক বড়ো হয়ে যাব, তখনও না?

দিদিমা বলতেন, কেন পারবে না? চেষ্টা করো। সবার কথা শোনো, লেখাপড়া করো, চেঁচিয়ো না, ঝগড়াঝাটি কোরো না, লক্ষ্মী হয়ে যা দেওয়া হবে খেয়ে নেবে, সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে, যে যা বলবে শুনবে...

সব শুনব? কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেও শুনব? কুমড়ো আর ঝিঙে খেতে বললেও খাব?

হ্যাঁ, সব শুনবে। সব খাবে।

আমার ধৈর্য থাকত না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলতুম, তা হলেই আমার দুধে আলতার মতো রং, পদ্মপলাশের মতো চোখ, আর জোছনার মতো হাসি হয়ে যাবে? তাহলেই আমার গানের মতো গলা, মধুরের মতো কথা হয়ে যাবে? তা হলেই সবাই আমায় ভালোবাসবে?

বাসবেই তো! লক্ষ্মী হও, তাহলেই সব্বাই ভালোবাসবে।

দিম্মা আমার আসল ইচ্ছের কথাগুলো কেমন এড়িয়ে গেলেন!

আর বাবা মানে রাঙাদা! বাবার কথা বলতে তো ভুলেই যাচ্ছি। বাবা আমার একটা কষ্টের জায়গা, টিপলে লাগে। বাবার কথা আমি বলি না। কাউকে জিজ্ঞেসও করি না। বাবা আমার দেখা জ্যান্ত মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। কীরকম দুঃখী-দুঃখী উদাস চোখ, কিন্তু আবার ভীষণ গম্ভীর কথাবার্তা। যখন কথা বলেন ঝকঝকে দাঁত দেখা যায় ঘন তামাটে রঙের ঠোঁট দুটোর মধ্যে দিয়ে। বাবার পায়ের পাতা কী ফরসা। নখে যেন ছোটো ছোটো গোলাপি আয়না বসানো আছে, সুন্দর সাদা ফ্রেমে বাঁধানো। বাবা সকাল আটটায় টাইসুট পরে বেরিয়ে যান, রাত্তির দশটা এগারোটায় ফেরেন। একটু দাঁড়ান, ঠাম্মার সঙ্গে দু-চারটে কাজের কথা বলেন। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে যান। একটু পরে ফের বন্ধ দরজা খোলে, ভেতর থেকে ভরভর করে আসে সিগ্রেটের গন্ধ। আমি নাক ভরে গন্ধটা উশ্‌শ্‌ করে টেনে নিই। এটা রাঙাদার গন্ধ। মানে আমার বাবার।

পর্দার কোণটা একদিন মুঠো করে ধরেছি। অমনি ভেতর থেকে গম্ভীর গলা, 'কে? কে ওখানে?'

আমি দুদ্দাড় করে পালাতে থাকি। পা পিছলে পড়ে যাই। ধড়াস করে শব্দ হয়। ভীষণ লাগে। কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার সামলাই। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। ঠোঁট ফোলে। বাবা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। পেছন থেকে একটা আলোর ঝলক, একটা গন্ধের ঝলক।

'মা-আ'—বাবা ডাকতে থাকেন, 'ঝুমা—আ, তিলু-উ-উ' ....পড়িমরি করে সব ছুটে আসতে থাকে। আমি তখন মুড়ে-পড়া ডান হাঁটুটাকে প্রাণপণে সোজা করবার চেষ্টা করছি। ব্যথায় চোখ ফেটে জল আসছে, কিন্তু চিৎকার আসতে দিচ্ছি না। তবে আমার দিকে কেউ দেখল না, সবার দৃষ্টি রাঙাদার দিকে।

কী রাজেন? কী হয়েছে? কী হয়েছে রাঙাদা?

একটা বাচ্চাকে সামলে রাখতে পারো না? বাড়িতে এতগুলো লোক! দেখো তো! পড়ে গেছে। ভীষণ লেগেছে বোধহয়।

ওরকম দুদ্দাড় ও দিনরাত পড়ছে, যা দস্যি, ও সব আদিখ্যেতার কান্না, তুই যা আমি দেখছি।

বাস রাঙাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। এইবারে আমি হাঁ-হাঁ করে কাঁদতে থাকি।

বড়োপিসি বলে, 'এতক্ষণ তো চেঁচাচ্ছিলি না? যেই আমাদের দেখলি অমনি...কম সেয়ানা না কি তুই? শেয়ালেও তোর কাছে ছ্যাঁচড়ামিতে হেরে যাবে।'

ছোটোপিসি বলে, 'বকুনি খাওয়াতে ওস্তাদ! মেয়ে তো নয় রাক্কুসি একখানা!' ঠাম্মা বলেন, 'আমি রাজার রুটির ময়দা আধমাখা করে রেখে এসেছি। আমার দাঁড়াবার জো নেই। ওকে তোল।. দ্যাখ আবার কী ভোগান্তিতে ফেলল! কত করে বলছি একটা বিয়ে কর, বিয়ে কর, হাড় মাস আমার আলাদা হয়ে গেল।'

গোড়ালি মচকে গেছে, ডান হাঁটুতে ভীষণ লেগেছে। পিসিরা দু-জনেও তুলতে পারল না, জেঠু এলেন। বললেন, 'এত চ্যাঁচাচ্ছে যখন নির্ঘাৎ ভেঙেছে।'

পিসিরা বলল, 'ও ওইরকম আউপাতালি। চুনে-হলুদে গরম করে লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে। উঃ দু দণ্ড শান্তি দেবে না!'

কাকু, কোথা থেকে এসে ফুট কাটল, 'এই আহ্লাদি! এখন দেড়মাস পা সোজা করে শুয়ে থাকবি। নইলে খোঁড়া!'

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'বেশ করব দৌড়োব, দৌড়ে তোমার ঘরে চলে যাব তোমার বইপত্তর হন্ডুল-মন্ডুল করে দেব। তোমার চাদর বালিশ সব ছিঁড়ে দেব।'

'উঃ, বউদির মেয়ে যে কী করে এমন হয়!' —কাকা বিরক্ত হয়ে বলল।

'রাক্কুসি একটা, আসল রাক্কুসি'—ছোটোপিসির মন্তব্য।

তা আমি তো রাক্কুসি; লকলকে জিভ বার করে মুখ ভেংচে পাশ ফিরে শুই। ওদের দিকে পেছন ফিরে। পায়ে আবার লেগে যায়। চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে। সামনে আমার কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু খানিকটা সাদা দেয়াল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আমি চোখ বুজিয়ে ফেলি, হাতজোড় করে মনে মনে বলতে থাকি, 'হে দেয়াল! হে দেয়াল! তুমি কার?'

দেয়াল বলে, 'আগে ছিলুম টিকটিকির, এখন তোমার। আমি বলি, তুমি যদি সত্যিকারের দেয়াল হও তাহলে আমাকে মায়ের মতো করে দাও।'

দেয়াল যেমন সাদা, তেমনি থাকে। উত্তর দিলে দেয়ালে একটা ছায়া পড়ে আমি দেখেছি।

আজকে কোনো ছায়া পড়ে না। যন্ত্রণায় আমি ঘুমোতে পারি না, ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকি। তখন অবশেষে আমাদের প্রকাশদাদু ডাক্তারবাবু আসেন। একটু টিপেটুপে আমাকে আরও কাঁদিয়ে শেষে বলেন, 'এক্স-রে করলে ভালো হত।'

ঠাম্মা বললেন, 'বাপরে, ওই আউপাতালি মেয়েকে নিয়ে এক্স-রে করতে যাওয়া! সে যে ভীষণ হাঙ্গামা!'

প্রকাশদাদু বললেন, 'এইগুলো আপনারা ঠিক করেন না। সেবার বললুম একটা ই. সি. জি. ইকো-কার্ডিয়ো. টি এম টি. করিয়ে আনতে, তা সে তো করালেন না। মানুষটা একরকম বেঘোরে...'

ঠাম্মা চোখে আঁচল দিয়ে বললেন, 'কী করে বুঝব ভাই, দিব্যি ভালো মানুষ, মাঝে মাঝে চোখে সব আঁধার দেখে। এখন, সে তো আমরাও চব্বিশ ঘণ্টাই দেখছি, দেখছি না?'

ঠিক আছে। হেয়ার-লাইন ফ্র্যাকচার একটা হয়েছে মনে হচ্ছে পায়ের পাতায়, যদি বলেন আমি প্লাস্টার করে দিতে পারি।

কিছু গণ্ডগোল হবে না তো!—জেঠু বললেন।

মনে তো হয় না।

শেষে আবার পা বেঁকে-টেকে যাবে না তো! বিয়ে দিতে পারব না তাহলে!

আমার ওপর ভরসাটা যখন এতদিন রেখেছ, তো আরও কিছুদিন রাখো!

উঃ দেড়মাস! মানে ছ সপ্তাহ, মানে ছ সাত্তে বিয়াল্লিশ দিন! পায়ে ভারী প্লাস্টার হাঁটু পর্যন্ত! আর চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা! তেমন ব্যথা লাগত না আর! কিন্তু অধৈর্যে বিরক্তিতে আমি চ্যাঁচাতুম। মাঝে মাঝে পরিত্রাহি একেবারে।

সে দিনটা ছিল রবিবার। শুয়ে শুয়ে আমার খেয়াল থাকত না কী তারিখ, কী বার। অনেকক্ষণ গল্পের বই পড়ছিলুম, পাশ ফিরতে গিয়ে অসুবিধে হল, তখনই দপ করে মনে পড়ে গেল—ও মা! কেন আমি খালি খালি গল্পের বই পড়ব? কেন চুপচাপ থাকব? এমন এবং একা? কেন কেউ না কেউ আমার বিছানার পাশে থাকবে না! আমার তো অসুখ! বড়োপিসির তো সামান্য টাইফয়েড হয়েছিল, ছোটোপিসি কিংবা ঠাম্মা তখন ঠায় বিছানার পাশে বসে থাকত না? কাকু বারবার এসে জিজ্ঞেস করত না? গল্প করত না? আর আমার যে পা-টাই ভেঙে গেছে? এটা বুঝি আর অসুখ নয়? তখন আমি আঁ-আঁ করে একটা চিৎকার দিয়ে উঠলুম। বাইরে পায়ের শব্দ। দৌড়ে নয়, কিন্তু বড়ো বড়ো পা ফেলে কেউ আসছে। কে রে বাবা! এ তো আমার চেনা শব্দ নয়। তারপরই দেখি সব্বোনাশ। দরজার চৌকাঠে রাঙাদার চেহারা। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারটা গিলে নিয়েছি।

'কী হল? লাগছে খুব?' —থেমে থেমে বললেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, না, ...

তাহলে?

আমি কোনো জবাব দিই না, শিটিয়ে শুয়ে থাকি।

স্বভাব, আর কী!—বড়োপিসি ঢুকতে ঢুকতে বলল।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, জিজ্ঞেস করছি পুটুকে। কী হল? লাগছে না, তাহলে কাঁদছ কেন?

কাঁদিনি, চেঁচিয়েছি।

ভালো। তা চ্যাঁচালে কেন? অমন বিকট গলায়?

ওর গলাটাই অমন। হেঁড়ে, খ্যানখেনে। বউদির মেয়ের যে এমন গলা হয় কী করে?—বড়োপিসি গড়গড় করে বলে গেল?

তোমার কমেন্ট আমি শুনতে চাইনি ঝুমা, পুটু জবাব দাও।

তখন বলি, আমার একা-একা শুয়ে থাকতে আর ভাল্লাগছে না।

তোমরা কেউ ওর কাছে একটু বসতেও পার না? আশ্চর্য! একটা দিন রোববার, তা-ও বাড়ি থাকবার জো নেই।

রাঙাদা বেরিয়ে গেলে পিসি আমায় চাপা গলায় ধমক দিল, 'তোকে তো 'ভোম্বল সর্দার' দিয়ে গেলুম। তখনই তো এলুম ঘরে। রাঙাদাকে মিছে কথা বললি?

পাঁচটা ছটা আটটা পাতা পড়েছি। আর ভাল্লাগছে না।

আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তোর কাছে বসতে হবে? জানিস তিন মাস পরে আমার একটা মস্ত পরীক্ষা!

তো এখানে বসে পড়া করো না।

তুই তো খালি কথা বলিস, বিরক্ত করিস।

কথা বলব না, বিরক্ত করব না।

সত্যি-সত্যি আমি বড়োপিসিকে একটুও বিরক্ত করিনি। যে-ই পাশ ফিরিয়ে পিসি বালিশটা আমার পায়ের নিচে ঠিকঠাক বসিয়ে দিল, আমি সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলুম। খাট, তারপর ফাঁকা, একদিকে বড়োপিসি, একটা ,চেয়ারে বসে পড়ছে, জানলার দিকে মুখ। আরও খানিকটা ফাঁকা, পাশ-দেয়ালে মস্ত বড়ো আলমারি, তার ওদিকে দেয়াল। দেয়ালটা আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধু। কিন্তু আমাদের বাড়ির এই সব মুখগুলোকেও আমি ভীষণ ভালোবাসি। ওই যে বড়োপিসি জানালার পাশে বসে কী পড়ছে, চুলগুলো ঝুলে পড়েছে সামনে, চুলের ফাঁক দিয়ে বড়োপিসির গাল, গালে একটা মাছির মতো আঁচিল, নাকের ডগাটা স্পষ্ট। এখন পিসির মুখে কোনো বিরক্তি নেই, বকুনি নেই। আমার ইচ্ছে করছে পিসি একবারটি এপাশ ফিরে আমার দিকে তাকাক, একবারটি বলুক, 'লক্ষ্মীসোনা'! আমি তো একেবারে লক্ষ্মীসোনার মতোই চুপটি করে রয়েছি। তাহলে বলছে না কেন? কেন বলছে না? বললে তো আমিও পিসিকে আদর করে দেব। কিন্তু পিসি একবারও আমার দিকে তাকায়ই না। ছোটোপিসিকেও তো আমার ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছা করে? কিন্তু ছোটোপিসি আবার আর এক। দলবেঁধে ওর বন্ধুরা এসেছিল সেদিন। আমি অতগুলো পিসি দেখে ছুটতে ছুটতে গেছি, আমার হাতে নরম ভালুক পুতুল ছিল, জামার পেছনে তিনটে বোতাম ছিল না, কাঁধ থেকে খসে পড়ছিল তাই খালি পায়ে অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছি, পা ধুলোয় ভরা। আমি জানি এইরকম করে বাইরের লোকের সামনে যেতে হয় না। কিন্তু কী করব, আমাদের আলনায় যে আর জামা ছিল না! ওদিকে অতগুলো পিসি।

ঢুকতেই পিসির দল হইহই করে উঠল—

তিলোত্তমা! এই তিলোত্তমা, এই বুঝি তোর রাজকন্যে বউদির মেয়ে?

এই বুঝি তোর রাঙাদার মেয়ে!

একমাত্র না রে?

হ্যাঁ। ও হওয়ার পরই তো বউদি...

কী স্যাড্ না?

তারপরেই সেইসব কথা।—একদম বোঝা যায় না, না?

তোর রাঙাদার মতনও নয়। বউদির মতো তো নয়ই। কার মতো বল তো?

ছোটোপিসি মুখটা কেমন বাঁকিয়ে বলে, 'আমার মতন নয় এটুকুই বলতে পারি। কে জানে কোত্থেকে এসেছে।'

আমি তখন মাথার চুল ঝাঁকিয়ে হেঁকে হেঁকে প্রত্যেকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, 'তোমার মতন, তোমার মতন, তোমার মতন?'

পিসিরা খুব হাসে, বলে, 'বেশ খরখরি আছে, না?'

ছোটোপিসি বলে, 'খরিশ একেবারে।'

আমি বলি, 'খরখরে, খরিশ, খনখনে, খশখশে, খপখপে, খটখটে, খ্যাংরা ঢ্যাংড়া...'

সবাই হাসে। একটা পিসি বলে, 'হ্যাঁরে, কিছু মনে করিস না, মা-মরা বলে বাচ্চাটাকে তোরা কি একটু যত্নও করিস না!'

ছোটোপিসির বোধহয় রাগ হয়, বলে, 'ও হল আখকুটির সর্দার। এই নতুন জামা আসছে দু-দিনেই সেটা ছিঁড়েখুঁড়ে একশা। পায়ে চটি পরবে না। চান করতে তেল সাবান মাখবে না, চুল আঁচড়াবে না। ন-বছরে পড়ল, ও কি আর বাচ্চা আছে না কি? এখন তো নিজের কাজ নিজেরই করার কথা।'

'যাই বলিস আর তাই বলিস মা-মরা মেয়ের আর একটু বেশি আদর-যত্ন দরকার'—পিসিটা বলল।

আমার কেমন রাগ হয়ে যায়। বলি, 'মা-মরা, মা-মরা! বেশ করেছি মাকে মেবে ফেলেছি। সব্বাইকে মারব। ঠাম্মাকে, ব-পিসিকে, ছো-পিসিকে, কাকুকে, জেঠুকে, ..'

ছোটোপিসি বলে, 'দেখলি তো!' ওর গলায় রাগ চোখে রাগ। উঠে আসে—'পুটু, যাও বলছি যা-ও।' আমাকে ঠেলে বার করে দিতে থাকে ছোটোপিসি। আর একটা পিসি বলে শুনতে পাই, 'কী বলল রে? মাকে মেরে ফেলেছি! এমন কথা কেউ নিশ্চয় ওকে বলেছে। এমা! বাচ্চা একটা, অসহায়!'

আর একজন আস্তে বলল, 'যাক গে যাক। পরের বাড়ির ব্যাপার। আমাদের কী!'

ঠাম্মার কী সুন্দর ফাটা ফাটা পায়ে বাসি আলতা লেগে থাকে। ফাটা ফাটা ঠোঁটে পানের রস। ঠাম্মার আঁচল থেকে সুন্দর সুন্দর রান্নার গন্ধ বেরোয়। আঁচল মুঠোয় নিয়ে গা ঘেঁষটে আমাব দাঁড়াতে ইচ্ছে করে ভীষণ। ঠাকুরপুজো করবার সময়ে ধূপ জেলে দেয় ঠাম্মা, দীপ জ্বালে, ঠাকুরকে ফুল দেয়, আমি হাতজোড় করে বসে থাকতে চাই, কিন্তু ঠাম্মা বলেন, 'সরে বোস পুটু, এখন পুজো করছি, ছুঁয়ে দিসনি।'

আমি তো চান করে এসেছি ঠাম্মা!

হোক, তুই জন্ম-নোংরা। যেমন চিরকুট্টি ফ্রক, তেমনি জটবাঁধা চুল, হাতে পায়ে সবসময়ে ধুলো! কোত্থেকে এত ধুলো পাস?

ঠাম্মা, আমিও পুজো করব, কপ্পুর দিয়ে পিদ্দিম জ্বালাব!

ওই যে বললুম, তুই নোংরা।

ব-পিসিকে বলো না একদিন আমায় ঘষে ঘষে ঘষে ঘষে চান করিয়ে দেবে, ধুঁধুলের ছাল দিয়ে! আমি চেঁচাব না, কিচ্ছু বলব না। গরম জলে বেশ করে। আমি পায়ের নখে নখপালিশ পরব ছো-পিসির মতন। একটা সিল্কের কাপড় পরব।

কোথায় পাবি সিল্কের কাপড়? আমার পুজোর কাপড়ে হাত দিবি না। আর তোর পিসিরা? তবেই হয়েছে।

তোমাদের কাপড় পরব না ঠাম্মা। ওই যে আলমারি আছে...

কোন আলমারি?

ওই যে রাঙাদার ঘরে! চকচকে আরশুলো রঙের আলমারি আছে, ওতে অনেক সিল্কের বেনারসি আছে...ওখান থেকে দাও।

ও রে বাবা, ও তো তোর মায়ের আলমারি। ওতে হাত দিলে তোর বাবা আমায় মেরে ফেলবে!

বাবা ঠাম্মাকে মেরে ফেলবেন? একেবারে? ছবিটা আমি তক্ষুনি দেখতে পেলুম। ঠাম্মা মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন। উলটেপালটে যাচ্ছেন, বাবা ঠাম্মার পেটে এইসান এক লাথি! ঘুষি, ঘুষি, ঘুষির পর ঘুষি, পেছনে একটা চাকা লাগানো ফলের গাড়ি। ঠাম্মা তার ওপরে পড়ে গেলেন, গাড়ি উলটে গেছে, রাস্তাময় কমলালেবু, আপেল, বেদানা গড়াচ্ছে, গড়াচ্ছে। ব্লাউজ ধরে রাঙাদা ঠাম্মাকে ওঠাচ্ছেন, আব্বার এক ঘুষি, ঠিক মুখের ওপর। ঠাম্মা পড়ে গেলেন, মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঠিক এমনি ছবি টিভিতে রোজ রোজ হয়। রাঙাদা ঠাম্মাকে এমনি করে মেরে ফেলবেন?

কেন ঠাম্মা?

তোর মা স্বর্গে গেছে তো! তার জিনিসপত্তর এখন তোর বাবার প্রাণ। নিজে ঝাড়ে পোঁছে, কাউকে হাত দিতে দেয় না। দেখিস না ঘরে চাবি দিয়ে চলে যায়। ওই একরকমের হয়ে গেছে!

যাঃ। তাহলে আর আমি কী করে পুজো করব? ঠাকুরঘরে সিংহাসনের ওপর নাড়ুগোপাল ঠাকুর আছেন। তার এপাশে ওপাশে লক্ষ্মীর পট, গণেশঠাকুরের পট, নারায়ণের পট, আর কত কত ঠাকুর ওপরে নীচে। আমি কী সুন্দর সব্বাইকে ফুল-তুলসী দিতুম, কপ্পুরের দপদপে দীপ জ্বালিয়ে পুজো করতুম, তারপর ছোট্ট থালায় এলাচদানা আর পুঁচকি গেলাসে জল দিয়ে উপুড় হয়ে পেন্নাম করতুম আর বলতুম, 'ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমাকে মায়ের মতো করে দাও, হে গণেশ, হে লক্ষ্মী, হে নাড়ুগোপাল আমি তোমাদের খুব ভক্তি করছি। দয়া করে আমাকে মায়ের মতো...'

কিন্তু বড়োপিসি আমাকে ধুঁধুলের ছাল ঘষে চান করিয়ে না দিলে আর ওদের রাঙাদা আলমারি খুলে একখানা সিল্কের কাপড়ও না নিতে দিলে আমি কী করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব? কী করে আমার ভক্তি বোঝাব? শুধু একখানা সিল্কের কাপড়ের অভাবেই কি তা হলে আমার মায়ের মতো হওয়া হচ্ছে না?

ভীষণ রাগ হয়ে যায় আমার, ঠাম্মা পুজো শেষ করে যে-ই আমাকে পেসাদ দিতে এসেছেন অমন আমি ঠাম্মার পুজোর কাপড়ের আঁচল দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিই।

অ্যাঁ?—ঠাম্মা ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেন আমার গালে! আমার এত ভীষণ ভীষণ লাগে। ঠিক সেই সিনেমার লোকদের মতো আমি মাটিতে ধড়াম করে শুয়ে পড়ি, উলটেপালটে কাঁদি।

দাদু তো একজন শোয়া মানুষ! পুজোর ঘরের পাশেই দাদুর ঘর। শুয়ে শুয়েই দাদু চ্যাঁচান, 'কী হল? কী হল? তোমরা কি আমাকে একটু শান্তিতে হরিনামও করতে দেবে না? আমার কি যাবার সময় হয়নি? হে ভগবান। এত অশান্তি। এত অশান্তি!'

আমি দাদুর ঘরে ছুটে যাই। নালিশ করি। দাদু তো আর সবার মতো না! হাঁটতে পারেন না, উঠতে পারেন না, কেউ এনে না দিলে দাদু খেতেই পাবেন না। দাদুর বিছানায় বাচ্চাদের মতো অয়েল-ক্লথ পাতা থাকে, আমি দেখেছি।

'দাদু, ও দাদু! ঠাম্মা আমাকে ভীষণ ভীষণ জোরে চড় মেরেছে।' আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি।

আমার পুজোর কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছিস সে কথাটা বললি না?

আমি তো পুজো করতে চাইছি, কেউ আমাকে পুজো করতে দিচ্ছে না কেন?

আট বছরের মেয়ে পুজো করবে কোথাও শুনিনি বাবা! এত আবদার! এত আবদার! যা বলবে তাই! যা বলবে তাই!

কোথায় তাই? আমাকে একটাও গোলাপি ফ্রক কিনে দিয়েছ? কাল আমাকে বাবা-কাকার মতো ডিমের রুটি করে দিয়েছিলে?

সাতসকালে আমার অত সময় কোথায় যে তোমার খাঁই মেটাব?

আজ সকালেও তো দাওনি!

দাদু এবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'যাবে? যাবে তোমরা এখান থেকে? কী আপদ! কী আপদ রে বাবা! দু দণ্ড যে শান্তিতে জিরোব তারও উপায় নেই।'

আমি আজ বড়োদের সঙ্গে খাচ্ছি। আজকে ভাইফোঁটা কি না! তাই উৎসব। বাবা, কাকু, জেঠু সব্বার কপালে চন্দনের টিপ। পিসিদের মাথায় ধান দুব্বো লেগে রয়েছে। খেতে খেতে বাবা বললেন, 'আট বছর বয়স হয়ে গেল, ওকে তোমরা স্কুলেও দিতে পারনি? একটু কাণ্ডজ্ঞানও কি নেই তোমাদের?'

ঠাম্মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'মেয়েটা যে তোমার বাবা, তুমি কিছু না বললে...'

'আশ্চর্য কথা! ও কী খাবে, কী পরবে সেগুলো কি আমি ঠিক করি? জিতু তুমি যত শিগগির সম্ভব ওকে একটা ভালো স্কুলে ভরতি করবার ব্যবস্থা করো।'

আমার তখন খুব সাহস হয়, 'আমি বলে উঠি, আমি রিয়াদের ইস্কুলে ভরতি হব। লাল স্কার্ট,সাদা জামা, লাল ফিতে...'

কাকু বলল, 'বয়স হিসেবে তো ওর ক্লাস থ্রি-তে পড়া উচিত। কিন্তু টু-থ্রি-তে তো আজকাল ভর্তি করা অসম্ভব ব্যাপার!'

তা আগে তোমাদের সে খেয়াল হয়নি কেন? আমার মেয়ে ঠিক আছে, তো আমাকে মনে করিয়ে দিলেও তো পারতে!

'আমি চেষ্টা করছি'—কাকু বলল।

'আমার মেয়ে' 'আমার মেয়ে' আমি দুপুরবেলা দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে শব্দগুলো ওলটাই, পালটাই। আবার রাত্তিরবেলা শুয়েও যতক্ষণ ঘুম না আসে শুনতে পাই একটা ভাবী গলা, 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে।' আমি খেলা করি শব্দদুটো নিয়ে।

কোন মেয়ে?

পুঁটু মেয়ে।

কার মেয়ে?

আমার মেয়ে।

কোন আমার?

বাবার আমার।

কোন বাবা?

পুঁটুর বাবা, পুঁটুর বাবা, আমার বাবা—।

এইভাবে খেলতে খেলতে আমি একদিন ইস্কুলে ভরতি হয়ে যাই। ক্লাস থ্রি-তেই আমি কি না 'আরে ছিছি রাম বোলো না হে বোলো না' আবৃত্তি করতে পেরেছি! একশোটা আমের দশটা পচা বেরোলে, বাকিগুলো চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে, ক-টা পড়ে থাকবে— বলতে পেরেছি!

বড়দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন, পুঁটু ছাড়াও ওর আর কোনো নাম নেই?

কাকু বললো, না, না, মানে আমরা তো সত্যিই—পুঁটুটা ঠিক...

বেশ তো আপনি একটা নাম দিয়ে দিন না।

কাকু মাথা চুলকোয়—আমি মানে নাম...

দিদিমণি বলেন, পুঁটু। তুমি বলো না তোমার কোন্ নাম ভালো লাগে! আমি বলি, সুরূপা।

না না, কাকু হাঁ হাঁ করে ওঠে—ওটা বউদি, মানে ওর মায়ের নাম। উনি মারা গেছেন।

বেশ তো, ওর যখন ওই নামটাই পছন্দ একটু উলটেপালটে স্বরূপা করে দিই?

স্বরূপা সুরূপা...কাকু আওড়াতে থাকে...আমি বরং একটু বাড়ি থেকে...

দেখুন, থ্রি-তে একটাই মাত্র ভেকেন্সি আছে বলে, আর ও খুব ভালো কোয়ালিফাই করতে পেরেছে বলে একশো ত্রিশটা অ্যাপ্লিক্যান্টের মধ্যে ওকে নিলাম। সময় নষ্ট করলে পারব না। আপনি যখন অভিভাবক হিসেবে এসেছেন আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঠিক আছে, কী রে পুঁটু স্বরূপা ঠিক আছে তো?

আমি বড়ো করে ঘাড় নাড়ি। ভীষণ পছন্দ। মায়ের নামের সঙ্গে কী মিল! এইবার একটু-একটু করে আমি মায়ের মতো হয়ে যাচ্ছি।

পাড়ার ইস্কুল। লাল স্কার্ট ইস্কুলে যাওয়া হল না বলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। কিন্তু কাকা বলল, 'অত দূরে তোকে নিয়ে কে যাওয়া-আসা করবে? রিযাদের গাড়ি আছে ওই রিয়া যেতে পারে।'

'তোমরাও একটা গাড়ি কেনো'—আমি বলি।

কেমন করে কিনব?

দোকানে যাবে, বলবে আমাদের স্বরূপা ইস্কুলে যাবে, ওই সাদা গাড়িটা দিন তো! রিয়াদের কালো গাড়ি, আমাদেরটা বেশ সাদা হবে?

কাকু হাসতে লাগল,—গুণের গুণমণি! গাড়ি কিনতে টাকা লাগবে না বুঝি? চাইলেই দিয়ে দেবে?

তা কেন? তোমার তো টাকা আছে, চাকবি করে টাকা পাও যে!

সে তো দু-দিনেই ফুট্টুস। ওতে কি হয়? লাখ লাখ টাকা চাই। যাক গে, এই স্কুলেও তো সবুজ স্কার্ট পরতে পাবি। নতুন জুতো, সবুজ রিবন। স্কুলব্যাগ, টিফিনবাকসোটা লালের চেয়ে সবুজ অনেক ভালো। আবার কেমন বাড়িব কাছে। হেঁটে হেঁটেই চলে আসতে পারবি।

কাকুকে কী করে বোঝাই হেঁটে হেঁটেই চলে আসতে আমি চাই না। কাছে নয়, দূরে, অনেক অনেক দূরে আমি চলে যেতে চাই। ট্রামে চড়ে, বাসে চড়ে, ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি সেই দোতলা বাড়িটা, ভুলে যাচ্ছি। দূর থেকে ছবি দেখার মতো দেখতে পাচ্ছি...পুজোর কাপড় পরা ঠাম্মা, উল বুনছে বড়োপিসি। বিনুনি দুলিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে ছোটোপিসি, কাকু অফিস যাচ্ছে, জেঠু কলেজ যাচ্ছে, অনেক বেলায়। দাদু শুয়ে শুয়ে খাচ্ছেন গলা গলা দলা দলা ভাত, মসমস শব্দ, একটু ফাঁক দরজাটা। সিগারেটের গন্ধ, আমি উশ্‌শ্‌ করে নিয়ে নিচ্ছি গন্ধটা আমি ভালোবাসি। দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে। যেখানে থেকে ছবির মায়ের মতো ওদের দেখতে পাব। ওরা কেউ আমায় দেখতে পাবে না।

'এ মা! এতদিন তুই স্কুলে পড়তিসই না!' ক্লাসের মেয়েরা চ্যাঁচামেচি করে জিজ্ঞেস করে।

কেউ ভরতি করে দ্যায়নি, কী করে পড়ব?

কেন? তোর বাবা? তোর মা?

আমার মা নেই, একটু ভেবে বলি, আমার বাবাও নেই।

সবাই অমনি চুপ হয়ে যায়। কেমন কাঁদো-কাঁদো! সবচেয়ে লম্বা মেয়েটা বলে, ইস্‌স! বাবা-মা নেই, এমন আমি ভাবতেও পারি না!

আমার কেমন খারাপ লাগে। আমি বলি,

> পাঁচখানা কাটলেট, লুচি তিনগন্ডা, গোটা দুই জিবেগজা, গুটি দুই মণ্ডা। আরও কত ছিল পাতে
> আলুভাজা ঘুগুনি। ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শুন্যি।

ওরা হেসে ওঠে।

তুই বানালি?

হ্যাঁ, বানালুম।

আরও বানাতে পারিস?

আমি আরও বলি, আবোল-তাবোল, খাই-খাই, খুকুর ছড়া—থেকে

বাঃ, স-ব তুই বানালি? এক্ষুনি এক্ষুনি?

এক্ষুনি নয়, আগে বানিয়ে রেখেছিলুম।

আমার এখন খুব ভালো লাগছে।

দিদিমণি ক্লাসে এলেন, নাম-ডাকা হয়ে গেলে একটা মেয়ে, তার নাম এখনও জানি না, তড়বড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

কী কথা? এক্ষুনি অমনি টয়লেট পেয়ে গেল?

না, না। আমাদের একজন নতুন মেয়ে এসেছে। দেখুন ওই যে স্বরূপা, ও না পদ্য বানাতে পারে।

দিদি বললেন, 'তাই নাকি? বলো তো?'

দিদিমণির রাগি মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল, আমি উঠে দাঁড়িয়ে চুপটি করে থাকি।

মেয়েটা বলল, 'বল না, সেই যে বলছিলি—পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হারু ফেরেন বাড়ি—বল না।'

আমি চুপ।

দিদিমণি বললেন, 'এটা ওর নিজের বানানো কেন হবে? এ তো সুকুমার রায়ের লেখা। আমি শুনেছি ও অ্যাডমিশন টেস্টে খুব ভালো কবিতা বলেছিল।'

'না দিদি'—মেয়েটাও ছাড়বে না—'ও বলেছে ওটা ওর নিজের বানানো।'

তুমি বলেছ? কী নাম যেন তোমার?

স্বরূপা।

সুকুমার রায়ের কবিতা তুমি নিজে লিখেছ। বলেছ?

আমি বলি, 'না।'

'হ্যাঁ দিদি, ও বলেছে, বলেছে, বলেছে! সব্বাই হইহই করে ওঠে।'

স্বরূপা, দাঁড়াও।

আমি দাঁড়াই।

কানে হাত দাও, দু কানে।

আমি দিই না।

'দাও বলছি। দা-ও!' ... আমি বড়োপিসি ছোটোপিসি ঠাম্মা সবার গলা শুনতে পাই।

তখন আমি কানে হাত দিই।

হ্যাঁ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, যতক্ষণ না আমি বসতে বলছি।

দিদিমণি পড়াতে থাকলেন। কী ছাইভস্ম আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ইচ্ছে করছে এই মেয়েগুলোকে ঘুষি মেরে মুখ ফাটিয়ে দিই। এমন মারব না যে বাছাধনদের আর নালিশ করতে হবে না।

কিছুক্ষণ পর দিদিমণি বললেন, 'আর কখনও মিথ্যে কথা বলবে?'

আমি মুখে মুখে জবাব দিই, 'মিথ্যে কথা বলিনি।'

আবার বাজে কথা বলছ?

আমি মজা করেছিলুম। কী করে জানব ওরা জানে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, বোসো। এমন মজা আর করবে না।

ক্লাস ভেঙে গেলে কতকগুলো মেয়ে বলল, কীরে কেমন খেলি? আমি মুখ বাঁকিয়ে বললুম, 'আবোল-তাবোল জানে না,' 'খাই-খাই' জানে না আবার ক্লাস থ্রির মেয়ে হয়েছে। ইঃ!!

নালশে মেয়েটা বলল, 'তুই একটা মিথ্যেবাদী।'

তুই তো একটা কেলে-কুচ্ছিত, বিশ্রী!

আমি রাগে অন্ধ হয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। অন্য সব মেয়েরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লম্বামতো মেয়েটা এসে তাড়াতাড়ি আমাদের ছাড়াতে লাগল।

'এই কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? ঠিক আছে শোধবোধ? শোধবোধ!'

আমি উঠে দাঁড়াই, আমার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। ও উঠে দাঁড়ায়, ওর কপালে আলু। দু-জনেরই চুল উলোঝুলো, জামাকাপড় ধুলোয়-ধুলো।

আমি তো মিথ্যেবাদী! তাই বাড়ি গিয়ে বলি, খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি। বিচ্ছিরি স্কুল, বিচ্ছিরি দিদিমণি, বিচ্ছিরি মেয়েরা....

'তোর কি কিচ্ছু পছন্দ হয় না।'

আমি গোঁজ মুখে বসে থাকি। আমার আর ইস্কুলে যাবার শখ নেই।

কিন্তু তাই বললেই কি হয়? স্কুলে আমাকে যেতেই হয়। বাবার কড়া হুকুম। রাগুদার! বাপ রে! আমাকে ওরা বলে রাক্কুসি, আমিও ওদের বলি, শূর্পনখা, তাড়কা, অলুম্বুষা, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ। আমি রামায়ণ সব জানি, ছোটোদের মহাভারত পড়েছি, কতবার! ওরা কিচ্ছু জানে না। এমন কি ঘটোৎকচ যে ছেলে-রাক্ষস তা পর্যন্ত জানে না। খালি কটমটে নামগুলো শুনে দাঁত কিড়মিড় করে। আমি দূরে পালিয়ে গিয়ে বলি, 'আয় না ধর ধর, রাক্কুসিকে ধর, কাঁচা খেয়ে নেব। অনেক ছুটেও ওরা আমাকে ধরতে পারে না। হেরো। কাঁচকলা! লবডঙ্কা।'

তখন ওরা সবাই মিলে একদিন আবার দিদিমণির কাছে নালিশ করল। দিদিমণিও আমাকে খুব বকলেন। আমিও বলি, 'আমাকে যে ওরা রাক্কুসি বলে খ্যাপায়, তার বেলা?'

দিদিমণি বলেন, 'ছি, ছি, ছি? রূপ ঈশ্বরের দেওয়া। সব্বাই তো সমান হয় না। তাই বলে ওইরকম করে বলবে? তোমাদের একটা দয়ামায়া বলে জিনিস নেই?'

কে চেয়েছে দয়ামায়া? আমার ভারি বয়ে গেছে চাইতে। আমি ওদের সঙ্গে ঘুরি না। একা একা থাকি। খেলার মাঠে সবার আগে পৌঁছে যাই দৌড়-রেসে। খেলাদিদি আমাকে হাইজাম্প শেখান, লংজাম্প শেখান। চু কিতকিত খেললে আমি বোঁ-ও করে ওদের কোর্টে গিয়ে যেটাকে সামনে পাই পেটে খোঁচা মেরে চলে আসি। কেউ আমাকে ধরতে পারে না। ধরবার সাহসই নেই। চোখগুলো কটমটে করে একটা ঝটকা মেরে যেমনি দৌড়ে যাই, ওরা ভয় পেয়ে যায়। আমাদের দল জেতে। আমাকে দলে নেবার জন্যে সব ছটফট করে। আমি কাউকেই চাই না। কোনো কথা

বলি না। দিদিমণি যে দল ঠিক করে দেন সেই দলেই খেলি। একা খেলি, একা জিতি। দল জিতল কি না জিতল ভারি বয়ে গেল আমার!

এই করতে করতেই একদিন খুব মারামারি লেগে গেল।

ওরা বলল, এই, পেটে খোঁচা দিবি না।

আমি বলি, এই, রাক্কুসি বলবি না।

রাক্কুসিকে রাক্কুসি বলব না তো কী বলব?

আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম, সামনে যাকে পেরেছি জাপটে ধরেছি, মারছি, কিল, চড়, ব্যাস, ওরাও সেই আর একদিনের মতো সবাই মিলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি পড়ে গেলুম, ওরা সবাই আমায় ঘিরে ধরে মারছে। চোখের পাতা ফুলে গেছে, কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে, হাতে কালশিটে। বড়দিদিমণির কাছে আমায় যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন আমার জামা ছেঁড়া, কাঁধ বেরিয়ে গেছে। ভীষণ বকুনি খাচ্ছে মেয়েগুলো। আমার যা আনন্দ হচ্ছে না!

মিনমিন করে একজন বলছে, 'পেটে খোঁচা দেবে কেন? মোর করতে হলে পেটে খোঁচা দিতে হবে।'

বড়দি বলছেন, 'তাই বলে এইভাবে বারো তেরোজন ঘিরে ধরে মারবে তোমরা? তোমরা তো কাওয়ার্ড। সুচরিতা! এ তো গণপ্রহারের শামিল!'

খেলার সুচরিতাদি কী বললেন আমি কিন্তু আর শুনতে পেলুম না। হঠাৎ আমার চারদিকে কারা হিজিবিজি করে হলুদ বনের কলুদ ফুল ছড়িয়ে দিতে লাগল, তারপর একটা মাঝরাতের মতো অন্ধকারের মধ্যে সব মিলিয়ে যেতে থাকল—মেয়েরা, দিদিরা, স্কুলবাড়ি, আমাদের বাড়ি, ঠাম্মা কাকু জেঠু পিসিরা সব। খালি একটা অনেক উঁচু শূন্য থেকে আমি পড়ছি, পড়ছি। কোথায় পড়ব মা? তোমার কোলে?

কতক্ষণ পরে জানি না, আধা-চোখ খুলে দেখতে পাই একটা অচেনা ঘর, অচেনা জানলা, দরজা, সবুজ পর্দা। এটাই কি তাহলে স্বর্গ? যেখানে আমার মা থাকেন! এ মা! স্বর্গ এইরকম? আমি তো ভেবেছিলুম স্বর্গের ঘর লাটসাহেবের ঘরের চেয়েও বড়ো। সেখানে সব গোলাপি, তা ছাড়া স্বর্গে এমন কিছু একটা ব্যাপার থাকবে যেটা আমি ভাবতেও পারি না। ও তো দেখছি জানা জিনিস সব! এই জানলা দরজাগুলো আলাদা হলেও, এরকম তো আমাদের বাড়িতেও আছে। এইরকম বিচ্ছিরি সবুজের কাছাকাছি কী যেন রঙের পর্দা তো আমাদের বাড়িতেও আছে. ঘাড় ফেরাতে গেলে দেখি ভীষণ ব্যথা! পাশ ফিরতে গেলে হাতে টান লাগল। দেখি হাতের থেকে একটা সরু নল কোথায় যেন উঠে গেছে! আমার ডানপাশে একটা নীচু কাঠের পার্টিশন। তার ওপাশ থেকে সাদা শাড়ি পরা, মাথার কড়া সাদা রুমাল বাঁধা একজন ঢুকলেন। আমি চট করে চোখ বুজিয়ে নিয়েছি, ও হো এটা তো প্রকাশদাদুর হাসপাতাল। উনি তো নার্সদিদি...

হঠাৎ শুনি পার্টিশনের ওপার থেকে রাঙাদার গলা, 'ব্ল্যাক-আউটটা তা হলে বলছেন...

প্রকাশদাদুর গলা, 'হ্যাঁ ঠিক ওর মায়ের মতো, সেম সিম্পটম। ভালো করে পরীক্ষা না করে বলতে পারছি না অবশ্য।'

রাঙাদা বললেন, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যই বটে! এইটুকু একটা মেয়ের এত স্ট্রেস! বউমারটা বুঝতে পারি, তাঁর তো ছিল একেবারে মুখে সেলাই। কিন্তু রাজেন—এইটুকু মেয়ের...'

রাঙাদা তাড়াতাড়ি বললেন, অত মার খেয়েছো। মারামারি করেছে...তার তো একটা!

মারামারিও করেছে বলছে? শিওর? পড়ে পড়ে মার খায়নি? ...

কোনো সাড়া পাচ্ছি না।

ডাক্তারদাদু বললেন, যদি করে থাকে তো আশার কথা। তার মানে ও আত্মরক্ষা করতে শিখছে, কাওয়ার্ডের মতো পালিয়ে বাঁচতে চায়নি। হারজিত লড়াইয়ে আছেই রাজেন। আজ হেরেছে...কাল জিতবে।

'কাওয়ার্ডটা বোধহয় আমাকেই বললেন কাকা!' —রাঙাদা বলে।

না, না। আমি কাউকেই তেমন কিছু বলতে চাই না। যে যার দায়টা ভালো করে বুঝে নিয়ে পালন করা চাই, নইলে দায় নিতে নেই। তুমি কী করেছ না করেছ তুমিই ভালো জানো বৎস। তবে তোমার কন্যা কালো, এক ধরনের কবচকুণ্ডল সে নিয়েই জন্মেছে। তার ওপর যা শুনছি—দশপ্রহরণধারিণী। দেখো, মানুষের মতো বাঁচতে ওর হয়তো বাবা-টাবার দরকার হবে না।

আস্তে, খুব আস্তে, কেমন ধরা-ধরা গলায় রাঙাদা বললেন, 'আ'য়াম সরি।'

এটার মানে আমি জানি, 'আমি দুঃখিত'। আরও একটা জানি, 'কাওয়ার্ড' মানে 'কাপুরুষ'। 'কাপুরুষ' মানে? আমি জানি, কিন্তু বোঝাতে পারব না। কিন্তু আর যেসব হিজিবিজি ওঁরা দুজনে বলাবলি করছিলেন, আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। আমার কানে শুধু লেগেছিল, 'মায়ের মতো, ঠিক ওর মায়ের মতো!' ব্যথা ভুলে গিয়ে আমি চোখ খুলে ফেলি, দেখি সামনে নার্সদিদি, আমারই মতো কালো, ঝুঁকে রয়েছেন আমার ওপরে! দেখি হাতটা, একটা ইনজেকশন...কিচ্ছু লাগবে না...কী ব্যথা করছে না তো?

ব্যথা করছিল ঠিকই। কিন্তু আমি বলি উঁহুহ্।

জ্যোতির্ময়ী গুহ

গত কয়েকদিন ধরেই অদ্ভুত ফোন আসছে। ভুতুড়ে ফোন। কে একজন বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করেন, 'জুতির্ময়ী গুহা বলে কাউকে চিনেন?' ভাষা এবং গলার টোন থেকে বোঝা যায় ভদ্রলোক বাঙালি নয়, কিন্তু বাংলা বলতে পারেন। 'জুতির্ময়ী গুহা বলে কারুকে চিনেন?' ভোর সাড়ে ছটায়, রাত আটটায় অফিস থেকে ফিরে সবে জিরোতে বসেছি তখন, কখনও আবার রাত দশটায়, খেয়ে উঠেছি হয়তো, ছেলে এসে বলল, 'বাবা তোমার ফোন'। সেই এক কথা, এক প্রশ্ন। একদিন সব সীমা ছাড়িয়ে গেল। রাত সাড়ে বারোটায়—ঝনঝন ঝনঝন—ভয়ে আঁতকে উঠেছি। ধর ফোন ধর। কোত্থেকে আবার কী সংবাদ এল রে বাবা। শাশুড়ি হার্টের রোগী। শ্বশুরের হাইপ্রেশার। শেষ মামাটি আজ তিনমাস হল কিডনির রোগে শয্যাগত। যে কোনো জায়গা থেকেই ফোন আসতে পারে। তড়াক করে উঠেছি। নিজের বুকের দবদবানি নিজেই শুনতে পাচ্ছি।

হ্যালো।

সুরঞ্জনবাবু!

হ্যাঁ, বলছি।

জুতির্ময়ী গুহাকে চিনেন? ...

একে ভুতুড়ে ফোন ছাড়া কী বলব বলুন তো।

প্রায় তেড়ে উঠি ঘুমে ভারী গলায়।

কী ভেবেছেন বলুন তো! কে আপনি? বারবার এক কথা। কতবার আপনাকে বলব জ্যোতির্ময়ী-ফয়ী কাউকে আমি চিনি না।

কিন্তু উনি যে বলছেন উনি আপনাকে চিনেন! অনেক কষ্ট করে আপনার ফোন নোম্বর বার করেছি। সারা টেলিফোন গাইডে আর কুনও সুরোঞ্জন করচৌধুরী নাই। কোতবার নোম্বর পালটেছে, ওয়ান-নাইন ফাইভ ওয়ান ফোন করে করে... উনি বলছেন উনি আপনার ভাঞ্জা।

মানে?

সরি? উনি বলছেন আপনি উনার ভাইপো।

মানে উনি আমার পিসিমা? সরি আমার কোনো পিসিমা নেই। জ্যোতির্ময়ী গুহ বলে তো কেউ নয়ই, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না ফর গডস সেক।

ফর গডস সেক আপনি একবার আসুন। একজন লেডির শেষ ইচ্ছা। তিনি আপনার আন্ট নোন কি না জানি না, কিন্তু কারু না কারুর আন্ট তো বোটে। বোলছেন যোখন। ...

কী অদ্ভুত যুক্তি!

কিন্তু শুনতে পেলাম আমি বলছি, সম্ভবত হাল ছেড়ে দিয়ে, 'অল রাইট, বলুন আপনার ঠিকানা।'

তিন বাই এক গুরুসোদয় দত্ত রোড। বালিগঞ্জ।...
আমি একেবারে আপাদমস্তক চমকে উঠেছি।

একটা সময় পর্যন্ত, সম্ভবত বারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনের এক গুরুসদয় দত্ত রোড ছিল আমারই, আমাদেরই ঠিকানা। সে এক বিশাল বাড়ি। বেশ কয়েক পুরুষের বাড়বৃদ্ধি চিন্তা করে তৈরি করা। ঠাকুরদা তিন ভাই। প্রত্যেকেরই যথেষ্ট পরিমাণ ছেলেমেয়ে। মেজো ঠাকুরদার ছেলে আমার বাবারা তিন ভাই এক বোন। একটা সময় এল যখন ওই বিশাল বাড়ি মেরামত করবার সাধ্য বাবাদের রইল না। দুই প্রজন্মের যে তফাত সেটাও বেশ বড়ো হয়ে দেখা দিল। তখনই সর্বসম্মতিক্রমে ওই বাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হয়। এ ঘটনা আমার বারো বছর বয়সের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা। শুধু আমরা কেন, শুনেছি বাড়ি বিক্রির বছর দুই পরেই হার্ট অ্যাটাকে একজন, সেরিব্রাল অ্যাটাকে একজন, আমার দুই ঠাকুরদা গত হন। বাকি দুজন আগেই গিয়েছিলেন। বেশি কথা কি আমার বাবার নিজের বোনই শকে মারা যান। হঠাৎ স্ট্রোক। পিসিমার আমি এবং আমার পিসিমা বড়োই প্রিয় সে সময়টায়। সারা দিনমান তাঁর রান্নাঘরেই কাটত। ওরই মধ্যে সুরোর জন্য ভালো জিনিসটা, পছন্দের জিনিসটা তুলে রাখা ওঁর বাতিক ছিল। তাতে অশান্তিও কম হত না। কেন না আমার আর এক ভাই ও এক বোন ছিল।

কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব রাত। সেসব মানঅভিমান, রাগারাগি। ছড়িয়ে পড়েছি সবাই এখানে ওখানে সেখানে। আমার নিজের ভাই সুজন মারা গেছে, বোন থাকে দিল্লির উপকণ্ঠে। বাবার দুই ভাই, অর্থাৎ দুই জ্যাঠা কবে গত হয়েছে। বাবা-মা গেছেনই। অন্য ঠাকুর্দাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একেবারেই ছিন্ন। যখন সবাই এক ছাদের তলায় ছিলুম তখন সম্পর্ক জ্যান্ত ছিল। ভাই বোন! এক একজনের বিয়েতে কী ঘটা! কী মজা! কে এখন কোন্ কোণে বাসা বেঁধেছে জানি না। জানতে খুব একটা উৎসাহও নেই! আর! নিজেই অবসর নিলুম এ বছর, কে আর ঠিকানা মনে রাখে। এমত অবস্থায় জ্যোতির্ময়ী গুহ, পিসিমা আবার তিনের এক গুরুসদয়ের প্রাচীন ভিটেয় আবির্ভূত হলেন? আমি তাঁর ভাইপো? বলছেন একজন অবাঙালি? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো!

আমরা থাকি স্টেশন রোড, চন্দননগর। গুরুসদয়ের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পর আমরা চলে যাই দমদম। ভাই সুজন বড়োসড়ো ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল, অবধারিতভাবে চলে গেল 'সব পথ এসে মিলে গেল শেষে' যেখানে সেই মেল্টিং পট আমেরিকা মহাদেশে। সেখানে ওয়াশিংটনের এক রাস্তায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। বিয়ে হয়নি, ভাগ্যিস! এ ঘটনার জের আমরা কেউ কাটাতে পারিনি। মা মাবা গেলেন দু বছরের মধ্যে। বাবা তাড়াতাড়ি বোনের বিয়ে দিয়েদিলেন। দমদমের বাড়ি বিক্রি করে চলে এলুম শ্বশুরবাড়ির দেশ চন্দননগরে, নিরিবিলিতে। তা এখন, দমদমও যা চন্দননগরও তা। বাবা যদ্দিন ছিলেন তদ্দিন অবশ্য শান্ত, সুন্দর স্ট্র্যান্ড, ফরাসি স্থাপত্যের সৌন্দর্য এ সবের মধ্যে দিয়ে একটা চলনসই শান্তি পেয়েছিলেন।

কত বছর কেটে গেল চন্দননগর-যাতায়াত করছি। উলটো মুখে যাই বলে ট্রেনের অফিস-টাইম-ভিড় খুব একটা পাইনি। অ্যাম্বিশন ছিল না, বর্ধমান ট্রেজারি অফিসেই কাটিয়ে দিলুম সারা জীবন। নোংরা ঘিঞ্জি অফিস, ফাইলে ফাইলে ধুলোয় ধুলোয় একেক্কার। নিজের ঘরটুকুর আবডাল সরলেই নরক। তবু ওখান থেকে নড়িনি। ভাইয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ত, বিদেশ-বিভুঁইয়ে একলা-একলা মর্মান্তিক মৃত্যু। বেশ আছি, তা ছাড়া সুজনের ক্যালিই কি আমার কোনো দিন ছিল?

ঠিক করি, আর দেরি নয়। পরদিন সম্ভব হল না। কিন্তু তার পরদিনই কলকাতাগামী লোকালে চড়ে বসলুম। কে এই জ্যোতির্ময়ী গুহ? কোন্ ঠাকুর্দার বংশের? নাকি পিসতুতো, মাসতুতো, মামাতো! এঁদের সবার কবেই বিয়ে থা হয়ে গেছে, কত দূরে এখন তাঁদের ফ্যামিলি! বৎসরান্তে একবারও দেখা হয় না, মনেও পড়ে না। এক পিসিমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার স্কুলে ফাইনাল ইয়ার। দমদম থেকে কদমতলায় তাঁদের বাড়ি যেতে যেতেই দিন কাবার। বেলাবেলি ফিরে আসা হয়েছিল।

ভেতর ভেতর একটা প্রবল উত্তেজনা হচ্ছে। পিসিমা বলে নয়, গুরুসদয় বলে। যতদূর মনে পড়ে কোনো সেনগুপ্তরা বাড়িটা কিনেছিলেন। খুব না হলেও বেশ ধনী। অত বড়ো পাঁচ কাঠার ওপর তিনতলা বাড়ি, তার ওপর তিন চার কাঠার বাগান, কিনতে তো পেরেছিলেন! না সারিয়ে ও বাড়িতে আর থাকাও যেত না। বাবার মুখেই শুনেছি—আগেকার দিনের সব পঙ্খের দেয়াল। তাতে বড়ো বড়ো জায়গা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, কড়িকাঠে ঘুণ, যখন তখন চুনবালির চাঙড় খসে পড়ত। ছাদ লিক করা শত চেষ্টাতেও বন্ধ করা যায়নি। মেঝেতে জায়গায় জায়গায় বড়ো ফাটল। জ্যাঠা বলতেন, মেটিরিয়াল ভালো দ্যায়নি আর কি! ঠাকুরদা তাড়াহুড়ো করে বন্ধুর ছেলেকে দিয়ে করালেন। দেখলেন না শুনলেন না!

ট্রেনের ফাঁকা কামরায় বসে আকাশপাতাল ভাবি। সেনগুপ্ত তো বাঙালিই হয়। বড়োজোর পূর্ববঙ্গ। 'কারু না কারুর আন্ট তো বটেই...।' পরিষ্কার অবাঙালি টান ও উচ্চারণ। যেসব বিহারি, উত্তরপ্রদেশীয়, পাঞ্জাবিরা দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে করতে ভাষাটাকে গলায় তুলে নিয়েছেন, কিন্তু মিড় গমক রপ্ত হয়নি তাঁদেরই মতো। তবে বাড়িটা আবার হাত বদল হয়ে গেল? অতখানি জায়গা। বহুতল উঠতেই পারে। ভাবতে বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে উঠল! অভিমানেই হয়তো, এই এতদিনেও ও দিকে যাইনি। সেই বিশাল বিশাল উঁচু সিলিংয়ের ঘর, লম্বা ডাঁটির পাখা, চুন বালি খসা দেয়াল, লাল সবুজ পেটেন্ট স্টোনের মেঝেতে জায়গায় জায়গায় ফাটল, চওড়া দালান, বিরাট খাবার টেবিল, তার ওপর গামছার নেট টাঙিয়ে আমরা পিংপং খেলতুম! গাড়ি বারান্দার ধারগুলোয় কত গাছ! বারোমেসে ফুল, মরশুমি ফুল... কে যে যত্ন করত আজও জানি না। আমার চন্দননগরের বাড়ির টবে সেসব ফুল কিছুতেই ফোটাতে পারিনি। সপ্তমুখী জবা কুঁড়ি হয়ে হয়েই ঝরে যায়। জুঁইয়ের লতাটাই ফনফন করে বাড়ছে, দু চারটে ফুল ফুটতে না ফুটতেই শেষ। আমার স্ত্রী বলে, 'দূর, তার চেয়ে তুমি নয়নতারা আর বোতাম ফুল লাগাও।' বলব কি! তাও আমার ভাগ্যে থাকে না। থাকবে কী করে? শিখিনি তো কী করে রাখতে হয়! চারা পুঁতে দু-চারদিন একটু দেখাশোনা করেই খালাস।

গুরুসদয়ের সেই চুন বালি খসা বালির মেজাজই আলাদা। যেন ইংরেজ-বিতাড়িত ওয়াজেদ আলি শাহ মেটিয়াবুরুজে এসে উঠেছেন। আমাদের কখনও মনে হয়নি বাড়িটা বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। বড়োরাই এসব ভাবতেন। দালানের বাঁকে, বারান্দার কোণে, ছাদের পাঁচিলে, এ কাকার খাটের তলায়, ও ঠাকুমার আলমারির পেছনে আমাদের জন্যে কত যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, ঘনাদা, শার্লক হোমস, জিম করবেট ওত পেতে থাকত! সিলিং থেকে দেয়ালের খসা ছালচামড়ার ছোপছাপে, মেঝের ফাটলে আমাদের জন্যে রহস্য ঝুলে থাকত, স্বপ্ন উঁচিয়ে থাকত! সেই গুরুসদয় ফ্ল্যাটবাড়ি? কৃপণ বারান্দা, কৃপণতর রান্নাঘর, বাথরুম, হয়তো আজকালকার কেতার ড্রয়িং ডাইনিং একত্রে করতে গিয়ে ঘরগুলো দশ বাই দশ। তারপরেই একটু আশা জাগে ওখানে রইস লোকেরাই থাকবেন। তাঁদের অন্তত ষোলো বাই ষোলো চাই। বারান্দার কৃপণতাও তাঁদের পছন্দ হবার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে তাঁরা বারান্দায় বসে সান্ধ্য চুমুকগুলো দেবেন কী করে? রান্নাঘরে অত গ্যাজেটসই বা ধরবে কেন?

এই সব ছাইপাঁশের সঙ্গে সঙ্গে তুতো ভাইবোনেদের ছোটোবেলাকার মুখ মনে পড়ে। স্মৃতিতে সবাই সার দিয়ে দাঁড়ায়। এই দেখছি, এই উধাও. যেন ভোজবাজি। আমাদের এখনকার বয়সের চেয়ে অনেক ছোটো মা বাবা কাকা কাকিমা জ্যাঠা জেঠিমাদেরও দেখতে পাই। পিসিমার মুখ মনে পড়ে। এখন ভেবে দেখতে গেলে এঁরা অনেকেই যুবক যুবতিই ছিলেন। কিন্তু আমরা সবসময় তাঁদের বড়ো অর্থাৎ বয়স্ক ভেবে এসেছি। এখন আমরা বুড়ো হতে ভয় পাই. কিন্তু তখন ঠাকুরদার শুকনো গাল, ঠাকুরমার ফোকলা হাসি—এসব কী ভালো লাগত! অদ্ভুত!

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে থামতে বলি। অন্তত বছর কুড়ি এদিকে আসিনি। সব কেমন বদলে গেছে। অত চওড়া রাস্তাটাকে সরু লাগছে। একটা বিরাট ভ্যাটের ওপর চারপাশে জঞ্জালের স্তূপ। দুর্গন্ধ ঢিবির ওপরে কুকুর বেড়ালের মোচ্ছব। এবার আমাকে নেমে খুঁজতে হবে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সুতরাং হাঁটতে থাকি। এবং হঠাৎ-ই চোখে পড়ে যায় ৩/১ গুরুসদয় দত্ত রোড। চিনতে পারিনি, তবু চিনেছিলাম। এ যে কী রকম অনুভূতি আমি বলে বোঝাতে পারব না। সেই একই গাড়ি বারান্দা। কিন্তু এখন বাহারি গ্রীলে ঢাকা সবটা। ওপরে লাল মতো দেখতে ঢালু ছাদ। সদর দরজা আগাগোড়া ঝকঝকে পালিশ। সেই বাড়ি কিন্তু পুরো সাদা ধবধবে. স্নো হোয়াইটের দেশ থেকে বুঝি উঠে এসেছে। নিয়মিত এ বাড়ির রং ফেরানো হয় নিশ্চয়. এতটুকু বৃষ্টির শ্যাওলা পর্যন্ত নেই। আগাগোড়া রইস. শুধু রইসই নয়. আরও কিছু। কোথা থেকে যে নেমে এসেছে? স্বর্গ থেকে? না স্বপ্ন থেকে?

সামনে দাঁড়িয়ে দারোয়ান। তাকে ছোটো টুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে দিতে হল। সে সেটাকে চালান করল ভেতরে অন্য হাতে। পাঁচ মিনিট... ছ মিনিট. . তারপরেই সেলাম করে দরজা খুলে দিল দারোয়ান। আমি আমাদের সেই পুরোনো চওড়া গলিপথের মধ্যে ঢুকলুম আটচল্লিশ বছর পরে।

মাথাটা এরা ঢেকেছে। জায়গায় জায়গায় কাচের মতো বড়ো বড়ো ফাইবারের চতুর্ভুজ। মধ্য দিনের আলো মৃদুতর হয়ে ঢুকছে গলিটায়। নানারকম কুচো পাথর দিয়ে তলাটা বাঁধানো। লোকটি আমাকে প্রথম দরজা ছাড়িয়ে দ্বিতীয় দরজার দিকে নিয়ে গেল। আমি জানি এটা অন্দরের দরজা। অর্থাৎ বৈঠকখানা, বড়ো জেঠুর ল লাইব্রেরি, হলঘর এগুলো আমার দেখা হবে না। ঢুকি ভেতর মহলের ঢাকা দালানে। সমস্ত একই আছে তবু বদলে গেছে। লাল সিমেন্টের জায়গায় গোলাপি আভার নিষ্কলঙ্ক শ্বেতপাথর। দূরে দূরে একটা করে ছোট্ট কালো রুইতন! সিঁড়িটার ধাপ এখন অনেক নীচু নীচু। আকারটা পালটে গেছে। দুটো মোচড় দিয়ে উঠেছে সিঁড়িটা। একই রকম মার্বেলের। পাশের রেলিং-এর ওপরের পাত ঝকঝকে পেতলের।

এই সিঁড়ির তলায়, সাদা ধবধবে ধুতি আর মেরজাই পরে ততোধিক ধবধবে, প্রায়-গোলাপি মার্বেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া গাত্রবর্ণের প্রশান্ত চেহারার এক বৃদ্ধ। একটু মোটা। চুলগুলো যেটুকু আছে ধবধবে, বাকিটুকু টাক।

বললেন, 'আসেন সুরোঞ্জনবাবু। আমি ভীষ্ম নরজাতিয়া।'

হাতজোড়. মুখে প্রশান্ত হাসি। হাসির উলটো পিঠে যেন একটা আশ্চর্য বিষণ্ণ গাম্ভীর্য।

ভীষ্মনাথ না বিশ্বনাথ প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। পরে খেয়াল হল ভীষ্মর 'ম'টা উনি উচ্চারণ করেছিলেন। জীবনে প্রথম শুনলাম এই নাম।

সিঁড়ি বেয়ে উঠি। উনি ওঠেন অবলীলায় ধুতি পরে. আমি উঠি হোঁচট খেতে খেতে ট্রাউজার্স পরে। কেননা আমার পায়ে এখন আটচল্লিশ বছর আগেকার ছন্দ। সিঁড়িটা বদলে যাওয়ায় সেই অভ্যাস ধাক্কা খাচ্ছে। ছন্দভঙ্গ হচ্ছে।

ওপরে উঠি। বেশ কিছু ধবধবে মহিলা ও পুরুষ শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাকে দেখেন। কেউই ঠিক যুবা বয়সের নয়। মহিলারা সাদা জমির ওপর লেসের পাড় দেওয়া শাড়ি সামনে আঁচল করে পরেছেন, কোমরে রুপোর চাবির গোছা, পরিষ্কার চুল আঁচড়ে বাঁধা। পুরুষরা পরেছে একই রকমের ধুতি ও মেরজাই।

দোতলায় উঠে আর নিজের বাড়ি চিনতে পারি না। এঁরা বোধহয় ঘরের মাঝের দেওয়ালগুলো ভেঙে একেবারে রিমডেল করে নিয়েছেন সব। ঘরের মধ্যে দিয়ে ঘর তার মধ্যে দিয়ে দালান, তারপরে আবার ঘর... যেন গোলকধাঁধা। কোনোটাই শোবার ঘর না। উঁচু তক্তপোশে গদির বিছানা, পাশে তাকিয়া... সম্ভবত কাজের জন্য। পেতলের পিকদান। ফাইল ক্যাবিনেট। ছোটো টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এই ভাবেই অবশেষে যে ঘরে এসে পৌঁছোই সেটা বোধহয় এঁদের অন্দরের বসার ঘর। দেয়ালে দেয়ালে পৌরাণিক কাহিনির ছবি সব। ভীষ্মনাথ খুব খাতির করে আমাকে একটি দোলনায় বসালেন। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ট্রেতে লম্বা সাদা পাথরের গ্লাসে পানীয় এল। ভীষ্মনাথ একটি গ্লাস আমার হাতে তুলে দিলেন, আর একটি নিজে নিলেন। বললেন, 'পিজিয়ে, খান।'

'দরকার ছিল না।' —আমি বলি, 'আমি এ সময়ে...'

'এখোন আপনার লাঞ্চ টাইম এঁরা জানেন,' —আশেপাশে ম... দি.কে তাকিয়ে বললেন তিনি।

মহিলারা নিঃশব্দে নমস্কার করলেন।

আমি কী বলব ভেবে পাই না। 'এঁরা জানেন' মানে কী? মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হচ্ছে না কি? সর্বনাশ! চিনি না জানি না। আর যাঁর নির্বন্ধে আমার আসা সেই জ্যোতির্ময়ী গুহ কোথায়? তাঁকে দেখব এবং দেখা দেব বলেই তো ছুটে এসেছি। যতটা না এই অচেনা মহিলার টানে, তার চেয়েও বেশি রহস্যের টানে। এখনও আমার মনে হচ্ছে একটা রূপকথার মতো কিছুর মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

ভীষ্মনাথ যেন আমার মনের কথা পড়তে পারলেন, বললেন, 'শরবতটা পিয়ে নিন, অনেক দূর থেকে আসা হচ্ছে তো!'

কী করি! শরবতটা পিয়েই নিই। ভারি সুন্দর, সুস্বাদু, তবে একটু গুরুপাকও বটে! এই সব হজম করে করেই বোধহয় এঁদের এমন চিকন গোলাপি চেহারা। তা ওঁর থেকে আমার পানের স্পিড ছিল অনেক বেশি, কেননা শরবতের চেয়ে জ্যোতির্ময়ীতেই আমার আগ্রহ বেশি। উনি একবার শান্ত সুরে বললেন, 'ধীর সে, ধীর সে...'

আমি বলি, 'উনি কোথায়?'

কে? আপনার আন্ট?

না, মানে জ্যোতির্ময়ী গুহ।

হচ্ছে চলুন।

একটা নাতিবৃহৎ ঢাকা দালান পার হতে হল। দু-একজন মহিলা নিঃশব্দে সরে গেলেন। হয়তো কৌতূহল ছিল, কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগবে ভেবে। তারপর যে ঘরটাতে ঢুকলুম সেটার আপাদমস্তক আমার চেনা। যদিও তার ছালচামড়া ছাড়িয়ে আইভরি প্লাস্টিক পেইন্ট আর মার্বল, যদিও জানলাগুলোয় রঙের বদলে মেহগনি পালিশ। কিন্তু সেই প্রিয় খড়খড়ি, লম্বা লম্বা গরাদ দেওয়া প্রায় দরজার মতো লম্বা লম্বা জানলা। লম্বালম্বি ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড ঝুলছে সেগুলো থেকে। এখন আড় করা হয়েছে, মেঝেতে তাই আলো ছায়া। সে আলোর আলোও খুব সুন্দর। সে ছায়ার ছায়াও

যেন অলৌকিক। এবং বড়ো ঠাকুমার সেই ঘরে, বড়ো ঠাকুমারই উঁচু পালঙ্কের ওপরে সাদা ধবধবে মোটা বিছানায় শুয়ে রয়েছেন একজন। এঁদেরই মতো ধবধবে বৃদ্ধা। তাঁর অনেক বয়স। শুষ্ক কুঞ্চিত দেহ, ছোটো করে ছাঁটা সামান্য রুপোলি চুল। তা সত্ত্বেও আমার চিনতে কোনো অসুবিধে হল না ইনি আমার নিজস্ব, একেবারে বাবার সহোদরা পিসিমা যিনি আমার বারো বছর বয়সে মারা গেছেন। বিস্ময়ের ধাক্কায় প্রথমটা কথা বলতে পারিনি, তারপর কোথা থেকে যে আমার মধ্যে থেকে পিসিমার বারো বছরের সুরো উঠে এল আমি জানি না। চারপাশের সমস্ত অপরিচিত লোক, অপরিচিত পরিবেশ, আমার বয়স, পিসিমার বয়স সব বিস্মৃত হয়ে আমি পালঙ্কের দিকে প্রায় ছুটে গেলুম, দু-হাত বাড়িয়ে বললুম, 'পিসিমা!' আমার চোখ টনটন করছিল।

ক্ষীণকণ্ঠে উনি বললেন, চিনতে পেরেছিস তাহলে?

'তুমি কী করে—এখানে... আমার...' আমি কোনো কথা কোনো অনুভূতিকেই রূপ দিতে পারি না।

ভেবেছিলি মরে নিশ্চিন্দি হয়ে গেছি, না রে? ...

আমি কিছু বলতে পারি না।

ভীষ্ম বরজাতিয়া কেমন একরকম দুঃখের হাসি হেসে বললেন, 'ভাইয়া, আপনাকে একটা কাহানি সুনাই। এই যে দেখছেন সুরিয়মহল, জানেন একসময়ে এ ছিল করচৌধুরীদের হাতে। তাঁরা এটা বেচে দ্যান সেনগুপ্তদের। সেনগুপ্তরা এসে শুনতে পান এ বাড়িতে আত্মা আছে, তো তাঁরা মাস ছয়েক পরেই বাড়িটা বেচে দ্যান আমাদের, বরজাতিয়াদের। সোস্তায় পেয়ে যাই।

আমি বরজাতিয়াদের বোড়ো ভাই, আত্মা ভয় করি না। সুনা ছিল ছায়া দেখা যায় এ বাড়িতে, রাতের বেলা ঘোরে, দীপ জ্বালে, আবার নিভায়। আমি খুঁজতে খুঁজতে এই ভাঙা বাড়ির গুদাম ঘরে পুরোনো কাঠ, টিন, বোরাউরা, আরও কোতো জঞ্জালের মধ্যে উনাকে খুঁজে পাই। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন, ভাইজি, এ আমার বাস্তুভিটা, বাপ-পিতামহ, আমি, আমার ভাইবোনেরা, ভাইপো-ভাইঝিরা সোব এখানে জন্ম নিয়েছি, কোতোজন মারা গেছেন, এখানে আমার বিয়ে হল, বেওয়া হয়ে দুই বছরের মধ্যে এখানেই ফিরে এলাম। কোতোজনকে মানুষ করেছি, ভাইপো-ভাইঝিদের, বোনপো-বোনঝিদের, এঁদের সোংসার সামহাল দিয়েছি, এই ভিটা বই কিছু জানি না, চিনি না। ওরা সব বেচেবুচে দিল, আমাকেও তো তাহলে বেচেই দিল, না কী? তাই আমি এখানে মাটি কামড়ে রয়েছি। আপনাদেরও সোংসার সামলাবো, আমাকে.. দাসী রাখুন। ভাইয়া পুরা ছয় মাস উনি এখানে লুকিয়ে ছিলেন। গুদোম ঘরে চাল-ডাল-আলু-কেরোসিন লুকিয়ে রাখতেন। খিড়কির দরজার ডুপ্লিকেট চাবি ওঁর কাছে ছিল। সাঁঝ ঘন হলে কুনও কুনও দিন ঘরে ঘরে ঘুরতেন, ছাদে যেতেন, কখুনও কখুনও বাইরে ভি। ভাইসাব আমি তোখন বুঝে নিলুম কি ইনিই এ সুরিয়মহলের সূরিয়। তাই আমরা ওঁকে আদর করে রেখেছি। এতদিন ওঁরই কাছে বাংলা শিখলাম, কোতো কী জানলাম। কিন্তু কুনও দিন উনি ভাই-বহেন, ভাঞ্জা-ভাঞ্জি কারু খোঁজ তো কোরেননি। আজ এতদিন পর উনার নব্বই পার হল উনি সুরোঞ্জন করচৌধুরীর তালাশ করছেন... তাই...'

পিসিমার শুকনো হাতে আমি হাত বুলিয়ে দিতে থাকি, চোখ দিয়ে জল ঝরছে. উনি দ্বিগুণ মমতায় আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দ্যান। হাতগুলো এতকাল পরেও সেই একই রকম তুলতুলে, সুখস্পর্শ আছে।

'ওরা তোদের বুঝিয়েছিল আমি মরে গেছি। না রে?'

নব্বই বছরের পিসিমার কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও আশ্চর্য স্পষ্ট।

আমি কিছু বলি না। ভেতরে ভেতরে একটা কষ্ট, একটা ক্ষোভ জমা হতে থাকে।

'আর কী-ই বা বলবে বল্! যাবার সময়ে আমাকে খুঁজে পেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে রে সুরো। কেলেঙ্কারির ভয়ে খালি থানাপুলিশ, ছবিছাবাটাই করেনি। তারপর মানুষের আর কী বলবার থাকে বল্!'

হঠাৎ দেখি ভারে ভারে খাবার আসছে। কয়েকজন নীরব মহিলা নিশ্চুপে একটা টেবিল বসিয়ে দিয়ে গেলেন, ভীষ্মনাথ একটা চেয়ারে। খাটের দিকে মুখ ফেরানো চেয়ারের।

ভীষ্ম বললেন, 'দুপুর হল। লাঞ্চের সময়। খেয়ে নিন ভাইয়া, আপনার আন্টজি এসব বলে বলে করিয়েছেন। মছলি-গোস্ত এ সব তো আমাদের ঘোরে ঢোকে না। একটু কষ্ট হোবে আপনার।'

আমি একবার আপত্তি পর্যন্ত করতে পারলুম না। একজন হাতে জল ঢেলে দিলেন। হাত ধুয়ে যা পারি খেয়ে নিলুম। কতদিন আগেকার রান্না সব! অপূর্ব স্বাদ ছিল পিসিমার রান্নার। এখন নিজের জিভের স্বাদকুঁড়ি বোদা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বুঝি নিখুঁত রেসিপি দিয়ে তৈরি হয়েছে এ সব। অনেক রকম। এঁরা কি জানতেন, পিসিমা কি জানতেন আমি আজই আসব? আশ্চর্য! আমি মিষ্টি খেতে পারতুম না, তাই পিসিমা রসে দেবার আগে আমার জন্য খাবার-দাবার তুলে রাখতেন। আজও দেখি সেই রসে না দেওয়া খাজা।

আমার খাওয়ার পর দুজন মহিলা দেখলুম পিসিমাকে খাওয়াতে এলেন। দুধ মিষ্টি এই সব খাদ্য। আর তখনই বুঝতে পারলুম পিসিমা চলচ্ছক্তিরহিত। ভাবতে থাকি, ভাবতে থাকি। কীভাবে ওঁকে, আমরা নিজের পিসিমাকে এই পরাশ্রয় থেকে নিয়ে যাব। গাড়িতে হবে না। অ্যাম্বুলেন্স চাই। সে না হয় হল। কিন্তু আমাদের চন্দননগরের বাড়িতে শোবার ঘর মাত্র দুটো। একটাতে আমরা থাকি। আরেকটাতে বাবা থাকতেন নাতিকে নিয়ে। এখন বাবা চলে গেছেন। নাতিরই ঘর হয়ে গেছে সেটা। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা বসে, স্টিরিও চলে, ধূমপানও চলে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সে এলেই শোবার অসুবিধা হয়। আমাকে নীচের বৈঠকখানায় নেমে যেতে হয়। ছেলেরও বছর আঠাশ বয়স হল। চাকরিবাকরি করছে। বিয়ে দিলেই হয়। এর মধ্যে কোথায় এই চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধাকে নিয়ে তুলব? কিন্তু এসব ভেবে তো লাভ নেই। নিয়ে আমাকে যেতেই হবে। এতদিন পরে মৃতা পিসিমার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাবির্ভাবে আমার স্ত্রীর মনের অবস্থাই বা কী হবে ভাবতেও ভয় পাচ্ছি। এঁকে তো সেবাযত্নও করতে হবে, শয্যাশায়ী যখন। মনে মনে দ্রুত একটা হিসেব কষে নিই। দুবেলা দুজন আয়া রাখলে দৈনিক ১২০ টাকা, শুধু নাইটে রাখলে ৬০ টাকা মিনিমাম। আর যদি তুতিয়ে পাতিয়ে সারা দিনের জন্য কাউকে রাখা যায়। মাসে এতগুলো টাকা আসবে কোত্থেকে? এটাই বড়ো খরচ। তা নয় তো উনি কী-ই খান আর কী-ই বা পরেন। ছেলের কাছ থেকে আমি কিছু চাই না, সে নিজে থেকে যা দেয়, দেয়। আমার অবসরোত্তর পাওনাগণ্ডার অঙ্ক নেহাত খারাপ নয়, কিন্তু সরকার সুদ কমিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য পেনশনারদের মতো আমিও মুশকিলে পড়েছি। একটা এফ. ডি. ভাঙাতেই হবে। আমরা দুজন না হয় বৈঠকখানাতেই শোব। বাইরে গ্রিল ঘেরা যে বারান্দাটুকু আছে ওখানেই অতিথি আপ্যায়ন...

'ঘুমিয়ে পড়লি নাকি কে সুরো?'

পিসিমা খুব অল্প অল্প করে খাচ্ছিলেন। থেমে থেমে। এবার জিজ্ঞেস করলেন। সেবাকারিণী মহিলা দুটি স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

বলি, 'না, তোমার খাবার সময়ে কথা বলতে চাইছিলুম না। তোমার তো আবার...'

'তোর মনে আছে?' —পিসিমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খাবার সময়ে কথা বলে ফেললে পিসিমার আর খাওয়া হত না। মায়ের তাই কঠোর নির্দেশ ছিল দিনে রাতে কোনো সময়েই যেন আমরা পিসিমার খাবার সময়ে ঘুরঘুর না করি।

আমার দাদারা দিদিরা কেউ কি বেঁচে আছে? হ্যাঁ রে?

না পিসিমা।

সুজ্জু কী করছে?

কী বলব? বলি—ও তো আমেরিকায়।

তাই বল, আর নীলি?

নীলি মানে নীলাঞ্জনা, আমার বোন। নামগুলি পিসিমারই দেওয়া।

তোমার নীলি এখন ঠাকুমা দিদিমা হয়ে গেছে পিসিমা।

নিদন্ত মুখে বড়ো তৃপ্তির হাসি হাসলেন উনি। বললেন, 'সে হয়তো তুইও হয়েছিস! কিন্তু আমাব কাছে তোরা সেই নীলি, সেই সুরো, সেই সুজু... দিনরাত খুনসুটি করছে আর সালিশির জন্যে রান্নাঘরে ভিড় করছে। বউদির কাছে বকুনিও তো কম খেতিস না।'

'যা বলেছ!'

আরও কিছুক্ষণ পুরোনো দিনের গল্প হল। তারপব শুশ্রূষাকারিণী মহিলারা বললেন. 'এবার মায়ির বিশ্রামের সময় হল।'

খাওয়ার সময়ে ওঁবা পিসিমাকে উঠিয়ে বসিয়েছিলেন। আমি প্রণাম করি, 'পিসিমা, আজ তাহলে আসি!'

'আয়', খেদহীন প্রসন্নতার হাসি হাসলেন।

ভীষ্মনাথ বরজাতিয়া আর তাঁর অন্তঃপুরের মহিলাবা কোথায় ছিলেন জানি না, একে একে আবির্ভূত হলেন সবাই। ভীষ্ম আমার হাত দুটি ধরে বললেন, 'বহোৎ বহোৎ সুক্রিযা ভাইসাব, আপনাকে কোত্তোদিন কোতো বাত ফোন করে বিরক্ত করেছি। কিন্তু দেখছেন তো ভুল কিছু বোলেনি। আসেন।'

দালানে দু ধারে মহিলারা দাঁড়িয়ে যেন আমায় বিদায় জানাচ্ছেন। ভীষ্মনাথ আমাব পাশে যেন কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তি। সংকোচে বলি, 'আমায় কিছুদিন সময় দিন ভাইসাব। ব্যবস্থাদি করে ..'

'সোময়? বেবস্থা?'—উনি ঈষৎ অবাক হযে আমাব দিকে তাকালেন। সিঁড়ি এসে গেছে। উনি থেমে গেছেন। আমি বলি, 'পিসিমাকে নিয়ে যাবার একটা.. '

মুখ থেকে বিস্ময় সরে যায়। উনি বলেন, 'আন্টজি কুথাও যাচ্ছেন না ভাইসাব। উনি যেতেও চান না। আপনাকে বললাম কিনা জুতির্ময়ী দেবী এ বাড়ির আত্মা। আত্মা তখনই দেহ ছাড়ে... যোখন... হাতজোড় করে বললেন—সোময় এসে যায়। আপনাকে দেখতে চেয়েছিলেন, দেখলেন, বাস।'

আমার ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে আছে। আমি সিঁড়ি বেযে নামতে থাকি। নীচের দালানেও কিছু মহিলা, কিন্তু ভদ্রলোক। কেউ কোনো কথা বলেন না, শুধু একটা সৌজন্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকেন, নমস্তে করেন। দরজার কাছে এসে বলি, 'আপনাদের ফোন নম্বরটা?' ভীষ্মনাথ হাসলেন, কথা বললেন না।

'মাঝে মাঝে দেখে যাবো পিসিমাকে।'

উনি ডাইনে বাঁয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

বিপুল কিন্তু নম্র চেহারার এক ভদ্রমহিলাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে নিবেদন করি, 'মাঝে মাঝে, ধরুন, মাসে একবার।'

উনি কথা বললেন না। মুখের ভাবে কেমন একটা শেষ কথা বলার সংকল্প। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন।

বেরিয়ে আসি। পেছনে সূর্যমহলের ফটক বন্ধ হয়ে যায়। দারোয়ান কেঠো ভঙ্গিতে সেলাম ঠোকে। আমি ফেরার রাস্তা ধরি। আমির আলি অ্যাভেনিউ-তে এসে বেকবাগান-হাওড়া মিনি। সিট পাই পেছনে, হাওড়া পৌঁছোই, ব্যান্ডেল লোকাল ধরি। সামনে একজন সিগারেট ফুঁকতে থাকেন, আশেপাশে ভিড় বাড়তে থাকে। সত্যিই তো আমার কী অধিকার... বরজাতিয়াদের ফোন নাম্বার গাইডে থাকলে খুঁজে বার করাই যায়... কিন্তু সত্যি, যিনি নিরুদ্দিষ্ট হলে খুঁজে বার করতে না পেরে মৃত্যুর কথা রটনা করে দিয়েছি... ফেরিওয়ালারা ওঠে, মার্কামারা ডাক—'চুপচাপ বসে না থেকে টুকটাক চালান দাদারা...চাটনি লজেন্স...এর মধ্যে আছে আমলা হরীতকী জোয়ান...বিটনুন,' ...বড়োরা রটালেন আমরাও বিশ্বাস করে নিলুম জ্বলজ্যান্ত মানুষটা. 'ঝালমোড়ি, ঝালমোড়ি, কেষ্টদার বিখ্যাত ঝালমোড়ি। ঝাল পাবেন, মুড়িও পাবেন। মজা ফাউ, মজা ফাউ...' 'দু মলাটের মাঝখানে দেড়শো জোক দাদা...দেড়শো... এক ছেলে তার মাকে বলছে, মা, বাবা এবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে! মা বলছে দূর, তোর বাবা আমার সামনেই দাঁড়াতে পারে না.. দেড়শো জোক.. সোসায়টিতে বলুন—লেডিদের কদর পাবেন..' পিসিমার দিন ঘনিয়ে এসেছে...ওঁরা কি মৃত্যুসংবাদটাও? চারদিকে এত মানুষ এত কোলাহল এত ঘামের গন্ধ, এত রং, ধুলো, লম্বা গোল চৌকো তেকোনা কতরকম মুখ... কিন্তু সবই কেমন অবাস্তব লাগে। যেন স্বপ্ন দেখছি। এক্ষুনি স্বপ্ন ভেঙে যাবে, সত্যিকারের বাস্তবে জেগে উঠব—গোলাপি ঘর, সাদা সাদা প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, পালঙ্কের ওপর কিংবদন্তি বৃদ্ধা যিনি নাকি বাড়ি বিক্রির শকে মারা গিয়েছিলেন। নব্বুই বছরের জ্যোতির্ময়ী গুহ, আমার নিজস্ব পিসিমা যাঁর নাম পদবি কিছু আমি জানতুমই না।

আকাশে পাখিরা

কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অবনীশ আর সীতার সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট, ওরা বলে কানেটিকাট স্টেটে। বাঙালি ছেলে অবনীশ আর আমেদাবাদের মেয়ে সীতার প্রেম আমাদের মধ্যে বেশ জল্পনাকল্পনার বিষয় ছিল। আন্তঃপ্রদেশীয় বিয়ে! অবনীশের বাড়ি শেষ পর্যন্ত মানবে কি না, সীতার বাড়ি থেকে আপত্তি উঠবে কি না, ওরা দুজনে শেষ অবধি অ্যাফেয়ারটা টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না! তা, সত্যিই কোনো পক্ষ বাদ সেধেছিলেন কি না জানি না। অবনীশ চটপট মার্কিন দেশে একটা ফেলোশিপ জোগাড় করে চলে গেল। বছরখানেক পরে গেল সীতা। ও বরাবরই দুর্ধর্ষ ছাত্রী ছিল। সব দিক থেকেই চৌখশ। প্রথমে গেল কলম্বিয়া, কী সব ম্যানেজমেন্ট-টেন্ট করল। তারপর দু-জনেই এই কানেটিকাট। ওখানেই ওদের বিয়ে, ওখানেই ওদের স্থিতি। এই তিরিশ বছরে একবারও আসেনি। কিংবা হয়তো এসেছে আমি জানি না। এলে আমাকে জানাবে না এটা ভাবতে আমার খারাপ লাগছে ঠিকই। কিন্তু এতগুলো বছর ধরে নতুন বছরের কার্ড আর পুজোর সময়ে সংক্ষিপ্ত চিঠি বাদে যাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন. এ ধরনের খেলাপ তাদের মধ্যে হতেই পারে। তা সত্ত্বেও আমি যখন বিশেষ কাজে নিউইয়র্ক যাবার একটা সুযোগ পেলুম, তখন আমার প্রথম কাজই হল ওদের একটা বিস্তারিত চিঠি লেখা, পরিবর্তিত ফোন নম্বর সহ। ঠিক তেরো দিন পরে ওদের ফোনটা পাই।

কী রে লম্বু, আমাদের মনে পড়ল তাহলে?

তাহলে তুই বাড়ি আছিস?, আমি বলি।

কেন? রাত এগারোটায় বাড়ি থাকব না কেন?

আমি হাসি—অবনীরা শুনেছি বাড়ি থাকে না!

একটু সময়! তারপরেই অবনীশের মার্কামারা হাহা হাসি। যেটাকে আমরা 'হাহাকার' বলতুম। যাক, হাসিটা যখন এক আছে, মানুষটাও খুব বদলাবে না। এই সময়ে বোধহয় অবনীশের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিল সীতা।

'উদোয়, তুমার তো ওপন টিকেট। আমাদের এখানে অন্তত মাসখানিক থাকবে কিন্তু।'

সীতার ভাঙা বাংলা আমরা বরাবরই উপভোগ করেছি। মজার এবং মিষ্টি, দুটোই। জানি না বাঙালিরা যখন অন্য ভাষা এমনি ভাঙা ভাঙা বলেন, তখন সেই ভাষাভাষীরা সেটা আমাদের মতো সানন্দে উপভোগ করেন কি না। আমরা নিজেরা কিন্তু খুবই অপ্রস্তুত হই। লজ্জা পাই। সীতা দিব্যি স্মার্টলি তুমার, অ্যাকন, কেন কি, হামরা চালিয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ ওদের উচ্ছ্বসিত আলাপ চলল। মাঝখানে এতগুলো বছর কেটে গেছে বলে মনে হল না। আমার এক মেয়ে, এক ছেলে শুনে ওরা জানাল ওদের দুই ছেলে, এক মেয়ে। টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে যেন উৎসাহের ঝড় বয়ে গেল কিছুক্ষণ।

অবনীশ বলল, 'চলে আয়। আমরা পথ চেয়ে বসে আছি। তোকে সময় দিতে আমার কোনো অসবিধে হবে না। আমি একট-আধট ছটি ম্যানেজ করতে পারব। সীতাটারই একট মশকিল...'

কথা শেষ হল না, সীতা বলে উঠল, 'অবনী কীর্কম একলা ষাঁড় থেকে যাচ্ছে দেখেছ? আমি মোটেই অসুবিধে করব না। হামরা তিনজনে খুব ঘুমব।'

বুঝতেই পারছেন এ ঘুম সে ঘুম নয়। এ হল ঘোরানোর উদাত্ত প্রতিশ্রুতি। সুতরাং অফিস ম্যানেজমেন্টের কাছে দরবার করি। আপনাদের কাজ ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা করে দেব কথা দিচ্ছি। কিন্তু পত্রপাঠ আমাকে ফিরতে বলবেন না। প্লিজ!

ম্যানেজমেন্ট মৃদু হেসে বললেন, 'উই আন্ডারস্ট্যান্ড। ইউ হ্যাভ স্কোর্স অব রিলেটিভস্ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস্ দেয়ার।'

গৃহিণী নিপুণভাবেই সব গুছিয়ে দিলেন। কিন্তু অবিকল, 'যেতে নাহি দিব'-র স্টাইলে। চক্ষু ছলছল। কারণটা অবশ্য আলাদা। তিনি কেঁদেছিলেন বিশুদ্ধ পতিবিরহে। ইনি ফোঁপাচ্ছেন মজা মারতে নিজে যেতে পারছেন না বলে। বাড়ির বিচ্ছু দুটোও সমানে তালে তাল দিচ্ছে। রিনি বলল, 'বলছ দেড় মাস, কিন্তু ভিসা তিন মাসের। দেড় মাসের বেশি থেকেছ তো বাবা আমিও অদূর ভবিষ্যতে জার্মানি কি ইংল্যান্ডে সেট্‌ল করছি।' তার ভাই রণো আবার এক কাঠি বাড়া। সে বলল, 'আমি তো ভাবছি হায়ার সেকেন্ডারিটা হলেই জি. আর. ই., তারপরই স্টুডেন্ট ভিসা। এবং মার্কিন মুলুক। এখন সেটাই করব না এই পচা কাঁকুড়গাছিতে পচা বাবার পচা বাড়িতেই পচব, সে সিদ্ধান্তটা নির্ভর করছে বাবার সময়মতো ব্যাক করার ওপব।' আমি মনে মনে বলি—বাবার কিছুর ওপরই কিছু নির্ভর করছে না বাপধন, সেটা শর্মা জানে।

প্রসঙ্গত আমার মেয়েটি যাদবপুরে সিভ্‌ল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। অঙ্কে খুব মাথা ছিল। আমার পরামর্শ ছিল অঙ্ক নিয়ে পড়া। মুচকি হেসে ইঞ্জিনিয়ার হতে চলে গেল। ছেলে শুনেছি চান্স পেলে ডাক্তারিও পড়তে পারে। আবার না পেলে ইতিহাসও পড়তে পারে। ওদের ব্যাপারস্যাপার আমি বুঝি না।

আমার মা আবার আর এক। তিনি বললেন, 'আমিও তাহলে বাপের বাড়ি চলে যাব।' বোঝো ঠ্যালা। চুয়াত্তর বছর বয়সে মহিলা অরিজিনাল বাপ-এর বাড়ি কোথায় পাবেন তা তিনিই জানেন।

যাই হোক, এদের কাটিয়ে তো কোনো মতে ব্রিটিশ প্লেনে ওঠা গেল। এ ঘটনা এগারোই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পাঁচ বছর আগেকার। কাজেই সহযাত্রীদের আগাপাশতলা জরিপ করার দরকার পড়েনি। ডাউনটাউন নিউ ইয়র্কে ঘোরবার সময়ে কোনো সন্দেহজনক আঁশটে গন্ধও পাইনি। বেশি কথা কি ওই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দ্বিতীয় টাওয়ারটার পনেরো তলাতেই আমার বেশিরভাগ কাজকর্ম ছিল।

প্রতিদিনই ফোনে অবনীশ আর সীতার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল। আমার হোটেলে ফেরার ওয়াস্তা। পিঁ পিঁ করে ফোন বাজবে।

কী রে লম্বু! ব্যাটা সেট্‌ল করিচিস?

এক্ষুনি সেটল করব কী রে?

আরে ফর দা টাইম বিয়িং। চান করিচিস? এক পাত্তর নিয়ে বসিচিস?

সময় দিলি কোথায়? এই তো ঢুকছি।

এই ঢুকছিস বলে নাঙ্গাবেলার বন্ধু ফোন করবে না?

করবে না কেন, কিন্তু চান টান, সেট্‌ল-ফেট্‌ল, এক্সপেক্ট করবে না। ...

কিংবা হয়তো সত্যিই চান সেরে এক পেগ নিয়ে বসেছি, সঙ্গে সোনালি চিংড়ি ভাজা। ফোন এসে গেল, 'উদোয় আছে?'

উদয়ের ঘরে আর কে থাকবে ম্যাডাম? বুধোয়?

আমি আর অপেক্ষার সহ্য হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি কোরো।

এতই যদি অধৈর্য তো গ্যাঁটের ডলার খর্চা করে একটা রিটার্ন-টিকিট কিনে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন দেবী! দিব্যি হলিডে করতে আসতে পারতুম! যে অফিস পাঠিয়েছে তার ফাইল বগলে সারা মাস চরকি-নাচন নাচতে হত না।

সরি উদোয়। যু আ রাইট। নেক্সট টাইম আর ভুল করছি না। যা হোক, ছাড়া পেলেই আসছ তো?

আর কোন চুলোয় যাব দেবী, এক কাজিন থাকে ক্যালিফোর্নিয়া, শ্বশুরবাড়ির দিকের এক আত্মীয় থাকেন ফ্লরিডা, তা সেসব জায়গায় যাবার কড়ি আমার নেই আজ্ঞে।

'যাক, তুই সেই আগের মতোই আছিস রে লম্বু!' —অবনী বোধ হয় শুনছিল, ফট করে বলে উঠল।

'তুইও তো আগের মতোই আছিস। ঠিক আড়ি পেতেছিস? তোর শ্যোন চক্ষু শ্যোন কর্ণ ফাঁকি দিয়ে যে বউ একটু পরকীয় করে নেবে তার উপায়ও রাখিসনি।'

দুজনেরই ইচ্ছে আমাকে নিতে নিউ ইয়র্ক আসে। একটু শহর দেখায়। কিন্তু এখানে আমার অফিসতুতো এক পূর্বতন সহকর্মী থাকেন। বিপত্নীক মানুষ, দুই ছেলের একজন কানাডার মনট্রিঅলে। আর একজন ইউ.এস.এ-তেই এইম্‌স্-এ। নিউ ইয়র্কে কেউই থাকে না। ভদ্রলোক আমাকে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নিউ ইয়র্কের থিয়েটার, পার্ক, মিউজিয়াম, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, মায় লং আইল্যান্ড পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেখাবার ভার নিয়েছেন। তাঁর উৎসাহেই বা জল ঢালি কী করে? একা মানুষ, সঙ্গী পেয়ে আর ছাড়তে চান না।

সেই মি. বাগচিই আমাকে অ্যামট্র্যাকের নীলবরণ ট্রেনে তুলে দিলেন। আমাদের এখানে একদম গোড়ায় ইলেকট্রিক ট্রেনগুলো এইরকমই ছিল। শুধু রংটা আলাদা। হুশ্‌শ্‌শ্ করে মফস্‌সলি প্রকৃতি দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই।

সবুজ-স্টেশনে দুই মূর্তি হাজির। অবনীশের মাথা প্রায় ফাঁকা। কিন্তু চেহারাটি একেবারে পেটা। পঞ্চাশোর্ধ্বে পেটে-ফুটবল নেই সফল স্বজাতীয় আমি দেখিনি। বিশ্ব পরিসংখ্যানও বলছে, বাঙালিদের মধ্যে হার্ট ট্রাবল বেশি, কারণ এই ফুটবলের ধাক্কা। সীতার সবচেয়ে সৌন্দর্য ছিল তার চুলে। সেই চুল দেখি কেটে ফেলেছে। তা ছাড়া একটু গায়ে সেরেছে। গাল-টালগুলো একটু বয়ঃভারী। ব্যাস।

কী করে চেহারাটা এমন ফিট রেখেছিস রে?

বন্ধু বলল, খর্চা আছে! খাটনি আছে!

আমাদের শুভদীপ য়ুনিভার্সিটি ব্লু ছিল, মনে আছে? এখন তাকে দেখলে চিনতে পারবি না। ছ-ফুট ব্যাসের একটি প্রকাণ্ড বল।

অবনীশ গর্বের হাসি হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

তোকেও কিছু আধবুড়ো লাগছে না, তবে এইবেলা যদি সাবধান না হোস তো ফুটবল না হোক একটি টেনিস বল তোর প্রাপ্তি হবেই। শরীরটা আলগা হতে থাকবে। তোর হাইটটাই এখনও তোকে বাঁচাচ্ছে।

ওকে আশ্বস্ত করি। আমিও মোটামুটি স্বাস্থ্য-সচেতন। একটু-আধটু যোগাসন করি, হাঁটাহাঁটিও করি। শুভদীপকে দেখে আমার ভয় ধরে গেছে।

তোমার তো চুলও চোমোৎকার আছে উদোয়। বেশ সল্ট অ্যান্ড পেপার। তুমার বন্ধুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। একেবারে চোক্‌চোক্ গোড়ের মাঠ হয়নি?

তখন আমি সুযোগ পেয়ে বলি, তো সীতাদিদি, তোমারই বা সে ভ্রমরকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ কেশদামের কী হল?

মুখটা বিরক্তিতে কুঁচকে সীতা বলল, যা খাটুনি! চুল এখানে রাখা যায় না উদোয়। অন্তত আমি পারি না। লম্বা চুল গাছের পাতার মতো ঝরে পড়ে যায়।

হুইহুই করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছে অবনীশ। পাশে সীতা। পিছনে আমি বেল্ট বাঁধা-ছাঁদা লাগেজের মতো।

শহর থেকে দূরে, পাইন-মেপ্‌ল-বার্চ ঘেরা একটা চমৎকার গ্রামে থাকে ওরা। নাম শেলটন। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে অনায়াসে আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে গেল সীতা। কিছুতেই আমাকে নিতে দিল না। পিছন-পিছন আমি। অবনী গ্যারাজে গাড়ি রেখে আসছে। বাড়ির বাইরেটা অবিকল ইংরেজি ফেয়ারি-টেলের বাড়িগুলোর মতো। ভেতরটাও যেন খেলাঘর। তা সিঁড়ি দিয়ে উঠে কফি রঙের কার্পেটের ওপর পা রেখেছি কি না রেখেছি—কুঁ কিঁ ক্যাঁ কুঁ কিঁ ক্যাঁ করে কিছু একটা কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল।

'ওঃ মাই প্রিটি, মাই সুইটি মিঠু ডিয়ার, মা ইজ হিয়ার'—বলতে বলতে কয়েক কদম গিয়ে সীতা হাত উঁচু করে একটা খাঁচার দরজা খুলল। খাঁচাটা সোনালি রঙের। সিলিং থেকে একটা চকচকে ধাতুর বাঁকানো ডগায় ঝুলছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়—কোনো গৃহসজ্জা। কিন্তু কাঁচের দরজা খুলতেই একটা সবুজ টিয়াজাতীয় পাখি বিদ্যুৎবেগে উড়ে সীতার কাঁধে গিয়ে বসল।

আমার দিকে ফিরে সীতা বলল, 'প্লিজ বসো, উদোয়, আগে একটু রেস্ট নিয়ে নাও তারপর তুমাকে বাড়ি দেখাব।'

ততক্ষণে কয়েক সিঁড়ি টপকে টপকে উঠে এসেছে অবনীশ। পিছন থেকে সোৎসাহে বলল, 'ও কী বলল বল তো!'

আমি বলি, 'বলল আগে একটু রেস্ট নিয়ে নিতে, তারপর'...

অবনীশ হা হা করে হেসে বলল, 'সীতা নয় সীতা নয়, মিঠুর কথা বলছি।'

মিঠু কে?

কী আশ্চর্য! ওই প্যারটটা।

ও আর কী বলবে? ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচাল খানিকটা।

'উঁহুঃ,' —আমাকে হারিয়ে দেবার বিজয়গর্ব ফুটে উঠল অবনীশের মুখে।

সীতা হেসে বলল, 'ও বলল হু ইজ দ্যাট, হু ইজ দ্যাট। আশ্চর্য ইনটেলিজেনট পাখি। একটা মানুষ বাচ্চার সঙ্গে কোনো তফাত নেই।'

অবনীশ বলল, 'চন্দনা জাতীয় বুঝলি। আমি আবার ল্যাটিন নামটা মনে রাখতে পারি না। আয় এদিকে আয়।'

ওকে অনুসরণ করে যাই। ওদিকে সোফায় সীতা বসে আছে। তার টি শার্ট শোভিত কাঁধে চন্দনা। হঠাৎ একটা সবুজ ঝলকানি তারপরই আমার মাথায় খটাস করে লাগল। উঃ আমি মাথাটা সরিয়ে নিই।

'নটি বয়, যাও মিঠু মায়ের কাছে যাও, যা—ও', ... অবনীশের গলায় আদেশের সুর।

সীতা বলল, 'হি ইজ জেলাস, বুজলে উদোয়। অবনী যে তুমাকে আদর করে নিয়ে যাচ্ছে, কাঁধে হাত রেখেছে! হিজ পা হ্যাজ টু বি ওনলি হিজ।'

অবনী তাড়াতাড়ি আমার মাথাটা দেখল, রক্ত-টক্ত কিছু বেরোয়নি নাকি। তবু অবনী একটু

ফার্স্ট এইড দিল। মাথার ভেতরটা ঝনঝন করছে আমার। সীতা বলল, 'জেনার‍্যালি হি ইজ ভেরি ওয়েল-বিহেভ্ড্, আসোল কথা, হিংসা হচ্ছে।'

এখন মিঠু তার ডান হাতের উলটানো পাতার ওপর। এই ভঙ্গিতে মোগল বাদশাদের ছবি পাওয়া যায়। তাঁদের হাতে অবশ্য চন্দনা থাকে না, থাকে শিকরে বাজ। তা এই বা কম কী?

আমি সংক্ষেপে বলি, ওরে ব্বাপ্।

সত্যিই রে উদয়, ও একদম এসব করে না। পার্ফেক্ট ম্যানার্স একেবারে।

আমি বলি, আমি খারাপ লোক বুঝতে পেরেছে আর কি! আমাকেও ওয়ার্নিং দিল, তোদেরও সাবধান করে দিচ্ছে।

'এই যাঃ,' সীতা বলল, 'তুমি মাইন্ড করেচো। এক্সট্রিমলি সরি, উদোয় আ অ্যাম গোয়িং টু পানিশ হার।' —সে পাখিটার ওপর তার বাঁ হাত চাপা দিল, তারপর তাকে তার তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে খাঁচায় পুরে দিল।

কাঁ কাঁ কাঁ, পাখিটা চিৎকার করেই যাচ্ছে।

নো মা। অ্যাম নট ইয়োর মাদার এনি মোর।

সীতা চলে এল। কী আশ্চর্য! পাখিটাও ঘাড় গুঁজে কেমন একটা ঝিমিয়ে মতো বসে রইল। ঠিক যেন একটা বাচ্চা দুষ্টুমি করে বকুনি খেয়ে মুখ গোঁজ করে, নীচু করে বসে আছে।

ততক্ষণে আমরা লিভিংরুমটার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। লম্বা লম্বা ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড সরে গেল। কাচ দিয়ে সমস্তটা ঢাকা, তার ওদিকে একটা রীতিমতো জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ঘন কালচে সবুজ পাতা-ঝরা-গাছের অরণ্য। বাড়ি আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া নালার জল বইছে। তাতে দু-চারটে হাঁস।

অবনীশ বলল, 'ওই যে জঙ্গলটা দেখছিস ওটা আমাদের। ওই স্ট্রিমটাও।'

'আমি জীবনে এই প্রথম কোনো জঙ্গল এবং নালার মালিক দেখলাম ভাই। আমি বলি।'

'আরে এখানে সাবার্বে অনেকেরই এমন জঙ্গল আছে। জঙ্গলই বলিস, বন-বাগানই বলিস!'

মানে!

ওয়াইল্ড গার্ডেন ধর। আমাকে রীতিমতো মেনটেইন করতে হয়। সময় মতো ডাল-ফাল কাটানো, নীচেটা পরিষ্কার করা। এ সবের লোক পাওয়া যায়। তবে আমাদের স্পেশ্যাল অ্যাকুইজিশন হচ্ছে ওই নালাটা, হরিণ জল খেতে আসে। চাঁদনি রাতে যা লাগে না!

হরিণও আছে তোর জঙ্গলে? তুই তাহলে হরিণযূথেরও ওনার?

'না তা নয়।' —ও বলল, 'হরিণরা রাস্তা ক্রস করে জঙ্গল পেরিয়ে অন্য জঙ্গলে চলে যায়। যাবার স্বাধীনতা তাদের আছে। আমার জঙ্গল বলে তাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আমি ঘিরতে পারি না। দিস ইস আ ফ্রি কানট্রি।'

সীতা বলল, 'কোতো পাখি আসে ওখান থেকে। আমাদের ডেকটার তলাতেই বার্ড ফিডার রাখি। দেখবে এস, ভাগ্যে থাকলে ফ্লিন্চ্ রবিন, ব্ল্যাক বার্ড, ব্লু জে, কার্ডিন্যাল আরও কোতো পাখি দেখতে পাবে। মাঝে মাঝে ওয়াইল্ড টার্কিও এসে যায়।'

আমাদের ছাদ থাকে, বারান্দা থাকে। এদের এখানে বেশিরভাগই দেখছি বাড়ির পেছনে একটা ডেক থাকে, ঠিক জাহাজের ডেকের ছোটো সংস্করণেরই মতো। এরা সেখানে নানা রকম হার্বস চাষ করে—ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, চায়না-গ্রাস, আরও কত কী তাদের নামও ছাই আমি জানি না। সীতা-অবনীশের ডেকে একটা রং-করা বেতের বসবার ব্যবস্থা দিবারাত্র রোদ খাচ্ছে জল

খাচ্ছে। জঙ্গলের দৃশ্যটা এখান থেকে বেশ ভালো দেখা যায়। একটা মাত্র ধূসর রঙের পাখি খুঁটে খুঁটে কী সব খাচ্ছিল, আমরা ঢুকে বসতেই হুশশ করে উড়ে গেল।

সীতা বলল, আশ্চর্য, ওরা তো অন্য দিন পালায় না।

আমি বলি, আমি 'খারাপ লোক', দেখো তোমাদের পোষা এবং না-পোষা পাখি সকলেই তোমাদের জানিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে অবনীশ অতি চমৎকার দেখতে মার্গারিটার ট্রে নিয়ে উপস্থিত। একটা ক্রিস্ট্যালের পাত্রে যথেষ্ট মেওয়া, যাকে এরা বলে ড্রাই ফ্রুট। আমার এখন একটু হাত-পা ছড়িয়ে কোনো পানীয় নিয়ে বসবারই দরকার ছিল।

আমার শেষ কথাটা অবনীশ বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল। বলল, 'পোষা-টোষা বলিসনি। মিঠুটা পোষাও নয়, পাখিও নয়, ও আমাদের পুত্র, যাকে বলে ছোটোখোকা।'

সীতা বলে, 'আমাদের চারটা। অত্রি, জিষ্ণু, রশ্মি আর মিটু।'

একটু গল্পগাছা করবাব পর ওরা পরম উৎসাহে বাড়ি দেখাতে লাগল। প্রাসাদবিশেষ। তিন ছেলেমেয়ের তিনখানা ঘর, ওদের নিজেদের একটা বিশাল শোবার ঘর, সঙ্গে লাউঞ্জ। টয়লেটে বাথ-টবে জাকুজি। অতিথি-ঘরটার সঙ্গেও একটা লাউঞ্জ। আগাগোড়া ছবিব মতো সাজানো। লাইব্রেরি। ডাইনিং কাম লিভিংরুম। ফর্ম্যাল ড্রয়িংরুম। বিশাল ব্যাপার। যাদের বাড়ি তারা বিশেষ উপভোগ করতে পায় বলে মনে হয় না। আমি দু-দিনের জন্যে এসে আচ্ছা কবে আরাম খেয়ে নিই। ভোরবেলা উঠে হাঁটতে হাঁটতে শেলটনের গাছে-ছাওয়া গ্রামাঞ্চলের রাস্তা বেয়ে চলে যাই যত দূর পারি। আশ্চর্য সবুজ গাছপালা সব। যেন কেউ প্রতিদিন সাবানজল দিযে ঝকঝকে করে মুছে যায়। রাস্তার নেড়ি-বিল্লি বলে জিনিস নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য 'ডিয়ার ক্রসিং' নোটিস দেখে বুঝতে পারি নেড়ি-হরিণ এখানে আছে বিস্তর। আর আশ্চর্য, আকাশে কোনো পাখি নেই। আমাদের তো গাছ থাকলেই সেখানে কাকে বাসা করবে। ভোর বা সন্ধে মানেই হবেোলা অর্কেস্ট্রা। এখানে সকালে পাখিদের জেগে-ওঠা নেই, বিকেলে তাদের ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘরে ফেরা নেই। কাকের কা-কা নেই এমন অবস্থা তো আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আশ্চর্য নিরালা, নীরব দিন-দুপুরে হঠাৎ-হঠাৎ কেমন অপ্রাকৃত নিঃশব্দ লাগে সব। কেন এত অস্বস্তি! তার পরে আবিষ্কার করি— কাক নেই, কা-কা নেই তাই। পাখি দেখতে হলে যাও সেই ডেকে। মেহেদি আর থাইদেশীয় তুলসীর মধ্যে বসে থাকো যদি ব্লু-ফিন্‌চ, রবিন কি ব্ল্যাকবার্ড দেখতে চাও।

কিন্তু আমরা তো আর সবাই সেলিম আলি নই, বিভূতিভূষণ বা বুদ্ধদেব গুহও নই, যে পাখির জন্য পথ চেয়ে আর কাল গুনে বসে থাকব! আসলে পাখপাখালির ডাকাডাকি আমাদের শহুরে জীবনযাত্রারও আবহসংগীত। সংগীত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় কেমন একটা কেমন-কেমন লাগে।

আমাকে কথা দিলেও অবনীশরা সেভাবে ছুটি নিতে পারেনি। দুটো উইক-এন্ডের সঙ্গে আর একটা করে দিন যোগ করে নিয়েছে। ওই দুটোর একটায় আমরা যাব হার্ভার্ড, কেমব্রিজ, বস্টন এবং তার কাছাকাছি নিউ হ্যাম্পশায়ার বলে একটি পাহাড়ি জায়গায়। আর একটায় যাব নিউ ইংল্যান্ডের প্রিমাথ নায়াগ্রা।

ভোরবেলা আমার চ্যানেল মিউজিক শুনে ঘুম ভাঙে। আমি চটপট বেরিয়ে পড়ি। ফিরে দেখি ব্রেকফাস্ট রেডি। ফেনায়িত কফির গন্ধে বাড়ি ভরপুর। সীতা বেচারি অত সকালে পরোটা-ফরোটা ভেজে ফেলে এক এক দিন। অবনী আগে, সীতা একটু পরে বেরিয়ে যায়। দুজনের দুটো গাড়ি মোড়ের ওধার ঘুরে হারিয়ে যায়। আমি আস্তে আস্তে ভেতরে এসে বসি। খুব ভোরে উঠি তাই এক এক দিন আর এক ঘুম ঘুমিয়ে নিই। অলস মাথায় বই পড়ি। ভি.সি.পি-তে ক্যাসেট চাপিয়ে

ভালো ভালো ছবি দেখি। একটা কি দুটো কি আড়াইটে বাজলে ফ্রিজ থেকে কিছুমিছু বার করে মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিই। তবে অনেক সময়ে মাঝেও একটু মুখ চালাতে ইচ্ছে করে। ফ্রিজের মধ্যে দিব্যি ছাড়ানো বেদানা-ডালিম, বাদাম আখরোট থাকে, টুকটাক চালাই। মোটকথা এরকম আলসে কুঁড়ে নিপাট-নিশ্চিন্ত বাদশাহি ছুটিযাপন আমার ভাগ্যে জীবনে এই প্রথম। লাগছে মন্দ না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এই বাড়ি এই জঙ্গল এই বৈভব এই হরিণ সব বোধহয় আমারই। গান শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগলে ঘুরে বেড়াই বাড়িটার মধ্যে। কত রকমের যে অলংকরণ! কাচের স্ফটিকের, কাঠের, গালার, কাপড়ের, পোড়া মাটির। আর ঘরে ঘরে ছবি, ছবি মানে ফোটো। ছবি দেখে-দেখে অত্রি-জিষ্ণু-রশ্মিকে আমার চেনা হয়ে গেছে। শিশুকাল থেকে এখনকার বয়স পর্যন্ত অজস্র ছবি। কখনও মার সঙ্গে কখনও বাবার সঙ্গে কখনও দুজনের কোলে পিঠে, কখনও ভাইবোন তিনজন, কখনও কেউ একা, বন্ধুদের সঙ্গে, পাহাড়-নদী-অরণ্য-পথ, পথের মানুষের সঙ্গে। অজস্র অজস্র। অত্রি নাকি এখন আঠাশ তো আট বছরের অত্রিও যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আমি নির্ভুল চিনতে পারব। জিষ্ণু ছাব্বিশ, তার নাকি আবার নিজস্ব পরিবারও আছে, রীতিমতো ফ্যামিলি ম্যান। আর রশ্মি একটা উনিশ বছরের কিন্তু গাল টিপলে দুধ বেরোয় গোছের বালক-বালক মেয়ে। তিনজনেই সুন্দব প্রাণবন্ত। রঙিন ছবিতে তাদের গালের লালিমা, স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফেটে বেরোয়। জিষ্ণুই ওদের মধ্যে অবনীশের রং পেয়েছে, ঘষা তামার মতো একটা অদ্ভুত রং যেটা অবনীশের ছাত্রবেলায়ও ছিল।

একা-একা একঘেয়ে লাগত যদি সন্ধে থেকে মাঝরাত্তির অবধি অমন জমাট আড্ডাটা না হত। এতদিনের জীবনের আদি-মধ্য-অন্তের ভেতরে যে আদি-ঘেষা মধ্যভাগটায় আমাদের তিনজনের জানাশোনা সেইসব দিনের স্মৃতিচারণের বেশিরভাগ সময়টা কাটে। তবে তারই অনুষঙ্গে আগেকার জীবন, এখনকার জীবনযাত্রার প্রসঙ্গে এসেই পড়ে। অবনীশ আসে আগে, ডিনারের ব্যবস্থা শুরু করে দেয়। দুজনে চা নিয়ে বসি। ওদের জন্যে ভালো দার্জিলিং চা নিয়ে এসেছি, তারই সদ্‌ব্যবহার হয়। খাঁচাব মধ্যে ঝটপটাতে থাকে মিঠু। কাঁ কাঁ, কাঁকাঁ, কাঁকাঁ।

'কী বলছে বল তো!'—অবনীশ পরমোৎসাহে জিজ্ঞেস করে।

আমি তোর টিয়ের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছি না অবনী, অনেস্টলি।

আরে কী আশ্চর্য! ও বলছে বাবা, বাবা, বাবা।

আমি হেসে বলি, 'আমি তো শুনছি বড়োজোর নাকিসুরের কাকা, আবার টাটা-ও হতে পারে।'

না রে, এটাই ওর ফেমাস 'বাবা' ডাক। প্রথম ডেকেছিল 'মা'। সে ঠিক আছে। মা একটা এক অক্ষরের শব্দ, সবাই বলে। কিন্তু 'বাবা' বলে যেদিন আমার কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম বুঝলি। কেননা, ডাকটা ও শুনল কোথায়? আমার ছেলেমেয়েরা যখন আসে, ডাকে 'ড্যাডি'। 'বাবা' কোত্থেকে পেল·ও অনেক ভেবে-ভেবে বার করি একদিন ও এই টেবিলটাতে খেলে বেড়াচ্ছিল, আমি আব সীতা আমাদের বাবাদের গল্প করছিলাম। সেই থেকে পিক-আপ করেছে। বোঝ একবার, কী সাংঘাতিক বুদ্ধি!

ইতিমধ্যে তো অবনীর সেই প্রডিজি পাখি ছাড়া পেয়ে তার বাবার মাথায় চড়ে বসেছে। বাবা তাকে মাথায় নিয়েই ফ্রিজের দরজা খুলল। দেখি সেই বেদানা আর কাঠবাদামের কৌটোগুলো নিয়ে আসছে।

বুঝলি এই আমন্ড আর ডালিম—এই দুটোই ওর সবচেয়ে ফেভারিট।

যাচ্চলে! আমি মনে-মনে জিভ কাটি। দুপুরের একাকিত্ব কাটাতে পাখির দানা মেরে দিয়েছি? তবে অবনীর মিঠুর যে কোন্‌টা ফেভারিট নয়, বুঝলাম না। ছোট্ট একটা সোনালি কফি পটে

তার জন্য চা এল, খেল, ফেলল, ছড়াল, তাতেও শানাল না, অবনীর কাপেও ঠোঁট ভিজিয়ে নিল তুরন্ত। বিস্কিটে ঠোকর মারতে লাগল। প্লেটে চুড়ো করে চিনি দিতে হল তাকে।

বুঝলি উদয়, এই পুঁচকেটাকে আর ম্যানার্স শেখাতে পারলাম না। অত্রি, জিষ্ণু এমনকি আমাদের একমাত্তর মেয়েটাও এত অসভ্য ছিল না। কারও সামনে বেসহবত হলে বাচ্চা বয়সে ওদের কত বকাঝকা করেছি। এটার বেলায় ফেল মেরে গেলাম।

আমি বলি, 'একটা পাখিকে 'পেট' হিসেবে তুই কতকগুলো সাধারণ জিনিস শেখাতে পারিস, কিন্তু . '

অবনী বলে উঠল, 'উদয় প্লিজ, মিঠুকে পাখি-পাখি 'পেট'টেট বলিসনি, বিশেষত সীতার সামনে। ভীষণ দুঃখ পাবে। রেগে যেতেও পারে।'

যা ব্বাবা! যতই ভালোবাসুক, পাখিকে পাখি বলতে পারব না?

সীতা এলে আর দেখতে হবে না। কাঁ কাঁ করে ডাকতে ডাকতে সীতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমি বলি, 'আমি একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসি বাবা, তোমাদের মিঠুর তো এখন আবার হিংসে হবে, আর ঠোক্কর খেতে আমি রাজি নই।'

প্লিজ উদোয়, একটু আদর খেয়ে নিক, তারপর ওর ব্যবস্থা করছি, যেয়ো না।

মিঠুর চিৎকার আর ওলটপালট, সীতার মুখ ঠুকরোনো অর্থাৎ চুমু খাওয়ার বহর দেখবার মতো। অনেকটা সেই সার্কাসের টিয়ার খেলার মতো। কাঁধ থেকে কোলে লাফিয়ে পড়ছে, তারপরেই আমাকে চমকে দিয়ে ঝটপট করতে করতে উড়ে গিয়ে বসছে মাথায়। হাত থেকে ডালিমের দানা নিয়ে কুট কুট করে খাচ্ছে। গর্বে ভরতি মিঠুর বাবা-মার মুখ। ভাবটা কেমন দেখছিস? জীবনে কখনও এমনটা দেখেছিস আর?

যাই হোক, অবশেষে সীতা মিঠুর ব্যবস্থা করে, নিজেদের শোবারঘর ও লাউঞ্জের ভেতরে তাকে পুরে দিয়ে আসে। ওখানে নাকি মিঠু অনেকটা ওড়বার জায়গা পাবে। টয়লেটে জল ভরা টব আছে, সেখানে চান করতেও পারে। আলমারির মাথায় বসে থাকতে পারে আবার কার্পেটের ওপর বসে বসে ঝিমিয়ে নিতেও পারে।

রশমিকেও নাকি ওরা ঠিক ওইরকম নিজেদের হলে বন্ধ করে রেখে দিত। সেটা অবশ্য কোনো দুষ্টুমির শাস্তি। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টার জন্যে।

অবনী বলল, 'রশ্‌মি খুব দুষ্টু ছিল ঠিকই, কিন্তু জিষ্ণুর কাছে ও কিছুই নয়। জিষ্ণু অবিকল সেই আবোল তাবোলের বাপরে কী ডানপিটে ছেলে!'

দুজনেই হাসতে লাগল।

আমি বললুম, 'তা সেই সবচেয়ে ডানপিটেই তো সবচেয়ে আগে পোষ মেনেছে শুনছি।'

'ওর কথা আর বলো না,' সীতা বলল, 'হাইস্কুল পাস কোরবার পোরই কলেজে জয়েন করতে না করতেই একটা ব্ল্যাক মেয়ের সঙ্গে থাকতে লাগল।'

অবনী বলল, 'এ হে হে, এসব কথা উদয়কে বলছ কেন? কী মনে করবে বলো তো?'

সীতা বলল, 'চব্বিশ বোছর বয়েসে এখানে এসেছি উদোয়, থার্টি ইয়ার্স প্রায় হতে চোলে, হামাদের ওয়েজ আমেরিকান হোয়ে গেছে, মোনে কিছু কোরো না। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট।'

আমি তাড়াতাড়ি ওদের আশ্বস্ত করি, আমি কিছুই মনে করিনি, আর মার্কিন সমাজ ও জীবনযাত্রার আদর্শ সম্পর্কে কিছু-কিঞ্চিৎ ধারণা তো আমাদেরও আছে রে বাবা!

সীতা বলল, 'ইভন দেন, উই ওয়্যার শক্‌ড্। অ্যাট ফার্স্ট। একটা আঠারো বছরের ছেলে তো আফটার অল!'

তোমরা কিছু বলোনি? রাগারাগি করে এখানে লাভ হয় না জানি।

'আরে জানব তবে তো বলব।' অবনী বলে, 'জানানোর দরকার বলেই মনে করেনি। বিয়ে করলে জানাত। এখানেই জন্মকর্ম, এখানেই শিক্ষা, এদের মতোই অবিকল তো। এটা ওরা লুকোনোর বা বলবার মতো কিছু মনে করে না। তবে আমরা ঠিকই জানতে পেরেছিলাম। তারপর এসেছেও এখানে।'

সীতা বলল, 'মোজা কি জানো উদোয়, মেয়েটা নিজে চাকরি করে পোড়াতে লাগল। দুটো বাচ্চা হয়ে গেল। তার নিজের কেরিয়ার বারোটা। তারপর জিষ্ণু কী বিহেভ করেছিল জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে মেয়েটা, সোফিয়া, একজন ব্ল্যাককে বিয়ে কোরে চোলে গেল। জিষ্ণু কিছুদিন পোরেই একটা ট্রাভল এজেন্সি খুলল, একটা স্প্যানিশ মেয়েকে বিয়ে কোরলো। দুজনে মিলে বিজনেস ভালোই চালায়। একটা বাচ্চা।'

'থাকে অ্যারিজোনা স্টেটে বুঝলি উদয়,' অবনীশ বলল, 'আসে বছরের একবার তো বটেই। নাতিটা বেড়ে হয়েছে। ওর মায়ের মতো। তবে মজা কি জানিস, সীতা কিন্তু মনে মনে সেই প্রথম দুটো নাতি-নাতনিকেই বেশি ভালোবাসে, সম্ভবত সোফিয়াকেও যদিও তারা আমাদের কারও সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে না।'

সীতা বলল, 'এগুলো একদোম বিশ্বাস কোরো না, বিয়ে হোক না হোক বাচ্চা দুটো তো আমাদেরই। বোলো? তাদের জন্য মন পুড়বে না? আর সোফি! হোতে পারে ব্ল্যাক। মেয়েটা প্রাণ দিয়ে জিষ্ণুকে তৈরি করে দিয়েছিল। তার স্যাক্রিফাইসটা হামি নিজে মেয়ে হয়ে কী করে ভুলতে পারি? উই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড হার অ্যাজ আওয়ার ডটার-ইন-ল।'

আমি কথা পালটাই। আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। আমি ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছি অবনীব পক্ষপাত বর্তমান পুত্রবধূর ওপর, সীতার সহানুভূতি পুত্রবান্ধবীটির ওপর। কেন? কোন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব এখানে কাজ করেছে কে বলবে?

সীতাও বলে, 'তুমার ফেমিলির কোথা বলো উদোয়।'

আমাব ফ্যামিলি? সেই যথা পূর্বম তথা পবম। আমার বাবাকে ওরা চিনত খুব। তা বাবা গত হয়েছেন অনেকদিন। আমার ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতে। ভাগ্যিস একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলুম তাড়াতাড়ি, দিদিরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাই সামলে নিতে পেরেছি।

মা বেচারি অনেক কষ্ট করেছেন ক-টা বছর। তারপর দিদির ননদ শকুন্তলাকে বিয়ে করেছি। বলা যায় একটা আধা-প্রেম, আধা-অ্যারেঞ্জড্ গোত্রের ব্যাপার। ছেলে রণো ছোটো কিন্তু আমার চেয়েও বড়ো এক এক সময়ে মনে হয়। মেয়ে রিনির ঠাকুমা মা-বাবার ওপর টান এমনই যে সে যাতায়াত অসুবিধে হলেও যাদবপুরে হস্টেলে থাকতে চায় না এখনও পর্যন্ত। কাঁকুড়গাছিতে একটা ছোটো বাড়ি করতে পেরেছি। জমি বাবারই কেনা ছিল। জামাইবাবু অনেক সাহায্য করেছেন বাড়িটা দাঁড় করাতে। মায়ের ত্যাগের কথা না-ই বললাম। শকুন্তলা মাকে অনেক আগে থেকেই চিনত, মাও ওকে। কে জানে সেই জন্যেই কিনা, বেশ মানিয়েই তো আছে। বিশেষত আমার মাতৃদেবী একটু মাই ডিয়ার গোছের আছেন। রিনি বলে গেছো মেয়ে। রণো বলে বড়ো-ছোটো মেয়ে। রিনি এখনও ঠাকুমার কাছেই শোয়। রিনির রণোর উভয়েরই পড়াশোনার বিপুল খরচ আমাকেই চালাতে হয়। শকুন্তলা অবশ্য শাড়ির ব্যাবসা করে কিছু রোজগারপাতি করে। তবে তার হ্যাপা অনেক। এখন এইসব খবরাখবরের মধ্যে কোন্‌টা কতটা ওদের বলব! এই প্রগতিশীল, অত্যাধুনিক সমাজে থাকে। দেশে এই ত্রিশ-একত্রিশ বছরে কবার গেছে হাতে গোনা যায়। ওদের অভ্যাস, ধ্যানধারণা, অভিজ্ঞতা, সুখদুঃখ সবই আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। ছেলেমেয়ে যে আমায় দেড় মাসের

কড়ারে আমেরিকা পাঠিয়েছে এ কথা কি ওদের বলবার? আমার ফাজিল বড়ো-ছোটো মেয়ের মা যে তাড়াতাড়ি না ফিরলে বাপের বাড়ি যাবার ভয় দেখিয়েছেন সে কথা বলতে গিয়ে যদি হাস্যকর প্রতিপন্ন হই?

ওদের মেয়ে রশ্‌মির মোটে উনিশ বছর বয়স। আমার রিনির চেয়েও দু-বছরের ছোটো। সেই মেয়ে স্কুলের পড়া শেষ করে এখন মাউন্টেনিয়ারিং করছে। আপাতত পূর্ব আফ্রিকায়। তার জন্য কোনো খরচখরচা করতে হয় না ওদের। গিফ্‌ট দেয় অবশ্য। গিফ্‌ট হিসেবে ডলার-ড্রাফ্‌টও দেয়। কিন্তু এই উনিশ বছরের কিশোরী পার্বতী মা-বাবার জন্মদিনে বিবাহবার্ষিকীতে কিছু-না-কিছু গিফ্‌ট পাঠাতে ভোলে না। কোথা থেকে সে নিজের খরচ চালায়, কোথা থেকে আবার উপহারের ব্যবস্থা করে ভাবতে গিয়ে আমি মুগ্ধ. অভিভূত হয়ে থাকি। আমার মেয়েও অবশ্য আমাকে উপহার দেয়। মার্চ মাস থেকে তাড়া দেবে, 'বাবা আমার শ তিনেক টাকা বড্ড দরকার. দাও না।'

শ তিনেক? অত কেন?

বেশি হল? আমি তো মিনিমানটাই চাইলাম।

এপ্রিলের পনেরো আমাদের বিয়ের তারিখে আমরা পতি-পত্নী একটি ফ্লাওয়ার ভাস, বা একটা-দুটো বিখ্যাত বই উপহার পাই। ওই তিনশো টাকা থেকে কেনা। মোড়কের বাহারি কাগজ, আর একগোছা ফুল রণোটাই নাকি যোগ করে। ও বলে, 'কাগজ আর ফুল বলে তুচ্ছ করো না বাবা, আই হেট টু বাই য়ু আ গিফ্‌ট উইথ ইয়োর ওন মানি। ইটস রিডিক্লাস।'

আমি বলি, 'তা তোর কি আজকাল নিজের রোজগার হয়েছে? ড্রাগ-পেডলার হয়েছিস না কি?'

শকুন্তলা বলে, দেখো কোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধার করেছে, পকেট মানি থেকে বাঁচিয়ে শোধ করবে। পাকামি না করলেই যেন নয়। মারব এক থাবড়া। তো এই আমার ছেলেমেয়ের আধুনিকতা। এখনও পর্যন্ত।'

আর ওদের বড়ো ছেলে অত্রি? মাত্র আঠাশ বছর বয়সেই তার ট্যালেন্টের জোরে সে সিয়াট্‌লের কোনো ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রির হেড। বিয়ে করেছে নিজেরই মতো পণ্ডিত আর এক শ্রীমতীকে। সে আবার গ্রিক। অত্রি এবং তার গ্রিক স্ত্রী সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়ায় গবেষণার দরকারে। বিভিন্ন সময়ে ওদের পাঠানো কার্ড ও ছবিগুলো দেখাল অবনী। ক্রিসমাস কার্ড, বার্থ ডে, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, নিজেদের এবং মা-বাবার, নভেম্বরে থ্যাংকস-গিভিং-এর কার্ড, অসুখ করলে গেট ওয়েল কার্ড। অত্রি আর আদ্রিয়ানার কার্ড দিয়েই গোটা কয়েক অ্যালবাম হয়ে যায়।

রবিবারের সকালবেলা। এইবারে আমরা বেরোব। গত সপ্তাহান্তে দেখে এসেছি নিউ হ্যাম্পশায়ারে অপূর্ব উইনিপেসাকি লেক. বোটিং-ও হল। নামটা কী সুন্দর। এইসব রেড ইন্ডিয়ান নামে ভরতি মহাদেশটা। সাস্‌কাচুয়ান, কেন্টাকি, কানেটিকাট, মিসিসিপি, মিসৌরি, ক্যানসাস, উইসকনসিন মিনেসোটা। দুদিন বেশি ছুটি নিয়েছিল ওরা। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হু হু করে পেরিয়ে, বস্টনের পাশে হার্ভার্ড থেকে পৌঁছে গেলাম নিউ ইংল্যান্ডের প্লিমাথ-এ। সেখানে আমেরিকায় প্রথম ব্রিটিশ পদার্পণের স্মৃতিসমূহ ঠিক তেমনই করে সাজানো আছে। আজ যাচ্ছি সোজা বাফেলো শহর। সেখানে থেকে নায়াগ্রায় মার্কিন দিকের চেহারাটা দেখা যায়।

গ্যারাজের দিকের দরজা দিয়ে আমরা বেরোই। গাড়িতে মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে। আমি, সীতা বেরিয়ে এসেছি। শেষ ব্যক্তি বেরোবে অবনী। হঠাৎ ফরফর ফরফর শব্দ। একটা সবুজ ঝিলিক, তারপরেই সীতার আর্ত চিৎকার, 'মিটু! মিটু! মিটু!' ব্লু-জিনস আর কুঁচি-দেওয়া হলুদ

শার্ট পরে সীতা দৌড়াচ্ছে, ক্রমেই গতি বাড়ছে তার। অবনীর মুখে গভীর আতঙ্কের অভিব্যক্তি। আমি হতভম্ব।

দু-তিন দিনের সফরে গেলে ওরা মিঠুকে ওদের শোবার ঘরে বন্ধ করে রেখে যায়। ওই স্যুইটটা মিঠুর ভারি পছন্দ। ওখানে রাখলে নাকি ও মনে করে ওকে ভি.আই.পি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। ঘরের মধ্যে ভারে ভারে ডালিম, কমলার কোয়া, বাদাম আরও কী সব ভিটামিন-মিশ্রিত বার্ড-ফিড রাখা থাকে, বাথটবে জল। যত খুশি চান করবে মিঠু। আর একটা ছোটো ভারী পাত্রে খাবার জল। এ ক-দিন ইচ্ছে করলে মিঠু তার বাবা-মার বিছানায়ও নৃত্য করতে পারে। এখন আজ ওরা দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে, না টেনেছে ঠিকই কিন্তু ল্যাচ আলগা হয়ে গেছে, তারপর খুলে আধখোলা মতো হয়ে গেছে দরজা। ভগবান জানেন। মোট কথা মিঠু কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে। গ্যারাজের দরজা দিয়ে আনাগোনাগুলো লক্ষ করেছে এবং ফাঁক পেয়েই ফুড়ুৎ করে পালিয়েছে।

বাড়িটা ডানদিক দিয়ে বেড়ে হরিণের নালা পার হয়ে পিছনের জঙ্গলের দিকে যাই আমরা। সবুজে সবুজে সব বিরাট ওক, মেপল, বার্চ অ্যাশ জঙ্গল আঁধার করে দাঁড়িয়ে আছে।

অবনী বলল, 'কোন দিকে গেছে খেয়াল করেছ?'

'এদিকেই এদিকেই'—কাতর উচ্চকিত স্বর সীতার।

'মিটু, মিটু, মা ইজ হিয়ার, কাম ব্যাক, কাম ব্যাক মাই সুইট।' —কম্পমান অক্লান্ত স্বরে ডেকে যেতে থাকে সে।

অবনী দৌড়ে বাড়ি ফিরে যায়, চিনি আর আঙুর নিয়ে আসে। কালো আঙুর মিঠুর বিশেষ প্রিয়। হাতে আঙুরের থোকা দোলাতে থাকে সে। সীতা হাত ভরতি চিনি নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী।

মি—ঠু, লুক অ্যাট দা গ্রেপস, কাম ডাউন মিঠু।

মিঠু। মিঠু!

হঠাৎ দেখি সীতার দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

'কাঁদছ কেন সীতা।' —আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'যদি ওই বন আর আকাশের স্বাদ ও পায় তো ভালোই তো, ওটাই কিন্তু এর আসল জায়গা, ওখান থেকে কখনও ফিরে আসে? 'বর্ন ফ্রি'-র সেই সিংহটার কথা মনে করো।'

হঠাৎ চোখ ভরতি জল নিয়ে পিছন ফিরে আমার বুকে দুম দুম করে কিল মারতে লাগল সীতা, 'হাউ ক্যান য়ু বি সো ক্রুয়েল, ওহ্ হাউ ক্যান য়ু বি সো ক্রুয়েল।'

অবনী তাড়াতাড়ি এসে তাকে থামায়। বলে, 'ও ঠিক ফিরে আসবে, যাবে কোথায়? এমন কোরো না সীতা, ধৈর্য ধরো।'

'মি-ঠু'—আবার ডাকে অবনী। তার কপালে ভাঁজ। গলার স্বরে মরিয়া রাগ।

অনেক উঁচুতে গাছের পাতার ঘন সবুজ থেকে একটা হালকা সবুজ বিন্দু হঠাৎ আলাদা হয়ে যায়। আমরা সবাই দেখতে পাই। কেমন গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে উড়ছে মিঠু। এক গাছ থেকে আর এক গাছে। সীতা হিস্টিরিক গলায় বলল, 'ও ভোয় পেয়েছে। কখনও জোঙ্গল দেখেনি। অত উঁচুতে ও গেল কী করে? অবনী কিছু করো, কিছু একটা করো প্লি-জ।'

মুখের দুপাশে হাত রেখে তীব্র স্বরে শিস দিয়ে ওঠে অবনী। মিঠু ঝাঁপ খেয়ে নীচের ডালে নেমে আসে।

'মিটু-উ-উ, মায়ের কোলে এসো...' দু-হাত বাড়িয়ে বলে সীতা।

আর একটা এলোমেলো ঝাঁপ শূন্যে। মিঠু আরও নীচের ডালে এসে বসেছে।

হাত উঁচু করে আঙুর দোলায় অবনী। চিনিসুদ্ধ হাত অঞ্জলি করে ওপর দিকে তুলে ধরে সীতা।

মুখে অনর্গল আদরের ডাক। গলা ভেঙে গেছে, মুখের চামড়ায় গভীর কষ্টের খাল, সীতা চিৎকার করে, 'মিটু, মি-টুস মাম্ কলস্ ডিয়ার, কাম ব্যাক টু মা, লুক হিয়ার, আই হ্যাভ সুগার ফর য়ু, মি-টু।'

গ্যারাজের মাথায় এসে বসেছে মিঠু। ঢালু করোগেটের ওপর পায়ের কুড়মুড় খচমচ মতো শব্দ তুলে গুটগুট করে হেঁটে হেঁটে আসছে।

অবনী বলে, 'টেক কেয়ার বেবি। হাঁ, ঠিক হয়েছে হাঁটি হাঁটি পাপা, হাঁটি হাঁটি পা পা।'

ঠোঁট বাড়িয়ে আঙুরের থোকা কামড়ে ঝুলে পড়ল মিঠু। অন্য হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলল অবনী।

লিভিংরুমের সোফাগুলোতে হাত-পা ছড়িয়ে এখন বসেছি তিনজনে। বাব্বাঃ! একখানা কাণ্ড হল বটে।

সীতা লজ্জিত, অনুতপ্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়্যাম স্যরি উদোয়। আই ওয়াজ নট ইন মাই সেনসেজ। প্লি-জ্।'

আমি হাসি, 'ইটস অল রাইট। কিছু মনে করার প্রশ্নই নেই। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু সীতা মনে করো যদি আবার একদিন এরকম হয়। হতেই পারে। বোঝাই যাচ্ছে ও সব সময়ে তক্কে তক্কে থাকে। ফাঁক পেলেই আবার পালাবে। আফটার অল ওর ওই ডানা দুটো তো ওড়বার জন্যেই, কবিত্ব করে বলতে গেলে আকাশের নীল ডাকে হারিয়ে যাবার জন্যে। যদি ওকে ভালোবাসো, ওর ছোট্ট জীবনের এই কৃতিত্বে, সার্থকতায় তোমরা খুশি হবে না?

'ডোন্ট য়ু সি।' সীতা ভয়ের গলায় বলে, 'আমরা তো ওর ডানা ছেঁটে দিয়েছি। সামান্য একটু, এরকমই করতে হয় বুঝলে। ও বার্ড-ব্রিডারদের কাছে হ্যাচারিতে জন্মেছে, জোঙ্গল আকাশ এসোব ও জানে না, জেনেটিক্যালি হয় তো জানে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জানে না। ও ভয় পাবে। হার্ট ফেল করবে। সাপখোপ কি কোনো শিকরে পাখিতে ওকে...' বলতে বলতে শিউরে উঠলে সীতা। যেন ওকেই সাপখোপ কি শিকরে পাখি ধরেছে।

তখন বুঝলুম কেন অমন অস্বাভাবিক উড়ছিল মিঠু।

বললুম, 'তোমাদের মিঠু স্ত্রী না পুং জানি না। তবে ওর জীবনে সঙ্গীর প্রয়োজনও তো আছে। সে জন্যও কিন্তু ও পালাতে চাইবে। আত্মরক্ষা করতে পারুক আর না পারুক।'

অবনী বলল, 'ওর মেট-এর চেষ্টা কি আর করিনি ভাবছিস। হি ইজ আ মেল, অনেক খুঁজেও ওর প্রজাতির ফিমেল পাইনি আমরা। অন্য প্যারট-টট্ দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি। তারা ওকে ঠুকরে শেষ করে দিতে চায়। তাই শেষ পর্যন্ত ও পাট চুকিয়ে দিতে হয়েছে।'

মানে?

মানে আর কি! ক্যাসট্রেশন করিয়ে নিয়েছি।

ওইটুকু পাখি! তার...?

আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকি? মুখ দিয়ে কথা সরে না। হঠাৎ একটা কথা মনে হয়। এই জন্যেই, এই জন্যেই বোধহয় এ দেশের আকাশে পাখি ওড়ে না। জঙ্গলের গভীরে যারা রয়েছে তারা রয়ে গেছে। কিন্তু বাকি সব পাখিকেই বোধহয় ওরা সন্তানসঙ্গহীন জীবনে শূন্যতা পূরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে পুষে ফেলেছে। সীতা-অবিনাশ দুই অভিমানী মা-বাবা এখন মিঠুকে নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। একবার এ আদর করছে আর একবার ও আদর করছে। কত রকমের দানা বেরিয়েছে স্টক থেকে— আখরোট, কাবুলিচানা, ঝুরি ভাজা। আমি তৃতীয় ব্যক্তি, আনমনে দেখছি। দেখতে-দেখতে একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটল। সোফায়-বসা আমার চারপাশে যেন ডানা ঝাপ্টানোর ঝড়ো আওয়াজ।

পাখিহীন আমেরিকা মহাদেশের আকাশে, শুধু আমেরিকাই বা কেন, অল্পবিস্তর সারা সভ্য দুনিয়ার আকাশে আকাশে আমি অসংখ্য পাখি উড়তে দেখলুম। বার্মুডা আর টি-শার্ট, তাপ্পি দেওয়া জিন্‌স আর পোলো নেক, সাদা ঝোলা-হাতা আর নীল সুতো ঝোলা... মোটের ওপর সবাই একই ধরনের, একই রকম উদ্‌গ্রীব উড়ান। তা-এর তাপে ডিম ফেটে ফেটে বেরিয়ে আসছে ছোটো ছোটো পালকের বল, কচি কচি ডানা গজাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে বেপরোয়া। আশ্চর্য! ওরা কি ভয় পাচ্ছে আমাদের এতদিনেব এই সভ্যতা ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওদের খোজা করে দেবে?

অপত্য

ব্যায়াম সমিতি থেকে ফেরবার পথটা অর্থাৎ শর্ট-কার্টটা একেবারে কাদা-জলা হয়ে আছে। অনুষ্টুপদা বলে রাবড়ি-কাদা। এই কাদার সঙ্গে রাবড়ির নাম জড়িয়ে থাকলে বার্বাড়িতে ঘেন্না ধরা বিচিত্র না। অবশ্য, রাবড়ি যেন কতই জুটছে! চটিজোড়া খুলে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে নিতে থাকল অঞ্জু। সে জানে কাদায় বা জলে এভাবে খালি পায়ে নামা আর প্রাণটাকে নামিয়ে দেওয়া মোটের ওপর একই কথা। ওই কাদার মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে কাচের ফালি, পেরেক, ধারালো যে কোনো জিনিসের টুকরো। পায়ে ফুটলেই আই.ডি.হসপিট্যাল, বেলিয়াঘাটা। সেখান থেকে ফেরার কোনো গ্যারান্টি নেই। তবে, পঁচিশ বছর বয়সের একটা বি.কম বেকার ছেলের ফেরাও যা, না ফেরাও তা। দাদা আছে গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা দোকানের সেলসম্যান। ছোটো বোনটাও এক ডাক্তারের চেম্বারে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। একমাত্র অঞ্জুরই দু-পাঁচটা টিউশনি ছাড়া কিচ্ছু হল না। এদিকে ব্যায়াম সমিতিতে মুগুর ভেঁজে, প্যারালাল বারে উলটে পালটে খিদেটি আছে সাধা। মুগকলাই, ছোলা, সয়াবিন, রাজমা সবই পেটের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। যখন রান্নাঘরের একপাশে বাবা চেয়ারে আর তিন ভাই-বোন মেঝেতে খেতে বসে, দেয়ালগুলো যেন মুখ বাঁকিয়ে বলতে থাকে, 'কম্মের তো ঢিপি! খালি থালা থালা ভাত মারতে আছিস!'

কে বলে দেয়াল থেকে? অঞ্জুর সতেরো বছর বয়সে মৃত মা না কি! দরিদ্র সংসারে দিবারাত্র খেটে খেটে মায়ের মেজাজ খুবই তিরিক্ষি ছিল। তার ওপর ছিল মাথার যন্ত্রণার রোগ। হলে, মাথায় কষে ছেঁড়া শাড়ির পাড় বেঁধে শুয়ে থাকত। কিন্তু মা অঞ্জুকে বড্ড ভালোবাসত। বোন যদি এ নিয়ে নালিশ করত, মা বলত, 'দ্যাখ মঞ্জু, পেটের সব সন্তানকেও সমানভাবে ভালোবাসা চাট্টিখানি কথা নয়, নিজে মা হলে বুঝবি। যে সন্তান সবচেয়ে হাসিমুখ, মায়ের দুঃখ বোঝে, যার ওপর ভরসা করা যায়, সে একটু বেশি পাবেই। তবে সেটুকু উথলোনো দুধ। আর কারও ভাগ থেকে কেড়ে কুড়ে নেওয়া নয়।' অঞ্জু চিরদিনই হাসিখুশি, আড্ডাবাজ, গুমোট কাটিয়ে দিতে ওস্তাদ, মায়ের ফরমাশ সামান্যই সব, তবু সেই সামান্যটুকু মেটাবার কথা কখ্খনও ভুলত না অঞ্জু। সরু করে কুচোনো একটু কাঁচা সুপুরি চিবিয়ে বোধহয় মায়ের একটু নেশামতো হত। সুপুরির জোগান আসত অঞ্জুর হাত দিয়ে। কাছাকাছি ঠাকুরের আশ্রমে যেতে ভালোবাসতো মা। অঞ্জু ওসব ঠাকুর-টাকুর কস্মিনকালেও পছন্দ করে না। তবু যেত মাকে নিয়ে। সেই মাকে জীবনে যেই একবার মাত্র সে এন.সি.সি.-র সঙ্গে ট্রেনিং-এ গেল ঠিক সেবারই মারা যেতে হল? স্ট্রোক! তাকে খবর দেওয়া গেল না। সে যখন ফিরল শ্রাদ্ধ-শান্তি সুদ্ধু মিটে গেছে, মায়ের ছবিতে রজনিগন্ধার মালা শুকনো! ছোটো ছেলে, প্রিয় ছেলের কাছ থেকে, মার কি শেষ সময়ে একটু জলও যাচ্ঞা ছিল না? মানুষটা যে ছিল এবং এক সময়ে তার না থাকা নিয়ে এই বাড়িতে মানুষগুলির আচার-আচরণ পোশাক-আশাকে কিছু সাময়িক পরিবর্তন হয়েছিল সেসব কিছু তখন বোঝবার উপায় পর্যন্ত নেই। শুধু দাদা আরও গম্ভীর, বোন আরও ক্লান্ত, বাবার আরও বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাওয়া। হতভম্ব অঞ্জু বাড়ি ঢুকতে বাবা শুকনো মত চোখে চেয়ে বলল, 'যাক, তোমাদের সংসারে, একটা মুখ কমল।'

সংসারটা যে কী করে তাঁর না হয়ে তাঁর ছেলেদের হয়ে গেল তা অঞ্জু বোঝে না। সে তো তখন বাচ্চা, দাদা সুদ্ধু চব্বিশ পেরোয় নি। কিন্তু যবে থেকে চোখ খারাপের অজুহাতে বাবার কাজটা গেছে তবে থেকেই বাবা সুযোগ পেলেই 'তোমাদের সংসার' কথাটা বলতেন। এখন বাবার চোখে গ্লকোমা, পায়ের নার্ভ শুকিয়ে আসছে। শিরদাঁড়ায় লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস! যথাসাধ্য চিকিৎসা করানো হয়! কিন্তু সেই একটা কথা আছে না, 'তোমার যথাসাধ্যটাও যথেষ্ট নয়!' এ হল সেই।

দাদা ভালো করে কথা কয় না। মঞ্জুও ভুরু কুঁচকে থাকে। বাবার সদাই দীর্ঘশ্বাস। তবু অঞ্জু যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটেই যাতায়াত করে সে, তখন তার মনে হয় সে রাজা। এই পৃথিবী, এই আকাশ, বাতাস, সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো সব তার। কোনো ভিক্ষুক, বিকলাঙ্গ বা বৃদ্ধ দেখলে মনে হয় কাছে গিয়ে বলে, 'ভয় কী? আমি তো আছি!' যেন সে রোদ থেকে তার নবীন ত্বক ব্যবহার করে অনায়াসে সালোকসংশ্লেষ করে যাচ্ছে। যেটুকু পুষ্টি ছোলা, মুগকলাই, রাজমা ইত্যাদি দিতে পারছে না, সেটুকু সে নিজেই বানিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত তার কোষকলায়। খোলা গলায় সে হাসতে পারে যেন পৃথিবীর সর্বসুখ তার আয়ত্তে। বাড়ির মধ্যে তার এমন হাসি শুনলে মঞ্জু ভুরু কুঁচকে ওঠে, 'কী রে, কী খেয়েছিস?'

কী আবার খাব?

এত হাসছিস যে?

হাসির সঙ্গে খাওয়ার সম্পর্ক কী?

মঞ্জু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, 'আজ এক এক বেলায় ক-টা স্লিপ কেটেছি জানিস? দুশো পঞ্চান্নটা করে। একবার ওপর আবার নীচ আবার ওপর। ভাতের ফ্যান গালতে গিয়ে আবার হাত ফসকে একটু গরম ফ্যান পড়ে গেছে হাতে। যদি বাংলা-ফাংলা পাস তো আমাকেও দিস দু-এক ঢোঁক। নইলে এত খাটুনি সয় না।'

হাতে ফ্যান পড়েছে তো কী দিয়েছিস?

কী আবার দেব? হাতের কাছে নুনের বাটি ছিল এক খাবলা চেপে ধরেছি।

খুব ভালো করেছিস। কিন্তু এবার ওষুধ লাগাতে হবে।

থাক থাক তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। তুই নিজের নিয়ে থাকগে যা। ...

তার এই এগিয়ে আসা, এই সদিচ্ছাটাকেও যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় মঞ্জু।

অথচ অঞ্জু আদৌ নিজের নিয়ে থাকে না। বাবাই বরং তাকে কিছু ছাড়তে চায় না। সে না কি অল্প পয়সায় গুছিয়ে বাজার করতে পারবে না। সে না কি একদিনেই গেরস্তকে ডকে উঠিয়ে দেবে। বাবার সেবার খুঁটিনাটিও বাবা মঞ্জু ছাড়া কারও কাছে করতে চায় না। কলঘরে, খাবার জায়গায় নিয়ে যাবার সময়ে খালি অঞ্জু। কিন্তু অঞ্জু যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে বাবার ব্যবহারের জিনিস। জামাকাপড় কেচে দেয়। শুধু নিজেরটা নয়, সবারই। তবু তাকেই সবচেয়ে ফিটফাট দেখায়। সবচেয়ে ঝকঝকে। উজ্জ্বল। আব সবসময়ে মনের ভেতর দিয়ে একটা আনন্দের বাতাস হিল্লোল তুলে বয়ে যায়।

অনুষ্টুপদা বলেন, 'আরে ছোকা, শরীরমাদ্যং শাস্ত্রে যে বলেছে সে কি আর এমনি বলেছে? গভীর উইজডমের কথা বলেছে। এই যে ব্যায়াম করছিস, শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে। গ্ল্যান্ড-ফ্ল্যান্ড সব পার্ফেক্ট। যেখান থেকে যতটা স্টিমুলেশন দরকার আসছে। আর তার ফলেই একটা চমৎকার মানসিক ভারসাম্য, একটা স্থিতিস্থাপকতা। এটাই মানুষের আসল অবস্থা। সচ্চিদানন্দ স্টেট। বুঝলি ছোকা?' —ছোকরা না বলে ছোকা বলেন অনুষ্টুপদা।

বোঝে অঞ্জু। খুব বোঝে। এই শারীরিক আনন্দ বা সুস্বাস্থ্য থেকে ক্ষরিত আনন্দ না থাকলে

যে কী হত, বাবাকে দেখে খানিকটা বোঝা যায়। দাদা, মঞ্জু, শুধু তার পরিবার কেন আরও কত ছেলে-মেয়ে-নারী-পুরুষ এই শারীরিক আনন্দের খোঁজই রাখে না। তবে আরও একটা জিনিস আছে। ব্যায়াম সমিতির সবাই কি অঞ্জুর মতো? বোধহয় না। অনুষ্টুপদা হয়তো বলবেন, যে কোনো কারণেই হোক সবাইকার শরীরের ভেতরটা সমান ভালোভাবে চলে না। তাই তারতম্য হয়ে যায়। কিন্তু কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। মানুষে মানুষে একটু তফাত আছেই। এই যে নেপাল, ওই ব্যায়াম সমিতিরই ছেলে তো! নিজের এলাকাটাকে ভয়ে জুজু করে রেখে দিয়েছে একেবারে। কাউকে তোয়াক্কা করে না। যখন তখন ভয় দেখায়, চোখ গরম করে। নেপাল এখন নেউল হয়ে গেছে। অঞ্জুকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল। এলাকার পলিটিক্যাল দাদার কাছে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল। সোজাসুজি কি আর?—'কী রে অঞ্জু, কমার্স গ্র্যাজুয়েট তো হলি। আর কদ্দিন ভ্যারেন্ডা ভাজবি? চল একদিন রবীনদার কাছে নিয়ে গিয়ে তোব একটা হিল্লে লাগিয়ে দিই।'

অঞ্জু বলেছিল, 'তুই অ্যাদ্দিন লেগে আছিস তোরই কিছু হল না।'

আমার? কিছু হয়নি? বলছিস কি রে? তুই একটা গ্রাজুয়েট আর আমি ইস্কুলের চৌকাঠ ডিঙোইনি। দুজনের হিল্লে কি একরকম হবে? তা ছাড়া এখন আমি পার্টির হোল টাইমার। কিছুদিন পরেই দেখবি একটা লরি কি বাস বার করে নিয়েছি। মনমোহন সিংটা আবার সময় বুঝে লোন-ফোনে গুচ্ছের গ্যাড়াকল ঢুকিয়ে দিল কি না।

'চলি রে দেরি হয়ে যাচ্ছে। টুউশনি আছে।'—অঞ্জু পা চালায়।

কোন কেলাস? ছাত্র না ছাত্রী?

'ছাত্র। তিনটে একসঙ্গে। হায়ার সেকেন্ডারি।'—অঞ্জু কেটে পড়ে। এইভাবেই সে নেপাল-নেউলকে কাটাতে কাটাতে আসছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যেও করে না, আবার মাথায় তুলে নাচেও না। খুব সাবধানে চলতে হয়। যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে। ওদের অহং প্রচণ্ড। ভুলেও সেখানে লেগে গেলে সর্বনাশ করে ছাড়বে।

ইদানীং নেপাল ঘন ঘন ধরছে তাকে। বিকেল তিনটে। অঞ্জু বেরিয়েছে। ছাত্রীর বাড়ি বিচি রোড। স্বভাবতই সে হেঁটে যাবে। মোড়ে নেপাল।

কী রে অঞ্জু ছাত্তর ঠ্যাঙাতে চললি?

আর বলিস কেন? পরীক্ষা এসে গেছে, এক্সট্রা দিন যেতে হচ্ছে।

ছাত্রী নিশ্চয়ই।

একটা নয় আবার, দুটো।

তাই এত গরজ। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিস একেবারে।

কী যে বলিস নেপাল, ক্লাস ফাইভের দুটো পুঁচকে।

রবীনদার কাছে কবে যাচ্ছিস?

সময় করতে পারছি না রে। বাবার জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় ফি-মাসে। তিন ঘণ্টা লাইন। তা ছাড়াও কত কাজ।

বেশি দেরি হয়ে গেলে তুই-ই পস্তাবি, আমার কী!

'চলি রে!' ... তার শক্ত হাতের মুঠোয় নেপালের হাতের পাঞ্জা ধরে কষে ঝাঁকুনি দেয় অঞ্জু।

ছাত্রীদের দেড়তলার ঘরে যখন ঢোকে তখন তার মুখ দেখে তারা বলে ওঠে, 'কী অঞ্জুদা, রাজ্যজয় করে এলেন মনে হচ্ছে?'

রাজ্যজয়ই বটে! মনে মনে ভাবে অঞ্জু। জানো না তো আর তোমাদের দুটো হায়ার সেকেন্ডারির মেয়ের এক ঝটকায় ক্লাস ফাইভে ডিমোশন হয়ে গেছে।

এভাবেই চলে অঞ্জুর, চলে যায়। তার বয়সের অন্যান্য ছেলেরা যখন হতাশায় ভুগছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন অঞ্জু নীরবে চেষ্টা করে যাচ্ছে চাকরির, আর প্রাণপণ টিউশনি। সেই সঙ্গে ব্যায়াম। ব্যায়াম-ট্যায়ামের সুবাদেও তো অনেকের চাকরি-বাকরি হয়ে যায়। অঞ্জুর তাও হল না। কোনও ব্যাপারেই সে বোধহয় প্রথম সারিতে আসতে পারেনি। প্রথম সারিতে আসতে না পারলে বিধিসম্মত, সম্মানজনক আয়ের দরজাগুলো বন্ধ থাকে। তখন কি না খেয়ে মরে যেতে হয়? তা নয়। তখন থাকে উঞ্ছবৃত্তি। যেমন এটা-ওটার দালালি, যেমন নেপালের রবীনদার চামচাগিরি, যেমন অঞ্জুর টিউশনি। টিউশনিতে সে মন্দ রোজগার করে না। নিজের খরচ তো চলে যায়ই। বাড়িতেও কিছু দিতে পারে। তবু...লোকে যখন জিজ্ঞেস করে, বলা যায় না কিছু করি। বেকার! এত বড়ো ছেলে বেকার! বাবা মাথা নুইয়ে, দাদার মুখে নির্বেদ, মঞ্জু ভুরু কুঁচকে আছে। সবাইকার হীনম্মন্যতা।

ল্যান্সডাউন দিয়ে হাঁটছে অঞ্জু। হাঁটতে হাঁটতে মনের কোণে ড্যালা পাকিয়ে আছে তার ব্যর্থতার চিন্তা। কিন্তু তার ওপর দিয়ে একটা আনন্দের ভালোলাগার হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আষাঢ় মাস। দুপুর বেলা প্রচণ্ড একটা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন গুমোটের পর। রাস্তা ভিজে, বাতাস ভিজে ভিজে-ভিজে হাওয়া। আকাশে মেঘগুলো তখন গুড়গুড় করে ভেসে যাচ্ছে। ভীষণ একটা তাড়া পড়ে গেছে যেন। সন্ধেবেলাটা একটু কালি-কালি হয়ে আছে তাই। মেঘের ছায়া পড়েছে পিচ রাস্তার পাতলা জমা জলের আয়নার মতো গায়ে। রাস্তায় বেশি লোক নেই। গাড়িগুলো খুব জোরে ছুটছে। এটা ঠিক নয় কিন্তু। বৃষ্টিপিছল রাস্তায় গাড়ি স্কিড করতে পারে। মানুষ আজকাল খুব বেপরোয়া হয়ে গেছে। জেনে-শুনেও কেন যে সাধারণ নিয়মগুলো মানে না!

শরৎ ব্যানার্জি রোড থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরোলেন। হাতে ব্যাগ, এক হাতে শাড়ির কুঁচি তুলে.আস্তে আস্তে হাঁটছেন। ঠিক অঞ্জুর সমকোণে। তাই সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল। উনি রাস্তা পার হচ্ছেন। ওদিকের দোকানটায় চলে গেলেন। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করছে। অঞ্জু আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটি তীব্র কিঁ-চ্ শব্দে তার চোখ চলে গেল রাস্তার মাঝবরাবর। সে কিছুক্ষণ আগেকার দেখা ভদ্রমহিলাকে শূন্যে দেখল। জামাকাপড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা খাপছাড়া বল শূন্যে, ভীষণ বেগে নেমে আসছে নীচের দিকে। একটা ম্যাটাডর পাশ কাটিয়ে তীব্র বেগে চলে গেল। পেছনে হেলমেট মাথায় একজন মোটরসাইকেল-আরোহী ছুটছে। ধর ধর—আশপাশের দোকান থেকে কিছু লোকও ছুটে যাচ্ছে ভ্যানটার পেছনে। অঞ্জু দৌড়ে গিয়ে ওঁকে রাস্তা থেকে তুলে নিল কোলে। মুখটা ওঁর ভেঙে যাচ্ছে। অঞ্জুর দু-হাত জামাকাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর কে. মিশনে স্ট্রাইক চলছে—সে তাড়াতাড়ি ভেবে নেয়—'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি... শিগগির শিগগির!' খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে একটা। 'দু একজন চলুন আমার সঙ্গে চটপট।' বাস, ভিড় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কে ওঁর ঝুলতে থাকা পা দুটো ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। কে একটা ব্যাগ তুলে দিল গাড়িতে। পুলিসের ঝামেলা...কে হ্যাঁপা পোয়াবে? ওপাশের দরজা খুলে তবু একটি অল্পবয়সি ছেলে উঠে এল। ...
'যদি কেউ এঁকে চেনেন, বাড়িতে খবর দিয়ে দিন। এস.এস.কে.এম-এ নিয়ে যাচ্ছি.....শরৎ ব্যানার্জি থেকে বেরিয়েছিলেন.....।'

হু হু করে ছুটছে গাড়ি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ। উনি যেন কী বলছেন! অঞ্জু কান নামাল, কিছু শব্দ, কিছু গোঙানি। মানুষের ভেতরে আরও অনেক কিছুর মতো একটা ধ্বনি ভাণ্ডারও থাকে! সেই ভাঁড়ারের দরজা ভেঙে পড়েছে। তাই ধ্বনিরা বেরিয়ে আসছে। অঞ্জুর কাঁধে জলের বোতল। সে একটু জল দিল মুখে। 'আরও জোরে, আরও জোরে ভাই! হর্ন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যান'...অঞ্জু প্রাণপণে ঝাঁকানি থেকে তার কোলের মানুষটিকে রক্ষা করতে করতে বলল।

হাসপাতাল দেখা যাচ্ছে অবশেষে। এমার্জেন্সির আলো। 'কে হন আপনি? কেউ না। সে কী? আননোন? এ তো পুলিশ কেস হবেই। আপনি পালাবেন না যেন। সিস্টার, ব্যাগটা নিন।'

'শুনুন ডাক্তার, ব্যাগ-ট্যাগ, পরিচয়-টরিচয় পরে হবে। আগে ওঁকে অক্সিজেন আর কী কী লাগে দিন প্লিজ। টেবিলে তুলুন। ফর গড্‌স্ সেক।'

তরুণ ডাক্তারটি চোখ ফিরিয়ে বলল, 'জানেন না তো পাবলিক আর পুলিশের হয়রানি! আগে পেপার্স ঠিক করতে হয়।'

'ওহ্ ডক্টর, উনি আমার মা, ধরুন আমারই। আপনার, আপনারও। মায়ের মুখ মনে করতে পারছেন না? কুইক, কুইক, প্লিজ, ফর গডস্ সেক।'

স্যালাইনের বোতল। অক্সিজেন। অবাক চোখে চেয়ে তরুণ ডাক্তার, প্রৌঢ় নার্স.....শি ইজ গ্যাসপিং। সরি, ইয়াং ম্যান!

কী হল?

শি হ্যাজ এক্সপায়ার্ড।

'এক্সপায়ার্ড?' —হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে অঞ্জু। ওহ্, পারলুম না, পারলুম না, পারিনি, কত চেষ্টা করি পারি না।

শুনুন, কী নাম আপনার?

অঞ্জন পোরেল।

ও. কে। এই ব্যাগে একটা কার্ড রয়েছে। ডক্টর শিশির বিশ্বাস। সাদার্ন অ্যাভিনিউ। ঠিকানাটা নিন। চটপট কনট্যাক্ট করুন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার এখনও দাঁড়িয়ে। দিশেহারার মতো অঞ্জুকে এদিক ওদিক চাইতে দেখে ডাকল।

'কী হল ভাই? ম্যাডাম কেমন আছেন?'

অঞ্জু মাথা নাড়ল ডাইনে-বাঁয়ে। অন্য ছেলেটিও বের হয়ে এসেছে। সে অন্যদিকে যাবে এবার। ড্রাইভার অঞ্জুকে বলল,

কোন দিকে যাবেন?

খবর দিতে।

ঠিকানা পেয়েছেন?

হ্যাঁ।

চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

বিশাল বহুতল বাড়ি। জানলায় জানলায় পর্দা ভেদ করে আলো এসে পড়ছে। নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সামনে এসে অঞ্জু নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। কালো প্যান্ট, তার ওপরে মেরুন টিশার্ট। জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে রক্তের দাগ। বোঝা যাচ্ছে একটু লক্ষ করলেই। হাতগুলো? হাতগুলো কি কোনো সময়ে ধুয়েছিল? বেল টেপবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল। একটি যুবক। এক্ষুনি বোধহয় অফিস থেকে ফিরেছে। হাতের ব্যাগটা এখনও রাখেনি। পেছনে একটি প্রৌঢ় মুখ। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

তোর মা ফিরল না কি রে রঞ্জন? অনেকক্ষণ গেছে।

কাকে চান?

এই কার্ড কার?

দেখি। ও, আমার বাবার।

শুনুন, এক্ষুনি এস. এস. কে. এম. এ এমার্জেন্সিতে চলে আসুন। একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। মায়ের। বোধহয় আপনার মায়ের।

কে রে রঞ্জন? কী বলছে? কী?

রঞ্জন নামের ছেলেটির মুখ পালটে যাচ্ছে। সে প্রায় রুদ্ধ গলায় চিৎকার করল, 'কৃষ্ণা, আমার ব্যাগটা ধরো।'

ভেতর থেকে একটি অল্পবয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল।

আমি পি. জি-তে যাচ্ছি। মায়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

কী-ই-ই?

—প্রৌঢ়ের গলায়, তরুণীর গলায় আর্ত জিজ্ঞাসা শুনতে পেল অঞ্জু। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ইনি ডক্টর শিশির বিশ্বাস, বেরিয়ে এলেন।

আমি যাব।

না বাবা।

'যেতে দিন।' অঞ্জু বলল।

নীচে নেমে সেই ট্যাক্সিই ছুটল। ডক্টর বিশ্বাস বললেন, 'সিরিয়াস কিছু নয় তো? কত করে বললুম সেলোটেপের এক্ষুনি দরকার নেই। সকালে হলেও হবে। কৃষ্ণা আনতে পারে। পূর্ণিমাকে পাঠালেও হয়। সেই এক গোঁ! কী বাবা! সিরিয়াস কিছু নয় তো?'

শিশির বিশ্বাস ওদিকে। মাঝখানে রঞ্জন। এদিকে অঞ্জু। পূর্ণ দৃষ্টিতে রঞ্জন চেয়ে আছে তার দিকে। তার জামাকাপড় ভিজে। রক্তের গন্ধ উঠছে। সে চোখ নামিয়ে নিল।

ওঁর নাম মাধবী। মাধবী বিশ্বাস। ব্যাগে চশমা ছিল এক জোড়া। বাই ফোক্যাল।

কে আইডেনটিফাই করবেন? আপনি কে?

আমি ওঁর হাজব্যান্ড।

আর কেউ নেই?

এই যে আমি, ছেলে।

'আসুন, আপনি আসুন।' —ঘরটায় ঢুকতে ঢুকতে তরুণ ডাক্তার বললেন, 'মনকে শক্ত করুন। শি হ্যাজ এক্সপায়ার্ড। ন্যাস্টি উন্ডস্। বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট একটা। আমি আমরা কিছু করতে পারিনি। ওই ছেলেটি, অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি।'

হাসপাতাল দুলছে। পৃথিবী দুলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে দূরে কোন আগ্নেয় বলয়ে। ডক্টর শিশির বিশ্বাসকে শক্ত দু-হাতে ধরে আছে অঞ্জু। টলতে টলতে রঞ্জন বেরিয়ে আসছে, 'বাবা, ইটস মাদার অল রাইট। শি ইজ নো মোর।' নো মোর, নো মোর, চারদিকে একটা চাপা আর্তনাদ। তারপর স্তব্ধতা। বিনা নোটিশে যখন পৃথিবীর মানুষকে এভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তখন পৃথিবী বিবরে প্রবেশ করে চুপ করে যায়। একদম চুপ।

'শুনুন, জায়গাটা এ থানার অন্তর্গত হলেও সব রোড অ্যাকসিডেন্টস লালবাজার ডিল করে। আমি চেষ্টা করছি। কনট্যাক্ট করছি। কিন্তু আপনাদের ওখানেই যেতে হবে।' ও. সি. বললেন।

লালবাজার বলল, 'পোস্টমর্টেম হবেই। আটকাতে পারবেন না। আপনাদের এটাতে গোলমাল নেই। কিন্তু গোলমাল হয়, হয়েই থাকে। কেসগুলো ওভাবে আলাদা করা যায় না। আমাদের রেকর্ড ঠিক রাখতেই হবে। একটা কাজ করতে পারি। পি. এম. যিনি করবেন সেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি। কথা বলুন। চট করে কাজটা হয়ে যেতে পারে। আগলি সিন। ডোম বডি আগলে আছে। পার্টির স্ট্রেন্‌থ্‌ বুঝে দরাদরি করছে......এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন, দেখুন।'

রাত বারোটা নাগাদ মোমিনপুর থেকে রঞ্জনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অঞ্জু বলল, 'আমি আসছি একটু বাড়ি থেকে। ঠিক সময়ে আবার এসে যাব।'

রঞ্জনদের ফ্লাটের সামনেটা এখন লোকারণ্য। রঞ্জন আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীদের হাতে প্রায় বাহিত হতে হতে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত আলো এখন চারদিকে। তখন সেখানে যথেষ্ট আলো ছিল না। এত লোক! সেই বিন্দুতে একটি মাত্র মানুষকে কে আসতে বলে রেখেছিল। নির্বাচিত একজন।

এই যে ভাই!

'আপনি এখনও আছেন?

'কী করি। বলুন'—ঘামে ভেজা জবজবে মুখটা মুছতে মুছতে জবাব দিল ট্যাক্সি ড্রাইভার ভদ্রলোক।

আপনি তো বাড়ি যাবেন, চলুন পৌঁছে দিই। কোন্‌দিকে?

যাদবপুর। কিন্তু আপনি কি পাগল হলেন? সেই সন্ধে থেকে.... মিটার তো আপ করে রেখেছেন দেখছি। আমি কিন্তু গোটা বিশেকের বেশি দিতে পারব না।

'আরে ভাই, কী টাকা দেখাচ্ছেন? আমরা সেন্টিমেন্টাল জাত জানেন তো? যত গরিব তত সেন্টিমেন্টাল। পয়সা নেই.... তাই বলে..... যাক গে চলুন, পৌঁছে দিই। আমাকে একটু ব্যাক করে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে গ্যারাজ করতে হবে। এতক্ষণ সমানে আপনিও তো ঘুরলেন নিজের কাজ-কম্মো ফেলে।'

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করতে করতে অঞ্জু বললো, 'আমি তো বেকার!'

হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল ড্রাইভার, বলল, 'ভাগ্যিস, আপনি বেকার ছিলেন, তাই একজন মা শেষ সময়ে ছেলের হাতের জল পেলেন। আপনার ওই ঢাউস ওয়াটার-বট্‌ল্—এ কি গঙ্গাজলই নিয়ে যাচ্ছিলেন?'

গঙ্গাজল? ধুর। কলকাতার জল এখন খেলেই আন্ত্রিক। জানেন না? আমি সব সময়ে ফোটানো জল ক্যারি করি। অনেক জল খেতে হয় কি না!

ওই হল! ওই-ই আধুনিক গঙ্গাজল ভাই। ভগবানের কী বিচিত্র লীলাই না দেখলুম।

গলির মোড়ে নেমে যেতে যেতে অঞ্জু জোর করে দশটাকার দু-খানা নোট গুঁজে দিল ভদ্রলোকের হাতে।

আপনি বেকার না?

আপনারও তো লস হল অনেক।

ওই ওঁদের থেকে বেশি কী? আচ্ছা আবার দেখা হয়ে যাবে। আমার নাম বিজন সরখেল। আপনি?

অঞ্জন পোরেল।

সাড়ে বারোটা বাজছে। জানলার কাছে উৎকণ্ঠিত মুখ।

কী ব্যাপার, অঞ্জু? এত রাত?

আর বোলো না। মর্মান্তিক একটা রোড অ্যাকসিডেন্ট। আটকে পড়েছিলুম। জামা কাপড়গুলো জলে ভিজিয়ে আবার যাব।

আবার যাবি? তোর কিছু হয়নি তো? —মঞ্জু চৌকাঠে।

'আমার?' অঞ্জু ভাবল, তারপর বলল, 'যাওয়া দরকার। তুই যা হোক কিছু খাবার দে। আমি চান করে আসছি।'

রাত তিনটেয় মোমিনপুর থেকে গাড়ি বেরোল। সৎকার সমিতি, গুরুদ্বার কারও গাড়ি পাওয়া যায়নি। টেম্পোয়ও আজকাল অনুমতি দিচ্ছে না। একটা গাড়ি মর্গ থেকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। সকাল এগারোটার আগে কোনো গাড়ি পাওয়া যাবে না। এগারোটা মানেই বারোটা, কিংবা একটা। বহু অল্পবয়সি ছেলে চারদিকে। এদের আত্মীয়স্বজন, এ ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সেদিকে তাকিয়ে নিজের ঘড়ির দিকে চাইল অঞ্জু। পাঁচটা বাজছে। বলল, 'আসুন না, আমরাই নিয়ে যাই, এই তো! কতটুকু আর পথ!' সে ডান পাশের সামনের খুরোতে হাত দিল।

আজও মেঘভরতি আকাশ। চুঁইয়ে পড়ছে সকালের আলো। একজন বয়স্ক মানুষ বললেন, 'মঙ্গলবার কাজ। কী যেন নাম তোমার? অঞ্জন? এসো বাবা। এসো কিন্তু।'

অঞ্জু বাড়ির পথ ধরল। গতকাল এ সময়েও মাধবী বিশ্বাস ছিলেন। হয়তো চা দিচ্ছিলেন তাঁর স্বামী শিশির বিশ্বাস, ছেলে রঞ্জন বিশ্বাসকে। ডাকাডাকি করে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন পুত্রবধূ কৃষ্ণাকে। সামনের দিকের চুলগুলো পাকা। সিঁথিতে অল্প সিঁদুর। রোগা, লম্বা, বেশ টরটরে। যখন কুঁচিগুলো হাতে ধরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। বেশ স্মার্ট! রাস্তায় চলাফেরা আজকালকার গৃহিণীদের তো বেশ অভ্যাসই আছে। তাহলে কী হল? চোখ? চোখের নজর কম হয়ে এসেছিল না কি? তার ওপর বর্ষাসন্ধ্যার ঘোলাটে আলো। ম্যাটাডরটা জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছিল। রাস্তা দিয়ে যে মানুষকেও চলতে হয় সে হুঁশ নেই। যন্ত্র ক্রমাগত মানুষকে চাপা দিয়ে চলেছে। সংঘর্ষ! সংঘর্ষের একমাত্র সাক্ষী, সংঘর্ষের কালে একমাত্র আশ্রয়, একটি বলিষ্ঠ বেকার যুবক শরৎ বোস রোড ধরে সোজা চলে আসছে। কে তাকে টেনে আনছে? তার তো এ রাস্তা দিয়ে যাবার কথা ছিল না। তাহলে কেন? একি মানুষীর জন্য মনুষ্য-শাবকের ভেতরের টান?

অজস্র ভিড়। প্রচুর জুতো। সেদিনের সেই ঘরখানাকে চেনা যাচ্ছে না। শ্বেতপদ্ম, রজনিগন্ধা, জুঁই। ট্রেতে করে সন্দেশ পরিবেশন করছে দুটি মেয়ে। অনেক পরিচিত, অনেক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন। বেশিরভাগই পরস্পরের সঙ্গে গল্পে মত্ত। জড়ো হবার একটা উপলক্ষ্য পেলেই শব্দরা উথলে ওঠে। সেতু বাঁধতে চায়। মৃত্যু? মর্মান্তিক! শেষ! কিন্তু জীবন? আহো জীবন। আহা জীবন! আমি, আমরা, তুমি, তোমরা যে পর্যন্ত আছি, আছ। আছিস? আছেন? আর থাকা দাদা। হাইপারটেনশন। ব্লাড শুগার তিনশো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বসুমল্লিকদের বাড়ি দেখা হয়েছিল না? হ্যাঁ, নাতির অন্নপ্রাশনে। সেই আর এই? এ তো আসতেই হয়। থাকি কোথায়? সিঁথি, নতুন বাড়ি করলুম যে! সিঁথি থেকে সাদার্ন অ্যাভেনিউ। বুঝুন। আপনি কি এখনও আই.সি.আই-তেই? জামাইটি তো খুব ভালো হয়েছে। লস এঞ্জেলিস। আরে বাবা আজকাল ভালো ছেলে মানেই মার্কিন দেশ। ও লিলিদি! দেখতেই পাচ্ছ না যে! সেদিন তোমার লেকচার শুনলুম। ওই তো গুরুসদয়ে। এখন সাঁই ভজনে যাস না তো কই আর? এক একটা হুজুগ আসে যেন! তা হোক, মানুষ বড়ো অসহায় রে! বুঝিস তো। একটা ভরসা চাই! কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ ... দেখলি তো? নিদানকালে কিছুই কাজে আসে না। পথে পড়ে বেঘোরে যাওয়া যদি কপালে থাকে তো তাই! আহা মাধবী বড়ো ফিটফাট ছিল রে! কথায় কথায় বলত হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে বরঞ্চ আমি বিনা চিকিৎসায় থাকব! উঃ! সাবধানও ছিল খুব! কী যে হয়ে গেল! এক বিঘত দূরে বাড়ি, স্বামী, ছেলে-বউ! ভাবা যায় না। শিশিরদার দিকে যেন তাকানো যাচ্ছে না। চুলগুলো ক-দিনে আরও সাদা.... বিনোদ, হ্যাঁ আমি ডাকছি। ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দাও না একটু। পুরুতমশাই দেশলাই জ্বালাতে পারছেন না।

অঞ্জু মুখ বাড়িয়ে দেখল মুণ্ডিত মস্তকে রঞ্জন আসনে বসে, হাতে কুশ, সামনে কোশাকুশি। পাশে সাদা লাল পাড় শাড়ি পরে সেদিনের সেই কৃষ্ণা বলে মেয়েটি। সে গোলাপ এনেছিল

কতগুলো। মাধবী দেবীর ছবির তলায় নামিয়ে রাখল। ইনি? খুব সম্ভব কয়েক বছর আগেকার। তখনও সামনের চুলগুলো অতটা পাকেনি। ছবির চোখ তার দিকে সোজা তাকিয়ে হাসছে। 'শেষ সময়ে বড়ো তেষ্টা পায়, অঞ্জু তুই জল দিয়েছিলি। ধুলোয় পড়েছিলুম। তুই কোল দিয়েছিলি।' 'বলুন..... বলুন পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ। আর এই পিণ্ডটি সবার জন্য। যাঁরা জল পাননি, তাপিত, পিপাসার্ত, অথবা যাঁরা পেয়েছেন, আরও পেলে আরও তৃপ্তি। গতাসবঃ। তাঁদের কথা মনে করে, হ্যাঁ...।'

অঞ্জু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। শ্রাদ্ধবাসর থেকে সবার অলক্ষ্যে সে পথে নেমে এসেছে। একটা মন্ত্রের ঘোর, একটা দৃষ্টির সম্মোহন তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে। আদিগঙ্গা।

'মাতৃশ্রাদ্ধ করবেন? অপঘাত? তা মস্তক মুণ্ডন করেননি কেন? অশৌচান্ত কোন পুরুতে করাল? আমি পারব না মশায়। ওই দিকে দেখুন গেঁজেল ঠাকুর রয়েছে। ওই যে থামে ঠেস দিয়ে! ওর কাছে যান। ও রাজি হয়ে যাবে। যত্ তো অশাস্ত্রীয় কাণ্ড...।'

কয়েকবার ডাকবার পর গেঁজেল ঠাকুর লাল চোখ মেলে বলল, 'বেশ বাবা, বেশ বেশ। মাতৃশ্রাদ্ধ করবে, কিছু নেই? আরে বাবা স্বয়ং পৃথিবী মাতা এত থাকতেও নিঃস্ব। কিছু নেই তাতে লজ্জা কী? প্রকৃত বস্তু হচ্ছে অন্ন, জল আর শ্রদ্ধা। আর সব ভেবে নিলেই হবে। সবই বাহ্য। অন্ন আর জলের সূক্ষ্ম অংশ আত্মা নেন। তা বাপু, ক-টি টাকা দাও, অন্নজলটুকুর জোগাড় করি।

চান করে এসো।

করেছি।

নব বস্ত্র পরো।

পরেছি।

তা একরকম ঠিকই বলেছ বাবা। একই বস্ত্র দেখার গুণে প্রতিদিন নতুন হয়ে ওঠে বই কি! সময়কে যদি পল-অনুপলের মালিক বলে দেখ, বস্তুকে যদি প্রতি নিমেষে লয় পেতে আবার জন্মাতে দেখ, তো নূতনে পুরাতনে কোনো ভেদ নাই। গঙ্গোদক একটু মাথায় দিয়ে বসো তবে। ... নাম বলো মায়ের! মাধবী দেবী? বাঃ! গোত্র? মনু? এরকম কোনো গোত্রনাম তো শুনি নাই বৎস! পিতৃপুরুষের নাম বলো। পিতামহ?

মানব।

পদবি নাই? নিরুপাধিক? বেশ বেশ। তা, তৎপূর্বে? প্রপিতামহ?

মানব।

তৎপূর্বে?

ইনিও মানব? বা বা বা।

মাতৃকূলের নামগুলি জানা আছে বৎস? মাতামহ?

মানব।

নিরুপাধিক? প্রমাতামহ?

মানব।

তৎপূর্বে? বৃদ্ধ প্রমাতামহ? ইনিও মানবই হবেন নিশ্চয়! চমৎকার। তবে বলো বৎস—বিষ্ণুর্ ওম্ মনুগোত্রস্য প্রেতস্য মম্মাতুর মাধবীদেব্যা....পিতামহস্য মানবদেবস্যো... মাতামহস্য মনুগোত্রস্য মানবদেবস্য অক্ষয়স্বর্গকামঃ এতদ্ অন্নজলং শ্রীবিষ্ণুদৈবত যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।

নাগিনা

সনাতনের বউটার চটক আছে। কথাটা সবাই বলছে। টি.ভি-তে ফিলিমের মেয়েছেলে দেখে-দেখে শালার চোখ আজকাল এমনি বিগড়ে বসে আছে যে কাউকে আর সহজে চোখে ধরতে চায় না। যদি বা চোখ-কান বুজে হাজার দশ-বারো ঝেঁপে একটার সঙ্গে ঝুলে পড়া যায় ক-দিনের পরই নেশা ফুট। তারপরে আছে আবার কাঁথাকানি, গু-মুত, চ্যাঁ-ভ্যাঁ। শুকনো মুখ, ঝোলা বুক, ফোলা পেট। দুশ্ শালা। মঙ্গা, নটে, যতীন সব একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে ঘরের মেয়েছেলে। মঙ্গা আজকাল যাচ্ছে বাঁধাঘাটের সোহাগির কাছে আর নটে পটেছে বিকাশ এন্টারপ্রাইজের বিড়ালচোখো সেলস্-ছুকরিটার সঙ্গে। নটের চেহারাটা আসলে এমন সাহেবমার্কা যে নটে বললে যেন ঠিক মানায় না। নটরাজ সিং বললে তবে খাপে বসে। তার গোরা মলাট, মাখুনে কথাবার্তা শুনে কেউ বলবে না সে একটা দাগি তোলাবাজ। সেলস্-ছুকরি জানে মি. সিং ব্যাবসা করেন। কী ব্যাবসা? না সাপ্লাই। এখন, তা কীসের সাপ্লাই, ছোরাছুরি না ছোঁড়াছুঁড়ি সে খবরটা মহব্বতের এই পয়লা ইস্টেজে কি কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে? সবচেয়ে শেয়ানা কিন্তু যতীন। সে চার ফেলে বসে আছে। দাঁও পেলেই গাঁথবে। নটেকে সে বলে থাকে, 'গোরা রং নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ধুস! মাল চাই। বহোৎ মাল।' রাধুদিদি রাধুদিদি করে সে এখন এক রাঁধুনিমাগির পেছনে পড়ে আছে। রাধুদিদির একটা ভালোমানুষ মেয়ে আছে। সাত চড়ে রা নেই। দু-বার ক্লাস এইট ফেল করে এখন ঘরে সেলাইপাতি শিখছে। করে-কম্মে খেতে হবে তো! একটা না একটা কিছু আজকাল সব গোত্তরের মেয়েছেলেদেরই দরকার হচ্ছে। তা এই রাধুদিদি লোকের বাড়ি রান্না করে বলে নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়, বর রেলের চাকুরে ছিল। ইনশিয়োরের টাকা, পেনশন, পি. এফ—এ সব মিলিয়ে রাধু বেশ মালদার। তার সাধ কালো মেয়ে এই বেলা চকোসা হয়েছে, তার একটা ভালো বিয়ে দেয়। যতীন বলেছে, 'তোমার ছায়ার পাত্তর দেখার ভার আমার রাধুদিদি।' ইতিমধ্যে নিজের ঘরের বউটাকে সে দুটো বাচ্চাসুদ্ধ স্রেফ গুম খুনের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে। সে যে নিজেই আদর্শ পাত্তর তা যতীন মুখে বলে নয়, কাজে প্রমাণ করতে চায়।

এরই মধ্যে সনাতন ফট করে বিয়ে বসে গেল। কত ঝেড়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুতেই ভাঙছে না। জিজ্ঞেস করলেই বলছে, 'এই বউয়ের গায়ে হাতে যা দেখছিস!' তা তোর বউয়ের গা হাত কি তুই দেখতে দিবি হারামখোর?

'দ্যাখ দেখে নে! আমার বউ তো আর মোচলমানের ঘরের বোরখাপরা বিবি নয়। মর্ডান মেয়ে। দ্যাখ।'

ফট করে বউয়ের শলমাচুমকির ঘোমটাখানা হাট করে দিল সনাতন।

ফিক করে হাসল মেয়েটি। তারপরেই গম্ভীর হয়ে উঠে চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, 'চা আনছি।'

তখনই সব্বাই দেখল—বাপ চটক বটে।

ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে ফুসলিয়েছিস না কী বল তো!

সনাতন বললে, কেন? আমরা কি ভদ্দল্‌লোক নই?

সে কথা যদি বলিস তো সে আলাদা কথা। পেলি কোথায়?

সম্বন্ধ করেছে আমার মেসো। তেলকলের পোদ্দারবাবুকে চিনিস তো? সে-ই। বাপ মা মরা। পিসির গলায় ছিল। ঝোপ বুঝে মেসো কোপ মেরেছে।

কী রকম?

পোদ্দার মেসোর কাছে টাকা ধারত পিসিটা। মেসো বললে, 'টাকা যখন খুশি দিয়ো। কিন্তু আমার শ্যালীপোর জন্যে দিতে হবে তোমার ভাগ্নিটাকে।'

কেন? তার জন্যে অত দরদ কীসের?

কী যে বলিস? শ্যালীপোর জন্যে মেসোর দরদ থাকবে না তো কি তোর জন্যে আমার থাকবে? ...

এই সময়ে বউ চা নিয়ে এল। একটা কেটলি আর গোটা কতক মাটির ভাঁড়।

'সবাইকে ঢেলে ঢেলে দাও।' সোয়ামির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ক্যা নাম গো ভাবি? —নটে একটু হিন্দির মিকসি দিয়ে শুধোয়।

নাগিনা।

ক্যা?

চার-পাঁচ যতজন ঘরে ছিল সব্বার যেন একসঙ্গে ইলেকট্রিকের শক লেগেছে।

থিনঅ্যারারুটের বিস্কুট সুদ্ধ একটা স্টিলের থালা সনাতনের হাতে চালান করে চলে গেল বউ।

সত্যি রে সনা?

কী সত্যি?

ওই নাম?

সনাতন হাসতে থাকে, 'মিছে কথা বলতে যাবে কেন খামোখা? মলিনা, সেলিনা এত নাম হচ্ছে আর নাগিনা নাম হতে পারে না?'

এখন, দলে এক নম্বরের হিরো যদি হয় নটরাজ, তো দু নম্বর হল সনাতন। নটের মতো কটা রং, ঝাড়া ছ-ফুট না হতে পারে, কিন্তু সনার কাঠামোটাও কিছু ফ্যালনা নয়। তা ছাড়া রঙে নটে পয়লা হতে পারে, কিন্তু চুলে গুরু সনা। সনার মাথায় একেবারে আসল গুরু ফিট করে বসানো। এ বুড়ো বয়সের কে. বি. সি-র গুরু নয়, একেবারে বয়সকালের রংদার শরাবি। যেন পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়ির বনেট! ইয়া গুল, ইয়া ছাতি। বলবান পুরুষ যাকে বলে।

এ হেন সনাতনের ঘরে সুখ-সোয়াস্তি ছিল না। মা-বুড়ির কবেই কোমর ভেঙেছে। দিনরাত কোঁকায় আর সনাতনের মরা বাপকে গাল দেয়। ইঁদুরে মাটি তুলে তুলে ঘরদোর নৈরেকার করেছে। রান্নাঘরে দুটি সানকি, একটি জনতা, একটি কড়া আর একরাশ কালিঝুলি। ডিজেল-মিশেল কেরাচিনির ঝাঁঝে ভূত পালিয়ে যায়। কিন্তু ইঁদুর, আরশুলো, টিকটিকি, মাছি, মশার কামাই নেই। একখানাই ঘর, দরমার বেড়া দিয়ে দুভাগ করা। একদিকে মা আরেক দিকে বউ নিয়ে ছেলে। বউ সনাতনের মুখ চাপা দেয়, 'আস্তে, আস্তে, আস্তে।'

নিকুচি করেছে তোর আস্তের।

তাহলে আমি পিসির কাছে চলে যাব। কালই। দিব্যি!

ব্যস, জোঁকের মুখে নুন পড়ে। এখন নতুন শাদি। নতুন রংচং। তার ওপরে চটুকে বউ। বয়স ষোলো কি সতেরো। এখন সনাতন একটু বিচ্ছেদসম্ভাবনাকাতর তো হবেই।

অ বউ? কী কচ্ছিস?

গর্তে অ্যাসিড দিচ্ছি মা!

দিয়ে?

দিয়ে ইট পাথর খোলামকুচি দিয়ে ভরাট করব।

কদ্দিন দিবি?

যদ্দিন না গেরস্তর ঘর থেকে ইঁদুর যায়।

অ বউ কী ঘষচিস?

গেরস্তর কড়া কেটলি ছানতা-জালতি জনতা খন্তা খন্তি!

ঘষে?

রুপোর মতো চকচকে যদি না করি তো আমার নাম নেই।

কদ্দিন রাখবি?

যদ্দিন গতর থাকে মা আর যদ্দিন আমার মানুষের...

মানুষের কী?

কিছু না।

অ বউ, কে এল?

নিবারণদা।

কে নিবারণ? নিবা ঘরামি?

হ্যাঁ গো মা।

কী করবে?

বারান্ডা ছাইবে।

পয়সা দেবে কেডা?

যার ঘর সে দেবে! তোমার ছেলে, আবার কে?

সনাতন সেদিন কাজ সেরে ফিরে দেখে ছাওয়া বারান্দায় নতুন পলতে পরানো পরিষ্কার জনতার নীল শিখায় চকচকে তাওয়া চাপিয়ে চেপে চেপে রুটি করছে বউ। একদিকে উঁচু মাটির বেদিতে পুরোনো সানকি কড়া-কেটলি যেন বা নতুনই। ক-টি ধোয়া মাটির ভাঁড় পাশে উপুড় করা।

এ কী?

বাচ্চা মেয়ের মতো একগাল হেসে বউ বলল, 'রান্নাঘর গো, এবার থেকে এখানেই রান্না করব। ভালো হয়নি?'

মুখ আঁধার করে তাকিয়ে তাকে সনাতন।

নিবারণদাকে দিয়ে ছাইয়ে নিলুম। সবসুদ্ধ পঞ্চাশটা টাকা তুমি ওকে দিয়ে দিয়ো। এসো চা খাবে এসো।

সনাতনের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে না বউ, ভূতপূর্ব রান্নাশালে ঢুকে যায়। এইবার সনাতনের চমৎকৃত হওয়ার পালা।

বাড়ির একটিমাত্র তক্তপোশে গুছিয়ে বিছানা করা। মা সেখানে বসে হাসছে। ছোট্ট জানলা দিয়ে ছোট্ট একটা হাওয়া ঢুকল। ঘরেতে মশার ধূপের কড়া গন্ধ।

বউ বললে, 'রুটির সঙ্গে গুড় খাবে তো?'

ভেলি?

না এখো।

আড়ে আড়ে চায় সনা, বউয়ের মুখে রহস্য হাসি।

অর্থাৎ কিনা, মায়ের এখন আলাদা ঘর হল অর্থাৎ কিনা বড়ো ঘরটি এখন নির্ভাঁজ নিষ্কণ্টক ফুলশয্যে ঘর।

তাই বলে আমাকে না বলে-কয়ে তুই এত বড়ো কাণ্ডটা করবি?

'দ্যাখো,'—বউ চোখ তুলে সোজা তাকায়, 'তুমিও যেমন কত্তা, আমিও তেমন গিন্নি। বারের ব্যবস্থা তোমার, ঘরের ব্যবস্থা আমার। তোমাকে বললে তুমি বাগড়া দিতে না? এতদিন ধরে ঘরদোরের এমন ছিরি তবে কেন করে রেখেছিলে?'

'খুব গিন্নি হইচিস'—কচি চিবুকখানা এবার সোহাগ করে নেড়ে দেয় সনাতন।

এইভাবেই আস্তে আস্তে সনাতনের রান্নাঘরে বাসন হল, মায়ের ঘরে ঠাকুর বসল, নিজের ঘরে তক্তপোশ এল, তক্তপোশে নতুন বিছানা-বালিশ, ঘরে তাক, তাকে পুতুল। ঘরের বাইরে পাপোশ, ভেতরে মাদুর, বারান্দায় মোড়া, কোণে ঝাড়ু, চা খাবার কাপ, জল খাবার গেলাস। সন্ধের শাঁখ, ধূপ। আর সনাতনের বেতো মা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। কবে যে সে দাঁড়িয়েছে, কবে যে পাড়া বেড়াতে শুরু করেছে, কবে যৌবনকালের তরিবতের মাংসের কালিয়া রাঁধতে লেগেছে সনাতন সেটা খেয়ালই করেনি। খেয়াল করল যেদিন সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে মাকে দেখতে পেল না।

মা কই রে?

সিনেমা গেছে।

বলিস কী? বেতো হাঁটু মচকে যদি মাঝরাস্তায় পড়ে যায়?

পড়বে কেন? মায়ের আর পায়ের ব্যথা নেই তো!

নেই!

কেন, দেখতে পাও না?

তা কী করে গেল?

মল্লিক ডাক্তারকে দেখলুম। ওষুধ দিলে, মালিশ চলছে।

গেল কার সঙ্গে?

দল বেঁধে গেল সব। চার-পাঁচ জনা। ভালো বই এসেছে।

তা তুই গেলি না?

'আমি? তোমায় ফেলে?' —বউ সনার গলা জড়িয়ে ধরে, বলে, 'যাব, তুমি-আমি।' কিন্তু সিনেমা না।

তবে?

বেড়াতে যাব। ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়ে, ভোঁ-করে, অনেক দূর। নিয়ে যাবে?

বেশ। যাস এখন।

বলে বটে, কিন্তু যাওয়াটা আর হয়ে ওঠে না। ঘরে ফিরলেই কোথা থেকে রাজ্যির আলস্য এসে সনাতনের হাত-পা মনের দখল নেয়। ইদানীং আবার তার মা সুদ্ধ ঝালর দেওয়া হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে। এত আরাম! এত আরামও ঘরে থাকতে পারে?

প্রায় দিনই সনাতন দেখে এ পাড়ার ও পাড়ার বউঝিরা তার বারান্দায় আসর জমিয়েছে। কাপে করে চা খাচ্ছে, উল বুনছে, আর গপ্পো করছে। সে ঢুকলেই আসর ভেঙে যায়। 'আজ চলি ভাই', 'চলিরে' বলতে বলতে সব গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে পড়ে। বোঝা যায় আসরটা চলছিল অনেকক্ষণ কেউ কেউ চেনা পড়োশিনি, 'কী মিস্তিরি, আছ কেমন!' বলে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে ভদ্রতা করে যায়। কেউ আবার হাতের থলি গুটিয়ে একেবারে বার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'এত আড্ডা কীসের?'—সে গম্ভীর মুখে বলে একদিন।

বউ প্রথমটা জবাব দেয় না।

'কী রে?'—আবার হাঁকে সনাতন।

কেন? আড্ডা দিলে কী হয়?

যদি কিছু নাই হবে তবে পালায় কেন? যেন পালে বাঘ পড়েছে!

মুচকি হাসল মেয়ে, বলল, 'আচ্ছা, এবার বলে দেব, ঘরের মানুষ এলে পালিয়ো না গো।'

মুড়ির সঙ্গে থাবা-থাবা ঘুগনি খেতে খেতে সনাতন বলে, 'আড্ডা হল গিয়ে মেয়েমানুষের কাল, শনির দশা যাকে বলে। বুঝলি? আজ ভাত সেদ্ধ হয়নি। কাল তরকারিতে লবণ দিতে ভুলেছি। পরশু পাশের ঘরের বচসায় তাল ঠুকতে যাচ্ছি।'

সনাতনের গলায় মুড়ি আটকে যায়। বউ হাসছে, গমকে গমকে হাসছে।

'কী হল? এত হাসি কীসের?'—সে ধমকিয়ে ওঠে।

'জল খাও এক ঢোক'—জল এগিয়ে দেয় বউ। তারপর হাসি গিলে নিয়ে সিঁদুররাঙা মুখ করে বলে, 'তুমি এমন করে বলো! শুলোতেও হাসবে।'

কথাটা হাসির হল?

হাসির ছাড়া কী? একেক দিন দুপুরে দু-চারজন বন্ধুসাথি আসে, তো তার সঙ্গে ভাত ধরা, তরকারি সেদ্ধর সম্পর্ক কী! আগে অসিদ্ধ, আলুনো পাও তারপরে বোলো।

'তুই জানিস না'—সনাতন এখন অনেক নরম হয়ে এসেছে—'মেয়েমানুষ জাত বড্ড জাঁহাবেজে, মতলববাজ! ওই যে চৌরাস্তার শঙ্করীটা! ও তো তোর মাথায় ভূত ঢুকিয়ে দিল বলে!'

জাত তুলছ কেন মিস্তিরি! আমি যদি ব্যাটাছেলে জাত বলে খোঁটা দিই তোমার কেমন লাগবে? সব মানুষে কি আর সমান হয়? ওই যে তোমার বন্ধু যতীন, মঙ্গা, নটে...ওরা আর তুমি কি এক? শঙ্করীই বা তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিল!

'বাপ রে! কাঁড়ি কথা শুনিয়ে দিলি যে!' —সনাতন হাসে। তার বন্ধুদলের থেকে সে আলাদা—এই নতুন সন্দেশটি তার বেশ লেগেছে। যেন 'আবার খাব' সন্দেশ। সত্যি কথা বলতে কী যতই সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হোক, সনাতনের ভেতরে একটা কমপ্লেক্স কাজ করে। নটে ফিলিমস্টার, মেয়েমাত্রই তাকে দেখলে লটকে পড়ে, মঙ্গার পুলিশফুলিশের সঙ্গে এক গেলাসের ইয়ার্কি, যাকে বলে ইনফ্লুয়েন্স। যতেটার বডিতে যেমন, বাতচিতেও তেমন সর্ষের তেল মাখানো, যে কোনো বিপদ থেকে স্রেফ বাতেল্লা দিয়ে কেটে বেরিয়ে যাবে। কার্যসিদ্ধির জন্যে স্বয়ং বস্ নটে যতের বুদ্ধি নেয়। মঙ্গার হোল্ডের ওপর ভরসা করে। কিন্তু সে সনাতন কে? কী? একটা সাধারণ কলের মিস্তিরি যার একখানা প্রকাণ্ড থোবড়া আছে। বাস! প্লামিং কাজ সে খুব ভালোই জানে। কিন্তু কমপিটিশন এসে যাচ্ছে। ফটিককে সে নিজের হাতে কাজ শেখাল এখন সেই ফটিকেরই পাখা গজিয়েছে। অধর দাস হেড মিস্তিরিটা তো আস্ত ঘুঘু। পানি-ট্যাংকির কাছে সকালবেলা তারা জড়ো হয়। অধর দাস হেড। ওইখান থেকেই সব যে-যার ডিউটি নিয়ে সারা দিনের মতো বেরিয়ে যায়। তার শাঁসালো কাজগুলোয় অধর ঠিক ব্যাগড়া দেবে।

সিঙ্গিদের ফুরুলে (ফেরুল) টি লাগিয়ে দু ফাঁক করেছিস তুই? হাঁরে সনা!

হ্যাঁ। কেন?

জানিস বড়ো সিঙ্গিদের কলে জল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ফুরুলে হাত দেবার তুই কে? তোর কর্পোরেশনের লাইসেন্স আছে?

এখন লাইসেন্স সত্যিই নেই। কিন্তু বড়ো সিঙ্গিদের কলে জল না আসার নালিশটা ডাহা মিথ্যে।

ছোটো সিঙ্গিরা ডেকেছিল সনাতনকে। তাদের কলের জল তাদের বড়ো শরিক পুরো ধরে নিচ্ছে, কল নীচু করে এস্টপ-কক দিয়ে। সনাতন বুদ্ধি দিল একেবারে ফ্রুল থেকে দুজনের লাইন আলাদা করে নেওয়া যাক। তাই করতে ছোটো সিঙ্গিদের যত জল আসছে বড়ো সিঙ্গিদেরও ততই আসছে। প্রেশার কম। তাই দুজনেই কম-কম পাচ্ছে। কিন্তু পাচ্ছে ঠিক।

অন্যদের ব্যাপারে, এমনকী সেদিনের ছোঁড়া ফটিকের ব্যাপারেও যেটুকু বা প্রোটেকশন দেবার, দিয়ে থাকে অধর দাস, যার না কি কর্পোরেশনের লাইসেন্স আছে। খালি সনাতনের বেলাতেই খিস্তি, খচরামো। বললে, 'আইন মেনে কাজ না করলে নিজের পোঙা নিজে ঢাকিস। আমি পারব না।'

এই অবস্থায় বউয়ের অ্যাসেসমেন্ট সনাতনের লাগে মন্দ না। মুখে অবশ্য জানতে দেয় না, বলে, 'এ শালি, খবদ্দার। বন্ধু তুলে কথা বলবি না। জানিস কত বড়ো বড়ো এস্টার একেক জন!'

'এস্টারই বটে!'—বউয়ের ঠোঁট তাচ্ছিল্যে বেঁকে যায়। 'তোমার ওই যতীন। নিজেকে ভেবেছে খুব চালাক, মিউ মিউ করে রাধুপিসির পেছনে পেছনে ঘুরছে। রাধুপিসি যেন আর জানে না কী মার মেরে যতীন নিজের বউটাকে তাড়িয়েছে। আর ওই মঙ্গল? ও তো দারোগার চাকর। বাড়ি গিয়ে পা-ধোয়া জল খেয়ে আসে, মুখেই যত হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা।'

তা হলেও হতে পারে, কিন্তু নটে?

বউ এবার মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'ছিঃ!'

কীসের ছি, কেন ছি এসব বিশ্লেষণে সে যায় না।

তা আমিই বা কীসে এদের চেয়ে সরেস হলুম রে!

তুমি তো তবু সৎভাবে উপায় করছ, ঘর বসিয়েছ, বুড়ো মাকে দেখছ...

আর যদি সৎভাবে উপায় না করি! যদি বাইরের দিকে নজর দিই, যদি মা-বউকে না দেখি?

'তবে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাবে!'—বউ আর কথা বাড়ায় না।

ইয়ার দোস্তরা খারাপ। সে ভালো। এ একটা আমোদের ব্যাপার বটে। সনা এ আমোদ বেশিদিন চেপে রাখতে পারলে না, একদিন বাংলুর মুখে বলেই ফেললে।

আমার বউ না তোদের দেখতে পারে না মাইরি।

'কারুর বউই সোয়ামির দোস্তদের দেখতে পারে না রে সনা। হিংসকুটির ঝাড় সব।'—যতে বলল।

কিন্তু সনাতন চলে গেলে বোঝা যায় কথাটায় তিনজনেরই আঁতে লেগেছে। কিছুর মধ্যে কিছু না, যখন-তখন তারা সনাতনের বাড়ি চড়াও হতে থাকে।

ক্যা ভাবি, একটু চা খাওয়াও, মিঠে হাতের কড়া চা! কী বল সনা?

বা, বা, ফুলকাটা চিনে মাটির কাপ, আজকাল এতেই চা খাচ্ছিস তবে?

আরে এ মোড়াগুলো তো আগে দেখিনি!

এ মাদুরটাও দেখচি নতুন! তা এত নয়া নয়া চিজ কোথা থেকে আসচে রে ইয়ার?

সনাতন তাচ্ছিল্যে ঘাড় নাড়ে, 'ও সব ঘরের ব্যবস্থা আমি বিলকুল বউয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। ও যা ভালো বুঝবে করবে। কোথা থেকে কিনেছে, কবে কিনেছে এসব আমি থোড়ি শুধোই।'

বন্ধুরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করে মুখ মটকে হাসে। বাস, আর কিছু না।

সেই শীতে সনাতন বউয়ের কাছ থেকে একটি জম্পেশ উপহার পায়। খয়েরি রঙের কার্ডিগান। ফাসক্লাস জিনিস। দুদিকে পকেট, বাহারি বোতাম। পরে ঠেকে যেতে হইচই পড়ে যায়। ঠেকসুদ্ধ

চ্যালাচামুণ্ডা গুরু গুরু করে ওঠে। কে এসে পকেটে হাত দিচ্ছে, কে বোতামে চুমু খাচ্ছে, কে আবার জোড়া জোড়া সাপ প্যাটার্নে হাত বুলুচ্ছে।

'সনা পকেটে কী রাখবে বল তো'—নটে জিজ্ঞেস করে যতেকে।

যতীন বলে, লুলিপপ।

মঙ্গা বলে, বলিস কী? সনা আজকাল লুলিপপ খাওয়া ধরেচে?

নিচ্চই—যতীন বলে—বউ রোজগার করছে সনা লুলিপপ খাবে না তো কি তুই খাবি? এবার বকলস দেওয়া পেন্টুল পরবে, মাথায় টুপি পরবে। বউই পরিয়ে দেবে।

ঠেকসুদ্ধ লোক হেসে ওঠে।

সনাতনের ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে যায়। সে সামনের বেঞ্চি ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। আদাছোলার চাট শালপাতাসুদ্ধ পড়ে যায়। সে কলার ধরে যতের।

যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! থোবড়া তোর এক চড়ে ভেঙে দেব।

নটে এসে ছাড়িয়ে দেয়, 'আরে ছাড় ছাড়, নিজেদের মধ্যে এসব কী রে সনা?'

গুরু তুমিই বিচার করো, এসব টুপি-ফুপি কী বলছে যতে, তার ওপর বউ তুলে কথা!

নটে বলে, ছাড়। যেতে দে। মুখ ফসকে কথা একটা বলে ফেলেচে।

তখনকার মতো শান্তি বিরাজ করে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই কখনও মঙ্গা কখনও যতে উলটোপালটা উটকো মন্তব্য করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে, কখনও সনাতন ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। কখনও আস্তিন গুটোচ্ছে, অমনি থেমে যাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে কথাগুলো। যতে-মঙ্গার সঙ্গে সুতরাং একটা হিচ্‌ হয়ে যাচ্ছে সনাতনের। কিন্তু নটরাজের কথা হল আলাদা। সে হল ভদ্দরলোক। তার সঙ্গে মাখামাখি দিন-কে-দিন বাড়তেই থাকে সনাতনের। লোকে বলে, 'সনাতনের সঙ্গে নটরাজের পটবে না তো কি তোর সঙ্গে আমার? নটে যদি তেণ্ডুলকর হয় তো সনা হল বিনোদ কাম্বলি। নটে যদি উত্তমকুমার হয় তো সনা হল সুচিত্রা সেন। নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বলে কথা!'

দুজনের এক নিভৃত মজলিশে নটে বলে, 'একটা কথা তোকে বলি সনা, মেয়েছেলেকে কখনও বিশ্বাস করবি না। অবিশ্বাস করতে তোকে বলছি না। কিন্তু চোখ কান একটু খোলা রাখতে হয়। বউ রোজগার করছে কথাটা ন্যাড়া করে বলতে সেদিন তোর গায়ে খুব লাগল, লাগবার কথা, কিন্তু সত্যিই তো কী করে তোর বউ ঘরের ছিরি অমন ফেরাল, তোর ঘরদোর তো আগেও দেখেছি।'

ও কথা বলিস নে নটে, ও তো উল বোনে। এখন উলের বোনা ফি গোলা কুড়ি টাকা মজুরি। একটা দশ-গোলার সোয়েটার বুনলে অমনি দুশো টাকা। বাড়ি বসে রোজগার, ভালো নয়? দুপুরবেলা আরও পাঁচটা মেয়ে আসে, হাতে থলিতে উলের গোলা! কথা বলতে বলতে শটাশট হাত চলে।

চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল নটরাজ। শেষে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, ভালো, খুব 'ভালো, অর্ডারগুলো ঠিকঠাক ধরতে পারলেই ভালো।'

কথাগুলো বাড়ি এসে বউকে শোনাল সনাতন। শুনে সে গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমাকে কে আমার হয়ে সাউখুড়ি করতে বলেছিল? কত রোজগার করি, কেমন করে রোজগার করি, এ সব ঘরের কথা পাঁচজনকে বলতে যাবার কী দরকার? তোমাকে বউয়ের রোজগারের খোঁটা দিচ্ছে, ওদের বউদের কী করতে হয়? বাচ্চা-কাচ্চা সুদ্ধু বউগুলোকে তো ঘরের বার করে দিয়েছে। যতীনের বউ সুন্দরীদিদি কোলে ছেলে নিয়ে লোকের বাড়ি-বাড়ি বাসন মেজে বেড়াচ্ছে। মঙ্গলের

বউ-লক্ষ্মীদিদির তিনটি ছেলেমেয়ে, খাওয়াতে না পেরে শেষে লাইনে দাঁড়াচ্ছে সে খবর রাখো? আর ওই নটা? ও যে কতগুলো মেয়ের সব্বনাশ করেছে। একটা গলায় দড়ি দিয়েছে। দুটো কোথায় চালান হয়ে গেছে কেউ হদিস করতে পারছে না।'

এতগুলো কথা স্বল্পভাষী সনাতনের বউ কোনোদিন বলেনি।

সনাতন প্রথমটা চুপ। কথাগুলো সত্যি। সনাতনের মর‍্যালিটি অবশ্য খুব পোক্ত নয়। যতীন বা মঙ্গলের বউদের সঙ্গে বনেনি তো ছেড়ে দিয়েছে, এর মধ্যে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুললে চলবে কেন? ছেলে কোলে নিয়ে সুন্দরীকে যদি পেট চালাবার জন্যে বাসন মাজতে হয় তো মাজবে! ছেলে বড়ো করার ভার মায়েরাই নেয়, ওসব ঝামেলি বাপেদের পোষায় না সবাই জানে, যতীনের এত পয়সা নেই যে সে এখন বউকে খোরপোশ দিতে বসে। তেমন বুঝলে সুন্দরী বাচ্চাগুলোকে বাপের কাছ পাঠিয়ে দিক। যতীন তাদের দেখভাল করবে কিনা, তারা বাঁচবে না মরবে অত কথা ভাববার দরকার তো সুন্দরীর নেই! গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব—এ হয়? কাজেই সে তার বউকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়, 'যা যা চুপ কর, চুপ কর। এত খবর তোকে কে দিয়ে গেল? গলায় দড়ি, হুঃ।'

হঠাৎ একদিন নটে ভিন্ন মূর্তি ধরে। সে সনাতনের বউয়ের খুব অ্যাডমায়ারার হয়ে পড়ে। দূর থেকে অবশ্য।

তোর অনেক ভাগ্য অমন লক্ষ্মী পেয়েছিস রে সনা। রূপসি তোর বউ একশোবার। কিন্তু গুণ তার দুশো।

ইয়ার্কি মারছ বস্?

ইয়ার্কি কী রে? ফ্যাক্ট! মাইন্ড করিসনি সনা, তুই তোর বউয়ের নখের যুগ্যি নয় তাই অমন রূপগুণের কদর করতে পারিস না। এই তো সেদিন নিবারণ বলছিল...তা দ্যাখ। কদিন ঘরে রাখতে পারিস।

নিবারণ আবার কী বলল?

তেমন আর কী! প্রায়ই যায় কিনা। বলে লক্ষ্মীর পিতিমে, দেখলে চোখ জুড়োয়।

'জুড়োচ্ছি চোখ'—সনাতন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর দ্যাখ নটে, গুরু আছিস গুরু থাক। তোকে আর আগ বাড়িয়ে আমার বউয়ের গুণ গাইতে হবে না। সব করেছে। ভারি দুশো-তিনশো রোজগার করছে অমনি সব তার করা হয়ে গেল। সনাতন আর রুজি রোজগার করে না, সনাতন আর কত ধানে কত চাল জানে না।'

নটে বলল, 'আমি একা নই বে শালা। সব্বাই তোর বউয়ের গুণ গাইচে। বলচে অমন মেয়ে লাখে একটা মেলে না। তোর সংসারটাকে একেবারে মাথায় করে রেখেচে। তোকে রেখেচে হাতের তেলোয়। বল রাখেনি? কোনো কিছুর জন্যে তোকে আর ভাবতে হচ্চে?'

'নিকুচি করেছে তোর হাতের তেলোর'—সনাতন রেগেমেগে উঠে যায়। পেছন থেকে নটে হেঁকে বলে, 'একেই বলে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। শালা অমন গুণের বউ পেয়েচিস তার কদর করতে শেখ। তা নয়...নিবারণ তো বলছিল...'

সনাতন ক্রমে ক্রমে চুপচাপ হয়ে যায়। হঠাৎই একদিন বউয়ের তৈরি জলখাবার সে ছুড়ে ফেলে দেয়, 'এটা কি সুজি হয়েছে? রুটি গড়তে শিখিসনি? কী শিখিয়েছে তোর ঝি পিসি? ভাত সেদ্ধ করতে পারিস না বেজন্মার বেটি!'

এই ক্রোধ, এই গালির সামনে বউ ক্রমে আর নির্বাক হয়ে থাকতে পারে না। বলে, 'শুনি বটে

এর তার কাছে সোয়ামি মানেই গালি। তা আমাকে যা বলছ বলো, আমার মরা বাপ-মা, আমার পিসি এদের গাল দিচ্ছ কেন? ছিঃ! এই তুমি মরদ?'

না না, আমি মরদ হতে যাব কেন? যত মরদ তোর ওই নিবারণ।

কেন? নিবারণদাদা আবার কী করল?

কী করল? নিবারণের সঙ্গে তোর কী? পাড়ায় যে ঢিঢি পড়ে গেল!

পাড়ায় ঢিঢি? নিবারণদা? কী ভুল বকছ?

ভুল বকছি? আনব ডেকে পাড়াসুদ্ধ লোককে?

বউ পত্রপাঠ স্থানত্যাগ করে।

অর্থাৎ সাক্ষীর ভয়ে আসামির টনক নড়েছে।

এখন থেকে সনাতন, চুল্লু পান করে এসে নিয়ম করে বউকে ঠ্যাঙায়। বাড়ির জানলা দরজাগুলো খুলে রাখে, নালিশগুলো যাতে পড়শিরা ভালো করে শুনতে পায়।

আশনাই! নিবার সঙ্গে আশনাই চলছে? মেরে মুখ ভেঙে দেব!

চুপ করো, চুপ করো। কারও নাম নিচ্ছ কেন শুধু শুধু?...

আর শুধু শুধু। সনাতনের মতো মরদ কি কাউকে গেরাজ্যি করে? শুনুক, দু'ধারে সব্বাই শুনুক যাকে তারা মাথায় তুলে নাচত কেমন গুণের গুণী সেই ধনি!

এততেও কিন্তু দমে না সেই বউ। আরও জম্পেশ করে পাঁঠার কালিয়া রাঁধে। তরকা রুটি। তক্তপোশে নতুন লেপ। কাজ সেরে বাড়ি ফিরলে শীতের দিনে হাত পা ধোবার গরম জল। বাড়িতে বিরাজ করে শান্তি। শান্তি অবশ্য একটা মশারির মতো। ভেতরে সন্ত্রস্ত ঘুম, বাইরে মশার ক্রুদ্ধ গর্জন। দুরারোগ্য ব্যাধির বাহকরা চক্রাকারে ঘোরে, ফাঁক পেলেই ঢুকে পড়বে।

নিবারণ বউয়ের বাপের পাড়ার লোক। পিসি তার মাধ্যমেই ভাইঝির তত্ত্ব নেয়। সে তো আর অতশত জানে না। সে বেচারির মাঝে মাঝে একেবারে কাঠবেকার দিন যায়। তখন সে সকাল থেকে রাত অব্দি ফ্রি। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কেউ একটা ফরমাশ করলে হাসিমুখে খেটে দেয়। কিংবা নিছক গল্প জমায় কারও বাড়ির দাওয়ায় বসে।

একদিন দরকারে অসময়ে ফিরছে, স্বগৃহে নিবারণকে দেখে থমকে আড়ালে দাঁড়ায় সনাতন।

নিবারণ হাঁক পাড়ছে, বউ এসে ঘোমটা খুলে দাঁড়াল। মুখে হাসি আর ধরে না। কী যেন একটা বলছে নিবা, ও-ই বউয়ের হাতে একটা চিঠি দিল! বসছে দাওয়ায়, জল-বাতাস এসেছে! মা বুড়ি কোথায়? ওহ্ তার তো এখন পা হয়েছে, পাড়া বেড়াতে গেছেন। ঘরে সোমত্ত বউ একা, ভাঁড়ে রসগোল্লা, চারদিকে ভনভন মাছি, ফেলে উনি গেলেন মজা মারতে। ঠ্যাং ভেঙে দিব—দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে সনা। ও কী! নিবা যে তার বউয়ের পেছু পেছু ভেতরে যায়? পাঁচ মিনিট? ঘড়ি দেখেনি সনা, কিন্তু এ নির্ঘাত, পাঁচ যুগ! ওই বেরিয়ে এসেছে। বউয়ের কাপড় কি এলোমেলো নয়? নিবার মুখে যেন সিঁদুরের দাগ! নেই? মুছে দিয়েছে শালো! কম সেয়ানা নাকি? বেরিয়ে যাচ্ছে নিবা। একটু সময় দিয়ে বাড়ি ঢোকে সনাতন।

'তুমি? এখন?'—ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছে বউ।

'একটা যন্তর নিতে এসেছিলুম'—সনাতনের আর প্রবিত্তি হয় না কালামুখীটার সঙ্গে কথা কইতে। তোম্বা মুখ করে সে বেরিয়ে যায়। বউ প্রমাদ গণে। কিছু একটা হয়েছে। কী? নিবাদা এসেছিল পিসির চিঠি নিয়ে মিস্তিরি কি আড়াল থেকে দেখেছে? নিবাদাকে দেখে কিছু ভাবল নাকি? সে আজকাল নিবাদাকে অত এসো-বসো করে না। বাপের বাড়ির লোক। দাদার মতো। তাকে গর্হিত সন্দ'র কথা বলে সাবধান করতে সে মরমে মরে যায়। আজ আবার পিসির চিঠি

নিয়ে তত্ত্ব করতে এসে নিজেই দেখতে চাইল কোথায় চালে কী ফুটো হয়েছে। টালি খসেছে, মাটি ধরাতে হবে...। নিবাদাকে দিয়ে আর কাজ করাবে না সে। কিন্তু দেখতে চাইলে না তো করতে পারে না। কাজ খোঁজে বেচারি, কাঠবেকার এ সময়টা। ঠিক এমন সময়েই মিস্তিরির আগমন? একটু বসল না। একটা কথা শুধোল না। সাঁঝের বেলায় বাড়ি ফিরলে সে নিজেই তুলবে কথাটা। 'নিবাদা এসেছিল টালি সারাতে হবে, দেয়ালে মাটি ধরাতে হবে...'

কিন্তু সাঁঝের বেলায় আজ আর ফিরলই না সনাতন। গেল বাঁধাঘাটে সোহাগির ঠেকে। চুল্লু গিলল মাঝরাত্তির অবধি, তারপরে রক্তরাঙা চোখে একখানা কাতান হাতে বাড়ি চলল।

বাড়ি? বাড়ি তো আর বাড়ি নেইকো তার। হয়ে গেছে নরককুণ্ডি খানকিবাড়ি। পায়ের কাছে এটা কী রে বাঞ্চোৎ? এক লাথিতে রাস্তায় পড়ে থাকা কার করোটিতে লাঠির বাড়ি মারে সনাতন মিস্তিরি। টলে একটু-আধটু। মাথায় তার আগুনের হাঁড়ি, তাতে ফুটছে সাতশো ভ্রূণের বাঁ হাতের কড়ে আঙুল, বুনো শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি, খুনে-ডাকাতের ধোলাই মগজ, কঙ্গোর জঙ্গলের শেকড়-বাকড়...। আজ সে দেখিয়ে দেবে মরদের বাচ্চা কাকে বলে! ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ! রাত-কুকুর চিকরে ওঠে। নির্ভুল নিশানায় কাতান চালায় মরদ। কেঁউ-উ-উ—বাস্, মুণ্ডু একদিকে ধড় একদিকে ছিটকে পড়ে। রক্তের ফোয়ারায় ভিজে যায় রাত। পুরো কুকুরের দল ইঁদুরের আওয়াজ করে ডাকতে থাকে।

বাড়ির দরোজায় এক লাথ্ মারে সনা। তার দেহে আজ হাতির বল। এক লাথ্, দুই লাথ্, তিন লাথে বিকট খ্যাঁচ আওয়াজ করে হাট হয়ে যায় দরোজা। বুড়ি ঘুমের ঘোরে জিগিয়ে ওঠে, 'কে? কে? কে রে?'

'তোর যম।'—দাঁতের মাঝে বলে মরদ। লাথ্ মারে শোবার ঘরের ঝাঁপে। এইবার মশারি হিঁচড়ে হ্যাঁচকা মারবে সে লাল শালুর সাধের লাউ লেপে। 'আজ তোরই একদিন কি আমার। ধষ্‌ষণ করে মেরে ফেলে দিব।'

সড়াক।—লাফ দিয়ে পেছু হঠে যায় মরদ। সামনে লকলক লকলক করছে এক কালনাগিনা। টালির ছাদ অবধি উঠে গেছে হিলহিলে পেছল কৃষ্ণবর্ণ, বুঝি চালি ফুঁড়ে যায়। চ্যাটালো আঠালো বিরাট ফণা সনার চোখের সামনে দুলছে, ঝিলিক দিচ্ছে জিহ্বা, মাঝখানে তার ভয়াবহ চিড়। আর ফণার দু পাশ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার নির্নিমেষে তার চোখ তাক করে রয়েছে।

সিদ্ধ পাষাণ

হরিসাধন লাহিড়ির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ট্রেনে।

পুরী-পাটনা এক্সপ্রেসে টিকিট পাইনি। আমার তো আগে থেকে কিছু ছকা থাকে না! ইচ্ছে বলুন, বাই বলুন, চাগলেই বেরিয়ে পড়ি। আসানসোল-বৈদ্যনাথধাম-ঝাঁঝা প্যাসেঞ্জার একটি অতি বিরক্তিকর ট্রেন। কিন্তু সোজা দেবগৃহ অর্থাৎ দেওঘর যেতে হলে আর উপায়ই বা কী! সঙ্গে তেমন বোঁচকাবুঁচকি নেই, একটা অ্যাটাচিতেই আমার সব কিছু ধরে যায়। উঠে জানলার ধারে গুছিয়ে বসি। বম্‌পাস টাউনে আমার মামার বাড়ির দিকের এক কাজিন সুচরিতাদের একটি উৎকৃষ্ট বাংলো আছে। দেখাশোনার একটি মালিও আছে। সুযোগ পেলেই সুচরিতাকে একটি ফোন করে দেওঘর কেটে পড়ি। সুচরিতাই দুর পাল্লা থেকে খবরাখবর যা দেওয়ার দিয়ে দেয়।

বছর তিনেক হল স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে বসে আছি। ছেলেটা অল্প বয়সেই দাঁড়িয়ে গেছে। এক্ষুনি বিয়ে থা করতেও চাইছে না। তার মা এখন তাকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমি সুতরাং নির্ঝঞ্ঝাট। একা একা ঘুরে বেড়ানোর আমার মস্ত মওকা। সহকর্মীরা বলেছিল, 'কেন শুধু শুধু যাচ্ছেন সোমেনদা, আপনাকে অন্তত এরা যেতে বাধ্য করতে পারে না। এখনও এগারোটা বছর...।' আমি মুখে কিছু বলিনি। বলিনি সময় থাকতে কদর থাকতে থাকতেই কেটে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ। এ-ও বলিনি এই বিশ্রী একঘেয়েমির জীবন আমার আর ভালো লাগছে না। কোনোদিনই লাগেনি অবশ্য। ভাবিনি তো এভাবেই দিনগত পাপক্ষয়ে জীবন কেটে যাবে! কত রকম আশা-আকাঙক্ষা, কত স্বপ্ন...সবই তো সংসারের চাপে জলাঞ্জলিই দিতে হয়। তবে এসব কথা বলেই বা লাভ কি! ভেবেই বা কি লাভ? তেমন কিছু হওয়ার হলে হয়তো তেমন ক্ষমতা নিয়েই জন্মায় মানুষ?

হরিসাধনবাবুকে আমার প্রথম থেকেই চোখে পড়েছিল। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরা মানুষ তো আজকাল তেমন একটা দেখা যায় না! তার ওপর এমন শান্ত সৌম্য ধরনের চেহারাটি। পুরুষমানুষ অথচ চাঁদের আলোর মত গায়ের রং। প্যাসেঞ্জার ট্রেন, অনবরত নামা-ওঠা, ধাক্কাধাক্কি ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে উত্তেজিত রাজনীতি, হাজারো ঢঙের হকারের চিৎকার। তারই মধ্যে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, কিন্তু কিছু দেখছেন বলে বোধ হল না। চোখে ওটা সানগ্লাস বোধহয় নয়, ফটোক্রোম্যাটিক চশমাই। একটা আবছা আড়াল থেকে ওঁর চোখ দুটো খুবই মগ্ন, মায়াবী বলে মনে হল। আমার ছটফটে স্বভাব। মনে মনে যতই একাচোরা হই, মুখে আমি খুব মিশুক। স্টেশনেই একখানা বাংলা কাগজ কিনেছিলাম, একটু পরেই পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে সেটা বদলাবদলি করি সেই সঙ্গে দিনকাল সম্পর্কে মতামতও। 'এই চা-এই চা' করে বার দুই তিন লেবু-বিটনুন দেওয়া চা-ও হয়ে গেল। ওঁর কিন্তু হেলদোল নেই। ট্রেনে উঠে চা-কফি খায় না এমন প্যাসেঞ্জার আমি আজও দেখিনি। এঁর কি চা টা চলে না? তাই হবে। তার কিছুক্ষণ পরেই মনে হয় ভদ্রলোক কোনো কারণে বিষণ্ণ, আত্মমগ্ন হয়ে আছেন। আপনজন কেউ মারা-টারা গেছেন হয় তো! কিংবা কারও দুরারোগ্য ব্যাধি! হয়তো ছেলের বউ কিংবা নিজের পত্নীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। এসব তো আজকাল ঘরে ঘরে। এভাবে ভাবছি দেখে নিজেই কিছুক্ষণ

পরে লজ্জা পেয়ে যাই। আশ্চর্য পরচর্চার স্বভাব তো! মুখে করছি না, মনে মনে তো করছি! আপনমনে থাকা বড্ড শক্ত কাজ।

একটি হকার তখনও এক গোছা ছুরি-ছোরা দিয়ে কতরকম কাজ করা যায় তারস্বরে তার ব্যাখ্যানা করছে। ওদিক থেকে ঝালমুড়ি তৃতীয়বার এসে গেল, যাদের হাতে ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এবার তাদের থেকে দাম সংগ্রহ করছে, পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে এক খদ্দেরের সঙ্গে মুড়িঅলার লাগধুমাধুম লেগে গেছে এমন সময়ে একটি অন্ধ ছেলেকে নিয়ে রোগা মুখ-চোখ-বসা এক মার্কামারা ভিখারি উঠল। উঠেই অসম্ভব চড়া সুরে পূর্ণদাসি স্টাইলে ফুকরে উঠল, 'ও-ও-ও-ও।' ছেলেটার হাতে একটা কাঁসি, নিপুণ হাতে ব্যাটা বাজাচ্ছে সেটাকে।

এ লাইনে আসাযাওয়া করছি মন্দ দিন হল না। বাউল দেখিনি কখনও। এ-ও অবিশ্যি বাউল নয়। কিন্তু গাইছে নিখুঁত স্টাইলে। বাচ্চাটাও ধরছে মাঝে মাঝে। সরু মোটা গলার বুনুনিতে গাইছে বড্ড ভালো। টপাটপ পয়সা পড়ছে ওদের টিনের কৌটোয়, কুড়ি পয়সা, পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা, হঠাৎ দেখি লোকটার হাতে একটা আনকোরা পঞ্চাশ টাকার নোট। দিলেন আমার সামনের ভদ্রলোক। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে একটু লজ্জা পেলেন, আশেপাশে সবাই-ই অবাক। বললেন, 'স্টেজে উঠতে পারলে ওর এর চেয়ে বিশগুণ তো রোজগার হতই'। আমি নিজেও খুশি হয়ে দুটাকার একটা কয়েন দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকালকার দিনে ট্রেনে ভিখারিকে পঞ্চাশ টাকা! নাঃ, ভদ্রলোকের দিলের তারিফ করতেই হয়। তবে স্বভাবতই সবচেয়ে অভিভূত হয়ে গেছে ভিখারিটি। বললে, 'বাবু আর কী গান শুনবেন, ফরমায়েশ করুন আজ্ঞে?'

উনি হাসিমুখে বললেন, 'কী শোনাবে বলো!'

'আজ্ঞে ফিল্‌মের গান বাংলা হিন্দি'...বলতে না বলতেই অন্ধ ছেলেটি গেয়ে উঠল 'যব্ ভি কোই লড়কি দেখুঁ মেরা দিল দিওয়ানা বোলে/ওলে ওলে এ ওলে'...তীক্ষ্ণ ধারালো গলায় পার্ফেক্ট একেবারে।

'আই', এক ধমক খায় ছেলেটি। ভিখারি বলে, 'বলুন না বাবু রাগপ্রধান, কেসিকেল.. যা বলবেন সব গেয়ে দেব।

ভদ্রলোক বললেন, 'থাকো কোথায়? এ লাইনে নতুন মনে হচ্ছে।'

'তা এক পকার নতুনই বলতে হবে, তবে আমাদের আর থাকা না থাকা, যখন সেখানে যেমন...কেসিকেল একখানা শুনুনই না বাবু। লিলুয়ার জাহাজবাড়িতে জলসা হল, তখনই তুলেছিলাম।' —লোকটি অবলীলায় রেকর্ড চালাবার মতো একটা বৃন্দাবনি সারং ধরে ফেলল। উচ্চারণ এত এলানো যে কথা স্পষ্ট ধরা যায় না। বৃন্দাবন, মুরলী ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর ছেলেটিও দু-তিনখানা চালু ফিল্‌মি গান গাইল। তারপর ওরা ভদ্রলোককে নমস্কার করে আমাদের বিদায় জানিয়ে পরের স্টেশনে নেমে গেল।

আমি বললাম, 'আপনাকে পঞ্চাশ টাকার গান শুনিয়ে গেল।'

ভদ্রলোক একটু লজ্জা পেলেন, কৈফিয়ত দেবার সুরে বললেন, 'কী জানেন। গুণী মানুষ দাম চুকিয়ে দিতে না পারলে শান্তি পায় না। এই দেখুন না, একসময়ে রাজা-রাজড়া নবাব-বাদশারা দরবারে গুণীদের তনখা দিয়ে রাখতেন। ধনীদের খেয়াল মেটাতে তাঁরা তো নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। কার্পণ্য তো করেননি। সব রাজাই কিন্তু সমঝদার হতেন না।'

আমি বললাম, 'আপনি নিজেও গুণী মানুষ, গানবাজনা করেন মনে হচ্ছে?'

উনি হেসে বললেন, 'সে তো আমারও আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওই কেসটা কীসের? ভায়োলিনেরই তো?'

আমি লজ্জা পেয়ে বলি, 'দূর আপনিও যেমন! একটা শখ, অক্ষম লোকের একটা নেশা, যেমন এই চা সিগারেট...'

'তা যদি বলেন নেশা না হলে কি আর সংগীত হয়? নেশাটিই হওয়া চাই। না কি বলুন!' সমর্থনের জন্যে আমার দিকে তাকান উনি।

'নেশা হলেই কি আর হয়? ক্ষমতা চাই, একটু আধটু 'ন্যাক' নয়, রীতিমতো ট্যালেন্ট। না হলে সব গুবলেট'—আমি হাসি।

উনি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।—'কী রকম?'

আমি বলি, 'দেখুন অল্প বয়সে অনেকেরই কোনো কোনো বিষয়ে একটু আধটু ক্ষমতা ধরা পড়ে। কেউ বাড়ির লোকেদের স্কেচ করে ফেলছে, কেউ হয়তো পাড়া ক্রিকেটে দশ রান দিয়ে তিনটে উইকেট তুলে নিয়েছে, কেউ বা আবার মান্না দে, মহম্মদ রফিকে নকল করে গাইতে পারে। এইগুলোকে সত্যিকারের প্রতিভা ভেবে তবে বাবা-মা কি সে নিজে যদি আশা করে সে একটা এরাপল্লী প্রসন্ন, কি মহম্মদ রফি, কি নন্দলাল বোস হবেই তবে খুব মুশকিল। দুরাশার খেসারত দিতে তখন সারা জীবনের সুখশান্তির দফা একেবারে গয়া।'

ভদ্রলোক মুখটা নামালেন, হাতের নখগুলো যেন পরীক্ষা করছেন, তারপর মুখটা তুললেন, কোনো নির্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি নেই, আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিকই, ঠিকই...। কিন্তু কী করে এই তফাতটা ধরা সম্ভব বলুন তো! অনেকেই দেখেছি, ছোটোতে আশ্চর্য ক্ষমতা দেখায়, সত্যিকারের খাটাখাটনি মানে যাকে বলে সাধনা সেটা ঠিকমতো করে গেলে...'

কথাটি উনি শেষ করলেন না।

'প্রতিভা মানে যে নিরানব্বই ভাগ ঘাম ঝরানো, আর এক ভাগ মাত্র প্রেরণা কি ক্ষমতা এ তো সত্যিই অনেকেই বলে থাকেন'—আমারও মনে পড়ে।

ধরুন সংগীত-বাদ্যে বড়ো বড়ো ওস্তাদদের অনেকের পরিশ্রমের কথা তো আমরা শুনেইছি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ সাহেব, বিলায়েৎ খাঁ সাহেব এঁদের পরিশ্রম তো অমানুষিক -- উনি বললেন।

আমি যোগ করি, 'বিজয় মার্চেন্ট শুনেছি আয়না মোড়া ঘরে সারারাত শ্যাডো প্র্যাকটিস করতেন। তবে না পার্ফেকশন।'

উনি বললেন, 'এঁরা সফল হয়েছেন তাই এঁদের নাম শুনি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, কত মানুষ আছেন যাঁরা অতটাই পরিশ্রম করেছেন। ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু কী যেন একটা ছিল না তাই...এখন কী সেই জিনিস যাতে প্রতিভা ও 'ন্যাক'-এ তফাত করে? কী করে বোঝা যাবে?'

আমি জবাব দেবার চেষ্টা করলাম না। কেন না জবাব তো আমার জানা নেই। উপরন্তু দুজনেই একই প্রশ্নের জবাব খুঁজছি! আমার নিজের ছেলের কথা মনে হল। মাত্র সাত বছর বয়সে ছেলেটা দিব্যি দাবা খেলত! অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন—ওকে তৈরি করো। খেলা শেখাও, ক্লাবে পাঠাও, প্রতিযোগিতার নাম দাও। আমি শুনিনি। বমু ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মতো পড়েশুনে খেলে-ধুলে বড়ো হয়েছে। স্ত্রীকেও সাবধান করে দিয়েছিলাম, 'খবর্দার ওর মাথায় দাবার ভূত চাপিয়ো না। খেলছে খেলুক। কিন্তু মাথায় যেন পোকা না ঢোকে যে ভবিষ্যতে ওকে গ্র্যান্ডমাস্টার হতেই হবে।'

ছেলের বেলায় সাবধান হতে পেরেছি। কেননা সুচরিতার গল্পটা আমার জানা ছিল। আমার সেই মামাতো বোন যার শ্বশুরের বম্‌পাস টাউনের বাড়িতে আমি বেড়াতে যাচ্ছি। সুচরিতার নাচ-গান দুটোতেই স্বাভাবিক পটুতা ছিল। চলা ফেরায় চমৎকার একটা ছন্দ। এর ওর দেখে এমন

সুন্দর নাচত, যে প্রথম সুযোগেই মামা-মামিমা ওর নাচ শেখার বন্দোবস্ত করলেন। এটা ওটা শিখে ভরতনাট্যম শুরু করেছিল। প্রচুর পরিশ্রম। ওরও, ওর মা মানে আমার মামিমারও—সেই কোন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট থেকে টানতে টানতে ডোভার লেন। সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। গুরু বদল করা হল। নতুনজন বললেন, 'এ কী! ও নাচবে কি মা! ওর পা যে ভেতর দিকে সামান্য বাঁকা। এ রকম শারীরিক ত্রুটি নিয়ে নাচের পেছনে সময় নষ্ট না করাই ভালো।' ভরতনাট্যমও হল না, ওর স্বাভাবিক ছন্দটাও গেল। ওরা তখন ঠিক করলেন ওকে গান শেখাবেন। ভোরে দুঘণ্টা, সন্ধের দুঘণ্টা বাঁধা রেওয়াজ। নামকরা শিক্ষক। সুচরিতা এখনও ছোটোখাটো পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান করে থাকে। বিয়ের বাসর, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন...। ও আমাদের পরিবারের লতা মঙ্গেশকর ধরুন। কিন্তু অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও ও এর চেয়ে বেশি কিছু আর করতে পারেনি। নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার কথা বলছি না। স্রেফ গানের গুণাগুণের কথাই বলছি—'জানো সোমেনদা'—আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিল, 'কত চেষ্টা করি ঠিক যেন মনে হয় সামনে একটা খাড়া পাঁচিল, সেটা আর কিছুতেই টপকাতে পারি না। এ যে কী কষ্ট।' নিঃশব্দে কাঁদছিল ও। কী সান্ত্বনা দেব ওকে!

কপাল, বুঝলি, সুচি, কপাল!

বাজে কথা বোলো না। আমার এটুকুই ক্ষমতা ছিল তাই এটুকুই হয়েছে। বড়োরাই আমাকে মিসগাইড করলেন—এত ভালো গাস, তত ভালো গাস। তত ভাল গলা। আমার গাইতে ভালো লাগত। আমি তো আমার সীমার কথা জানতাম না। জানার কোনো দরকারও ছিল না। তা না এই রেওয়াজ, সেই ট্রেনিং। হুঃ।

বলছিস কী রে? ট্রেনিংগুলোর মধ্যে দিয়ে তুই কত শিখেছিস বল তো! এসব গুরুমুখী বিদ্যা। না শিখলে তাল, লয়, রাগ-রাগিণী, রাগের চলন এসব কিছুই জানতে পারতিস না।—এটা আমি ওকে ভোলাবার জন্যে বলিনি। সত্যি যা মনে করি তাই বলেছি। নিজে না-ই হতে পারলাম বড়ে গোলাম, ভীমসেন, হবার চেষ্টা করছি বলেই তো তাঁদের আরও ভালো বুঝতে পারি। তবে এ সবে সুচরিতা সান্ত্বনা পেত না। জলসা-কনফারেন্সে যাবার অভ্যেসটাও ওর আস্তে আস্তে চলে গেল। টিকিট কেটে আনলে বলত, 'দূর আমার ভালো লাগে না। যা আমি কিছুতেই গলায় তুলতে পারছি না, অন্য একজন অবলীলায় তা করে দিচ্ছে শুনলে আমার কেমন যন্ত্রণা হয়। হিংসুটে বলিস আর যাই বলিস।'

একটু বেশি বয়সেই বিয়ে হয়েছে সুচরিতার। তিরিশ-টিরিশ। এতগুলো বছর বেচারি খালি গান নিয়েই পড়ে ছিল। ব্যাঘাত হবে বলে বিয়েতে রাজিই হচ্ছিল না। কে জানে সুচরিতার এখনও সেই কষ্ট আছে কিনা! হয়তো ছেলে মেয়ে স্বামী সম্পদ এসব পেয়ে ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো ভোলেনি। ভোলা যে শক্ত সেটুকু তো আমি বুঝিই।

যাক, এইভাবেই হরিসাধনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। দুজনেই দেওঘরে নামি। আমি চলে যাই সাইকেল রিকশাতে বম্পাস টাউন। উনি বাস ধরে চলে যান মধুপুর। যাবার সময়ে বললেন, 'বাড়ির ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে রাখলাম। যদি ঘুরতে ঘুরতে একবার গিয়ে পড়েন, আমার তো ভালো লাগবেই,' একটু থেমে দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আপনারও লাগবে।'

ভদ্রলোককে আমার ভালো লেগেছিল বললে কম বলা হবে। যেন একটা টান। অনেক দিনের জমানো টান। আমার এই বাহান্ন-তেপান্ন বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত গেরস্থ জীবনে নতুন করে যে আর কিছু পাবার নেই তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে! যে নিস্পৃহ নিষ্ক্রিয় ধরনের মন উত্তরষাটে আসার কথা, তা গ্রহের ফেরে উত্তর পঞ্চাশেই আমার এসে গেছে। এদিকে 'বনং ব্রজেৎ' জাতীয়

কোনো তাগিদও মনের মধ্যে টের পাই না। চারদিকে যেসব উপকরণ, ঘটনা, সম্পর্ক ছড়িয়ে আছে তার থেকেই আমার ব্যস্ত থাকার, ভালোলাগার জিনিসগুলো খুঁজে নিতে হয় এখনও। একমাত্র এই বাজনা। বাজনাটুকুতেই আমার নিজস্ব কিছু বাড়তি আনন্দ যা আমি অন্য কিছুতেই আর পাই না। এক সময়ে খুব বাজাতাম। বাইশ-তেইশ বছর বয়স যখন, তখন পাড়া বেপাড়ায় জলসা হলে উদ্বোধনী সংগীতের আশেপাশে উদীয়মান ভায়োলিন শিল্পী সোমেন্দ্রনাথ সরকারের নামটা থাকত। তারপরে জায়গা হল সংগতিয়া হিসেবে। কোথায় বিরহ, বিচ্ছেদ, মৃত্যুর সময়ে করুণ 'এফেক্ট' দিতে হবে। নৃত্যনাট্যে, নাটকে। কখনও কখনও ফিলম—ওসব জায়গায় আমার ডাক পড়ত। কিন্তু একক স্বাধীন শিল্পী হিসেবে বাজাবার আর সুযোগ পাইনি। তা নিয়ে আমার অবশ্য কোনো নালিশ নেই। কিন্তু সেরকম বাজাতেই বা পারলাম কই? ওই সুচরিতার মতোই আমি আমার পরিবারের ভি.জি যোগ। আমার কথা সুচি কতটা কী বুঝতে পারে জানি না, কিন্তু ওর কথা তো আমি সেই জন্যেই অত ভালো বুঝতে পারি। তা ছাড়া, এখনও বাজনা নিয়ে কেউ কোনোরকম কটাক্ষ করলে আমার বড্ড লাগে। আমার স্ত্রী করে। 'ওঃ, ওই তোমার প্যাঁও প্যাঁও আরম্ভ হল—একদিনের জন্যে অন্তত রেহাই দাও না।' ছেলে কিছু বলে না, বলেনি কোনো দিন। কিন্তু ওর বন্ধুরা হয়তো এক দঙ্গল বাড়িতে আড্ডা মারতে এসেছে—'মেসোমশাই, আপনার সেই ভায়োলিনটা? আছে এখনও।' যেন আমিও প্রাগৈতিহাসিক, আমার ভায়োলিনও প্রাগৈতিহাসিক। কিছু বলি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ রাগ হয়, যে রাগ কষ্টেরই ওপিঠ। তাই এইরকম যখন বেরিয়ে পড়ি, বেশির ভাগ সময়েই যন্ত্রটা আমার সঙ্গী হয়।

দীর্ঘ দশ এগারো কি তার চেয়েও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম আমার কারও সম্পর্কে কৌতূহল হল। একটা আকর্ষণই বলব। ভদ্রলোক বলে গেলেন, 'আমার ভালো লাগবে আপনারও লাগবে'—কী রকম একটা প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন কথাটা। আমি কি তাহলে এই উত্তর-পঞ্চাশে একজন সমমনস্ক বন্ধু পেতে চলেছি?

দেওঘরে বহুবার এসেছি। যখন তখন আসি বম্‌পাস টাউনের ফুলে-ভরা 'মালঞ্চমালা' নামের বাংলোটায়। দেশি কেয়ারটেকার বংশীধর ও তার পরিবার আমাকে আকণ্ঠ চেনে। কখন কী দরকার বলবার প্রয়োজন পর্যন্ত পড়ে না। ভোরবেলায় বাংলো থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে ক্লক-টাওয়ারের মোড় পর্যন্ত চলে আসি। তারপর আরেকটি সড়ক ধরে উইলিয়ামস্ টাউনের পথ ধরে চলে যাই রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলের হাতা পর্যন্ত। এবার আস্তে আস্তে ফিরি। ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। বংশীধরের চা তৈরি। চা এবং আনুষঙ্গিক। খাওয়াদাওয়া সেরে একটা বই নিয়ে আসি। বাংলা আর ইংরেজি কিছু পেপারব্যাক এখানে থাকেই, দু-একখানা সঙ্গে আনি কি না আনি। পড়তে পড়তে ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে চোখ জড়িয়ে আসে, মধুফুলের গন্ধমাখা হাওয়া বয়। এই চটকাটুকু ভাঙলে তবে চান। সে-ও বেশ সময় নিয়ে। এসব অঞ্চলের জলে হাওয়ায় কেমন একটা অপাপবিদ্ধ, সোঁদা সোঁদা টাটকা গন্ধ থাকে। শুধু নিশ্বাস নিতেই একটা অগাধ আরাম। বংশীধরের বউয়ের বাঙালি রান্নাও ঠিক বাঙালি রান্নার মতো হয় না। এই তফাতটুকুও আমার মন্দ লাগে না। অচেনার সঙ্গে বসবাসের রোমাঞ্চের এটাও যেন একটা অঙ্গ। আমার গিন্নি বলেন, 'দূর! এটা কি বাঁধাকপি হয়েছে না গোরুর জাবনা হয়েছে? মিষ্টি পড়েনি। কষা হয়নি! পাতাগুলো ড্যাবড্যাব করছে.! ও পার্বতী, এ কেমন রেঁধেছ?' আমার কিন্তু এইরকমই ভালো লাগে। এখানে দুপুরটায় খুব পাখি ডাকে। এদের ভিটেয় দেখি বারোমাসই ঘুঘু চরে। কিন্তু ভিটেমাটি চাটি হয়ে যাবার কোনো লক্ষণ এখনও পর্যন্ত তো দেখি না! সন্ধেবেলা একটু বেড়াই। কাছাকাছি। কিন্তু অন্ধকার একটু গাঢ় হতে না হতেই আমার যন্ত্র আমায় টানতে থাকে। চিবুক দিয়ে পরম সোহাগে যন্ত্র চেপে ধরে ছড় চালাই,

এখানে কেউ শোনার নেই। গাছগুলো ছাড়া। বংশীধরের ফ্যামিলি হয়তো শোনে কিন্তু তারা তো বিচার করে না। সুতরাং এইখানেই সোমেন্দ্রনাথ সরকার উদীয়মান বেহালা-শিল্পীর প্রকৃত মুক্তি। এই অস্তায়মান কালে।

দিন দশেকের কড়ারে এসেছি। দশদিনই যে পুরোপুরি থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার দশ দিন পেরিয়ে গেলেও কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু এবার দিন পাঁচেক কাটতে না কাটতেই ভেতরে একটা 'পালাই পালাই' রব টের পাই। এমন নয় যে বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু হেথা আর নয়। মন যখন ভীষণ অস্থির হয়ে থাকে তখনও এইরকম হয়। আমার আবার মন উচাটনের কারণ কী? নিজের মনের ব্যবহারে নিজেই অবাক হই। অন্ধকার বারান্দায় জোনাক জ্বলা দেখতে দেখতে ভাবি। তারপর আস্তে আস্তে বোধোদয় হয় যে একাকিত্ব আর ভালো লাগছে না। সঙ্গপিপাসা পাচ্ছে। যাচ্চলে! যে একাকিত্বর জন্য তিনশো উনত্রিশ কিলোমিটার উজিয়ে আসা সেই একাকিত্বই আউট? সঙ্গপিপাসা ইন? আরও ভাবি। বাজাতে বাজাতে, বেড়াতে বেড়াতে ভাবি। অবশেষে ঘুমোতে ঘুমোতে টের পাই সঙ্গপিপাসার দোষ নেই। আসলে পছন্দসই সঙ্গী পাবার একটা সম্ভাবনাতেই এমন আকুলিবিকুলি। হরিসাধন লাহিড়িমশাই আমাকে টেলিপ্যাথিক ডাক পাঠাচ্ছেন। সুতরাং আর দেরি করি না, সংকোচও নয়, ঝুলি কাঁধে, বেহালা বগলে ওল্ড মিনা বাজার স্ট্যান্ড থেকে মধুপুরের বাস ধরি।

জসিডি এসেছি, গিরিডি এসেছি, কিন্তু মধুপুরে আমি এই প্রথম। জায়গাটা দেখলাম স্টেশন রোড বাদ দিলে তেমন ঘিঞ্জি নয়। প্রকৃতি তো একরকম হবেই। কিন্তু মধুপুর এখনও অনেক ফাঁকা, স্বাভাবিক। বিশেষ করে এই হল্লাটার এলাকাটি। হল্লাটারের মোড় পেরিয়ে বাহান্ন বিঘে শুরু। রাস্তার ধারে বাড়ি-টাড়িগুলোর বেশিরভাগই ভগ্ন দশা। তবু তারই মধ্যে কোথাও একটা-দুটো পলাশ মেটে রঙের ফুলে আকাশ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। দু-তিনটে য়ুক্যালিপ্টাস যেন ঠিক রুপোর থাম। ওই তো মাঝখানে বিরাট ইঁদারা আমার প্রথম ল্যান্ডমার্ক। কে টিলি সাহেবের বাংলোর নাম করি। অমনি 'কেটলি' সাহেব? বলে শনশনিয়ে প্যাডল মেরে আমায় পৌঁছে দেয় রিকশাওয়ালা। চমৎকার কাচঢাকা বাংলোটি। ফুলে ফুলে ভরা বাগান। তবে আমার গন্তব্য তো কেটলি সাহেবের বাংলো নয়! তার পাশে মধুপুরের লালধুলো মাখা ঈষৎভগ্ন মুরারিকুঞ্জ। পড়ন্ত রোদে গায়ে পাঞ্জাবি চড়াতে চড়াতে বেরিয়ে আসছেন হরিসাধনবাবু। স্মিত হেসে বললেন, 'এলেন তাহলে?'

এত্তেলা পাঠালেন। কী করি বলুন?

স্নানাহার হয়েছে?

ও সব হাঙ্গামা তো চুকিয়েই বেরিয়েছি। বাঃ বেশ জায়গাটি!

এই মুরারিকুঞ্জ কিন্তু মোটেই আমার বম্পাস টাউনের 'মালঞ্চমালা'র থেকে কোনো অংশেই ভালো নয়। তেমন দেখাশোনা হয় না এটা স্পষ্ট। কিন্তু আমার কেমন মনে হল বাড়িটির একটা বিশেষ জলহাওয়া আছে যেটা আমার পক্ষে বেশ স্বাস্থ্যকর। যেন অনেকক্ষণ ধরে তার বাঁধতে বাঁধতে এইমাত্র সবগুলি সুরে বলে উঠল। হরিসাধনবাবুর ব্যক্তিত্বের জন্যই এটা হল কিনা বলতে পারি না। সন্দেহ নেই ভদ্রলোকের একটা প্রভাববলয় গোছের কিছু আছে। আমার মন আমার ভেতরের চাহিদাগুলোর সঙ্গে মানিয়েই যেন উনি তৈরি। ভালো। অনেক রকমের অভিজ্ঞতাই তো হল জীবনে! এবার এই আধবুড়ো বেলায় আর এক অপরিচিত আধবুড়োর জন্যে টান! জীবনে কখনও তেমন সত্যিকারের বন্ধু পাইনি। আমার মতো গুজগুজে লোকের নাকি বন্ধু হয়ও না, এ কথাও একাধিক প্রিয়জনের কাছ থেকে শুনেছি। তা এইবারে আমার সেই বন্ধুত্ব লাভের ফাঁকা কোটাটা বোধহয় পূর্ণ হতে চলল।

'বুধুয়া'...ভারী গম্ভীর স্নেহমাখানো গলায় উনি ডাকলেন।

একটা অল্পবয়সি সাঁওতাল ছেলে এসে দাঁড়াল। ঠিক একটি বাংলা লোককথার রাখাল ছেলে। গোরু তাড়াবার পাচনবাড়ি আর দুপুর যাপনের বাঁশের বাঁশিটি হাতে ধরিয়ে দিলেই হয়।

'দ্যাখ, ইনি আমার বন্ধুলোক। মালপত্র ভেতরে নিয়ে রাখ। কলঘরটা দেখিয়ে দে আর ভালো করে চা কর।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'যান হাত মুখ ধুয়ে আসুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

দাওয়ার ওপর দুটি বেতের গোল চেয়ার। ইঁদারার চমৎকার জলে হাত মুখ ধুয়ে দাওয়ায় এসে দ্বিতীয় চেয়ারটা দেখাই, বলি, 'কী ব্যাপার! হাত গুনতে জানেন নাকি?'

উনি বললেন, 'প্রতিবেশী দু-একজন এলে আসেন। আমরা অনেক দিনের বাসিন্দা তো? তবে'—আমার দিকে চেয়ে বললেন—'মাথার মধ্যে একটা অন্য প্রতীক্ষা ছিলই, বুঝলেন তো?' ...তা আর বুঝিনি, না বুঝলে আর এতটা পথ বাসের ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর ধুলো মাখতে মাখতে চলে আসি?

দিনগুলো অতঃপর চমৎকার কাটতে থাকে। অভ্রের কুচি ছড়ানো কালো আকাশের তলায় কখনও বসে, কখনও হাঁটতে হাঁটতে কথা হয়। অনেক রাতে চাঁদ ওঠে। পুরো রাস্তাটা, রাস্তার মোড়ে যুগল শিরীষ, টিলি সাহেবের কাচের বাংলো কিছুই তখন আর এ জগতের থাকে না।

হরিসাধনবাবু মানুষটি অকৃতদার। ঠাকুরদাদার কয়লাখানি ছিল। সোনার চামচ মুখে জন্মেছিলেন অর্থাৎ। কিন্তু সে সব ওঁর বাবার আমলে চুকেবুকে যায় যা বুঝলাম। বাবা মানুষটি আলালের ঘরে দুলাল ছিলেন। অতি শৌখিন, বিলাসী, অলসও বটে। নিজের বাবার দোষ-ঘাটের কথা আর উনি স্পষ্ট করে কী বলবেন। কিন্তু বাবার রকমসকম দেখেই বোধহয় উনি বিয়ে থার মধ্যে যাননি। এটা অবশ্য আমার অনুমান। এক ভাই এক বোন। বোনের স্বভাবতই বিয়ে হয়ে গেছে। কলকাতা আসানসোলে খান দুই বাড়ি আর এই মুরারিকুঞ্জ, এটুকুই এঁর ভাগে পড়েছে। এভাবে খবরগুলো জানতে পারিনি অবশ্য, কোনো কৌতূহলও দেখাইনি। কথায় কথায় একটু একটু করে খবরগুলো প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ঠাকুরদাই ছিলেন মুরারিমোহন। ঠাকুরদার ওপর হরিসাধনবাবুর অগাধ শ্রদ্ধা। এই ঠাকুরদা এবং মা ওঁকে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বড়ো করেছেন। তবে জীবনে কাজ বলতে উনি দুটি করেছেন। এক দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে গুণীদের গানবাজনা শোনা এবং সে নিয়ে লেখালেখি। আর দ্বিতীয় হল—সেতার বাজানো। সংগীত নিয়ে লেখাজোখা করেছেন। আমার খুব শখ এ ধরনের বই পড়ার। কই আমি...আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। হরিসাধন লাহিড়ির লেখা কোনো বইয়ের কথা আমি মনে করতে পারলাম না।

উনি কুণ্ঠিত গলায় বললেন, 'আমার আবার লেখা, তাও আবার আপনার চোখে পড়বে! অখ্যাত প্রকাশক, যেমন তেমন করে ছেপেছে। ভাষা-ভাব এসবের কী-ই বা আমি জানি। তবে কী জানেন? অনেক অখ্যাত কিন্তু খানদানি গুণীর কথা আছে বইগুলোতে ডায়েরির মতো করে। সেগুলো সংগীতপ্রিয় মানুষের কাছে...'

আছে আপনার কাছে...

এখানে নেই। কলকাতার বাড়িতে আছে।

আমি ভাবছিলাম। ডায়েরির মতো করে লেখা দেশবিদেশের ভ্রমণকাহিণি তার মধ্যে গান, গুণী...কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে ব্যাপারটা! বলি, 'আচ্ছা, সেই মহারাষ্ট্রের গনেশপুরী নামে একটা গ্রামে নারায়ণ কেরকার বলে এক সরোদিয়া...'

আপনি পড়েছেন?

আমি বলি, 'দাঁড়ান দাঁড়ান পণ্ডিত গম্ভীরনাথ সেতারের সিদ্ধশিল্পী যাঁকে শেষ বয়সে পা জখম হয়ে যাওয়ায় লোকে ল্যাংড়া পণ্ডিত বলত?'

এইবার হরিসাধনবাবু জোড় হাত কপালে ঠেকালেন, বললেন, 'আপনি পড়েছেন তাহলে?'

আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমার মামাতো বোন সুচরিতার বাড়িতে হঠাৎ হাতে এসেছিল, কিন্তু সে তো আপনার লেখা বলে...'

উনি হেসে বললেন, 'মাথা খারাপ? নিজের নামে লিখি কখনও! 'পর্যটক' নাম নিয়ে লিখেছিলাম। যাক আপনি পড়েছেন...' সমস্ত মুখে ওঁর খুশি ছড়িয়ে পড়ল, বললেন, 'আপনার সঙ্গে তাহলে শেয়ার করা যায়।'

আপনার কাছে নিশ্চয়ই কপি আছে। এবার ফিরে গিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আর একবার ভালো করে পড়ব। খামচা খামচা পড়েছি তখন, ভালো লাগছিল খুব।

যাঁদের কথা লিখেছি তাঁরা সব অখ্যাত, কিংবা নিজেদের এলাকার মধ্যে একটা ছোট্ট মহলে পরিচিত। শেখান, বাজান বা গান, অত নাম ডাক পয়সাকড়ি কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের কথা জানতে পেরেছি এটাই লাভ। এটাই ও লেখার আসল মূল্য।

আমি বলি, 'না, না খুব ডিটেইলে আমার মনে নেই ঠিকই। কিন্তু এই কেরকার, ওই গম্ভীবনাথ, কতকগুলো সুন্দর টুকরার মতো গেঁথে আছে মনে। আচ্ছা সত্যি ওঁকে ল্যাংডা বলত বলে উনি রাগে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন? আচ্ছা ছেলেমানুষ তো!'

তাই বটে—হরিসাধনবাবু হাসলেন, গানের অগাধ পণ্ডিত হলে কী হবে, ছেলেমানুষেব মতোই মান-অভিমান ছিল। আসলে দেখতে খুব সুপুরুষ ছিলেন তো! টকটকে রং, কাটা কাটা নাক মুখ, আকর্ণবিস্তৃত চোখ। রুপোলি চুল একটু ঢেউ খেলানো, দীর্ঘকায়। কপালে সিঁদুরেব ফোঁটাটি পবে যখন আসরে বসতেন মনে হত একটি লম্বা প্রজ্বলিত মোমবাতি। রূপ নিয়ে ছিল খুব গর্ব। পাটনায় থাকতেন। গঙ্গায় চান করতে গিয়ে একবার ভীষণ পড়ে গেলেন। একটি পা হাঁটু থেকে কাটা গেল। আর যায় কোথা! একটা ঝোপড়পট্টির পাশে থাকতেন, সেখানকার বাচ্চারা ল্যাংড়া পণ্ডিত ল্যাংড়া পণ্ডিত বলে অস্থির করে দিতে লাগল। ক্রমে বড়োরাও ধরল। প্রথমটা ছেলেদের সঙ্গে রাগারাগি, চ্যাঁচামেচি। তারপর একদিন এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করে গেলেন। লিখে গেলেন 'ম্যায় যা রহা হুঁ।' বাস।

আচ্ছা! একেবার নিরুদ্দেশ?

নিজের লোকেদের কাছে তাই। এসে উঠলেন আসানসোল এক রইস ভক্তর কাছে। তাঁর সঙ্গে কড়ার হল, কাউকে কোনোমতেই তাঁর খবর জানাতে পারবেন না। আসরে উনি ক্রাচ নিয়ে কিছুতেই উঠবেন না। সে নাকি বহোৎ শরম কি বাত্! তবে ভদ্রলোকের নাতিকে উনি গড়ে পিটে নিজের মতো ওস্তাদ বানিয়ে দেবেন। এই অনর্থক ইগোর আবদার মেটাতেই তাঁর আশ্রয়দাতা গুণগ্রাহী ভদ্রলোক অগত্যা পণ্ডিতজিকে নিয়ে তুললেন নিজের এক নির্জন বাগানবাড়িতে। আর নাতিটিকে ভরতি করে দিলেন পণ্ডিতজির খিদমতগারি বলুন খিদমতগারিতে, শাগরেদি বলুন শাগরেদিতে।

এবং আপনিই সেই নাতি।

তবে? হাসিমুখে বললেন উনি, এবং সেই বাগানবাড়িটিই এই মুরারিকুঞ্জ।

'বলেন কী'—আমার শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন একটা রোমাঞ্চের শিরশিরানি বয়ে যায়। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি সংগীতের অজানা ইতিহাসের এক অজ্ঞাতবাসের পাতায়?

হরিসাধন বললেন, 'আমাদের কালী কুণ্ডু লেনের বাড়িতে, আসানসোলের বাড়িতে কত জলসা

বসেছে। ওই পরিবেশ, তারপরে আরাম-বিলাস, এতে বাবার অল্প বয়সটায় খুব ক্ষতি হয়ে যায়। ঠাকুমা এ জন্য ঠাকুরদাকেই দোষ দিতেন। আমার ছোটোবেলায় এঁদের এমন ঝগড়া আমি বহু শুনেছি। ঠাকুরদা বলতেন, যা আমার অমৃত, তা যে আমার ছেলের গরল হয়ে দাঁড়াবে, কী করে বুঝব বলো! মূলত বাবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যই উনি আমাকে এই মধুপুরের মুরারিকুঞ্জে পাঠিয়ে দেন। ইচ্ছে ছিল বাজনটাও ভালো করে শিখি। সেই বছর আষ্টেক বয়সেই আমি সেতার-টেতার ভালোই হ্যান্ডল করতাম নাকি! মা-ও আসতেন। কিছুদিন থেকে চলে যেতেন। এখানে আমার একজন গৃহশিক্ষকও থাকতেন। তাঁরই কাছে পড়াশোনা করতাম। আর...'

বলুন। থামলেন কেন? অমন গুরুর একটিমাত্র শাগরেদ।

'ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না...' বলে উনি বিষণ্ণ মুখে এমন করে চুপ করে গেলেন যে সে নীরবতার সম্মান না রেখে আমি পারলাম না।

এসব কথা অবশ্য এক দিনে হয়নি। হরিসাধনবাবু কথা বলেন খুব থেমে থেমে, প্রত্যেকটি কথা যেন অনিচ্ছুক স্বরযন্ত্রের মধ্যে থেকে টেনে বার করছেন। হা-হা করে উনি হাসতেও জানেন না। ওঁর সংস্পর্শে আমারও ফক্কুড়ি, অযথা কথা, চ্যাঁচামেচি এসব বন্ধ। ভোরবেলা আমি অভ্যাসমতো একটু বেড়িয়ে আসি। চমৎকার জায়গাটা। প্রাণভরে নিশ্বাস নিই। বুকে যেন নতুন করে জোর আসে। উনি কোনোদিনই আসেন না। অনেক ভোরে ওঠেন টের পাই। নিস্তব্ধ জায়গা একটু হাঁটাচলার শব্দ, কাশির আওয়াজ এসব স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু আমি যখন বেরোই, তখন ওঁর ঘরের দরজা দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকতেই দেখি। কী করেন কে জানে! সাধনভজন হতে পারে। কিন্তু উনি যখন বলেন না, আমি তখন জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করি না। যখন ফিরি, তখন উনি স্নান সেরে ফিটফাট তৈরি। ভেতর দিকের দাওয়ায় দুটি ফোল্ডিং চেয়ার পড়ে, একটি ফোল্ডিং টেবিল। তার ওপরে চা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা। তখন চা খেতে খেতে গল্প হয়। আগের দিনের কাগজটা হাতে পাই তখন। রাজনীতির খবর নিয়ে দু-একটা মন্তব্য, অন্য কোনো ভালো নিবন্ধ থাকলে দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ি। উনি হয়তো বললেন, 'থার্ড লেটারটা পড়ুন দাদা, ঠিক বলেছে।'

আমি হয়তো বললাম, 'অ্যাঙ্করটা দেখেছেন? ভালো লিখেছে আজ।'

এডিটোরিয়ালের পাতায় দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স-এর অধ্যাপক লিখেছেন পোস্ট কোল্ড ওয়্যার ইকনমিক্স নিয়ে, দেখুন পড়ে।

উনি এক সময়ে নিজের ঘরে ঢোকেন। আমি বই-টই পড়ি, ভায়োলিনটা কেস থেকে বার করে অযথাই মুছে মুছে চকচকে করি, ছড়টাতে রজন লাগাই। বাজাতে হাত ওঠে না। অতবড়ো উস্তাদের শাগারেদ! বাপরে! কিন্তু কোনোদিনই ওঁকে বাজাতে শুনি না।

সেদিন কথায় কথায় ধরেই পড়লাম, 'ঘরের কোণে যে যন্ত্রটি কাপড়মোড়া শুইয়ে রেখেছেন, ওকি পুজো করার জন্যে দাদা?'

উনি চমকে উঠে বললেন, 'ঠিক, ঠিকই বলেছেন। পুজো ছাড়া আমার মতো অভাজন আর কী করতে পারে বলুন!'

এ কথা কেন বলছেন?

আরে দাদা আমি কি পণ্ডিতজির যোগ্য শিষ্য? একটু আধটু স্বভাবপটুত্ব ছিল। কিন্তু তখন অল্পবয়স, খেলাধুলো, গল্পের বই, সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে হুটোপাটি এসবই ভালো লাগত। পণ্ডিতজি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরগম সাধতেন। একটা পালটা চলছে তো চলছেই। সারে রেগা গামা গামাগারেসা। আমার মতো মুকখুর তা পোষাবে কেন? অভিমানও হত খুব। কলকাতায় সবাই

কত মজা করছে, সিনেমা থিয়েটার খেলা। ক্রিকেট-ফুটবলের পোকা ছিলাম তো। রাগেও অনেক সময় গোঁয়ারের মতো ঘাড় গুঁজে বসে থাকতাম। কিছুতেই সেতার ধরব না।

বকুনি খেতেন না? এঁরা তো খুব কড়া ধাতের মানুষ হন শুনেছি।

উনি তা ছিলেন না। ওঁর কাছে আমার সাতখুন মাফ। তা ছাড়া আমি কিন্তু ওঁর সেবা করতে খুব ভালোবাসতাম। পা দাবানো, মাথা টিপে দেওয়া। সুড়সুড়ি খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন। বলতেন, আমি যেখানেই থাকি, তোকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করব বেটা। তুই যদি চাস তো সব পাবি।

তবে? কিছু তো শিখেছেন! অত ছোটো থেকে অমন একটা সঙ্গ! বাজনাও তো শুনেছেন প্রচুর!

তা শুনেছি। দিনে রাতে, দুপুরে বিকেলে। এই সেতার আর আমি এই দুটি ছিল ওঁর অবলম্বন। কখনও বাজাতেন ঝড়ের মতো, কখনও যেন ভারী জলস্রোত, পুরো ওজনটা নিয়ে বইছে। কখনও আবার ফোয়ারার মতো ঝরে পড়ছে। সেসব শুনে আমার মতো বালকও মন্ত্রপড়া সাপের মতো নিশ্চুপ হয়ে যেত। কিন্তু শিখতে হলে তো আমাকেই কসরতটা করতে হবে। তাতে আমি নারাজ। সেতার ধরেই বলব, 'তোমার মতো হচ্ছে না যে পণ্ডিত দাদু!' 'আরে! একদিনে কি হয় বেটা! আমি তো পঁচাশ বরস সাধনা করে একটুকু পেয়েছি।' ব্যাস আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়ে যেত। উনি আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বলতেন, 'আমাদের ঘরের লড়কা হলে তোকে মেরে লাট করে দিতাম। কিন্তু তুই যে গানের ঘরের লড়কাই নয় রে বেটা।'

এভাবে চলতে চলতে শেষে একদিন আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়। দুজনেই দুজনকে বাজনা শোনাব। সত্যি বলতে কী এ কদিন না বাজিয়ে বাজিয়ে আমার হাত যেন নিশপিশ করছিল। ঠিক আছে ধরেই ফেলি।

তখন সন্ধে সবে গাঢ় হতে শুরু করেছে, আমি লাজলজ্জা ভুলে একখানা ইমন ধরি। ইমন বড়ো সুন্দর রাগ। কোনোক্রমেই ভালো হচ্ছে না, কিছুতেই মেজাজ আসছে না, নিজের ওপর বিশ্বাস নেই? একখানা ইমন ধরে ফেলুন। ইমন নিজেই আপনাকে গড়গড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। খিঁচ নেই, খোঁচ নেই, বড়ো স্বচ্ছ অথচ মায়াময়। তাই আমি মনের সুখে ছড় চালাই। ইমনে ভরিয়ে তুলি মুররিকুঞ্জের দাওয়া। মিনিট পঁয়তাল্লিশ, আর কত আলাপ করব? খালি পুনরাবৃত্তিই হয়ে যায়। যন্ত্র কোলের ওপর নামিয়ে রাখি।

মগ্ন হয়ে শুনছিলেন হরিসাধনবাবু। এবার যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, 'বাঃ!'

আমি কিছু বলি না। চড়ার দিকে আমার তারের আওয়াজে কেমন কর্কশতা এসে যায়। অনেক চেষ্টা করেছি, দামি বিদেশি তার করিয়েছি, কিন্তু নিটোল মধুর আওয়াজ কিছুতেই বার করতে পারি না। সুরও মাঝে মধ্যে ফসকায়। কী করব? 'তুমি জানো মোর মনের বাসনা, যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না, তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা—দিবস নিশি'।

'মনে বড়ো দুঃখ, না দাদা।' —খুব মৃদুস্বরে উনি বললেন, অদ্ভুত একটা দরদ গলায়।

গলায় আর্দ্রতা কোনোমতে সামলে হতাশ গলায় বলি, 'কী করি বলুন, সারাজীবন চাকরি বাকরি সংসারধর্ম করেছি বটে, কিন্তু আমার মন পড়ে থেকেছে এই তারে ছড়ে। যে সুর হৃদয়ে শুনি হাতে তাকে আনতে পারি না কিছুতেই, আহা যদি একটিবারও পারতাম! আর পারব না!'

অনেকক্ষণ চুপ আমরা! নিশ্বাসের শব্দসুদ্ধ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ উনি বললেন, 'যদি পারেন?'

যদি? যদি দিয়ে তো স্বর্গের সিঁড়িও বানানো যায়, বস্তুজগৎ কি আর তা দিয়ে চলে? সে যাক—এবার আপনার বাজনা শুনি।

উনি বললেন, 'এখন আপনার ইমন আর আপনার যন্ত্রের আওয়াজ শুনছে বাতাস। টের পাচ্ছে

না? সুরের ধ্যান ভাঙতে নেই। আর একটু রাত হোক, খাওয়াদাওয়ার পর...একটু বেশি রাতে বাজাব।'

সাড়ে আটটা নাগাদ আমাদের খাওয়াদাওয়া চুকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাওয়ার ওপর আরামচেয়ারে এলিয়ে বসে থাকি। ওঁর তো বাজানোর নাম নেই দেখছি। মনে একটা অভিমানের মেঘ জমছে। সেই মেঘ থেকে গুমোট। গুমোট থেকে বিস্মরণ। চোখের পাতা জুড়ে কী ভাবে কখন যে ঘুমের অন্ধকার নেমে এসেছে জানি না। কত রাত তখন?

ঘুমটা ভাঙল একটা মধুর অথচ বলিষ্ঠ আওয়াজে—ট-ঙ-ঙ্-ঙ্। মাথাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে ওঠে। খরজ থেকে কোমলগান্ধার ছুঁয়ে শুদ্ধ মধ্যম পর্যন্ত একটি নিটোল গম্ভীর মিড়। যেন সুরের কলসটি সুরের পাথারে ডুবে গেল। তাকে ঘিরে সুরের বৃত্তগুলি ছড়িয়েই যাচ্ছে, ছড়িয়েই যাচ্ছে। মাঝরাতে মালকোশের সঙ্গে মন্দ্র আলাপে মেতেছেন কোনো সিদ্ধ বাদক। পায়ের রোম থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠছে সুরের স্পন্দনে, শরীরের মধ্যে যেন সহস্র তন্ত্রীতে মালকোশ বাজছে। অনেকক্ষণ বসেই ছিলাম, তারপর আর থাকতে পারলাম না। হরিসাধনদার ঘরে ঢুকে পড়লাম। এ ঘরে উনি কোনোদিন আমাকে ডাকেননি, আমিও তাই আসিনি। পর্দা উড়তে চকিতে চোখে পড়েছে একটি পাথরের বেদি মতো, তার ওপরে একটি জাজিম বিছানো। সেখানে দুটি বিঁড়ের ওপর তোলা ঢাকনায় ঢাকা একটি সেতার। শোবার খাট অন্যদিকে। পেছনের খোলা জানলা দিয়ে এখন তারার আলো এসে পড়েছে ওঁর কাঁধে, মাথায়, চুলের জায়গায় জায়গায়, কনুইয়ের কাছটায়, আলোর কালোয় এক অদ্ভুত মহিমময় মূর্তি। এ যেন আমার চেনা হরিসাধনদা নয়, ওঁর খোলসের মধ্যে থেকে আরও সৌম্য আরও হাজারগুণ প্রাজ্ঞ এক দ্বিতীয় হরিসাধন যেন বেরিয়ে এসেছেন। হাতের যন্ত্রটারও জায়গায় জায়গায় আলো পড়েছে। স্টিলের তারগুলো মাঝে মাঝে ঝিকিয়ে উঠছে। সে যে কী আলোকসামান্য দৃশ্য আর আলোকসামান্য সুর আমি বলে বোঝাতে পারব না। হঠাৎ দেখি বেদির ওপর আমার ভায়োলিনটাও সযত্নে শোয়ানো আছে। সরস্বতী পুজোর দিনে আমরা যেমন বইপত্র সব ঠাকুরের বেদিতে রাখি! উনি ইঙ্গিতে আমাকে সেটা তুলে নিতে বললেন। আমি ঘোরের মধ্যে তুলে নিই, ছড় টানি। উনি যা করছেন তাকে অনুসরণ করে যাই প্রাণপণে, কোনো কথা কোনো সংকোচ মনে থাকে না, হঠাৎ খেয়াল হয় মাঝে মাঝে উনি থেমে যাচ্ছেন, শুধু সুরটুকু ধরে রাখছেন, তখন আমিই বাজাচ্ছি, একলা। অনুসরণ নয়, নিজে বাজাচ্ছি, মালকোশের গম্ভীর তরঙ্গপ্রবাহের পর্দায় পর্দায় অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছি, হাত চলছে বিদ্যুতের মতো, পরক্ষণেই আবার ঝংকৃত হয়ে উঠছে সেতার। কতক্ষণ যে এই যুগলবন্দি চলেছিল জানি না, গোটা ঘরটা, তার কড়ি বরগা, জানলা দরজা, তার ভেতরে পিছলে-পড়া রাতের আলো আর রাতের অন্ধকার পুরোটাই যখন সেই সুরের যুগলবন্দি ধরে নিল, পাথরে যেমন করে রং ধরে তখন কোনো একটা সময়ে আমাদের বাজনা আপনি থেমে গেল। এবং দুজনে সর্বত্র ছড়িয়ে যাওয়া সেই ভরাট সুরের মধ্যে মূর্তির মতো বসে রইলাম। তারপরে কখন সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে নেশার ঘোরের মতো ঘুম এসেছে, টলতে টলতে গিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন চারদিক আলোয় ফটফট করছে। একফালি পুবের রোদ ঠিক আমার ডান চোখের ওপর ধারালো ছুরির ফলার মতো পড়ে আছে। কোথাও কোনো একটা পাখি রোদের ঝলকে দমে না গিয়ে তীব্র মিষ্টি সুরে ডেকেই যাচ্ছে, ডেকেই যাচ্ছে।

মুখ হাত ধুয়ে এসে বসি। হরিসাধনদা রোজকার মতোই বসে আছেন নিজের চেয়ারে। বুধন আমার সাড়া পেয়ে চা আর চিঁড়েভাজার প্রাতরাশ এনে রাখল। আমি বললাম, 'দাদা একটু পায়ের ধুলো দিন।' 'করেন কী! করেন কী!' —উনি আমার হাত ধরে ফেললেন।

আমি বলি, 'কাল যা হল, তা যদি স্বপ্ন না হয় তাহলে প্রণামটা না করতে দিয়ে আপনি আমাকে একটা মস্ত করণীয় থেকে বঞ্চিত করছেন।'

উনি আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রণাম? নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু সেটা এখানে নয়।' উনি উঠে পড়লেন। ওঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকি। সেই জাজিম, সেই বেদি, তার ওপর সেতারটি শোয়ানো, পাশে আমার ভায়োলিন। উনি বললেন 'এই আসনে প্রণাম করুন। এ আসন পণ্ডিত গম্ভীরনাথজির। আপনি কাল যা শুনেছেন আর যা বাজিয়েছেন তা পণ্ডিতজির আশীর্বাদ। অমন ঘটে, খুব মাঝে মাঝে, আপনার অদৃষ্টে ঘটে গেল।'

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। সে সব কথা এখন স্বপ্নের মতোই মনে হয়। সত্যি কি শুনেছি? সত্যি বাজিয়েছিলাম? সত্যি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল. কেসের ডালাটা খুলে আমার তন্বী যন্ত্রিণীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করি. 'যা শুনেছিলাম সে কি সত্যি? আর একবার অমনি করে বাজো না যন্ত্র!' যন্ত্র আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। তার মেহগনি শরীরে বোবা কষ্ট। হরিসাধনদার সঙ্গে আমার কখনোই তো আর দেখা হয়নি কিনা! সপ্তাহ দুই পরে ওঁর কালীকুণ্ডু লেনের বাড়িতে গিয়ে শুনি হঠাৎ মারা গেছেন। মধুপুরেই ওঁর অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেছে। জানাল ওঁর ভাগনে।

হিসেবের বাইরে

থলের মুখটা বড়ো করে ধরেছেন উমাপদ। মুলো, বেগুন, ঝিঙে, কুমড়ো সব নেওয়া সারা। শাকটার জন্য ভেবেছিলেন চাষিদের কাছেই যাবেন। কিন্তু লখার কাছেই পেয়ে গেলেন।

দে বাবা, দেখেশুনে দে, তুঁতের জলে ভিজিয়ে রাখিসনি তো? দেখিস, তোর বউদি তুঁতের জিনিস ছুঁয়ে দেখে না।

তুঁতের কারবার লখা করে না, লখা ঝাঁজিয়ে ওঠে, কোনোদিন আপনাকে খারাপ জিনিস দিয়েছি?

'বা, বা দিব্যি পাটশাক উঠেছে তো!' এক আঁটি কিনেই ফেললেন উমাপদ। যতই লিস্ট মিলিয়ে খরিদ করুন, হিসেবের বাইরে হাত চলেই যায়।

তা যদি বলো, বাজারহাট খুব সোজা জিনিস না। সময় লাগে। বাড়িটা ভাগ্যক্রমে কাছাকাছির মধ্যেই। তাই নিয়ম করে আসেন। রোজ না হলেও একদিন বাদ-বাদ তো বটেই। ফ্রিজে সাতদিন জমিয়ে রেখে খাওয়া তাঁরও পছন্দ নয়, তপুরও নয়। এইবার মৎসামুখী হতে হবে। মাছটা তিনি রোজ আগেই কিনে থাকেন। তরিতরকারি সময়ের জিনিস মোটের উপর সবই পাওয়া যায় কিন্তু মাছের ব্যাপারটা তো আর তা নয়। পাবদা না ট্যাংরা, পারশে না ভেটকি—কী পাওয়া যাচ্ছে তার উপর মেনু প্রোগাম সব নির্ভর করছে। আজকে এই পুঁইয়ের অনারে ভালো চিংড়ি দেখতে হচ্ছে। পুঁইটাই আজকের অর্ডার ছিল। অর্ডার বলো অর্ডার, আবদার বলো আবদার। চিংড়ি নেহাত পাওয়া না গেলে কাতলার মুড়ো ভরসা। মুশকিল হল ব্যাটারা মুড়োগুলো এমন করে কাটে যে কাঠ ছাড়া আর কিছু থাকে না। একটু কণ্ঠা, কণ্ঠার শাঁস না হলে ছ্যাঁচড়া জমে?

পাটপাতা দিয়ে খাবার জন্য দুশো মতো মৌরলাও কিনে ফেললেন উমা। তপু একেবারে অবাক হয়ে যাবে আজ।

এইজন্যেই লোকে আড়ালে উমাপদকে তপতীপদ বলে উল্লেখ করে থাকে। তিনি এ অঞ্চলের একজন ডাকসাইটে স্ত্রৈণ।

ছোটোখাটো মানুষটি। চটপটে, তরতরে। এ মোড় থেকে ও মোড় পৌঁছে যাবেন লহমার মধ্যে। খুরে এমন ধার! পরেন ধুতি আর রঙিন খাদির পাঞ্জাবি। মুখটা রূপী বাঁদরের মতো রাঙা ধরনের। কুতকুতে চোখ, ঝুপড়ি ভুরু। এক মাথা চুল গন্ধ তেল দিয়ে ঠেলে আঁচড়ানো ব্যাকব্রাশ।

উমাপদর শৌখিনতায় কেউ খুঁত ধরতে পারবে না। বাজার যাবার সময়ে ধুতিটা একটু হেঁটো করে পরেন অবশ্য। বাজারের চটিও আলাদা, রবার বা প্লাস্টিক যা-ই হোক। ধুয়ে নিলেই কাদা চলে যাবে। কিন্তু বাজারের এই কাদা, নোংরা, দুর্গন্ধ, ঠাসাঠাসির মধ্যেও তাঁর সবুজ কিংবা কমলা পাঞ্জাবির বোতামপটিতে গলার কাছের 'ভি'-তে চিড় ধরে না। পাশ-পকেটে পরিষ্কার তোয়ালে রুমাল। চুলের ফের একটা এদিক-ওদিক হবার জো নেই। ব্যাপার-বাড়িই যান আর বাজারেই যান উমাপদর চুল সদাসর্বদা ঠাস। চুলগুলিতে বলা বাহুল্য কড়া কলপ। তাঁর রাঙা মুখের শিরে কুচকুচে কালো চুলের বাহারের দিকে পথচলতি লোক ফিরে তাকাবেই।

জামার বোতাম, চটিজুতোর পালিশ, ধুতিপাঞ্জাবির ইস্তিরি, মায় চুলের কলপটি পর্যন্ত তপতীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে, তবু মানুষের নিজের স্বভাবের অভ্যেসের দিক তো একটা আছেই! ধরুন উমাপদ বর্ধমানের সুদূর গ্রামের ছেলে, পড়াশোনা করতে তাঁকে বোর্ডিংয়ে থাকতে হয়েছে বরাবর। চাকরিকালে আবার যে দু-চারখানা মেস কলকাতায় এখনও বহাল আছে, তারই একটাতে বাস করেছেন। ফলে নিজের জামাকাপড়ের বন্দোবস্ত নিজে করাটা গড়পড়তা বাঙালির ছেলের চেয়ে তাঁকে বেশিই রপ্ত করতে হয়েছে। গিন্নিরা গোছানো হোন বা না হোন এসব মানুষ কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা ফিটবাবু থাকবেই। জামার বোতাম সেলাই বা জুতো পালিশের জন্য এদের বউয়ের কাছে ধরনা দিতে হয় না, দর্জি-মুচির কাছে দৌড়াদৌড়ি করবারও দরকার পড়ে না। ঠিক কথা। কিন্তু খাওয়াদাওয়া? বোর্ডিংয়ের কুমড়োর ঘ্যাঁট আর মেসের মচ্ছের কালিয়া নামধারী বস্তুটির সঙ্গে যাদের পরিচয় গাঢ় হয়, তাদের যা-ই হোক রসনাগত শৌখিনতা বজায় থাকতে পারে না। থাকলে তারা সারভাইভ করতেই পারতেন না। অসাড় জিহ্বাই এসব ক্ষেত্রে একমাত্র বর্ম। আর বোডিং মেসের বোর্ডারের ছুটি-ছাটার বাড়ি? কে না জানে বর্ধমানের লোকেরা বেঁচে থাকে পোস্ত খেয়ে। সকালের জলখাবারে মুড়ি-পোস্ত, দুপুর-ভোজনে ভাত-পোস্ত, রাত-ভোজনে ভাত বা রুটি-পোস্ত। পোস্ত মুখরোচক সন্দেহ নেই। কিন্তু উঠতে বসতে যদি কেউ একই জিনিস খেতে থাকে, খেতে চায়, সেটাকে কি ঠিক শৌখিনতা বলে অভিহিত করা যায়?

অথচ সেই উমাপদ এখন পোস্তর ঘের থেকে দিব্যি বেরিয়ে এসেছেন। তিনি এমনকি মাছের তেলের বড়া, ইলিশের মুড়ো-ল্যাজার টক, মোচার পাতুরি ইত্যাদির মতো অচিরাচরিত পদাদির আস্বাদন পাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন। বেশি কথা কি বঙ্গীয় বেগুনভর্তার সঙ্গে বিহারি বেগুনচোকার কী তফাত, বা কত চালে কত ডাল মেশালে খিচুড়ি উপাদেয় হয় এসব কুটকচালিও তিনি দিব্যি জেনে গেছেন। এ বাবদে তাঁর শৌখিনতা বা পরিপক্বতার কৃতিত্ব পত্নী তপতীকে দিতেই হয়।

তাই বলে কেউ যেন না ভাবে উমাপদর তপতী দিনরাত্তির রান্নাঘরের খিদমতগারি করছেন। হলুদ-লংকায় হাত-রাঙা, নখ ভেঙে গেছে, ভাজা খেয়ে খেয়ে চামড়া চ্যাপচ্যাপ, পান খেয়ে দাঁতে ছোপ। তপসী সেই জাতের মহিলা নন যাঁরা গৌরবর্ণ চাঁদ হেন মুখটি জন্মসূত্রে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। উমাপদও তপতীকে তা থাকতে দেবেন না। ডাঁই করা ফ্যাশন-পত্রিকা উমাপদর টেবিলে। পাঠিকা তপতী, পাঠক উমাপদ।

পত্রিকার টিপস দেখে উমাপদ তপতীকে হেনার প্যাকেট এনে দেন। এই দ্যাখো, ডিমের সাদা, কফি-পাউডার, পুরোটাই ডিটেলে বলে দিয়েছে। লাগাও, লাগাও। লাগিয়ে ফ্যালো।

কী ব্যাপার? না, তপতীর মাথায় উত্তর-চল্লিশের পাকা চুল ভেসে উঠতে শুরু করেছে।

শীতের হাওয়া শুরু হতে না হতেই দু-তিন খেপ ক্রিম এসে যায়।

মাখো মাখো, মুখে হাতে, পায়ে, আঙুলের মধ্যে মধ্যে ভালো করে ঘষে,—কী ব্যাপার, না তপতীর গোড়ালি ফাটছে, হাত খসখস। গাল-গলা খসখস। এসব নিয়ে উমাপদর ভারি উদ্বেগ। তপতীর চেয়েও।

লোকে জানে রকমারি মনোহারির দোকানে উমাপদবাবুকে দেখা মানে তিনি কসমেটিকস কিনছেন। জুতোর দোকানে? তিনি স্কিন-কালারের মোজা কিনছেন। মিশন রো-এর মোড়ে?—হঠাৎ ভালো জাতের মুসাম্বি কি বেদানা দেখেছেন। জীবনদায়ী, যৌবনদায়ী এসব ফল।

ছেলে পড়ছে হায়দ্রাবাদে। বাড়ি শুনসান। কর্তা-গিন্নিতে রাঁধেন বাড়েন, থাকেন খান, বকবকম করেন আর টিভি দেখেন। পড়শিরা বলে কর্তার আপিসটাই মাঝখানে একটা বেরসিক ড্যাশ। ড্যাশটিকে হাইফেন করতে নাকি উমাপদবাবুর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এদান্তে বড্ড কড়াকড়ি

পড়েছে। ভাগ্যিস পাতাল রেল হয়েছিল তাই হুশ করে যেতে আসতে পারছেন। গিন্নির আঁচল ছেড়ে বেরোনো কি উমাপদর পক্ষে সহজ?

না, না দ্বিতীয় পক্ষ-টক্ষ নয়। সিলভার জুবিলি হয়ে গেল তপুকে ঘরে এনেছেন উমাপদ। সেই থেকেই মজে আছেন। যেমন রং, তেমনি চুলের বাহার। মুখ-চোখের বিচার অত আলাদা করে কে-ই বা করতে যাচ্ছে। আসল হল টান। টানছে কিনা। তা তার পিছনে অন্য বস্তুও তো কিছু না কিছু আছেই। রসনেন্দ্রিয় হয়ে পাকস্থলির ট্র্যাডিশনাল পথেও তো তপতী উমার হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করেছেন কিনা! বাঙাল মামারবাড়ি আর ঘটি বাপেরবাড়ি হওয়ার সুবাদে দুই বাংলার পাকপ্রণালীর যা কিছু মোহিনীমায়া সবই যে তপতীর আয়ত্তে সে আভাস পূর্বেই পেয়েছি। ওদিকের কচুরশাক এদিকের লাউশাক দিয়ে পোস্ত, এদিকের মুলো-ভেটকি ওদিকের কালোজিরে কাঁচালংকার বিখ্যাত ট্যালটেলে মাছের ঝোল সর্বত্রই তপতী-হস্তের অবাধ কৃতি। কাজেই, মুচকি হাসলে কী হবে! সবকিছুরই একটা কার্যকরণ থাকে।

হনহন করে চলেছেন উমাপদ খাস্তগির। হাতে ব্যাগ, ব্যাগে বাক্স, বাক্সে টিফিন, গায়ে জহর, তলায় খাদি, তলায় উলিকট। পায়ে মোজা, মোজার ওপর পাম্প, জিবে তপতী, বুকে তপতী—আপাদমস্তক তপতীতে ঠাসা হয়ে চলেছেন উমাপদ।

'আস্তে দাদা, আস্তে,'—পাতাল রেলের সিঁড়িতে রবিন।

কেন? ধাক্কা? পা মাড়িয়েছি?

আরে না, না আপনি মারবেন ধাক্কা? বলছি আপনার জন্যই। বয়স তো হচ্ছে! উমাপদবাবু কাষ্ঠ হাসলেন।

প্রথমত, বয়স হচ্ছে, এ একটা ফালতু কথা। আপামর জনগণ হল গিয়ে জন্মবুড়ো। জন্মেই মরে আছে। এই বুঝি এল, এই বুঝি...। তিনি সে বান্দা নন। কত বয়স? পঞ্চাশ? পঁচানব্বুইয়ে অলিম্পিক করছে আজকাল, একশো পার করছে লিখতে লিখতে, লেকচার দিতে দিতে। দেশ চালাচ্ছে কারা? ছেলেছোকরারা? পাকা পাকা মাথা সব। হয় পরিপক্ব শুভ্র-সনাতন, নয়তো বেল, সব চুকে-বুকে গেছে। তা এদের কাছে তো তাঁর পঞ্চাশ নস্যি? তুরতুর করে ওর এর পাশ দিয়ে গলে গলে ঠিক ন-টা পনেরোরটাতে উঠে পড়বেন তিনি। বাঁধা নিয়ম। হাতেই বাঁধা হিসেব।

ভিড় কাটিয়ে এগোতে না এগোতেই এক দঙ্গল স্কুল-ছাত্রী। বাঙালি নয়। মাড়োয়ারি এরা। দুধ-ঘি-খাওয়া নধর চেহারা। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে। হলুদ ব্লাউজ, নীল স্কার্ট, টানটান দু-বিনুনি একেবারে খুলির ওপর থেকে ঝুলিয়েছে কেউ কেউ, আবার ঝুঁটি বেঁধেছে ক্লিপ দিয়ে। মুঠো করে সহজেই ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। উমাপদবাবুর হাইটে কুলোবে না। কিন্তু এইভাবেই তিনি কচি লাউ, বোম্বাই বেগুনের বোঁটা ধরে ঝুলিতে পোরেন।

সুতরাং আর এগোলেন না তিনি। ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না এরা, কিচিরমিচির শালিক-ছাতারে-চড়ুই-বাবুই। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে, সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে মাখন-চকচক হাত ঘুরে যায়। গোল গোল হাত গাল ঝাপটা মেরে যায়। কিচ্ছুটি বলবেন না উমাপদ। করুক যা করছে, দিক না তাঁকে চেপটে, তাঁর আপত্তি নেই। ওই রবীন্দ্রসদন আসছে, হুড়মুড় করে নেমে যায় সব। চোখে-কানে দেখতে দেয় না এই মেট্রো রেল।

এইবার এগোতে থাকেন উমাপদ। একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছেন। পাশে এক ছোকরা। সামনে সিটে একটি ফ্রক, আর আশ্চয্যি, একটি শাড়ি। ডাইনে বাঁয়ে যদ্দুর চোখ যায়, চোখ চালিয়ে—সালোয়ার-কামিজ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না উমাপদ। আছে বুড়ি-থুড়ি।

কিন্তু কাঁচা গায়ে শাড়ি এই একটি মাত্তরই। সালোয়ার-কামিজ ড্রেসটা দুচোখ পেড়ে দেখতে পারেন না উমাপদ। পোশাক না পাশবালিশের ওয়াড় বোঝা যায় না। ফ্রক তবু একরকম। কিছুটা খোলাখালা থাকে। তবে সব পোশাকের সেরা পোশাক হল গিয়ে শাড়ি। এই যে মেয়েটি সবুজ রঙের গোল-গলা ব্লাউজ পরেছে, উপরের দিকে ভাঁজটা কেমন চমৎকারভাবে ভেসে রয়েছে। যতই চেষ্টা করুক পুরোপুরি ঢাকাতে পারবে না। ব্লাউজের আর কোমরের মাঝখানে যে নরম, সাদা, রসালো পেটিটুকু ওর দাম লাখ টাকা। এমন পুরু অথচ ফোলা নয়, চিকন, সুস্বাদু জিনিস কুমারী মেয়ে ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। নাভিটি খোলা আছে কি না দেখা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করা যায়, আছে। কোনো বিনোদিনী আজকাল নাভির ওপরে শাড়ি পরে না। উঠে দাঁড়ালে বোঝা যাবে।

সামনে দিয়ে শটাশট অন্ধকার পাতাল চলে যাচ্ছে। সুতল, তলাতল, রসাতল। সেইদিকেই ঠায় চেয়ে আছেন উমাপদ। ছোকরা ঝুঁকে পড়ে ফুটকি-ফোড়ন কাটছে। চেনাশোনা বোধহয়। কলেজ-টলেজ? প্রেম নাকি? আজকাল আবার এদের ফক্কুড়ি দেখে এসব বোঝা যায় না ফ্রকে-শাড়িতে-প্যান্টে দিব্যি জমেছে। উমাপদবাবুও হাত টান টান করে জমে গেছেন। শাড়ির পাশে ফাইল। এসপ্লানেড এলেই উঠে যাবে। বয়স্কা মহিলার তাক ওদিকেই। তিনি তা হতে দেবেন না। টুক করে বডি নামিয়ে দেবেন।

আ মলো! উঠে পড়ল যে! এটা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। ফ্রক বসে। শাড়ি উঠে যাচ্ছে। বয়স্ক মহিলা বসছেন। ছোকরা অমায়িক। মুহূর্তে এসপ্লানেডমুখী কিউয়ে শামিল হয়ে গেলেন উমাপদবাবু। কখন যে চলতে শুরু করেছেন, কখন যে নেমে পড়েছেন বুঝতেই পারেননি। সামনেই মেয়েটির ধড়। বেশ ধড়ফড়ে, জ্যান্ত-জিয়ল।

কখনো ঠিক পাশে, কখনো ঠিক পিছনে, কখনো দু মানুষ পিছনে, তুরতুর খুরখুর চলেছেন উমাপদ। সামনে লকলক করছে সবুজ লাউডগা আঁচল, বিনুনিটিরও বেশ গোছ আছে। এক গোছে এক কেজি, বেশি তো কম হবে না। খুলিটি বেশ ঢাকা তো! শাঁসে জলে মাখা। ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

বেরোবার ঘুরনচাকের কাছে এসে টনক নড়ল। কাজ সেরে নিলেন। ঝট করে রাগত মুখ ফেরাল শাড়ি। উমাপদ তখন দু মানুষ পিছনে, সামনে ঢ্যাঙার পিছনে একেবারে ঢাকা পড়ে গেছেন। কিছু না, একটা কৌতূহল ছিল, মিটে গেল। আধপর্ব মতো ডেপ্‌থ্‌। উপর ভাসা জিনিস নয়। মানে নাভিটি। এইবার উমাপদ ফিরে আবার পর-ট্রেনে উঠবেন। উটকো কিছু না ঘটলে নিশ্চিন্তে আপিস যাবেন।

ওদিকে উমাপদকে খাইয়েদাইয়ে সাজিয়েগুজিয়ে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা করে রওনা করিয়ে তপতী আস্তে সুস্থে চান করেন। তাঁর সর-ময়দায় সামান্য কাঁচা হলুদ মেশানো থাকে। একটা সোনার জেল্লা আসে চামড়ায়। নিখুঁত হিসেব। সর-ময়দা শুকোবে। তারপর ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে-দিয়ে স্পঞ্জ রগড়ে সব তুলবেন। রিঠে ভিজছে রাত থেকে। সেই জল মাথায় পড়বে, ফুরফুরে রেশমি হয়ে থাকবে চুল। এসব করতে সারতে টাইম লেগে যায়। তারপর চান-টান সেরে ধোয়া ছাপা শাড়ি আলগা করে পরে তপতী খেতে বসেন। একলার ঘরে একলার টেবিলে খাওয়া। সে যে কী তরিবত আর কী পরিতৃপ্তি তা একমাত্র তপতীই জানেন। সোনামুগের ডাল দিয়ে চামরমণি চালের ভাত মাখো, আধা নরম কড়া ট্যাঁড়স ভাজা দিয়ে খাও। ডাল মেখেও খাও, গন্ধ মেখেও খাও। চক্ষু বুজে কষের দাঁত দিয়ে কাঁকড়ার দাড়া ভাঙো। চুষে চুষে ভেতরের ঘি টানতে থাকো, টানতে টানতে বুঁদ হয়ে যাও, তারপর টকটক জিবের আওয়াজ করে চাটনি বা অম্বল। চেটেপুটে শব্দ করে, এক

চেয়ারে গা আর এক চেয়ারে পা এলিয়ে বসে, আয়েশ করে খাও। খেয়ে-দেয়ে মুখ কুলকুচো করে একটি দাঁতখড়কে নাও, ঠিকঠাক জায়গা খুঁচিয়ে কাঁকড়ার খোলামকুচি ট্যাড়সের বিচি, খেজুরের খোসা এসব বের করে আনো। যত খুশি মুখ ভ্যাটকাও, দাঁত ছরকুটে করো, কেউ দেখতে আসবে না। বলতে কী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই সময়টায় তপতী ইচ্ছে করেই বেশ খানিকটা মুখ ভেংচিয়ে নেন। যেন সামনে কোনো বাঁদর-টাঁদর আছে। নিরাপদ দূরত্বে অবশ্য। মাঝে জাল। তা নয়তো তপতীর ভেংচি-ভিরকুট্টির বাহার দেখে বাঁদরটা নির্ঘাত বিপজ্জনকভাবে খিঁচিয়ে খিমচিয়ে দিত। সুন্দর সুসংস্কৃত মুখখানায় কত রকম কাটাকুটি খেলা যায় সেটা দেখা, এবং নিজেকে দেখানোই যেন তপতীর উদ্দেশ্য।

বেল বাজে, সেলস গার্ল এসেছে। আবার বেল বাজে। কাজের লোক এসেছে।

পাখার তলায় বসে চুলটাকে একটু শুকিয়ে নেন এবার। ভিজে চুলে শুলে মাথা ধরা কেউ আটকাতে পারবে না। মাথা ধরলে চোখে কালি, চোখে কালি পড়লে উমা ব্যস্ত হবেন। পত্রিকার ডাঁই থেকে চোখে কালির নিদান খুঁজতে সন্ধে কাবার। সুতরাং চুল শুকোলে তবেই পছন্দসই কয়েকখানা পত্রপত্রিকা নিয়ে তপতী বিছানাসই হবেন। যত না পড়েন তারচেয়ে বেশি দেখেন তপতী। প্রথমে দেখেন সাজ। তারপর দেখেন রূপ। তারপর দেখেন গল্প। তারপর ফিরে আসেন সাজসজ্জায়। কত লেহেঙ্গা চোলি, কত বীরবউলি, বডিসুট, বাউটি, শেরওয়ানি, জিন্‌স, কত জিম-যন্ত্র, কত ব্রেসিয়ার, কত হোসিয়ারি। দেখতে দেখতে চোখ ফেরে না। শেষে যখন বিউটি-ঘুমে ঢলে ঢলে পড়তে থাকেন বুকের ওপর উপুড় হয়ে থাকে পাতজোড়া এক নবনায়ক। পত্রিকা আঁকড়ে পাশ ফেরেন তপতী। এইবার উটকো কিছু না ঘটলে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন।

দুই বুড়ো

দুই বুড়ো। একজন ছিয়াত্তর, একজন উনআশি। উনআশি সরকারি আমলা। ভূতপূর্ব। ছিয়াত্তর সরকারি কনট্র্যাকটর। ভূতপূর্ব। সরকারি কনট্র্যাকটর বলে তো কিছু সত্যি-সত্যি হয় না। তবে কোনো সময়ে সেটা হরেদরে হয়ে গিয়েছিল যে যোগসাজশে তারই ফলে আজ প্রাক্তন এম. এসসি/পি.এইচ.ডি.-র সঙ্গে প্রায় এপাশ-ওপাশ একদা-ঠিকেদার দাবা খেলেন। দাবাতে যখন মাথা খেলে না তখন চাইনিজ চেকার, চাইনিজ চেকারেও যখন সুবিধে হয় না তখন লুডো। আমলা একদিন ভূতপূর্ব হয়ে যাবেন, সেটা জানা কথা। কিন্তু ঠিকেদার? বাঘ যেমন নরমাংসের স্বাদ পেলে চিরকালের জন্যে নরখাদক হয়ে যায়, ঠিকেদারও তেমন ঠিকেদারির নিগূঢ় রসের সন্ধান পেলে আর রিটায়ার করে না, আমরণ ঠিকেদারি করে যায়। তবু ইনি রিটায়ার করতে বাধ্য হলেন কেননা আমলা মহোদয় রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে রসের ফোয়ারাটি শুকিয়ে গেল। এখন কথায় কথায় মেজো-সেজো অফিসার, কেরানিকুল, যে-যেখানে আছে ইনস্পেকশনের জুজু দেখায়, বিল আটকে দেয়। এতজনকে খুশি করতে হলে কি আর পড়তা পোষায়? সুতরাং সাম্রাজ্য ত্যাগ করে সরকারি ঠিকেদার মশাই বানপ্রস্থে গেলেন। সম্রাটপুত্ররা কেউ যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়নি। সব এটা-সেটা চাকরিতে পেশায় ঢুকে গেল। কাজেই সাম্রাজ্যও আর রইল না। গোবি মরুভূমি হয়ে গেল। এই গোবি মরুভূমিতে একমাত্র সাহারা হলেন দত্তগুপ্ত। অর্থাৎ ভুবনমোহন দত্তগুপ্ত, প্রাক্তন আই.এ.এস।

দত্তগুপ্তরও আর কোনো সাহারা, কোনো মরূদ্যান নেই। ছেলেপিলে ক-টিকে যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত করার জন্য দত্তগুপ্ত সরকারি অর্থ ও সরকারি সুবিধে অকাতরে ব্যয় করেছেন। নাড়ু খেয়ে-দেয়ে নাড়ুগোপালরা সব ঘোষণা করলেন—উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরুতে পর্যন্ত থাকা যায়, কিন্তু এই হিন্দুস্তানের ন্যায় ওঁচা দেশে আর নয়। এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন অভারতীয় নগরে-বন্দরে থানা গেড়েছেন। দত্তগুপ্তর একটি শোফার, তিনটি কাজের লোক, একটি বাড়ি। ঠিকেদার ঘোষদস্তিদারেরও অনুরূপ। তাঁর তিনটি বাড়ি, দুটি কাজের লোক, শোফার নেই, কেননা আর তিনি গাড়ি রাখেন না। এই তিনটি বাড়ি এবং দত্তগুপ্তর বাড়িটিও তিনিই সরকারি ঠিকের টাকা দিয়ে ভারি সুন্দর শক্তপোক্ত করে বানিয়ে নিয়েছিলেন। জমি ছাড়া বাড়িবাবদে খরচ তেমন কিছু হয়নি। বাড়িগুলির মোটা ভাড়া থেকে তাঁর জীবনধারণের অর্থ আসে। তিনি নিরামিষাশী, এখনও নিজের বাজার নিজে করেন, পত্নী বেঁচে থাকতেও শখের রান্না করতেন। কৃপণও আছেন বেশ। দুটি ঠিকে লোক নিয়ে তাঁর দিব্যি চলে যায়। কথাবার্তায় মিছরি মাখানো, তাঁর নীচের তলার ভাড়াটেরাই অসুখে-বিসুখে তাঁর দেখাশোনা করে। দত্তগুপ্তর ব্যাপারস্যাপার আলাদা। তাঁর মোটা পেনশন আছে, সঞ্চিত অর্থের সুদ, ডিভিডেন্ড ইত্যাদি আছে। উপরন্তু তাঁর ছেলেমেয়েরা মাঝে মধ্যেই তাঁকে পাঁচশো কি হাজার ইউ-এস. ডলার, হাজার দেড়েক অস্ট্রেলিয়ান ডলার, একশো কি দুশো পাউন্ড এই রকমের গিফ্‌ট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠিয়ে থাকে। তাঁর বাড়ির একতলাটিও একটি ব্যাংককে ভাড়া দেওয়া আছে। তিনি বেশ জমকালোভাবে থাকতে ভালোবাসেন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন শোফার-ড্রিভ্‌ন্‌ ডিলাক্‌স অ্যামবাসাডরে চড়ে হাওয়া খেতে বেরোন,

কোনোদিন বাইপাসের দিকে, কোনোদিন ভিকটোরিয়া, কোনোদিন লেক, কোনোদিন আবার নিছক গঙ্গার ধার। বেড়ানোর সময়ে তাঁর সঙ্গী থাকেন ঘোষদস্তিদার। সন্ধেবেলা হলেই তাঁর একান্ত পানের আসর বসে। শ্রেষ্ঠ সুরা, অর্থাৎ স্কচ হুইস্কি. তিনি কি চার পেগ মেপে খান, সঙ্গে থাকে যথেষ্ট অনুপান সহপান। স্প্রিং চিকেন, মাটন, শাম্মি কাবাব, রসালো রেশমি কাবাব। মুচমুচে ভেটকিফ্রাই, তিব্বতি মোমো ইত্যাদি ইত্যাদি। এই আসরে ঘনিষ্ঠ পানরসিকদের অবারিত দ্বার। কিন্তু তিনজন, খুব জোর চারজন। দত্তগুপ্তর বৈঠকখানায় ঠিক যতজন ধরে। এখানেও স্বভাবতই ঘোষদস্তিদার নিয়মিত অতিথি।

সন্ধের আসরের পরেও ঘোষদস্তিদারকে সহজে ছাড়তে চান না দত্তগুপ্ত। আমলা সময়ের বহু না-বলা কথা তাঁর পেটে এখনও গজগজ করছে। কোন্ মন্ত্রীর কে কে প্রণয়িণী ছিল, কার কার তলে তলে অন্য পার্টির সঙ্গে যোগসাজশ, কতগুলো ধরকাপড় একেবারেই গট-আপ, কোন্ সেক্রেটারি ছিলেন গুপ্ত-হোমো, কোন্ পুলিশকর্তার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক নেতার এক গেলাসের ইয়ারি। ইত্যাদি ইত্যাদি। তেত্রিশ বছরের চাকরিজীবনে এ রকম অজস্র সঞ্চয় তাঁর। তার ওপরে একাকিত্ব, নিজের পরিবার এবং পারিবারিক দায়িত্ব ও সমস্যার অভাব, উপরন্তু বার্ধক্যের এক কথা বার বার বলার অভ্যাস। সব মিলিয়ে সন্ধের পানের আসরের পর থেকে তিনি আরও চাঙ্গা এবং গপ্পে হয়ে ওঠেন। কে আর তাঁর ধৈর্যশীল শ্রোতা হবেন দ্বিতীয় বৃদ্ধ ঘোষদস্তিদার ছাড়া? পদলেহনের পুরোনো অভ্যাসটি ঘোষদস্তিদার এখনও ছাড়তে পারেননি। আর পারবেনও না। এক গল্প তিনশো তেত্রিশতম বার শোনার পরও তিনি একই রকম উৎসাহে ঘাড় নেড়ে যান। একই রকম সায় দেন, একই প্রতিক্রিয়া দেখান এবং একইভাবে দত্তগুপ্তর আত্মবিশ্বাস ও অহংকারের তৃপ্তিসাধন করেন।

দত্তগুপ্তর জীবন একেবারেই আড্ডা-নির্ভর ও অকর্মক। কিন্তু ঘোষদস্তিদারের তা নয়। তিনি তাঁর ঠিকেদারি অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। কোথাও চেনা-পরিচিত কারও বাড়ি বা ফ্ল্যাট হচ্ছে, সারাই-ঝালাই হবে এমত খবর যদি তিনি পান, তাহলে নানারকম কলাকৌশল করে ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

চৌধুরী নাকি বাড়ি করছে? এ কি সেই সল্টলেকের পুরনো প্লটটায়? বা বা। এতদিনে সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তা, কাকে দিয়ে করাচ্ছে? সম্রাট? না তীর্থংকর? মনোতোষ গড়াই? চিনতে পারলুম না তো। ঠিকাছে, ঠিকাছে, ভালো বুঝেছে দিয়েছে। অন্য কিছু না, এইসব আননোন লোক কোথায় কী কমবেশি করে ফেলবে, মশলাপাতি কম দরের দেবে। কত পার্সেন্টেজ রাখবে—এগুলো ...ওই একটু আর কী! সতর্ক থাকা দরকার।

এই জায়গায় দত্তগুপ্ত তাঁর কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভারী গলায় বলবেন, 'চৌধুরীকে বলো একবার শিবপদকে কনসাল্ট করে নিতে। গড়াইয়ের লোক কী দিচ্ছে না দিচ্ছে, শিবু যদি একবার চেক করে দেয়...'

শিবুটি বলাবাহুল্য ঘোষদস্তিদার মশাই।

এইভাবে দুজনের পরিচিতদের লতায়পাতায় যে যেখানে আছে সব জায়গাতেই টোপ ফেলেন শিবপদ ঘোষদস্তিদার। কোনোটা লাগে, কোনোটা লাগে না। অন্য কিছু না, তাঁর এটা হবি, নেশা। নেশার জন্যে মানুষ কত অসাধ্যসাধন করে থাকে, শিবপদ আর এটুকু পারবেন না? টাকাপয়সার পরোয়া তিনি বড়ো একটা করেন না। তবে কাজে নামলে নয়-নয় করেও কিছু পকেটে এসেই যায়, তাই দিয়ে শিবপদ তাঁর বসতবাড়ি, দত্তগুপ্তর বসতবাড়ি, পারলে নিজের অন্যান্য বাড়ি সংস্কার করেন। ভাড়াটেরা খুশি হয়। শিবপদবাবুর মতো ল্যান্ডলর্ড আর হয় না, এঁরা বলাবলি করেন।

দত্তগুপ্ত যতবার টাকাপয়সা হিসেব করে দিতে যান, শিবপদ বলেন, 'ও হবে এখন। আপনার কাজটা আগে হোক!' কাজ হয়ে গেলে, দত্তগুপ্তর সম্পূর্ণ সন্তোষ সাধিত হলে তবে একবার সিমেন্ট বালি রং কাঠের ন্যূনতম বিলটি পেশ করেন শিবপদ। কাজেই দত্তগুপ্তর আস্থাভাজন হতেও তাঁর ঘর থেকে খরচ করতে হয় না।

দুই বুড়োর বোঝাপড়া যাকে বলে ষোলো আনার জায়গায় আঠারোআনা। বন্ধুত্বে বেশ আঠা। একদিন দেখা না হলে দুজনেই বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকেন। সেবার শিবপদের হল ভাইরাল ফিভার। তিনদিন দেখা নেই। দ্বিতীয় দিনেই ফোন তুললেন দত্তগুপ্ত।

কী হে শিব, জ্বর কত?

থার্মোমিটার তো বলছে দুই।

দুই জ্বরেই কাবু হয়ে পড়লে?

তা পড়লুম।

বলি খাওয়াদাওয়া বন্ধ নাকি? একটু করে চিকেন স্যুপ খেতে শুরু করো, বোস্টমগিরি ক্দিন বন্ধ থাক।

ওয়াক উঠবে যে!

নাক টিপে খেয়ে নাও। এসব রোগে ফুডটাই আসল। বুঝলে?

বুঝলুম।

আজকের কাগজটা দেখেছিলে?

এখনও সময় পাইনি।

বলছি শোনো। ওই তোমাদের সল্টলেক গো, হেরইনের ডেন ধরা পড়েছে। বাইরে থেকে ধর্মীয় আশ্রম, ভেতরে সব চরসে বুঁদ। মন্ত্রীর ছেলে, পুলিশ কমিশনারের মেয়ে, চিফ সেক্রেটারির বউ—তবে আর বলছি কেন? হাই-টেক ডেন। কত তার কায়দাকানুন, মেম্বারশিপ কার্ড, শাকাহারী রেস্তোরাঁ... ভেতরে এই ব্যাপার। আমাদের টাইমে...

গল্প শুরু হয়ে যাবে। দেড়টি ঘণ্টা কাবার করে, তবে ফোন রাখবেন দত্তগুপ্ত।

আর দত্তগুপ্তর অসুখবিসুখ। হয়ই না বলতে গেলে। একবার বাথরুমে পড়ে গিয়ে দেড়মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। সে সময়টা শিবপদকে দত্তগুপ্ত ভবনেই আস্তানা গাড়তে হয়েছিল।

ভুবনমোহন দত্তগুপ্তর কাছ থেকেই 'মঙ্গলদীপ' বহুতলের তিনতলার দক্ষিণ-পশ্চিমের ফ্ল্যাটটা শেষ অবধি বিক্রি হওয়ার সংবাদটা পেয়েছিলেন শিবপদ।

'মঙ্গলদীপ' হয়েছে বছর তিনেক। সব ভরতিও হয়ে গেছে। সাউথ-ওয়েস্টটাও হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু ক্রেতা তিনকড়ি সান্যালের ওটাতে বাস করার ইচ্ছে ছিল না। সে এটা গেস্টহাউস বানাতে চাইছে খবর পেয়ে ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দারা রুখে দাঁড়াল। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তি হিসেবে ভুবনমোহনের সইসাবুদ সমর্থন এসবও তারা জোগাড় করে। সেই থেকেই ফ্ল্যাটটার খোঁজ রাখতেন ভুবনমোহন। তিনকড়ি অবশেষে ওটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। কিনেছেন এক মহিলা। এই খরিদ নিয়েও বহু ঝামেলা। মহিলা অবিবাহিত না ডিভোর্সি কেউ জানে না। কিনেছেন, থাকবেন একা একা। এতে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের একটু খুঁতখুঁতুনি ছিল। তাঁরা ভুবনমোহনের কাছে দরবার করেন।

একটা মিষ্টি গলা দুদিন অন্তর ভুবনমোহনকে ফোনে ডাকতে থাকে।

হ্যালো, দত্তগুপ্ত বলছি।

আমি ঋতা সেন বলছি, 'মঙ্গলদ্বীপ'-এর তিনতলার সাউথ-ওয়েস্ট ফ্ল্যাটটাতে কি কোনো গোলমাল আছে? মানে ওনারশিপে?

কেন আপনি কাগজপত্র দেখেননি?

না, রেজিস্ট্রি তো এখনও হয়নি কিনা!

দেখুন এসব কথা ফোনে হয় না। বাড়িতে আসুন।

সে তো খুব ভালো কথা। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে সংকোচ বোধ করছিলুম।

অতএব মহিলা আসেন। বছর চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশের মহিলা। চমৎকার চেহারাটি রেখেছেন। ইনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি করেন। ঋতা সেনকে ফ্ল্যাটটি পাইয়ে দিলেন ভুবনমোহন। অর্থাৎ 'মঙ্গলদ্বীপ'-এর বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। বোঝালেন—আপত্তির কোনে. প্রয়োজন নেই। একলা মহিলা যাবেনই বা কোথায়! ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঋতার স্বভাবতই এখন ভুবনমোহন-নির্ভরতা চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যায়। এখনও তিনি ফ্ল্যাটে আসেননি। কিন্তু অফিস ফেরত তিনি প্রায়ই ভুবনমোহনের এখানে ঢুঁ মেরে যান, সঙ্গে থাকে কোনোদিন নিজের হাতে বেক করা কিছু সুখাদ্য, কিংবা ভালো রেস্তোরাঁ থেকে আনা কিছু জিভে-জল, একদিন সসংকোচে এক বোতল আইরিশ-ক্রিম নিয়ে হাজির। 'আপনি লিকিয়র খান তো!'

আরো না খাই তো তুমি এনেছ বলে খাব! অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? একটু আধটু খাই বইকি! সারাজীবন খেতে হয়েছে চাকরির খাতিরে, এখন একটু না খেলে কি চলে মা?

তবে ভুবনমোহন শুধু উপহার নিতেই জানেন না, দিতে জানেন বিলক্ষণ। একদিন ঋতা সেনকে তিনি একটি প্যাকেট এগিয়ে দেন।

কী এটা, মেসোমশাই!

এখন, ঋতা তাঁকে মেসোমশাই কেন বলে ভুবনমোহন তা বুঝতে পারেন না।

মাসিটি থাকতেন তো তাঁর মেসো হওয়া সাজত। কিন্তু মাথা নেই অথচ মাথাব্যথা! যাই হোক, মেয়েদের মন আর মেয়েদের জিভ, একবার ভেবে বা না ভেবে যখন জিভের জগায় এনে ফেলেছে তখন আর ফেরানো যাবে না।

ভুবনমোহন বললেন—দ্যাখোই না খুলে।

প্যাকেট খুলতে একটি চমৎকার দক্ষিণী শাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

কেমন, পছন্দ হয়?

কার জন্য বলুন।

তোমার জন্যে, আবার কার জন্যে।

সে কী! ও মা! কেন?

কেন মেসোমশাই কি তোমাকে একটা সামান্য উপহার দিতে পারে না? এই শাড়িটি পরে তুমি গৃহপ্রবেশ করবে।

বিমর্ষ হয়ে ঋতা বলল, আর গৃহপ্রবেশ। জানলা দরজার রং নেই। ভেতরে সুদ্ধু ন্যাড়া প্লাস্টার অফ প্যারিস। বাথরুমে আয়না নেই, ফ্লাশ কাজ করছে না। ছুটি পড়ুক, মিস্ত্রি খাটাবার সময় পাই, তারপরে ওসব ভাবা যাবে।

এই কথা! আগে বলোনি কেন? তোমাকে মিস্ত্রি খাটাতে হবে কেন? আমার লোক জানা আছে। নিশ্চিন্তে ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে দাও। গুছিয়ে সব করে দেবে। কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

হবি তো হ, শিবপদ ঘোষদস্তিদার ধোপদুরস্ত হয়ে ঠিক এমনি শুভক্ষণেই প্রবেশ করলেন। নাও ঋতা, তোমার মিস্ত্রিমশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করো। ডক্টর শিবপদ ঘোষদস্তিদার।

হঠাৎ খামোখা ডক্টরটা ভুবনমোহন একটা মজার মেজাজেই যোগ করেছিলেন, কিন্তু এতে দুটি

কাজ হল। এক শিবপদ কেন কে জানে বেজায় খুশি হয়ে গেলেন, আর দুই ঋতা সেন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে গেল।

সে কী? উনি মানে... আমি তো কিছুই...

অত সংকোচের কারণ নেই। শিবপদ একজন শখের ইনটিরিয়ার ডিজাইনার। তুমি ওর সাহায্য নাও। তোমার ছুঁচ সুতো থেকে খাট আলমারি পর্যন্ত সব ব্যবস্থা ওই করে দেবে।...

ঘোষদস্তিদারের জালে মাছ পড়ল। অনেক দিন পর।

ঘষ ঘষ ঘষ ঘষ,—চলল ঘষামাজা, নারকোল দড়ি, শিরীষ কাগজ, পাথর, অ্যাসিড, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, মোজেইকের মিস্ত্রি, ঝালমিস্ত্রি, রঙের মিস্ত্রি, ছুতোর ... কাজ কি একটা। মাসখানেকের মাথায় ঋতা সেনের ফ্ল্যাট ঝকঝক করতে লাগল। শুধু রং পালিশই নয়। সেখানকার যেটি সেখানে সেটি ফিট করে দিয়েছেন শিবপদ। গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল।

সন্ধেবেলা। দৈনিক আসরে শিবু অনুপস্থিত। রাত দশটা নাগাদ ফোন যায়।

কী হল শিবু! আজ যে বড়ো এলে না।

আর বলবেন না, কতকগুলো লাইটের শেড কিনতে এজরা স্ট্রিটে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে মহামিছিল। তিনটি ঘণ্টা বসে বসে বাড়িই ফিরেছি সাড়ে আটটা।

শেড কার? ঋতার বাড়ির?

আজ্ঞে।

এখনও শেষ হয়নি?

এই খুচখাচ।

দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হন শিবপদ। আসরে আজ ভালো বোতল বেরিয়েছে। খাঁটি ভদকা। সঙ্গে বড়ো বড়ো চিংড়ি মাছ ভাজা, ব্যাটারে ডুবিয়ে বেশ মুচমুচ করে।

বাঃ মাছগুলো তো জব্বর।

ঋতা দিয়ে গেল খানিক আগে। প্রায়ই দিচ্ছে—উদাস গলায় বলেন ভুবনমোহন।

বারণ করি, শোনে না। তা দিক। দিতে যদি তার ভালো লাগে। ও, তোমার তো আবার চলবে না... অমৃতে অরুচি। মনেও ছাই থাকে না। ওরে অ রামহরি শিবুবাবুর জন্যে কী ভেজেছিস দিয়ে যা না।

কদিন বাদ দিয়ে শিবপদবাবু খুরখুর করে ঢুকছেন।

কী হল ছক পাড়ুন!

ভুবনমোহন মুখ গোঁজ করে বসে আছেন।

গোঁসা কেন? আরে এই নিন। আমি পাড়ছি। বলুন কী নেবেন? সাদা?

দ্যাখো শিবু ইচ্ছেমতো আসবে-যাবে ওভাবে গেমের কনটিনুয়িটি থাকে না!

কী করব বলুন, একা মহিলা, একটা ভার নিয়েছি। না তো করতে পারি না।

কেন? কী হল?

ওই আজকাল উঠেছে না! ফেং শুই।

সে আবার কী?

আর বলেন কেন? এদিকে বাস্তু শাস্ত্র, ওদিকে ফেং শুই। আজ মিস্তিরি ডেকে নর্থের দেয়াল থেকে সাউথ দেয়ালে আলমারি সরাই। পশ্চিমে নাকি বাথরুম চলবে না। আরে সারা বাড়িতে পশ্চিমে পর পর টয়লেট। তো কী করি, কোন্ ম্যাঙ্গো লেনের ঠিকানা, রিপন লেনের ঠিকানা, খুঁজে খুঁজে এক আলুওয়ালিয়া বাস্তু বিশেষজ্ঞ আর চ্যাং সায়েব ফেং শুই এক্সপার্ট এদের কাছ

থেকে পরামর্শ নেওয়া, জিনিস কেনা, লাগানো, ক-দিন দাদা এই করেছি। বাড়ি যাবার সময় পাইনি।

বলো কী? মঙ্গলদীপেই ছিলে নাকি?

না, তা আর কী করে থাকি! ঘোষদস্তিদার হাসেন। সারাদিন মিস সেনকে নিয়ে ঘোরা...

খাওয়াদাওয়া কোথায় করলে?

চমৎকার চমৎকার মাদ্রাজি, গুজরাটি শাকাহারী রেস্তোরাঁ খুলেছে ওদিকে, চলুন একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।

আমাকে নিয়ে কি আর শাকাহারী ভালো লাগবে শিব!

খোঁটা দিচ্ছেন! —হঠাৎ কেমন খিঁচিয়ে ওঠেন শিবপদ। যেন ভেতর থেকে কে একটা কী একটা দাঁতে নখে বেরিয়ে আসতে চাইছে।—নিজে যখন মৌজ করে চিংড়ি ভাজা খান! শিব খ্যাঁক করে বলেন।

'তুমি তু-তুমি... তো-তোমার এত বড়ো সাহস!' ভুবনমোহন রেগে তোতলাতে থাকেন।

শিবপদ অবশ্য ক্ষমা চান। আবার আসর বসে। গেলাস চলে। দাবার ছক পড়ে। লুডোর কাটাকাটি হয়। কিন্তু আবার একদিন খিঁচিয়ে ওঠেন, না শিবপদ নয়, ভুবনমোহন। তিনিও অবশ্য ক্ষমা চান। এরপর বোতল খোলে, চাট আসে, দাবার দান পড়ে। কিন্তু আবার একদিন খিঁচ, এবার শিবপদ।

এইভাবেই একদিন দুই বুড়োর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়।

জোলি চেপ

এদিকটায় মারোয়াড়ি এসে কপালখানা স্রেফ খুলে গেছে জলি দাসের। শুধু জলিই বা কেন? বিজলি, রেণু, ঝুমা, কাজলি, টুনটুনি... জলির যত বন্ধু আছে সব্বারই।

জলি যখন গুড়গুড়ে ছিল, তখন এত সব আকাশছোঁয়া বাতাস-ঢাকা বাড়ি ছিল না কিন্তু। ছিল দোতলা, বড়ো জোর তিনতলা, গলির মধ্যে থাম-টাম-অলা পেল্লাই প্রাসাদও কয়েকটা, কিন্তু ওই—তিনতলার বেশি নয়। সাতপুরোনো আদ্যিকালের বাড়ি সব। নোনা ধরেছে কোনোটায়, কোনোটায় হলুদ কি গোলাপি রং জ্বলে গিয়ে ছ্যাতলা পড়ে গেছে। এক-একটা অবশ্য নতুন রংচং মেখে, সেজেগুজে ওঠে কখনও সখনও, দেখায় যেন এক ডালা শিঙি-মাগুরের মধ্যে একখানা ঝাঁ-চকচকে বাংলাদেশি ইলিশ। কিন্তু এখন? এখন এ তল্লাটের চেহারাই পালটে গেছে। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি ডবসন রোডটা তো সদাসর্বদা ঝমঝম ঝমঝম করছে। তিরিশ ফুট কুল্লে হবে কি রাস্তাটা? আগে ছিল একটা সাবেক চার্চ, ক-টা দোকানপাট। পাঞ্জাব-লাইনের এ পাশে খোলামেলা ছড়ানো খান দুই বাড়ি রাস্তাটাতে রাজত্ব করত। রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির কোনো আত্মীয়ের বাড়ি একটা, অন্যটা এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী ও দানবীর বিরজা ঘোষদের। হাওড়া স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলে ডানদিকে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স বেশ খানিকটা খোলা জায়গা-জমি নিয়ে। সেখানে এদিককার অনেক স্কুল-কলেজেরই বচ্ছরকার স্পোর্টস হয়। এখন এ রাস্তায় যত এগোবে তত দোকানপাট, যত এগোবে তত দোকানপাট। এ স্রি মার্কেট, স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্রের দোকান, পাওভাজি-দহিবড়া-পাপড়িচাট, ইডলি-ধোসা এ সবের দোকান। হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালার শ্বেতপাথরের সিঁড়িঅলা ঠান্ডা দোকান তো আছেই আর আছে দু গজ অন্তর একটা করে ওষুধের দোকান আর প্রতি মোড়ে একখানা করে জলিদের পার্লার। সেই পার্লারে একবার ঢুকে পড়ো অমনি চেরা-চেরা চোখের নেপালি দিদিরা হাতের কেরামতিতে বেমালুম তোমার ভোল পালটে দেবে। ঢুকল জলি, বেরুল জুলেখা সুলতানা, ঢুকল টুনটুনি, বেরুল টুইঙ্কল খান্না। আর সেই পার্লারের স্বর্গদ্বারে ঢোকবার রেস্ত জোগাতেই উঠছে পরের পর পরের পর তাল ঢ্যাঙা বাড়ি। সাততলা আটতলা নতলা। মার্বেলের সিঁড়ি, রেলিংয়ের ওপর পেতলের পাত। দরজার বাহার কী। চৌখুপি চেঁছে মাথা গোল করে যেন সুন্দরী-অপ্সরাদের নেলপালিশ লাগানো পেল্লাই নখ এক-একটা। মন্দিরও আছে একাধিক। হনুমানজি বজরংবলি, শিউজি। মন্দিরে বারোমাস গাঁদাফুলে কেয়ারি ঝোলে। দেখলে বুঝবে কী একটা বিশেষ পরব। তা কিন্তু নয়। রোজ রোজই প্রবল ঘণ্টা-ঘড়ি বাজিয়ে আরতি হচ্ছে। রোজই কাতার দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ভক্তরা। আপিস যেতে-আসতে মারোয়াড়ি বাবু দণ্ডবৎ হয়ে যাচ্ছে একবার করে। মহা ধুম। আকাশ ঢেকে গেছে বলে যে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে, তা নয়। আকাশে কী থাকে? চাঁদ, তারা, সুয্যি—এই তো! তা দোকানে দোকানে কি এখন অমন হাজার তারা জ্বলছে না? সাদা সিঁড়ির মোড়ে, গেটের ওপর ঘষা কাচের গোল বাতিগুলোর থেকে যে আলো বেরোচ্ছে, সেটা কি জোছনার চেয়ে কম সুন্দর!

এ তো গেল একটা রাস্তা। এটাই সবচেয়ে জমজমাট, সবচেয়ে দামি। কিন্তু আরও আছে।

রয়েছে শহরের বুক ফুঁড়ে জি টি রোড, হাওড়া রোড, হরগঞ্জ রোড, আর সেসব রোডের এ পাশ ও-পাশ দিয়ে ডালপালার মতো নেংটি-নেংটি গলি। কত লেন, কত স্ট্রিট, কত যে রোড। ক্ষেত্তর মিত্তির লেন, সীতেনাথ বোসের লেন, জেলেপাড়া, শৈলেন বোসের রোড, অবনী দত্ত রোড, আরও ওদিকে যাও তো উত্তম ঘোষের লেন, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, জালান রোড, ধর্মতলা রোড। রোডের আর শেষ নেই। সেই সব রোডের দু ধারে টপাটপ দাঁড়িয়ে পড়ছে ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা মাল্টিস্টোরি। আলাদিনের ম্যাজিক যেন! এ জায়গায় পুরোনো বাসিন্দারা গজগজ করে অবশ্য আসতে যেতে—শহরটাকে একবারে বেচে দিলে? আকাশটাকে সুদ্ধু বেচে দিলে এই মেয়র আর মিউনিসিপ্যালিটি! ছি, ছি, ছি! কিন্তু করবেটা কী! মুরোদ তো ঘণ্টা। আর জলি তো দেখে দিব্যি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে শহরের। বিল্ডিং দেখলে বুক দশ হাত হয়ে যায়, দোকানপাট দেখলে চোখ ধকধক করে, জিভ দিয়ে দিয়ে লাল ঝরে। শহরের মতো শহর একখানা।

তা চোখে দেখে থ মেরে থাকলেই তো হবে না। পয়সা চাই। বাঙালিরা মোটে পয়সা দিতে চায় না। মাইনে দেখো বছরের পর বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে না? বলি তোমরা মাগ্‌গিভাতা পাও না? তোমাদের ইনকিমেন নেই?—ক্যাঁট ক্যাঁট করে জলি শুনিয়ে দিয়েছে কোণের বাড়ির রীতা বউদিকে। এই বউদিটা আবার তাদের সঙ্গে একটু গলাগলি মেশে। বাড়ির, বাপ-মায়ের খবর নেয়, হোমিয়োপ্যাথিকের ওষুধ দেয়, জ্বরজ্বারি-পেটের গোলমাল, সর্দি-কাশি, পা টনটন, দাঁত কনকন—সেরেও যায় বেশ। এখন জলি আর তার বন্ধু টুনটুনি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—আদিখ্যেতা! জলির মায়ের যখন হঠাৎ অ্যাপেনডিসের ব্যথা উঠল। সে তো চোখের গুলি ঠিকরে যায় আর কী! রীতা বউদি আর অশোক দাদা তাদের কোনো চেনাশোনা লোক ধরে হাসপাতালে ভরতি করে দিল। কোন্ কেলাব থেকে অ্যাম্বুলেন্স আনাল। ডাক্তার বলেছিল, তক্ষুনি অপারেশন না করলে নাকি বার্স্ট করত। জলির সেই মা আবার উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আবার বাড়ি-বাড়ি বাসনমাজার কাজ ধরেছে। তবে, সে তো কোন কালের কথা। তখন জলি ছোটো, কাজ ধরেনি।

স্লেট-পেনসিল-বর্ণপরিচয় কিনে জলিকে খানিকটা লেখাপড়াও অবশ্য শিখিয়েছে রীতা বউদি। ইংরেজি ঠিকানা সে পড়তে পারে, বাংলা তো পারেই। তা সে তো অবৈতনিক ইস্কুলে গেলেও শেখা যেত। বাড়ি-বাড়ি কাজ করে জলির সেখানে যাবার সময় হত না এই যা! রিক্তাকেও পড়াশোনা শিখতে ডেকে নিয়েছিল বউদি। তবে রিক্তাটা একটু মাথামোটা ; তা ছাড়াও রিক্তার নাম নিয়ে খামোখা রীতা বউদি আর জলির মায়ের মধ্যে একটা মন কষাকষি হয়ে যায়। তার ফলে, রিক্তাকে পড়তে পাঠানো বন্ধ করে দেয় তাদের মা।

রিক্তা নাম শুনে মুখ টিপে বুঝি হেসেছিল বউদি, হ্যাঁ গো কমলামাসি, হঠাৎ রিক্তা নাম দিতে গেলে কেন? রিক্তা মানে জানো?'

তা অবশ্য কমলামাসি জানে না। রিক্তা হল গিয়ে রিক্তা, জলি হল জলি, আর টিংকু, তার ছোটো মেয়ে টিংকু হল টিংকু—তার আবার মানে কী? তার নিজের নামটি যে মা-লক্ষ্মীর নাম সেটুকু অবশ্য কেন যেন সে ছোট্টবেলা থেকেই জানে, মানেটা হাওয়ায় বাতাসে ভেসে থাকে। তবে ওসব নামের এখন আর তেমন ধক নেই।

মানে জানে না, উৎসটি সোৎসাহে বলে কমলামাসি।

বিরজা ঘোষদের বাড়ি কাজ করতুম বউদি, তাদেরই কুটুমবাড়ির বউ এয়েছিল। কী সুন্দর! কী সুন্দর! এই অ্যাত্ত গয়না, এ-ই বেনারসি শাড়ি...তার নাম ছিল রিক্তা।

রীতা বউদি হেসে বলেছিল, 'তা এই গয়না আর সেই শাড়িতেই সুন্দর হয়ে গেল?'

না গো বউদি, কী রং! কী চোখমুখ!

তাই বলো।

তারই নাম থেকে নাম রেখেছি। নইলে আমাদের আর বিদ্যে কী? তবে কী জানো বউদি, মুক্‌খু-সুক্‌খু গরিবগুর্বো মানুষেরও তো শখ যায়—বাক্যের শেষে কমলামাসির অভিমানের সুর গোপন থাকেনি।

নিশ্চয়ই। শখেতে তো দোষ নেই—রীতা বউদি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—কিন্তু 'রিক্তা' মানে যার কিচ্ছু নেই। কিচ্ছুটি না। অমন নাম রাখতে গেলে কোন আক্কেলে?

তা হবে—কমলা যেমন ন্যাতা টানছিল তেমনি টানতে থাকে, তার কোনো ভাবান্তর হয়নি। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। তা ছাড়া, কমলামাসি কোনো কোনো ব্যাপারে আলট্রা-মডার্ন। জোর অসুখবিসুখ করলে সে শনি-মঙ্গলবারের ভরের দিনে চণ্ডীমায়ের ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে, কতবার জলপড়া তেলপড়া নিয়ে এসেছে সে মায়ের থানের ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে, টিংকুর পাছে নজর লেগে যায় বলে তার কপালের কোণে ভুষো কালির ধ্যাবড়া ফোঁটাটি দিতেও তার কোনোদিন ভুল হয়নি। যে বর লাথি মেরে তাকে ঘর থেকে দূর করে দিয়েছে তার জন্যে সধবার জয়-মঙ্গলবার, সাবিত্রী বের্তো, তারকেশ্বর এসবও সে নিয়ম মেনে করে—এগুলো মেয়েমানুষের কর্তব্য, লাথি-ঝাঁটার বরই হোক আর সোহাগ-সিঁদুরের বরই হোক, আর যতই তাকে সে নিজে দু বেলা 'মর মর' বলে শাপান্ত করুক। বড়ো মা (শীতলা) যখন ফি বছর ফাগুন মাসে চানে বেরোন, তখনও সে নতুন কাপড় পরে, নতুন গামছা বুকে জড়িয়ে, উপোস করে এলোচুলে দণ্ডি কেটে থাকে। কিন্তু 'রিক্তা' নামের মেয়ে নিঃস্ব রিক্তই হবে এমন বাজে কুসংস্কার তার নেই। এই যে তার নাম কমলা, তা লক্ষ্মী ঠাকরুনটি কি ট্যারচা চোখের কোণ দিয়েও কোনো দিন দেখেছেন তার সংসারের দিকে? নিজের মনেই চোখ গরম করে ভেংচি কাটে সে। হ্যাঁ, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই, তোকে বলেছে! 'রিক্তা' নাম হলেও কিচ্ছু নেই, 'কমলা' নাম হলেও কিচ্ছু নেই। তফাতটা কী? আসল কথা, নিজেদের নাম তো! ঝি-চাকরে নিচ্ছে, গায়ে ফোসকা পড়ছে তাই ভদ্দরলোকদের।

রিক্তার পরে যে 'জলি'! সে-ও তো এক ধনীর দুলালি নেকি চণ্ডীর নাম থেকে নেওয়া। সে মেয়েটা সব সময় লাফাচ্ছে। স্কিপিংদড়ি নিয়ে, লাল রবারের বল নিয়ে, ছোট্ট ছোট্ট পায়রার ডিমের মতো সাদা-সাদা বল নিয়ে। ধাড়ি মেয়ে, যতই কেন ফ্রকে-স্কার্টে বয়স লুকোক! ওর বয়সে তার রিক্তা হয়ে গিয়েছিল নির্ঘাত। ফ্রক দিয়ে বয়স ফুটে বেরোচ্ছে। নেচে বেড়াচ্ছেন ধিঙ্গি। তবু সে মেয়েটার বাবা-মা-দাদু যখন 'জলি-জলি' ডাকত গায়ের লোমগুলো তার খাড়া হয়ে যেত। সত্যি, সত্যি, এই তিন সত্যি। একটা নীল দরজার কপাট খুলে সে যেন ঢুকে পড়েছে এক মোজাইক-মেহগিনি-কার্পেটের স্বপ্নের জগতে, যেখানে মেয়েরা খালি বল খেলে আর গান যায়, বউয়েরা খালি ক্রিম মাখে আর অর্ডার করে আর ভালো ভালো সিল্কের শাড়ি পরে বেড়াতে যায়, আর বরেরা হাসি-হাসি মুখে বউয়েদের দিকে ঘোর-লাগা চোখে তাকায় আর চুমো দেয়। হ্যাঁ, জলির বাবা জলির মাকে যখন তখন চুমো খেত, এ কমলা নিজের চোখে চুপচুপিয়ে দেখেছে। ভূত নয় প্রেত নয়, চণ্ডীমায়ের নল-চালা নয়, সুদ্ধু 'জলি-জলি' ডাক। মায়ে ডাকছে, ঠাকুমায় ডাকছে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন সুরে। বাস! কমলার লোম খাড়া। চোখের ওপর সেই দৃশ্য, জলির বাবা জলির মাকে টুক করে চুমো খেয়ে নিচ্ছে।

এমনটাও হয়! রিক্তাদের বাপ তো ওসব চুমো-ফুমো জানত না। মাসমাইনে পেলে আগে নিজেরটা ফূর্তি করে ওড়াবে। তারপর চুলের ঝুঁটি ধরে তার মাথা দেয়ালে ঠুকে ঠুকে তার থেকেও আদায় করবে ফূর্তির টাকা। রাত্তিরে মালের ঘোরে, ছেঁড়া কাঁথায় দু-পাশে দুই মেয়ে, হুঁশ খেয়াল

নেই. ভূতের মতো লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে তার ন্যাতানো বুক ধরে হিড়হিড় করে টানত লোকটা। তার ঝাঁপাই কী! বাপ রে! যেন রাক্কস। কচিকাঁচা জেগে যাবে বলে সে মুখ বুজে গোঁ গোঁ করে যন্ত্রণা সইত। একদিন সেই গোঙানি শুনে রিঙ্কা জেগে উঠে কচি-কচি হাত দিয়ে বাপকে পিটতে শুরু করে, 'মাকে মারছ কেন? মাকে মারছ কেন?' এক ঝটকায় মেয়েকে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল বাপ, 'এবার তোকেও মেরে পাট করে দেব মেলা হম্বিতম্বি করলে।'

নেহাত নিকষ অন্ধকার, তাই!

'ধুস্। তোকে দিয়ে নেশা জমে না' - পরবর্তী মন্তব্য রিঙ্কার বাপের, 'জড়ালে গায়ে হাড় ফোটে। বডি বলতে কিছু নেই, মমতা কুলকান্নির বডি দেখেছিস?'

কে আমার গতর এমন করেচে? চারবেলা গতর খাটিয়ে মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছি। বছর-বছর ছেলেপিলে আর দুবেলা মার, আবার কুলকান্নি দেখাচ্চেন। কে আমার অক্ষয়কুমার এলেন রে!

তা সে নেশা জমাবার পাত্তর অন্যত্র পেয়ে গেল বোধহয়। তাই তাকে মেরে ধামসে তার সোনার জল করা ক'গাছি রুপোর চুড়ি আর হার ছিনিয়ে নিয়ে সেই যে পিঠটান দিল, আর এ মুখো হয়নি।

গেছে, ভালো হয়েছে।

খালি 'জলি' ডাক শুনলেই সে যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়, মনে হয় সে একটা সুন্দরপানা বউ, হাওয়াই শাড়ি পরেছে, ঝমঝম করছে সোনার চুড়ি, বালা। গা থেকে সেন্টের পাগল করা গন্ধ বেরোচ্ছে আর সে, সেই রিঙ্কা-জলি-টিংকুর রূপের ধুচুনি বাপ হঠাৎ কার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ওই জলির বাপের মতন লম্বা, ফরসা, লাল চশমার এক ম্যাজিক মানুষ হয়ে গেছে, তাকে আদর করছে, চুলে হাত বুলিয়ে, কপালে চুমো খেয়ে। এই স্বপন দেখতে-দেখতেই তার হাতের ঝাড়ন হাতেই থেকে যায়, ফ্যালফ্যাল করে সে সামনের দিকে চেয়ে থাকে।

ও বউ! ও কী! কী ভাবছ? হাত চলছে না যে তোমার মা! কিছু হয়েছে?

আর কী হয়েছে! হয়েছে যা হবার তাই। বা যা না হওয়ার তা না হওয়াই।

তা আসল বৃত্তান্তটি হল কমলা মাসিদের সাধ-আহ্লাদের সঙ্গে তাদের মেয়ে জলিদের সাধ-আহ্লাদের কিন্তু অনেক ফারাক। জলির সাধ অন্যরকম।

'ও কীরে? তুই কি ভুরু প্লাক করে এলি নাকি?'—রীতা বউদি একদিন অবাক হয়ে বলল।

ভেতরে ভেতরে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে জলির। সে বলল. 'কেন বউদি, তুমিও তো করো, করো না?'

কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল বউদি। তাড়াতাড়ি সামলে নিল, হাসি চেপে বলল, 'হ্যাঁ...তা অবশ্য। সে যাহোক বেশ করেছিস। ধনুকের মতো হয়েছে একেবারে, পঞ্চশরের পুষ্পধনু!'

শেষের কথাগুলোর মানে ঠিক ধরতে পারল না জলি, ইচ্ছে করে শক্ত করে বলেছে, যাতে সে বুঝতে না পারে! কিন্তু ওটা যে একটা ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ এটুকু সে বেশ বুঝেছে। বুঝে অঙ্গ জ্বলে গেছে তার।

কী রে? আজকে পড়তে এলি না!

পড়তে আমার হারগিজ ভালো লাগে না বউদি—ঝাঁঝিয়ে ওঠে সে। বউদি না আরও কিছু! মামি আসলে! তার মা যদি বউদি ডাকে তার ডাকা উচিত মামি, ডেকেও ছিল সে, মনিবই বারণ করল, বলল, বউদি, বউদিই ডাকবি।

আমি কিন্তু হারগিজ পড়ি রে জলি। খবরের কাগজ, পত্রিকা-টত্রিকা, বই...রীতা বউদি মুচকি হেসে বলল।

তুমি পড়ো তো আমার কী!

না, সেদিন বলছিলি না আমি ভুরু প্লাক করি তাই তুই করেছিস, তাই বলছিলুম আমি যখন পড়ি তুইও পড়।

'খবর তো টি.ভি. দেখলেই জানা যায়। কোন পার্টি ভালো, কোন পার্টি শয়তানের পার্টি, কেরোসিনের দাম বাড়ল, নতুন মারুতি বেরিয়েছে...' আসল প্রসঙ্গটা সামান্য পাশ কাটিয়ে যায় সে।

বাস? এইটুকু জানলেই তোর হয়ে যাবে? তোকে কেউ উলটো পালটা কাগজে সই করিয়ে নিলে বুঝতে পারবি?

কাগজে সই? কত একেবারে জমি-বাড়ি-ঘরদোর রয়েছে আমার! হুঃ! ঠকিয়ে নেবে!

শুধু বাড়িঘরদোর কেন? ঠকিয়ে নেবার অনেক কিছু আছে রে জলি! তা ছাড়াও লেখাপড়া শিখলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবি। এটা বুঝিস না? কোনটা ভালো কোনটা মন্দ—বোঝবার জন্যেও একটু পড়তে হয় রে। আর সুযোগ যখন পেয়েছিস!

জলি মুখ ঝামটে বলল, 'আমি তো আর তোমার মতো মাস্টারি করতে যাচ্ছি না। উন্নতি? কী উন্নতি? ভদ্দরলোকে আমাদের বিয়ে করবে?'

রীতা বউদি এ প্রশ্নের সদুত্তর জানে না। সে চুপ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যা ভালো বুঝিস কর, আমি তো চেষ্টা করলুম। তারপর...। ছোটোবেলায় আমার বাপের বাড়িতে রঘু বলে একজন কাজ করতে এসেছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে। আমাদেরই মতো বয়স ছিল। আমরা ভাইবোনেরা মিলে তাকে লেখাপড়া শেখাতুম। স্কুলফাইন্যাল পাস করল। ড্রাইভিং শিখল, আস্তে আস্তে নিজের ট্যাক্সি করল। এখন রঘুনাথের নিজেরই তিনটে ট্যাক্সি। ডিপ্লোমা এনজিনিয়ারিং পড়েছে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, দেখিস—ভালো ছেলে। মানে আমার দাদা ভাইয়েদের সঙ্গে তফাত বুঝবি না।'

দাদা ভাইয়েদের সঙ্গে তফাত বুঝবি না। হুঁ! কে চেয়েছে তোমার বোন হতে! অষ্টপ্রহর পরনে ফ্যাসফেসে সাদা শাড়ি, খাতা দেখছে তো দেখছেই, টিভিতে ভালো ভালো মারপিট কি নাচগান রোমান্সের সিনগুলো এলেই নব ঘুরিয়ে দেবে। কাজ নেই অমন ভদ্দরলোক হয়ে!

সেইদিনই জলি মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেয়। 'চন্দ্রলোক'। এই বিল্ডিংটার তিনতলায় একটা, চারতলায় একটা, মোট দুটো কাজ সে পেয়েছে। সুরানাদের বাড়িতে পাঁচশো, আর একটু চাপ দিয়ে ছশো সে আদায় করে নেবে। দেওরারা একটু কিপটে। ওরা চারশোর বেশি কিছুতেই উঠল না। কিন্তু সুবিধে হচ্ছে ওদের বাড়িতে তার সাইজের দুটো মেয়ে আছে। তাদের পুরনো সালোয়ার কামিজ সে এখনই গোটা-তিন পেয়ে গেছে। টিকে থাকতে পারলে আরও কত পাবে! ম্যাক্সি, নাইটি, ঘাগরা চোলি...ফাটা নয়, চটা নয়, খালি পুরোনো। রীতা বউদি শুধু শাড়ি পরে। বেড়াতে যাবার সময়ে সে চুড়িদারগুলো পরে। কম ব্যবহার হয় সেগুলো, সেগুলোর আশায় বসে থাকবার কোনো মানেই হয় না। তা ছাড়া রীতা বউদি তার থেকে মোটাও বেশি। লম্বাতেও একটু বেশি। রিক্তার গায়ে ঠিক হয়। তা সে রিক্তা বুঝুক গিয়ে। চেহারাটাই ভ্যাসকা, রিক্তার গতর নেই। মা আর জলি দুজনে মিলে বাড়ি বাড়ি খেয়ে রোজগার করে, রিক্তা আর টিংকু ঘর সামলায়। তা ছাড়া, অবশ্য ওরা দুজনেই চেয়ার বোনে।

রীতাবউদির বাড়ি ছাড়াও আরও দুবাড়ি কাজ করে সে। একজন বুড়ো, তাকে রেঁধে বেড়ে, ঘরদোর গুছিয়ে ছিষ্টি করে দিতে হয়। তবে কিছুই দেখে না বুড়োটা। চাল ডাল সবজি, বালিশের ওয়াড়, মোমদান এসব হারগিজ সরায় সে। বুড়োর বাড়ির কাজ হল তার লক্ষ্মী। আরেক পার্টি আছে সাহা বাড়ি। ও বাড়ির মেম্বারও যত, কাজের লোকও তত। রান্নার লোক, ঘর ঝাড়ার লোক, ঝাঁটপাটের লোক, কাপড়কাচার লোক...। মাইনে মোটামুটি, কিন্তু কামাইয়ের সুখ খুব, হপ্তায়

একদিন দুদিন না গেলে টেরও পায় না। মনিব নয়, হয়তো অন্য কোনো কাজের লোকই খেয়াল করে, বলে—কাল যে বড়ো এলি না জলি!

'মাথাটা খুব যন্তন্না করছিল'—কাতর মুখে জলি বলে দেয়, বাস। মারোয়াড়িদের কাজগুলোয় ভালোমতো বসে গেলে সে রীতা বউদিদের কাজটা ছেড়ে দেবে। মাকে বলাবলির দরকার নেই। খামখা ব্যাগড়া দেবে। অ্যাদ্দিনের বাড়ি, আমাদের বিপদ-আপদে বুক দিয়ে করেছে। একটু মাইনে কম ঠিকই কিন্তু খাটুনিও কম, ব্যবহার ভালো। তো ব্যবহার নিয়ে কি জলি ধুয়ে খাবে? আর ব্যবহার না আরও কিছু ভুলিয়ে ভালিয়ে হোমিয়োপ্যাথিকের গুলি খাইয়ে, অ্যাত করলুম, ত্যাত-করলুম...কিনে রেখেছে নাকি!

কী রে? কাল এলি না। আজও এত বেলা....অসুখবিসুখ না কী?

ভুরু কুঁচকে রীতা বউদি বলল।

সাত সক্কালে কু গাইছে দেখো। অসুকবিসুখ তার হতে যাবে কেন? শত্তুরের হোক! অসুক-বিসুক ছাড়া কি তোদের লোকজন ছুটি পেতে পারে না?

শরীরটা টিসটিস করছিল বউদি—সে ব্যাজার মুখে বলে।

হ্যাঁরে শুনছি নাকি তুই ওই মাল্টিস্টোরিড-এ কাজ নিয়েছিস?

কে বললে?

যে-ই বলুক। কথাটা কি সত্যি?

কেন? ওদের বাড়ি কি আমাদের কাজ করা মানা?

তা কেন? কিন্তু তুই অলরেডি আমার, বিপিন জ্যাঠার ওখানে, সাহা বাড়িতে কাজ করছিস। এর ওপরে আরও কাজ নিলে, শরীর তো টিসটিস করবেই। এত লোভ করিস না।

লোভ?—ফোঁস করে উঠল জলি—ভালো খেতে, ভালো পরতে আমাদের বুঝি শখ সাধ হতে নেই? খাটব, খাব, তা-ও পারব না? সবই তোমাদের একচেটে?

অমন করে কথা বলছিস কেন জলি? তুই তো আগে এমন ছিলি না। কোত্থেকে এসব শিখে আসছিস?

তুমিই আমাকে যা শেখাবার শিখিয়েচ বউদি, আর কেউ অমন যেচে পড়ে আমার উপকার করতে যায়নি।

ঠিক, ঠিক বলেছিস। আমি তোর উপকার করতে গিয়েছিলুম। তাই তুই ভালো করে দক্ষিণা দিচ্ছিস।

মুখখানা আষাঢ়ে মেঘের মতো, থমথম করছে একেবারে। কী রে বাবা? কাঁদবে নাকি?

ঘরগুলো ঝাঁটপাট দিয়ে চলে যা জলি। বাসন আমি মেজে নিয়েছি। এক্ষুনি বেরোব।... রীতা বউদি ঝটকা মেরে চলে গেল।

এর ঠিক তিনদিন পরে রীতা বউদির বাড়ির কাজটা ছেড়ে দিল জলি। সে কি আর বলে কয়ে ছেড়েছে? দূর! যায়নি! একদিন, দুদিন, তিনদিন স্রেফ ডুব মেরে দিয়েছে। এদিকে অন্য বাড়িগুলোতে ঠিকই আসা-যাওয়া করছে। এর থেকে বোঝো যা বোঝবার।

বুড়োই বললে চারদিনের দিন, 'হ্যাঁ রে জলি, রীতা বউমাদের বাড়ি যাচ্ছিস না? আমার কাছে সে খোঁজ করতে এসেছিল!' জলি গম্ভীরভাবে বলল, 'ছেড়ে দিয়েছি।'

সে কী! বলা নেই, কওয়া নেই...

বলতে কইতে গেলে ফালতু এক কাঁড়ি কথা শুনতে হবে দাদু।

তাই বলে...—বউটা বড়ো ভালো রে...ওকে ভোগাচ্ছিস?

দেখো দাদু, প্রেশার কুকার নামাতে নামাতে জলি বলে, কে ভালো কে মন্দ অতশত জানি না, পোষাচ্ছে না, ছেড়ে দিয়েছি, বাস।

বুড়ো আর কিছু বলল না।

হাতে পয়সা এসেছে, ভালো পয়সা। এখন নিয়ম করে পার্লারে যাচ্ছে জলি! কদিন পরেই চুলটা ঝপ করে কেটে ফেলল, একে বলে স্টেপ-কাট। পার্লারের ঝকঝকে আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারে না জলি। ঝুমুঝুমু চুল। বাঁকানো ধনুকের মতো ভুরু। বিলিচ করে মুখটা ফরসা চকচকে লাগছে! পুজো দেওরার জর্জেটের চুড়িদার কামিজ পরে শ্যাম্পু করা চুল ঝাঁকিয়ে, লাল টুকটুকে লিপস্টিক লাগিয়ে, হাত ভরতি লাল-সোনালি কাচের চুড়ি ঝমঝমিয়ে জলি চন্দ্রলোক থেকে আসছে। আবার পিঙ্কি দেওরার লাহেঙ্গা চোলি পরে ফ্রস্টেড লিপস্টিক লাগিয়ে বেগুনি চুড়ি ঝমঝমিয়ে জলি চন্দ্রলোকে যাচ্ছে।

জলি কত মাইনে পায় তার মা বোনেরা জানে না। আগে যে টাকাটা পেত সেটাই সে মাস গেলে মাকে ফেলে দেয়, বলে—বাকিটা আমার, আমি যা খুশি করব, একটা কথা বলতে পাবে না।

রিক্তা জুলজুল করে তার ভুরু দেখে, 'কত নিল রে?'

আট টাকা।

আর চুল?

তোর অত খোঁজে দরকার কী? তোর টাকা?

শুধু বোনেরাই নয়, পাড়ার মস্তানরাও তাকে লক্ষ করেছে। পিন্টু কোন কারখানায় লেদের কাজ করে, চুল ফাঁপিয়ে, হাতে বালা পরে চলে, একদিন বললে, 'এ জলি! সিনেমা যাবি নাকি?'

কী সিনেমা?

মোহরা। ফাস্টো কেলাস রে...তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত্ মস্ত...আধ-গাওয়া গেয়েই দিল পিন্টু তাকে লক্ষ করে।

পাত্তা দিল না জলি, 'কী খাওয়াবি?'

ঝালমুড়ি।

আইসক্রিম খাওয়াস তো যাব। পেস্তা-আইসক্রিম।

সিনেমা, আবার আইসক্রিম, বড্ড বেশি হয়ে গেল না?

'তাহলে থাক'—জলি আর দাঁড়ায় না।

সাট্টার পেনসিলের লাড্ডু সিংও তাকে নজর করেছে। লাড্ডুর পকেট ভারী বেশি।

কী রে জলি? একেবারে মাধুরী দীক্ষিত হয়ে গেছিস যে রে।

'নাকি?'—মুখ বেঁকিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে জলি বলে।

এক থাবড়ায় মুখ ভেঙে দেব অমন করে কথা বললে—লাড্ডু বাবা মেজাজি লোক, এ প্যাংলা পিন্টু নয়!

সিনেমা যাবি?

কী সিনেমা?

মোহরা। ফ্ল্যাট হয়ে যাবি নাচ দেখলে—তু চিজ বড়ি হ্যায়...

ও আমার টি.ভি.-তে দেখা হয়ে গেছে। অনেক বার।

আরে! কোথায় টিভি আর কোথায় বড়ো ইস্কিন...যাবি তো বল।

'কী খাওয়াবে?' —খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জলির।

ধর রোল।

কী রোল, এগ না চিকেন না মাটন।

ধর এগ!

আর?

আর? আচ্ছা আইসক্রিম, তোর ওই ঘাগরামতো ড্রেসটা পরে আসিস।

লাড্ডুর সঙ্গে 'পারিজাত'-এ মোহরা দেখতে চলে যায় জলি। এগ নয়, চিকেন রোল খাইয়েছে লাড্ডু, ভ্যানিলা আইসক্রিম।

সিনেমা দেখতে দেখতে লাড্ডু জলির চুলে ইলিবিলি কাটে, পেট খিমচে ধরে।

ভ্যাট, হাত সরান, কাতুকুতু লাগছে।

আইসক্রিম খাওয়ালুম না।

আইসক্রিমে যেটুকু হয় হয়ে গেছে।

'আ-রে!'—লাড্ডু চমৎকৃত হয়ে বলে, তুই তো শেয়ানা মাল আছিস রে।

হল কাঁপিয়ে উল্লাসে সিটি দেয় লাড্ডু। অন্যরা প্রতিধ্বনি করে। আসল কথাটা না বুঝেই অবশ্য, একটা শেয়াল ডেকে উঠলে যেখানে যত শেয়াল আছে ডেকে ওঠে, সেই নিয়মে।

নিজের বুদ্ধিবৃত্তির এ হেন তারিফে মাটিতে পা পড়ে না জলির। রীতা বউদির মুখখানা মনে পড়ে। তার মুখ ঝামটা খেয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়েছিল! হুঁঃ, দুখানা খবরের কাগজ মুখস্ত করলেই যদি বুদ্ধি হয়ে যেত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না। জলিকে নাকি ঠকিয়ে নেবে! অত সস্তা!

লাড্ডু থেকে, পিন্টু থেকে ক্রমশ নন্দীর বাগান, পিরতলা, ঘুসুড়ি, পর্যন্ত সারা তল্লাটের অনেকের জানা হয়ে যায়—কীসে জলি মাধুরী দীক্ষিতের কতটা পাওয়া যায়। জলি হল গিয়ে গরিব লোকেদের মাধুরী দীক্ষিত। আর সেই হিসেবে, এখন জলির তোরঙ্গে 'ওনলি ভিমল' আর 'প্রফুল' জমতে থাকে, জমতে থাকে নেল এনামেল, লিপস্টিক, লিকুইড মেকাপ, কাজল, ব্লাশার, হাজারো রঙের বিন্দি আর কাচ-মেটালের চুড়ি, সেন্ট, রুমাল, ব্রা, প্যান্টি, ঘাগরা চোলি, জরির কাজ করা শলমাচুমকির কাজ করা চুড়িদার, শ্যাম্পু, ফরসা হবার রকম রকম ক্রিম।

কমলা, তার মা বলে, 'এত কিনছিস? জলি এসব তো বেশ দামি রে!'

দামি কিনব না তো সস্তা কিনব?

না, তাই বলচি, বোনেদেরও একটু আধটু দে। আহা মুখ শুকিয়ে থাকে। চেয়ার বেঁধে বেঁধে হাতে কড়া।

অবহেলাভরে জলি পূজা-পিঙ্কির কাছ থেকে পাওয়া চুড়িদার-ফুড়িদারগুলো রিক্তা-টিংকুকে দিয়ে দেয়। ক্ষয়া লিপস্টিক, জমে যাওয়া কমপ্যাক্ট—তা-ও দেয়।

এখন, লাড্ডু-পিন্টুদের আওতা যে সে ক্রমেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে এটা লাড্ডুরা প্রথমটায় বোঝেনি। কিন্তু একদিন পিলখানার ফলের কারবারি মোয়াজ্জমের সঙ্গে ধর্মতলার হিন্দ-সিনেমায়, আর একদিন বাঁধাঘাটের তুলোর দোকানের ভুঁড়িয়াল ভজুবাবুর সঙ্গে কাফে ডি মনিকোয় তাকে এরা আবিষ্কার করে ফেলল। আর তখনই শুরু হয়ে গেল বখেড়া। এ পাড়ার সঙ্গে ও পাড়ার, এ তল্লাটের সঙ্গে ও তল্লাটের। এরা বলে জলি আমাদের মাধুরী দীক্ষিত ওকে আমরা একা চাখব, ওরা বলে জলি আমাদের রোবিনা ট্যান্ডন ওকে আমরা একা চাটব। এরা বলে জলি আমাদের মিস ইউনিভার্স, ও আমাদের সঙ্গে নাচবে, ওরা বলে খবর্দার জলি আমাদের মিস ওয়ার্ল্ড, ওর সঙ্গে নাচার হক খালি আমাদের, আমাদের আমাদের।

প্রথমটা ঝগড়া শুরু হয়েছিল খিস্তাখিস্তি দিয়ে। তারপর ক্রমে ঘুষোঘুষি, লাঠালাঠি, পাইপগান, সাইকেলের চেন, তারপর বোমবাজি। দুটো চারটে লাশ পড়ে গেল, কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, কয়েকজন গুরুতররূপে আহত। পুলিশ এল। কয়েকটাকে রুলের গুঁতো দিয়ে কয়েদে পুরল, কয়েকটাকে আবার নেতৃ-ফোন পেয়ে চটপট ছেড়েও দিল। লাশগুলো বেশির ভাগই মর্গে পচতে লাগল, কেননা ডোম ফোমদের সঙ্গে বখেড়া করে কে সেসব ছাড়ায়। যাঃ, যা খুশি কর গে যা। আর ইতিমধ্যে একদিন কমলামাসি এসে রীতা বউদিদির কাছে কেঁদে পড়ল, 'ও বউদিদি গো, আমার জলিকে তুলে নিয়ে গেচে গো—ও-ও! কিছু করো, কিছু একটা উপায় করো বউদিদি!

কে তুলে নিয়ে গেল? পুলিশ?

না বউদিদি, অন্য কেউ, চুপচাপ কখন তুলে নিয়ে গেছে টেরটি পাইনি।

খুবই রাগ রীতা বউদি অশোক দাদাবাবুর। হাতের ছাত্রী ফসকে গেলে কার না রাগ হয়! তবু মানুষটা বিপদে পড়েছে ; অনেক দিনের লোক। আর সত্যি, ওর তো কোনো দোষ নেই। পাঁচ বাড়ি কাজ করে বেড়ায়, কখন আর সে মেয়ের ওপর নজর রাখবে, মেয়ে বিগড়ে গেলেই বা সে করবেটা কী! তবু মায়ের প্রাণ তো! অতএব দাদা-বউদিদি কমলামাসিকে সঙ্গে করে পুলিশে ডায়েরি করে আসে। খরচ-খরচা করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, ধরা পড়া করে টিভিতেও বলায়। ছবি আর কোথায় পাবে? শুধু বিবরণ। দৈর্ঘ্য—পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, লাল চুড়িদার, বয়স পনেরো/ষোলো, জলি দাস। সন্ধান পেলে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

টিঙ্কু আর রিঙ্কা কিন্তু তালে ছিল। মা যখন দোরে দোরে 'হা জলি যো জলি' করতে করতে ঘুরে মরছে, তখন দুই বোন চোখে চোখে তাকায়, পরিষ্কার ইশারা। তক্তপোশের তলা থেকে জলির তোরঙ্গটি তারা টেনে বের করে, এর ভেতরেই তাদের আলিবাবার রত্নভাণ্ডার। কোন্‌টা আগে পরবে আর কোন্‌টা পরে পরবে ঠিকঠাক অর্ডারটা ঠিক করতে না পেরে দুই বোনেরই গা শিরশির করতে থাকে। ডালা কিন্তু সহজেই খুলে যায়। তালাই ছিল না। ও মা! এ যে ফক্কা! কিচ্ছুটি নেই। ভিমল হাপিস, পাউডার, ক্রিম, কাজল, সেন্ট, রুজ, লিপস্টিক, সায়া-ব্লাউজ, চুড়িদার, মায় বিন্দি আর হেয়ারক্লিপগুলো পর্যন্ত হাপিস। ভ্যাবাচ্যাকা মেরে থাকে দুজনে। যারা জলিকে তুলে নিয়ে গেল, তারা কি জলির তোরঙ্গের মালও তুলে নিয়ে গেল? যা বাব্বা! কী করে! কখন?

আসলে, জলিকে তো কেউ তুলে নিয়েই যায়নি! জলি নিজেই নিজেকে সুযোগমতো তুলে নিয়েছে। তার সামনে এখন সিনেমা-রঙা ঝিলিমিলি পথ। সে পথ দিয়ে কত মেয়ের মেলা, তাদের জন্যে কত জিনিস! ফরসা, আরও ফরসা, আরও আরও ফরসা। আরও হেয়ার স্টাইল, আরও হেয়ার স্টাইল, এখন জলিও তো....। জলিও তো কী! মাস্টার হবে? সরকারি চাকুরে হবে? স্বাধীন ব্যবসাজীবী হবে? আই.এ.এস. হবে? নাকি হবে পাইলট বা খেলোয়াড়? না, এ সব না, এখন ইচ্ছে করলেই জরি-চিকমিক চুমকি-ঝিকমিক সিকি পোশাকে জলি আপামর ব্যাটাছেলে সাধারণের লেহ্য হয়ে উঠতে পারে। রিঙ্কা-টিঙ্কুদের ঈর্ষা, জলিদের গৌরব।

খারাপ থাকবে কেন? চারদিকের সাইকেডেলিক আলোয় জলি হারগিজ ভালোই আছে।

ইউলিসিসের কুকুর

There, full of vermins he lay abandoned on the heaps of dung.

বড়ো বড়ো মানুষদের নামে এখন আমাদের রাস্তা-ঘাট-পার্ক-ময়দান-সদন-সরোবর-স্টেডিয়াম। বেশিরভাগই উনিশ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার আমাদের গৌরব, আমাদের জনক, ঐতিহ্য, পিতৃপুরুষ। এইভাবেই তাই তর্পণ করি। পুরোনো নামের রাস্তা হয়ে যায় মহাত্মা গান্ধি রোড, রবীন্দ্র সরণি, শরৎ বসু রোড, নেতাজি সুভাষ রোড। নতুন প্রমোদ ভবন, মঞ্চ হয়, মঞ্চ দিই রবীন্দ্রসদন, নজরুলমঞ্চ, শিশিরমঞ্চ। সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের নামে ব্রিটিশ রাজের কোনো গন্ধ ছিল না, তবু সে রাস্তা এখন আমাদের জাতির অহংকার মেঘনাদ সাহার নামে। এই মেঘনাদ সাহা সরণির মোটামুটি মাঝখানে শরৎ বসু রোড আর কেয়াতলার মাঝামাঝি জায়গায় আমরা থাকি। লেকের দিকে মুখ। মা, দাদা, বউদি, টুটুল আর আমি। ছিমছাম শান্তির সংসার আমাদের। বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি, অটো অনবরত ছুটে চলেছে এপার-ওপার দুটো রাস্তা দিয়েই। তবু আমরা নিরিবিলির স্বাদ পাই। কেননা, থাকি এগারো তলায়। এত ওপর থেকে লেকসমেত পুরো দক্ষিণ শহরতলিটাই মানচিত্রের মতো চোখের তলায় বিছিয়ে থাকে। এত গাছ! এত গাছ! আর এত সবুজ। এ যেন ধুলো-ধোঁয়া-আবর্জনার কলকাতাই নয়, প্রথম পৃথিবীর কোনো সবুজ নগর সভ্যতা। বাস্তবিকই এখান থেকে কলকাতাকে বড়ো সুঠাম দেখায়। গাছ-গাছালির মাঝসাঝ দিয়ে কখনও দেখা দিতে দিতে কখনও দেখা না-দিতে দিতে এলিয়ে থাকে লেকের চিকচিকে চিকন বাহুলতা। লেকের ভেতরে দ্বীপ। সুন্দর অঙ্গদের মতো। শুনতে পাই লেকের জল আজকাল দূষিত হয়ে গেছে। তীরভূমির সুন্দর কোথাও বা নষ্ট হয়ে গেছে নোংরামিতে, মস্তানিতে। কিন্তু এত উঁচু থেকে সেসব বোঝা যায় না। সুন্দরটুকু আর সুঠামটুকুই চোখে ভেসে থাকে। চোখ থেকে প্রবেশ করে হৃদয়ে, মগজে। এমন একটা শান্তি ছড়াতে থাকে যে রাগ-ঝাল সব নিমেষেই হাওয়া।

দাদা বাড়ি এসেছে অফিস থেকে, অফিসে হয়ে থাকবে কিছু অপ্রিয় ঘটনা, হয়তো বা চোটপাটই! রাত হয়ে গেছে। সাড়ে ন-টা। টগবগ করে ফুটতে ফুটতে দাদা বেল দিচ্ছে ধরুন, বাড়ির চাবি তো দাদার পকেটেই ঘোরে। কিন্তু এসব সময়ে দাদা যেন চাবির অস্তিত্বটাই ভুলে যায়। সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে ন-টা পরের চাকরি তো! চুষে ছিবড়ে করে দেয় একেবারে। তাই বেলের ওপর অসহিষ্ণু আঙুল। আপনি দরজাটা খুলে যায়, যেন জাদু। 'বাবা! বাবা! বাবা!' টুটুল তার মিষ্টি কচি গলায় কলকলিয়ে ওঠে। পেছনে বউদির কোমল, অথচ জিজ্ঞাসু চালচিত্র। মুখে বলছে না—কেন এত দেরি! অথচ উদ্‌বেগ লেগে আছে চোখে, উদ্‌বেগ আর উদ্‌বেগ-মুক্তি। ঝপ করে অমনি পারা নেমে যায়। প্রথম দফায়। মাঝখানের টেবিলে ব্রিফবাক্সটা নামিয়ে সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে থাকবে দাদা। ভেতরে ভেতরে হাসি হাসি পাচ্ছে, কিন্তু এমন গোঁ যে এটাকে প্রকাশ করবে না। অফিসি-অশান্তির আঁচটা বউদি-টুটুলকেও পেতেই হবে। বউদি পায়। মুখের হাসিটা থিরথির করে কাঁপতে থাকে। হাসা ভালো না না-হাসা ভালো ঠিক করতে পারছে না বেচারি। কিন্তু টুটুলের

ভয় পেতে বয়ে গেছে। তার মনের ভেতরের খেলার মাঠে সদাই নির্ভার ছুটোছুটি। তাই সে বাবার গালের নাগাল না পেয়ে হাঁটুর ওপর, প্যান্টের জমিতেই চুমু দেবে। এমন মিষ্টি তার আওয়াজ, আর এমন চনমনে সেই চুমুর পেছনের চোখ আর ঠোঁটের কারসাজি যে দাদা তাকে কোলে টেনে না নিয়েই পারবে না। 'সন্টিপুটি! সন্টিপুটি! সন্টিপুটি!' দুজনে লুটোপুটি খাবে।

আমি আস্তে করে দাদার চোখ টেনে নিয়ে যাব সামনের দেয়ালে। যেন নদীর ঘাট। নীল-বেগনি-সাদা জলে চিকমিক। নীলচে সবুজ, সবজে নীল ছায়ায় নৌকো, অদূর দ্বীপ, সাঁকো, বেড়াচ্ছে মানুষজন। ছাব্বিশ বাই তেত্রিশ ইঞ্চির মতো হবে, ক্লোদ মনের আঁকা। এই একই ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছিলেন নাকি দুই শিল্পীই—মনে আর রেনোয়া। শান্তির দ্বিতীয় স্রোত মনের ওই নীল-সবুজ থেকেই এবার নামবে।

'একটু ঠান্ডা খাবে নাকি?'—কে বলল? বউদি?

ফ্রিজের দরজা খুলে যাবে। স্বপ্ন-আলোর মধ্যে থেকে ঝলক-ঝলক ঠান্ডা। গ্লাসে করে বরফ সাজিয়ে তার ওপর ঠান্ডা শরবত ঢালা হবে। হাসবে বউদি, বলবে, 'জলজিরা অন দা রক্‌স্।' একটু একটু চুমুক দিতে দিতে শরীর শিথিল হয়ে আসবে দাদার। মনের মধ্যে ঠান্ডা বইতে থাকবে। এরপর যা একটা মজা হবে না। দাদা আর টুটুল একসঙ্গে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে পড়বে। টুটুলটা একদম নাঙ্গা। তিড়িং তিড়িং করে উইচিংড়ের মতো লাফাবে। জলের পোকা তো ছেলেটা। এই গরমে ওকে যতবার খুশি শাওয়ারের তলায় দাঁড়াতে দাও কিছু হবে না। গ্রীষ্মের দিনে বাবার সঙ্গে এই রাত চান, তারপরে পাউডারে-পাউডারে সাদা হয়ে চারজনে খেতে বসা একটা মহা উৎসবের মতো ব্যাপার। নিত্য-নিত্য হলেও পুরোনো, একঘেয়ে হয়ে যায় না।

এইবারে আসরে নামবে মা। মায়ের এই অবতরণ এত সহজ যে বোঝাই যাবে না মা-ই আপাতত এ দৃশ্যের নায়িকা। ফরসা রংটা মায়ের। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে না—'দ্যাখো দ্যাখো আমি ফরসা। আমি ফরসা!' রোগাও না মোটাও না, খাটোও না লম্বাও না। মায়ের চুলগুলো পরিচ্ছন্ন বাঁধা থাকবে। একটি গাছিও নিজের অবস্থান ভুলবে না। বিকেলবেলায় টান টান করে পরা স্নিগ্ধ শাড়ি এখন একটু আলগা। অনুচ্চ গলায় মা ডাকবে—'কী রে? তোদের হল? খাবার দিচ্ছি।' চানের পরে একেবারে সাফসুতরো মেজাজ, দাদা আদুরে গলায় বলবে, 'মাম্মি ডিয়ার, মাম্মি ডিয়ার, কী রেঁধেছ আজ আমার জন্যে?' নিজের দেড়ো গালটা দাদা মায়ের প্রৌঢ় শিথিল গালে ঘষবে। বউদি হাসবে। ও তো জানে এই দেড়ো গালের ঘষাতে গাল কেমন ছড়ে যায়। গালের এই ছড়ে-যাওয়াটুকু ওরা শাশুড়ি-বউয়ে ভাগাভাগি করে নিয়েছে, রাগারাগি করে না! মায়েরটা ভোরের আলোর মতো। বউয়েরটা গোধূলির লালের মতো।

রাতের খাবারটা খুব সাদামাটা। টুটুলের ভালো-মন্দের কথা ভেবে বাছাই। কেননা এই সময়টাই একমাত্র টুটুল বড়োদের সঙ্গে খায়। প্রথমে একটা স্যুপ দেবে মা। এটা বউদি স্পেশ্যাল। কোনোদিন লাল টকটকে তাজা টোম্যাটোর, কোনোদিন হালকা চিকেনের জলের মধ্যে নুড়লরা জড়ামড়ি করে শুয়ে থাকে। কোনোদিন আবার বর্ণহীন তরলের ওপর কমলা, সবুজ, সাদা সবজির লেসের কারু। ফুলো ফুলো রুটি থাকে, হালকা-সেঁকা পাঁউরুটি থাকে। তা ছাড়া হয়তো একটা মাছের স্টু। সকালে দাদা শুক্তো খেয়ে যায়নি, কি পোস্ত খেয়ে যায়নি। দাদার ভাগ বাটিতে করে বসানো থাকবে। গরম, কিন্তু জিভ ঝলসায় না। রাতের গাঢ় ঘুমে ঢলবার আগে এই কুসুমকুসুম গরম খানা।

খেতে খেতে সামনের দেয়ালে চোখ পড়ে যাবেই। সেখানে লম্বাটে একটা এচিং। শিব-পার্বতীর মুখের মুগ্ধ ডৌল, লম্বা টানা যামিনী রায় চোখ, আর পার্বতীর চিবুকে শিবের, শিবের কাঁধে পার্বতীর অজন্তা-আঙুল।

দেখতে দেখতে দাদা ফট করে হয়তো বলবে, 'আচ্ছা মা, আমাদের আর্টে পুরুষকেও এমন মেয়েলি করে আঁকে কেন বলো তো?

এই এদের তক্কো শুরু হল। দেশের যাবতীয় জিনিস—তার শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পকলা, সংগীত-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য—সব দাদা লেন্সের তলায় রেখে রেখে দেখবে। এটা কেন? ওটা কেন? সেটা কেন? যেন কোনো গোয়েন্দা-সংস্থা ওকে মাথায় দিব্যি দিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেছে।

আমি কি অতশত জানি!—মা চট করে উত্তর দিতে চাইবে না। আসলে তর্কাতর্কি দিয়ে আবহাওয়াটা নষ্ট করতে চাইছে না। সারাদিনের মধ্যে এই একবারই তো।

তবু?

শুনেছি, সমঝদাররা বলেন আমরা বস্তু বা ব্যক্তি আঁকি না, ভাব আঁকি। এ ছবির মেজাজ খুব রোম্যান্টিক। দেখছিস না শিবের আঙুল আর পার্বতীর আঙুল একই রকম লীলায়িত।

তাই বলে শিবের মতো একটা জবরদস্ত পুরুষমানুষকে গোঁফ দাড়ি দেবে না। এই মিতালি, তুমি কিছু বলো!

বলব? —বউদি একটু একটু হাসবে।

বলতেই তো বলছি!

পুরুষের চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখা তো, তাই তাদের যা ভালো লাগে তেমন করেই সব আঁকাজোকা গড়াপেটা হয়।

এই এক ফেমিনিস্ট কচকচি শুরু হয় তোমার।

বলছিলাম না তো সেইজন্যে। ...বউদির চোখে অভিমান, একটু দুষ্টুমিও কি!

মা বলবে, মিতালি কিন্তু কথাটা খারাপ বলেনি। ভাববার মতো। টুটুল মাছটা খাচ্ছিস না? বেছে দিয়েছি তো!

টুটুল আসলে এখন ঢুলছে। সারা দিন স্কুল, সারা বিকেল খেলা, সারা সন্ধে পড়া-পড়া খেলা আর খেলা-খেলা পড়া। চোখ টেনে টেনে জেগেছিল সুদ্ধু বাবার জন্যে। বাবা, দিদু, মায়ের সঙ্গে একসঙ্গে বড়োদের টেবিলে, বড়োদের মতো করে খাবে। কিন্তু ওই গরমে রাত সাড়ে নটার চানটা তার সমস্ত স্নায়ু আলগা করে দিয়েছে। ঘুম এখন আঙুল বুলোচ্ছে তার কচি শরীরে। আয় ঘুম, যায় ঘুম।

সব ভালো, সব সুন্দর এদের। দাদার এই প্রশ্নগুলো, যখন-তখন ওই খারাপ লাগা, সংশয়, আর অসন্তোষ বাদে। কেমন ভয়-ভয় করে আমার। এত বিরক্তি ওর কীসের। বাবার কথা ভেবে?

কোনোদিন হয়তো হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই বলবে, পুরো দেড় ঘণ্টা জ্যাম একটা মিছিলের জন্যে, ভাবতে পারো! গাড়িগুলো চলছে কোনো লেন-টেনের বালাই-ই নেই। আমার বনেটে আজ প্রায় ভিড়িয়ে দিয়েছিল এক ব্যাটা ট্যাক্সি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে গোটা শহরটাই উন্মাদ হয়ে গেছে। সদ্য পালিয়ে এসেছে কোনো পাগলাগারদের গারদ বেঁকিয়ে।

খামোকা রাগ করে নিজের ক্ষতি করছ। এটা রিয়্যালটি! মেনে নাও।—বউদি বলবে।

রিয়্যালিটি নয়! অন্য অনেক সভ্য দেশ আছে পৃথিবীতে। এটাই অসভ্যতম, বর্বরতম দেশ। এগুলো এই দেশেরই 'রিয়্যালিটি'। তোমার আর কী! বাড়িতে বসে হাওয়া খাচ্ছ।

বাঃ, আমি বুঝি টুটুলকে নিয়ে স্কুল আসাযাওয়া করি না! বাজার হাট, দোকান, ব্যাংক, পোস্টাপিস এগুলো কি উড়ে উড়ে হয়?

হুঁ। ...দাদা কাগজটা তুলে নেয়।

কান পেতে শুনি দাদা ফোঁসফোঁস করছে। শুনতে পাই মায়ের বুক ঢিপঢিপ করছে। আস্তে

ধীরে ওঠে মা। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে। তারপর পেছন দিকের কমলা পরদাটায় কান ধরে দুদিকে সরিয়ে দেয়। ছেলের রাগে মায়ের রাগ, সেই ঝাল ঝাড়ছে মা পর্দার ওপর। পরক্ষণেই বুঝতে পারি শুধু রাগ নয়। গূঢ় উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে। কেননা, পর্দা সরাতেই ঝাঁপিয়ে আসে গ্রীষ্ম-সকালের এখনও তপ্ত না-হওয়া দক্ষিণে হাওয়া, অনেক নীচে বিস্তৃত সবুজের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ারা ঝলমলে হাসি হাসতে থাকে। এক ঝাঁক টিয়া খিরিশ গাছটার মাথা থেকে সবুজ বিদ্যুতের মতো দাদার চোখের আড়াআড়ি উড়ে যায়। আজ ওদেরও অফিসের বেলা হয়ে গেল।

কেমন স্তিমিত হয়ে যায় দাদার মেজাজ। চুপচাপ। আমি বুঝি কৃষ্ণচূড়ার সিঁদুরে লাল চারদিকের সবুজে মাখামাখি হয়ে সোজা ঢুকে যাচ্ছে ওর বুকের ভেতরে। টিয়াগুলোর বিদ্যুৎগতি ওর রক্তে ভালোলাগার ঝড় তুলেছে, চেয়ারে মাথা কাত করে বাবু বলে ওঠেন, 'সত্যি মা, এখান থেকে মনেই হয় না এই বদমাশ, ঠগবাজ, অসভ্য, নোংরা দেশটাতে আছি। ইউরোপে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হাইওয়ের ধারে কাছে রেস্ট হাউসের জানলা দিয়ে তাকালে এইরকমটাই দেখা যায় হয়তো! অন্তত ফটোগুলো তো তাই বলে।'

'কৃষ্ণচূড়াও?' —কেমন চাপা অভিমান মায়ের গলায়।

ওঃ হো হো, মাম্মি ডিয়ার, না কৃষ্ণচূড়া নেই, নেই তোমার ফেভারিট সপ্তপর্ণী। কোনো ফুল-টুল বড়ো বড়ো গাছের মাথায় দেখা যায় বলেও জানি না। ট্রপিক্যাল নয়তো। বেশির ভাগই পাতাঝরা গাছের বন। পাইন আছে, ফার, ওক, বার্চ, মেপল কতরকম। গাছেদের বিউটিও খুব কম নয়।

টুটুল কলকলিয়ে ওঠে, বাবা, ওদের টিয়া আছে? আয়রে আয় টিয়ে, নায়ে ভরা দিয়ে?

মনের দিগন্ত হাতড়ায় দাদা। চুপ করে থাকে। অন্যমনস্ক।

বউদি চায়ের কাপগুলো তুলে নিয়ে যায়। মা ছেলে কাগজের দুটো পাতা মুখের সামনে ধরে বসে থাকে। কী অত পড়ে ওরা? দূর বাবা!

টুটুল তার ট্রাইসাইকেলে চড়ে ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে ঘর ঘুরে বেড়ায়। স্তূপীকৃত খেলনা-গাড়িগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে তার ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যায়। হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে, 'অ্যাক্সিডেন্ট! অ্যাক্সিডেন্ট!'

বাঁকা চোখে ছেলের দিকে তাকায় দাদা। ভেতর থেকে বউদির গলা ভেসে আসে, 'টুটুল, চান করবে এসো। স্কুলের দেরি হয়ে যাবে-এ-এ।'

হঠাৎ দাদা চেঁচিয়ে ওঠে, 'তিনটে রেপ! দুটো তার মধ্যে গণধর্ষণ, বুঝলে মা?'

মা চুপ।

এ কী? এতগুলো অ্যাক্সিডেন্ট একেবারে শহরের মাঝ-মধ্যিখানে? ওনারা একে অন্যকে ওভারটেক করছিলেন। গেছে একটি কলেজ-তরুণী, একটা বাচ্চাছেলে আর তার মা, ছেলেকে স্কুলে দিতে যাচ্ছিল—এই তোমার মিতালি আর টুটুলের মতো।

খোকন!

মা, এটা পড়েছ? গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, এক রাজনৈতিক দল অন্য দলের সমর্থকদের। পুরো গ্রাম পুড়ে ছাই। এক ঠাকুমা আর তার চার বছরের নাতি বেগুনপোড়া—ছবি দিয়েছে ঠিক তুমি আর তোমার নাতির মতন।

মা থরথর করে কেঁপে ওঠে।

একটু চুপচাপ। তারপর দাদা আশ্চর্য হয়ে বলে ওঠে, 'বালিগঞ্জের বহুতলের নতলার ফ্ল্যাটে দম্পতি খুন? বাইপাসে জলার ধারে আবার জোড়া লাশ? মুণ্ডু নেই মা!'

তুই চুপ করবি।—মায়ের মুখ লাল হয়ে গেছে কষ্টে, ভয়ে, হতাশায়।

চুপ করব! চুপ করব কেন? রাস্তায় যেখান সেখান থেকে বাচ্চা, যুবক, প্রৌঢ়, তুলে নিয়ে যাচ্ছে—হয় প্রতিহিংসা নয় র‍্যানসম। আরও শোনো—আবার খ্রিস্টান খুন। নেতারা বলছেন—এ গুন্ডা বদমাশের কাজ। গুন্ডা বদমাশ বেছে বেছে খ্রিস্টানই শিকার করছে—অ্যাকর্ডিং টু দেম। হোটেলের ব্যাপারটা পড়লে? মিনিস্টাররা মিনি মাগ্না খেয়ে আর খাইয়ে হোটেলটাকে লাটে তুলে দিয়েছে। বিক্রি করতে চাইলে কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে, বলছে—বিক্রি করতে দেব না, কাজ-কাম করব না, বসে বসে খাব—এটাই মানুষের অধিকার।

বলেছে! এই কথা!

'বেসরকারিকরণ করতে দিচ্ছে না, সব কটা দলের ট্রেড্ ইউনিয়ন তাদের পেছনে। এর আর কী মানে দাঁড়ায়?'—কাগজটা হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় দাদা, যেন এভাবেই এইসব বিশৃঙ্খলা, খুন, দুর্ঘটনার সুরাহা হবে। মুখে তার আক্রোশ।

অন্য দেশও আছে মা। সভ্য, বাধ্য, অবর্বর।

মা কেমন গোঁয়ারের মতো বলে, 'ওখানে স্কুলে বাচ্চারা বন্দুক ছুড়ে ছুড়ে টিচার আর ক্লাসের বন্ধুদের মেরে ফেলছে। শুনিসনি? ভয়ানক নয়?'

দাদা যেন শুনতেও পায়নি। বলে, সরকারি হাসপাতালের ক্যাম্পাসে এখন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেআইনি কলোনি। হাসপাতালের তার থেকে হুক করে তাদের আলো, পাখা, হিটার সবই চলছে। রোগীদের খাবার থেকে চুরি করে ডেইলি খাওয়াটাও হয়ে যাচ্ছে মা। বিশাল অঙ্কের ইলেকট্রিক বিল মেটাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ, ওদিকে সদ্যোজাত বাচ্চাকে কুকুরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, শিশু পাচার হচ্ছে, এক বেডে তিনজন রোগী। ময়লা পরিষ্কার হয় না ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, সে সময়টা ওয়ার্ডবয়রা অবৈধ প্রেমের রোমাঞ্চ উপভোগ করে। সরকারি হাসপাতালের প্রোফেসর কাম চিকিৎসক স্বয়ংই চিকিৎসা পাননি। খবরট কদিনই...

'ওদের মেয়েদের বাবারা পর্যন্ত অ্যাবিউজ করে...' মা বলে।

মাইনর-রেপ তো এখানে জলভাত এখন। কেউ অবাক পর্যন্ত হয় না—দাদা বলে।

ওদের বাবা-মা ডিভোর্স হলে বাচ্চাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়—মা।

খেতে দিতে না পেরে এখানে বাবা-মা ছেলে বিক্রি করে দিচ্ছে, নিজের হাতে খুন করছে—দাদা।

ওদের প্রেসিডেন্ট নিজের অফিসে বসে...

একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার করে ওঠে দাদা—কী? কী বলতে চাও তবে তুমি! খুঁজে খুঁজে খারাপগুলো বার করছ কেন? মনুষ্যত্বের এই ইতর সর্বাত্মক অপমানের সাফাই গাইছ। মিনিমাম সিকিয়োরিটি নেই, মিনিমাম সততা নেই, মিনিমাম শিক্ষা-শৃঙ্খলা নেই। এদের সাফাই! অন্য দেশেও আছে, কিন্তু সেগুলো ব্যতিক্রম। এখানে সেটাই রীতি! তুমি স্বীকার করো, বা না করো।

বউদি ভেজা তোয়ালে হাতে ছুটে আসে। —'কী হল! চ্যাঁচাচ্ছ কেন? এ কী মা! তুমি কাঁদছ?'

টপ টপ করে জল পড়ছে মায়ের চোখ দিয়ে। ধরা গলায় বলল, 'এত কথা কেন বলিস? তুই তো জানিস ওরা তোর বাবাকে ফিরিয়ে দেয়নি।' গলা বন্ধ হয়ে যায়, আর কথা বলতে পারে না।

'দেখো তো কী করলে?' বউদি ধমকে ওঠে।

দাদা বলে, 'সরি মা। এক্সট্রিমলি সরি, কেঁদো না, আমি চানে যাচ্ছি।' তোয়ালে কাঁধে ফেলে উঠে গেল দাদা।

হ্যাঁ বাবা! বাবার কথা কি আর দাদার মনে আছে? সে তখন কত ছোট্ট! এই টুটুলের থেকে একটু বড়ো হবে হয়তো। মনেও নেই, অভাববোধও নেই আর। মা একাই তো ছেলেকে মানুষ করে তুলল। আর কত অল্প বয়স থেকেই দাদা সংসারের ভার নিতে শিখল। কোথায় গেল বাবা। কত দিন মানুষটাকে দেখি না। শুধু মনের গভীরে বিশ্বাস করি, সে আছে, কোথাও আছে। একদিন না একদিন আসবে। চৌকো কাঠামোর জোয়ান মানুষটা। যেমন বুদ্ধি তেমন জেদ। বিজ্ঞানী ছিল। পরমাণু বিজ্ঞান। মানুষটা ছিল এমনিতে খুব আমুদে, মিশুক। মায়ের সঙ্গে কত মশকরা, দাদার সঙ্গে কত খেলা। যেসব সহকর্মীরা বাড়িতে আসত তাদের সঙ্গেও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা তামাশা চলত। মুখটা আর ভালো করে মনে পড়ে না। চোখ, মুখ, নাক কেমন আবছা হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বটা মনে আছে। ঝকঝকে, ধারালো, কী আত্মবিশ্বাস। জানবার, জয় করবার কী অদম্য ইচ্ছা! জীবনের সব যুদ্ধ যেন জয় করে ফেলবেই।

বাগবাজার থেকে এখানে আসার পেছনেও তো সেই একই জেদ! একই উদ্যম। তা নয়তো তিন পুরুষের সেই বিরাট বাড়ি, তার উঁচু উঁচু ঘর, লম্বা-চওড়া দালানেও তাকে ধরল না কেন? কেন বাবা এখানে চলে এল, ছোটোভাইকে নিজের অংশটা ছেড়ে দিয়ে! এখানে নাকি বাবার একলার স্টাডি, একলার লাইব্রেরি, যতক্ষণ খুশি নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে। আর ইনস্টিট্যুটের ল্যাবরেটরি। এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যে। আমি জানি, এগুলো বাবার নিজের অর্জন। মুখে চুরুট ঝুলিয়ে বাবা ইনস্টিট্যুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ছুটির দিনেও কিছু মনে পড়েছে, বেরিয়ে যাচ্ছে—এমন কত দেখেছি। ছোটোখাটো সীমাবদ্ধ কাজ, সীমাবদ্ধ সময় নিয়ে বাবা সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। নতুন নতুন জ্ঞান আর নিত্যনতুন উদ্ভাবনের জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতেও বাবার আপত্তি ছিল না। তাই, সে ডাক যখন এসে পৌঁছোল, তাকে আর কিছুতেই আটকে রাখা গেল না। মায়ের নিজের বাবা অসুস্থ, মা যেতে পারবে না। দাদা সবে ভালো স্কুলে ভরতির সুযোগ পেয়েছে, তার কথাও ভাবতে হয়। তা ছাড়াও, বাবার কাজের যে ক্ষেত্র সে এক গোপন রণক্ষেত্রবিশেষ। সেখানে দারা-পুত্র-পরিবারের খুব একটা স্থান নেই। তবু বাবা যাবেই।—'চার-পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে'—বাবা মাকে বোঝাল। ছেলেকে আদর করল। তারপর চলে গেল। সেই চার-পাঁচ বছর এখন বিশ বছরে দাঁড়িয়েছে। এখন আর তার কোনো খবরই নেই। প্রথম প্রথম ফোন আসত, পিকচার পোস্টকার্ড আসত, আসল ঠিকানা নয় একটা বিশেষ ঠিকানায় চিঠি দিতে হত বাবাকে। বাবার উপায় ছিল না নিজের গোপন ঠিকানা জানাবার। তারপর একদিন সব চিঠি, সব খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষটা যে কোথায়, কেমন আছে, সেটা আর জানাই গেল না। মা সে সময়ে কাকাকে নিয়ে কনসুলেটে ধরনা দিয়েছে। খরচপত্তর করে পাঠিয়েছে সে মুলুকে। কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাবা নাকি সে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে? জানে না, কেউ জানে না।

আস্তে আস্তে মা শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত কর্তব্য করে যায় নিখুঁতভাবে। কিন্তু মনটার নাগাল আর কেউ পেল না। এত লোক আসে এত লোক যায়, মায়ের মনে কোনো দাগ পড়ে না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বলল, ভুলে যাও তাকে। অনেকে বলল—সে নিশ্চয় প্রতিরক্ষার কিছু গোপন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। আর তাকে আসতে দেবে না। একটা বিশাল শক্তিশালী দেশ, নিয়তির মতো। কঠিন দেয়াল এক। সে দেয়ালে মাথা ঠুকেও মা কিছু পেল না। মায়ের এখন একমাত্র দুর্বলতা ছেলে। ছেলেকে নিয়েই বেঁচে আছে মা। আঁকড়ে থাকেনি কোনোদিন। দাদা যেমন ইচ্ছে পড়াশোনা

করেছে, চাকরি নিয়েছে, যেমন ইচ্ছে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশেছে। কিছুতেই বাধা দেওয়া নেই। খালি ওই একটা নিষেধ। বিদেশ যাবে না। ইউরোপ হোক, অস্ট্রেলিয়া হোক, কোথাও না। আর মার্কিন দেশ! নাম শুনলেই মায়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়।

দাদা বিয়েও তো করল নিজের পছন্দে। এসব নিয়ে সাধারণত কত মনকষাকষি হয়ে থাকে। সেসব কিচ্ছু হল না। বউদি মানুষটাও কপালগুণে বুঝদার। তবে হাসিখুশি, উচ্ছল, মায়ের ঠিক উলটো।

প্রথম প্রথম বউদিকে খুব অপ্রতিভ হতে দেখেছি। 'মার কি আমাকে পছন্দ হয়নি?'—দাদাকে জিজ্ঞেস করেছে।

দূর, —দাদা বলেছে, —মায়ের কথা তো তোমাকে বলেইছি। তুমি তোমার মতো থাকবে।

কিন্তু, বললেই কি আর তা পারা যায়। কোনো কারণে খিলখিল করে হেসে উঠেই বউদি থতমত খেয়ে চুপ করে যেত। যেন কত অপরাধী!

একদিন মা আর বউদি খেতে বসেছে, মা হঠাৎ বলল, মিতা তোমার কি শরীর খারাপ?

না তো!

তবে মন খারাপ?

না মা।

আমাদের মা-ছেলের সংসারে কোনো সুর ছিল না। রং ছিল না মিতা। তুমি সেই রং আর সুর এনেছ। তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব নেই?

আছে তো!

তো তাদের একদিন ডাকো না, খাওয়াও, আড্ডা জমাও, হাসি-গান হইহল্লা।

মা সেদিন নিজে হাতে খাবারদাবার করল। বউদি ঘর গুছোল, ফুলটুল সাজাল। সেদিন দেখলাম, মা কত সহজে সব করছে। আড়ালেও থাকল না, ওদের মাঝমধ্যিখানেও রইল না, কিন্তু দেখলাম—কিছুই ভোলেনি মা, হাসি, গল্প, গান—কিচ্ছু না।

বন্ধুরা তো উচ্ছ্বসিত! সবাই চলে যেতে বউদি হঠাৎ মায়ের ঘরে এসে তার কোলে মাথা রাখল, দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, 'কোথায় এতদিন লুকিয়েছিলে মা!'

বউদির চুলে হাত বুলিয়ে মা বলল, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে/ দেখতে আমি পাইনি...'

তারপর ধীরে ধীরে এদের বাড়ির স্বভাবে একটা পরিবর্তন এল। মা-ও যেমন একটু খোলামেলা, হাসিখুশি হল, বউদিও রইল না আর অতটা হুল্লোড়ে। চমৎকার একটা ভারসাম্য আপনা থেকেই এসে গেল সংসারে। আর টুটুল আসতে তো সব কিছুই অন্যরকম। টুটুলের সঙ্গে মায়ের যত খেলা, যত গল্প-বলা, যত গান, যতেক আহ্লাদ। বাবা একেবারে হারিয়ে গেল।

জুন মাসের সেই শুক্রবারটা? উঃ! স্পষ্ট মনে পড়ে। দাদা যেমন বেরিয়ে যায়, গিয়েছিল। বউদি যেমন বাজার-হাট-ছেলের স্কুলের জন্যে বেরোয়, বেরিয়েছিল। অতিরিক্তের মধ্যে মা সেদিন দশটা সাড়ে-দশটা বাজতেই বাইরের পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে গেল, ব্যাগের মধ্যে কীসব কাগজপত্র ভরল, থলির মধ্যে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। মা যে একেবারে বেরোয় না তা নয়। বাজারেও যায়। দরকার হলে টুটুলকে আনতেও যায়। কিন্তু নিয়মিত নয়। সেদিন মা টিপটপ চুল বেঁধে, হাতে ব্যাগ, যেন অফিস যাচ্ছে।

তখন সন্ধে পেরোব পেরোব করছে, মা ফিরল। মুখ-চোখ ক্লান্ত। হতেই পারে, যা গরম! বউদিও তাই বলল, মা তোমার রোদ লেগে যায়নি তো।

মাথা নাড়ল মা। কাপড় বদলাল না। মুখ হাত ধুতে যেন ভুলে গেছে। নিজের ঘরেই বসেই রইল—ভূতের মতো।

বোমটা ফাটল রাত্তিরবেলায়। দাদা অফিস থেকে এসে সোজা মায়ের ঘরে।

এখনও এমনি করে বসে! মা তোমার টাকাটা কি ছিনতাই টিনতাই হয়ে গেল নাকি?

এফ. ডি. টা তুলতেই তো গিয়েছিলে?—বউদি জিজ্ঞেস করল।

মা নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বলল, সারা দুপুরটা বড্ড হয়রান হয়েছি রে। একবার বলে আগাম নোটিশ দিতে হবে, দিয়েছি বলে তার কপি দেখালে বলে আমাদের ফাইলে তো পাচ্ছি না, তারপরে বলে হলুদ ফর্ম লাগবে একটা, এখন নেই। পরে আসুন। আবার বলে, ওটা অটোম্যাটিক্যালি আবার ফিক্সড হয়ে গেছে। শেষকালে একজন হঠাৎ বলে উঠল—এতগুলো টাকা তো পাচ্ছেন মাসিমা, সবটা একা খাবেন? বোনপোদের একটু খাওয়াবেন না? তারপর অনেকে মিলে শুরু করল, মাসিমা কত ভালো, কত ধনী, কত উদার, ঈশ্বরের একেবারে কাছের লোক—এই করে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে নিল।

পাঁচ হাজার। তুমি দিলে?

মা বলল, টাকাটা তো গেলই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা ভদ্রলোকের ছেলে সব, অমন একটা জায়গায় কাজ করছে যখন শিক্ষা-টিক্ষাও আছে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরা স্বাভাবিক দেখতে। কিন্তু আমাকে যখন ঘিরে ধরেছিল, মনে হচ্ছিল একদল নেকড়ে আমার ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে। হিংস্র নখদাঁতগুলো যেন আস্তিনের তলায়, ঠোঁটের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিল, ক্রমশই কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে আসছিল, মাসিমা-মাসিমা করে। টাকার জন্যে এক্ষুনি যেন আমার গায়ে হাত বুলোতে শুরু করবে। খোকন, ঘেন্নায় আমি যে প্যাকেটটা হাতে উঠেছে দিয়ে এসেছি। আমার কেমন গা ছমছম করছে।

দাদা শান্তভাবে বলল, তোমার আজ করছে। আমার অনেক দিন ধরেই করছে মা। যে কোনোদিন দেখবে এখানে মাস মাইনেটা নিতে গেলেও ঘুষ দিতে হচ্ছে। হয়তো তুমি ঠিকই বলো। সবাই এমন নয়, 'কিছু কিছু'। কিন্তু এই 'কিছু কিছু'-ই সব কন্ট্রোল করছে।

দাদা যদি প্রচণ্ড রাগারাগি করত, ফেটে পড়ত, সে একরকম হত। কিন্তু আজ দাদা অসহ্য গম্ভীর, যেন একটা অন্ধকার, দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মতো। আমার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এইটাই আসল বোঝা। আমি স্পষ্ট বুঝি।

কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ব্যস্ততা। রেজিগনেশন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পাসপোর্ট, ভিসা, কেনাকাটা। সে এক হুলুটথুলুট কাণ্ড। এরই মধ্যে মায়েতে ছেলেতে চলেছে দড়ি টানাটানি। মা-ও কিছুতে যাবে না। ছেলেও কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। মা বলল, আমি নিজের মতো থাকব পোস্টঅফিসের টাকাটার সুদেই আমার চলে যাবে। হঠাৎ কোনো দমকা খরচ হলে তুই তো রইলিই। আমাকে আর টানাটানি করিস না।

দাদা বলল, আমাদের ছেড়ে, টুটুলকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?

খুব কষ্ট হবে, কিন্তু পারব।

খুব কষ্ট হবে! তা সেই খুব কষ্টটা করবে কেন শুধু শুধু? এত জেদ কীসের? এত জেদ ভালো নয় মা। আচ্ছা, তুমি না হয় পারলে। টুটুল! টুটুল পারবে?

এতক্ষণে মায়ের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। শিশুর মায়া বড়ো মায়া! মা ধরা গলায় বলল, বাড়ন্ত বাচ্চা, ভুলতে দেরি হবে না দেখিস!

ভোলবার আগেই যদি মনের কষ্টে ওর কঠিন কিছু হয়?

শিউরে উঠে মা টুটুলকে বুকে টেনে নিল।

আর এই মুহূর্তে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া টুটুলটা তার পাকা কথার ঝুড়িটা নামিয়ে দিল। মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল, দিদু, ও দিদু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না!

কোথা থেকে যে এসব কথা শেখে এরা! কিন্তু ও তো শুধু পাকা কথাটা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হৃদয়বিদায়ক কান্নাও কাঁদছে। অতএব মায়েরও পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট হয়, ওদের লাগেজের সঙ্গে মায়ের লাগেজও যোগ হয়। তারপর একদিন রাত নটা নাগাদ শক্ত করে টুটুলের হাত মুঠোয় নিয়ে একখানা টাটা সুমোয় উঠে যায় মা। দাঁতে দাঁত চেপে, ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। বউদিই বরং দেখি চোখ মুছছে, আবার জল পড়ছে আবার মুছছে। দাদার মুখটা কঠিন, কিন্তু শোকার্ত। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনটা উড়ে যায়।

চিৎকার করে উঠতে চাই। কিন্তু ওরা কি শুনতে পাবে? মূৰ্ছিত হয়ে পড়ি—ওরা দেখতে পায় না। যাক, তবে চলেই যাক। দেয়ালে দেয়ালে ছ্যাতলা জমুক, মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। পোকামাকড় আরশোলা ছুঁচো ইঁদুরের নিরঙ্কুশ রাজত্ব হোক ওদের সুখের সংসার।

বারান্দা দিয়ে এখনও দেখতে পাই। রবীন্দ্রসরোবরে স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে দৌড়োচ্ছে দলের পর দল খেলাপাগল কিশোর। সবুজের ছাপের ওপর খালি গায়ে ফুটবলে শট মারছে, ধবধবে পোশাকে কেতাদুরস্ত ক্রিকেট শানাচ্ছে। কবাডি খেলছে। লেকের জলে গ্রীষ্ম-বিকেলের পড়ন্ত আলোয় শুরু হচ্ছে রোয়িং, ওদের মধ্যে টুটুলকে কোনোদিন দেখতে পাব কি? ঘোর এপ্রিলে লাল হয়ে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, রঙ্গন। রাংচিতার পাতায় আলো ঝলকায়, শীতভর ফুটতে থাকে মরশুমি ফুল। রাত জমিয়ে জলসা হয়, দূরের বেতারে ভেসে আসে নতুন গায়কের নতুন গান, পুরোনো গায়কের মন কেমন-করা পুরোনো গান, হয়ে যেতে থাকে বইমেলা, শিল্পপ্রদর্শনী। আর সারাবছর ধরে খিরিশ গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ বিদ্যুৎরেখা ঝলসে, আপিসে বেরোয়, আপিস থেকে ফেরে স্বদেশি টিয়ার ঝাঁক। দেখতে পাবে না। শুনতে পাবে না মা, দাদা, বউদি।

ঝুল জমেছে সিলিংয়ের কোণে কোণে। মাকড়সারা অদ্ভুত চতুরালি দেখিয়ে জাল বুনছে, পোকা ধরছে, চুষে ছিবড়ে করে ফেলে দিচ্ছে। শুকনো পোকা আর নধর মাকড়সায় ক্রমে ভরে যায় সারা সংসার। কেউ নেই যে সে ঝুল ঝাড়বে, কেউ নেই যে কীটনাশক ছেটাবে।

তারপরে একদিন গুড়গুড় করে মেঘ ডাকতে থাকে। কালি নীলে ঢেকে যায় আকাশরেখা, প্রলয়ংকর ঝড় ওঠে। দড়াম দড়াম করে আছাড় খেতে থাকে বড়ো বড়ো গাছ। এগারো তলার ওপরেও শুনি সমুদ্রের হুহুংকার। দানব-হাওয়া ধাক্কা দিতে থাকে। দমাদ্দম শিলাবৃষ্টি হয়, আর শিলার ঘায়ে হুড়মুড়-হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে থাকে জানলার বারান্দার কাচ। বাস, আর বাধা কী? পরিত্যক্ত বাড়ি। বাইরের ঝড় নির্বিবাদে ঢুকে পড়ে অন্দরে। তাণ্ডব চলতে থাকে। মিছিলের ডাক, লাঠিচার্জ, গুলির আওয়াজ, উজাড় হয়ে যাচ্ছে নিঃস্ব মানুষ। জলে বিষ, আলো নেই, ভাইরাসের পর ভাইরাস আক্রমণ করতে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, এ. সি ঘরে চিংড়ি মালাইকারি আর রেশমি কাবাব, কুলচা আর কুলপির মিটিং, নতুন নতুন দুর্ঘটনা, নতুন নতুন ক্ষতিপূরণ, নতুন নতুন কর। রাজার তোষাখানার কৃষ্ণগহ্বর মরণটানে টেনে নেয় সব, চিহ্ন রাখে না।

শুয়ে থাকি। কাদায়, জলে, রক্তে, ক্লেদে থাবা রেখে শুয়ে থাকি। কত দিন, কত মাস, বছর যায়। মাঝে মাঝে ঝনঝন করে ফোন্ বেজে ওঠে। ওরা কি ফিরছে? ওরা কি আমার খবর নিচ্ছে? নাঃ, এ রং নাম্বার। তারপরে একদিন দরজার বেল বাজে। কে এসেছ ভুল করে! এ ঠিকানায় কেউ থাকে না। কেন আমাকে বিরক্ত করো? কী আশ্চর্য! দেখি আস্তে আস্তে শব্দ করে খুলে যাচ্ছে দরজা। আমার রোঁয়া ফুলে উঠেছে, গায়ে কাঁটা, বুঝি নির্ভুল আঙুলে সুইচ টিপছে কেউ। বাতি

জ্বলে ওঠে, ঝুল-জমা, ঝাপসা আলো। সেই আলোয় দেখি—বিকৃতদেহ দীনহীন ভিখারি এক। ক্লান্ত, বৃদ্ধ, যেন কত দেশান্তর, কত বিপর্যয়ের সমুদ্দুর পেরিয়ে এল, প্রত্যাশায় আকুল চোখ—ধুলো ময়লা, আবর্জনা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। একটার পর একটা দরজা খোলে, জানলা খোলে। আমি ফিসফিস করে বলি, বড্ড দেরি করে ফেলেছ বাবা, বড্ড। তোমার যদি এতদিনে সময় হল, এদের সময় ফুরিয়ে গেছে। এখানে আর কেউ তোমায় চিনতে পারবে না। ফিরে যাও যে সমুদ্দুর থেকে এসেছিলে সেইখানে। কিংবা এসো, এই ধ্বংসস্তূপে, এই সর্বনাশে, তুমি আর আমি, আমি আর তুমি ওতপ্রোত হয়ে শুয়ে থাকি।

মর্তৃকাম

দীপ্তটা মারা গেল। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দীপ্ত, আজকাল যাকে বলছে 'ভালো বন্ধু'। কোনো অসুখে-বিসুখে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এমনকি দুর্ঘটনাও নয়। মার্ডার। কোনো মৃত্যুরই কোনো সান্ত্বনা নেই। কিন্তু মাত্র বছর দুয়েক আগেই দীপ্তর ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। এমনও হয়েছে ছ-সাত রাত ওর জন্যে নীলরতনে ঠায় বসে আছি। মশার কামড় খাচ্ছি আর চমকে চমকে উঠছি। এই বুঝি কোনো খারাপ খবর এল...এই বুঝি...। এক এক সময় এমন হয় না? বাড়িসুদ্ধু আপনজন বন্ধুবান্ধব ভেতরে ভেতরে কাঁটা হতে হতে মড়াকান্না কাঁদতে তৈরি হয়ে যায়? তখন যদি দীপ্তটা সত্যি-সত্যি মারা যেত বোধহয় তৈরি ছিলাম বলেই মেনে নিতাম। বুকের ভেতরটা কিছুদিন হা-হা করত, চায়ের দোকান, ধাবা, মাঠ-ময়দান যেসব জায়গায় দুজনে কত ঘুরেছি সেখানে স্মৃতি হাঁ করে থাকত। ওর বাড়িতে থেকে থেকে খোঁজখবর নিতাম, মাসিমা কেমন আছেন? কোনো দরকার হলে নিশ্চয়ই বলবেন...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দীপ্ত দিব্যি ফিরে এল। সেই হালকা-পলকা দীপ্ত, কথার কথায় হঠাৎ চুপ করে যাওয়া, নীচু গলায় খিস্তি।

দুর্ঘটনায় মারা যাওয়াও ওর অসম্ভব ছিল না। কেননা শ্যামবাজার শ্রীরামপুর বাসে ও বালি থেকে উঠত, একদিন জি. টি. রোডে সেটা একটা লজঝড়ে বাসের সঙ্গে লেগে যায়। ঘ্যাচাং। ডান সাইডে যারা ছিল তাদের মধ্যে দু-তিনজন স্পট ডেড, বেশ কয়েকজন মারাত্মক জখম। দীপ্তও বসেছিল ডান দিকেই, শেষ সিটে। তেমন কিছুই হয়নি। একটু ফার্স্ট এড দিয়ে ছেড়ে দিল। সবাই বলল, 'লগনচাঁদা ছেলে, মঙ্গল খুব স্ট্রং, তা নয়তো আগে জখম, পাশে জখম, ওইভাবে বেঁচে যায়। ভাবাই যায় না।'

আজকাল লোকে বাসে-মিনিবাসে ওঠে প্রাণ হাতে করেই। ভালো করে চালাতে না শিখেই লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে সব, হাত দুরস্ত হতে না-হতেই বাস-ট্রাকের স্টিয়ারিং ধরছে। তা তখন যদি মারা যেত, বিরাট একটা কান্নাকাটি, দৌড়োদৌড়ি, বুক চাপড়ে ভাগ্যকে অভিসম্পাত, মর্গ...এইভাবে শেষ হয়ে যেত ব্যাপারটা। বাস কোম্পানি থেকে ফ্যামিলিকে ক্ষতিপূরণ দিত কিংবা দিত না। ফ্যাক্টরিতে ওর বোনকে একটা চাকরি পাওয়াবার জন্যে তদবির করতাম। মেয়েটা সবে সাবালক হয়েছে, কোনো ট্রেনিং নেই বলে ওরা গাঁইগুঁই করত। আমরা লড়ে যেতাম। কিন্তু মঙ্গল স্ট্রং। বেঁচে গেল। সবাই বলল, ছেলেটা দীর্ঘায়ু হবে। আমার মনে আছে, দীপ্ত বলেছিল, দীর্ঘায়ু না দ্রিঘাংচু? মাঝেমাঝেই মাসিমাকে বলত, অত হাঁকপাঁক করো কেন বলো তো? দেখলে, তো শালা ম্যালিগন্যান্ট আমার কিস্যু করতে পারল না। অ্যাকসিডেন্ট? সিনে নেই। কী রে জয়, কী বুঝছিস গুরু?

মুখে কিছু আটকায় না? মাসিমা রাগ করে বলতেন, ওভাবে বলতে নেই। গ্রহ কুপিত হন।

মাসিমার সামনে এই। আমাদের সামনে আবার দীপ্ত অন্য মানুষ। তখন বলত, কী করা যায় রে জয়, কিছু বল?

কীসের কী?

দেখছিস তো চারদিকে কী অবস্থা! একেবারে নো-হোয়্যার হয়ে আছি। এক মুহূর্ত ভাল্লাগছে না। শালারা বাবাটাকে ফুটিয়ে দিলে। মাথার ওপরে কেউ থাকার সোয়াস্তি কী জীবনে জানলাম না। মুখ শুকনো বিধবা মা, বোনটা কালো, কত দূর পড়াতে পারব, পারলেও কোনো হিল্লে হবে কি না...তুই কিছু ভাবিস? তোর অবশ্য বাপ আছে।

তেমনি দুটো বোন, একটা ভাই এখনও স্কুলে। তবে কী জানিস, আমরা যা হোক করে চালিয়ে নিচ্ছি। চারপাশে লোক দ্যাখ—ধুঁকছে। তাদের তুলনায়...

একটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। ধরুন চৌরঙ্গি এলাকায় সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। জ্যাম জমাট একেবারে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। সড়সড় সড়সড় করে কিছু ভিখিরি এঁকেবেঁকে গাড়িগুলোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। কার কোলে রিকেটি ছেলে, কার একটা হাত কাঠের মতো, কার গাল এমন ভাঙা, চোখ এমন গর্তে ঢোকা যে মনে হয় এই বুঝি শ্মশান থেকে উঠে এল। বাচ্চা ছেলে, করুণ মুখে পয়সা চাইছে, একটা গাড়ির কাচ নেমে গেল, কোনো মহিলা কিছু দিলেন। গাড়ি চলে যেতেই ছেলেটা ষাট-বছুরে বুড়োর মতো মুখ করে ভ্যাঙালে, ভিক্ষে পছন্দ হয়নি।

এই দৃশ্যগুলো আমরা লোলুপ চোখে দেখতাম, ঠিক যেমনভাবে কাঙালরা সুখাদ্য দেখে—শিককাবাব, গলদা চিংড়ির কালিয়া, মটন দো পিঁয়াজা। দীপ্ত বিড়বিড় করত—ঠিকই, এর চেয়ে বোধহয় ভালো। আমি বিড়বিড় করতাম—আমাদের চেয়েও খারাপ।

দীপ্ত বলত, টপ করে লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেলে আর সব গাড়িগুলো এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে, এইসব ভিখিরিগুলো তো পিষে যাবে রে জয়!

আমি বলতাম, রাস্তা ভরতি ধর থকথকে রক্ত...

রাস্তা ভরতি ধর থ্যাঁতলানো মড়া...

কেউ কি বাঁচবে?

অসম্ভব। কেউ না।

আর গাড়িগুলো?

কয়েকটা পড়ি-মরি করে পালিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু বাকিগুলোতে জনগণ নির্ঘাত আগুন ধরিয়ে দেবে। টেনে নামাবে ড্রাইভারগুলোকে। মার মার বেদম মার।

পুলিশ আসার আগেই ফুটে যাবে।...হাসতাম আমি।

শুধু ড্রাইভার? মালিকগুলো!

ঘাবড়াচ্ছিস? বেশির ভাগই নিজেরা ড্রাইভ করে। আর পেছনে হেলান দেনেওয়ালারা? পার পাওয়া অত সোজা নয়! রেমন্ডের স্যুট, এক্সক্যালিবারের শার্ট, নাইকির শু...কিস্যু করতে পারবে না। গণপিটুনির পর কে বড়োসাহেব আর কে ছোটোসাহেব ধরতেই পারবি না। পেট্রোল ট্যাংকে কেউ ধর একটা বিড়ি ফেলে দিল। ব্যস সব কাঠকয়লা। ছুঁ মন্তর ছুঁ মন্তর ছুঁ মন্তর ছুঃ।

দুজনে খ্যা খ্যা করে হাসি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওরকম কিছু ঘটে না। ভিখিরিগুলো ম্যাজিক জানে, কিংবা ওদের বডিগুলো হাওয়া দিয়ে তৈরি। এ গাড়ির বনেট, ও গাড়ির বাম্পার, সে গাড়ির বডির পাশ দিয়ে দিয়ে ভানুমতীর খেল দেখাতে দেখাতে ঠিক বেরিয়ে আসে সব। গাড়িগুলোও এঁকেবেঁকে, কায়দা করে পাশ কাটিয়ে আবার অন্য কোনো মোড়ে সিগন্যাল খাবার জন্যে হুশ হয়ে যায়। ঠিক যেমন ম্যালিগন্যান্ট বা অ্যাকসিডেন্ট টপকে বেঁচে থাকে দীপ্ত, বেঁচে থাকি আমি।

দীপ্ত আসে শ্রীরামপুর থেকে, আমি শ্যাওড়াফুলি। নিজেদের মধ্যে আমরা বলি বিশ্রীফুলি, আর শ্যাওড়াপেতনিপুর। কারখানায় যাই, খোঁচা-দাড়ি খাড়া চুল হাজিরাবাবুর খেরোর খাতায় সই করি—দীপ্ত সমাদ্দার, রফিক আসলাম, বিহারীলাল পান্ডে, মহম্মদ বেণু, ইসমাইল খাদির শেখ...।

এক মাস মান্থলি আমার, পরের মাসে দীপ্তর। একজনই পকেট থেকে একটু বার করি, বলি, 'আমরা এক সঙ্গে দাদা, ডেলি।'

এখন চিনে গেছে। কেউ আর ওসব দেখা টেখার ঝামেলায় যায় না। দীপ্ত বলে, 'পুরনো পাপী' বুঝলি তো? দাগি হয়ে গেছি।

ট্রেনে কারও হাতে বাংলা কাগজ থাকলে তাক বুঝে ছোঁ মারি।—দাদা ওই মাঝের পাতাটা, পাঁচ নম্বর, পাঁচের পাতা।

বিরক্ত হয়, তো হোক, বয়ে গেল। কাগজ খুলে খুঁজে খুঁজে দেখি—জমজমাট খবরাখবর আছে কি না। যেমন ধরুন নস্কর লেনে দোতলা বাড়িতে গৃহিণীহত্যা, রক্তগঙ্গা, আলমারি খোলা, উদ্দেশ্য ডাকাতি। কিংবা বেহালা পর্ণশ্রীতে গৃহবধূর আত্মহত্যা, গলায় দড়ি। দড়ির দাগ বসেনি, জিভ ঝোলেনি, সন্দেহ—খুন। মহিলার স্বামী ও তাঁর বান্ধবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বোবা-কালা কিশোরী পুলিশবাবুরাকে ধর্ষিত, ডাক্তারি পরীক্ষা হচ্ছে। অপরাধী বলে এখনও কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। নিরুদ্দিষ্ট ডাক্তারের মৃতদেহ পুকুরধারে, কাদার মধ্যে পোঁতা, আগের রাতে সহকর্মির বাড়ি নেমতন্ন ছিল। শালবনিতে ডাকিনী সন্দেহে বৃদ্ধাকে খুন। কালাহান্ডিতে অপহৃত বালকের ছিন্নমুন্ড দেহ রঘুনাথপুরে, সন্দেহ নরবলি। প্রকাশ্য রাজপথে গণধর্ষণ ও হত্যা। ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে যুবতির মৃতদেহ, সন্দেহ ধর্ষণ ও হত্যা, বালক-চাকরকে চোরের মার দিয়ে, ঘরে বন্ধ করে রেখে দম্পতি হাওয়া বদলাতে উধাও। প্রোমোটার খুনের চক্রান্তে জড়িত সন্দেহে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি ফেরার হবার চেষ্টায় ছিলেন।

দীপ্ত আমাকে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে, 'কী রে জয়, খুনটুন করলেও তো বেশ আপনি আজ্ঞে পাওয়া যায় রে! খবরের কাগজওয়ালারা তো খুব খাতির করে!'

যা বলেছিস। মহিলার স্বামী ও 'তাঁর' বান্ধবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, 'তিনি ফেরার হবার চেষ্টায় ছিলেন'।...

আমাদের উল্লাস দেখে পাশের লোকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। 'কাগজটা কি আপনাদের দেখা হয়ে গেছে?' শুকনো গলায় বলে।

নিশ্চয়, নিশ্চয় সার। চুম্বুক মানে চুম্বকটুকু পড়ে নিয়েছি, নিন্ ধনিয়বাদ দাদা।

ঠিকাছে, ঠিকাছে।

সেই দীপ্তই খুন হয়ে গেল।

খবরটা কাগজেই পড়ি। লোক্যাল চায়ের দোকানে গিয়ে জম্পেশ করে একটা ডবল-হাফ আর একটা সর্ষের তেলে ভাজা ওমলেট আমার রোববারের মেনু। সঙ্গে কাগজ। কাগজটা হাতবদল হতে থাকে। এই কাগজের লোভেই যে অনেক খদ্দের তার ধরা দুধের চা খেতে আসে চা-ওয়ালা তারক তা বিলক্ষণ জানে। রোববারে কাগজে কাগজে ছয়লাপ। লোকে বলে 'পেপার'। একখানা 'পেপার' পেয়ে যাবার কোনো অসুবিধে নেই। প্রথম পাতার বাঁ দিকে লম্বা কলমটায় দেখি 'ব্যান্ডেল ল্যোকালে যুবা খুন'। আবার 'যুবা'! আমি শব্দ করে হাসি। যুবাই বটে, যুবা কি এখনও আছে না কি? এখন সব ছেলেছোকরা ছ্যামরা মদ্দ, আধবুড়ো, সিকিবুড়ো। 'যুব্বা!' তা তিনি কেমন খুন হয়েছেন দেখি। যদি নতুন কিছু হয়।

লাস্ট ট্রেন সাইডিংয়ে নিয়ে যাবার সময়ে কিছু কিছু কর্মী লক্ষ করেন একটি কামরা থেকে লাল জল বেরিয়ে আসছে। বড্ডই লাল, জমাট মতো, তখন কামরায় উঠে দেখা যায় এক যুবা, পরনে ছাই রঙের শার্ট এবং খাকি প্যান্ট, গলার নলি ও কবজির শির কেটে দেওয়া হয়েছে কোনো সূক্ষ্মধার অস্ত্র দিয়ে। অস্ত্রটি ঘটনাস্থলে পাওয়া গেলে এটি আত্মহত্যার কেস বলে সাব্যস্ত হত। কিন্তু অস্ত্রটি পাওয়া যায়নি। কবজি, গলা কেটে অস্ত্রটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেবার সম্ভাবনা অবশ্য উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। বডি পোস্টমর্টেমে যাচ্ছে। আশ্চর্য যুবাটির পকেটে কিছুই পাওয়া যায়নি, টিকিট—দৈনিক বা মান্থলি, কোনো টাকাপয়সা বা মানিব্যাগ, হাতে ঘড়ি নেই। কোনো ভাবেই শনাক্তকরণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। দেখে মনে হচ্ছে না, কিন্তু সে কি কোনো কারণে অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছিল?

চিহ্ন পাওয়া যায়নি তো ছবি দে! বিরক্ত হয়ে বলি। একটা কাজ যদি এরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে! যখন পচে-গলে যাবে তখন দিবি বোধহয়। আরও কতকগুলো খুন, সুইসাইড, ধর্ষণের ঘটনা পড়ি নিয়মমাফিক। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি চলে যাই। কেননা যাবার পথে বাজারটা করে নিয়ে যেতে হবে। বেশি সকাল সকাল গেলে মাছ আগুন, বেশি বেলা করে গেলে বেগুন। অর্থাৎ পচা-পাচকো।

দেখেশুনে গোটা দুই ফলুই মাছ কিনি। কড়া করে ভাজলে কাঁটা টের পাওয়া যায় না। রোজ রোজ মাছের তেল-কাঁটার চচ্চড়ি কিংবা তেলের বড়া খেতে খেতে মুখ পচে গেছে।

আপিসের দিনে কাক-চান, জলও থাকে না তেমন। আজ একেবারে গলির মোড়ে টিউবওয়েলের তলায় বসে পড়ি। লাল সাবান মেখে জব্বর চান। বাড়ি গিয়ে এখন একটু আয়েশ করব, গায়ে পাউডার ছড়িয়ে একটা ফতুয়া আর লুঙি, তেল-মাখা চুলে যত্ন করে টেরি কাটব। তারপর ফলুই মাছের কড়া করে ভাজা মাখো-মাখো ঝাল দিয়ে মুশুর ডাল আর আলুপোস্ত দিয়ে এক থালা ভাত, তারপর বাড়ির একমাত্র তক্তপোশটা দখল করে নিয়ে দিবানিদ্রা। তা সেই দিবানিদ্রারই আয়োজন করছি এমন সময়ে রুখু চুল, শুখো মুখ, লাট খাওয়া সালোয়ার-কামিজ আর হাওয়াই চপ্পল পায়ে শিপ্রা এসে হাজির।

ভাই খুলে দিয়েছিল। এসে বলল, 'দাদা, কে এসেছে, একজন মেয়ে, বাইরে এসে দেখে যাও!'

মেয়ে? আমার কাছে? মেয়ে-টেয়ে আমার কাছে আসবার মতো তো কেউ নেই! আওয়াজ-ফাওয়াজ দিলে অনেক সময়ে মেয়েরা খুব পটে যায়। ওটা এক ধরনের খোশামোদ। ওরা জানে। আমার তোমাকে খাসা লাগছে, বুঝলে মেমসাব, তো সেই পুলকটাই এইভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে দেখাচ্ছি! এটা বোঝে বলেই রাগতে রাগতে ঠোঁটের কোণে একটু প্রশ্রয়, চলাফেরায় একটু ময়ূরী ময়ূরী ভাব ফুটে ওঠে। তো আওয়াজ-ফাওয়াজ দেওয়া তো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। এখন আবার রোববারের দুপুরটা মাটি করতে কোন্ মাধুরী এলেন!

উঠে দাঁড়িয়েছি, শিবানী, আমার বড়ো বোন, শিপ্রাকে নিয়ে ঢুকল।

আরে শিপ্রা? কী ব্যাপার? হঠাৎ? এখন?

শিপ্রা লালচে চোখ মেলে বলল, দাদা কাল বাড়ি ফেরেনি।

বাড়ি ফেরেনি? দীপ্ত? সে কী! কালকে ওর ওভারটাইম ছিল অবশ্য, তা কোনো খবরও দেয়নি?

আপনি...মানে আপারও তো ওভারটাইম...আমরা ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোনো খবর পাব।

আমি কালকে ওভারটাইম করিনি শিপ্রা। ছুটি হতেই ডাক্তারখানা, এইসা ভিড় না। মায়ের জ্বর হচ্ছিল...। দ্যাখো, আরও কিছুক্ষণ...হয়তো কোথাও আটকে গেছে। হয় এসে যাবে, নয় খবর দেবে।

কী করে খবর দেবে? পাশের বাড়ি থেকে আজকাল আর আমাদের মেসেজ দেয় না। আর আটকে কোথায় যেতে পারে! তেমন কোনো জায়গা আছে? বলুন না, তাহলে খোঁজ নিই।

কী করে আর বন্ধুর বোনকে বলি রাত্তিরে আটকে যাওয়ার একটাই জায়গা আছে আমাদের মতো আত্মীয়-বন্ধুহীন ছোকরাদের। হয়তো দীপুটা সেখানেই...

আমার বড্ড ভয় করছে জয়দা, আমার সঙ্গে একটু যাবেন?

ঘড়িতে দেখি দেড়টা। এখনও পর্যন্ত ফিরবে না? যে চুলোতেই যাক!

মা বড্ড কান্নাকাটি করছে, যদি একটু...যদি পুলিশে খবর দিতে হয়...

বিকেল অবধি অপেক্ষা করবে না?

কখনও এরকম হয় না জয়দা। কখনও...

এটা কিন্তু একদম শতকরা শতভাগ সত্যি। আমরা একশো ভাগ ভদ্রবাড়ির ছেলে, যেমন করেই হোক বি. এ-টা পাস করেছি। দীপুর বাবা ছিলেন লোক্যাল স্কুলের হেডমাস্টার। শুনেছি ওঁর বিরোধী গ্রুপ ওঁকে কায়দা করতে না পেরে ওঁর বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ আনে। জামিন পাবার আগে দু-দিন হাজতবাস করতে হয় ওঁকে, হাই ব্লাডপ্রেশার ছিলই, স্ট্রোক হয়, এক ঘায়েই শেষ। যখন এ ঘটনা ঘটে, দীপু তখনও স্কুলে। কাজেই যেভাবে লেখাপড়ার কথা ছিল, সেটা হয়ে ওঠেনি, মা-ও খুব শোকগ্রস্ত ছিলেন বহুদিন। তাই বলে ভদ্র হোয়াইট-কলার ছাপটা যাবে কোথায়? আমার বাবা আবার সরকারি আপিসে কলম পেষেন। যতই হোক সরকারি চাকরি। একটা খাতির আছে। সন্তান সংখ্যা একটু কম রাখলে আর একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। তবে আমার বোনেরা, ভাই সব—পড়াশোনা করে, বাজে সঙ্গে মেশে না, একটা নিয়ম-নীতি আছে চাল চলনের। যেমন আমরা মা-বাবাকে তুমি করে বললেও অন্যদের কাছে যখন উল্লেখ করি 'আপনি' করে বলি। দীপু বলে, আমার 'বাবা মারা গেছেন' আমি বলি, 'মা ডাকছেন'। খিস্তি ফিস্তি সব চৌকাঠের বাইরে রেখে বাড়ি ফিরি। বাজার করি, আত্মীয় কারও অসুখবিসুখ করলে মা খোঁজ নিতে পাঠান। মুখ মুছে ভিজে বেড়ালটির মতো যাই। বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময় আছে। বড়োদের সামনে ফুঁকি না। কাজেই শিপ্রা বলতেই পারে, 'কখনও এ রকম হয় না জয়দা, কক্ষনও।' এবং আমিও ওর উদ্‌বেগ চিন্তা বুঝতেই পারি।

মাকে বলে চটপট জিনসটা গলিয়ে নিই, আর সেই সময়ে হঠাৎ কেন যেন একটা কথা মনে আসে। 'শিপ্রা-আ', ঘর থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, 'দীপু কী পরে গিয়েছিল রে কাল?'

কেন, আপনার মনে নেই?

আছে। কিন্তু রোজ রোজ নিজেদের খাড়া-বড়ি-থোড় জামাকাপড় কে-ই বা অত খেয়াল করে। তাই নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করি, 'বলই না।'

খাকি প্যান্ট, আর ছাই-ছাই রঙের শার্ট।...

ঠিক, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। খাকি প্যান্ট, আর ছাই রঙের শার্ট।

ভেতরটা গুড়গুড় করছে, হঠাৎ কেমন শীত করে কাঁপুনি এল। কাঁপা কাঁপা গলায় শিপ্রাকে বললাম, চল!

সেদিন সন্ধের খবরই দু-তিনটে চ্যানেলে ছবিটা দেখাল। চোখ বুজে শুয়ে আছে দীপু। গলার কাছটা জমাট রক্ত। মুখটা ইতিমধ্যেই একটু ফুলে গেছে। যেন মৃত্যুর মধ্যেই দীপুর স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।

ছোট্ট সাদা-কালো টিভিতে ছবিটা দেখাতেই আঁক করে উঠলেন মাসিমা, আঁ ক দ্বিতীয়বার, তারপর একেবারে অজ্ঞান। শিপ্রা যেন পাথরের মূর্তি, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে আমি শিপ্রাকে নিয়ে লোক্যাল থানাতে ঘুরে এসেছি। ও.সি. আশ্বাস দিয়েছেন—খোঁজখবর করছেন, কতকগুলো রুটিন প্রশ্ন করে নিয়েছিলেন।

কোনো পার্টি, মনে পলিটিক্যাল পার্টিতে...

না স্যার, ফ্যাক্টরিতে থাকলে একটা ইউনিয়নে চাঁদা দিতেই হয়, ব্যস।

কোনো শত্রু?

আমার অত দুঃখেও হাসি পেয়ে যায়, দীপুর শত্রু? আমার শত্রু? তার চেয়ে যদি জিজ্ঞেস করতেন, 'কোনো বন্ধু আছে?'—তাহলে সহজে উত্তরটা দেওয়া যেত।

শুনুন স্যার, আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের শত্রুও থাকে না মিত্রও থাকে না।

দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিলেন অফিসারটি, এমনিতেই মুখটা বিকৃত হয়েছিল, এখন একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দেবে ছোকরা।'

হাসি পায়, এই তো পথে এসেছ, যুবা-টুবা তরুণ-ফরুন নয়। ছোকরা। স্রেফ ছোকরা। শিপ্রা থাকায় আমি যথেষ্ট সংযত থাকি।

রাগ করছেন কেন স্যার, আমরা বড্ড উদ্‌বিগ্ন।

উদ্‌বিগ্ন লোকেরাই এখানে আসে। খিঁচোতে হলে পাড়ার এম. এল. এ-কে খিঁচোও, কাউন্সিলরকে খিঁচোও। আমরা তোমাদের কাছে ভোট চাইতে যাব না, বুঝলে হে? ছ্যাঁচড়া একটা চাকরি করি। মাইনে পাই, ডিউটি করি, ডিউটি মাঝরাত্তিরে কলার ধরে টেনে আনে। বুঝলে?

বুঝেছি, স্যরি স্যার।

শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, লভ অ্যাফেয়ার! পিরিত নাকি? ট্রায়াংগুলার?

শিপ্রা কেঁদে ফেলে। আমি বলি, ও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির আপন বোন, বাড়ি ফেরেনি বলে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আর কেউ তো নেই!

এমন করে বলি, যেন আমার অস্তিত্বের জবাবদিহি দিচ্ছি। তাতে লোকটি খুশি হয়।

যাই হোক, দীপুর মুখটা দেখব আশঙ্কা করেই টিভি-টা খুলেছিলাম। সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে গেল। খাকি প্যান্ট আর ছেয়ে শার্ট হাজারও লোক পরতে পারে, কিন্তু এই খাকি-ছেয়ে নির্ভেজাল আমাদেরই।

জমাদারদের নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে লাশ ছাড়াতে হল। কী অদ্ভুত যুক্তি ওদের। জিনিসপত্তরের দাম হু হু করে বাড়ছে বাবু, দিতে বলছি ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিন।

আ রে। এটা তো তোদের পাওনা-ই নয়। —জয়ন্তদা বলল, পাওনা? পাওনার কপালে ট্যাঁড়া। খুশি হয়ে দ্যান সবাই।

খুশি হয়ে? ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধু অপঘাতে মারা গেছে, খুশি হয়ে? বলছিস কী?

ওই হল। জেবন আজ আছে কাল নেই। জেবনদারদের তো পেটে খেতে হবে! চাঁদা তুলে কোনোক্রমে পাঁচশো জোগাড় হল। কিছুটা আমার পকেট থেকে। ওই গড়ের মাঠ থেকে যে কী করে এত মাল বেরোলো সে আমি জানি, আর আমার পকেট জানে।

কাজকর্ম হয়ে গেল। শিপ্রার জন্যে চেষ্টা করছি, তবে নেহাত শুকনো কারখানায় ও কী-ই বা চাকরি পেতে পারে। সবে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। এখনও কলেজ-টলেজ শুরুই হয়নি।

একটাই ভালো সব মন্দর মধ্যে। পুলিশ হাল ছাড়েনি। খুনিকে ওরা খুঁজে বার করবেই। আমাদেরও মধ্যে কথা হয়—শিপ্রা, আমি, শিবানী, পাড়ার শঙ্কর, জয়ন্তদা, 'দীপ্ত? দীপ্তকে কে মারবে? কেন মারবে?' জয়ন্তদার উদ্যোগ উৎসাহ বেশি, বললে, 'পুলিশ করছে পুলিশের মতো। আমরা ইনভেস্টিগেশন চালাব আমাদের মতো। রাজি জয়?'

রাজি।

তবে আমার এটাই আশ্চর্য লাগে. দীপ্তটা যখন জলজ্যান্ত ছিল, তখন ওর সেই জ্যান্ত শরীর মনের খবরাখবর কেউ রাখত না। এখন, যে মুহূর্তে ছেলেটা মার্ডারের লাশ হয়ে গেল—দরদ, হাহাকার, বিস্ময়, ন্যায়বিচার পাবার রোখ সব যেন প্রতিযোগিতা করে করে বেড়ে যাচ্ছে এদের মধ্যে। লাশ ছাড়ানোর সময়ে বিশ-পঁচিশ টাকা দ্যাখ না দ্যাখ বেরিয়ে এল এ-পকেটে ও-পকেট থেকে। যেন লাশটা দেখবার জন্যে সব হন্যে হয়ে আছে। ব্ল্যাকে টিকিট কাটছে। আমার মনে আছে, দগদগে হয়ে মনে আছে। এই মস্তানরা কখনও একটা চা কি সিগারেটের দাম চুকিয়ে দিয়ে, কিংবা পাঁচটা টাকা ধার দিয়েও আমাদের উপকার করেনি। বলতে কী আমাদের ছোট্ট এরিয়ার দীপ্ত সমাদ্দার স্রেফ খুন হয়ে একটা সেলিব্রিটি হয়ে গেল। শিপ্রা, মাসিমার শোকে ফোলা মুখের ছবি বেরিয়েছে মেলাই কাগজে। কোনোটাতে কোনোটাতে আমিও এক কোণে আছি, মুখ দেখানোর কমম্পিটিশনে প্রায়ই গোহারান হেরে গেছি। পাশের বাড়ির জবা বউদি, ছায়া মাসিমা, পাড়া-মস্তান মিঠুন, কয়লা, প্রতিবেশী শঙ্কর, জয়ন্তদা—সব্বাইকার মুখ দিব্যি ফোকাসে এসেছে। শোক-থমথম ফটো সব। মহিলারা কেউ মাসিমাকে জড়িয়ে আছেন, কেউ শিপ্রাকে বুকে টেনে নিয়েছেন, ফলে শিপ্রার চুল আর হাত ছাড়া কিছুই আসেনি, এসেছে ছায়া না কায়া-মাসিমার পুরো গোল মণ্ডুখানা। ঠিক সিরিয়ালের মতো পোজ দিয়েছেন। কাঁধে শিপ্রা মুখ-লুকানো, ছায়া ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, ক্লোজ-আপ।

হাসিও পায়। কান্নাও পায়। দীপ্তটা মার্ডার হবার আগে যদি জেনে যেত এত লোকে ওদের ফ্যামিলির বন্ধু, একটু নিশ্চিন্তে মার্ডার হতে পারত।

মাস তিনেক কেটে গেছে। হাঁফ ছাড়া গেছে একটু কেননা, রেল, ভারতীয় রেল স্বয়ং কী মনে করে শিপ্রা সমাদ্দারকে চাকরি দিয়েছে। মাইনে সামান্যই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি তো! মাসিমা একটা রান্নার কাজ ধরেছেন। আর কী-ই বা একজন আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশে গরিব বিধবা করতে পারেন। আমি একটু ক্ষীণ আপত্তি করেছিলাম। মাসিমা বললেন, 'তুমি বললে ভালো লাগল, কিন্তু ওঁর নামে মিথ্যে অপবাদ যখন রটল, যখন উনি দুম করে চলে গেলেন সেই অকূল পাথারে দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি একা। ওঁর পাওনা-গণ্ডা পেতে পেতে পাঁচ বছর! তখন কী করেছি আর কী না করেছি জয়! দুঃখ-ধান্দা করেও যেমন করে হোক দিনগুলো চলে যাচ্ছিল। ছেলেমেয়ে বুকে আছে, মস্ত বড়ো বলভরসা। তা ভগবানের সইল না। কে যে এমন কাজ করল, কেন যে করল!'

মাঝে অবশ্য একবার ফলো-আপ নিউজ বেরিয়েছিল পুলিশ নাকি কিছু সূত্র পেয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সেসব গোপন রাখা হচ্ছে। কিন্তু ভরসা রাখতে পারছি না। প্রতিদিন গুদো গুদো লোক মার্ডার হচ্ছে। কাগজ ছবি দিয়ে খবর দিয়ে স্টোরি করেই খালাস। মাঝেমাঝেই দেখি বেশ ভারিভুরি লোকদের হত্যারও 'এখনও কিনারা হয়নি', 'অপরাধী শনাক্ত হয়নি', 'তদন্ত চলছে'। এবং অবধারিতভাবে 'তদন্তের স্বার্থে' সূত্রগুলো গোপন রাখা হল।

ইদানীং মাসিমা বলতে শুরু করেছেন, 'ও তদন্ত হলেই বা কী! না হলেই বা কী! আমার যা

যাবার তা তো গেলই। কে খুনে শাস্তি পেল কি না পেল তাতে কী-ই বা আসে যায়! ফিরে তো পাব না।'

বলেন কি মাসিমা! একটা রাগ, নিদেনপক্ষে শোধ নেওয়ার প্রশ্নও তো রয়েছে।

শিপ্রা বলে, নেই জয়দা, নেই। আমাদের মতো নিরুপায় লোকের নিরাপদে বেঁচে থাকাটাই তো আশ্চর্য। ধরুন মশার ঝাঁক, মাছি, পিঁপড়ে, আরশোলা, হাজারে হাজারে জন্মাচ্ছে। একটা চাপড়, ব্যস থেঁতলে যাবে, কে তার তদন্ত করে বলুন! এক পিঁপড়েই কি আর এক পিঁপড়ের দিকে ফিরে তাকায়? পিঁপড়ে জীবন চলতেই থাকে, চলতেই থাকে...চা খাবেন তো?

নাহ্, একটু জল দিও বরং, ভেতরটা তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

মাসিমা বললেন, দুটো বাতাসাও দিস শিপ্রা।

আসল কথা রাগ, প্রতিশোধস্পৃহা এসবের জন্যে একটু জীবনীশক্তি লাগে। সেটুকুও এদের নেই। আমারই কি আছে? জ্বলে উঠতে পারছি কি? অফিস যাই, নাম সই করি, পরেই দীপুর নামটা কাটা রয়েছে একটা লাল কলম দিয়ে, হাজিরা খাতার পাতায় যেন মার্ডার। ফেরবার সময়ে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ট্রেনে উঠে একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেলেই মনে হয় এই কি সেই কামরা...যেখানে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিল দীপু? এই কামরাতেই কি আমার বন্ধুর রক্ত লেগে আছে! ও আগে নেমে যেত—শ্রীরামপুর, কাঁচের মুখে ফিরে তাকাত একবার—আবার কাল, জয়। আবার...

আবার কাল দীপু... আবার... আমি ফিরে জবাব দিতাম। কতটা জবাব দেবার ইচ্ছে থেকে আর কতটা শুধু অভ্যেস...বলা মুশকিল। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক নামছে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক উঠছে, একভাবে, প্রতিদিন একভাবে—সেই যে দাদা...ঝাল মুড়ি, কড়াক কড়াক কড়াক ঝাল মুড়ি...ছুরি নিয়ে নিন সাত ফলা ছুরি... নখ কাটুন, পাঁউরুটি কাটুন, কোকাকোলার বোতল খুলুন চ্যাক করে, কাগজ ফাড়ুন, চিঠি খুলবেন তো দাদা... চিঠি খুলবেন না?... ইমপর‍্যান্ট চিঠি—চাকরির চিঠি, বাপের অসুখ, শুভবিবাহ, হোল খুলবেন দাদা, হোল, বাড়িতে ডাকাত এলে স্রেফ পেটটা ফাঁসিয়ে দিন—সাত ফলার মাল্টি পারপাস ছুরি দাদা... চা... চা... লেবু চা..., দুধ চা..., দুধ চা, লেবু চা...।

আমার ভেতরেও ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে মরে আসছে। মাসিমার মতো বা শিপ্রার মতো করে ভাবছি। কী হবে? ফিরে তো পাব না। তবু রুটিন করে থানায় হাজিরা দিয়ে যাই। কী স্যার, হল কিছু?

ও. সি কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলেন, 'হলেই হল দীপুবাবু, স্যরি জয়বাবু? —এ যে কী ছ্যাঁচড়ার চাকরি! ডিউটি কর, বাড়ি যাও, একটু পেট আলগা করে খেতে বসেছি...বাস কল এখুনি যেতে হবে। এ-শালার চাকরি তো আর করেননি!'

সেদিন ওই রকমই গেছি। ও. সি পাশের চেয়ারে বসে এক সাদা শার্ট আর কালো জিনস্ পরা ভদ্রলোককে বললেন, 'এই যে এঁর কথাই বলছিলাম স্যার। মা ছাড়ল, বোন ছাড়ল, ইনি কিন্তু লেগেই আছেন, এই দীপু চম্পটি, মৃত জয় সমাদ্দারের প্রাণের বন্ধু। সরি জয় চম্পটি আর দীপু সমাদ্দার।'

বিবরণ শুনে আমি একটু হাসি। শুকনো, বিরস কঠিন হাসি।

আর জয়বাবু, ইনি আই. বি থেকে আসছেন। কেসটা হ্যান্ডল করছেন। কানাইলাল সামন্ত।

ভদ্রলোক ইয়াং ম্যানই বলা যেতে পারে। মেরেকেটে পঁয়ত্রিশের এদিক-ওদিক। আমাদের থেকে বড়ো হলেও তেমন কিছু নয়। মুখটা ভালোমানুষ-ভালোমানুষ।

'মাফ করবেন, জয়বাবু'—কেমন কাঁচুমাচু হয়ে বললেন কানাইলাল—'আপনাদের মতো ঘনিষ্ঠ ক-জনের সহযোগিতা না পেলে...আই মিন...মুখ দেখাতে পারছি না ডি. আই. জি-র কাছে।'

আমি অবাক হয়ে বলি, সহযোগিতা ছেড়ে, আমি তো জোঁকের মতো লেগে আছি দাদা, তা এনারা তো যে তিমিরে সে তিমিরেই। এক বছর পুরো পার হয়ে গেল।

মার্ডার জয়ন্তী—ও. সি বললেন।

ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাই। কোনো লাভ নেই। অবশ্য। যেমন অসাড় তেমন অসাড়ই থেকে যাবে এই লোকগুলো।

কানাই সামন্ত বললেন, কোথায় একটু বসা-টসা যায় বলুন তো?

ও. সি বলেন, ওই তো ওদিকের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। জেরা ঘর। চলে যান। এখানেও বসতে পারেন, তবে এখানে নানান কিসিমের লোক তো অনবরত আসছেন, আপনাদের ব্যাঘাত হবে।

না, না। এখানে একেবারেই নয়।

আমি বললাম, এখানে ছোটোখাটো চায়ের দোকান আছে, কাছাকাছি দেখে আমরাও বসতাম... আমি দীপ্ত...

না, না। ওখানে একেবারেই নয় জয়বাবু। আপনাকে সবাই চেনে, আমার আইডেনটিটি সম্পর্কে একটা কৌতূহল... না না, তাতে আমার অসুবিধে আছে।

দীপ্তর বাড়িতে যাবেন?

কে কে আছেন?

ওর বোন তো চাকরিতে বেরিয়ে গেছে। মা হয়তো ফিরে এসেছেন...

না, না।

সবেতেই যদি এত না-না তাহলে উনিই বলুন। আমি চুপ করে যাই। ভেবে-চিন্তে উনি বললেন, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজে যাতায়াত আছে?

নাহ্, এখন আর...

আইডিয়্যাল প্লেস বুঝলেন। আপনি কাল বিকেলে ধরুন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওখানেই চলে আসুন। অফিসের পর। কী, ঠিক আছে? আমি তিনতলাটাতে অপেক্ষা করব, ওখানে আমাকে বা আপনাকে কেউ চিনবে না।

চারটে-পাঁচটা নাগাদ ইদানীং, আমার শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। কেন জানি না। গরম প্রচণ্ড। ঘামে যেন গঙ্গাজল বয়, 'বড্ড ঘামছ'—মদন শূর বলে, 'একটু নুন-চিনির শরবত খেয়ে নাও বুঝলে? শরীর থেকে নুনটা বেরিয়ে যায় তো! বিরাট গোল হাঁড়ি লাল ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে শরবতঅলারা দাঁড়িয়ে থাকে।'

আশেপাশে থাকে লেবু, চিনি, লবণ। সব মিলিয়ে বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা গা-জুড়োনো শরবত করে দেয়। খেয়ে সত্যিই একটু আরাম পাই। মদন শূর বলে, 'কে জানে আবার কলেরা খাচ্ছি, টাইফয়েড খাচ্ছি না হেপাটাইটিস বি খাচ্ছি।'

কেন, ইনজেশন নেন না? আজকাল হেপাটাইটিস বি-র তো ভ্যাকসিন বেরিয়েছে।

তুমিও যেমন। আমি নেব ভ্যাকসিন? তুমি নিয়েছ? নাও?

আমি না নিলেও কিছু হবে না। আমি হাসি—আমাদের কিছু হয় না। হবে না...যতক্ষণ না খুন হচ্ছি, অনন্ত আয়ু শূরদা।

যা বলেছ, মদন শূর তার গেলাসে চুমুক দেয়।

তারপরেই মনে পড়ে যায়—আরে আজ কফি হাউজ যাবার কথা নয়?

গুচ্ছের পয়সা খরচা করে কে আবার বাসে যায়। আর একটু সময় থাকলে হেঁটে মেরে দিতাম। কিন্তু সময় নেই হাতে। হাওড়ার ট্রামগুমটি থেকে গুঁতোগুঁতি করে ট্রাম ধরি। রাস্তাময় থিকথিকে পিঁপড়ের মতো দলা পাকিয়ে আছে মানুষজন। কিংবা চিটেগুড়ে আটকে থাকা ভিনভিনে মাছি। কেমন ঘেন্না করে। ঘিনঘন মতন। এমন নয় যে আমি এর বাইরে, কোনো মহান বিশিষ্ট। নিজেকেও দেখতে পাই ওইসব মাছি-ভিনভিনে ঘিনঘিনে ভিড়ে। বাসে-ট্রামে একটু পা রাখার জন্যে গুঁতোগুতি, বাজারে আনাজ-তরকারি একটু কম পয়সায় পাবার জন্যে ঝুলোঝুলি, হাসপাতালে পেচ্ছাবখানার পাশে মেঝেতে একটু জায়গা করে দেওয়ার জন্য ওয়ার্ড মাস্টারকে ধরাধরি, আপিস-ফ্যাকটরিতে বাদুড়ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে প্রাণ হাতে করে লেটে পৌঁছোনো, গালাগাল খাওয়া, ইউনিয়ন সর্দারদের গা-জ্বালানি চালবাজি শুনতে শুনতে প্রাণপণ চেষ্টায় ভুরু সোজা করে রাখা...টিউবওয়েল থেকে জল আনতে ঠেলাঠেলি, রাত্রে মশারির মধ্যে চটাস-চটাস...ঘেন্না...খুব ঘেন্না...দীপুটা বেঁচে গেছে একরকম, মরে বেঁচে গেছে।

একটা পা ট্রামের পা-দানিতে। এইভাবেই হাওড়া ট্রামগুমটি থেকে মহাত্মা গাঁধি রোড হয়ে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছোই। মহান ইউনিভার্সিটি পাড়া, শতবার্ষিকী বিল্ডিং, মহান প্রেসিডেন্সি কলেজ, মহান হিন্দু স্কুল-হেয়ার স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, আর মহান মহান সব দোকান, ফুটপাতে, বারান্দার রেলিং-এ, স্টল-এ। দোকানে শিক্ষার্থী, বিদ্বান। ইনটেলেকচুয়েলদের পাড়া। মাড়িয়ে চলে যাই। পাঠমন্দির, এঁরা আবার অধ্যাত্মচর্চা করে থাকেন। সমর্পণ করো, প্রশ্নহীন বিশ্বাস, ফেথ...কিছু আশা করো না, শুধু ডেকে যাও, কিছু চেয়ো না প্রে, প্রে, প্রে। কফি হাউজের সিঁড়ি দিয়ে উঠতি ইনটেলেকচুয়েলদের সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে হয়। ইনটেলেকচুয়েলও শালা একসেস্ হয়ে যাচ্ছে। ভাবিসনি সবাই ইনটেলেকচুয়েল হবি, যদ্দিন আসতে পারছিস এসে নে, হেসে নে, যেন পৃথিবীটা কিনে নিয়েছিস এমনি করে গলাবাজি কর। তারপর উট। আড়াই পোঁচ কাটা, বাকি গলা দিয়ে কালো রক্ত পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে।

এই যে ভাই এদিকে। —খুব নিচু গলা কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কানাইলাল সামন্ত। লোকটাকে এমন সাধারণেরও সাধারণ দেখতে যে কালই দেখেছি, আজই ভুলে মেরে দিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে হচ্ছিল—লোকটাকে খুঁজে বার করব কী করে? চিনিই তো না। তা সে সমস্যাটা রইল না। কানাইলালই আমাকে খুঁজে নিয়েছে।

গুছিয়ে বসি।

একটু লেট হয়ে গেল, —রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে কৈফিয়ত দিই—বড্ড ভিড়।

আমি বুঝতে পেরেছি জয়বাবু, টাইমিংটা...আমি দুঃখিত। এত ট্রাবল। খিদে পেয়েছে তো খুব?

ও তেমন কিছু না...।

আমি অলরেডি চিকেন স্যান্ডউইচ, চিজ-ওমলেট, আর পেঁয়াজ-পকোড়া অর্ডার দিয়েছি। আর কিছু?

আমি হেসে বলি, ইনাফ। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাব এটা বলেন—'ইনাফ'।

খাবার আসে। লোকটি দুটো আলাদা প্লেটে খাবার সাজায়। আমার দিকে একটা এগিয়ে দেয়—এই যে ভাই—বেয়ারাকে ডাকে—পকোড়াটা কফির সঙ্গে দিও।

ঠিক আছে স্যার।

নিন শুরু করুন। নিজে একটা কাঁটা দিয়ে ওমলেট কেটে মুখে পোরে কানাই সামন্ত। আমি

একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিই, একটু জল খেয়ে নিই। ভীষণ তেষ্টা। তেষ্টাটাই এতক্ষণ জ্বালাচ্ছিল প্রচণ্ড।

বেশ কিছুক্ষণ দু-জনেই নিজের নিজের খিদে মেটাতে থাকি। কানাইলাল একবার বোকা লাজুক চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে, কিছু মনে করবেন না জয়বাবু, বড্ড খিদে পেয়েছিল।

ঠিকাছে। ঠিকাছে—আমি ওঁকে নিশ্চিন্ত করি।

আমি আসলে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। গ্রোপিং ইন দা ডার্ক, বুঝলেন? নিহত মানুষটির চারপাশটা কেমন ছিল, কাদের সঙ্গে মিশত সেইসব...

আমি চেয়ে থাকি।

দেখুন সম্ভাবনা নাম্বার ওয়ান, আপিসে কারও সঙ্গে গণ্ডগোল। ছোটোখাটো হলেও বলবেন কিন্তু স্যার। তুচ্ছ বলে গোপন করে যাবেন না, কোনো ছোটোখাটো কাজিয়া? তুচ্ছ কারণে লোকে আজকাল খুনোখুনি করছে।

'দেখুন,' আমি ওমলেট ছিঁড়ে মুখে দিই, 'সেই যে বলে না তৃণাদপি তৃণ! আমরা সেই রকমই। তুচ্ছ একেবারে। একটা চাকরি পেয়েছি, সেটাই আমাদের যথেষ্ট। না পেলে, না পেতেই পারতাম, জানি না কী করতাম, হাত পেতে ভিক্ষে নিতেও পারতাম না, আবার গুন্ডা-গুলিগান হয়ে বোমাবাজি...তা-ও আমাদের দ্বারায় হত না।'

আপনি আমরা-আমরা করছেন কেন? দীপ্তবাবুর তো আলাদা সার্কল, আলাদা মন থেকে থাকতে পারে! ধরুন কোনো ড্রাগ-পাচারকারীর শাগরেদ হয়ে গেছেন পাকেচক্রে।

এটা কিন্তু আমি একটু ভাবি, তারপর বলি, আপনি বললেন, তাই ভাবলাম, ভেবে দেখলাম খুব হচ্ছে।

নাহ্। ছোটোবেলা থেকে বন্ধু, ইস্কুলে, কলেজে, দুজনেই পি ডিভিশন। দুজনের এক চাকরি, ঝগড়া-কাজিয়া এড়িয়ে চলতাম, বোথ অভ আস। এ নিয়ে আমাদের অনেক কথাও হয়েছে। ও আমার সঙ্গে একমত ছিল। উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু প্রোটেস্ট, টু কোয়ার্ল। উই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু পাচার ড্রাগ।

ইউনিয়নের দিক থেকে কোনো প্রেশার?

আমার এবার হাসি পেয়ে যায়। তেতো হাসি।

আরে দাদা, ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের কী? ইউনিয়ন প্রেশার দেবে আমাদের মতো চুনোপুটিকে? আমরা প্রেশারের মধ্যেই বাস করতাম। বুঝলেন? জলে মাছ যেমন জলের প্রেশারে বাস করে!

আপনি জয়বাবু ভারি চমৎকার কথা বলেন। এত সুন্দর কথা বলতে আমি অনেকদিন কাউকে শুনিনি। অথচ...অথচ...

'অথচ কী? আমার কিছু হল না?'—আমি হো হো করে হাসি। 'দেখুন কানাইদা, আপনার কতটুকু অভিজ্ঞতা আমি জানি না, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন—কিন্তু একটু লাগসই কথা বলার ক্ষমতা, লাগসই কাজ করার ক্ষমতা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের আছে। তো কী?'

খুব অপ্রস্তুত হয়ে যায় ভদ্রলোকের মুখ।

ঠিক। ঠিকই বলেছেন জয়বাবু। একটা লাক-ফ্যাক্টর থেকে যায় না। না থাকলে...ক্যাঁচাল ভালো লাগে না সন্ধের ঝোঁকে। পাখাটা ওপরে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে কিন্তু গরমে গ্যাদগেদে হয়ে যাচ্ছি।

বললাম, কী যেন বলছিলেন সম্ভাবনা নাম্বার ওয়ান...

হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি। সম্ভাবনা নাম্বার টু—লাভ—মানে লভ-অ্যাফেয়ার। ধরুন কারও সঙ্গে লভ

হয়েছে, কিন্তু তার একটি আগের লাভার আছে, ধরুন স্বামীই। এই এক্সট্রা ম্যারিটাল বা দাম্পত্য-বহির্ভূত প্রেম বলুন, প্রেম, সম্পর্ক বলুন, সম্পর্ক...এটা এখন রাজনৈতিক খুনের পরেই প্রায়রিটি পাচ্ছে মোটিভে...বুঝলেন? স্ট্যাটিসটিক্স বলছে।

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলাম, এবার ঠান্ডা গলায় বলি, 'আপনার বন্ধু ও.সি বাবুও এই সন্দেহটির কথা বলছিলেন। যট্টুকু জানি বলছি সামন্তবাবু, সরি, মি. সামন্ত।'

আরে না না, সামন্তবাবু ইজ অল রাইট। মিস্টার-টিস্টার নয়। বলুন, বলুন, কী বলবেন!

যদি বলি হ্যাঁ। বাস-স্ট্যান্ডের পাশে দোতলা বাড়িটার আড়তদার বরটার রসবতী বউটার সঙ্গে দীপ্তর আশনাই ছিল...বিশ্বাস করবেন?

কোন বাড়ি? কোন আড়তদার? কোন্ বউ? যদি কাইন্ডলি একটু ডিটেল বলেন।

কোন বাড়ি, কোন আড়তদার, কোন্ বউ জানি না। ওরকম হরদম আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আপনি যেমন সম্ভাবনার কথা বলছিলেন আমিও তাই বলছিলুম। কিন্তু আপনিই বলুন, এই আমার দিকে তাকিয়ে বলুন—গালে ব্রণর গর্ত, চোখে মাছ, বুকে পায়রা, গলায় বেড়াল আর পকেটে বিরাজ করছেন সাক্ষাৎ মা ভবানী। আপনার গোয়েন্দা মনটা কী বলে?' এরকম ফেকলু পার্টি দিয়ে এক্সট্রা-দাম্পত্য হয়?

খুব লজ্জা পেয়ে সামন্ত বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'বড্ড বিনয়ী আপনি জয়বাবু। বড্ড বিনয়ী! ওসব ফেকলু টেকলু...নাঃ—দ্যাট ইজ টু মাচ। আফটার অল ইয়াং ম্যান! কারা এক্সট্রা-দাম্পত্য করে তাদের দেখেছেন? কেউই ময়ূরছাড়া কার্তিকটি নয়। কেউই একেবারে তাগড়াই ভীম পালোয়ান বীরসিংগিও নয়।'

বেশ তো, তাহলে এই থিয়োরিটাই বসের কাছে পেশ করুন। উনি পিঠ চাপড়ে দেবেন।

আপনি জানেন না জয়বাবু, এভাবে কেস হাজির করলে... আমার চাকরিটা চলে যাবে। যতক্ষণ না আড়তদার বা রসবতী...কোনো সাবুত হাজির করতে না পারি...আমার নিস্তার নেই।

তাহলে আপনি খুঁজতে থাকুন। আমি উঠি।

আর একটু টাইম যদি দয়া করে দেন জয়বাবু, নইলে আবার একদিন বসতে হবে। কোথায় বাড়ি গিয়ে মাথায় দু-ঘটি জল ঢালবেন, তা না একটা টিকটিকির টিকটিকুনি শোনা।—খুব চিকচিকে চোখে চেয়ে মন্তব্যটি করে সামন্ত, ওর ধারণা একটা দারুণ মজার কথা বলেছে।

আমার যে সত্যিই বাড়ি গিয়ে মাথায় জল ঢালতে ইচ্ছে করছে সেটা ব্যাটা বুঝতে পেরেছে ঠিক।

বলল, 'ধরুন এ-ও তো হতে পারে জয়বাবু, দীপ্তবাবুর যে বোনটি আছে কোনো মস্তান তার পেছনে লেগেছে, দীপ্তবাবু তাকে ঠান্ডা করে দেবেন বলে শাসিয়েছেন...'

আমি এবার হেসে ফেলি, 'শুনুন সামন্তবাবু এই মস্তান-টস্তানরা একটু রক্তমাংস চায় বুঝলেন? দীপ্তর বোন শিপ্রাকে একবার দেখে আসুন। তারপর এ বিষয়ে কথা হবে। দ্বিতীয় অধিবেশন।'

প্লিজ প্লিজ দীপ্তবাবু, স্যরি জয়বাবু আর এ-কটু। তাহলে কি আপনি বলছেন সেদিন দীপ্তবাবুর পকেটে বাই চানস্ অনেকগুলো টাকা ছিল? ট্রেন ডাকাতি?

শুনুন দাদা, পকেটে একটা মাদুলি আর দু-পাঁচ টাকা ছাড়া আমাদের পকেটে আর কিছু থাকত না। হাতঘড়িটা ডিজিটাল, ফুটপাত থেকে উনপঞ্চাশ টাকার কেনা।

সে ক্ষেত্রে এ-ও তো হতে পারে, দীপ্তবাবু ডিপ্রেশনে ভুগতে ভুগতে নিজেকে অযুগ্যি ভাবতে ভাবতে, একঘেয়েমির শিকার হতে হতে আত্মবিনাশ...মানে জিঘাংসা একটা—নিজেরই ওপর...?

এইবারে আমি বসে পড়ি। এতক্ষণ পাতি বকবকামির পর এটা তো লোকটা খারাপ বলেনি।

সত্যিই তো! নিজেকে ঘেন্না করতে করতে, অযুগ্যি ভাবতে ভাবতে, আরও তিরিশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর এইভাবে বেঁচে থাকতে হলে...এ কথা মনে করে...এ তো আমারও কথা। আমারও। সামন্তর মতো একটা পাতি টিকটিকির মাথায় এটা আসতে পারে ভাবিনি তো!

কী হল? —সামন্ত ঝুঁকে বসেছে, —চুপ করে রইলেন যে?

এটা ভাবা যেতে পারে—আমি অন্যমনস্কভাবে বলি

এটাই ভাবতাম জয়বাবু... যদি না দীপ্তবাবুর ভিসেরায় একটু স্ট্রং বার্বিচ্যুরেটের সন্ধান পাওয়া যেত। নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে কি ব্রেড দিয়ে নিজের গলার নলি কাটা যায়? সেইজন্যে সব দিক ভেবে-চিন্তে আমরা এক দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজ করছি, সে ঠিক দীপ্তবাবুর মতো, যার পরিস্থিতি ঠিক দীপ্তবাবুর মতো, দীপ্তবাবুর মতোই যার আত্মবিনাশ করতে প্রবল ইচ্ছে হয়, কিন্তু যে...আসলে আপনি নিজেকে মারতে চেয়েই দীপ্তবাবুকে মেরেছেন, তাই না জয়বাবু?

এগজ্যাক্টলি—আমি ক্লান্ত গলায় বলি এবং হা-ক্লান্ত চোখে কানাইলাল সামন্তর মুখের দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি।

গোলাপি ঘর

আমরা খুব খু-উব দুষ্টুমি করলে আমাদের মা একটা অদ্ভুত ধরনের ভয় দেখাতেন আমাদের। ধরুন কিছুতেই আমাদের দস্যিগিরির সঙ্গে পেরে উঠছেন না। স্কুলের টাস্‌ক করেছি আধ-খামচা, কোনো কথা শুনছি না. বাড়ির বেচারি স্প্যানিয়েলের গায়ে টিউবের রং গুলে বেশ করে লাগিয়ে দিয়েছি, কিংবা পাশের বাড়ির মাথায়-ছিট ঝড়ু কাকুর পেছনে লেগেছি। ঝড়ুকাকু রেগেমেগে নালিশ করছেন আর আমরা একটুও অনুতপ্ত না হয়ে হাসাহাসি করছি। এই রকম বাঁদরামি করলে তবেই মা ভয়টা দেখাতেন।

হঠাৎ আমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মুখটা ওপরে তুলে ধরলেন—যেন শূন্যে। ঘরের মধ্যেই কেউ আছে, যে মায়ের কাছে দৃশ্য কিন্তু আমাদের কাছে অদৃশ্য।

'হ্যাঁ. হ্যাঁ, আসছি। হ্যাঁ এবার আর দেরি নয়। একটু অপেক্ষা করো. জিনিসপত্রগুলো সুটকেসে ভরে নিই...কী বললে? দরকার হবে না?' একটু ম্লান হাসি...তারপর...'অবশ্য আমার যা যা লাগবে সেসব তো তুমি দেবেই। কেন বিশ্বাস করব না? আরে! হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ওই সময়েই ভালো। নিশ্চয়! ফিরব না। ফিরব কেন?'

ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারতুম না। ঠিক যেন একটা টেলিফোনে কথা হচ্ছে। ল্যাজের দিকেরগুলো শুনতে পাচ্ছি. কিন্তু মুড়োর দিকটা পাচ্ছি না। যতই কান খাড়া করি।

আমরা একেবারে জড়োসড়ো. হয়ে যেতুম ভয়ে। শিঁটিয়ে যেতুম।

তারপরে মা উঠে দাঁড়াবেন। চারদিকে তাকাবেন যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। আমাদের ওপর দিয়ে চোখ চলে যাবে, অথচ আমাদের দেখবেন না। যেন এই ঘরের মধ্যে একটা অন্য ঘর জেগে উঠেছে। অন্য পৃথিবী। মা চলতে আরম্ভ করবেন, যেন ঘুমের মধ্যে চলেছেন।

এইবারে ভয়ে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাডা হতে থাকবে। দু-জনে দুদিক থেকে ছুটে গিয়ে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরব। 'কোথায় যাচ্ছ? ও মা!—কোথায় যাচ্ছ। আমাদেরও নিয়ে যাও।'

'কিন্তু ওখানে তো তোমাদের যেতে দেবে না', —মা বলবেন যেন কেমন ঘোর লাগা গলায়।

তাহলে তুমিও যেয়ো না। তুমি যাবে না। কিছুতেই না।

কিন্তু তোমাদের তো আর আমাকে দরকার নেই। কী করা উচিত না উচিত; কী খাবে না খাবে, কী রকম ব্যবহার করবে না করবে—সবই তো তোমরা জেনে গেছ! তা ছাড়া তোমরা তো আমাকে ভালোও বাসছ না আর। যেসব ছেলেমেয়েরা মাকে ভালোবাসে তারা মা যা ভালোবাসেন সেইসব করে। যা বলেন তাই। যদি নিজেদের ভালো না লাগে তাও। শুধু মা খুশি হবেন বলে।

আমরাও তাই করব। তুমি যা বলবে তাই। আমাদের যদি লক্ষ্মী হতে ভালো না লাগে তা-ও লক্ষ্মী হব। ঝড়ুকাকার কানের কাছে ঠোঙা ফাটাব না, ভুলোর গায়ে রং দেব না। দাদার চোখ ছলছল, আমার চোখ জ্বালা করছে কান্নায়।

মা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠবেন. 'হ্যাঁ. আজ যেতে পারছি না। না না ওরা লক্ষ্মী

ভালো হয়ে যাবে বলছে। শুনতে পাচ্ছ তো! হ্যাঁ, পাপ তো বটেই। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো। ওদের এখনও আমাকে দরকার—বলছে। ওরা কথা দিচ্ছে, আচ্ছা এবারটি ওদের মাফ করো।'

এরপর মা আবার আগের মা। আমাদের সঙ্গে খেলছেন। আলিবাবার গল্প বলছেন, গান করছেন। এইসব সময়ে মা আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন, এমন শক্ত করে যেন মা নয়, আমরাই কোথাও চলে যাব বলে ভয় দেখিয়েছি। কেমন গা ছমছম করত, কিন্তু বুঝতে পারতুম মা আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে আছেন। যেন নরম পশমের কম্বলের মতো ওম-অলা সেই ভালোবাসা। নিবিড়, নিখাদ। আর সেই সময়গুলোতে আমরা যেন মায়ের হয়ে যেতুম, একলা মায়ের। আর কারও নয়। অনুভব করতুম মায়ের অনন্ত দুশ্চিন্তা, অনন্ত উষ্ণতা, গভীর আবেগ। সমস্ত জিনিসটা যেন বাস্তব জগতের নয়, কোনো ভাবজগতে ঘটছে। একেবারেই বিমূর্ত।

অন্যান্য সময়ে শত কৌতূহল সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে স্পিকটি নট। যদি আবার মনে পড়ে যায় যদি আবার সেই রকম ..উঃ। না! একেবারেই না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে জল্পনা চলত মাঝে মাঝেই।

কার সঙ্গে মা কথা বলেন বলতো!

নিশ্চয়ই বন্ধু টন্ধু হবে। ম্যাজিক জানে তাই অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু আমরা তো ওর গলা, কথা, কিছুই শুনতে পাই না।

দাদা বিজ্ঞের মতো বলত, আমরা ছোটো তো! আমাদের কান মায়ের মতো নয়। বড়ো হলে কানের জোর বাড়বে তখন ঠিক শুনতে পাবো লোকটার গলা।

কিন্তু তুই ধরে নিচ্ছিস কেন ওটা একটা লোক! মেয়ে নয়!

এ কথার জবাব আমরা কেউই দিতে পারতুম না। কেমন যেন মনে হত, ও বিরাট কেউ, শক্তিমান, লম্বা-চওড়া—মেয়েরা অমন হয় না।

একদিন কিন্তু দাদা মুখ কালি করে স্কুল থেকে ফিরল। একটা কোণে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলল, আমি জেনে গেছি।

কী?

মা কার সঙ্গে কথা বলেন।

কে?-- আমার গলা কাঁপছে।

মৃত্যুর দেবতা, যম।

ঝগড়া-টগড়া ভুলে আমরা দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরলুম।

কিন্তু এই মৃত্যুর দেবতা কি মানুষের সঙ্গে কথা বলে? বলতে পারে?

বলে। বলেছে। সাবিত্রী বলে একজন মেয়ে, আর নচিকেতা বলে একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে বলেছে। আজই স্যার সেই গল্প করছিলেন আমাদের ক্লাসে।

ভয়ে আমরা আধমরা—যদি যমরাজের সঙ্গে মায়ের এতই জানাশোনা, যখনতখন কথা বলাবলির সম্পর্ক, তবে তো যে কোনো মুহূর্তে মা ওর কাছে চলে যেতে পারেন। ও-ও তো ডেকে নিয়ে যেতে পারে মাকে। কিছু একটা আমাদের করতেই হবে। আটকাতেই হবে। ঠিক আছে মা বিরক্ত হন এমন কিছু আর আমরা করব না। ভালো হয়ে থাকব।

চলে কিছুদিন। তারপর একদিন আবার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার হাতে দাদার চুলের মুঠি, দাদা আমাকে বেধড়ক মেরে যাচ্ছে। আমি ওকে আঁচড়ে দিচ্ছি, ও আমাকে কামড়ে দিচ্ছে। মা আমাদের ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, 'মিঠু মিঠু'। চুল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি। তোমার দাদা

হয় না? কান মুলে দিচ্ছ কি দাদার? রনি, ছি ছি, অমন করে মারছ কেন? মিঠু তোমার ছোটো বোন না? তোমরা কি বাচ্চা না রাক্ষস?'

কিন্তু তখন দুজনেই মাথায় রাগ চড়ে বসে আছে। থামব না। আমরা কিছুতেই থামব না।

এমন সময় দেখি, মা নিথর হয়ে যাচ্ছেন, ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের, মুখ ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

'কেন? কেন আমার ছেলে মেয়ে এত নিষ্ঠুর? কেন ওরা এত মারামারি করে? বলো, বলো আমাকে, বলো।...ও, বুঝেছি ওরা আমায় ভালোবাসে না। ভাই বোনকে, বোন ভাইকে কেউ কাউকে ভালোবাসে না। কিন্তু কেন? আমি তো ওদের মা! মাকে কি ভালো না বাসা...'

কিছু যেন শুনলেন, তারপর বললেন, 'ও বুঝেছি। মা টা কিছুতে কিছু আসে যায় না। ভালোবাসে না তো ভালোবাসে না—এর কোনো কেন টেন নেই। যাব...কিন্তু ওদের ওপর আমার কিছু কর্তব্য তো এখনও রয়েই গেছে।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, 'মা! তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?'—আমার গলা কাঁপছে!

ও সব তোমরা বুঝবে না।

দাদা গোঁয়ারের মতো বলল, 'আমি জানি। আমরা বুঝি।'

'কী বুঝিস?' মায়ের গলায় কি সামান্য কৌতুক?

'তুমি যমের সঙ্গে কথা বলো। দিনরাত ও তোমায় ডাকাডাকি করছে। আর তুমি চলে যেতে চাইছ। মানে মরে যেতে চাইছ! খারাপ মা! বিচ্ছিরি মা।'—বলতে বলতে দাদা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। আমিই বা বাকি থাকি কেন?—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।

দেখি মা যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন। ঘাবড়ে গেছেন।

আরে না, না, কে বলেছে তোদের ওটা যম? দূর একদম ভুল।

ভুল না আরও কিছু। ও তোমাকে নরকে নিয়ে যাবে। বিরাট কড়ায় গরম তেলে ছ্যাঁক ছোঁক করে ভাজবে। সুদ্ধু, সুদ্ধু আমরা দুষ্টুমি করেছি বলে। বাজে লোক, বদমাশ।

সে কী রে? ও আমাকে ঠিক তোদেরই মতো ভালোবাসে। নরকে নিয়ে যাবে কেন? নরক বলে কিছু আছে না কি? যত্ত ভুলভাল ভাবছিস।

তাহলে কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে তোমায়?

মা যেন দেয়াল ভেদ করে অন্য কোনো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। ধ্যানস্থ। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক, ভারী নরম একটা হাসির মতো কিছু খেলা করছে ঠোঁটে।

'গোলাপি ঘর।'

'গোলাপি ঘর? কোথায়?' আমরা আশ্চর্য হয়ে সমস্বরে বলি।

কোথায় তা জানি না। জানার দরকারও নেই। ঘরটা আগাগোড়া গোলাপি। ব্যস। খুব বড়োও নয়। খুব ছোটোও নয়, ইচ্ছে করলে তোমার দরকার মতো বাড়িয়ে নিতে পার। কিংবা কুঁচকে ছোট্টও করে নিতে পার। ছোট্ট সুন্দর ঘরখানা। একদিকে একটা সিঙ্গল খাট, তাতে গোলাপি চাদর, গোলাপি বালিশ। আর জানলা-দরজার পর্দাগুলো গোলাপিই, কিন্তু একটু গাঢ়, ধর ম্যাজেন্টা ম্যাজেন্টা। মেঝেতে একটা গোলাপি কার্পেট, তাতে গাঢ় গোলাপির ফুল লতা পাতা বোনা।

চেয়ার-টেবিল? সেগুলোও গোলাপি?

না, সেগুলো গোলাপি নয়। তবে এমন চকচকে আয়নার মতো পালিশ যে ঘরের সব গোলাপির ছায়া পড়ে পড়ে গোলাপিই মনে হয়। আর আছে একটা ম্যাজেন্টা শেডওয়ালা টেবিল-বাতি। জ্বাললে এত সুন্দর হয়ে যায় না ঘরখানা। চমৎকার একেবারে। ...মার মুখে দিব্য আলো।

কী করে খাবে ওখানে?

কোনো ব্যাপারই না। একটা ছোট্ট রান্নাঘরও তো আছে, সেখানে গোলাপি উনুনে ভাত-ডাল-আর একটা সেদ্ধ কিছু করে নেব, তারপর গোলাপি কাচের প্লেটে করে খেয়ে নেব। তোরা তো জানিস আমার তোদের মতো খাওয়ার ল্যাঠা নেই।

'আর মাছ? আর উচ্ছে।' আমি বলে উঠি, আমার চোখ এইবারে চিকচিক করছে। মা যে আমাদের বিচ্ছিরি-লাগা এই দুটো জিনিস ভীষণ ভালোবাসেন। তার কী হবে?

'সে যদি ইচ্ছে হয়, ঠিক এসে যাবে।' —মা নিশ্চিন্তে উত্তর দেন।

'আমরাও যাব মা, আমাদেরও নিয়ে চলো। আমাদেরও,' —গোলাপি ঘরের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আমরা বলি।

'কিন্তু ওখানে তো ছোটোদের, ছোটোদের কেন, কাউকেই নিয়ে যাওয়া যায় না। ও ঘর শুধু আমার, একা আমার। ওখানে কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই। খালি গান, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সবুজ মাঠ।...'

এইবারে ধরে ফেলেছি। আমাদের সঙ্গে চালাকি, না?

বলি, এই যে বললে একটা ছোট্ট ঘর। ওর মধ্যে পাহাড়, জঙ্গল, মাঠ নদী এসব ধরবে কী করে? স-ব মিছে কথা।...

মায়ের অঙ্গ থেকে এখন রহস্য ঝরে ঝরে পড়ছে, মুখে একটা আবিষ্ট হাসি। বললেন, 'বুঝতে পারছিস না মিঠু। ওইটেই তো ম্যাজিক ঘরটার। তুমি যা-যা চাও, যা-যা ভালোবাসো সব, স-ব ওখানে পাবে।'

আমরা যখন বড়ো হয়ে যাব, অনেক বড়ো, তখনও ওখানে যেতে পারব না?

নিশ্চয়ই পারবি। কিন্তু সেটা অন্য ঘর। ঘর আকাশ-নীল, কিংবা কচি কলাপাতা বা পেস্তার মতো সবুজ, হাতির দাঁতের মতো বা খুব হালকা বেগুনিও হতে পারে। কিন্তু গোলাপি ঘরটা শুধু আমার, একা আমার। ওই রংটা, আমার নিজস্ব রংটা আর কোথাও লাগানো যাবে না। ওই ঘরটাতেও কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

ছেলেমেয়েকেও না!

না।

আমরা বিমর্ষ মুখে চুপ করে যাই। একটু পরে মিয়োনো গলায় জিগ্যেস করি, ও লোকটা কে, যার সঙ্গে তুমি কথা বলো?

কিন্তু যতবার জিগ্যেস করি, মা শুধু আমাদের বুকের মধ্যে টেনে আদর করেন, চুমো খান, উত্তর দেন না।

আজ এতদিন পর, বহু রুক্ষ বছরের ভয়ংকর লড়াই, ভয়ংকরতম যন্ত্রণা, একটা গোটা জীবন-ভরতি বিদ্বিষ্ট মুখপ্রবাহ এবং প্রাণ-অবশ-করা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে পথ চলবার পর, মা যখন আর ইহজগতে নেই, যখন আমি আমার সেই নীল ঘরটা পেয়ে গেছি—আকাশের মতো নীল ঠিক যেমনটি মা বলেছিলেন, যখন জেনে গেছি এই ঘর ইচ্ছে করলেও কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না, তখন অর্থাৎ এখন বুঝতে পারি মা কার সঙ্গে অমন কাতর ভরসায় কথা বলতেন। দেবতা ঠিকই। কিন্তু মৃত্যুর নয়। জীবনের।

ক্যালক্যাটা মকটেল

২০০৩-এর আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় ফোটোগ্রাফটি সর্বদেশীয় বিচারকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার নাম 'ক্যালকাটা মকটেল'। চিত্রী অম্বুজ শ্রীনিবাসন। কারিগরি আছে ছবিটাতে। কোলাজ, সুপার ইমপোজিশন, নেগেটিভ ইত্যাদি অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করে ছবিটি যেন স্টিল ফোটোর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কেউ বললেন স্টিল হয়েও এ চলচ্চিত্র, কেউ বললেন এ কবিতা, কেউ বললেন, এর মধ্যে খুব জটিল ছোটোগল্পের গুণাবলি দেখা যাচ্ছে। মোট কথা, ছবিটি সকলকে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করল। বলা বাহুল্য, দেড় লাখ ইউ এস ডলারের প্রথম পুরস্কারটি শ্রীনিবাসনই পেল। পৃথিবীতে আলোকচিত্র-প্রেমীর অভাব নেই। শ্রীনিবাসনের ফ্যান মেলটি বেশ পুরুষ্টু হতে লাগল। অনেক গুণমুগ্ধ জিজ্ঞেস করতে লাগল—এই অদ্ভুত ছবিটি সে কী ভাবে ভাবল।

দেখুন, শিল্পী মাত্রেই জানেন কত অর্থহীন এই প্রশ্ন এবং কত প্রত্যাশিতও। শিল্পী কি সব সময়ে সত্যিই জানেন কী ভাবে কী ঘটে তাঁর মাথার মধ্যে? কোথাও তিনি মানবসীমা ছাড়িয়ে যান। মিস্টিক, একটা অতীন্দ্রিয়ের হাতছানি তাঁকে নিশি-ডাকে ডেকে নিয়ে যায়।

অম্বুজ জানে, অথচ জানে না। সে ফোটো-জার্নালিস্ট। পেশাদার। এর নাড়ি নক্ষত্র তার জানা। কিন্তু এ ছবির আইডিয়াটা একটা হঠাৎ ঝলক, তারপর ক্রমিক ঝলক। যখন কাজটা শেষ হয়ে গেল সে বুঝতে পারল এতক্ষণ সে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল।

২

পশ্চিম জার্মানির এক অটোবানে মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনায় আমি মুক্তি পাই। মৃত্যু না বলে মুক্তি কথাটা কেন বললাম, তার একটা বিশদ কারণ আছে। আমি মাটিল্ডার পাল্লায় পড়েছিলাম।

যা উপার্জন করতাম তাতে বেশ আরামে থেকেও মোটের ওপর চলে যেত। দু-বার স্ত্রী বদলে ঘাড়মোড় ভেঙে যার প্রেমে পড়লাম সে পঁয়ত্রিশ। আমি সত্তর। যতই বয়স হয়, ততই কিছু কিছু মানুষ তরুণী-লোভে পাগল হয়। আমিও হয়েছিলাম। চিকনচাকন বাদামি চোখের ধোঁয়াটে চুলের মাটিল্ডা আমাকে চুম্বন-টানে টেনে নিয়েছিল। আধা ব্রুনেট ঝলমলে এক কপর্দকহীন ডিভোর্সি। পঁয়ত্রিশ কি পঁচিশ বোঝা শক্ত। সময় কাউকে কাউকে ছোঁয় না। আমার চোখ আর বাকি সব ইন্দ্রিয়ও তো তখন সত্তর পার! তা এই আধাব্রুনেট সুন্দরীটি আমাকে কী কারণে পাত্তা দিল? আসলে মেয়েটা ছিল ডাকসাইটে বেজন্মা। কোন্ দেশের কোন্ জাতির কোন্ ধর্মের রক্ত যে তার ধমনিতে ছিল না, তা জানতে লাইব্রেরি-ভরতি বিজ্ঞান আর সমাজবিদ্যা লাগবে। বিজ্ঞান অবশ্য বলে থাকে এ রকম মিশ্রণে উন্নত ধরনের মগজ তৈরি হয়। কিন্তু এ মেয়েটা অদ্ভুত। নিজেকে নাস্তিক বলে গ্যাদা দেখায় আবার বিপদে পড়লেই বুকে ক্রশ আঁকে, দুষ্টু বুদ্ধির শিরোমণি অথচ কিচ্ছু শিখতে পারেনি। ফলে আকাট মূর্খ, মিথ্যেবাদী আর বিচ্ছিরি রকমের সুযোগসন্ধানী। ব্যালে ও বেলি-ডান্স দুটোই শিখতে গিয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে অবশেষে একটা নাটকের দলে ড্রেসগুছোনির

কাজ করছিল। এদিকে আমি এক তীক্ষ্ণনাসা, উজ্জ্বল চোখ, গ্রানাইটের তৈরি সম্ভ-সম্ভ চেহারার অতি স্মার্ট মোটামুটি বিখ্যাত ইনটেলেকচুয়াল, যাকে ঠিক অতটা বৃদ্ধ বলে বোঝা যায় না। আমার মনোযোগে ও অহংকারের সপ্তম স্বর্গ তো পেলই, উপরন্তু আমাকে সমাজে ওঠার একটি সোনার সিঁড়ি ঠাওরাল।

কিছুটা সময় অবশ্যই রূপ-রস-স্পর্শঋদ্ধ এক অবিশ্বাস্য মৈথুন স্বর্গে বাস করি, তারপর মোহভঙ্গ হয়। আরে ধ্যাত্তেরি, আমার আয় অনিয়মিত, বুঝে খরচ করলে যথেষ্টর বেশি, না করলে পপাত। আজ এই ডিজাইনার ড্রেস চাই, কাল ওই মুক্তোর ছড়া চাই, পরশু চাই কমল-হিরের ব্রুচ। সীমাসংখ্যা নেই আবদারের। না রাঁধবে বাড়িতে, না যাবে সস্তার জায়গায় খেতে। তার ওপর মদ্যপ। নির্জলা হুইস্কিতে হুশ করে পৌঁছে গেল। সন্দেহ হয় বার থেকে, লোকের বাড়ির সেলার থেকে বোতল হাতাত। বাধা দিলে তুলকালাম। গালিগালাজ, জিনিসপত্র ভাঙচুর। পার্টিতে পার্টিতে আমাকে ধরে বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে পরিচয় করত। প্রথম পাঁচ মিনিটে সম্মোহন, দ্বিতীয় পাঁচ মিনিটে বিদ্যে জাহির। তৃতীয় পাঁচ মিনিটে পরিষ্কার হয়ে যেত ওর মূর্খামি। ওর এই হ্যাংলাপনা, ইতরামি ক্রমে আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। তৃতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ভাবছি, এমন সময়ে বছর দুইয়ের মাথায় আমার সেরিব্র্যাল স্ট্রোকটি হল।

গেল মোটর নার্ভগুলো। চিকিৎসা। অজস্র ফিজিয়োথেরাপি। তার পর আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়ি। টলে টলে উঠে দাঁড়াই। হাতে ওঠে লাঠি। প্রাণপণ মনের জোরে নিজেকে একটা মোটামুটি কর্মক্ষম অবস্থায় নিয়ে আসি। রোজগারপাতি কমে গেল। মাটিল্ডা উঁচু ডালে মই বাঁধবার চেষ্টা করল কয়েক বার, কিন্তু টিকতে পারল না। দায়ী ওর সেই আকাটমি। শরীর দেখানো, চুরিচামারি আর ঝগড়া করা ছাড়া আর কিছুরই তো চর্চা করেনি। ককেশীয় রক্তের এই একটা সুবিধে। গায়ের রং, উচ্চতা, গঠন, চোখ-মুখের সৌন্দর্য জিনগত ভাবে পেয়ে থাকে। একটু যত্নআত্তি করলে, ফ্যাশান-ট্যাশন জানলে দাসীকে দাসী বলে চেনা যায় না। মা মেরির দিব্যি বড্ডই নীচু স্তরের। মজা হল আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম এই সময় থেকেই। পার্ট টাইম বেশ্যাগিরি আর পার্ট টাইম দাসীগিরি করে ও-ই আমার থেকে বেশি রোজগার করত। তার ওপর পেশার প্রয়োজনে একটু না ঘুরলে আমার চলে না। কে গাড়ি চালাবে মাটিল্ডা ছাড়া? ওকে ছাড়া আমার উপায়ও রইল না। হয়ে গেলাম ওর রাখনা। ওর দিক থেকে মাঝে মাঝে এক লপ্তে যখন অনেক টাকা রোজগার করতাম, তাই দিয়ে বড়োমানুষি করবার লোভ ছিল। তা ছাড়া বোধহয় একটা ভদ্রস্থ পরিচয়ের আড়াল ওর খুব দরকার ছিল। সুতরাং বিচ্ছেদটা মুলতুবি হতে হতে তামাদি হয়ে গেলই বলা চলে।

৩

একটা পত্রিকার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে যেতে হয়। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ঝকঝকে টয়োটা লেক্সাস ভাড়া নিলাম। বেশ কিছু ফোটো তোলা হল। তখন শেষ রাত্তির, মেয়েটা হালকা মাতাল ছিল। হাইওয়ে থেকে নেমে একটা পুরনো ধরনের গ্রামের ছবি তুলছিলাম। স্রেফ গাড়ির কাচ নামিয়ে। এমন সময়ে মাতালে-বুদ্ধিতে মেয়েটা একেবারে বিনি নোটিসে টপ গিয়ারে গাড়িটাকে হাইওয়েতে এনে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল ট্রাকের সঙ্গে রাম-ধাক্কা।

মাটিল্ডার কিমাকার দেহটার দিকে চেয়ে মনে হল বাব্বাবা, বাঁচা গেল। পরক্ষণেই ভাবলাম, বাঁচবই বা কী করে? কে আর এই বাহাত্তুরে আধা-পঙ্গু ফোটোগ্রাফারের সহধর্মিণী হতে আসবে!

আর তা না হলে কে-ই বা গাড়ি চালাবে! তারপর বোধোদয় হল। নিজের থ্যাঁতলানো মাংসপিণ্ডটাকে পরিষ্কার দেখতে পাই। এহেহে, বেচারা বুড়োটা! তবে বেঁচেই বা কী করত? তিলতিল করে মরা বই তো নয়? বড়ো চমৎকার মৃত্যু! বুঝতেই পারিনি কিচ্ছু! আ-হা। কিন্তু আমি তো তা হলে প্রেত! মাটিল্ডাও কি তবে প্রেতিনী! মারাত্মক ভয়ে আমি হাওয়ার সমুদ্র উথালপাতাল ফ্রিস্টাইলে সাঁতরে যাই। ব্রেস্ট স্ট্রোকে টুঁ মারি আকাশ পর্দায় এবং এক সময়ে উছলে উঠি মহাকাশে।

অসাধারণ এক দৃশ্য আমার ফোটোগ্রাফার সত্তাকে টেনে বার করে। কোনো প্রেতবোধ, শূন্যতাবোধ আমার থাকে না। ফোটো তুলতে থাকি প্রাণ ভরে। যে দিকে তাকাই শুধু পিণ্ডে পিণ্ডে অগ্ন্যুৎপাত। গ্রহ তারা সৌরমণ্ডল নীহারিকা ছায়াপথ ধূমকেতু লালবামন শ্বেতবামন কৃষ্ণগহ্বর অ্যাস্টারয়েড। আশ্চর্য! অত্যাশ্চর্য! এই সব ফোটো যদি 'নেচার'-এ পাঠাতে পারতাম একটা যুগান্তকারী ব্যাপার হয়ে যেত! কিন্তু এও অতি আশ্চর্য যে এই অনন্ত চলন, বিরাট গরিমা তার প্রাথমিক জাদু ক্রমশ হারিয়ে ফেলল আমার চিত্রী চোখে। বড়ো একঘেয়ে লাগতে থাকে। খুব লজ্জা পাই এই মহামহিমের সঙ্গ আর আমায় টানছে না বলে। কিন্তু সত্যি কথা না বলে তো নির্ভেজাল শিল্পীর উপায়ও নেই। নামতে থাকি এবং খুঁজতে খুঁজতে টুক করে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে একটা ওজোন-ফুটো দিয়ে গলে পড়ি।

৪

গ্লোবটার আলো-অন্ধকার আমার চোখের সামনে ঘুরে যায়। ভালো কথা; চোখ, ক্যামেরা এ সব কথা ব্যবহার করছি বটে, কিন্তু এ সব কিছুই আর নেই আমার। শুধু অভ্যাসটা আছে। সর্বসত্তা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তবু বলি চোখ। অনুরূপভাবে নাক, কান, মুখ হাত, পা...

আরও নীচে নামি। উত্তাল সমুদ্র, উত্তুঙ্গ পাহাড়, নিশ্ছিদ্র বনানী। নদীনালা, শহর, গ্রাম, মানুষজন। ছবি তুলে যাই কিন্তু বুঝতে পারি এগুলোর সনাতন রূপে কোনো মৌলিকত্ব আনতে পারছি না। ঢেউ উঠছে তো উঠছেই। ভাঙছে তো ভাঙছেই। সব নদী সমুদ্রের দিকে যায়। সব পাখি উড়ান শেষে নেমে পড়ে নীড়ে। মেরু-অঞ্চল থেকে ক্রান্তীয় ও ক্রান্তীয় থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত ক্যামেরার লেন্স ঘুরে ঘুরে আসে। সোনালি বালু, মাসাই যোদ্ধা, রেন ফরেস্ট, সেক্যুইয়া ফরেস্ট—এ সব কত বেরিয়েছে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর পাতায়। সুতরাং লেন্স ঘুরতে থাকে তৃপ্তিহীন। আর এই ভাবেই এক কৃষ্ণনীলিম রাতে ধরি আলোর ফুটকি দিয়ে আঁকা এক অসম্পূর্ণ গ্রাফিক্‌স! বিন্দুর বিন্যাসে ঢেউ। কিন্তু নিউ ইয়র্ক নয়। গোল গম্বুজ রয়েছে। কিন্তু একাধিক। ওয়াশিংটন নয়। কতকগুলোর চারধারে মিনার, কোনোটার মাথায় পরি। কোনোটার মাথায় নিশান। দৈর্ঘ্যে বড়ো প্রস্থে ছোটো এক মুঠো এক শহর। উড়ালের ডানায় গাড়ির আলোর রেখা, নীচে গাড়ির ভিড়। আশ্চর্য হয়ে দেখি সেই সিগন্যাল সবুজ হয়, সব রকমের গাড়ির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে আগে যাবে। রেস নয়, অথচ ভয়ানক প্রতিযোগিতা। কী আশ্চর্য জাদু জানে এদের চালকরা। এ ওর পাশ কাটিয়ে এতটুকু জায়গা দিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে। তিন চাকার এক রকম গাড়ি তো মনে হল সার্কাসি কসরত দেখাতে দেখাতে ছুটছে। নতুন রকম বটে। ক্লিক।

পেভমেন্টে জমাট জনতা। কোনো উৎসব নাকি? মনে তো হচ্ছে না। তা ছাড়া মানুষ ছাপিয়ে জেগে থাকে গম্বুজ, মিনার মন্দির। আরও সব বিল্ডিং-এর উদ্ভাসিত বডি। হালকা কুয়াশায় মোড়া চুমকি বাহার। এই চুমকিস্তান আমার খাসা লাগে। আরও নেমে যাই সুতরাং। দেখি এক কালো

গুহা থেকে ছত্রভঙ্গ মানুষ-পিঁপড়ের দল উঠে আসছে। যেন কোনো মহাভয় থেকে পালাচ্ছে। নির্ঘাৎ এখানে কোনো সন্ত্রাসবাদী হানা...ও হো, এটা পাতালরেলের সুড়ঙ্গ! লজ্জা পেয়ে দিক পরিবর্তন করি। রাস্তায় রাস্তায় সুদৃশ্য লম্বা বাড়ি, পাশে ভ্যাটে ছড়ানো স্তূপাকার জঞ্জাল। নাক নেই তবু গন্ধ বুঝি। তারপর গন্ধ চিনে চিনে পৌঁছে যাই জঞ্জালক্ষেত্রে। ঘুরে বেড়াচ্ছে অজস্র কীট। না, কীট তো নয়, ময়লা শিশু সব জঞ্জাল খুঁটে খুঁটে কী জানি কী থলিতে পুরছে। পাশ দিয়ে হুশ করে চলে গেল নীল-সাদা বাস, বাস ভরতি চকচকে ঝকঝকে বাচ্চার দল কলকলাচ্ছে। শিশু-কীটগুলি জঞ্জাল খুঁটে খায়। বাস ভরতি শিশুগুলি কলকলিয়ে যায়। বুঝে যাই এখানে আসলে দুটো শহর আছে। গরিব শিশুর শহর আর সচ্ছল শিশুর শহর। আর গরিবরা গরিব হলে কী হবে, তাদের বাচ্চা জন্মানোর কামাই নেই। জন্মানো বাচ্চাগুলোর দেখভাল কিন্তু কেউ করে না। বেশ স্পার্টান ব্যবস্থা। পারলে বাঁচো, নইলে মরো!

সর্বনাশ! জঞ্জালের পাহাড়টা যে ওদের ওপর ভেঙে পড়ল? ক্লিক।

৫

আমার আশেপাশে এখন বেশ কয়েকটি প্রেতশিশু। নিরবয়ব ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছে।

১ম জন—দমবন্ধের সময়ে এট্টুখানি কষ্ট'হয়েছিল। তোর?

২য় জন—তুই কি ওই বদবুতে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলছিস?

১ম জন—ধেৎ, বদবু আমাদের মা-বাপ, বদবু আমাদের ভাত দেয়, তুইও যেমন!

৩য় জন—না রে, ওই পাহাড়ের ভেতরে একশোটা হাজারটা আধা-খ্যাঁচড়া ব্যাঙাচি মেয়ে আছে। পেট থেকে বের করে টেনে ফেলে দেয় তো? দুর্গন্ধ বলে দুর্গন্ধ?

১ম জন—ওদের বেশ আর জন্মাতে হল না! যাক, আমরাও আর জন্মাচ্ছি না! ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে কাগজ, টিন, বোতলভাঙা বার করো রে, সর্দারকে দাও রে, পিটুনি খাও রে!

৪র্থ জন—এখন থেকে পেট ভরে ভাত খাব। আর মাংস। তারপরে সেই ঝলমলে দোকানটা থেকে সায়েবি জামাকাপড় কিনব, প্লেনে উড়ে চলে যাব অনেক দূরে, সায়েবদের দেশে যেখানে বড়ো বড়ো বাড়ির বড়ো বড়ো ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা চলে যায়!

২য় জন—(হেসে) খাবি যে তোর মুখ, জিভ, দাঁত কই? পরবি যে তোর ধড় কই? দেখছিস না কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ বুঝতে পারছি তুই খন্তা, আমি পচা, ওটা মকবুল। ভুতো, রাজু, আসগর আর হরিশ উড়ে আসছে দ্যাখ।

এ বার আমার দিকে ওদের চোখ পড়ল, তুমি সায়েব-ভূত না?

'ঠিক সাহেব নয়,' আমি আমার গায়ের রং আর আদি জন্মস্থানের কথা ভেবে বলি।

সায়েবের মতো, তাই না? ওই যে নীচে একটা জায়গা আছে সেখানে অনেক সায়েবের মতো আছে, দেখবে?

আমি আমার ক্যামেরা রেডি করি। নীচে একটা বিরাট ইনস্টিটিউট বাড়ি থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে প্রচুর, হ্যাঁ, তরুণ-তরুণীই তো মনে হল। সব্বাই একই রকম টাইট টপ আর টাইট জিন্‌স পরেছে।

একজন আর একজনকে বলল, হাই ক্রিস, ডিসিশন নিলি?

দ্বিতীয় জন—নারে প্যাট্‌স, আই নিড আ ফিউ ডেজ মোর, মুঝে টাইম দে বাবা, দিজ ওল্ডিজ আর সো বোরিং।

প্রথম জন—হোয়াট'স দা গ্রেট প্রবলেম? তুই ক্রিস থাকবি গোমজির সঙ্গে, এর মধ্যে ওল্ড পিপ্‌ল আসছে কী করে!

দ্বিতীয় জন—আরে বাবা, গোমজ এ-বার স্টক মার্কেটে কত হেরেছে জানিস? ফিফটিন ল্যাক্‌স, বেবি। ইউ নিড ক্যাপ্‌স, বুড়োবুড়ি চট করে দেবে নাকি?

তৃতীয় জন—তো যা, কত লিটার অয়েল লাগবে হিসেব কর। ডিসগাস্টিং! ধরিয়ে দে না পাত্তি পুরিয়া, দিতে পথ পাবে না।

'অনেকটা সায়েবের মতো, নয়?' খন্তা বলল।

আমি ভাবতে থাকি, ভাবতে থাকি। ঠিক সাহেবদেব মতো কি?

আরও দেখাচ্ছি, এসো।

হুশ করে নেমে পড়ি একটা আধা-অন্ধকার ঘরে। আলো জ্বলছে, নিবছে, প্রায় বিবসন তরুণ-তরুণী নাচছে। এঁকেবেঁকে, যেন ঘরময় সাপ কিলবিল করছে। ক্যামেরা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

দ্যাখো, ওরা কী খাচ্ছে!

নীলিম আকাশের নীচে নীল সুইমিং পুলের পাশে কাবাব উৎসব হচ্ছে। কাবাব মোগলাই ডিশ। আমার খুব প্রিয়। এলাহি আয়োজন।

রাজু বলল, আরও খানা আছে। পিলা, সফেদ, হর রং। কী খুশবু! আচ্ছা সায়েব ভূত, ওরা সব খেতে পারে না। তবু আমাদের দেয় না কেন বলো তো?

কালু বলল, আসল কথাটা বল না, খালি পিলা-লাল। ও সায়েব ভূত, সায়েবদের দেশের রাস্তাটা বাতলে দেবে?

অনেক দেশ তো আছে। কী রকমটা চাও?

যেখানে মা-বাবা থাকে। বাবা মাকে ঠ্যাঙায় না। মা বাবাকে খিস্তি করে না। যেখানে সর্দার আমাকে চোর-ঠ্যাঙান ঠ্যাঙায় না। আমাদের নীল-সাদা বাসে করে ইস্কুলে নিয়ে যায়। আর যে দেশে সত্যিবাদী লিটার আছে।

লিটার?

ওই যে গো মানুষের মতো। ওরা মাঝে মাঝে দাঁড়ায় আর বলে ভাত দেব, জল দেব, লাইট দেব, পাকা ঘর দেব, কিন্তু দ্যায় না।

শিশুর দল কলবল কলবল করতে করতে মিলিয়ে যায়। সাহেবদের দেশের কথা ভুলে, জীবন্মুক্তির খুশিতে ভরপুর।

৬

নিঃসঙ্গ আমার লেন্সে ভেসে ওঠে বাজার।

পাঁচ আঙুলে পাঁচ আংটি ধবধবে পোশাক এক চেকনাইঅলা কালো ব্যক্তি টাইগার প্রন-এর ঝাঁকার সামনে দাঁড়িয়ে।

'৬০০ টাকা দর কিন্তু।'

'আরে যা যাঃ, দর দেখাসনি, পাঁচ কেজি তুলে দে। আছে তো? তোপসে দে চার কেজি।' একটি রোগা, ভুড়িঅলা নিরীহ চেহারার লোক এসে দাঁড়ায়। পরনে লুঙ্গি। বলে, 'মিরগেল আজ কত যাচ্ছে?'

মাছঅলা তোপসে ওজন করছিল। জবাব দিল না। একরাশ কুচোমাছ একদিকে জড়ো করা ছিল। সেদিকে আঙুল দেখাল।

সসঙ্কোচে কিছু কুচোমাছ কিনে লোকটি চলে যায়। কুচোমাছের খদ্দের আর পাঁচ-ছ' কেজির খদ্দেরকে যার যার সওদা সুদ্ধ ক্যামেরায় ধরে রাখি।

মাছওলা বলল, পেনশন পজ্জন্ত পায়নি, আবার মিরগেলের দর...

চেকনাই বলল, কে ওটা?

যদুগোপাল ইস্কুলের মাস্টার।

তা পেনশন পেল না কেন?

হেডমাস্টার আর পেনশন আপিসের বাবুদের খাওয়ায়নি। আবার কী? ওরা কাগজপত্তর সব গোলমাল করে রেখে দিয়েছিল। পাঁচ বছর জুতোর সুকতলা খুইয়ে এখন বলচে পেনশন হবে না।

বলিস কী রে? তা তুই এত জানলি কী করে?

আমার ছেলে দুটো তো ওই ইস্কুলের। আবার ওই মাস্টারের পাইভেট ছাত্তরও ছিল। বড়োটাকে বি কম পজ্জন্ত পাস করাল। ঢুকিয়ে দিয়েছি সরকারি আপিসে। সিডিউল কাস্টোর খাতায়। ছোটোটা ঘষটে ঘষটে একটা পাস দিয়েছে। ধরেছে প্রোমোটারি করবে।

হাঃ হাঃ বলো কী হে? আমার ভাত মারবে?

সসম্ভ্রমে মাছঅলা বলল, 'আপনি প্রোমোটার নাকি? এ দিকে তো দেখিনি!'

এ বার দেখবে। 'রূপসায়র'-এর বোর্ড দেখেছ তো? জলাটা বুজোতে মেলা ঝামেলা গেল। পাকাপাকি থাকব তেরো তলায়। শিগগির আসছি।

চেকনাই আর মাছঅলার সব কথা আমি ভূত হয়েও ভালো বুঝতে পারিনি। নেহাত কৌতূহলে চেকনাইয়ের পেছু নিয়েছিলাম। তা বেরিয়েই চেকনাই একটা বিরাট মিছিলে আটকে গেল। একটু পরে দেখি লোকটা বিনবিন করে ঘামছে। ইশারায় মুটেটার কাছে জল চাইল। আমার অভিজ্ঞতা আছে, বুঝলাম লোকটার স্ট্রোক হচ্ছে। ধড়াস করে পড়ল। ছুটে এল কিছু লোক।

আধমনি কৈলাশ, আরও কজন লাগবে। এই একটা ট্যাক্সি দ্যাখ তো!

মুটেটা ততক্ষণে মোট সুদ্ধ হাওয়া হয়ে গেছে।

ট্যাক্সিটা যদি বা পেল, মিছিল পার হতে পারল না। মিছিল যদি বা পেরোল, হাসপাতালে জায়গা হল না। হাসপাতালে যখন জায়গা হল তখন চেকনাই হুশ করে আমার পাশে এসে গেছে। একটার পর একটা এসে যেতে লাগল এর পর। বাচ্চা, ধাড়ি, বউমানুষ, আধবুড়ো... গাদা একেবারে। চেকনাই টক করে হাওয়া হয়ে গেল। বলে গেল 'টা টা বাই বাই/আবার যেন দেখা পাই। আলাপ করার ইচ্ছে ছিল সাহেব দাদা, দেদার ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে আপনাদের ওদিকে। কিন্তু মিছিল, এই মিছিলকে আমি বড্ড ভয় পাই।' এই প্রেতলোকের ছবিটা আমি আগাগোড়া তুলি। এখানে কথা কম। কাজ বেশি। তা ছাড়া আমার আর অসুবিধেই বা কী!

তা যদি বলেন মিছিলে আমারও বড্ড ভয় ধরে গেছে। কোনো যুক্তি নেই, তবু ভয়। পালাতে থাকি।

৭

ঘোর অন্ধকারে উম্মত্ত কাণ্ডের সামনে পড়ে যাই। একটা মেয়ে আর তাকে ঘিরে তাকে নিয়ে সাত-

আটটা লোক, তাদের পরনে ইউনিফর্ম। মেয়েটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আর গলা দাবিয়ে খুন করে দেয় ওরা। ক্লিক। আলোয় অন্ধকারে এ রকম আরও দৃশ্য দেখি, গাড়ি থামিয়ে টেনে বার করছে। মোটর বাইকের পেছন থেকে টেনে নামাচ্ছে। গলিতে গলিতে ওত পেতে আছে। লাথি মেরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নায়কোচিত দর্পের সঙ্গে গালাগাল সহযোগে ধর্ষণ ও খুনের কাজটা সম্পন্ন করছে। পাঁচটা লোক একটা লোককে জ্যান্ত অবস্থায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটছে দেখলাম। বুলেট, ড্যাগার, স্টিক, ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

কারা যেন প্রচণ্ড চ্যাঁচায়। এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতিবাদে নিশ্চয়ই। পটকা ফাটছে, রকেট উঠে যাচ্ছে আকাশে। বড়ো বড়ো করে লেখা ব্যানার, 'ওয়ার্ল্ড কাপ রানার্স জিন্দাবাদ।' 'ওয়ার্ল্ড কাপ রানার্স জিন্দাবাদ।' গাঁদা ফুলের পাপড়ি ছড়ানো পথে যাই, দুধারে জনতা উন্মত্তের মতো শিস দিচ্ছে, নাচছে! বাজনা বাজছে। 'জিতল কে? জিতল কে/লাল হলুদ আবার কে?' পিলপিল করে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ ছুটছে—এ পথ দিয়ে মহাতারকারা যাবেন, বলিউড! বলিউড! সমস্ত উঠে যায় আমার ভূতগ্রস্ত ক্যামেরায়।

অসীম ধৈর্যে ভিড় পার হয়ে একটি মলিন চেহারার ছেলে বাড়ি ফেরে, 'আজ টিইশনের টাকাটা পেয়েছি মা, রাখো।'

এত কম?

ভাইরাল ফিভারে কামাই হয়ে গেল, কেটেছে।

দুটি মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভিড় বাসে উঠে গেল। বুটিকটা শুরু করবার টাকা জোগাড় করতে হবে বুঝলি? গোলি মারো কনট্র্যাক্টের চাকরিকে! এবং কোথা থেকে ধোঁয়ার মতো কবিতা ওঠে, গান ওঠে, ঝমঝম করে বাজনা বাজে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। সুন্দর সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ। গান হচ্ছে, চটুল গান, গভীর গান। কবিতা হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, নাটক হচ্ছে। প্রেমের কবিতা, প্রতিবাদের কবিতা, গ্রামের গপ্পো, শ্রমজীবীদের গপ্পো, ষড়যন্ত্রের নাটক, কিম্ভুত নাটক। মেলা দেখি, অজস্র মেলা। আর তার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে। অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো কুকুররা আমার প্রেত দেখতে পেয়ে যায়। ছুটে আসতে থাকে লক্ষ লক্ষ ঘেয়ো কুকুরের পাল, লম্ফঝম্প, কেঁউ কেঁউ, ঘোউ ঘোউ। কাকেরা গলা মেলায়। শকুন ঘুরতে থাকে হাসপাতালের আস্তাকুঁড়ে। জিঘাংসায় মৃত, ধর্ষণে হত, দুর্ঘটনায় থ্যাঁতলানো শবরাশির ওপর। ক্রমে এই সমস্ত শব শকুন হত্যা হস্তশিল্প কুকুর ও কবিতা ছাপিয়ে উঠতে থাকে কাকের আওয়াজ, আজানের সুর, গ্রন্থপাঠ, ধর্মগুরুদের স্বস্তিক সদানন্দ মুখনিঃসৃত শিবনেত্র উপদেশামৃতের গমগমে আওয়াজ। মাথা তুলে উঠতে থাকে সুপার মার্কেট, বিশাল বিশাল বিলাসবহুল সব পেয়েছির দোকান। চরম হতাশায় বুঝতে পারি দেখনসুন্দর, মাখনহাসি, গহ্ন-পচা মাটিন্ডার প্রেত এখন বিছিয়ে আছে গোলার্ধের এই অক্ষাংশ এই দ্রাঘিমায়।

আমার সারা জীবন-মরণের সবচেয়ে অ্যাবসার্ড ছবিটি আমি পাঠাতে থাকি তরঙ্গে তরঙ্গে যতক্ষণ না কোনো লেক রোডের কোনো অম্বুজ শ্রীনিবাসন তার অ্যান্টেনায় পুরোটা নির্ভুল ধরতে পারে। কেন না প্রেত হলেও শেষ বিচারে তো আমি শিল্পীই।

প্রকাশ না করে আমার উপায় কী!

পিঁপড়ে

কাদাগোলদিয়া গ্রামে একটা খুন হয়ে গেল। খবরের কাগজে খুন আর ধর্ষণের খবর অবশ্য নিয়ম করেই থাকছে। ব্রেকফাস্ট যেমন নিয়ম, সে চা-মুড়িরই হোক আর চা টোস্টেরই হোক, খুনও তেমন নিয়ম। হোটেলে জিজ্ঞেস করবে—ডিম কি সিদ্ধ না ওমলেট? পোচ না স্ক্র্যাম্‌বল্‌ড্? তেমনি ধর্ষণ কি সিঙ্গল ধর্ষণ না গণধর্ষণ? শুধু ধর্ষণ না তারপরে খুনও? কী ধরনের খুন? গলা-ফলা টিপে, না কুচি কুচি করে কেটে? এইগুলোই হল যাকে বলে ডিটেলের কাজ। এগুলোর দিকেই মনোযোগ চট করে চলে যায়। শুধু খুন-ধর্ষণের খবর এখন বড়ো জোলো হয়ে গেছে। বস্তুত খুনের খবরটার চেয়ে অকুস্থলের নামটা কাগজ পড়ুয়াদের আমোদ দিল বেশি। কাদাগোলদিয়া! আচ্ছা উদ্ভট নাম তো! এখন, 'পিচকুড়ির ঢাল' যদি কোনো গ্রামের নাম হতে পারে, 'ঘোকসাডাঙা' বলে যদি কোনো জায়গা থেকে থাকে তাহলে কাদাগোলদিয়া কী এমন দোষ করল? তবু লোকের হাসি থামতে চায় না। কাদাগোলদিয়া! ছেলেমানুষরা বলছে, 'বলটায় এত কাদা লেগেছে যে কাদার বল বলে মনে হচ্ছে। সেটাকেই কেউ কোনো সময়ে এক শটে গোলপোস্টে পাঠিয়ে দেয়। বুঝলি? কিংবা কাদা বলে একটা ছেলে গোলটা দেয়। কাদা গোল দিয়া।'

কিন্তু অন্যে অপরে হাসছে বলেই তো কাদাগোলদিয়ার লোকে হাসতে পারে না। খুনটা তাদেরই গ্রামের প্রান্তিক বনবাদাড়ে হয়েছে কিনা! কোনো গুন্ডা বদমাশও নয়। গেছে এক মাঝারি চাষি বাড়ির চালাকচতুর করিৎকর্মা ছেলে হাসান। সব দিকে নজর ছিল হাসান মিঞার তা যদি বল।

বডি আবিষ্কার করে, পরান মণ্ডল। সে ভোরের দিকে মাঠ সারতে গিয়েছিল। যেমন যায়। সবাই জানে পরান রাত থাকতেই যায়। ঝোপের আড়ালে কার পা দেখে উঁকি মারে—কে রে? নিজের আবরু ক্ষুণ্ণ হওয়াটা সে ভালো মনে করেনি। তা তারপরেই মাঠ মাথায় উঠেছিল। লুঙ্গি হড়কানো অবস্থায় সে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটেছিল, 'খ্‌খুন। খ্‌খুন'...

পুকুরের ধারে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় পরান। 'খুন হওয়া' কাউকে তো সে কখনও দেখেনি! আশ্চর্যের কথা হলেও কাদাগোলদিয়ায় এই প্রথম খুন। কিছু কিছু লোকে তার চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু কোথায় কে আগড়ম বাগড়ম চ্যাঁচাচ্ছে ভেবে কিছু লোক আসেনি, কিছু আবার ভয় পেয়েছিল, খুনটা হয়ে গেছে না এখন ঘটছে এইটা না বুঝতে পারাই তাদের ঠকঠকানির কারণ। কিছু লোক অবশ্য বেরিয়ে আসে, যেমন শেখ আমিন, মৃত্যুঞ্জয় মাঝি, রজব মণ্ডল, গদাধর পণ্ডিত, সুরেন গুছাইত। এঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, কলজেতে হিম্মত আছে। সহসা ভিরমি খান না।

'কী হয়েছে রে পরান? কী বলছিস, এ কী দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে যে! জল ঢাল, জল ঢাল, চামচে আন, চামচে আন!'

'কী হয়েছে বাবা!' —শেখ আমিন মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভয় পেয়েছ? কেন?'

বাক্যশূন্য পরান দূরে জঙ্গলের দিকে কম্পিত আঙুল তোলে।

অতঃপর দল বেঁধে সবাই জঙ্গলের দিকে চলে. সে জঙ্গলের নাম বজ্জিডোবার জঙ্গল।

কাদাগোলদিয়া নামটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কিন্তু বুজিডোবাটা তুলনামূলকভাবে সহজ। একটা বড়ো পুকুর বুজে বুজে জায়গায় জায়গায় দঁক হয়ে গেছে। সেই আধবোজা পুকুরের সৌজন্যেই হয়তো গাছ-আগছার এত বাড়বাড়ন্ত এখানটায়। আর তাই এই নাম।

হাসান পড়ে আছে, চিৎপটাং একেবারে। কোপটা গলার পেছনে, অর্ধেকটা হাঁ হয়ে রয়েছে। সামনে থেকেই বোঝা যাচ্ছে, রক্ত কালচে বেঁধে আছে চারপাশটায়। চোখ যদিও খোলা, তবু মনে হয় না খুনিকে দেখতে পাওয়ায় কোনো ভয়ভীতি বা বিস্ময় সে চোখে আছে। পেছন থেকে ঝোপ বুঝে কোপ, সঙ্গে সঙ্গে ধড়মুণ্ডু ফাঁক। পিঁপড়ে ধরে গেছে লাশে, ডাঁশ ডাঁশ লাল বিষ-পিঁপড়ে।

ক্রমশই লোক জমে, ছেলেবুড়ো, ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে যে যেখানে আছে। একটা মৃদু জোঁ-ও-ও মতো আওয়াজ। এত লোকে শ্বাস ফেললেও তো একটা আওয়াজ হয়! বাস, নইলে সব স্তব্ধ। কে মারল, কেন মারল, কখন মারল—এসব প্রশ্ন এখনও ওঠেনি। বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সব বোবা হয়ে গেছে। এমনকি হাসানের বউ, মা পর্যন্ত। ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। এরা কেউ কখনও খুন হয়ে যাওয়া মানুষ দেখেনি তো! এ যেন একটা সিনেমা! মারপিট, রাগারাগি দেখেছে। কিন্তু হয় গদাধর পণ্ডিত, নয় শেখ আমিন, নয়তো রাশভারী হারান ঘোষ মশাই সেসব থামিয়ে দিয়েছেন। স্তবকবচমালা গড়গড় করে বলে যাবে গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে। তুমি কমা দাঁড়ি পাবে না। শেখ সাহেব পঞ্চায়েত-প্রধান—তাঁর কাজই হল গরমেন্টের গ্রান্ট সব ভাগবাঁটোয়ারা করা, ঝগড়া-কাজিয়া থামানো, ছোটো-আদালত হলেন তিনি গাঁয়ের। আর হারান ঘোষ? প্রচুর গোধনের মালিক। ভূমিসংস্কারে সিলিং এর জমি চলে যাওয়ার পরে উনি দুধের কারবার ফলাও করেছেন। ধনীও বটে, আবার অভিভাবকও বটে সবার, ফাদার-ফিগার যাকে বলে। হারান ঘোষের কথা অমান্য করবে এত বড়ো বেয়াদব এ চত্বরে কেউ নেই। তা ছাড়া সবাই-ই পঞ্চায়েতের মেম্বার। কাদাগোলদিয়া-ভাগ্যবিধাতা।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে হাসানের মা ছেলের বুকের ওপর ঝাঁপাই ছুড়তে যাচ্ছিল। প্রধান তাকে অনেক কষ্টে থামায়।—'অমন করো না হাসানের মা। এ এখন পুলিশ কেস। একটি জিনিসে হাত দিলে ফটকে উঠে যাবে, তাদের কাজের অসুবিধে হবে। তুমি তো চাও তোমার ছেলের খুনি ধরা পড়ুক। না কি?'

'খুনি পেলে কি আমার ছেল্যাটা ফিরে আসবে গো-ও-ও'—মদিনার শাশুড়ি আমিনা আর লোকলাজ মানে না, চুল ছিঁড়ে কাপড় ছিঁড়ে একশা করে। হন্তার শাস্তির চেয়ে নিহতের পুনর্জীবনের জন্য তার আকিঞ্চন অধিক। এই উথালপাথাল মড়াকান্নার আসরেই কাটা গাছের মতো ধড়াস করে পড়ে যায় বাক্যহীন হাসান-বিবি মদিনা।

এতক্ষণে ব্যাপারটার নিষ্ঠুর নগ্ন বাস্তবটার মুখোমুখি হল সবাই। মুখর হয়ে উঠল শোকে, রাগে, প্রতিশোধ-স্পৃহায়। যথাসময়ে পুলিশ এল, মাপজোক, ফোটো, সরেজমিন তদন্ত যা করার করল। সাংবাদিকও এল ঝাঁকে ঝাঁকে।

'কী দেখলেন পরানবাবু?'

পরান বেচারি কিছুই দেখেনি। তখনও অন্ধকার, তবে তার চোখ-সওয়া। সে দেখেছে শুধু একজোড়া পা। রক্তগঙ্গার মধ্যে একখানা মুখ, একখানা ধড়। সেই হতভম্ব মুহূর্তে ঠিকঠাক চিনতেও পারেনি যে এ তারই হতভাগ্য সাঙাত।

'তবে যে বলছিলেন আপনার দোস্ত হাসান মিঞা?'

এই পুলিশি এবং সাংবাদিকি জেরার উত্তরে মূর্খ পরান কী বলবে? চিনতে না পারা! ছুট দেবার

আগের ভগ্নাংশ মুহূর্তে চিনতে পারা, চোখ ও মনের এবং তাদের পেছনের মস্তিষ্কের এই জটিল ব্যবহার সে ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না।

আমি খুন করিনি গো। আমি কিছু জানি না—চিকরে, ডুকরে ওঠে পরান।

সবাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করে, পুলিশ কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকে। সাংবাদিক লেখে—'কাদাগোলদিয়ার হাসান মিঞাকে হত্যার অপরাধে তার প্রতিবেশী ও বন্ধু পরান মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে।'

গ্রেপ্তার করা আর প্রমাণ করার মধ্যে অবশ্য আসমান-জমিন ফারাক। কিন্তু খবরের কাগজ পড়া লোকেরা বড়ো কুঁড়ে। তাদের একটা খবর দিলেই সেটা গপ করে গিলে নেবে, তারপর যখন-তখন উগরোতে থাকবে। যাক্ একটা খুন হয়েছে, খুনিও পাওয়া গেছে। মিটে গেল। তার কী-কেন নিয়ে লোকে ক-দিন মাথা ঘামাবে? তদ্দিনে আর কতকচাট্টি খুন ধর্ষণ তো খবরে এসেই গেছে!

এদিকে পরানের জেরা চলছে।

হাসানের বউ মদিনার সঙ্গে তোর আশনাই ছিল?

এমন কথা বললে তোমার জিব খসে পড়বে গো পুলিশবাবু।—এক লাথি বুটের।

এক সীমানা তোদের জমিনের। মাঝের শিমুল গাছটা নিয়ে অনেকদিনের মনকষাকষি। হাসানের মা বলেছে।

চাচির জিব খসে পড়বে গো এমন কথা বললে। শিমুল গাছ? শিমুল গাছ দিয়ে কী হবে গো! তেমন ছায়া পজজন্ত নি। দুকুরবেলা শিমুলতলায় খেতে বসতুম মাথায় ভিজে গামছা বেঁধে। এত রোদ্দুর, এত রোদ্দুর, যেন শলার মতো ফুটতেছে।...

গ্রামের বোর্ডও বিশ্বাস করতে পারে না, পরান এমন কাজ করেছে। সে ষণ্ডাগণ্ডা ঠিকই, রাগিয়েছ কি মাথায় খুন চেপে যাবে। বউকে সে যে মাঝে মধ্যে পিটুনি দেয়, ছেলে প্রাইমারিতে ফেল করেছিল বলে যে তাকে সে চোরের ঠ্যাঙানি দিয়েছিল, একথা সবাই জানে। কিন্তু মানুষটা এমনিতে খুবই নিরীহ। উপরন্তু পরান-হাসান মানিকজোড়। পরানের গতর আর হাসানের মগজ এই দুটি খুব ভরসার জিনিস এদের।

গদাধর পণ্ডিত বললেন, পরান এ কাজ করতেই পারে না।

শেখ আমিন বলেন, 'করবেই বা কেন? ধরো ভোরের বেলা মাঠ সারতে গিয়ে কোনো তুশ্চু কথায় কাজিয়া লেগে গেল। মারামারি করবে? তো বদনা দিয়ে করুক। হেঁসো পাবে কোথায়? হেঁসো নিয়ে যাবে কেন?'

হারান ঘোষ মোটা মানুষ। তায় ভয়ও পেয়েছেন বিলক্ষণ, হাঁপিয়ে-হুঁপিয়ে বললেন, সেকালে আগে থেকে একটা রাগ পোষা ছিল বলতে হয়।

গ্রামের মাথারই যখন এমন ধন্দে পড়ে গেছে তখন অন্যে পরে কা কথা। মাঝখান থেকে হাসানের মদিনা আর পরানের ময়না কেঁদে বুক ভাষায়। হাসানের মা শয্যা নিয়েছে। পরানের বাপ দু-বেলা প্রধানের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করছে।—আর কেউ না জানুক, আপনি তো জানো পরান আমার হাট্টা-কাট্টা হলে কী হয় ভারি মায়াবি মানুষ, তার ওপর ভীতু, শেখ সাহেব ওকে আমার ছাইড়ে আনো।

গ্রামের তিন মাথা চিন্তিত, বিষাদগ্রস্ত মুখে চেয়ে থাকে। অজ পাড়াগাঁয় মানুষ তারা। পঞ্চায়েত-প্রধানই হোক আর সংস্কৃতজ্ঞ পুরুতঠাকুরই হোক। পুলিশে ধরলে কী করতে হয় না হয়, তেমন জানা নেই। এ ফৈজত তো ছিল না এখানে।

অবশেষে তিনজনে পরামর্শ করে সদরে যায়, উকিল ভাড়া করে।

'আমাদের ঘরের ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে হবেই উকিল স্যার।'

জোড় হাত করে শেখ দাঁড়িয়ে থাকে যেন উকিল স্বয়ং আল্লার রসুল। গদাধরও জোড়হস্ত। নেহাত বামুন তাই পায়ে পড়তে পারছে না। কিন্তু মুখখানি যারপরনাই কাতর। হারু ঘোষ আসেনি বটে, কিন্তু উকিলের খরচ মেটাতে সবচেয়ে বেশি চাঁদা সে-ই কবুল করেছে। না করেই বা করে কী! গরিবগুর্বো লোক সব। চাষিভুষো। সরকারের কাছ থেকে কিছু জমির পাট্টা পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বীজ কই? সেচের জল কই? সার কই? যদি বলো পঞ্চায়েত তো আছে। গরমেন্টও তো দিচ্ছে। দিচ্ছে একশোবার, কিন্তু পঞ্চায়েতের কি একটা হ্যাপা? এই বান ডেকে গেল তো এই আবার রোদের জ্বলুনি। এই ডেঙ্গুর মড়ক তো এই টিউকলে বিষ উঠছে। মানুষ যায় কোথায়? যাক্ হারান গাঁয়ের মাথা, সে দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না, চায়ও না। এর বদলে সে যে সারা গাঁয়ের মান্যিগন্যি পাচ্ছে?

শেখসাহেব আর গদাপণ্ডিত কখন আসে, কখন আসে। সারা গাঁ পথ চেয়ে রয়েছে। হারু ঘোষ আপন গোলার পাশটিতে কাঠের চেয়ারে বসে আছে। পরানের বাবা পেছন চুলকোতে চুলকোতে বলে উঠল, 'কী পিমড়ে, কী পিমড়ে! হারুদাদা কী পিম্ড়েই না হয়েছে তোমার উঠোনে। এ যে করাতের কামড় গো!'

'যা বলেছিস নেপু, আমাকেও ক-দিন যেন বড্ড কামড়াচ্ছে! মিনিটা চাদ্দিকে এঁটোকাঁটা ছড়িয়েছে বোধহয়। ওরে ও করালী, কেরোসিন জল ঢেলে উঠোনটা মুছে দিয়ে যা না!'

গরম পড়লেই এই বিপদ। পিঁপড়েরও গরম লাগে, সে গর্ত থেকে বেরিয়ে মানুষের বিছানাপাতির ঠান্ডা খোঁজে। আর ফাঁকতালে ঠান্ডা গায়ের গরম রক্ত খেয়ে নেয়। মজা হল এই যে, পুত্রশোকে মানুষ নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে অসাড়মতো হয়ে যায়—এমনটাই শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল খুনের আসামি ছেলের কাতর বাবা পিঁপড়ের কামড়টুকুও সইতে পারছে না। 'ধুত্তেরি ছাই' বলে নেপু মণ্ডল কিছুক্ষণ পরেই উঠে পড়ল।

এদিকে পুলিশের হয়েছে মহা ঝামেলা। এ শালা সমানে থার্ড ডিগ্রি খেয়ে যাচ্ছে। জিব বেরিয়ে যাচ্ছে তবু বলবে না মদিনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক হয়েছিল। ও সি মমতাময় সবজান্তা হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আরে গাড়ল, এতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন? এ তো হয়েই থাকে! ইয়ারবকশি বিবি তো এক হিসেবে তোরও বিবির মতন। একটু আধটু ফস্টিনস্টি করেছিস বই তো নয়! তাতেই হাসানের অত খচে যাবার কী হল! একেবারে খুন করব বলে শাসানি! ভোরবেলায় ডাক দিয়েছে যাতে কাকপক্ষীটিও টের না পায়। নাও এখন বোঝো ঠ্যালা, নিজের হেঁসোয় নিজেই খুন!' প্রসঙ্গত হত্যার অস্ত্র সেই হেঁসোটা বুজিডোবার কোনো অগভীর জলার কাদা থেকে উদ্ধার হয়েছে, দেখা গেছে ওটি হাসানেরই।

শেখসাহেব, হারু ঘোষ এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে। তবে কি হাসান কোনো গোপন কারণে আত্মঘাতী হল? গদাধর কথাটা উড়িয়ে দিয়েছে। নিজের ঘাড়ে কোপ দেবে তারপর দশ হাত দূরের কাদায় হেঁসো পুঁতে আসবে এমন আত্মঘাতী এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

যাই হোক, ও. সি বাবুর কথায় মার-খেয়ে-সর্বাঙ্গের-ছাল-উঠে-যাওয়া পরান ঝেঁঝে বলে, 'ও তোমাদের ঘরে হয় গো পুলিশবাবু। দোস্তের বিবির সঙ্গে কথা বলতেই মোরা চোখ নীচে থুই। হাসান শাসানি দিয়েছিল এমন মিছে কথা আমায় মেরে ফেললেও বলতে পারবোনি। ওরে হাসান রে...হাসানের নাম ধরেই ডুকরে ওঠে পরান।' এবং ও.সি দাঁতে দাঁতে ঘষে বলেন, 'বজ্জাতের ঝাড়, কথা বলতেই চোখ নীচে থুই, কলির লক্ষ্মণ!'

তবে একটা কেস পুলিশ দাঁড় করিয়েছে ঠিকই। বনবাদাড়, জলাজঙ্গল, কাকপক্ষী ডাকেনি, পরানের হাতে গাড়ু, হাসানের হাতে হেঁসো, হাসান খুন, পরান আবিষ্কারক, দুজনে ঘরেও পড়শি, জমিজমাতেও পাশাপাশি। দু-জনেই বর্গায় জমি পেয়েছে, সোনা ফলাচ্ছে। পরানের গতর, হাসানের মাথা। একটা না একটা সুতো এর মধ্যেই আছে। আসামি পরান মণ্ডল সদরে চালান হয়ে গেল। পুলিস ফাটকে। কেস উঠবে মহামান্য সরকার বনাম পরানকেষ্ট মণ্ডল। কাদাগোলদিয়া চাঁদা তুলে উকিল দিয়েছে, ঘোড়েল উকিল। হাঁ করলে কথা বুঝে যায়।

বলে, 'শুনুন মশাই। কোর্টে কেস ওঠবার আগে আমি আপনাদের এখানে জেরা করতে চাই। বলুন দিকিনি গ্রামে কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে কি না।

'হায় আল্লা' —শেখ আমিন বললেন, 'হোল কাদাগোলদিয়া এক রং, এক মন, এক প্রাণ। তাতেই না গাঁয়ের এমন রবরবা!'

আপনি পঞ্চায়েত-প্রধান আপনি তো বলবেনই। তা ছাড়া রবরবা বলতে তো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটা ভালো পুষ্করিণী 'নেই, নদী মজে এসেছে, ক-টা মাত্র পাতি কুয়ো, বড়ো চাষিদের কিছু শ্যালো ম্যালো আছে হয়তো, রাস্তায় গোছডোবা কাদা, অর্ধেক লোক মজুর খাটে। আপনি ঘোষমশাই না হয় সম্পন্ন লোক, নিয়মিত মাদার ডেয়ারিতে দুধ সাপ্লাই দিয়ে থাকেন—চোখ মটকে শেখের দিকে চাইল উকিল—আপনার কথাও স্বতন্ত্র। আপনার হাত দিয়েই তো সরকারি টাকার বিলিবন্দোবস্ত হয়। কিন্তু আর সব? বেশিটাই তো হাঘরে-হাভাতে।

'গদাধর টিকি নেড়ে বললেন, এ আপনার অন্যাই অন্যায্যি কথা উকিলবাবু। গরিব বড়োলোক সর্বত্তর থাকবেই, ও আপনি যতই কেন সাম্য করুন। দেখতে হবে মিলমিশটা আছে কিনা। এই যে আপনাকে সব চাঁদা করে ফি দেওয়া হল, তা কি হত যদি এক মন এক প্রাণ একতাটি না থাকত! নিজ কথা নিজ মুখে বলতে নাই...কই রে তোরা বল না!'

পরানের বাবা নেপু মণ্ডল চোখ মুছে বলল, তা সত্যি কথা বাবু, ও ঘোষমশাই আর পণ্ডিত মশাই-ই আপনার ফিস্-এর বারো আনা দিচ্ছেন, আমার পরানকে ছাইড়ে আনার জন্যে।

'ভালো'—উকিল বললেন, 'তা এ তো দেখছি মিক্স্‌ড় গাঁ। হিঁদু-মোছলমান সম্পর্ক কেমন? দুই কমিউনিটি হয়তো ভেতরে ভেতরে খেপে আছে। হাসানের খুন হল গিয়ে দাঙ্গার প্রথম স্টেজ।'

কথা শেষ হতে না হতে তড়াং করে উঠে দাঁড়ায় সুরেন, বদর। তেরিয়া গলায় বলে—'খবর্দার।'

রবিউল, নিতাইপদ, ওমর, কালোবরণ যে যেখানে ছিল যার যার মতো কসম খেলো, ওসব পাপ-কথা আমাদের বলবেন নে। যদি বলো কেন তো আমরা সব এক দরের লোক—পুজোই করি আর নামাজই করি। দুটো ভাতের জোগাড় করতে জিব বেরিয়ে যায়। আবার দাঙ্গা!'

গদাই পণ্ডিত বললেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো—আসাদ, সুরেন, বদর ঠিক বলেছে। এ গাঁয়ে আমিই একমাত্তর বিশুদ্ধ ভটচায্যি আর সব...'

খুন হতে হলে তা'লে আপনাকেই হতে হয় বলছেন?

উকিল চতুর হেসে পণ্ডিতের দিকে তাকালেন...আপনিই প্রকৃত মাইনরিটি!

খ্‌খুন কেন? ওরে বাপরে...এসব কী অলুক্ষুনে কথাবাত্রা আপনার? রামঃ।

গদাই যেমনই ভয় পেয়েছে তেমনই চটেছে।

দুঃখের কথা ভুলে দু-চারজন মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। উকিলের ইশারায় এবার শেখ আমিন তার দশাসই চেহারা মেলে উঠে দাঁড়াল। বাজের মতো গলায় বলল, 'মদিনা বিবি, ময়না-বউ সত্যপিরের কসম খেয়ে বলো দিকিনি এ ব্যাপারে তোমরা কিছু জানো কি না! ভয় কিছু নেই।'

দুই বউ ঘোমটার আড়ে এ ওর মুখে চায়। বলে কী! ঘরের মানুষ খুন হল বনজঙ্গলে, আমরা জানব কী?

শেখ আরও গম্ভীর গলায় বলল, পুলিশ সন্দেহ করছে ময়না বউয়ের সঙ্গে হাসানের...

বউগুলি তো ছেলেমানুষ! ময়না-বউয়ের শাশুড়ি এবার একটা বাঁকারি নিয়ে তেড়ে আসে। বাতাসে শপাত করে চালায় আর রক্তচক্ষে বলে, 'মোদের এক ছেল্যা অক্ত গঙ্গা, আরেক ছেল্যা পুলিশের ঠ্যাঙায়। ইয়ার্কি পেয়েছ শেখ? দেখে নিবো। অন্যের বিবি-বউয়ের দিকে কোন ভামের নজর সে হাঁড়ি হাটে ভেঙে দিব না কি?'

লোক সব মুচকি মুচকি হাসল। তেমন কিছু নয়। ও শেখসাহেবের একটু দোষ আছে। বউ মানুষ কি ডবকা মেয়ে একা পেলে দুটো বেশি কথা কন। তা সে দোষ কি আর কারও কারও নেই?

উকিলবাবু বললেন, আহা রাগ করছ কেন পরানের মা। আমি সত্য বার করবার চেষ্টা করছি। সত্যি-সত্যি কি কাউকে দুষেছি! যাক, এখন তা হলে দাঁড়াল—এ গাঁয়ে পার্টিপুটি নেই, হিন্দু-মোচলমান নেইকো। পিরিত-আশনাই তা-ও নেই, জমিজিরেত নিয়ে হল্লাগুল্লা কিচ্ছু না, তবু শেষ রাতের ঝুঁঝকো আঁধারে একটা লোক খামোখা খুন হয়ে যায়। কেউ তাকে খুন করেছে পেছন থেকে, তারই হেঁসো দিয়ে তারপর সেটি দশ হাত দূরে কাদায় নিক্ষেপ করেছে, কিংবা পুঁতে দিয়ে এসেছ। 'আর হবি তো হ' সে লাশ প্রথম দেখল কি না তারই স্যাঙাত। ভূতে করে গেছে বোধহয়!

দেখো সব, সাক্ষীসাবুদ নেই, তবু পরিস্থিতি যা দাঁড়াচ্ছে মার্ডার ইন ডিফেন্স দাঁড় কবানো যেতে পারে। কোনো কারণে হাসান পরানের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। সে পরানকে আক্রমণ কবতে আসে, পরান জোয়ান বেশি, সে হেঁসো কেড়ে নিয়ে হাসানের গলাতেই বসিয়ে দেয়। তারপর যা-যা করবার করে। আত্মরক্ষার খাতিরে খুন করলে ফাঁসি হবে না, যাবজ্জীবনও হবে না। কিন্তু কথাটি তো বাবাজিকে স্বীকার করতে হবে! ইতিমধ্যে আবার যদি সাক্ষীসাবুদ বেরিয়ে পড়ে, পড়তেই পারে, তা হলেই সর্বনাশের মাথায় পা। এখন গ্রামের মাথা যারা আর পরানের বাপ তোমরা তাকে কবুল করাও। তারপর দেখছি তার সাজা কমানোর জন্যে কী করতে পারি!

পরানের বাপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কাজটি সে করেনি, তবু তাকে কবুল যেতে হবে?

কী করে জানছ করেনি?

আমার ছেল্যাকে, তার স্যাঙাতকে আমি জানব না?

'আরে বাবা, জোয়ান ছেলেদের ভেতরে কী চলছে না চলছে সে আন্দাজ করা কি বাপ-জ্যাঠার কম্মো!'—উকিল ডিবে থেকে জোড়া পান বার করে মুখে পোরে।—হাসান কেন হেঁসো নিয়ে জঙ্গলে যায়? শৌচকার্য করতে কি হেঁসো লাগে?

এই সময়ে দূর শহর থেকে একটি বাবুমশাই আসছিলেন সাদা অ্যামবাসাডর চড়ে। পরনে পরিষ্কার বাঙালি ধুতি পাঞ্জাবি। আধ মাইলটাক দূরে দাঁড় করাতে হল গাড়ি। খারাপ রাস্তা। কাদা, কাঁটা জঙ্গল খুব। জিপ নিয়ে এলেই হত। ধুতি-পাঞ্জাবি হাঁটু অবধি তুলে বাবুটি এলেন, সঙ্গে কিছু সঙ্গীসাথি। হাসি-হাসি মুখখানি, দেখলেই বোঝা যায় মনটা সাদা, খুব মায়াও শরীরে। গাঁয়ে অতিথ্। সব ঘটনা গোড়ার দিকে শুনে বললেন, 'ঘোষমশাই, আমায় মাফ করবেন, আমি আপনার বাড়িতে থাকতে পারছি না।'

কেন? কী অন্যাই আমি করেছি বাবু?

'আরে না না, অন্যায় করবেন কেন?'—হাত তুলে হারু ঘোষকে আশ্বস্ত করেন তিনি, 'এলাম

একটা শুভ কার্যে আর তার আগেই এমন মর্মবিদারক ঘটনা ঘটে গেল? আসলে আমি হাসান আর পরানের ফ্যামিলির সঙ্গে থাকতে চাই। ওদের এই দুঃখের দিনে'...তিনি চুপ করে গেলেন।

শেখ সাহেব বললেন, 'কিন্তু আপনার অভ্যাস নেই, বড্ড যে কষ্ট হবে বাবুমশাই!'

তুড়ি দিয়ে সে কথা উড়িয়ে দিয়ে বাবুটি হেসে বললেন, 'আজই ধপধবে জামাকাপড় দেখছেন, গাড়ি দেখছেন মশাইরা। গোটা জীবনটা যে বনজঙ্গলে চাষিভাইদের ঘরে কাটিয়েছি! তাঁদের কাঁজি আমানিই মেরে দিয়েছি নুন লঙ্কা দিয়ে। ছারপোকা ভরতি চারপাইতেই অঘোর ঘুম ঘুমিয়েছি! সকালবেলা দেখি সারা গায়ে বিজবিজ করে মরে রয়েছে ব্যাটারা। এত রক্ত খেয়েছে, এত রক্ত।'

আপনি টের পেলেন না?

টেরটিও পেলাম না। সে ঘুম কি যে সে ঘুম? যাকগে সে কথা, আমি পরানের দাওয়ায় শুয়ে থাকব, হাসানের মা একটু যা হোক দেবে। ওতেই ঢের হয়ে যাবে।

কিন্তু বাবুমশাই আপনার কষ্ট না হলেও ওদের যে কষ্ট হবে গো! পণ্ডিত বললেন।

সে কী? ওদের কী কষ্ট?

ওদের তো নিজেদের চারপাই আপনাকে দিতে হবে। নিজেদের ভাগের অন্ন!...

মহা কোলাহল শুরু হল। শেষ পর্যন্ত অনেক বাগবিতণ্ডার পর ঠিক হল—চারপাই দেবেন হরেন ঘোষ, তার সঙ্গে একপ্রস্ত বিছানা। রাতেব খাবার শেখ সাহেব। সকালের জলখাবার গদাই পণ্ডিত। তারপর বেরোবার আগে মধ্যাহ্নভোজটি খাওয়াবেন স্বয়ং হারু ঘোষ। কিন্তু বাবুর এক গোঁ, উনি হাসান মিঞা কিংবা পরান মণ্ডলের দাওয়ায় গায়ে মশার তেল মেখে শোবেনই শোবেন। তা, তাই তাই। বদর, গুছাইত, আসাদ, নিতাই, কালো সব চোখে চাওয়াচাওয়ি করতে করতে ঘরে গেল। এমন ধারার বাবুমশাই তারা কোনো ভোটের আগেই দেখেনি।

মঞ্চ বাঁধা হল। মাইক্রোফোন হল। জাতীয় পতাকা এল।

'এই গরিবি, এই ভুখা, এই ব্যামো আর দেখতে পাবা যাচ্ছে না। আপনাদের বৃথা স্বপ্ন দেখাব না। বলব না পাকা বাড়ি, নদীবাঁধ, বড়ো ইস্কুল, হাসপাতাল, গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ...এসব আমরা চক্ষের নিমেষে করে দেব। কিন্তু দূষণমুক্ত পানীয় জল, সস্তায় শিক্ষা, সস্তায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এগুলোতে আপনাদের জন্মগত মৌলিক অধিকার। কেউ দেবে না। আপনারা বুঝে নেবেন আপনাদের হিসেবের কড়ি। আমরা শুধু পাশে থাকব। যতদূর পারি সাহায্য করব। করবই।'

বক্তৃতা প্রতিবারই হয়। লোক জড়ো হয় নিছক কৌতূহলে। কিন্তু এবার জয়জয়কারের মধ্যে দিয়ে বক্তৃতা শেষ হল।

ক-দিন পর পঞ্চায়েতের ভোটাভুটি রুটিনমতো শেষ। নিশ্চিন্দি। বাবুমশাই হাসান মিঞার কবরে নিজের সংবর্ধনার মালাটি এবং পরানের বাবাকে মঞ্চের জাতীয় পতাকাটি দিয়ে গেলেন।

এই সময়ে নতুন ও অভাবনীয় আর একটি শোকের কারণ ঘটল।

খবর এলো পরান কয়েদে আত্মহত্যা করেছে। উঁচু জানলার গরাদে নিজের পরনের শাড়িটি (জেলে যাবার সময়ে বউয়ের একটি শাড়ি পরে গিয়েছিল পরান) বেঁধে ঝুলে পড়েছে।

সারা গ্রাম চুপ। আর ক-দিন পরই কেস উঠবে। পুলিশ ফটক থেকে হাজতে যাবে পরান। এর মধ্যে কী করল? সে কি মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মারিয়াছে? বেশিরভাগ লোকেরই এখন এই সন্দেহ হচ্ছে। ঠিকই, দুই স্যাঙাত্ যেন ইদানীং বড্ড গুজগুজ ফুসফুস করত! ওরই মধ্যে সুতোটি লুকিয়ে আছে। পরানের মা আর কাঁদতে পারে না। তার শুকনো তোবড়ানো মুখের দিকে চেয়ে পরানের বাপ বলল, 'কী জানি বউ, জোয়ান ছেল্যাদের ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে বাপে-জ্যাঠায় তার কট্টুকু জানে?'

গভীর রাতে শেখ আমিনের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হল। কীসে যেন বড্ড কামড়াচ্ছে। টর্চ জ্বেলে দেখবার চেষ্টা করেন। দেখতে পান না। কনুইয়ের ভাঁজে, গলায়, ঘাড়ে, হাঁটুর নীচে, গুহ্যদ্বারে। কী রে বাবা! এমন খাসা বেলুনের মতো লাইলনের মশারি—তার ভেতর ডাঁশ আসবে কোত্থেকে? তবে কি বিবিজান ঠিকঠাক গোঁজেননি? অভিসম্পাত দেন তিনি। ছারপোকা না কি? বাবুমশাইয়ের ছারপোকার গপ্পো মনে পড়ে গেল। ছার হওয়াই সম্ভব। এখানে সেখানে দু চারটে চাপড় মেরে, আঙুল দিয়ে আঁধার পিষে ঘুম যান। দূর ছাই, ঘুম কি হয়। জ্বালিয়ে দিচ্ছে একেবারে। আবার টর্চ জ্বালেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। চক্ষু স্থির হয়ে যায়। বিছানাময় থিকথিক করছে টকটকে লাল বিষ পিঁপড়ে। আতঙ্কে মশারি খুলে বাইরে আসেন হারু ঘোষ। জামা কাপড় ক্রমে ক্রমে খুলে একেবারে নাঙ্গা হয়ে যান। ঝাড়তে থাকেন, মারতে থাকেন, ফুঁ দিয়ে চিপটে, চাপড়ে। কিছুতেই শালারা নড়ে না। চারটে মরে তো চল্লিশটি রক্তবীজ তার জায়গা নেয়। গোঁসাই তাঁর ধর্মপত্নীকে ডাকতে যান, ছেলেমেয়েদের নাম করে চ্যাচান, গলা বেরোয় না। মুখগহ্বর দিয়ে, নাসাবিবর কর্ণবিবর দিয়ে শরীরের ভেতরে লংমার্চ করতে করতে ঢুকে যাচ্ছে রক্তলাল পিপীলিকা বাহিনী। অসহ্য যাতনায় মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যান।

ভোরবেলা। ঘরে ঘরে লোক জেগে উঠেছে, দাঁতন চিবোচ্ছে কেউ, বলদে লাঙল জুতছে কেউ, গোরুবাছুর হামলাচ্ছে, পাখ-পাখালি মনের সুখে গলা সাধছে, উর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের দিক থেকে ফিরে আসে তারা, যারা গিয়েছিল। গাড়ু হাতে, বদনা হাতে। কী রে? কেন গো? না শাড়ির লাল পাড়ের মতো টসটসে লাল, অস্বাভাবিক বড়ো পিঁপড়ের সারি ঢুকছে জঙ্গলে। আসছে গাঁয়ের ভেতর থেকে। একটা নয় দুটো নয়, তিনটে। জঙ্গলের দশ বারো গজ দূরে ত্রিবেণির মতো তিনটি ধারা মিশে যায়। চওড়া হয়ে যায়, আশে তাকায় না পাশে তাকায় না। অনম্য শৃঙ্খলার সঙ্গে ঢুকে যেতে থাকে সেই ঝোপটির তলাকার গর্তে যার ওপাশে পরান আর ওপাশে ছিল হাসান। মাত্র ক'দিন আগে।

ভয়ে, বিস্ময়ে মূক জনতা ফিরে যেতে থাকে, জানে না গিনেস বুকে লিপিবদ্ধ করবার মতো একটা প্রাকৃতিক ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করল আজ। কিন্তু ও কী? স্তব্ধ ভোরের বিস্ময় চিরে তীব্র মড়াকান্না উঠছে না তিন দিক থেকে? কেন? যার যার নিজ নিজ শোবার ঘরে রক্তাক্ত যন্ত্রণাবিকৃত তিনটে আতঙ্কস্থির মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে তাদের স্বজনবর্গ।

বস্তুত মানুষ সংখ্যায় অগণ্য, ক্ষমতায় কালান্তক ও বুদ্ধিতে বেস্পতিতুল্য হলেও সেই তিমিরেই থেকে যায় যে তিমিরে অদ্যাপি ছিল, কেননা সে নাকে-তেল কানে-তুলো দিয়ে জেগে জেগে ঘুমোয়। কিন্তু পিপীলিকাদি প্রাচীন ঐতরেয়গণ এখনও বাতাসে পাপের গন্ধ পান।

ক্যালভেরি

বাজারে জোর গুজব এক নির্দোষ ব্যক্তিকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। কী অপরাধ সন্দেহে তাকে ধরা হয়েছিল, কত বছর সে বন্দি আছে সে খবর কেউ জানে না। এমনকি কোন্ দেশের জেলে সে পচছে সেটাও ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। শুধু বিশ্ব গুজব। গুজব কানাকানিতেই ছড়ায়। তা এখন তো কানাকানি শুধু রামে-শ্যামে, টমে-ডিকে হয় না, হয় ইংল্যান্ডে-আমেরিকায়, চিনে-ফ্রান্সে, ভারতে-রাশিয়ায়...। মিডিয়া যখন খবরটা কব্‌জা করল তখন সেটা প্রায় বাসিই হয়ে গেছে। তবে বিশদ বৃত্তান্ত তো পাবলিক জানে না। এইখানেই কাগুজে কেরামতি। মজা হচ্ছে সব দেশের প্রধান কাগজই ভেবেছে এটা তার স্কুপ, শেষ রাত্তিরে কোনোক্রমে পাতা করেছে সব। সকালবেলা গরমাগরম বিকোবে। হায় কপাল! সকাল হতেই সব চক্ষু চড়কগাছ। তবে ওই যে ডিটেল? ডিটেলেই রকমারি মশলা।

হ্যাঁ, ডিটেলে নানান তফাত। 'বিশ্বের এক অজ্ঞাত জেলে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি অজ্ঞাত অপরাধে অজ্ঞাতসংখ্যক বছর বন্দি আছে' —এরকম তো খবর হয় না। এত 'অজ্ঞাত' দিলে পাবলিক কান মলে দেবে। কাজেই যে যার প্রতিভার পুঁটলি খোলে। কোনো কাগজে বলে লোকটা আছে ইংল্যান্ডের জেলে। কেউ বলে কুখ্যাত সাইবেরিয়ায়, কেউ বলে খোদ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে, কেউ বলে করাচির যে জেলে জুলফিকার আলি ভুট্টোকে রাখা হয়েছিল সেখানেই, কেউ আবার বিস্ময় প্রকাশ করল—আমাদের এই ভারতের মহামানবের দেশে, একেবারে নাকের গোড়ায় তিহার জেলেই নাকি লোকটি গুমছে। ফলাও তর্কবিতর্ক, চিঠি কাউন্টার চিঠি চলতে লাগল। টেলিভিশনের সব চ্যানেলে থিকথিক করছে এক নিউজ; এক বিতর্ক। বি.বি.সি এ বাবদে মার্গারেট থ্যাচার, ব্লেয়ারের বিবৃতি নিল, সি. এন. এন নিল দুই বুশ, ক্লিন্টন, কলিন পাওয়েলের, এখানেও সব প্রাইভেট চ্যানেলে জোর যুক্তি-তক্কো-গপ্পো চলতে লাগল।

আপামর বাঙালির (রাজনৈতিক নেতারা বাদে) বিশ্বাস জায়গাটা সাইবেরিয়া এবং বন্দিটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। না-ই যদি হবে তো রেনকোজির ভস্মর ডি. এন. এ টেস্ট করালি না কেন? কেউ খুঁতখুঁত করে, সে বললে তো তাঁর বয়স একশোরও অনেক বেশি হয়ে যায়। লোকটি সে রকম বুড়ো-অথর্ব বলেও তো শোনা যাচ্ছে না! নেতাজি-গরবে গরবি বাঙালি জ্বলন্ত চোখে বলল, 'মহামানবদের ক্ষেত্রে এমনটাই হয়ে থাকে।' আবেগের চোটে বাংলা ভুলে বাঙালি স্লোগান দিতে লাগল—'আওয়ার নেতাজি অমর রহে', 'যুগ যুগ জিও সুভাষচন্দর', 'নেতাজি সুভাষ জিন্দাবাদ, অবিশ্বাসী মুর্দাবাদ'।

আপামর আরববাসী, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক-বাসী (বুশ-ব্লেয়ার বাদে) আনন্দে নৃত্য করতে লাগল, 'এই হল আস্‌লি মর্সিহা, ওসামা-বিন-লাদেনের স্পিরিচুয়াল গুরু।' কেউ বললে, 'এটা সাদ্দাম, তেল-সংক্রান্ত চুক্তিটা ফাইনাল না করে আমেরিকা ছাড়বে না। ইজরায়েল বাদে মধ্যপ্রাচ্য কট্টর পান-ইসলামিক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে লাগল।'

লোকটির নাম নাকি আন্তর্জাতিক অপরাধীর তালিকায় ছিল। দেশ থেকে দেশান্তরে জেল থেকে

জেলান্তরে বদলি হয়েছে সে। কিন্তু কী যে তার সম্ভাব্য অপরাধের চরিত্র কেউ বলতে পারে না। যুদ্ধবন্দি? এই তো সেদিন হিন্দি-পাকি ভাই-ভাই-এর আবেগে প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধের কিছু ভারতীয় বন্দি ছাড়া পেয়ে বর্ডার পেরোল। যে যুবক ছিল, সে অবশ্য এখন অতি বৃদ্ধ, বেশির ভাগেরই পরিবারের সব মরে-হেজে গেছে। কেউ কেউ যুবক নাতির গলা জড়িয়ে কাঁদবার সৌভাগ্য-সুযোগ পেয়েও কাঁদতে পারল না। কান্না শুকিয়ে গেছে। তবে? কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কোনো ধাঙড়-মুদ্দফরাস না কি? না কি রাজনৈতিক অপরাধী—স্তালিনের সময়ে গুইগাঁই করেছিল বলে চালান হয়ে গেছে পোল্যান্ড থেকে পূর্ব জার্মানি, পূর্ব জার্মানি থেকে উত্তর কোরিয়ায়। স্পাই সন্দেহে আটক হয়েছিল, হচ্ছে বহু লোক, তাদের কেউও হতে পারে। কিছু প্রমাণ করা যায়নি। নথিপত্রও সব ব্যাখ্যাতীতভাবে হারিয়ে গেছে।

প্রশাসনের এই অদ্ভুত অবিচারের বিরুদ্ধে সব দেশের জনগণই খেপে উঠল। লোকটিকে মুক্তি দিতে হবে অবিলম্বে। ইংল্যান্ডে কালো পতাকা, ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজ ঘেরাও, ফ্রান্সে ছাত্র-আন্দোলন, রাশিয়ায় প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র, চিনে তিয়ানানমমেন মেন স্কোয়্যার সিলড্। ইরাকে ফটাফট গাড়িবোমা, কিছু মার্কিন ও ভূরি ভূরি ইরাকি ছিন্নভিন্ন। বেশি কথা কি, ভারতেই জেলে জেলে খুনজখমের আসামিরা অনশন ধর্মঘটে শামিল হল। 'আমাদের আটক রাখো, পরোয়া নেই, নির্দোষী ঠাকুরদাদার মুক্তি চাই।' মানবাধিকার কমিশন, অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল, ইউ. এন. ও সব নড়েচড়ে বসল। এরই মধ্যে ইজরায়েল ঘোষণা করল, 'সব বন্দি ছাড়তে পারি, প্যালেস্টিনীয় ছাড়ব না।' সুইজারল্যান্ড বলল, 'আমরা বিদেশি টাকা ব্যাংকে রাখি, বন্দি রাখি না,' স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলল, 'আমরা নোবেল পুরস্কারে পর্যন্ত অবিচার করি না, আর বন্দির বেলায় করব?' এই তালে ইন্ডিয়ার যত প্রাক্তন ও অধুনাতন মুখ্য ও প্রধানমন্ত্রীরা জেড প্লাস প্লাস নিরাপত্তা চাইতে লাগল। বিধায়ক, সাংসদরা নিরাপত্তার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করলেন। কে না জানে খ্যাপা পাবলিক খ্যাপা মোষের মতো, কখন যে কার ভুঁড়ি ফাসিয়ে দেবে কেউ জানে না। দুগগা, দুগগা! ফলে কোনো থানাতেই আর পুলিশ রইল না। সাংসদ মশাইরা 'করবা চৌথ'-এ স্ত্রীর পুজো পেতে যাচ্ছেন—ব্ল্যাক ক্যাট, অজ গাঁয়ের বিধায়ক মশাই মাঠ সারতে চলেছেন—ব্ল্যাক ক্যাট। চোর-জোচ্চোর-বাটপাড়দের মহাফুর্তি। হাই-ফাই অপরাধীরা করুণা করে আই. পি. এসদের সঙ্গে আড্ডা দিতে লাগল। জলকর বসছে না বসছে না, হকার উঠবে কি থাকবে, গঙ্গা মহানন্দার পাড় ভাঙল কি ভাঙল না, জলে আর্সেনিক কমানো হবে কি হবে না, পারমাণবিক বর্জ্য কোথায় জমছে, ওজোন স্তরের ফুটো কতটা বাড়ল, মেরু বরফ কত ইঞ্চি গলল—এসব নিয়ে আর কারও মাথাব্যথা নেই।

অবশেষে চাঞ্চল্যকর খবর বেরোল—লোকটির নামের আদ্যক্ষর জানা গেছে। ভি-পি বা ভি-ভি। হিন্দি বেল্ট বলল, 'এ নির্ঘাৎ আমাদের ভানপ্রতাপ ভুয়ালকা—সমাজসেবক মানুষ, কী একটা স্ক্যাম নিয়ে চিরুনিতল্লাশির সময়ে উবে গিয়েছিলেন আহা!' পূর্বাঞ্চল বলল, 'এ হল গিয়ে ভবদেব ভট্টাচার্য, আদি নিবাস ভাটপাড়া, শেষের দিকে ত্রিপুরা-আসামে বরো জঙ্গি আলফা জঙ্গিদের অহিংসাধর্মে দীক্ষা দিতেন, জঙ্গি ধরবার সময়ে পুলিশে একেও ভুল করে/বদমায়েশি করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ বলল, 'লোকটা আদৌ ভারতীয় নয়, কোন্ দেশি কে জানে, ওর নাম ভিভিয়ান পাস্ক্যাল ভারমন্ট। এরকম আরও কত নাম। কে কোন্ দেশি কেউ বলতে পারে না। রিফিউজি ছড়িয়ে পড়েছে ভুবন জুড়ে। কেউ আর সীমারেখা মানছে না। এ দেশের ভুখা মানুষ ওদেশে, ওদেশের ভুখা মানুষ এদেশে। যেখানে রুটিরুজি, যেখানে শান্তি, নিরাপত্তা সেখানেই ঠেলে উঠছে মানুষ। পারাপারি করতে গিয়ে মরুভূমিতে, তুষারভূমিতে প্রাণ দিচ্ছে কত মানুষ, যে জাহাজের সাগরে যাওয়ার কাল কবেই শেষ, তাইতে চড়ে মরিয়া মানুষ সলিলসমাধি পাচ্ছে।'

তবে এ নিয়ে বেটিং শুরু হয়ে গেছে। বেটিং যে কত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে হয় তা তো আমরা জানি না। বুশ জিতবে না কেরি জিতবে, কংগ্রেস সি. পি. এম-এর সঙ্গে আসন-সমঝোতা করবে, না পি. ডি. এফ-এর সঙ্গে, তেণ্ডুলকর আগে ঘুমোতে যান, না সৌরভ গাঙ্গুলি? কে বেশি কেরামতি দেখাতে পারে—আমাদের লাল্লু না ত্রৈলোক্যনাথের লুল্লু? ইলিশের দর এ সিজনে তিনশো থাকবে না চারশো উঠবে? কয়েক হাজার কোটির জুয়ো খেলা। যারা সাদ্দামের ওপর বেট করেছিল সাদ্দাম ধরা পড়তে তাদের কোটি কোটি টাকা লোকসান হল। কয়েকজন বেটসম্যান আত্মহত্যাই করে ফেলল।

পাবলিক এখন তেতে গেছে। তাকে রোখে কারও সাধ্য নেই। সুতরাং নানারকম স্লোগান শুরু হয়ে গেল। 'আমার নাম তোমার নাম--ভিভিয়ান ভিভিয়ান।' 'ভানপরতাপ ভুয়ালকা জবাব দাও আমেরিকা।' 'ভবদেব ভট্টাচার্য—বাংলার আশ্চর্য।' ভিভিয়ান ভবদেব ভানপরতাপদের মুক্তি সবাই চাইছে। শ্বেতপত্র দাবি করছে।

বিরাট বিরাট পদযাত্রা, মিছিল দেখে যে যেখানে আছে শামিল হয়ে পড়ল। কাগজকুড়োনি ছেলে, দেহবেচা মেয়ে, জমাদার হাবিলদার সব। কেননা এত বড়ো মিছিল কেউ দেখেনি। ধরুন শুঁটে আর পুঁটে কাগজ কুড়োচ্ছিল। শুঁটের মুখে আঙুল। পুঁটের পিঠে বোঝা। হাঁ করে দেখছে, হঠাৎ দেখে আগে লোক পাছে লোক—'ভিভিয়ান, ভিভিয়ান।' তো তারাও বলতে লাগল 'ভিভিয়ান-ভিভিয়ান।' পারুল আর বকুল পাড়া থেকে একটু দূরে খদ্দের খুঁজতে এসেছিল। দেখতে দেখতে একটা লোককে বেশ মালদার মনে হল, পারুল চোখ মারল, বকুল মডেল পোজ দিল। লোকটা দেখতেই পেল না, হাত আকাশে ছুড়তে ছুড়তে 'আশ্চর্য আশ্চর্য' বলতে বলতে এগিয়ে যেতে থাকল। আরও কাছে এগোতে ভিড়ই বকুল-পারুলকে চুম্বক টানে টেনে নিল। খদ্দের-টদ্দের ভুলে তারাও চ্যাঁচাতে লাগল—'ভবদেব ভশচায্যি আশ্চয্যি আশ্চয্যি।' 'মুক্তি দাও মুক্তি চাই, নইলে গদি ছাড়াবই।' 'পৃথিবীর সরকার নিপাত যাক। শেম শেম শেম শেম।' জমাদার রামলখন, ছাতুঅলা যুধিষ্ঠির, বুটপালিশ লখিয়া, বাসের খালাসি নন্দলাল সব প্রতিধ্বনি তুলল—'ছেম ছেম।'

সব দেশের বিরোধীপক্ষের মহা ফূর্তি। এই সুযোগে শাসকদলকে নাকানিচোকানি খাওয়ানো যাচ্ছে। ডেমোক্র্যাট আর রিপাবলিকান, লেবার আর কনজারভেটিভ। কংগ্রেস-বি.জে.পি-সি.পি.এম যে যেভাবে পারে ব্যাপারটার ফায়দা তুলতে লাগল।

আমাদের এ দেশে যেমন—সরকার পক্ষ বলল, 'ঘটনাটা ঘটে কংগ্রেস আমলে, অবভিয়াসলি। কংগ্রেস বেকায়দায় পড়ে বলল, 'ধুত, ও তো ব্রিটিশ আমলের কথা।'

এরকম কাজিয়া সব দেশেই পুরোদমে চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শীর্ষ সম্মেলন ডেকে সবাই ঠিক করল, সত্তর কি তার চেয়ে বেশি বয়সের বন্দি যাদের প্রমাণাভাবে জেলে আটকে রেখে ভুলে যাওয়া হয়েছে, সে রকম সবাইকে খুঁজে পেতে ছেড়ে দেওয়া হবে। রাজবন্দি যুদ্ধবন্দি তো বটেই।

এতে কিন্তু অনেক কয়েদির এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল। এতকাল হয়ে গেছে, জেলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বেচারিরা, নিশ্চিন্ত জীবন, নিশ্চিন্ত ভাত-কাপড়। সে যেমনই হোক না কেন। আত্মীয়স্বজনদের প্রজন্ম পেরিয়ে গেছে, এতদিনের জেল-খাটা দাদুকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, এ কী সমস্যা? সংসারটা বেশ গুছিয়ে তোলা গিয়েছিল! যাই হোক, বিশ্ব পাবলিক যেমন একবগ্গা, বিশ্ব সরকারও তেমন। দাও ছেড়ে, সরকারের বন্দি পোষার খরচ কমে যাবে। তাই বা কম কী! সুতরাং বহু দিনের অপরাধ-প্রমাণ-না-হওয়া বন্দিরা ছাড়া পেতে লাগল। অবশ্যই সত্তরোর্ধ্ব হতে হবে।

যে দেশে জনতার যাকে পছন্দ হল ফুল-মালা-চন্দন দিয়ে বরণ করে শোভাযাত্রা শুরু করে

দিল। বাকি জীবন এদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে সরকারগুলো এমন কথা দিয়েছিল। তারা এখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মুল লোক তো একটি। ঠিক আছে তাকে ঠিকঠাক স্পষ্ট করতে না পেরে না-হয় আরও কয়েকজনকে ছাড়া গেল। কিন্তু এ যে বেরোচ্ছে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে? এত লোক বিচার ছাড়া এতদিন বন্দি ছিল? এ তো মহা ফাঁপরে পড়া গেল! তা কী করা যাবে! কথা দিলেই যে কথা রাখতে হবে তার তো কোনও মানে নেই। ইন্ডিয়া ঠোঁট উলটে বলল—ছাড়ুন তো ও রকম কত কথা নিত্য দিতে হচ্ছে, বন্যা, খরা, বাঁধ...কত রকমে লোক উৎখাত করতে হচ্ছে তা জানেন? সাহায্য-ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে তো ফেল করে যাব মশাই। জনগণ যা করছে করতে দিন। লেটস ওয়াচ অ্যান্ড ওয়েট।

এখন জনগণ যাদের পছন্দ করল তাদের কথা বলি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল জেল থেকে পাক্কা ত্রিশ বছর পরে মুক্তি পেল অ্যাডাম। সেমিটিক তো বটেই। একেবারে যিশুখ্রিস্টের মতো চেহারা। অ্যাডাম একটি হত্যা-শিল্পী। শুধু খুনের জন্যেই সে একশো একটা খুন করেছে। এত নিপুণভাবে যে, খুন-হতে-থাকা ব্যক্তিটিও বুঝতে পারেনি খুনি কে! চার-পাঁচটি খুন একই পদ্ধতিতে করে ফেলায় অ্যাডাম একটু বেকায়দায় পড়ে। সন্দেহবশত তাকে ধরা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। এবং তা সত্ত্বেও উকিলের পর উকিল, বিচারকের পর বিচারকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে-ই খুনি এবং প্রমাণ পাওয়া যাবেই। এইভাবে তার ফাইল কোথায় ফাইলের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে গেল। কত বিচারক অবসর নিলেন, কত উকিল-অ্যাডভোকেট-সলিসিটর মারা গেলেন। অ্যাডামের কথা সকলে ভুলে গেল। জেলের ব্যবস্থাট্যবস্থা ভালোই, নালিশ করার কিছু নেই। সুতরাং অ্যাডাম ভালোই ছিল। একমাত্র অসুবিধে, সে খুন করতে পারছিল না। জেলের মধ্যে খুন চার-পাঁচটা করাই যায়। কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে সে 'প্রভু, ইহারা জানে না ইহারা কী করিতেছে'—জাতীয় একটা মহাপুরুষোচিত হাবভাব নিয়ে ছিল। তার মুক্তিতে তার কয়েদি-বন্ধুরা পর্যন্ত খুশি হয়ে তাকে ফেয়ারওয়েল দেয়। কেননা সবাইকারই ধারণা ছিল তার মতো নিষ্পাপ উচ্চমার্গের ধ্যানী পুরুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

শোভাযাত্রীরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে অ্যাডাম, তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেব?

অ্যাডাম উদাস স্বরে বলল, তিরিশ বছর পরে আর আমি কোথায় যাব? থাকার মধ্যে এক বুড়ো বাপ ছিলেন, কবে মরে হেজে গেছেন। যেখানে হোক আমাকে ছেড়ে দাও, সরকার তো একটা ভাতা দেবেই, যেমন করে হোক চালিয়ে নেব। অনেক ধন্যবাদ, আমার সন্তানসম দেশবাসীগণ!

'এখন এখানকার হাওয়া একটু গরম, তুমি বরং তোমার দাড়িগোঁফটা কামিয়ে ফেল'—একজন উপদেশ দিল। সত্যিই ওসামার সঙ্গে অ্যাডামের মিল খুব।

তবে এসবে অ্যাডামের মন নেই। তার প্রবল খুন-পিপাসা পাচ্ছে। লেটেস্ট ফ্যাশন অনুযায়ী ন্যাড়ামুণ্ডি হয়ে, দাঁড়িগোঁফ কামিয়ে তার চেহারাটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। বয়সটাও যেন কমে গেল এক ধাক্কায়।

শিট! বাবা-মা না থাক তার বউ ছেলেপিলে অবশ্যই ছিল। সেসব ছেলেরা এখন কে পঁয়ত্রিশ কে চল্লিশ, বউও তো বুড়ো হল। বাড়ি তার পশ্চিম-উপকূলে অরভিল নামে একটা ছোট্ট গ্রামে। বউ ছেলেপুলেদের জন্যে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বুড়ো বয়সে তাদের আদরও সে আশা করে না। কিন্তু কৌতূহল যাবে কোথায়? বিশেষ করে স্যারা, তার বউ, একেবারের জন্যেও বিশ্বাস করেনি সে খুনি। যতদিন পেরেছে উকিলের কড়ি গুনেছে। কান্নাকাটিও করেছে কম নয়। কিন্তু অরভিলে সে স্যারা আর তার দুই ছেলের কোনো খোঁজই পেল না। মার্কিন দেশে লোকে এই

বাড়ি কিনছে তো এই আবার বেচে দিচ্ছে। এক জায়গায় খুঁটি গেড়ে বসবার ধাতই নেই কারও। অত বড়ো বড়ো ছেলে, বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে নিশ্চয়। কোথায় তাদের খুঁজবে? অ্যাডাম ভ্রাম্যমাণ খুনি হয়ে গেল।

বরকত ছিল ধুরন্ধর জালিয়াত। দেখতে নেহাতই দেহাতি ভালোমানুষের মতো। লোকটা এমন জালিয়াতির কারবার ফেঁদেছিল যে পৃথিবীর যেখানে যত শেয়ারবাজার সর্বত্র ধস নেমেছিল। নামটা সে কখনও এক রাখত না। গায়ের রংটা মাজা মাজা, বেঁটে, মাথায় টাক। ইতালীয়, স্প্যানিশ, ভারতীয় যা ইচ্ছে হতে পারে। এই চেহারা এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি হাতিয়ার করে সে কাজ-কারবারে নেমে পড়েছিল। কখনও আন্তোনিও, কখনও রামদাস, কখনও বদরউদ্দিন নামে সে চলাফেরা করত। গোটা দশেক ভাষা জানত, তার মধ্যে ছটা ভাষায় মাতৃভাষার মতো দড় ছিল। একটি খাঁটি ভাষাবিদের যা যা গুণ থাকা দরকার সবই তার ছিল। উপরন্তু সই জাল করায় তার জুড়ি ছিল না। পঁচিশ বছর জেলের ভাত খাচ্ছে সে ফ্লোরেন্সের এক জেলখানায় মানুচ্চি নামে। এখনও তার আসল নাম ফাঁসই হয়নি। আসলে সে এবার ফেঁসে গিয়েছিল নেহাতই ছোটোখাটো একটা পাসপোর্টের সই জাল করার ব্যাপারে। কেন যে ছাড়া পায়নি সেটাই এক বিস্ময়। খুব সম্ভব শেষ যাদের জন্যে জালিয়াতি করেছিল, তারা নিজেরাই জালিয়াতির দায়ে ধরা পড়বার ভয়ে মুখ খোলেনি। বরকতও তার এক অঙ্গে অত রূপ ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে ট্যাঁ-ফোঁ করেনি। জেলখানাটা সে ভালোই উপভোগ করছিল। নানান কিসিমের অপরাধী আসে জেলে। কত জনের কাছ থেকে কত কী শেখা যায়। শিক্ষক হিসেবে দু-চারজন অন্তরঙ্গ ছাত্রও যে জুটে যায় না তা নয়। মানুচ্চিবেশী বরকত শোভাযাত্রীদের বলল, 'পঁচাত্তর বছর পার হয়ে গেলে আর কি আত্মীয়পরিজন থাকে!'—তার চোখ ছলছল করছে। সে বলল প্যারিসের একটা টিকিট কেটে তাকে উঠিয়ে দিতে। তারপর কপালে যা আছে, ছেলে সেখানে থাকলেও থাকতে পারে। আসলে কিন্তু বরকতের বাড়ি সুদূর পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে। জালিয়াতির নেশা তার এমন সাংঘাতিক ছিল যে অসুবিধে হবে বলে বিয়ে-থাও করেনি। বরকতের সুইস ও ইতালীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিদ্যমান। প্যারিসের রাস্তায় বরকত টুক করে হারিয়ে গেল।

তৃতীয় যাকে জনতার ভারি পছন্দ হল সে হল এক ধার্ষণিক। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে এ যে কত ধর্ষণ করেছে, কত যে এর অবৈধ সন্তান, কত মেয়ে যে এর জন্যে আত্মহত্যা করেছে, কতজনকে লাইনে নাম লেখাতে হয়েছে, কতজনকে যে এ খুন করে ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই। পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি এর রেঞ্জ। একা পেলেই ধর্ষণ করে ফেলো—এই নীতিতে বড়োই বিশ্বাসী লোকটি। মুখোশ পরা থাকত বলে লোকটিকে চেনা যেত না। কয়েকটি মেয়ে গলা শুনে আন্দাজে একে শনাক্ত করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কেস প্রমাণ করা যায়নি। তার ওপর কেস চলাকালীন আগুন লেগে নথিপত্র পুড়ে যাওয়ায়, জজ উকিল সাক্ষী সব মারাত্মক আহত হওয়ায় কেসটি স্থগিত হয়ে যায়। তারপরে যা হয়। না হল কিছু প্রমাণ, না কিছু অপ্রমাণ। না পেল বেনিফিট অব ডাউটে মুক্তি না হল কোনো বিশেষ শাস্তি। বছরের পর বছর নিঃশব্দে জেলের ঘানি টানছে। মিষ্টি ব্যবহার, উদাস হাবভাব, এসব দেখে কবেই তাকে 'সশ্রম' থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবু কেন যে খালাস পায়নি। সেসব অজ্ঞাত। এর নাম ট্যাঁপা অথবা বামাকান্ত। চেহারা রাশভারী প্রফেসরের মতো, ট্যাঁপাবাবুই বলা উচিত। কিংবা ট্যাঁপা স্যার। জেলে থাকলেও তাঁর অপরাধের পরিচিতি অনেকদিন হারিয়ে গেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সে একটা আপনভোলা ঐশ্বরিক হাসি দিত। অত ধর্ষণ করায় ট্যাঁপা স্যারের ধ্বজভঙ্গ হয়, তাঁর অপরাধ অপ্রমাণের এ-ও এক কারণ। তবু সেই প্রশাসনিক বিচারবিভাগীয় এবং আধিভৌতিক গাফিলতিতে তিনি জেলে থেকে যান।

ট্যাপা ছিলেন ছোটোখাটো ব্যাবসাদার। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পার্টনার স্বভাবতই ব্যাবসাটি হাত করে নেয়। তাঁর স্ত্রী লজ্জায় ঘেন্নায় তাঁকে ছেড়ে চলে যান। দুটি সন্তান নিয়ে তিনি এখন তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করছেন। আলিপুর সেন্ট্রাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি প্রথমে তাঁর পুরোনো বাড়ি রাজারহাট-বিষ্ণুপুরে এলেন। চিনতেই পারেন না। যেখানে তাঁর বাড়ি ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁ-চকচকে পেল্লাই কমপ্লেক্স। অর্থাৎ বাড়িটা, তার জমিটা সব কেউ ঝেঁপে নিয়েছে। তা নিক। সংবর্ধনার গাঁদার মালা খুলে ট্যাপাবাবু একটি বটতলায় একটু জিরোলেন। অবশিষ্ট শোভাযাত্রীদের বললেন, 'আমি ভাই সংসার ত্যাগ করেই গিয়েছিলাম। তিনি কপালে ভোগান্তি লিখেছিলেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। সংসার অনিত্য। আমি সুযোগ পেলেই নগরাজ হিমালয়ে চলে যাব। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এত কষ্ট করলেন। তবে জেলে থাকলেই বা কী হিমালয়ে থাকলেই বা কী! পার্থক্য নাই।'

শোভাযাত্রীরা কাঁদো কাঁদো মুখে চলে যেতে ট্যাপাবাবু গাঁদার মালাগুলো আবার পরে নিলেন। বাজারে গিয়ে কয়েকটি জবার মালাও কিনলেন। কালীমন্দিরে গিয়ে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরলেন। তারপর গম্ভীর গলায় 'ওম্ কালীত্তারা ব্রহ্মময়ী' হাঁকতে হাঁকতে গ্রামে গ্রামান্তরে, গঞ্জ থেকে মফস্‌সল ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শিষ্যসামন্ত মন্দ হল না, রোজগারপাতি চমৎকার। খালি পুরোনো অভ্যাসটি মাঝে মাঝে চাগাড় দিয়ে ওঠে। অতদিন জেলখানায় থেকে তাঁর ধ্বজভঙ্গ অনেকদিন সেরে গেছে। কিন্তু চট করে ও পথে পা বাড়ান না। বয়সটাও হল বাহাত্তর। ভালো সুযোগের সন্ধানে থাকেন। বছর দশ থেকে পনেরো-ষোলোর দুটি চারটি হলেই চলবে।

উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আরও ছাড়া পেলেন উলোঝুলো চুল এক বৈজ্ঞানিক। ইনি সাংঘাতিক সব বিষ তৈরি করছিলেন বলে জনরব। পৃথিবীর তামাম সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর খদ্দের। কিন্তু আবারও, তাঁর মামলার নিষ্পত্তি হয়নি, কেউ জানে না কেন তিনি আলাস্কার জেলে পচছেন। শুধুমাত্র বিষবিজ্ঞানী পরিচয়টুকু থাকার জন্যই অনেক দেশের সরকারই তাঁকে সাগ্রহে পুষতে চাইল। তিনি অটাওয়ায় এসে একটি ঠান্ডা পানীয়ের কারখানায় যোগ দিলেন। কাঁচা-পাকা চুল আর গোঁফের মধ্যে দিয়ে চোখ দুটো ঝিকঝিক করছে, যেন এক্ষুনি বলে উঠবেন, 'কী? কেমন জব্দ?'

বলা বাহুল্য, ছাড়া পেলেন অনেক কমিউনিস্ট, অনেক স্তালিনবিরোধী, নানা ধরনের রাজনৈতিক বন্দি। যুদ্ধবন্দি এবং অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও, যাঁদের কোনো না কোনোভাবে ফাঁসানো হয়েছিল। এঁদের কেউ পছন্দ করল না, তেমন ক্যারিশমা ছিল না নিশ্চয়, জেল থেকে বেরিয়ে এঁরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। সরকারকে কাউকেই ভাতা দিতে হল না। সবাই ভাবলেন—বাপ রে এই বেলা পালিয়ে যাই, আবার কী ছুতোয় আটক করবে কে জানে! অনেকে আপনজন খুঁজে পেলেন, অনেকে পেলেন না, ভিক্ষাবৃত্তি নিলেন কতজন। কতজন মারাই গেলেন। আপদ চুকে গেল। শাঁখ, বিউগল, মালা, বোকে কিচ্ছু না, এঁরা মহাপৃথিবীর জনস্রোতে হারিয়ে গেলেন।

এঁদের মতোই বেরিয়ে এসেছিল একটি ছোট্টখাট্টো শুকনো-শাকনা গোছের মানুষ। বয়স কত? গাছপাথর নেই। নাম কী?— মনে নাই। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ইতিউতি চায়। এত মানুষ, এত গাড়ি, এত অট্টালিকা যেন সে কখনও দেখেনি। দু-তিনবার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কোথায় ছিল? কেন ছিল? এখন কোথায় এল? কেন এল? প্রশ্নগুলো মানুষটার মনে উঠছে আর লয় পাচ্ছে। এত হাবাগোবাকে কোন্ দেশ নেবে? গায়ের রং হলদে ঘেঁষা। মাথায় কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া চুল পেকে করকর করছে। শরীরের গড়নটা যেন ভারতীয়, নাকটা মাঝখান থেকে খাঁটি ইউরোপীয়দের মতো চড়া।

চারদিকের শহর-ছবি গ্রাম-ছবি মানুষ-ছবি যেন একটা গোলকধাঁধার মতো। তার যেটুকু স্মৃতি আছে, মনে হয় কিছুই যেন তেমন নেই। থাকবেই বা কী করে? গাছপাথর নেই এমনই বয়স। কত যে ঠিক তা সে নিজেও জানে না। কেমন বেভ্‌ভুল। খালি মনে হয়, হাওয়াটি তো তেমন করে বইছে না। চাঁদের রংটি তো তেমন চাঁপা-চাঁপা নেই। আকাশ এমন ফ্যাকফেকে কেন? কীসের এত দুর্গন্ধ!

খুনখুন করে হাঁটতে থাকে বুড়ো। মাঠ বায়। নৌকো বায়। জাহাজ বায়। বিশ্ব-আন্দোলনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে শুনে কেউ তাকে 'না' করে না। মাথা গুঁজে থাকে, চাট্টি খায়। আর সমুদ্দুরের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে। কালো জলে ফেনার সারি। আকাশ কোথায় সাগরে মিশছে বোঝা যায় না। কেমন যেন চেনা-চেনা। আবার অচেনা-অচেনা। আন্তর্জাতিক অপরাধী হিসেবে তাকে ধরা হয়েছিল। ঘুরেছে জেল থেকে জেলান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। কত কী-ই যে তার চেনা, আধো-চেনা!

'কী করেছিলে গো বুড়ো?'

সে মাথা নাড়ে—কিছু করি নাই।

ধরেছিল কেন?

মনে নাই। —ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকে।

আহা! বিনিদোষে হাজতবাস করতে করতে ম্যাদা মেরে গেছে গো!

এইভাবে ডোভার থেকে এডেন হয়ে মুম্বই বন্দরে ভিড়ল জাহাজ।

'এবার নেমে যাও বুড়ো। মাল খালাস করব, তারপর ফিরে যাব। ভাগো এবার।'

একজন বললে, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি এ দেশের সরকারি আপিসে দেখিয়ো। খেতে পরতে থাকতে দেবে। এখন তো বাপু তোমাদের সাত খুন মাফ।

এক খুনই বা কী, আর সাত খুনই বা কী! লোকটা কিছুই বোঝে না।

জেলের মধ্যে বন্ধ থাকতে খুব কষ্ট। কিন্তু একটা নিয়মে থাকা তো! তাই লোকটা বেশ শক্তপোক্ত। সরকার কী খুব আবছাভাবে মনে পড়ছে তার। কিন্তু একে ওকে জিজ্ঞেস করে যদিবা সরকারি অফিসতক পৌঁছোল, দর্শনি দিতে না পারায় দরজা থেকেই হাঁকিয়ে দিল দারোয়ান!

যাই হোক, বুড়ো অথচ শক্তপোক্ত, উপরন্তু কেমন নিষ্পাপ নরম চেহারার কারণে সে একটা কাজ পেল। বাড়ি ঘর সামলাবে, রান্না রসুই করবে, বাচ্চা দেখবে। সে আর এমন কী! জেলে থাকতে এর চেয়েও শক্ত কাজ সে হেলায় করেছে।

এদের নাম দারুওয়ালা। পতি পত্নী দু-জনেরই দুটো ব্যাবসা। বেরোবার বা ফেরবার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। একটি লোক তাই বড্ডই দরকার। দারুওয়ালারা প্রথমেই তার ছবি তুললেন। নাম কী?—অনেক চেষ্টা করে তার মনে হল ভি—ভি—ভিখু। বয়স? দেখেশুনে ওঁরাই বললেন, 'আনুমানিক সত্তর। নিরপরাধ বলে পৃথিবীময় যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরই একজন।'

নিকটবর্তী থানায় ছবি সমেত পরিচয়পত্রটি জমা দিয়ে দারুওয়ালা দম্পতি ভিখুকে বাড়িতে তুললেন। সে যে খামোখা আটক ছিল তাতে তাঁদের কোনো সন্দেহই নেই।

ভোর থাকতে থাকতে ছোট্ট আড়াই কামরার ফ্ল্যাটটি ঝাড়াপোঁছা করে সে। জল ভরে, বাসন মাজে, প্রাতরাশ তৈরি করে, বছর সাতের মেয়ে আর বছর পাঁচের ছেলেটিকে খেতে দেয়, টিফিন তৈরি করে, রাস্তার মোড়ে তাদের স্কুল-বাসে তুলে দিয়ে আসে। বাড়ির তালা খুলে এবার ভেতরে ঢোকে সে। খুব একটা ভালো দৃশ্য নেই। তবু ছোট্ট বারান্দাটাতে কীসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে সে। সময় হলে ছেলেমেয়ে দুটিকে বাস রাস্তা থেকে বাড়ি নিয়ে আসে। খেতে দেয়। তারা ক্লাবে

খেলতে যায়। সে বারান্দাতে বসে থাকে। দুর্বল মাথা, প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করে কী তার নাম, কবে কোথায় প্রথম জেলে নিয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধী...।

রাত আটটায় হয়তো মি. দারুওয়ালা ফিরলেন। মিসেসের ফিরতে আরও দু-ঘণ্টা। দু-জনে খেতে বসলেন। তাঁর যা যা খান সব শিখিয়ে দিয়েছেন ভিখুকে। সে দিব্যি মাংস বানায়, মোটা মোটা তন্দুরি রুটি, লাচ্ছা পরোটা, আচার কিনে আনে, সবজি বানায়, ডালভাজি কালিডাল সব শিখে গেছে সে। তার মনিব খুশি। মুম্বইয়ের তুলনায় অনেক কম মাইনেতে পেয়েছেন তাঁরা লোকটিকে। প্রতিবেশীরা ঈর্ষা করে। বাচ্চা দুটিও ভারি খুশি। দু-জনে দাবা খেলে, কমপিউটার গেম খেলে। শান্ত হাত পা কোলে করে ভিখু বসে থাকে। ভেতরে কেমন একটা শান্তি। বয়স হয়ে গেছে, বেশি তো সময় আর নেই, পৃথিবীর মেয়াদ ফুরিয়ে এল। এইরকম একটা খাটা-খোটা নিশ্চিন্ত জীবন ইতিমধ্যে বেঁচে নিতে খারাপ লাগে না তার। রবিবার দিন ওঁরা এক এক সময়ে বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে যান। কোনো কোনো দিন নিজেরা বাড়িতে থেকে তাকেই একটু ঘুরতে পাঠান। এইভাবেই তিন-চার বছর কেটে যায়। দারুওয়ালারা ভাবেন আর কী চাই! ভিখু ভাবে এই তো বেশ!

এক রবিবার বেশ দূরে একটু ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্র দেখে হাওয়া-টাওয়া খেয়ে এসে সে অবাক হয়ে দেখে বাড়ির দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে চক্ষুস্থির। ঘরে রক্তগঙ্গা। চারটি মৃতদেহ পড়ে আছে. মহিলা এবং তাঁর বাচ্চা মেয়েটির গায়ে কাপড় নেই। আলমারিতে চাবি ঝুলছে। একটা গোঙানির মতো আওয়াজ করে জ্ঞান হারিয়ে সেইখানেই পড়ে যায় ভিখু এবং এইভাবেই পুলিশ তাকে আবিষ্কার করে।

অনুসন্ধানে বার হয় সেই দিনই দারুওয়ালারা আঠারো লাখ টাকা বাড়িতে এনেছিলেন, কিছুর একটা পেমেন্ট। যদিও খুনের অস্ত্র বা টাকাটা পাওয়া গেল না। তবু তার ইতিহাস এবং পরিস্থিতি তাকেই খুনি বলে সাব্যস্ত করে। আশপাশে সবাই বলতে লাগল, 'অত কম টাকায় অত ওস্তাদ নোকর। তখনই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল! আসলে কিন্তু মোটেই সন্দেহ হয়নি।'

সরকার বনাম ভিখু মামলায় ভিখুর তরফের সরকার-প্রদত্ত দাতব্য উকিল প্রায় সারাক্ষণই মাথা ঝুলিয়ে বসে রইল। সরকারি প্লিডার বললেন, 'বিশ্ব হুজুগে কোনো কোনো ঘৃণ্য-অপরাধী ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। এ ব্যক্তিটি তাদেরই একজন। এবার অপরাধের শাস্তি দিয়েই ছাড়ব। ধর্ষণ, খুন এবং জালিয়াতিও। কেননা ভিখু বলে পরিচিত সেই লোকটি আসল নাম লন্ডন জেলের আধপচা নথি পত্রের থেকে পাওয়া গেছে। ভগোয়ান পরসাদ। যে ভগোয়ান সে ভিখু সাজে কেন?'

সুতরাং একদিন নির্বিঘ্নে ভিখুর ফাঁসি হয়ে গেল। জল্লাদ এই সুযোগে নিজের মজুরি বাড়িয়ে নিল। পুলিশ অফিসারের প্রমোশন হল, দপ্তরের সবাইকে একদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারি খরচে ভূরিভোজ খাইয়ে দিলেন। ভিখুর লাশটাতে জল্লাদ সুদ্ধ থুথু ফেলল—বেইমান!!

স্মৃতিভ্রষ্ট বেকুব ভাগোয়ান পরসাদের ফাঁসি হয়ে গেল। কিন্তু প্যান্ডোরার বাক্স থেকে ছাড়া পাওয়া শয়তান-পরসাদগুলি চতুর্গুণ প্রতাপে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

স্মার্ট গাই

চোখ মেলে সত্যেন চ্যাটার্জি চারদিকে ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। দুর্ভেদ্য, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

প্রথমে মনে হয়েছিল মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু শহরের মাঝরাত, সুখী গৃহকোণের মাঝরাতেও তো এমন অন্ধকার হয় না! ঘরে মৃদু নীল, রাস্তা থেকে রক্ষী আলো। পাশে একটা ঘুমন্ত, নিশ্চিন্ত মানবশরীরের নরম উষ্ণতা, যা এক রকমের আলোই। এখানে ঠান্ডা, জলো-জলো ভিজে ভিজে ভাব চারদিকে এবং...এবং... অন্ধকার...ত্রিলোক অন্ধ করা। আরে! এ তো তবে মৃত্যুর পরবর্তী অন্ধকার! নরকের! কেননা সে তো একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল! বাঁচার কথা নয়! সে মানবলীলা সংবরণ করেছে। দপ করে মনে পড়ল গর্জমান সাইক্লপস্-চোখ। বিকট বিধ্বংসী আওয়াজ আর তারপর অন্ধ তমস। গা হিম করা ভয়ে চোখ বুজল সে। মরলে তবে মানুষ প্রথম এই অন্ধকারে আসে? তারপর? তারপর কী ভাবতে গিয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল তার। কীসের লোম? গায়ের? গা কোথায়? কেন? কী করে? তখন সে বুঝল, কপালজোরে যে গুটিকতক লোক মরিয়াও মরে না সে সেই বিরল প্রজাতির। সে মরে নাই।

আকাশে ছিন্ন কাঁথার মধ্যে দিয়ে মলিন আলো। চোখ-সওয়া হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। ওই তো মরণ আলিঙ্গনে পরস্পরকে আঁকড়ে ধসে রয়েছে দানব ট্রাক আর তার নীল ইন্ডিকা। ট্রাকটার পশ্চাদ্দেশ মোটামুটি অক্ষত, কিন্তু নীল ইন্ডিকাখানা ট্রাকের দুমড়ানো সম্মুখভাগের তলায় ঢুকে গেছে। একেবারে পিণ্ডাকৃতি। আসলে সে ড্রাইভারের সিট থেকে ছিটকে পড়েছিল। কী করে সে জানে না। ডানদিকের দরজাটা কিছুদিন থেকেই একটু গোলমাল করছিল। গ্যাসকেট-ফ্যাসকেটের ব্যাপার আর কী? গারাজে যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছিল না, এত্তো বিজি শিডিউল...যাব যাব করে...সেই আলগা দরজাই তাকে বাঁচিয়েছে। কে বাঁচাল? আলগা দরজা? না সাত রতির রক্তপ্রবাল প্লাস তিন রতির নীলা? না কি? সে হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকায়—হে জগদীশ্বর, আর কেউ নয়, তুমি...তুমিই বাঁচিয়েছ। আমার ওপর তোমার অনিঃশেষ করুণা হে বিধাতা! তার চোখ দিয়ে গরম জল বেরিয়ে এল।

দিল্লি রোড বম্বে রোড যেখানটায় বিভক্ত হয়ে গেছে সেই মোড়টার কাছাকাছি ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা। তারা ফিরছিল। লিজি আর সে। ভোরবেলা পৌঁছে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েই আবার অফিস ছুটতে হবে। সারা সপ্তাহের নিশ্ছিদ্র খাটুনির পর এইসব বিনোদন। তার আলসে-মেজাজ আর তারপর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে উল্লসিত উত্তেজনাময় ড্রাইভিং। সত্তর...আশি...আশি ছাড়াচ্ছে...নব্বই...। লিজ বলছে আরও জোরে। যেন মিলনমুহূর্তের তুঙ্গ শীৎকারে, সমস্ত শরীরে চারিয়ে যায় উন্মাদনা। অদূরে সাইক্লপস চোখ হঠাৎ...গাঁ গাঁ, প্রাণপণে গাড়ি ডাইনে ঘোরাবার চেষ্টা। বিকট আওয়াজ। অন্ধকার।

আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের শারীরিক অবস্থাটাকে বুঝে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। সারা শরীরে ব্যথা। কিন্তু সেরকম যন্ত্রণা নেই। হাড় ভাঙেনি। গরম স্যুটের দৌলতে

শরীরটা সুরক্ষিত। কপালের ওপর একটা জায়গা জ্বালা করছে, হাতের পাতায়ও। বোধ হয় ভালোই ছড়েছে. উঠে দাঁড়িয়ে কোট থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল সে, পড়েছে একটা ঘেসো মাঠে। হাইওয়ের পাশে এরকম থাকে আকছার। কে জানত সেসব আয়োজন সত্যেন চ্যাটার্জির প্রাণ বাঁচানোর জন্য? কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে ঘাসভূমিকে চুম্বন দেয় চ্যাটার্জি। ক্রিকেটার ফুটবলাররা ম্যাচ জিতে যে-রকম দেয়। হাঁটুতে বেশ আড়ষ্ট ব্যথা লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সত্যেন, ঘটনার জন্য, দুর্ঘটনার জন্য, লাভ-লোকসানের অনুপাত কষে নেওয়া এক সুখ-দুঃখে মিশ্রিত পবিত্র কান্না। এবং, আর একটু পরে মাঠ পার হয়ে সাবধানে রাস্তার দিকে এগোতে থাকল সে।

আশ্চর্য! এ রাস্তা দিয়ে এখন তো মিনিটে মিনিটে ট্রাক যায়! একটাও?...নাঃ আসছে একটা, চোখে আলো পড়তেই হাত তুলতে গিয়েছিল, পরক্ষণেই আতঙ্কে মুখ ঢাকল সত্যেন। কী সর্বনাশ! সাহায্য কী? এখন সাহায্যের মানে কী?

ট্রাকটা চলে গেল প্রচণ্ড বেগে। কী একটা খড়মড়ে জিনিস উলটেপালটে ভাঙছে তার চাকায়। ভ্রূক্ষেপও করল না। মত্ত ড্রাইভার, ঘোরে আছে। চাঁদ পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে এবার। সেই আলোয় সত্যেন আশ্চর্য হয়ে দেখল তারই গাড়ির নাম্বারপ্লেট, তিন-চার টুকবোয় ভাঙা, কিন্তু...তার পায়ের কাছে তারই গাড়ির আইডেনটিটি পৌঁছে দিয়ে গেছে মত্ত ট্রাক, কিংবা ট্রাক নয়...আসলে সেই সর্বশক্তিমান যিনি মারেন, বাঁচান। জল-উপছোনো চোখে সে ত্বরিতে তুলে নিল টুকরোগুলোকে, একটার পর একটা তাসের মতো সাজাল। অদূরে একটা লম্বা জলাশয় চিকচিক করছে, গলা থেকে টাইটা খুলে নিয়ে টুকরোগুলোকে পরম যত্নে বাঁধল সে, সঙ্গে বাঁধল একটা বড়োসড়ো পাথরের টুকরো। সব তার জন্য এই মধ্যরাতের বধ্যভূমিতে সাজিয়ে রেখেছেন তিনি। আকাশের দিকে তাকাল একবার। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে জিনিসটা মাঝপুকুরে ছুঁড়ে দিল। যেমন করে চাকার বল ছোড়ে। ধুপ্‌প্‌প্‌ চমৎকারভাবে ডুবে গেল আইডেনটিটি।

এবার সে অনেক সাহস সঞ্চয় করে তালগোল পাকানো অকুস্থলের দিকে যায়। ট্রাকটা যেন দু-পা তুলে আহত ঘোড়ার মতো সামনে লাফিয়ে উঠেছে, ভাঙা দরজা দিয়ে ঝুলছে একটি মৃতদেহ। মুখের জায়গায় একটা মাংসের রক্তাক্ত চাঙড়। অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। ইন্ডিকাটা ঢুকে গেছে ভেতরে। তার সামনে পেছন বলে আর কিছু নেই। একটা অসমান বিকৃত বস্তুপিণ্ড এবং সেই পিণ্ডের সঙ্গে পিণ্ডাকৃতি হয়ে, শিউরে উঠল সত্যেন, জড়িয়ে গেছে নিজের দেহ। খুব সাবধানে লাইটার জ্বালিয়ে দেখল—ধড় মুণ্ড বলে আলাদা কিছু নেই। বীভৎস! তার ভেতর থেকে প্রবল একটা বমির ভাব উঠে আসছে। কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। ট্রাঙ্কে তাদের ব্যাগগুলো ছিল। তাদের অস্তিত্বই বুঝতে পারল না সত্যেন। অকুস্থল থেকে সরে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল সে। বমিটাকে আটকাতে পারল না। ঘাসের ওপর উগরে দিল ভয়, ঘৃণা, তারপর একটু সুস্থ হতেই কী মনে পড়ল—সে নিজের পাশ পকেটে, হিপ পকেটে, বুক পকেটে হাত রাখল। পার্স, পার্স, গোছা গোছা টাকা। ক্রেডিট কার্ড। লাইসেন্স, এমনকি রুমাল সহ সব পরিষ্কার গুছিয়ে রাখা, যেন পোশাকের সঙ্গে সেলাই করে দিয়েছে কেউ। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ভগবান, ওহ্ ভগবান, অগতির গতি! অবলের বল হে! একবার লাইটারটা আবার বার করল। জ্বালিয়ে দেবে? নাহ্। আগুন এখন বহু দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, বিস্ফোরণ হতে পারে, বলতে কী সে নিজেও ঝলসে যেতে পারে অল্পবিস্তর। তা ছাড়া খোদার ওপর খোদকারি করার দরকারটাই বা কী! তিনি যখন যেচে পড়ে তাকে এমন রক্ষা করেছেন! যা নিতান্তই দুর্ঘটনা অগ্নিযোগ করলে সেটা প্রমাণ লোপের চেষ্টা বা অপরাধে পরিবর্তিত হবে। সে তো অপরাধী নয়! এই দুর্ঘটনার

জন্য দায়ীও সে নয়। মেজাজে গাড়িটা চালাচ্ছিল সে। দোষ ওই ট্রাক ড্রাইভারের, ব্যাটা মাতাল ছিল। ঘোর মাতাল, পুলিশ ওর পেটে পিপে-ভরতি দেশি পাবে। সে কলকাতা নগরীর দিকে হাঁটা দিল। তার শহর, তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়।

স্টেশনের রিটায়ারিং রুম ভাড়া নিয়ে সারাদিন নিজের পরিচর্যা করল সত্যেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সুটটার কোথাও ফাটা-ফোটা হয়েছে কি না। নেই, তা সত্ত্বেও একজন অ্যাটেনড্যান্ট জোগাড় করে সুটটা ইস্ত্রি করিয়ে আনল, জুতো জোড়া পালিশ করাল, কপালের ওপরটা ভালো ছড়েছে। একবার ভাবল পট্টি লাগাবে। তারপর ভাবল সেক্ষেত্রে কৈফিয়ত দিতে হবে, তারপর ভাবল পট্টি না লাগালেও কৈফিয়ত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সে হাতে ও কপালে পট্টি লাগাল। চানটান করে ভালো করে ব্রেকফাস্ট করল, প্রেস করা সুটটা পরল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে থানায় গেল, বালিগঞ্জ থানা, নিজের গাড়িটা মিসিং ডায়েরি করাল, তারপর দোকানে গিয়ে অবিকল আগেরটার মতো একটা টাই কিনে পরল, অবিকল আগেরটার মতো ওভারনাইট ব্যাগ। যে রকম দুটো স্টোনওয়াশ জিনস, নাইট-সুট ও টি-শার্ট নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো কিনে ব্যাগটা ভরতি করে ফেলল। কটেজ ইন্ডাস্ট্রির দোকানে গিয়ে একটা শ্রীনিকেতনী লেডিজ ব্যাগ কিনে ফেলল। যেখানেই যায় মণির জন্য সে কিছু-না-কিছু উপহার আনে। তারপর বাড়ি ফিরে এল, পূর্ণদাস রোডে তার চমৎকার ফ্ল্যাট, যাকে বাড়ি বলাই যায়।

এখন মণি থাকবে না, সে স্কুলে গেছে। নার্সারি অ্যান্ড কিন্ডারগার্টেন। সাতটায় বেরোয়, দেড়টা-দুটোয় ফেরে। আর ঋত, ঋতম? সে-ও এখন স্কুলে। ঢোকবার আগে একটা কোচিং নিয়ে ঢোকে। কোন্ ভোরে তার মা উঠে তাকে ব্রেকফাস্ট করে দেয়। বেশ ভারী। তারপর টিফিনবাক্স ভরে দেয়। ফলটল বা কোনো মুখরোচক জাঙ্ক ফুড খেতে হলে টাকাপয়সা থাকে পকেটে। মণিমালার জেদ ঋতমকে তার বাবার মতো হতে হবে, যদি না তার চেয়েও বড়ো হয়।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল সত্যেন। সত্যেন ও মণিমালা দুটো নামই পুরনো ধরনের বলে তাদের দরজায় লেখা আছে এস চ্যাটার্জি, এম. চ্যাটার্জি, ঋতম চ্যাটার্জি। এই এস এম ঋতমের মধ্যে দিয়ে সত্যেন চ্যাটার্জি তার আইডেনটিটি কার্ডের মধ্যে ঢুকে গেল। ছবি হ্যান্ডসাম, বয়স—৪৩, ঠিকানা 'প্রারম্ভিকা' ২/৫ পূর্ণদাস রোড, কলকাতা...। পেশা—সার্ভিস, অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার এফ আর ইন্ডাস্ট্রিজ, ফোন...। মাঠের মতো লিভিংরুমের নিবিড় কার্পেটের ওপর শব্দহীন মার্জার চরণে সে শোবার ঘরের আযত আলস্যের মধ্যে এসে পৌঁছোল। প্রশস্ত ডবল বেডের পুষ্পিত আবরণী তাকে স্বাগত জানাচ্ছে, স্বাগত জানাচ্ছে দেয়াল থেকে হাস্যমুখ ফ্যামিলি অ্যালবাম। সত্যেন-মণি, মণি-সত্যেন, সত্যেন-মণি-ঋতম, মণি-ঋতম, সত্যেন-ঋতম হাস্যমুখ। বাপের হাসিতে সংযত আহ্লাদ, মা গরবিনি, পুত্র স্বাভাবিক শিশু-বালক হাসিতে স্নেহ-সুখ-জাগানিয়া। এ ছাড়াও আছে, ব্যাঙ্গালোরে ম্যানেজমেন্ট স্নাতক যুবক সত্যেন সবান্ধব। তীক্ষ্ণ চোখ-মুখ, মুখটি দুধ দিয়ে ধোয়া। সদ্য-বিবাহিত দম্পতি, স্টুডিয়োয় তোলা বিজ্ঞাপন ফটো, নতুন ফ্ল্যাট-প্রবেশ, সাদা গরদের ধুতি চাদর, লালপাড় গরদের শাড়ি, কোলে ক্রন্দনরত ঋতম। সে নতুন ফ্ল্যাটে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। সিল্ক দেওয়াল, দাবাবোর্ড মেঝে, ঢাকনা দেওয়া ঘোমটা আলো, আসবাবের তনিমা, ইলেকট্রনিক্সের গ্ল্যামার কিছুই তার ভয় কাটাতে পারছে না। স্বাভাবিক শিশু-বিস্ময় জাগাতে পারছে না। সে বোধহয় ফিরে যেতে চায় সেই বউবাজারি দোতলার তুতো ভিড়ে, যেখান থেকে কনিষ্ঠতম শরিক সত্যেন চ্যাটার্জি নিজের অংশের তোয়াক্কা না করে সমাতৃক, সপত্নীক, সপুত্রক বেরিয়ে এসেছিল। এরকম হয়। বাচ্চাদের নতুন পরিবেশ অ-নিরাপদ মনে হয়। মানিয়ে নিতে সময় লাগে। সেই মানিয়ে নেওয়ার ছবিও ঝলছে দেয়ালে। ঠাকুমার কোলে নিদন্ত-হাসি ঋতম। পরম নিশ্চিন্ত, ঠিক যেমন এই

ফ্ল্যাটটার কোলে এখন সত্যেন চ্যাটার্জি। অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার এফ আর ইন্ডাস্ট্রিজ। স্মার্ট গাই। সহকর্মীরা ঈষৎ বক্রোক্তির সঙ্গে ঈষৎ বাহবা মিশিয়ে বলে থাকে, 'চ্যাটার্জি ইজ আ স্মার্ট গাই।'

আয়নায় ছায়া পড়েছে তার। বন্ধ ঘরে আলো কম, প্রতিবিম্বও তাই ছায়াময়। তাকে ঠিক কী রকম দেখাচ্ছে খাট থেকে বুঝতে পারল না সত্যেন। কাছে গিয়ে আয়নার ওপরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। এই আলো জ্বেলে মণিমালা প্রসাধন করে। খুব নরম চেহারার, নরম ধাতের মণিমালা। মাখনে গড়া হাত-পা, চুলগুলো কাক-কালো, কপালে ছোটো টিপ, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, গলায় সরু হার, কানে মাকড়ি, হাতে বালা, ঘড়ি—মণিমালা স্কুলে, কি বাজারে কি অন্য কোনো দরকারে বেরোচ্ছে। কিংবা মাথায় বিচিত্র খোঁপা, চোখে কাজল, দামি গাদোয়াল, গহনা মণিমালা বিয়েবাড়ি যাচ্ছে, পার্টি-বাড়ি যাচ্ছে। পাশে সত্যেন, স্মার্ট গাই। নতুন ওভারনাইট ব্যাগ ভরতি জামাকাপড় ঠিক যেমনটি নিয়ে গিয়েছিল, টাইয়ে বাঁধা গাড়ির নাম্বারপ্লেট গহিন জলে, প্যান্টের পকেটে, শার্টের ভেতর পকেটে গোছা গোছা ক্যাশ, পার্সে ক্রেডিট কার্ড, আইডেনটিটি কার্ড, লাইসেন্স, বাড়ির চাবি, ঈশ্বরের করুণা।

দ্রুত জামাকাপড় বদলে ফেলল সে, এক গ্লাস জল খেল, একটা হালকা ট্রাংকুলাইজার, শুয়ে পড়ল সর্বতাপহর বিছানার কোলে। ভাবতে লাগল কিছু কি ভুল হয়ে গেল। কোনো চিহ্ন পড়ে নেই তো? ব্যাগ-ফ্যাগ সব গাড়ির থ্যাঁতলানো শবের সঙ্গে এমনভাবে দলা পাকিয়ে গেছে যে সে হদিস করতে পারেনি। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে গাড়ির কাগজপত্রগুলোরও নিশ্চয়ই একই দশা। তবু তার সামান্য আফশোশ হতে লাগল অকুস্থলে আগুন জ্বালিয়ে না আসার জন্যে। সে তো খুনখারাপি করছে না। অ্যাকসিডেন্টটাও সে ঘটায়নি। লিজ, ট্রাক ড্রাইভার ও তার খালাসি নিশ্চিত ডেড অ্যান্ড গন। তাদের বেঁচে থাকবার কোনো আশাই নেই। তা হলে আগুন ধরিয়ে শবদাহ করলে অপরাধ হত? সে তো কোনো অপরাধ করেনি! করেনি কী? অপরাধ? ঠিকঠাক! সত্যেন! ট্রাংকুলাইজারে আস্তে আস্তে তলাতে শুরু করল সে।

মি. স্যান্ডারসনের জন্যে লিজকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অফিসের আলিপুর গেস্ট হাউসে। উনি চেয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান, বেঙ্গলি, লোক্যাল। লিজকে শাড়ি পরিয়ে নিতেই আর কোনো অসুবিধে হয়নি। আসল কথা, ওসব লোককে হ্যান্ডল করতে সফিস্টিকেশন চাই। লিজি তো হেঁজিপেঁজি নয়, সে-ও এক নামকরা কোম্পানির কলকাতা অফিসের রিসেপশনিস্ট। লম্বা লম্বা পা, মডেলের মতো লীলাময় চলাফেরা, একেবারে যেখানে যতটা মাপ দরকার তেমনই। গেস্ট হাউসে যখন স্যান্ডারসনের সঙ্গে কনট্রাক্ট বিষয়ে ফাইনাল কথাবার্তাগুলো হল, দেখা গেল পিএ-র কাজটুকু লিজি অনায়াসে করে দিতে পারে। মি. স্যান্ডারসন চমৎকৃত। ইদানীং লিজ তারও অনেক সেক্রেটারিয়াল কাজ করে দিচ্ছে। আনঅফিশিয়ালি। একটাই চাহিদা তার। সত্যেন, সত্যেনকে তার চাই।

প্রথম যেবার সত্যেন নিজেকে দিয়েছিল, এত কিন্তু কিন্তু, এত লাজুক ছিল সে যে নিজেকে স্মার্ট গাই বলে প্রমাণ করতেই পারেনি লিজের কাছে।

'ভার্জিন না কি?' —এখনও সেই হাসি শুনতে পায় সে।

কবে আর ভোগ করতে শিখবে?

বিবেক? আশ্চর্য সত্যেন, তুমি তো ফ্যামিলিকে বঞ্চিত করছ না। ইউ স্টিল লভ ইয়োর ওয়াইফ অ্যান্ড মেক লভ টু হার, ডোন্ট ইউ?

আস্তে আস্তে একেবারে অচেনা, উত্তেজক নেশার বস্তু চিনতে পেরে গেল। সত্যিই সারা সমাজটা পালটে গেছে এখন, পালটাবেই। এসব এখন কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না। আরে বাবা,

রোজ তোমার বাড়িতে খেতে ভালো লাগে? থাই, মোগলাই, কন্টিনেন্টাল—জিভের বদল, স্বাদের বদল, পরিবেশ বদল—ভালো লাগে না? কী দোষ এতে? তেতাল্লিশ হয়ে গেল, কবে আর ভোগ করবে জীবনের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা ঐশ্বর্য? তা ছাড়া, মণিকে তো সে একটুও কম দেয় না! মণির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—শান্ত, প্রসন্নশ্রী...সকলেই বলে থাকে। আর ঋতম? তার তো কথাই নেই। তার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পায় সত্যেন। এবং নিজের ছায়ার মতোই ভালোবাসে...অ্যান্ড হি লভস্ হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড...মেকস লভ টু হার।...ডাজন'ট হি?

এ কী! তুমি এসে গেছ? অফিস যাওনি? এমন করে ঘুমোচ্ছ যে? শরীর ঠিক আছে তো?

সাধারণত সে ট্যুর সেরে সোজা অফিস চলে যায়।

কীরকমভাবে ঘুমোচ্ছিল সে? পুঁটলি হয়ে। হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো, মাথাটা নুয়ে এসেছে বুকের ওপর। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মতো!

একটু একটু করে ফিরছে সত্যেন। কিন্তু ঘোর অবাস্তবতায়। ট্রাংকুলাইজড্ ঘুম্ চট করে সত্য চিনতে পারে না। ঘরখানা টলমল করছে। সামনে একটি অলৌকিক মূর্তি। ছোটোবেলার সরস্বতীপুজো? ভূমিকম্প! অঞ্জলি দেবে? পল্টন...পল্টন...আজ সরস্বতীপুজো...বেলা হয়ে যাচ্ছে। ওঠ। ওঠ বলছি শিগগিরই। তুই-ই ফাঁকে পড়বি...আমার কী...

মাথাটা জোরে ঝাঁকিয়ে চোখ কচলে উঠে বসল সত্যেন। তাকে নিয়ে স্প্রিং ফোম একটু দুলে উঠল।

কী হয়েছে? এত তাড়াতাড়ি? আমি তো তোমাকে বিকেলের আগে...

'এত আশ্চর্য হবার কী আছে? —একটু বিরক্ত গলায় সত্যেন বলল, 'তুমি কখন ফিরলে?'

এই তো আজ প্রাইজ-লিস্ট করার ছিল। একটু দেরিই হয়ে গেছে। আমি ঘরে ঢুকে বিছানার কাছে আসবার আগে পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি তুমি...এসেছ।

হঠাৎ সত্যেন বুঝতে পারল, তার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে। সে নাও ফিরতে পারত। কাঁপা গলায় বলল, 'আর বোলো না গাড়িটা চুরি হয়ে গেল।'

গাড়ি? চুরি? কোথা থেকে? কখন?

কখন কি জানি? পার্কিং লট থেকে, বর্ধমান সরকারি গেস্ট হাউস...তেমন কিছু না ভেবেই বলে গেল সত্যেন।

বলো কী? এনকোয়ারি করলে না? পুলিশ? নোটিফাই করেছ?

মণি প্লিজ তুমি আমাকে একটু কম প্রশ্ন করো। আমার মাথার ঠিক নেই।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কাটল কী করে?

ও কিছু না। অন্ধকারে টয়লেটে যেতে গিয়ে...

খেয়েছিলে?

সে তো একটু...

একটু নয়, খুব। ভোগো! ...মণিমালা পেছন ফিরল,—একেবারে নতুন গাড়িটা! ইশ্‌শ্‌। ওখানে থানায় ডায়েরি করেছিলে!

সেটাই ভুল হয়ে গেছে। —ঠোঁট কামড়াল সত্যেন, আমার মাথার ঠিক ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনে কনফারেন্স মাথায়, গণদেবতা ধরে...। যাই হোক, এখানে ডায়েরি করে তবে বাড়ি...ওহ মণি, আমি—হা-ক্লান্ত—হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মণিমালার কোমর জড়িয়ে মাথা রাখল। হু হু করে কাঁদতে লাগল।

এ কী! তুমি কাঁদছ? কাঁদছ কেন?

গাড়িটা নতুন...

বদারেশন, কিন্তু ইনশিয়োর করা জিনিস...অমন উতলা হবার কী আছে। তাই বলে তুমি কাঁ-দবে? অপার বিস্ময় মণিমালার গলায়।

চট করে নিজেকে সামলে নিল সত্যেন। ভারী গলায় বলল, একটু চা খাওয়াবে? ঋত কোথায়?

এই তো এসে পড়বে।

মণিমালা চলে গেল। সত্যেন টয়লেট গিয়ে মুখেচোখে জলের ঝাপটা দেয়। এটা তো মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। বর্ধমানে চুরি যাওয়া গাড়ির ডায়েরি বালিগঞ্জ থানায়? বর্ধমানে শনিবার রাতটা রেস্ট নিয়েছিল তারা। রবিবার সকালেই শান্তিনিকেতন স্টার্ট করে গেছে। শ্রীনিকেতনের রাস্তায় চমৎকার রিসর্ট। কলকাতা থেকে এত কাছাকাছি যাওয়াটা বিপজ্জনক। কিন্তু করবেই বা কী! অত অল্প ছুটি! তবে বুকিংটা দেখলে কারও সাধ্য নেই সন্দেহ করে! সত্যেন চ্যাটার্জি একা এসেছে, আলাদা রুম। সন্তোষ গিদওয়ানি আলাদা। পরে। আলাদা রুম। স্টেশনে পৌঁছেই গাড়ি থেকে নেমে রিকশ ভাড়া করে চলে গেছে সন্তোষ গিদওয়ানি। শান্তিনিকেতনেও তাই। নামটা আবার পালটে নিয়েছে।

চা খেতে না খেতেই কাঁধে ভারী স্কুল-ব্যাগ ঋতম এসে গেল? পাঁচটা বাজছে টিকটিক করে। শীতের ম্যাড়মেড়ে বিকেল. সন্ধেয় মেশবার আগে বা ক্রমশই আরও আরও মন খারাপ করা হয়ে যেতে থাকে। সে সেন্টিমেন্টাল ধাতের মানুষ নয়। শীত-বিকেলের এই প্রকৃতি সে লক্ষ করেনি বহু বহু দিন। এ সময়ে সে অফিসে থাকে, কাজে ব্যস্ত, মিটিংয়ে, কনফারেন্সে এ হোটেল থেকে ও হোটেলে ভ্রাম্যমাণ। ছুটির দিনে বেশিরভাগই বেরিয়ে পড়ে, হু হু করে নীল ইন্ডিকা চালিয়ে, পাশে লিজ সন্তোষ গিদওয়ানি বা মণিমালা চ্যাটার্জি যে-ই থাক। পিছনে একটি দশ-এগারো বছরের দুধ-ধোওয়া-মুখ তার নিজস্ব রক্তের ঝলক থাক বা না থাক। এ কথাটা বলত মণিমালা। সকাল সকাল ক্বচিৎ বাড়ি ফিরলে দেখত মণিমালা বারান্দায় বসা, আলুথালু, মুখে বিষাদের ভার। ঋত খেলতে বেরিয়ে গেছে। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে খুঁজতে বারান্দা।

এ কী মণি! এখানে! আলো জ্বালোনি?

জ্বালালেই বা কী, না জ্বালালেই বা কী!

মানে?

দূর, এরকম সন্ধে হলে মনে হয় আলো আর জ্বলবে না।

ওহ্‌, তোমার সেই বেদনাবিলাস?

মণিমালার ভেতরের এই অন্ধকারকে ভালো চেনে না সত্যেন, যেমন চেনে না মণিমালাও সত্যেনেরটা। দু-জনের অন্ধকারের প্রকৃতি আলাদা।

'বাবা, তুমি এসে গেছ?' —খুশির হাসিতে কলকলাচ্ছে ঋতম।

কেমন একটা অস্বস্তি হয় তার। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, 'কাজ হয়ে গেল, এসে গেলাম!'

'কী মজা!—মা খেতে দাও!' ...পিঠে ব্যাগ, মুখে হাসি, নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছে একমাত্র সন্তান কিন্তু তাকে যেন সে পুরোপুরি চিনতে পারছে না। তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থির করতে পারছে না। হাত বাড়িয়ে অনিশ্চিত ডাকছে, 'বালক, তুমি আমার কে? তুমি কোথায়? আমি তোমার কে? ঋতম্ আমি...আমি কোথায়?'

সন্ধে সাতটা। ঋতম পড়ছে নিজের ঘরে। মণিমালা বারান্দায়, সত্যেন বারান্দায়, মুখে অনভ্যস্ত সিগারেট। বাড়িতে ধূমপান করে না সে। স্ত্রী-পুত্রের প্যাসিভ স্মোকিং এর কারণ হবে না, খুব সচেতন। মণিমালার চোখে প্রশ্ন। সত্যেন পড়তে পেরেছে। বারান্দায় তো! উড়ে যাবে। ভীষণ অস্থির-অস্থির লাগছে।

তাই তো দেখছি, বর্ধমানে ডায়েরির কী হবে?

আরে বাবা ওসব আমাদের লোকাল থানাই করে দেবে। জাস্ট একটা ফোন।

প্রসেসটা কি তাই? তোমার মনে নেই মেজদাদুর অ্যাকসিডেন্ট হল ল্যান্সডাউনে। ডায়েরি করানো হল ভবানীপুরে। তার পরে বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট কেস সব লালবাজার।'

অ্যাকসিডেন্ট কেস! অ্যা ক্ সি ডেন্ট...

সে বলল, কাল ফার্স্ট থিং খোঁজ করব। আজকের দিনটা, জাস্ট আজকের দিনটা আমাকে রেহাই দাও।

অন্ধকারেও মণিমালার মুখের বিস্ময়, আহত অভিব্যক্তি বোঝা যায়। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকা।

স্যরি মণি, প্লিজ।

ঠিক আছে। কিন্তু গাড়ি ছাড়াও ...তোমার আরও কিছু প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে। অফিসে কিছু গণ্ডগোল ..? এত অস্থির?

ইয়েস। ঠিকই, কিন্তু এগুলো তো ডিসকাস করে কোনো লাভ নেই! লেট মি থিংক!

'সাড়ে আটটা, মা!' ---ঋত ডাকছে।

মণিমালা উঠে গেল। এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। আর অভিমান প্রকাশ করেনি। স্বামীর ভাবনায় সে যথেষ্ট ভাবিত। কিন্তু এসব বিষয়ে সে যদি ভাবনা চিন্তা করবার সময় চায়। একা একা, তো ভাবুক। তাতে অবশ্য মণির ভাবনা কমে না। কেননা সে যে কর্পোরেট জগতের কিছুই বোঝে না এটা ঠিক নয়। তেরো-চোদ্দো বছর বিয়ে হয়ে গেছে, ঘনিষ্ঠ বসবাস। আপনা-আপনিই অনেক কিছু চুইয়ে চুইয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে।

খাবে এসো।

প্রচুর অনিচ্ছা নিয়ে সত্যেন ওঠে। হাত-মুখ ধোয়ার সময় নিয়ে। খিদে যে পায়নি তা নয়। কিন্তু ইচ্ছে নেই। মনে হচ্ছে খেতে গেলেই উঠে আসবে।

ধোঁয়া-ওঠা মাটন। রুটি বেতের ঝাঁপিতে। একটা দুটো করে সেঁকে দিয়ে যাচ্ছে পূর্ণিমা। আলু-ফুলকপির ডালনা, স্যালাড।

মাটনের বাটি সরিয়ে দেয় সত্যেন, কালকেও খেয়েছিল। গন্ধেই বমি আসছে।

রেজালা করেছে আজকে, সরিয়ে রাখছ যে!

ভালো লাগছে না মণি। আমি যা হয় দিয়ে ঠিক খেয়ে নিচ্ছি প্লিজ ডোন্ট বদার।

খেতে খেতে মণিমালা ডাকল, 'পূর্ণিমা টি. ভি টা অন করে দিয়ে যাও তো।'

একেবারে অন্যমনস্ক ছাঁদে খাচ্ছে সত্যেন। মগ্ন খাওয়ায় ভাবনায়। যেন সে একটা গ্রহে একলা মানুষ। কোথায় কেউ নেই। চারপাশে খালি বাতাস। তা-ও আছে কী?

'ও মা, দ্যাখো দ্যাখো, কী ভয়ংকর অ্যাকসিডেন্ট!'—ঋতম চেঁচিয়ে বলে।

'ওরে বাবা, ঠিক গাইসালের মতো, না?'

গতকাল মধ্যরাতে দিল্লি রোড বম্বে রোডের সংযোগস্থলে একটি ট্রাক ও একটি প্রাইভেট

কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকটি মোটরগাড়িটির উপর উঠে যায় সংঘাতে। ট্রাকের চালক ও খালাসি মৃত। গাড়িটি একেবারে পিণ্ডাকৃতি হয়ে গেছে। আগুন লাগেনি কেন—সেটাই আশ্চর্য! গাড়ির চালক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন। তাঁকে শনাক্ত করা যায়নি। তবে কোনো কোনো প্রমাণ অনুযায়ী চালক একজন মহিলা।

হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক ধুক...হঠাৎ একটা ফসকে গেল।

'দ্যাখো বাবা—দ্যাখো...!' মুখ তুলে চায় সত্যেন রক্তহীন, দৃষ্টিহীন।

তদন্ত হচ্ছে। খবর এখনকার মতো শেষ হল। পরবর্তী খবর...

ও কী? উঠে পড়লে!

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলায় সত্যেন, অস্পষ্ট স্বরে বলে, হয়ে গেছে। তারপর তাড়াতাড়ি শোবার ঘরের বাথরুমে বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। আজকের রুটি, ফুলকপি, মটরশুঁটি গোটা গোটা উঠে আসে, তারপর গতকালের মাটন তার শেষবিন্দু পর্যন্ত পাকযন্ত্র আলোড়িত করে উঠে আসতে থাকে। ঝাঁঝরির ওপর তর্জনী দিয়ে সমস্ত ঘষে ঘষে পাতালে পাঠায় সে, খুনি যেভাবে খুনের প্রমাণ লোপ করে, তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়ে। জ্বর আসছে। ঘনঘটা করে জ্বর আসছে...

কাজকর্ম শেষ। ঋত ঘুমিয়ে পড়েছে। এত বড়ো হল ছেলে তবু শোবার সময়ে মাকে চাই। হয় মা গল্প বলে, কিংবা ছেলে, কিংবা গল্প হয়...প্রণীত কী বলেছে, ঝুমুরের সঙ্গে চৈতালির কী রকম ঝগড়া হয়ে গেল শুধু শুধু। জানো মা, অভিষেক মোবাইল নিয়ে স্কুলে আসে। আমাকে একটা দেবে?

তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে ঋত? জানো না ক্লাস সিক্সের ছাত্রের মোবাইল কেন, ঘড়ি ব্যবহার করাও ঠিক নয়। দরকারই তো নেই, তুমিই বলো। সারেরা জানতে পারলে বকবেন কিন্তু।

উচিত নয় কেন মা?

অ্যাডাল্টরা যা যা করে মাইনরদের তা তা করতে নেই সব সময়ে। তুমি কি বাবার মতো চাকরি করতে পারবে? সেই জ্ঞান বুদ্ধি এলে তখন...

ঠি-ক বাবার মতো! ঘুম-ঘুম গলায় বলল ঋত—নীল ইন্ডিকা গাড়ি...ক্রেডিট কার্ড.,,টাকার ব্যাগ...ট্যুর...মা...

আলতো করে ছেলের মাথায় হাত রাখে মণি—হ্যাঁ। বিচক্ষণ... কাজপাগল...লাভিং অ্যান্ড কেয়ারিং...

সেই একই হাত সত্যেনের গায়ে রেখেছে মণিমালা। জাগাতে নয়, মানুষটা ভীষণ চিন্তিত, সেই চিন্তার ওপর আশ্বাসের হাত। হাতে তাপ উঠে এল। বেশ জ্বর। তাই অখিদে, অনিচ্ছা, খারাপ লাগা, কিচ্ছু ভালো না লাগা...বিরক্তি! বেশ করে ঠান্ডা লাগিয়ে এসেছেন।

'শুনছ! শুনছ! —ওষুধটা খেয়ে নাও।'

লাল চোখ মেলে সত্যেন। কোথায় আছে, কে বলেছে, ঠিক করতে পারছে না।

তোমার খুব জ্বর। এখন দুটো প্যারাসিটামল খেয়ে নাও—মণি এক হাতে তার ঘাড়টা তুলে রেখেছে। আর এক হাতে ট্যাবলেট দিচ্ছে দুটো, জল। —শুয়ে পড়ো।

দুদিন অফিস কামাই হল। মণিমালারও। একটা জ্বরো রোগী, অতি দুর্বল, অতি অস্থির, মাঝে মাঝে এমনকি বিড়বিড় করে বকছেও। ডাক্তার দেখে গেছেন। সাধারণ ঠান্ডা লাগা জ্বর বলেই

মনে হচ্ছে, তবে আর একদিন থাকলে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। কী করে যাবে মণিমালা? সে মেপে ওষুধ দেয়, জ্বর মাপে, স্পঞ্জ করিয়ে দেয়। নাঃ, তৃতীয় দিনে জ্বর ছেড়ে গেছে। সত্যেনকে অফিস যেতেই হবে। দুর্বলতা? তেমন কিছু না। জোরালো সুপাচ্য পথ্য দিয়ে গেছে মণিমালা সমানেই।

অফিসে জ্বরের কথা জানানো হয়েছে. কিন্তু গাড়ি চুরির কথা নয়। সত্যেন একটা নীল মারুতি ভাড়া করেছে হঠাৎ দূর থেকে দেখলে কারও কিছু মনে হবে না। ইনশিয়োরেন্স ক্লেম এখনও পাঠায়নি। কেন? সে জানে না।

আস্তে আস্তে পুরো দমে কাজকর্ম আরম্ভ হয়ে যায়। একটা মেরুন রঙের এস্টিম কিনেছে সত্যেন। স্যান্ট্রো, জেন, এসব গাড়ির গড়ন একদম পছন্দ করতে পারছে না সে আজকাল। তাই দীর্ঘপুচ্ছ এস্টিম। নতুন টাকা দিয়ে নতুন লোনে। ইনশিয়োরেন্সের টাকাটা পাওয়া গেলে মণি আর ঋতের জন্য সে আর একটা গাড়ি কিনবে। এটা আগেই করা উচিত ছিল। কিন্তু মণিমালা খুব উৎসাহী নয়। তার জন্যে গাড়ি কেনার কথা উঠলেই কথা ঘুরিয়ে ফেলে।

একদিন...মাত্র একদিন বলেছিল—

আমার কেমন...খারাপ লাগে।

কেন?

কী দরকার? এত কাছে স্কুল! ঋতও কী সুন্দর বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করতে করতে যায় স্কুল বাসে। বাজার-হাট? বিশেষ দরকার হলে তা তোমার গাড়িই পাই!...

মণি কিন্তু বেশ সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। তার বাবা দাদা দু-জনেই ডাক্তার। স্বভাবতই তাদের বাড়িতে দুটো গাড়ি আছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে মণিমালা অতিরিক্ত পছন্দ করে না, এবার বোধহয় একটু জোরই করতে হবে।

ইনশিয়োরেন্স থেকে ফোন আসছে। চুরি যাওয়া গাড়ির কোনো কিনারা হল না। সুখের কথা, বর্ধমান গেস্ট হাউজ জানিয়েছে, চ্যাটার্জি খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, গাড়ির খবর তারা জানে না। কিন্তু স্যার তক্ষুনি পুলিশে ডায়েরি করলেন না কেন?

আমার মাথার ঠিক ছিল না। কর্পোরেট হাউজের ব্যাপার তো বোঝেন। শান্তিনিকেতনে ছুটতে হবে তক্ষুনি, জরুরি কাজ। ওখানে কনফারেন্স করে হন্যে হয়ে ফিরেছি। তারপর ডায়েরি করি। গাড়ির মেক, নাম্বার, ডেট অব পারচেজ, ইনশিয়োরেন্সের তারিখ। টার্মস।

একটাই বিপদ। অফিসে যদি খোঁজখবর করে কার সঙ্গে মিটিং করতে উইক-এণ্ডে বর্ধমান, তারপর শান্তিনিকেতন ছুটতে হয়েছিল তাকে। তবে, অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার হিসেবে অনেক প্রজেক্ট তাকে একাই হ্যান্ডল করতে হয়, একাই প্ল্যানিং করতে, ডিসিশন নিতে হয়। যেটা শুরুতেই গুবলেট হয়ে গেল তারজন্য ডিটেল্ড রিপোর্টও দেওয়াটা জরুরি নয়। এই ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি নতুন বাজারে নেমেছে। কমপিটিটিভ মার্কেট। টাকাটা শেষ পর্যন্ত চুকিয়েই দেবে বোধহয়। কেননা বলল—যদি নাম্বার প্লেট পালটে ভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে থাকে, ফিরে পাবার কোনো আশাই নেই। সাধারণত কোনো অপরাধমূলক কাজ করলে গাড়িটা ব্যবহার করে এরা অকুস্থল থেকে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে যায়। যখন এত দিনেও বার হল না তখন গাড়িটা ইতিমধ্যেই চোরাই মাল, দু-তিন হাতফেরতা হয়ে গেছে।

একটা মারুতি এইট হানড্রেড ডিলাক্স কিনে সোজা বাড়ি ফিরে এল সত্যেন। ধবধবে সাদা। মণিমালার হাতে চাবি দিয়ে বলল, 'নাও এটা তোমার।'

কী আশ্চর্য!

আশ্চর্যের কী আছে? গিফ্‌ট! বিবাহবার্ষিকীর, অল রাইট? তোমার লাইসেন্স আছে, কিন্তু কলকাতার রাস্তায় আমি তোমাকে ড্রাইভ করতে দেব না।

ন্যাশনাল হাইওয়েতে রাত্তিরে একটি মেয়ে একা গাড়ি চালাতে পারে আর এই কলকাতার রাস্তায় দিনের বেলা আর একটি মেয়ে একটু পারবে না?

কোথায় আবার পেলে এ রকম?

কেন? ওই যে গাড়িটা সেদিন অ্যাকসিডেন্ট করল না? সেই তুমি যেদিন ফিরলে!

গায়ের চামড়ার খোল থেকে রক্তমাংসের মানুষটা প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। কী বলছে মণি? ও কি কিছু সন্দেহ করেছে? কী করে? কেন? অনেক কষ্টে সে শুধু বলতে পারল, 'ত্‌তাই ওরকম অ্যাকসিডেন্ট হয়।'

কেন? ট্রাক ড্রাইভারটা? সে তো আর মেয়ে নয়! তার বেলা?...

সব মেয়েদের পারংগমতা প্রসঙ্গে কথাটা বলেছিল মণি। মেয়েরা পাইলট হচ্ছে, অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ট্রাক ড্রাইভার? রাত্তিরে ওরা একেবারে বেহেড হয়ে গাড়ি চালায়।'

'সে তো জানি! সেই জন্যেই তো বারণ করি ধরো ওইটা যদি তোমার ইন্ডিকা হত? ওই মেয়েটির জায়গায় যদি তুমি...উহ্‌হ্‌।' শিউরে উঠল মণিমালা, আর তার চেয়েও বেশি শিউরোলো সত্যেন নিজে। তার গা ছমছম করছে। এবং বেশ কয়েকদিন যাবৎ শান্ত, শ্রীমতী মণিমালাকে কেমন ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। যতবার দেখছে নিজের মুখে মনে পড়ছে। যতবার দেখেছে দুর্ঘটনার দৃশ্যটা হু হু করে চলে আসছে চোখের সামনে। ঋত! ঋত দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত অদ্ভুত ভোরের স্বপ্নে। ঋত 'বাবা' বলে ডাকতে চেষ্টা করছে, পারছে না, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে তবু পারছে না। আতঙ্কিত চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে নিজের গলাটা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। একটা নীল গাড়ি চড়ে ঋত হুশ্‌শ্‌ করে চলে গেল। কাঁচের ভেতর থেকে দেখা যায় তার আবছা বাই-বাই।

তার বিমর্ষ ভাব লক্ষ করেছে মণি। বলল, 'চলো না, আমরা ক-দিন একটু কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। সামনেই ২৬ জানুয়ারি সাতাশে পড়েছে শনিবার। তিন দিন ক্লিন ছুটি পাওয়া যাচ্ছে।'

কোথায় যাবে এই ক-দিনে? ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেলে তো!

ট্রেনে কে যেতে চাইছে? নতুন এস্টিমটা করে, ড্রাইভার নিয়ে...কথা শেষ হল না চিৎকার করে উঠল সত্যেন—'না-আ-আ।'

তুমি এত আপসেট হয়ে পড়ছ কেন? আশ্চর্য তো!

'ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজমের একটা ছোটো প্যাকেজ নেওয়া যায়'—শান্ত গলায় বলল সত্যেন।

ঠিক বলেছ। ধর জয়রামবাটি কামারপুকুর!

ঠিক ঠিক। এই রকম, এই রকম কিছুই একটা দরকার এখন। শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা, শ্রীচৈতন্য, যাঁরা যাঁরা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের দূত হয়ে এসেছেন—গেছেন তাঁদের দরকার তার। অন্য কিছু ভাবতে পারছে না সত্যেন। বার বিস্বাদ, অফিস বিরক্তিকর, মানুষের সঙ্গ ভীতিপ্রদ, এমনকি যাদের সঙ্গে এই ছোট্ট ভ্রমণে যাওয়া সেই একান্ত নিজের সৃষ্টি পরিবারকেও তার ভালো লাগছে না। ইতিমধ্যেই তারা যেন অনেক যোজন দূরে চলে গেছে।

অথচ ঋত ঠিক তেমন করেই বাবার ট্রাউজার্স-এর সঙ্গে লেপটে প্রশ্ন করছে, বাবা, এইগুলো সারদা মায়ের জীবন নিয়ে কমিকস?

প্রদর্শশালার কক্ষে ঋত কমিকস দেখছে তার বাবা দেখছে ট্র্যাজিকস। হে মা, হে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যদি সত্যিকারের ঠাকুর হও তো এই অধম, নীচাশয়, ক্লিন্ন, বিশ্বাসঘাতক পাপী, হ্যাঁ পাপীকে রক্ষা করো। একবার। আর কখনও এমন হবে না। দীক্ষা নেব, মাছ-মাংস ছেড়ে দেবে, বিশাল ডোনেশান দেব মঠে। মাতৃমন্দিরের চৌকাঠে সে এতক্ষণ ধরে প্রণাম করে সে অন্য অভ্যাগতদের অসুবিধে হয়, মণিমালা সামান্য হেসে মন্তব্য করে, 'তোমার যে এত ভক্তি তা তো জানা ছিল না!'

কে কাকে কতটুকু জানে মণিমালা? তুমি কি আদৌ সত্যেনকে জানো? জানো, দিনের পর দিন সে কীভাবে তোমাকে ঠকিয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট করে অকুস্থল থেকে নিজের সমস্ত চিহ্ন লোপাট করে পালিয়ে এসেছে খুনির মতো! মেয়েটি একেবারে সর্বাংশে মৃত ছিল। কিন্তু তার যদি একটুও প্রাণ অবশিষ্ট থাকত সত্যেন কি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করত? না। রূঢ় সত্য হল—না। মেয়েটি প্রমাণ তার আইডেনটিটির, যেমন নাম্বার প্লেটটা ছিল প্রমাণ—তার গাড়ির আইডেনটিটির। তার মানসম্মান, তার ঘর, বার সব ভেঙে যেত।

আবার সেই ভয়াবহ শহর। বাইরে থেকে এ শহরে ঢুকলেই একটা গুমগুম চাপা গর্জন শোনা যায়, যেন অন্ধকার হিমেল রাতে হাইওয়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ট্রাক চলেছে। শহর ভরতি নীল ইন্ডিকা, শহর ভরতি লিজ, লম্বা অনাবৃত পা, সোনালি হাই-লাইট চুল, মডেল চেহারার স্মার্ট মেয়ে লিজ, যে রিসেপশনিস্টের কাজও করে আবার প্রয়োজন হলে ক্ষুধিত পুরুষকে শান্তও করে, ইচ্ছা হলে, পছন্দ হলে, অপাপ পুরুষকেও বশ্য বাসনায় প্রাণপণে চায়। চতুর্দিকে লিজের প্রেত। পথ-চলতি কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারে না সত্যেন। কেননা লিজ টুকরো টুকরো হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে। ভালোবাসা নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, এক প্রবল, দুর্দম ভয় হয়ে।

শুনেছ চ্যাটার্জি, লিজ গ্লো নামে মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের সেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটা। তুমি তো ভালোই চিনতে! শি ইজ মিসিং ফর দা লাস্ট ওয়ান মান্থ্। খেলুড়ে মেয়ে ছিল যাই বল—দ্যাখো কোথায় ফেঁসেছে...কী হল?

সত্যেন চ্যাটার্জি অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার এফ. আর. ইন্ডাস্ট্রিজ টেবিলের ওপর তার পি. সি-র কি-বোর্ডে ঢলে পড়েছে।

'প্রেশার দ্রুত ফল্ করছে। এঁকে নার্সিংহোমে শিফট্ করতে হবে।'

'তাই কিছুদিন ধরেই ওকে কেমন কেমন লাগছিল। এই বলো!'

লিজের ছবিটা কাগজে ফ্ল্যাশ করছে, কাগজে, টি. ভিতে। যদি কেউ হোয়্যার অ্যাবাউট্স্ বলতে পারো। হ্যাঁ...না....ও তো থাকত হস্টেলে...ঠিক হস্টেল নয়...পি জি বলতে পার। দেয়ার ওয়াজ সেভারাল। অফিস থেকে তো তলব গেছেই, ফেলো পি. জি-রাও নোটিশ করেছে।...ওরকম নাকি ও প্রায়ই যেত। মোস্ট প্রব্যাবলি নষ্ট টাইপের! গোড়ায় পার্ক সার্কাস এরিয়ায়...মা মারা যাবার পর থেকে রিপন স্ট্রিটে ওই গেস্ট হাউজ...এনি ওয়ে শি ইজ নাও দ্য টক অব দা টাউন। আজকাল মেয়েদের যখনতখন তুলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে...যা হচ্ছে দিনদিন দেশটা...হোপলেস।

চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু হলুদ। অণুপরিমাণ, কিন্তু সব মিলিয়ে পরিব্যাপ্ত। মাইলের পর মাইল ছাওয়া। সেখানে আস্তে আস্তে নেমে আসতে থাকে, ধোঁয়া, কালো, কালির অন্ধকার।

একটু মাপা খাওয়া-দাওয়া বুঝলেন! ওষুধ তো যা দেবার দিলামই। হালকা করে চিকেন, মাটনও

কচি দেখে, রোজ নিয়ম করে আড়াইশো গ্রামে তো খাওয়াবেন। না, হার্টে কিচ্ছু নেই। বোধহয় খুব টেনশনে ছিলেন। এসব জবের এই-ই রীতি!

মাংস কিন্তু একদম খেতে চাইছে না, মাছও...হঠাৎ ভীষণ অরুচি...

এমনিতে খেতেন?

ওরে বাবা, যথেষ্ট না হলে খাওয়াই হত না...অথচ হঠাৎ....

কী জানি তার থেকেই হয়তো প্রেশারটা....

ডক্টর, সম্প্রতি ওঁর আধ্যাত্মিক দিকে খুব ঝোঁক হয়েছে। বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মার ছবি এনে শোবার ঘরে টাঙিয়েছেন। মঠে যাচ্ছেন সময় করে!

ইনট্রেস্টিং! তারপর থেকেই কি এই মাছ মাংসে অরুচি?

মোর অর লেস!

ডাক্তার হেসে বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ডারের শিষ্যসামন্ত মহারাজরা কিন্তু মাছটাছ যথেষ্ট খেয়ে থাকেন। একেবারে চর্ব্যচোষ্যলেহ্য-পেয়। এটা ওঁর মাথায় ঢোকান। আমিষ খেয়েও 'ঈশ্বর' হয়।

তা কিন্তু না। ইচ্ছে করে যে সংযম করছেন তা নয়। আপনা আপনিই...

ঠিক আছে। আমি একটা পাউডার প্রোটিন লিখে দিচ্ছি। দুধের সঙ্গে সকাল সন্ধে। অন্তত সাত দিন কমপ্লিট রেস্ট। তারপর সেটা একটু বাড়াতেও হতে পারে।

'লিজ গ্লো, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান, দৈর্ঘ্য - ৫´ ৭˝, ফরসা রং, সোনালি স্ট্রিক দেওয়া চুল, সাত নম্বর রিপন স্ট্রিট, কলকাতা। গত একত্রিশে ডিসেম্বর থেকে নিরুদ্দেশ। কেউ যদি খোঁজ দিতে পারেন যোগাযোগ করুন—ভবানীভবন, আলিপুর।'

শুকনো মুখে, রুগ্ণ হাতে কাগজটা নামিয়ে রাখল সত্যেন।

হ্যালো চ্যাটার্জি! আছ কেমন! ছবিটা দেখলে? এ তো আমাদের লিজ গ্লো-ই। আমি শনাক্ত করে ভবানীভবনে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।

তোমারও দেওয়া উচিত—মণিমালা বলল—একটা অন্তত ফোন করে দাও।

ভবানীভবন! আমি এফ. আর. ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সত্যেন চ্যাটার্জি বলছি।

লিজ গ্লো নামে নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটিকে আমি, আমাদের অফিসের অনেকেই চিনত।

ইয়েস। ভালো কি মন্দ কী করে জানব বলুন। মেয়েরা রিসেপশনিস্ট, পি. এ-র কাজ করলে তাদের একটু-আধটু বদনাম হয়েই থাকে।

'এটা তুমি একেবারে ঠিক বলছ,' —মণিমালার মুখ গনগন করছে ; 'রিসেপশানিস্টরা একা একাই মন্দ হয়, আর যেসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এদের ব্যবহার করে তারা সব নিষ্পাপ বালক... ও কী! তুমি অত ঘামছ কেন? একটু গরম দুধ নিয়ে আসছি...দাঁড়াও ঘামটা মুছিয়ে দিই!'

চাঞ্চল্যকর খবর। ই. টিভি বাংলা। লিজ গ্লো নামে নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটিকে গত একত্রিশে ডিসেম্বর বর্ধমান সরকারি গেস্ট হাউজের ম্যানেজার দেখেছেন। তবে ওই নামে রেজিস্টারে নেই। জনৈক সন্তোষ গিদওয়ানি রুমটি নেন। শান্তিনিকেতনের 'রুদ্রপলাশ' হলিডে রিসর্টের মালিকও মেয়েটিকে চিনেছেন। তিনি নিশ্চিত নন, তবে মেয়েটি সম্ভবত মেরিয়ান সিম্পসন নামে রেজিস্ট্রি করায়।

খবর শুনতে শুনতে মণিমালার হাতের কলম থেমে গেল। কী অদ্ভুত কাকতালীয়...ওই দুটো দিন তো সত্যেনও ওইখানে ছিল। দু জায়গাতেই কোনো পার্টির সঙ্গে ওর কথাবার্তা ছিল।

খবর সাধারণত এড়ায় সত্যেন। কিন্তু মণিমালার যে কী খবরতৃষ্ণা!

চ্যানেল সার্ফ করে করে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব চ্যানেলের খবর দেখবে।

দ্যাখো দ্যাখো, বুশকে কী রকম ঘোড়েল শয়তানের মতো দেখাচ্ছে...

...ইশ্‌শ্ কী বলছে শুনেছ...গোধরা হলে গুজরাতও হবে। এদের হাতে আমরা রাজদণ্ড দিয়েছি।...সত্যেন হরিবল্...চা বাগান দেখাচ্ছে... এ লোকগুলো স্রেফ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে! অনাহার না অসুখ এই নিয়ে তদন্ত কমিটি... সত্যেন এর পরেও আমরা দ্বিতীয় গাড়ি কিনি। আমাদের ছেলে নিজস্ব সেলফোনের বায়না ধরে!

কী অদ্ভুত কো-ইনসিডেন্স সত্যেন, তুমিও ওই দু-দিন ওখানেই ছিলে। দ্যাখোনি ওকে?

না।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কী আছে? গিয়েছিলাম পার্টির সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক মারপ্যাঁচ কষতে। গেস্ট হাউজে কে এল, কে এল না নজর রাখতে নয়। ঘর থেকে বেরোইনি পর্যন্ত। তার ওপর গ্ গাড়ির ভাবনাটা...

কিন্তু... কিন্তু পুলিশ যদি দুটোকে যোগ করে? যদি বলে...। মণিমালার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

বালিশের ওপর মুখ উপুড়, সত্যেন থরথর করে কাঁপছে। পুলিশ যোগ করবে কি না জানা নেই। কিন্তু মণি, মণিমালা যোগ করছে।

ফান, ওনলি ফান, বিশ্বাস করো মনি, লিজ গ্লো আমার কেউ না। আমিও তার কেউ না। খেলার সঙ্গী, বাস। আমি লোকলজ্জা থেকে বাঁচতে, আমার সংসার বাঁচাতে নিজের পায়ের ছাপ মুছে মুছে এসেছি। আসতে কি পারতাম, যদি তিনি আমাকে না বাঁচাতেন? কী হত, যদি আমি ওইরকম অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে না যেতাম। দুঃসংবাদ তোমাদের কাছে পৌঁছত, সঙ্গে নিহত একটি মেয়ের নাম জড়িয়ে থাকত, উভয়ের পরিচয় বার হত, তার পর সবাই সব বুঝত, তুমি বুঝে যেতে। 'তিনি' বাঁচালেন বলেই আমি বাঁচবার জন্যে আর যা-যা করার করলাম। নইলে কী? মৃত্যু, তার চেয়েও বেশি দুশ্চরিত্র দুর্নাম, তার চেয়েও বেশি নিকটতম মানুষটির কাছে বিশ্বাসঘাতক...কিন্তু আমাকে সেসব দেখতে শুনতে ভোগ করতে হত না।

ফোন।

'আমি মিসেস চ্যাটার্জি বলছি।'—মণিমালা ধরেছে।

উনি ক-দিন অসুস্থ, ছুটিতে আছেন, ঘুমোচ্ছেন।

সামান্য কতকগুলো রুটিন এনকোয়ারি ম্যাডাম, হ্যাঁ ওই মেয়েটি সম্পর্কে, বেশি বিরক্ত করব না আসছি।

সত্যেন ঘুমোয়নি। সে কখনও পুরোপুরি ঘুমোয় না। ঘোরে থাকে।

'শুনছ।' দ্বিধাগ্রস্ত কম্প্র স্বর মণিমালার—'লালবাজার থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসছে।'

আসুক।

তুমি একটু রেডি হয়ে নাও।

ঠিকই তো আছি।

চুলে একটু চিরুনি, কেমন বিধ্বস্ত লাগছে।

দু'.হাত মাথার মধ্যে চালিয়ে নিল সত্যেন—ঠিক আছে। ঠিকই...

ঘরটি অবাস্তব। যেমন স্বপ্নে দেখা যায়। অচেনা, আধোচেনা বস্তু সব। ওগুলোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ কেউ ভেতর থেকে বলে যাচ্ছে—আছে, আছে।

স্টেডি, আপনি টলে যাচ্ছেন...।

ওঁর প্রেশার ভীষণ নেমে গেছে তো! ঘুমোচ্ছিলেন।

স্যরি টু ডিসটার্ব য়ু। জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন। মিসেস চ্যাটার্জি আপনি যেতে পারেন।

সত্যেন হাত বাড়িয়ে মণিমালার হাত ধরল, বলল—উনি থাকবেন।

অ্যাজ য়ু প্লিজ...আচ্ছা মি. চ্যাটার্জি আপনি মেয়েটিকে কতদিন চিনতেন?

অনেক দিন। তা বছর পাঁচ-ছয় তো বটেই !

কী সূত্রে চেনা, বলবেন?

সতর্ক গলা। সত্যেন বলল, 'বিদেশ থেকে ক্লায়েন্ট এলে আমাদের কাছ থেকে লোকাল কোনো পি. এ. চান। এই মেয়েটি সে রকম ফ্রি-লান্স পি. এ. ছিল।'

কতবার এভাবে ও আপনাদের কাজ করেছে?

একটু ভাবতে দিন...হ্যাঁ, চার-পাচবার হবে !

আপনি শিওর যে ও শুধু পি. এ.-র কাজই করত !

হঠাৎ মণিমালা বলে উঠল, 'আপনি 'ও' করত বলছেন কেন? 'উনি' করতেন বলতে কী অসুবিধে ! একজন মহিলা তো !'

সামান্য, খুব সামান্য একটু ব্যঙ্গের হাসি ভদ্রলোকের মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।—'মি. চ্যাটার্জি, আপনি আমার কথার উত্তর দিন।'

দেখুন, আমার কাজ হল কোম্পানির তরফ থেকে অ্যাভেলেব্‌ল কোনো পি. এ. পাঠানো। তারপর আমি কী বলতে পারি !

পারেন, কিন্তু বলবেন না। এই ভ্রাম্যমান ক্লায়েন্টদের সবরকম চাহিদার দিকে আপনাদের লক্ষ রাখতে হয়, হয় না?

সত্যেন চুপ করে রইল।

এতবার আপনি মেয়েটিকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন, অথচ তাকে দু-দুটো জায়গায় দেখেও চিনতে পারলেন না?

দেখুন, ফার্স্ট থিং অ্যাপয়েন্ট করা আমাদের কাজ না। ওটা সাবর্ডিনেটরাই করে দিতে পারেন। তবে পার্টির সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে মেয়েটি যখন পি. এ. হিসেবে উপস্থিত থেকেছে, নিশ্চয়ই দেখেছি। তবে ওসব জায়গায় আমি গেছি জরুরি কাজে। নিশ্চয় খেয়াল করিনি!

মেয়েটি কলকাতায় ফিরতে আপনার ও আপনার ইন্ডিকার সাহায্য নেয়নি বলছেন ! মি. চ্যাটার্জি আপনার চুরি যাওয়া গাড়িটা নীল ইন্ডিকা, সেকেন্ড জানুয়ারি দুর্ঘটনার গাড়িটাও নীলই ছিল, সম্ভবত ইন্ডিকাও। শান্তিনিকেতনেও আপনাকে ওই গাড়িতে দেখা গেছে। আপনার গাড়ি চুরির গল্পটা স্যরি, বানানো। এখন যদি বলি 'মহিলাটি' আপনার সঙ্গেই 'ফিরছিলেন' পথে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে, আপনি সামহাউ বেঁচে যান। তারপর এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে ভেবে সমস্তটাই চেপে গেছেন।

বলুন !

যদি বলি মেয়েটি কাকতালীয়ভাবে আপনার সঙ্গে 'ফিরছিলেন' না, 'এঁর' সঙ্গে আপনি অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন, ফেরবার পথে দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা!

বলতেই পারেন !

আপনি এর প্রতিবাদ করবেন না? বিপক্ষে প্রমাণ দেখাতে চেষ্টা করবেন না?

লাভ?

যদি বলি, ওটা একটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত মার্ডার ! আপনি ক্রমশই মেয়েটির সঙ্গে

জড়িয়ে পড়ছিলেন, ছাড়া পেতে চাইছিলেন, পারিবারিক শান্তি মানসম্মান বিপন্ন হবার ভয় পাচ্ছিলেন, সুযোগ খুঁজছিলেন, গাঁ গাঁ করে লরিটাকে ছুটে আসতে দেখে আপনি ওপাশ ড্রাইভার নিজের দিকে দরজা খুলে লাফ মারেন। গাড়িটা আপনার অর্ধাঙ্গিনী, আপনার লজ্জা সমেত গুঁড়িয়ে যায়!

সত্যেন একটু চমকাল, তারপর স্থির চোখে চেয়ে বলল, 'বলতেই পারেন।'

আপনি প্রতিবাদ করবেন না? আপনার স্বপক্ষে প্রমাণ-টুমাণ...

লাভ?

দূর মশাই। আই বি র অফিসারটি হঠাৎ খোলা গলায় হেসে উঠলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে রসিকতা করছিলাম, স্যরি। ওই প্রথম থিয়োরিটাই ঠিক। মেয়েটি দৈবাৎ আপনার গাড়িতে আসে। জাস্ট আ লিফ্‌ট্! মিসেস চ্যাটার্জি প্লিজ একটু চা বা কফি...গলা শুকিয়ে গেছে।'

ভারী পায়ে মণিমালা চলে গেল, যেন নিজেকে টেনে টেনে।

এখন অফিসার পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। তার ভেতরে একটা মাত্র ফটো। কোয়ার্টার সাইজ। সত্যেন। পেছনে লেখা—'সত্যেন মাই লভ, মাই লাইফ।' চকিতে ফটোটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন অফিসার।

এ ফটো আপনি ওকে দিয়েছিলেন?

না, নেভার।

কোনো গ্রুপ ফটো থেকে আলাদা করে প্রিন্ট করে ছবিটা বানিয়েছে ও। স্টুডিয়োর নাম পড়েছে। অমর। এনকয়্যারি করে তাই জেনেছি। অ্যাকচুয়ালি এই ফটোটাই আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মি. চ্যাটার্জি। আপনি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, 'রুদ্রপলাশ' রিসর্ট। ও ছুটতে ছুটতে এসে বলল, মি চ্যাটার্জি না? আপনি কি কলকাতা ফিরছেন? আমাকে প্লি-জ একটা লিফট দিন। আমি ট্রেন মিস করেছি অর হোয়াটেভার...এই ডায়ালগটা স্পষ্ট মনে করতে পেরেছে 'রুদ্রপলাশ' এর এক কর্মী, ছবিটা ও-ই পায়, তাড়াতাড়িতে মেয়েটার ব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছিল। ডু য়ু সি? এই নষ্ট মেয়েটা সামহাউ আপনাকে ভালোবেসেছিল। ছায়ার মতো অনুসরণ করত, যদি কখনও সুযোগ আসে, যদি কখনও...। সেই সুযোগই ও পেয়ে গেল 'রুদ্রপলাশ'-এ। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। টোটালি নষ্ট, বাট ডেডলি সিরিয়াস ইন লভ। স্ট্রেঞ্জ!

এখন এখানে কেউ নেই, কিছু নেই, অনর্থক ভিড়, আলো অথবা অন্ধকার। মাথাটা ফাঁকা, অথচ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে এখন সত্যেন। স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ! কফির আর স্ন্যাকস-এর ট্রে নিয়ে মণিমালা ঢুকে আসছে।

'না অফিসার'—সে থেমে থেমে পরিষ্কার উচ্চারণ করল—'ব্যাপারটা এই নয়। ব্যাপারটা হল আমাদের একটা অ্যাফেয়ার চলছিল। আমার কাছে ওটা ফান জাস্ট একটা ফান। বাট...অ্যান্ড য়ু সে...শি ওয়াজ ডেডলি সিরিয়াস। সো...ইউ সি...আই কিল্‌ড্ হার। ওর মৃত্যুর দায় আমার।'

কাঁটাচুয়া

ডক্টর প্রণব নাথ একজন বছর তেত্রিশের এমবিবিএস ডাক্তার, নিজের বিচারেই তিনি সাধারণ। অল্পস্বল্প প্রাইভেট প্র্যাকটিস আর বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় তাঁর দিনকাল ভালোই কাটে। স্ত্রী এবং চার বছরের মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, এক সঙ্গে টিভি দেখা, সময়মতো খাওয়াদাওয়া, আরাম-বিশ্রামের সুযোগ পান। অধিকতর সফল বন্ধুবান্ধব কি দামি ডাক্তাররা যখন পিঠ-চাপড়ানোর ভঙ্গিতে বলেন, 'তুমিই ভালো আছ প্রণব, একেবারে প্ল্যানড্ আউট লাইফ অ্যান্ড লাইফস্টাইল, আমাদের দ্যাখো মাঝরাত অবধি দৌড়োচ্ছি, সামাজিকতার তো প্রশ্নই নেই, ফ্যামিলির সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করা কোনো অতীতের কথা, যে কোনো দিন বউ ডিভোর্স চাইতে পারে'— তখন প্রণবের মনের অবস্থাটা ঠিক কী দাঁড়ায় বলা মুশকিল। সবগুলোর ওপর ক্রোধ, না কি হীনম্মন্যতা, না কি 'বেশ আছি, তোদের রক্তবেচা কালো টাকা আমার দরকার নেই' গোছের একটা মনোভাব? কে জানে, তবে সেদিন রাত ন-টা নাগাদ প্রণব ডাক্তার নিজের চেম্বারে তিরিক্ষি মেজাজে বসেছিলেন। সন্ধে ছ-টা থেকে ঝাঁপ খোলেন। আজ একটিও মক্কেল নেই। গত দু-দিনও প্রায় এই অবস্থাই গেছে। যে ওষুধের দোকানটার লাগোয়া তাঁর চেম্বার, তারা এমনিতেই তাঁর ওপর একটু চটা, কেননা, তিনি সবসময়ে তাদের দোকানে পেশেন্ট পাঠান না, তারা যেসব ব্র্যান্ড রাখে সেগুলোও সবসময়ে রেকমেন্ড করেন না। রোজ বেরোনোর সময়ে তারা চোখ চাওয়াচাওয়ি করে, অন্তত প্রণবের তাই মনে হয়। শীতকাল ন-টায় চেম্বার বন্ধ করার কথা। দূর হোক গে, আর অপেক্ষা করবেন না, এক্ষুনি বন্ধ করে দেবেন। উঠে চেয়ারের পিঠ থেকে কোটটা নিয়ে হাত গলাচ্ছেন, শূন্য ওয়েটিং রুম থেকে কতকগুলো বিধ্বস্ত, কেমন আতঙ্কিত গলা ভেসে এল।

ডক্টর আছেন?

প্রণব ডাক্তার দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর পেশাদার গলায় বললেন, আসুন।

একটি রক্তাক্ত ছেলেকে ধরাধরি করে আনল আরও দুটি ছেলে, তাদেরও শার্ট-প্যান্টে ছোপ।

কী ব্যাপার? অ্যাকসিডেন্ট! হাসপাতালে চলে যান স্ট্রেট।

না, ঠিক অ্যাকসিডেন্ট বলা যায় না স্যার, আগে প্লিজ একটু দেখুন, একটা ফার্স্ট এড যদি...

ছেলেটির বাহারি টিশার্ট, তার তলায় বহু বিজ্ঞাপিত গেঞ্জি একেবারে রক্ত মাখামাখি হয়ে গেছে। আর্তনাদ করছে ছেলেটি। কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গের জামাকাপড় তো খুলতে হবেই। খুলে বড়ো আশ্চর্য জিনিস দেখলেন ডাক্তার। ছেলেটির সারা গায়ে সমান দূরত্বে কতকগুলো ফুটো ফুটো ক্ষত। কাঁটার মতো ছোটো নয়, গুলির মতো বড়ো নয়। রক্ত পড়ছে ঝুঁঝিয়ে। বেশ গভীর....চটপট ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে ড্রেসিং করে দিলেন তিনি। প্রেসক্রিপশনের ওপর কলমটা স্থির, একটু গেরেম্ভারি চালে বললেন, 'কিছু ফুটেছে। কী করে হল?'

অন্য দুই তরুণের চোখে হঠাৎ একই সঙ্গে ভয় আর সতর্কতার লালচে-কালচে আলো জ্বলতে দেখলেন তিনি। বললেন, কী করে হল ঠিক করে বলো!

এতক্ষণে তিনি হৃদয়ংগম করেছেন, ছেলেগুলি বাইশ-তেইশের মধ্যে। জামাকাপড়, হেয়ার স্টাইল, মোবাইলের মহার্ঘতা এবং মুখের চেহারা দেখে মনে হয় হয় এরা পয়সাঅলা, কিন্তু নিম্নরুচির পরিবারের ছেলে। যেমন এখন চারদিকে প্রচুর হচ্ছে। হিন্দি সিনেমায় নগ্নিকারা সুইট-হার্ট, নায়করা এদের রোল মডেল, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যের দিকে এরা লঙ্গরখানাগামী ভিখারিদের মতোই আদেখলা চোখে ছুটে যায়।

'কী করে হল'—তিনি আবারও কড়া গলায় বললেন, 'বাড়িতে কি কোনো বন্যজন্তু পোষা হয়?'

'সেটাই তো!' —একটি ছেলে বলে উঠল, 'বাইপাসের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম মানে এই আমরা তিনজন। মেন রাস্তা ছেড়ে একুট পাশের দিকে নেমে, মানে নেচারস্ কল। আমাদের এই বন্ধু...'

নাম কী?

নাম মানে ইয়ে মানে আদিত্য আগরওয়াল...

হ্যাঁ, তারপর বলো...

ও-ই নেমে যায় আগে। কিছুর ওপর ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিল্লাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

ইতিমধ্যে আদিত্য আগরওয়াল ছেলেটি নেতিয়ে পড়েছে। প্রণব হঠাৎই বুঝলেন সারা সন্ধে রুগি না আসার পরে একটি মক্কেল পেয়ে অতি উৎসাহে তিনি একটু অসাবধানই হয়ে গিয়েছিলেন। একে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। এক্ষুনি রক্ত দিতে হবে। নেতিয়ে গেছে রুগি। ছেলেগুলিকে বোঝালেন—কেস খুবই সিরিয়াস। ভয় খেয়ে গেল সব।

ডাক্তারবাবু আপনিই ব্যবস্থা করে দিন।

একটু ভেবে প্রণব ফোন লাগালেন ড. জহর দাশকে।

ড. জহর দাশ প্রণব নাথের মাস্টারমশাই। খুব ভালো ছাত্র না হলেও খাটিয়ে বলে ড. দাশ তাঁকে স্নেহ করেন এখনও। জানেন, প্রণবের মধ্যে কোনো ফাঁকি বা চালাকি নেই।

এই সময়টা ড. দাশ একটি নামকরা বেসরকারি হাসপাতালে ডিউটিতে থাকেন।

'কী বললে?' —ড. দাশের গলায় একটা বিস্ময়। তা ছাড়াও কিছু একটা আছে প্রণব ঠিক ধরতে পারলেন না।

হ্যাঁ, আমি সব রেডি রাখছি। পাঠিয়ে দাও।

তরুণগুলি সন্ত্রস্ত মুখ করে চলে গেল।

'আমি সব রেডি রাখছি, পাঠিয়ে দাও'—কথাটা প্রণবের ভেতরে কোথাও একটা ওয়ার্নিং বেল বাজাতে লাগল। কেন, তিনি বুঝতে পারলেন না।

ঘড়িতে দশটা বাজল। অ্যাসিস্ট্যান্ট রবিকে চেম্বার বন্ধ করতে বলে গাড়িতে উঠলেন ড. জহর দাশ। দ্রুত হাত ধুয়েছেন। অ্যাপ্রন টাঙিয়েছেন হুকে, তর সইছে না। কেননা আসছে কাল তাঁর পিতৃহীন ভাইপো অবনীশের বিয়ে। কালকে বিকেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিটে একবার চোখ বুলিয়ে রবিকে বললেন সব ক্যানসেল করে দিতে। বাড়ি খুব কাছেই, মহানির্বাণ থেকে একডালিয়া। এই রক্ষা। খোলা দরজা দিয়ে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন ডাক্তার। স্ত্রী গোপা এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, 'ও কী?'

কী

পেছনে দ্যাখো !

ডাক্তার পেছন ফিরে দেখলেন সিঁড়ি থেকে প্রতি ধাপে দরজা বরাবর তাঁর জুতোর ছাপ, রক্ত। একটু দাঁড়িয়ে রইলেন। মেয়েও বাবার গলা পেয়ে ছুটে এসেছিল। তিনজনেই দেখল জুতোয় রক্তের ছাপ।

ডক্টর একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এত ভয় পাবার কী আছে। একটা অ্যাকসিডেন্ট কেস এসেছিল। হসপিটালে পাঠালাম। চেম্বারে দরজার কাছে রক্ত ছিল বোধহয়। খেয়াল করিনি। রবিটাও জুতো জোড়া খুলে ফেললেন তিনি। মেয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। মোজা পরা পায়ে নিজের বাড়ির দোতলায় উঠতে উঠতে ড. দাশ একদম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ওপরে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে যান তিনি সোজা। মোবাইলটা বার করেন নাইন এইট থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন সেভেন জিরো থ্রি থ্রি। এনগেজড্। কুশারীর এখন ব্যস্ত থাকারই কথা। তিনি খুব অস্থির হাতে জামাকাপড়গুলো চেয়ারের পিঠে ছুঁড়ে দিলেন, পড়ে গেল লক্ষ করলেন না। ঠান্ডা-গরম মিলিয়ে শাওয়ার নিলেন একটা। তারপর কোনোক্রমে পায়জামাটা গলিয়েই আবার ফোন করলেন নাইন... টু থ্রি ওয়ান, বাজছে। সারে জঁহা সে আচ্ছা। কুশারী ধারেকাছে আছে তো। এক মিনিট প্রায় তারপরে ওধারের কণ্ঠ বলল, ডা. দাশ! বলুন .

ও কেসটা পাঠিয়েছিলুম..

অনুভব ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ

ডেড।

ডক্টর একটু থেমে বললেন, আশঙ্কা করেছিলুম। কিন্তু ব্যাপার কী?

ওরা বলল, ময়দানে এমনি আড্ডা মারতে গিয়েছিল, ঘুরছিল, হঠাৎ এই বন্ধুটি মানে অনুভব কিছুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জন্তুটা অন্ধকারে শনাক্ত করা যায়নি। কালো মতো গোল প্রাণী একটা। বেশ বড়ো। পালিয়ে গেল। কিন্তু অনুভবের অবস্থা ওই..

শজারু?

মনে হচ্ছে!

শিওর নও?

ড. দাশ আজকাল কতরকম নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র বেরোচ্ছে। জাস্ট হোম মেড। ব্লেড, ছুরি, ভোঁসো, চপার এসবে আর অ্যাডভেঞ্চার নেই। দুষ্কৃতীরা নতুন নতুন চিজ বার করছে।

তোমার তাই মনে হয়?

বললাম না, শিওর নই। ওদের মুখে মাদকের গন্ধ নিশ্চয়ই নোট করেছিলেন।

তোমার ধারণা ওরাই নিজেদের মধ্যে...

শিওর নই। আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছি। কে ঝামেলায় যাবে?

ড. দাশ কিছুক্ষণ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আর একটা নম্বর টিপলেন। এটাও বেশ খ্যাতনামা বেসরকারি হাসপাতাল।

হ্যালো জেমস, একটা কেস রেফার করেছিলুম।

ইয়েস ডক্টর—আদিত্য আগরওয়াল, এই কিছুক্ষণ আগে মারা গেল, ন্যাস্টি উন্ডস্।

কী মনে হয়?

ওরা তো বলছে রাস্তার ধারে ঝোপে এনসি অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিল। একটা কিছুর ওপর

হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তোমার কী মনে হয়?

আ আম থিংকিং..

কী করবে, পুলিশে ইনফর্ম করবে?

স্ট্রেঞ্জ ড. দাশ, আগরওয়ালের বাড়ির লোকেরা চাইছে পুলিশে ইনফর্ম করা হোক, যা-কিছু আপত্তি দেহ কাঁটাছেঁড়া হবে মর্গে যাবে বলে। কিন্তু সঙ্গী ছেলেগুলো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। বলছে

কী বলছে?

পুলিশ মিছিমিছি ওদের জড়াবে। ওরা তো মা করাব করেছে বন্ধুর জন্য। দিজ আর মানিড পিপ্‌ল। ড. য়ু নো হোয়াট আই মিন!

ইয়েস।

মোবাইলটা প্রায় হাত থেকে খসেই পড়ে গেল ড. দাশের। কুমারী আর জেমস দু-জনেই হসপিটালের কঠিন ময়না তদন্ত করে বডি ছেড়ে দেবে। পার্টি যথেষ্ট টাকা খরচ করেছে। কিন্তু কেস দুটো কাঁটার মতো ফুটে রয়েছে তার ডাক্তারি বিবেকে। একই রকম কেস একই সন্দেহ দুটো। নতুন কিছু। ডাক্তার হিসেবে তার কিছু কর্তব্য ছিল। এবং এবং তার চেয়েও বড়ো কথা প্রশ্ন। প্রশ্ন জাগছে। জন্তুটা কি ময়দান থেকে উড়ে বাইপাস গেল? না কেউ হাতে গাড়ি-টাড়িতে বহন করে নিয়ে গেল?

ভাইপোর বিয়ের বরকর্তাগিরিটা ঠিক মন দিয়ে করতে পারলেন না ড. দাশ। বিকেল থেকে দু-তিনবার ফোন করেছিল বকে। আগরওয়াল ফ্যামিলি কি মেনে গেছে! পোস্টমর্টেমের রেপোর্ট কী? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি এই মারাত্মক মারের তাড়নায় যে কোনো অস্বাভাবিক কেসের পেছনে এঁটুলির মতো লেগে থাকে। প্রণবকে তিনি ভালোই চেনেন। তার প্রশ্নের সদুত্তর কোনো না কোনো সময়ে তাঁকে দিতেই হবে। আপাতত ভাইপোর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি বাড়ির বিয়ে .. কোন কেস? তার মনে নেই। ও সেইটা? কাঁটা ফুটিয়ে এসেছিল? না তিনি এখনও খোঁজ করেননি.. এসব বলে কাটিয়ে দেওয়া গেছে।

কিন্তু প্রণব নাথ তার প্রশ্নের উত্তর ড. দাশ নয় অন্য জায়গা থেকে পেয়ে গেলেন। সাধারণত ডাক্তারদের টিভি দেখবার সময় হয় না, খবরের কাগজ পড়া তো দূরের কথা। কিন্তু প্রণব টিভি দেখবার সময় পান। কতকগুলো অনুষ্ঠান তার বিশেষ প্রিয়। তার মধ্যে একটি হল — 'অলৌকিক কি এখনও আছে?' --এখানেই কোনো মিরাকল বাবার ভণ্ডামি ফাঁস করেছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়া। বাবার চেহারা, তাঁর চরণামৃতের মধ্যে আংটি লুকিয়ে ফেলার কায়দা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই তারা ক্যামেরার আওতায় আনে। 'জাদুকর পি সি সরকারের হাত-সাফাই আর বাবা কামেশ্বরের পা সাফাই' বলে খুব পাবলিসিটি পেয়েছিল খবরটা এই অনুষ্ঠানেই প্রণব তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন একে অবশ্য জবাব ঠিক বলা যাবে না। বিজ্ঞানের নিয়ম হচ্ছে দৃষ্টান্ত জোগাড় করা যত নজির ততই যুক্তির আওতায়। কোনো ল' এর আওতায় আসার সম্ভাবনা ততোধিক বেশি। সেই তথ্য পেয়ে গেলেন প্রণব 'অপ্রাকৃত' অনুষ্ঠানে।

গ্রামের নাম গহরাশোল। পঞ্চাশোর্ধ কামরান আলি ভিন গাঁয়ে কুটুমবাড়ি গিয়েছিলেন। মাঝখানে বিশাল ধানখেত পড়ে। সেই ধানখেতের মধ্যেই কামরানের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। বুক থেকে নাভি, নাভি বেয়ে নিম্নাঙ্গের দিকেও চলে গেছে ছোটো ছোটো ফুটো। রক্ত জমাট বুকের তলায় ফুটোগুলিও সাক্ষাৎ এক একটি রক্তমুখ। বোঝা যায় স্রেফ রক্তপাতেই মৃত্যু হয়েছে কামরানের।

'প্রাকৃত' এখানেই শেষ হয় না। জামাইডোবা গ্রামে কার্তিক পাল নামে এক ব্যক্তিকে মেলার মাঠের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়। সে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে 'কাঁটাচুয়া, কাঁটাচুয়া...' বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, জ্ঞান আর ফেরে না।

মাঠে, খেতে, বাইপাসে ময়দানে একই রকম। কিন্তু যেবার কানাই মাঝির বাড়ির মধ্যে গগন পাড়ুইয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া গেল, সেবার সমস্ত দেশে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। পাড়ুইয়ের ক্ষেত্রে মোটামুটি সাক্ষী ছিল কানাই মাঝির বউ রাধা। রাধার জবানবন্দি—সন্ধের পরটায় তখনও কানাই ঘরে ফেরেনি। গগন তার খোঁজে আসে, রাধা তাকে চা দেয়, লেড়ো বিস্কুট দেয়। তারপর সে কুয়োতলার দিকে হাত ধুতে গিয়েছিল। বিকট আর্তনাদ শুনে রাধা ছুটে যায়। দেখে এই কাণ্ড! সে তখনই চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করেছিল। জবার পাতা থেঁতো করে গগনের সর্বাঙ্গে লাগায় পাড়াপড়শিরা। কিন্তু গগনকে বাঁচানো যায়নি, সে রাধার দিকে চেয়ে 'কাঁটাচুয়া, কাঁটাচুয়া...' বলতে বলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কাঁটাচুয়ার খোঁজে পড়শিরা কানাই মাঝির বাড়ি, তার আশপাশ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে লন্ডভন্ড করে ফেলেছিল কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ কি না কোনো অজ্ঞাত কারণে স্রেফ শূন্য থেকে এক ধরনের ভয়াবহ শজারু জন্ম নিচ্ছে বা আবির্ভূত হচ্ছে। এবং কোনো একজন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে একেবারে খতম করে দিচ্ছে। 'অপ্রাকৃত'র অ্যাংকর বঙ্কিম হেসে তির্যক ভঙ্গিতে বললেন দর্শকদের, 'আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখিয়ে চলেছি, অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই। আপাতদৃষ্টিতে যা অতিপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছে তা আসলে কোনো শঠের চতুরালি। সাধারণ মানুষ খুব সহজে এতে বশ হয়ে যান—ডাকিনী, মন্ত্র-তন্ত্র, ওঝা, মরা মানুষ বেঁচে ওঠা, ভূতের ঢিল—সবেতেই আম-জনতার অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বাস করতে পারলে যেন মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। কিছুদিন আগে একটি গ্রাম পুরো খালি হয়ে গিয়েছিল স্রেফ ভূতের ভয়ে। অথচ পরে দেখা গেল রণপা পরে কঙ্কালের মুখোশ পরে কিছু লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভয় দেখাচ্ছিল। এই তথাকথিত শজারু ভূতের রহস্যও সমাধান হয়ে যাবে, যদি মানুষ একটু সহযোগিতা করেন।'

বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা শুরু হল, ট্রামে-বাসে, রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে, সরকারি অফিসে...। কেউ বললে—যোগসূত্র আছে কি না দেখো। রাজনীতি। কী রাজনীতি করত ওইসব মৃত মানুষেরা? গ্রামের মানুষগুলি কিছু-না-কিছু রাজনীতির খাতায় নাম তোলাতে বাধ্য। কিন্তু দেখা গেল মোটেই সব এক পার্টির নয়। শাসক দল, বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করছে বা বিরোধী দল শাসক দলের সমর্থকদের বেছে বেছে মারছে এমন কোনো তত্ত্ব খাড়া করা গেল না। না, অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে রাগারাগি না, কোনো সামান্য সূত্রই পাওয়া গেল না। শহরাঞ্চলে তো ব্যাপার আরও গোলমেলে। তরুণ যুবক, আজকের প্রজন্ম, জিন্‌স আর ছাপ্পা টি শার্ট পরা, পুলিশম্যান খাঁকি উর্দি পরা, আধবুড়ো মাস্টারমশাই ধুতি-শার্ট পরা, লুঙি পরা দোকানদার। রাজনৈতিক সমর্থন, বয়স, কাজ পেশা কোনো সূত্রই খাটছে না।

ডক্টর জহুর দাশ একদিন বাড়িতে আলোচনার সময়ে কথাটা বলেই ফেললেন। তিনিই প্রথম ডাক্তার যিনি নাকি শজারু-ফুটো মানুষ রুগি পেয়েছিলেন। স্ত্রী-কন্যার কাছে এ কথাটা বলায় এখন বেশ একটা আত্মপ্রসাদ আছে। কোনো না কোনো একটা বিষয়ে প্রথম হতে কে না চায়?

জহুরের কথা শুনে স্ত্রী গোপা তো আতঙ্কিত।

কী সর্বনাশ! শজারু যদি এবার তোমাকে ধরে। ডাক্তার যতই বোঝান শজারুবিদ্ধ মানুষগুলির ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজনকেও শজারু তাক করেছে এমন কোনো খবর নেই, ততই গোপা বলে

যান, 'তোমাদের সব কিছুই লাইটলি নেওয়া অভ্যেস। কাল তাক করেনি বলে আজ বা আসছে কাল তাক করবে না তার কোনো গ্যারান্টি আছে? ডাক্তারদের ওপর তো আজকাল সব মানুষের রাগ, কেউ একটা শজারু লেলিয়ে দিলেই হল।'

গোপার এখন কাজ হল শোবার আগে বিছানা, খাটের তলা, গাড়িতে ওঠবার আগে সিট খুঁজেপেতে দেখা। পইপই করে স্বামীকে বলে দেন, 'কোনো রোগীকে অবহেলা করবে না, রোগীর আত্মীয়স্বজনকে রাগাবে না। যথেষ্ট আলোকিত রাস্তা ছাড়া নামবে না' ইত্যাদি ইত্যাদি। ড. দাশ যখন বললেন, এসব মেনে চলা অসম্ভব তখন গোপা এমনকি সাশ্রুনয়নে নিজের ও মেয়ের মাথার দিব্যিও দিয়ে ফেললেন।

'মাথার দিব্যি? সে আবার কী?' ড. দাশ ও তাঁর মেয়ে নন্দনা হেসে খুন।

'তোরা কোনো জিনিসই সিরিয়াসলি নিবি না।' কাঁদো-কাঁদো মুখে গোপা উঠে গেলেন।

নন্দনা নিজের ঘরে বসে আপন মনে পিনকুশনটা ঘোরাচ্ছিল। সে ভাবছে। খুব ভাবছে। পেশায় নন্দনা সাংবাদিক। তবে ফ্রি-লান্স। কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখনও সে গাঁটছড়া বাঁধেনি। নিজের ইচ্ছেমতো বিষয়ে, কারও আদেশে নয়। কারও দেওয়া কাজ নয়। একদম নিজের পছন্দের বিষয়ে নিজের কায়দায় স্টোরি করে সে। তার টাকার দরকার নেই। বাবা পাঁচ হাজার করে মাসোহারা তার নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন। জন্মদিন, পুজো, দোল, রথ যে কোনো উপলক্ষ্যে তাঁর মেয়েকে জিনিসপত্র ছাড়াও টাকা উপহার দেওয়া চাই। তবু নন্দনা কুঁড়ে, বাবা-নির্ভর ডাঁটিয়াল হয়ে যায়নি। টাকার অভাব না থাকাটা একটা ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এটা সে তাদের কাজের মেয়ে জলি, তার বাবার চেম্বারের রিসেপশনিস্ট অণিমা এবং আরও অনেককে দেখে দেখে বুঝতে শিখেছে। জলি বেচারি গ্রামের হলেও ভদ্র কৃষক ঘরের মেয়ে, মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু গঙ্গার ভাঙনে তাদের গ্রাম তলিয়ে গেছে। তলিয়ে গেছে জমিজমা, বাড়িঘর, ইস্কুল, বাবা সব। পড়াশোনা বিসর্জন দিয়ে জলি আর তার মা শহরে এসে বাড়ির কাজের লোকের দলে নাম লিখিয়েছে। জলি দেখতেও ঢলঢলে। ভারি শান্ত, সুশ্রী, কথাবার্তায় কোনো গ্রাম্য টান নেই। অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। হিসেবপত্তরে ওর কখনও ভুল হয় না। খুব সংকোচের সঙ্গে ও নন্দনার কাছ থেকে কবিতার বই, গল্পের বই পড়তে চায়। নন্দনার মা প্রায়ই বলেন জলির অনেক ভাগ্য যে সে তাঁদের মতো ভদ্র বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। নন্দনার মনে হয়, এর উলটোটাও তো সত্যি, জলির মতো লোক পেয়ে তারাও কি বর্তে যায়নি! জিনিসপত্রের মর্যাদা বোঝে। বই কখনও এদিক-ওদিক করে না। নন্দনার যা-কিছু ফরমাশ হাসিমুখে খাটে। লেখবার সময়ে নন্দনার বারেবারে ফ্রেশ চা চাই। কে এনে দেয় বুঝেসুঝে জলি ছাড়া? একটি ভদ্র ভূসম্পত্তিওলা পরিবারের মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া চমৎকার মেয়ে কলেজে না গিয়ে নন্দনাদের সুখসুবিধে দেখছে! তাদের জুতো পালিশ, তাদের ঘর গুছোনো, জামাকাপড় কেচে ইস্ত্রি করে যার যার ঘরে রেখে আসা! ভালো-মন্দ খাবার তৈরিতেও সে এক্সপার্ট। নন্দনার বন্ধুরা এলে জলিকে বলতে হয় না। প্রথমেই এক দফা কফি দেবে। তারপর বিশেষ ফরমাশটা কী জেনে নেবে। আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট বড়ো জোর।

অণিমা মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে। লেখাপড়ায় খুব ভালো না হলেও পাস কোর্সে বিএ পাস করেছে। ওর বাবা কিছুতেই বরপণ জোগাড় করে উঠতে পারেননি। তাই অণিমা ডক্টর দাশের চেম্বারে কাটা চুল ফুলিয়ে, ঠোঁটে লিপস্টিক, রিসেপশনিস্টের কাজ করে। নন্দনাকে দেখলেই আগে আগে উঠে দাঁড়াত, নন্দনা অনেক বলে বলে সেটা বন্ধ করেছে।

বাবার টাকায় ফুটানি করার মনোবৃত্তি নন্দনার নেই। তাই বলে সে যেমন করে হোক নিজের

উপার্জনের জন্যও হন্যে হয়ে ওঠেনি। বাবার সে একমাত্র মেয়ে, টাকার জন্য কোনোদিন তাকে কারও কাছে খেলো হতে হবে না। এটা, ওই যে বললাম, তার কাছে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ বলে মনে হয়। তাই সে টাকার জন্যে নয়, নিজের খুশিতে সংবাদ খোঁজে। লেখে, অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠানই তার লেখা প্রায়ই বার করে। নন্দনা লেসবিয়ানদের নিয়ে লিখেছে। ভারতের ক্রিকেট-জ্বর নিয়ে লিখেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা লিখেছে। নন্দনা দাশ অনেকের কাছেই বেশ পরিচিত নাম।

পিনকুশনটা বাঁইবাঁই করে ঘুরছিল। হঠাৎ নন্দনার মনে হল ওই পিনকুশনটাই তার এবারের বিষয়। তার অবচেতন থেকে বিষয়টা উঠে আসছে। পিনকুশনটা প্রতীক। শজারু-বিদ্ধ মানবদেহের।

বেশ কিছুকাল আগে স্টোনম্যান নামে এক আতঙ্ক আবির্ভূত হয়েছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। তখন সে বেশ ছোটো। সে সমস্যাটার সমাধান হয়নি। যে বা যারা রাতের আঁধারে ফুটপাতের ঘুমন্ত গরিব মানুষের বা পথচারীদের মাথা পাথরের আঘাতে থেঁতলে দিত, তারা হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল পুলিশকে বোকা বানিয়ে। শজারু আতঙ্ক এখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই, কোথাও বাদ নেই। যেদিন একটা ইংরেজি কাগজের পাতায় শজারুর আবির্ভাবের কথা জানা গেল, সেদিন থেকে তো পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে আর কোনো আলোচনা নেই। দিল্লিতে শজারুর আক্রমণে মারা গেছে তেইশ জন। শুধু দিল্লি শহরেই। বিহারে সাতাশি জন। লখনউ শহরে তেরোটি, কলকাতায় সরকারিভাবে আটাশ, লোকে বলছে এর উলটোটাও হতে পারে, অর্থাৎ বিরাশিটি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-গঞ্জের কোনও স্ট্যাটিস্টিকস নেই।

যেমন হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়েছে তেমনই হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যাবে শজারু-আতঙ্ক। নিশ্চয় কেউ বা কারা কোনো উপায়ে এই আতঙ্ক তৈরি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কী? শুধু আতঙ্ক ছড়ানো? এক ধরনের টেররিজম? যেন এ জিনিসের কিছু কম আছে এখন পৃথিবীতে! নন্দনা ঠিক করল সে নয়নপুর গ্রামের কানাই মাঝির বউ রাধা মাঝিকে ইন্টারভিউ করবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। নয়নপুর হুগলি জেলার একটি মোটের ওপর সমৃদ্ধ গ্রাম। ট্রেন থেকে নেমে বাসে যেতে হয় মাইল দশেক। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন কানাই মাঝির ঘরে পৌঁছোল নন্দনা তখন বেলা পড়ে এসেছে। বউটি দাওয়ায় বসে কুলোয় করে চাল ঝাড়ছিল। নন্দনাকে দেখে অবাক হয়ে তাকাল। অজ গাঁয়ে একজন শার্ট-প্যান্ট পরা বব চুল সোমত্থ যুবতি, কাঁধে ক্যামেরা, হাতে ঝোলা ব্যাগ...

কে আপনি?

আমি খবরের কাগজের লোক। আপনাকে ইন্টারভিউ করতে, মানে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

আজ্ঞে খবরের কাগজ তো ইন্টারভু নিয়ে গেছে।

আমি অন্য কাগজের লোক। আপনাকে একটুও বিরক্ত করব না।

সন্ত্রস্ত গলায় বউটি বলল, আমার সোয়ামি আসার আগে যা কবার করুন। সে এসব পছন্দ করে না।

আচ্ছা। গগন পাড়ুই আপনার স্বামীর কেমন বন্ধু ছিল?

খুব বন্ধু। মাঝি কখনও স্যাঙাতকে মারবে না, তা বলে দিলুম।

না, না, তা বলছি না আপনার সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক ছিল!

মেয়েটি এবার ঝেঁঝে উঠল, 'মেয়েছেলে হয়ে কথার ছিরি দ্যাখো। সোয়ামির স্যাঙাত তো আমার কে? আমার কী? এলে বাটি করে চা দেব, দুটো মুড়ি দেব বাস, ফুরিয়ে গেল।'

সেদিন গগনাকে মুড়ি-চা দিয়েছিলেন?

বিস্কুট দিয়েছিলুম সাধের স্যাঙাতকে।

আহা রাগ করছেন কেন? কুয়োতলার দিকে উনি গেলেন কেন?

সে কি আমাকে বলে গিয়েছিল? ব্যাটাছেলে কোথায় যাচ্ছে না-যাচ্ছে, জিগ্যেস করতে গেলুম আর কি! তারপরে তখন আমার কী গা বিড়োচ্ছে, বাপরে!

গা বিড়োচ্ছে?

হ্যাঁ গো দিদি, হঠাৎ কেমন যেন সব গুলিয়ে উঠল। ভীষণ বমি পাচ্ছে, চক্ষে আঁধার দেখছি, শরীরটা কেমন করছে। তখন সে কুয়োয় গেছে, কী মাঠে নেমে গেছে খেয়াল করবার অবোস্থা আমার?

তা কী করে ঠিক হল?

কিছুক্ষণ পর আপনাআপনি ঠিক হয়ে গেল। আমি তো ভেবেছি পেটে এবার কিছু একটা এল বোধ হয়।

তা এসেছে?

বউটি বিমর্ষ মুখে বলল, নাহ্। সে ভাগ্যি করে কি এসেছি!

কখন চিৎকার শুনতে পেলেন স্যাঙাতের?

শুনতে পাচ্ছিলুম, মোটে নড়তে পারিনি। তারপর শরীরটা একটু ঠিক হতে যাই, লোকজন ডাকি।

গগন লোকটা কেমন ছিল?

বউটি মুখ বিকৃত করে নিজের কাজে মন দিল।

কেমন আবার?

ক্যামেরা টেপ রেকর্ডার সব গুটিয়ে নন্দনা স্টেশনের দিকে রওনা হল। সে একটু ভাবিত হয়ে পড়েছে। একটি মাত্র ইন্টারভিউ নেওয়া গেল, তা-ও সন্তোষজনক নয়। অন্য কোনো কেসের প্রত্যক্ষদর্শী বলে কেউ নেই। সাক্ষী-সাবুদ না হলে সে কী রিপোর্ট করবে, তদন্তই বা কী, আর স্টোরিই বা কী!

ইতিমধ্যে 'শজারুর নতুন শিকার', 'আবার শজারু', 'ভুতুড়ে শজারু' নাম দিয়ে নানা কাগজে নানান সংবাদ বেরিয়েই চলেছে, বেরিয়েই চলেছে।

সেদিন সন্ধেবেলা। শীতের সন্ধে যেন কুটকুটে ভেটকম্বলের মতো নেমে পড়েছে শহরগুলিতে, হাওয়া নেই, তাই যত কিছু দূষণ আটকে রয়েছে ভূগোলকের ওপর। মা বললেন, 'কণা আজ আর পড়তে যাসনি।'

কণা চুল আঁচড়াচ্ছিল। তার মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে এসে গেছে। অঙ্ক-সায়েন্স বাঘ। সপ্তাহে তিন দিন পড়তে যায়। একদিন বাদ গেলে স্যার আর একটা দিন বার করতে পারবেন না। কিন্তু মা-র বোধহয় শরীরটা আজও ভালো নেই, সে বলল, মা তুমি চুপচাপ শুয়ে থাক, আমি বেশিক্ষণ পড়ব না। জাস্ট একটা চ্যাপ্টার বুঝে নিয়ে চলে আসব।

'ঠিক আসিস কিন্তু।' বলে মা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

কণার মনটা হালকা। স্যার ভালো পড়ান। ফিজিক্স, বায়োলজিতে আগের ভয়টা তার আর নেই। কেমিস্ট্রিতে বড্ড মুখস্থ করতে হয়, এটাই মুশকিল। আগে জিয়োমেট্রিক রাইডারগুলো সে বেশিরভাগই পারত না। শশাঙ্ক স্যারের কাছে কোচিং নেবার ছ মাসের মধ্যে এ ব্যাপারেও তার

অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে তার পড়াশোনাটা একটা দুর্ভেদ্যে দুর্গ বলে মনে হত। শশাঙ্ক স্যারের দৌলতে এখন তার বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সায়েন্স গ্রুপে লেটার মার্কস পাওয়াটাই এখন রুণার লক্ষ্য। বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাসে তার কোনো সমস্যা নেই। ইতিহাসে মেমারির সমস্যা ছিল। সেটাও স্যার কীভাবে কী পদ্ধতি অনুসরণ করে মনে রাখতে হয় শিখিয়ে দিয়েছেন। এগারোশো, বারোশো, তেরশো, চোদ্দশো সব সনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো সে লম্বা সারি করে পর পর লিখে রাখে। বাস। জয়েন্ট দেবার ইচ্ছে রুণার নেই। সে পিয়োর সায়েন্স পড়বে, গবেষক হবে। সেদিনই বাবা কাগজে পড়ে বলছিলেন, 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা সাংঘাতিক কমে গেছে আমাদের দেশে। বিজ্ঞানের মহা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।' সে বিজ্ঞানী হবে। নানান বিষয়ে কৌতূহল জাগছে তার। বেণি দুলিয়ে, ঝোলা ব্যাগ কাঁধে স্কার্ট পরা রুণা বেশ আত্মমগ্ন হয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে তার মায়ের জ্বরের কথা মনে নেই। এ সেই মধ্য-কৈশোর যখন মা-বাবা স্মৃতির পেছন কোঠায় স্থান নিতে থাকে। সামনের কোঠাগুলো দখল করতে থাকে বন্ধুবান্ধব। প্রতিদিনকার উত্তেজক বর্তমান, ভবিষ্যতের হাতছানি, নানারকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নিজে নিজে, যাকে বলে স্বয়ং। রুণার চারদিকের পৃথিবী রঙিন, বাস্তবে তা যতই দূষিত, কৃষ্ণবর্ণ ধূলিধূসর হোক না কেন।

শশাঙ্ক স্যার একটা বাড়ির একতলায় ঘর নিয়েছেন। এখানেই কোচিং করেন। ওপরে থাকেন এক বয়স্ক দম্পতি। তাঁদের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। দরজাটা খোলাই থাকে। আজ দেড় ঘণ্টা তাকে একা সময় দিয়েছেন স্যার মাধ্যমিক এসে গেছে বলে। পরের দেড় ঘণ্টা অম্বু অর্থাৎ অম্বুজের। ও এইচএস দেবে। সারাবছর ক্লাস সিস্টেমে পড়া, কিন্তু পরীক্ষার মুখোমুখি সময়ে এইটুকু তাদের জন্যে করেন স্যার, এর জন্য বেশি চার্জ নেন অবশ্য। কিন্তু কী করা যাবে!

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রুণা। কেমন একটা বুনো গন্ধ। জান্তব। রুণা কোনোক্রমে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল। স্যার, স্যার একটা গোঙানির মতো আর্তনাদ তার গলায়, সে চিৎকার করে জ্ঞান হারাল। স্যার কৌচের ওপর ধসে পড়েছেন, শরীর দিয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত ঝরছে।

পরে ডাক্তার এসে দেখে বললেন, 'হিউম্যান পিনকুশন হয়ে গেছেন ইনি। পিনগুলো মিসিং। একটি মাত্র সন্দেহজনক তথ্যের আভাস পাওয়া গেল এক্ষেত্রে।'

অম্বু। অম্বুজের দেড় ঘণ্টা পরে আসার কথা ছিল। কিন্তু সে দেড় ঘণ্টা আগেই এসেছে। রুণার আর্তনাদ শুনে সেই প্রথম ছুটে আসে। কেন?

পুলিশ প্রশ্ন করছে—কেন? —অম্বুর কাছে কোনো সদুত্তর নেই। তাকে তন্নতন্ন করে ঘেঁটে ফেলা হয়েছে—একটা ক্যালকুলাস কষা খাতা, আর একটা এইচএস-এর ফিজিক্সের বই ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে যা আশ্চর্য তা হল শশাঙ্ক পুরকায়স্থর চোখের দৃষ্টি, আতঙ্ক যেন ছিটকে আসছে।

এই রুণার কেসটা পড়বার পর নন্দনার নতুন করে আশা জাগল, স্টোরিটা সে করতে পারবে।

একডালিয়া থেকে বারাসত অনেক দূর। তবে বাইপাস দিয়ে হু-হু করে যাওয়াই যায়। ইদানীং বাবা-মার বাইপাসে আতঙ্ক। কলকাতায় সবচেয়ে বেশি শজারু-মৃত্যু বাইপাস ও সংলগ্ন অঞ্চলেই হয়েছে। মা বিশেষ করে ভীষণ রাগারাগি করেন, ভয়ও পান খুব। নন্দনা মনে মনে হাসে। সে ঠিক ফাঁক খুঁজে নেবে। প্রতি শুক্রবার মা তাঁর সমাজসেবা কেন্দ্রর কাজে যান। কী সমাজসেবা হয় তার বিশদ বিবরণ নন্দনাকে মাঝেমধ্যেই শুনতে হয়। মা আবার সেক্রেটারি। মাসের একটা অধিবেশনে মাকে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। আজ সেই শুক্রবার। নন্দনা ফাইল, টেপ, ক্যামেরা গুছিয়ে নিয়েছে। প্রায় পা টিপেটিপেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, ইশ এ শুক্রবার বাবা

সকাল সকাল ফিরবেন। মা থাকবেন না, সে থাকবে না। সে জলিকে ডেকে বলে গেল। বাবাকে যেন ঠিকমতো খাবার-টাবার দেওয়া হয়। সাধারণত এ কাজটা মা বাবা সে-ই করে, বাবা অন্যদের হাতে খাবার-টাবার একেবারে পছন্দ করেন না। ধারেকাছে লোকজন থাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, সে যত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই হোক না কেন।

একটা দিন, বাবা প্লিজ চালিয়ে নাও।

'বিশ্বাস করুন আমার মেয়ে কিচ্ছু জানো না।' —রুণার মা বললেন, 'আমাদের একটা দিনও স্বস্তিতে কাটছে না। কোনো না কোনো কাগজ, টিভি চ্যানেল থেকে লোক আসছেই। আচ্ছা তুমিই বলো, তোমাকে তুমি বলছি—একটা এই বয়সের মেয়ে এই রকম একটা ক্রাইমের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে, কাগজে টিভি-তে তার ছবি প্রচার করলে তার ভবিষ্যৎটা কী হবে! তার ওপর পরীক্ষা মুখের গোড়ায়।'

নন্দনা বলল, 'মাসিমা, আপনাকে মাসিমাই বলছি, এটা তো মানবেন। যে এটা ভয়ানক এক সন্ত্রাস, যার কোনো সূত্র, কোনো প্রমাণ আমরা পাচ্ছি না। সমাধান করতে না পারলে আপনার বাড়ি আমার বাড়িতেই আক্রমণ হবে না, কে বলতে পারে! চিহ্নিত করা দরকার এই শয়তানকে। আমরা কেউ সেফ নই, মাসিমা।'

'আমরা আর কবে সেফ ছিলাম! বলো, উঠতি বয়সের মেয়েকে নিয়ে যে আমাদের কী ভয়ে ভয়ে দিন কাটে! ঠিক আছে তুমি যদি ছবি তুলবে না, আসল নাম ব্যবহার করবে না কথা দাও—তো ডাকছি।'

রুণা মেয়েটি খুব স্মার্ট। কিন্তু শজারুর উল্লেখে তার মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখলে যে কোনো মানুষ ভয় পাবে। ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল রুণার মুখ। নন্দনা যখন বলল, 'ভালো করে মনে করো কখন ঠিক কীভাবে ওঁকে দেখলে। কেউ ধারেকাছে ছিল কি না। তুমি সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলে কি না।'

রুণার ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যেতে থাকল। যেন দৃশ্যটা এখনও তার চোখের সামনে ঘটছে।

অনেকটা সময় দেওয়া সত্ত্বেও রুণার থেকে বিশেষ কিছুই কথা বার করা গেল না। সে যে ঘরে একটা বিশ্রী বুনো গন্ধ পেয়েছিল, তার অবিশ্রান্ত মাথা ঘুরছিল। গা বমি করছিল, চোখের সামনে যেন একটা ধূসর কুয়াশার পর্দা ঝুলছিল, সেভাবে সে কিছুই দেখতে পায়নি। ঘোরটা কেটে যেতে দেখে তবে ভয়ানক দৃশ্যটা তার চোখে পড়েছে—এইটুকুই। কোনো জন্তু-জানোয়ার কিছু না।

নন্দনার মনে হল মেয়েটি কিছু যেন একটা চেপে যাচ্ছে। সে বলল, মাসিমা। যদি কিছু মনে না করেন আমাকে একটু চা খাওয়াবেন?

নিশ্চয়ই—ভদ্রমহিলার নন্দনাকে ভালো লেগেছে।

রুণা চটপট বল তো—নন্দনা বেশ হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, অম্বুজকে ধারে-কাছে পাওয়া গেল কেন? তুমি নিশ্চয়ই জানো ও পুলিশের নজরে আছে!

এবার রুণার লাল হয়ে গেল, তারপর ওর চোখ থেকে টপ্‌টপ্ করে জল পড়তে লাগল। সে ফিসফিস করে বলল, 'আপনাকে বলছি দিদি, প্লিজ আর কাউকে বলবেন না। আমি পনেরো মিনিট আগে বেরোতাম আর অম্বু পনেরো মিনিট আগে পৌঁছে যেত। ওই আধঘণ্টা আমরা একটু গল্প করতাম হাঁটতে হাঁটতে।'

অম্বুজ তোমার বন্ধু?

আবার লাল হয়ে কণা বলল, হ্যাঁ, মানে ওই, কাউকে বলবেন না।

না না, এ আবার কাউকে বলে না কি? তা ছাড়া এ তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তুমি অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? আচ্ছা কণা অম্বুজ ছেলেটি তো সেদিন আরও অনেক আগে চলে এসেছিল...

ম্ মানে ও ওইরকম করছিল। ওর সইছিল না। সারাক্ষণ পায়চারি করবে।

তার পরে তোমার আর ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না দিদি। আমি তো বেরোই-ই না। মা ফোন পর্যন্ত গার্ড দিয়ে রেখেছে।

আচ্ছা। অম্বুজের ঠিকানাটা আমায় দাও।

রুবি হসপিটালের কাছে নন্দনা পৌঁছে গেল। তখন তার ঘড়িতে আটটা বাজছে।

তার মোবাইলটা ঝনঝন করে বাজছে। এখন ধরার উপায় নেই।

বাইক চালাতে চালাতে মোবাইল সে ধরে না। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার বাসনা তার নেই। থেমে গেছে। কিন্তু আবার বাজছে। বিজন সেতু থেকে নেমে একডালিয়ার মোড়ে বাইকটা এক পাশ করে সে মোবাইলটা তুলল, মিসড কল। এ তো বাড়ির নম্বর! আবার একটা মিসড কল—সেটাও বাড়ির নম্বর। তার মানে মা এসে গেছে। সে তো পৌঁছেই গেল। আর এখন কলের জবাব দেবার দরকার নেই। একডালিয়া ঢোকার মুখে সে দেখল একটা পুলিশের কালো গাড়ি। একটা অ্যাম্বুল্যান্স সাইরেন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল। ভিড় কাটাতে কাটাতে সে শুধু আশপাশ থেকে কটা টুকরো কথা শুনতে পেল, 'একেবারে খোদ ডাক্তারের বাড়ি, ভাবতে পারেন! —দোতলায় উঠল কী বেয়ে? ভয়াবহ।.. তা-ও ভরসন্ধেবেলা, মাঝরাত্তির তো নয়। কেউ দেখতে পেল না।'

কী ব্যাপার? চোর ডাকাত না কি? ডাক্তার? এখানে আরও ডাক্তার থাকেন। ডক্টর শ্রীমানী, ডক্টর প্রীতি চ্যাটার্জি। তবে একটু এগিয়ে সে বুঝতে পারল ঘটনা যা-ই ঘটে থাকুক, সেটা তাদের বাড়িতেই। লোকে লোকারণ্য। তাকে পথ ছেড়ে দিল সবাই। দু-চার লাফে সিঁড়ি টপকে টপকে সে ওপরে উঠে গেল। কেউ নেই, লোকজনের মধ্যে বাহাদুর নীচে ভ্যাবলার মতো ধপাস করে বসে আছে। আর ওপরে জ্যাঠতুতো দাদা অবনীশ যার সেদিন বিয়ে হল আর কেউ নেই। রাত সাড়ে আটটায় যেন বাড়িতে মাঝরাত নেমে এসেছে।

এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও অবুদাকে দেখে নন্দনার মন বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল। সে অবনীশকে পছন্দ করে না। ছোটো থেকেই তারা আদায় কাঁচকলায়। ঝগড়াঝাঁটি নেই। কিন্তু সে অন্তত এই কাজিনটিকে এড়িয়ে যায়। কারণ অনেক।

সে যাই হোক আজ অবনীশকে বিধ্বস্ত লাগছিল। বলল, 'তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? বাড়িতে এত বড়ো একটা বিপদ হয়ে গেল!'

'কী হয়েছে?' নন্দনার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে ভয়ে। 'মা কোথায়? আর সব? বাবা? জলি?'

অবনীশ একটু ইতস্তত করল। সময় নিল, তারপর বলল, 'মনটা শক্ত কর বাচ্চু। শত্রুরু...আমাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে। কাকাবাবু... জলি খাবার দিতে গিয়ে দেখে... সে-ও অজ্ঞান। কাকিমা ছিলেন না। পরে এসে দেখেন এই কাণ্ড। এই সময়টা কোনো হেল্প ছিল না। জানি না কী হবে!'

নন্দনার ভেতর থেকে একটা ফোঁপানি উঠে আসছে। সে সেটাকে প্রাণপণে চাপা দেবার চেষ্টা করছে। ভেতরে ভেতরে ওইভাবে কাঁদতে কাঁদতে সে বাবার ঘরের দিকে ছুটল। হা-হা করছে

দরজা। ভেতরে টাটকা রক্তের স্বাদ। তাড়াতাড়ি করে মুছে নেওয়া হয়েছে মেঝে। ন্যাড়া গদি কামানো মাথার মতো তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

'কোন হসপিটাল?' --সে কোনোমতে জিজ্ঞেস করল। তার এক চমকে মনে পড়ে যাচ্ছে মায়ের সাবধানবাণী। মা মাথার দিব্যি দিয়েছিলেন। তারা হেসেছিল। আড়ালে বসে আরও কেউ বোধহয় হেসেছিল।

অবনীশ এবার এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, 'বাচ্চু প্লিজ, তুই এরকম ভেঙে পড়িসনি। তোর এই অবস্থা হলে কাকিমার কী হবে বল তো!'

ব্যস, নন্দনার আর আবেগের বাঁধ থাকল না। ঝড়ের সমুদ্রের মতো সে ভেঙে পড়ল বাবার বিছানার গদির ওপর। সে জানে কোনো আশা নেই। একজনও বাঁচেনি। প্রথম দুটো কেসই তো বাবার নিজের। যথেষ্ট মেডিক্যাল হেল্প পেয়েছিল। বাঁচেনি। আর বাবার ক্ষেত্রে কুড়ি মিনিট কি আধঘণ্টা কত দেরি হয়েছিল ভগবানই জানেন।

অবনীশ এবার গভীর মমতায় তার কাঁধে হাত রাখল, 'বাচ্চু তুই একটা শক্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুই এরকম করবি! তোর সেলফ কনট্রোল কোথায় গেল? একটু সামলে নে প্লিজ। তোকে নিয়ে যাব বলেই তো আমি অপেক্ষা করছি। কাকিমা বারবার করে বলে গেছেন তোকে যেন একলা না ছাড়ি।'

নন্দনা কোনো কথাই বলতে পারছে না। গদিটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। মুখ দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে, বাবা! বাবা!

অবনীশের চোখ ছলছল করছে। সে হঠাৎ নীচু হয়ে ভেঙে পড়া নন্দনাকে জোর করে তুলে ধরল। গাঢ় গলায় বলল, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে বাচ্চু? এই টপটা তুই খুলে ফ্যাল।'

নন্দনার টপের জিপার চড়াৎ করে খুলে গেল।

'তুই এই জিনসটাও খোল'---তার গলা ধরে এসেছে। চোখ ধকধক করছে---অস্থির হাত এখন চলে যাচ্ছে প্যান্টের জিপারে। নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছে অবনীশ : 'তুই অসহ্য সুন্দর বাচ্চু, শোকে তোকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তুই আমায় পাগল করে দিস, ওহ্'--চকিতের মধ্যে তার বুকের ভাঁজে ঢুকে গেল অবনীশের ঠোঁট।

আর তার পরেই সে দেখল তার ঠোঁট জোড়া যেন পেরেকে গেঁথে গেছে।

ক্রমশ শোকসন্ধ্যার অন্ধকার আরও দম বন্ধ করা, ক্রমশ এক বুনো জান্তব গন্ধে ভরে যায় ঘর। প্রবল বমি পেতে থাকে নন্দনার। তার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাচ্ছে। সামনে দুলছে কুয়াশার পর্দা। ভেদ করে কিছু দেখা যায় না। প্রত্যেকটি লোমকূপ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে চকচকে মসৃণ তীক্ষ্ণ দৃঢ় শলাকা। শিউরে শিউরে উঠছে গা। হাড়গোড় মানছে না, গুটিয়ে বর্তুলাকার হয়ে যাচ্ছে শরীর। অসহ্য মোচড়াচ্ছে।

দু-চার মিনিটের ব্যাপার। শলাকা ত্বরিতে গুটিয়ে যায় ত্বকের মধ্যে। এত চিকন যে তাতে কোনো ক্লেদ লেগে থাকে না। বর্তুলাকার বদলে সটান হয়ে যায় শরীর। মাথায় ঝিম ধরে আছে, যেন সে নেশাগ্রস্ত। মেঝের ওপর এক হাত এলিয়ে পড়ে থাকে এক অর্ধনগ্ন অর্ধচেতন তরুণী। অদূরে ছিটকে পড়ে থাকে এক যুবকদেহ। বিমুখ রক্তরা সহস্র ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসছে। চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে ভয়।

ক্রমে জ্ঞান ফেরে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ডক্টর দাশের উচ্চশিক্ষিত কন্যা। পেশায় সাংবাদিক। এই দৃশ্য সে এই প্রথম দেখল। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে তার। কাঁপা হাতে উর্ধ্বাঙ্গের

জামা পরে নেয় সে, জিন্‌স কোমরে তোলে, আঠা-আঠা হাতে ফোনের ডায়াল ঘোরায়। প্রথমে অ্যাম্বুল্যান্স, তারপর পুলিশ, তারপরে মা।—ম্ মা-আআ র বাচ্চু বলছি, শ্ শ জারুটা যায়নি মা, অবনীশদাকে...।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে নন্দনা, অকারণেই হাত বোলায় মসৃণ বাহুতে। কী যেন! কী যেন! তার মনে পড়ে না। সে কিছু জানে না। গিরগিটি যখন রং বদলায়—লাল, হলুদ, সবুজ—সে কি বুঝতে পারে? জানে? প্রকৃতি জানে। গিরগিটি জানে না।

আবেশ

বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ির অলকার উপর তারা-মার ভর হয়েছে শুনেছ গো? —ও শান্তি!

শান্তি সারাদিনের কাজকর্ম সেরে একটু দুপুর-ঘুমের জোগাড় করছিল। তার স্বামী পোস্টঅফিসে কাজ করে, ছেলে সেক্রেটারিয়েটে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে। নিশ্চিন্দির চাকরি। খেয়েদেয়ে স্বামী দুটি পান, ছেলে চারটি সুপারি-কুচি মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ছোটো ছেলে তারও পরে। তারপর শান্তির কাজ শুরু। একটা না কি? আড়াইটে নাগাদ সে একটু নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পায়। পাশের বাড়ির গীতাদি বারান্দা থেকে বুক অব্দি ঝুঁকিয়ে ডেকে যাচ্ছে তো ডেকেই যাচ্ছে।

কে অলকা?—ধড়মড় করে সে উঠে বসে। বারান্দা নেই, জানলায় দাঁড়ায় শান্তি।

অলি গো, অলি, আমাদের ঠাকুরবাড়ির অলি।

তাই বলো, অলকা বললে বুঝব কী করে? ওর বিয়ের জন্যে পাত্তর দেখা চলছে না?

সে তো কবে থেকেই চলছে। রূপের ধুচুনি মেয়ে। তার উপরে বিএ এমএ পাস দিয়ে বসে আছে। বিয়ে কি সোজা?

তা গীতাদি, রূপের ধুচুনি পাত্তরও তো চারিদিকে কিছু কম দেখছি না। তোমার আমার ছেলের কথা বাদ দাও। নিজের ছেলে কেউ কুচ্ছিত দেখে না। কিন্তু আমাদের বরেরাই বা কী নবকার্তিক ছিল গো? তা-ও তো তোমার মতো চোখোলো মুখোলো মেয়ে জুটেছে। আমার যে অন্তত রংটা আছে এটুকু তো স্বীকার করবে? কেউই মুক্খু নই।

তা যদি বললি—ব্যাটাছেলের রূপ আর কে দেখতে যাচ্ছে।

তাহলে গুণ দেখুক। কোনোমতে রোজগার। দুটি মাছ-ভাত। কোনোমতে বছরের কাপড়চোপড়, ছেলে চাকরিতে ঢুকে গেল এতদিনেও একখানা গয়নার মুখ দেখলুম না তা যদি বলো? ছেলের বউ এলে ওই ঘরের সোনা-ই হাতে ধরে তুলে দিতে হবে ভেবে আমার এখন থেকেই বুক কাঁপছে ভাই। গতর ক্ষয়ে গেল। বাসন মাজা, ঘর পোঁছার একটা লোক আছে এই পর্যন্ত। রান্না করো, কাপড় কাচো, ইস্ত্রি করো, সাধের রকম রকম জলখাবার করে দাও, বোতাম বসাও, শার্টের কলার উলটে দাও। নিজের ব্লাউজ-সায়া, এদের পাজামা-লুঙ্গি নিজে হাতে সেলাই করো। এসো জন বসো জন—যেটুকু বজায় আছে দিদি আমার জন্যেই আছে। নিজে না খেয়েও কিছু না কিছু জমাই। ছোটো ছেলেটার আবার যেমন দামালপনা, তেমন বায়না, কে হ্যাপা পোয়ায় গো? এই আমিই তো!

গীতাদির ছেলে এখনও হায়ার পড়াশোনা করছে। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী স্কুলমাস্টার। উদরান্ত কোচিং আর কোচিং। গীতাদির সিচুয়েশনও কিছু উত্তম নয়। ছেলে যে কত হাজার রকমের ট্রেনিং নিচ্ছে। ইয়া ইয়া টাকার তোড়া বেরিয়ে যাচ্ছে। সাধের গয়না মেয়ের বিয়েতে তো সবই প্রায় গেছে। এখন ছেলের ট্রেনিং-এর জন্যে স্বামী মুখে রক্ত তুলে খাটছেন, বাকিটুকুতে হাত দেওয়া কারো মনোমতো নয়। এই যা। ছেলেটার একটা কিছু হয়ে গেলে বাঁচা যায়। আরও একটি গুপ্ত ভয় তার আছে ছেলেকে নিয়ে। সেটা শান্তি জানে না। গীতাদি বললেন, যাবি নাকি?

কী করতে?

তারা-মার ভর সোজা কথা নয় শান্তি। গিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?

রোজ হচ্ছে?

আমাদের যমুনা বলছিল, শনি-মঙ্গলবারে হয়। প্রথম প্রথম নাকি রোজ হত। এখন শনি মঙ্গলে এসে ঠেকেছে আজ তো শুক্কুর হল। কাল যাওয়া যায়। যদিও আমার তর সইছে না।

তাহলে কাল বিকেলে গা-ধুয়ে. এদের একটু বলে কয়ে রাখতে হবে। কতক্ষণে ছাড়া পাব তো জানি না! রুনিটাকে নিয়েই ভাবনা। সন্ধেবেলা অবিশ্যি কোচিনে যাবে। তবু. ।

ও সব ম্যানেজ করো, কাল যাবই। -গীতাদির ইচ্ছে ছেলে নিয়ে দুশ্চিন্তার গুপ্ত কথাটি তারা-মাকে পেশ করে।

পালপুকুর নাম হতে পারে। কিন্তু ঠিক গাঁ-গঞ্জ নয়। বিটি রোড ধরে যেতে যেতে যেতে যেতে যখন ভাবছ এ আর আসবে না, ঠিক তখনই এসে যাবে স্টপ। সামনে দিয়ে রেললাইন গেছে। সেই লেভেল ক্রসিং পার হলেই দেখবে দু দিকে উপচে পড়ছে বাজার। আলু, পটোল, কুমড়ো, লাউ, পেঁপে, চিচিঙ্গে, ট্যাড়স সারি দিয়ে তো আছেই। ঘ্যাস ঘ্যাস বড়ো বড়ো অন্ধ্রের পোনা কাটছে মেছোরা. ঘ্যাস ঘ্যাস মুরগির গলা কাটছে মুরগিঅলা, সরু একচিলতে দোকানে রোগা ছাল ছাড়ানো পাঁঠাও ঝুলছে। খাও কোনটা খাবে। জিলিপি ভাজছে গরম গরম, কচুরি ভাজার কটু গন্ধ উঠছে বাতাসে। বাক্সে ডালডা আর কেরোসিনের ঝাঁঝ। তার পাশে মস্ত মুদির দোকান। ডাল, মশলা থেকে বড়ি. পাঁপড়, আমসত্ত্ব. খেজুর, খোবানি কিছুই বাদ নেই। আর একটিমাত্রই ল্যান্ডমার্ক। একটি ফোটো স্টুডিয়ো। কাচের মধ্যে বাহার দেওয়া উত্তম সুচিত্রার ছবি. প্রসেনজিৎ ঋতুপর্ণার ছবি. কে নেই? সব্বাই এখানে ওই পালপাড়ার 'ম্যাজিকল্যান্ড' স্টুডিয়োয় এসে ফোটো তুলিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও ফ্রক ছড়িয়ে কুঁজো হয়ে বসে ফোকলা দাঁতে বাচ্চা মেয়েটি হাসছে। থামে হাত দিয়ে স্টাইল মেরে শাড়ি পরা লোকাল সুন্দরীর ছবি, বিয়ের জন্য তুলতে আসা ছবির সার। 'ম্যাজিকল্যান্ড' এর তলায় ব্র্যাকেটে লেখাও আছে—'এক ছবিতেই বিয়ে'। বাস, আর কোনো ল্যান্ডমার্ক নেই। ডাইনে, বাঁয়ে সরু সরু গলি—তার ভিতরে ঢুকে আবার ডাইনে, বাঁয়ে সরু সরু গলি। এর ভেতর থেকেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় গুণে গেঁথে যে গলি চাইছ খুঁজে বার করতে পারলে তো পারলে। গুনতে ভুল হলে নিশি পাওয়ার মতো ঘোরো মাঝদুপুরে, কেউ দেখতে আসবে না খাঁ খাঁ গা-জ্বালানি রোদে।

জমির দাম সস্তা ছিল। খুব একটা বসতও গড়ে ওঠেনি। তাই এদিকে আসা। সস্তা হবে। শুনতেই বারো নম্বর রেলগেট পেরিয়ে। এক বাসে তুমি রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট পৌঁছোতে পার। পালপুকুর উত্তর চব্বিশ পরগনা. সড়কপথে, রেলপথে ঋদ্ধ। কোনো অসুবিধা নেই। কাছে-পিঠে কলকারখানা নেই, গাড়ি-ট্রাকের ধোঁয়া নেই। বাজারের এলোমেলো নোংরামিটুকু ছাড়িয়ে ডাইনে, বাঁয়ে ঘুরে যেতে পারলে নতুন বাড়ির গন্ধ, পুরোনো বাড়ির ভরসা. খোলোমেলা মাঠে এবং নিষ্কলুষ আকাশ দেখতেই পারো। তবে কিনা—পপুলেশনে জেরবার এই দেশের আপামর সাধারণের নজর বড়ো নীচু, বা বলা ভালো সরু হয়ে গেছে। জমি যখন রয়েছে, বসত যখন নতুন হচ্ছে তখন রাস্তা কেন পাশাপাশি দুটো ছোটো গাড়ি পাস করার মতোও হবে না—এ প্রশ্নের জবাব নেই। কারা জমি বিক্রি করে, কারা বিল্ড করে কর্পোরেশন কতটা জমি রাস্তার জন্যে হিসেবে রেখেছে সে অঙ্ক কষার দরকার নেই আমাদের। আমরা দেখব আমার রিকশায় উলটোদিকের রিকশার চাকা বেধে গিয়ে বিভ্রাট হল। দেখে গালাগালি দেব। গাড়িতে গেলে ওপাশ থেকে গাড়ি আসছে দেখে ও ড্রাইভারের হাত নাড়ুনিতে আমি পেছোব না আমার ড্রাইভারের খিঁচুনিতে ও পেছোবে, সেটা পরিস্থিতিই বলতে পারবে। বাড়িগুলি একটু

উঁচু করে তৈরি করা ঠিকই। তিন চার ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠতে হয়, কিন্তু সিলিং সেই নীচু। হাইরাইজের ফ্ল্যাট বাড়িতে যেমনটা হয়। ওই যে নীচু নজর! দোতলার বারান্দা লম্বা মানুষ হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারবে।

পালপুকুরের পালপাড়ার এই চেরা চেরা অলিগলির গোলকধাঁধা পেরোতে পেরোতে শেষকালে গা ঠেকে যাবে যে কুঠিতে সেটিই অলকার বাপ-ঠাকুরদার ভিটে 'তারাকুঠি।' শ্রী দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তস্য পুত্র তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকারে এখন। এর পরেই পালপুকুর এবং তার সামনে বিরাট মাঠ। পুকুরটি বাঁড়ুজ্যেদের, এখনও প্রোমোটারের নজর পড়েনি। সামনের মাঠ কার কে জানে। তবে বার্ষিক শারদ দুর্গাপুজো, শ্রীশ্রীকালীপুজো, বাণীবন্দনা, রবীন্দ্রজয়ন্তী...আদি উৎসব এখানেই হয়। পালপুকুর বন্ধুসংঘ, পালপুকুর পিপলস ক্লাব দুটিই মাঠের উপর শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে, এলাকার কেউ কেউ জানে, সবাই জানে না। ছেলেপিলেরা এখানে একটু খেলাধুলো করতে পায়, এতেই সব খুশি আছে। বর্ষাকালে ঘাসে-আগাছায় ভরে যায়, খেলাধুলো হতে হতে টাক-পড়া মাথায় মাঝে মাঝে খামচা খামচা চুলের মতো ঘাসপাতা গজিয়ে থাকে।

এই তারাকুঠির বাড়িটির দিকেই মঙ্গলবার ভোর থেকে দলে দলে লোক চলেছে। বহুদূর ছড়িয়ে গেছে তারা-মার খ্যাতি। মাঠটি ভরো-ভরো। এইরকম শনিবারও। অন্য কোনো দিনে কিন্তু সব শুনসান। ছিমছাম মেয়েটি বাঁড়ুজ্যে বাড়ির চাতাল পেরিয়ে সিঁড়ির ধাপে এসে পা দেয়। পায়ের বাসি আলতার ছাপ সে সাবান ঘষে ঘষেও তুলতে পারেনি। কালো মেয়ে, ছিপছিপে, একটু বেশি লম্বাই বোধহয়। একসময়ে পাত্রপক্ষ বলত—'তাল-ঢ্যাঙা।' যা ভালোবাসার লোকের কাছে শ্যামা ছিপছিপে বা তন্বী শ্যামা তাই পাত্রপক্ষের কাছে তাল-ঢ্যাঙা রক্ষাকালী প্রতিভাত হয়। রূপের খানিকটা তো নজরের উপর নির্ভর করেই। মেয়ের মুখটি রোগা, লম্বা, হনু জাগা ছিল—পাত্রপক্ষের ভাষায় ঘোড়ামুখো। তবে এখন শাঁসে-জলে খানিকটা ভরে ভরাট লম্বাটে আদল এসেছে। কপাল বড়ো, ঘন ভুরু, চোখ লম্বা, সরু, মণি বাদামি, নাক টিকোলো, হাঁ মুখটি বড়ো। ছড়ানো ঠোঁট। সবচেয়ে খারাপ ছিল বোধহয় দাঁত. সামনের দাঁতগুলি বড়ো বড়ো, এবড়োখেবড়ো। আজকালের সম্পন্ন সচেতন বাড়ির বাবা-মা ছোটোতেই এমন দাঁত ঠিকঠাক করিয়ে দেন। টলস্টয় বলেছিলেন, 'হাসলে যাকে ভালো দেখায় না সে মেয়ে দুর্লভ, তবে যদি নিতান্তই মেলে, সে-ই প্রকৃত কুৎসিত।' এ মেয়েটি সেদিক থেকে প্রকৃতই কুৎসিত। তবে সে হাসতই না। ছোটো থেকে নিজের চওড়া কপাল, বড়ো হাঁ আর অসমান দাঁতের অসুন্দর হাসি সে লক্ষ করেছিল, তাই মুখ খুলে হাসতই না। এখন হাসে। খারাপ তো দেখায় না। সবচেয়ে যা ভালো তা হল চুল। অনেক চুল মেয়েটির। এখন শ্যাম্পু করে কীসব মেখে ফুলো চুল বাগে এনেছে। হলুদ শাড়ি পরা কেশবতী মেয়েটিকে পিছন থেকে দেখলে রূপবতীই মালুম হয়। পিছনের লোক সামনে এসে নির্লজ্জের মতো মুখ দেখে তারপর নির্লজ্জতরের মতো মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে যাই হোক, যারা অলকাকে আগে দেখেছে তারা আকাশ-পাতাল তফাত দেখে। এই মেয়েটির চিকন কালোয় হলুদ, কমলা শাড়ির আভা লেগেছে। চোখদুটির চাউনি গভীর রহস্যে স্থির। মুখে চাপা হাসি। মুখমণ্ডলে প্রসন্ন বিভা। অনেকেরই চেয়ে চেয়ে আঁখি না ফিরে। কেন-না তারা দেবী না হোক দেবীর আধার দেখে। আর যারা নিতান্তই কামিনী রমণী দেখতে চায়, না জেনে না শুনে, তাদের পিছন থেকে দেখার প্রত্যাশাটা সম্মুখ দর্শনে পূর্ণ যদি না হয় তো কার কী করার আছে? অলকার? বয়েই গেল। এখন।

তখন? তখন বয়ে যেত না। বড়ো লজ্জা, বড়ো অপমান। গোঁড়া বাড়ি। ঠাকুরদা দেবপ্রসাদ ছিলেন তারা-মার ভক্ত। শেষদিকে প্রায় বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পূজিত, নিজে হাতে গড়া তারা মূর্তি ঠাকুর ঘরে, সেখানে সকাল সন্ধে পুজো—ঠাকুমার দায়। তারপরে মায়ের। পুজো মানে

পুজোর জোগাড়। আসল পুজোটুকু বাবা ব্যাটাছেলে তারাপ্রসাদই করতেন। কখনও কখনও তিনি অসুস্থ হলে পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বা শ্যামই করত। মায়ের অসুবিধা থাকলে অলকা করত পুজোর জোগাড়। অলকা বিএসসি পাস করল তারপর বাবা পড়া বন্ধ করে দিলেন, মুখে বললেন, গ্র্যাজুয়েট হয়েছে আর কী! ঠাকুরবাড়ির মেয়ে পুজো-অর্চনা করুক, রান্নাবান্না, বিয়ের জন্যে তৈরি হোক। আসল কথা অবশ্য অলকা জানে। তার মাও জানেন। শ্যামা অলকার মতো লেখাপড়ায় ভালো নয়। তার পড়ার খরচ আছে। মিনি মাগনা হয় না। সৎ ব্রাহ্মণ হলে কী হবে, তারাপ্রসাদ সামান্য চাকরি করেন। বসতবাটিটি ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই মেয়ের পড়া বন্ধ। বিএড পাশ করে টিচার হওয়ার ঘোর বাসনা হয়েছিল অলকার। এমন কিছু খরচ না। না হয় টিউশনি করে সে নিজেই জোগাড় করবে। কিন্তু বাঁড়ুজ্যেবাড়ির মেয়ে চাকরি করবে এতেও তারাপ্রসাদের ঘোর আপত্তি। হতে পারেন তাঁরা বংশানুক্রমে শক্তিপূজারী। কিন্তু বংশের মেয়ের হাতে তাঁরা কোনো প্রহরণ দেখতে চান না। সে কলম পেনসিল হলেও। বিশ্বাসও করেন না। রমণী চৌকাঠের পার কী ঘরের বার। বিশ্বাস নাই। ভালো কথা, মা তাকে রান্নাঘরে বেশি যেতে দ্যান না। উনুন-তাতে কালো মেয়ের কী মূর্তি হবে কে জানে! তবে রান্নাঘর ছাড়াও উনকোটি কাজ আছে সংসারে। অলকা সবই করে, করেও ভাববার সময় পায়। একতলা বাড়ির ছাদের ওপর ফুলবাগান করার সময় পায়। বাড়ির পিছনে সামান্য জমি, সেখানেও ফুল ফুল আর ফুল। সবই অলকার এক হাতের করা। লাল পঞ্চমুখী, গোলাপি সপ্তমুখী। জবার গাছ বাগানে আছে অন্তত গোটা দশেক।ময়ের পুজোর ফুল। এ ছাড়া পেয়ারা গাছ এবং কদম, শিউলি, কাঠ-চাঁপা, করবী। একটি নিম গাছ, বাতাবি লেবু, গন্ধলেবুর গাছ এবং অদ্ভুত কথা এক সৃষ্টিছাড়া বটল পাম বাগানে।

ছাতে সাদা ফুলের জোছনায়, সুগন্ধে মাত হয়ে থাকে বাঁড়ুজ্যেবাড়ির ওপর বাতাস। কামিনী, বেল, জুঁই, কুন্দ, রজনিগন্ধা, টগর, শ্বেতকাঞ্চন, হাসনুহানা। সিমেন্টের উঁচু বেঞ্চি করা আছে, তার ওপর পরপর গাছ। বড়ো টব, ছোটো টব, দেয়ালের গায়ে ছোটো একটি খুপরি কুলুঙ্গিতে খুরপি, সারের কৌটো, কাঁচি সব মজুত থাকে। এই ছাতটিই অলকার জুড়োবার জায়গা ছিল। শীতকালে বড়ি দেওয়ার নাম করে, আচারের ভরসা নিয়ে সবাইকে সে ছাতে চলে আসত। যতক্ষণ রোদ ততক্ষণ সে টুপটুপ বড়ি দিচ্ছে, বড়ি দিয়ে আচারের শিশির ঢাকনা খুলে রোদে দিচ্ছে। মাঝারি সব কড়ির বয়ামে আমতেল, ছড়া তেঁতুল, এঁচোড়-ফুলকপি-মটরশুঁটি তেলে দিয়ে রকম রকম আচার, আম কোরা, তেঁতুলের কাই। রকমারি। রোদ একটু সরে গেলে দেখবে কোন্ গাছে ঝুড়ি এসেছে, চড়ুই-শালিখ কুঁড়ির বোঁটা কেটে দিয়ে যাবে, সেগুলো সে বড়ো বড়ো কাঠির ঝুঁড়ি চাপা দেবে। আচার ছাতের ঘরে তুলবে। তারপর নীচে নেমে শুরু হবে রাজ্যের কাজ। রোদের ঝাঁঝ মরে এলে আবার চলো। হাতে বই, বেতের চেয়ার ছাত-ঘর থেকে টেনে নামিয়ে, চুল মেলে দিয়ে সাঁঝ না নামা পর্যন্ত পড়া। কী পড়ে অলকা? যা পায়। সঞ্চয়িতা, গীতাঞ্জলি, লাইব্রেরি থেকে আনা গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণের বই, অদ্ভুত যত অভিজ্ঞতার গল্প, আর পড়ে পাঁজি, গীতা এবং ঠাকুরদা দেবপ্রসাদের ডায়েরি। শেষোক্ত বস্তুটি সে বইয়ের আলমারি ঝাড়তে-গোছাতে গিয়ে আবিষ্কার করে। করে এত অবাক হয়ে যায় যে প্রথমেই গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ঝিমঝিমে দুপুর, বাবা অফিসে, মা ঘুমে, ভাই বাইরে—কেউ শুনতে পায়নি সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে সামলে নেয়। ঠাকুরদার ডায়েরি হেন রত্ন পাওয়া গেলে বাবা তো অবশ্যই তার রত্ন দাবি করবেন, সে ডায়েরি তার ছোঁয়া তো বারণ হয়ে যাবে। তাই সে ঝেড়েঝুড়ে বাইরের সারির পিছনদিকে জিনিসটি যেমনকে তেমন রেখেই দেয়। মাঝেমধ্যে অন্য বইয়ের ভেতর করে নিয়ে এসে পড়ে।

ডাক পড়ত। মাঝে মাঝেই। তার পাঠ-নিমগ্ন, কুসুমবেষ্টিত নির্জনতা থেকে নেমে যেতে হত।

আলমারি থেকে টিসুর শাড়ি, কেন-না ফুলে থাকবে, ভরন্ত দেখাবে। মেক-আপ স্টিক তো স্রেফ এইজন্যেই কেনা। সাজগোজ শেষ করে কপালে একটি বড়ো টিপ দেবেন মা। তাতে কপাল একটু যদি ছোটো দেখায় চুলগুলো হাতখোঁপা করে হাজিরা দিতে হবে তাকে বাইরের ঘরে। সুটেবল গার্ল-এর খোঁজে যেখানে দলকে দল বসে কচুরি-আলুর দম-রসগোল্লার গুষ্টির তুষ্টি করছে।

কী নাম মা?

অলকা ব্যানার্জি।

কুমারী তো? আসল কথাটি যে বন্দ্যোপাধ্যায়—বোধহয় জানা নেই।

অলকার মনে হয়, বলে, কুমারী জেনেছেন বলেই তো দেখতে এসেছেন। বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ করতে আসেননি নিশ্চয়!—অবশ্যই এত কথা সে বলে না। হাসি ঠেকিয়ে নম্র, নতভাবে জবাব দেয়—

কুমারী অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ গো মেয়ে, খুব নাকি পাস করেছ শুনতে পাই।

মায়ের চোখের শাসনে, প্রাইভেটে এম এ পাস করার কথাটা সে আর বলে না, বলে—এমন আর কী! বিএসসি। —কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল। ফার্স্ট ক্লাস কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে, এত কথা সে কেনই বা বলতে যাবে।

চুলটা একটু আলগা করো তো মা!

কাঁটা তিনটি আলতো করে খুলে নিতেই পিঠে ফণা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশি রাশি কেশ। অলকার চোখে হাসি খেলে যায়।

তা ওদিক থেকে রি-অ্যাকশন আসে। বৃদ্ধাটি বলছেন,—'চুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব? —অথচ দেখতে তো ইনিই চেয়েছিলেন।'

পরে খবর দেব বলে চলে গিয়ে যখন আর খবর দ্যান না এরা, বাবা-মার গায়ে কাঁটা ফুটতে পারে কিন্তু অলকার বড়ো স্বস্তি বোধ হয়। এরা তো বউমার হাতের রান্না চেয়ে-চিন্তে চেটেপুটে খেয়েও বলবে, 'রান্না নিয়ে কি ধুয়ে খাব?'

তবে অলকা বেশি কথার মানুষ নয়। নিজের ভিতরের সোয়াস্তি সে বাইরে প্রকাশ করতে যায় না।

এভাবে দ্বিতীয় দল, তৃতীয় দল আসে। অলকাকে নিজে হাতে খাবার প্রস্তুত করতেও হয়। কিন্তু খবর আর আসে না। দেখতে দেখতে সাতাশ পার হয়ে গেল। হঠাৎ ঠাকুরঘরের চৌকাঠে বাবা খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। কী ব্যাপার? ঠাকুরঘরে ঢুকতে পাবে না অরক্ষণীয়া কন্যা। পুজোর জিনিসপত্রে হাত দেবে না।

মা বললেন, পাগল হলে না কি? আগেকার ওসব অরক্ষণীয়া-টিয়া আছে নাকি এখনও?

না।

'রাগটা করছ কার উপর?' মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কালোকুষ্টির ঝাড় তো তোমরা। দেয়ালের দিকে চেয়ে ছবিগুলো দ্যাখো না। আমার যদি কিছু ছিরিছাঁদ থেকেও থাকে, সে তোমাদের এই সংসারের পিছনে গেছে। মেয়ে যে রূপটা পাবে, কোন্ স্বগগো থেকে পাবে শুনি? আজকাল কত কি স্নো, ক্রিম উঠছে, পার্লার, মার্লার সেসব করার জন্যে দু-দশ টাকা ধরে দিয়েছ কোনোদিন? ওই মেয়ে বড়ি, আচার, পুজোর জোগাড়, কাপড় কাচা, বাসন মাজা সবই করছে আমার সঙ্গে সঙ্গে।' ঝনাৎ করে মা চলে গেলেন।

সত্যি কথাই। জিনে থাকবে তবে তো রূপ পাবে? ছিটেফোঁটা নেই কোনো কুলে!, আয়নার

দিকে চেয়ে অলকা মনে মনে বলে। দেবপ্রসাদ যেন কালীর হাতের খাঁড়াটা। একবগ্গা, ঘাড় উঁচিয়ে পইতে হাতে করে এগিয়ে আসেন আর কী! ফোটোগ্রাফেও বোঝা যায় খসকা কালো রং, সব ঢেকে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। তস্য পত্নী একেবারেই কেলে হাঁড়ি। ঠাকুমাকে ছোটোবেলায় দেখেছে, ভালোই মনে আছে তার। খুব বড়োলোকের মেয়ে ছিলেন। তাঁর অনেক গয়নাপত্তরও ছিল। হয়তো সেইসব ঘুষ দিয়েই নিরূপ কন্যার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মানুষটি ছিলেন বড়ো ভালো। বউমাকে কোনোদিন কষ্ট দেননি। নাতি-নাতনিকে অশেষ ভালোবাসতেন। তাঁকে কোনোদিন দেখতে খারাপ বলে মনে হয়নি অলকার। রূপের ছব্বা কী জিনিস এই এখন ইদানীংই পুরো মালুম হচ্ছে। চতুর্দিকে হোর্ডিং, তাতে রূপসি মেনকা রম্ভারা বুকের ভাঁজ দেখিয়ে সব উলঙ্গবাহার ছড়িয়ে রয়েছেন, ছিঃ। এইসব কাগজ, বিজ্ঞাপন আর পত্রপত্রিকার দৌলতেই তাদের পৃথিবী জানল রূপ কুরূপ, বিরূপ, রূপকথার নানান আখ্যান-ব্যাখ্যান। তা নয়তো সে কি কোনোদিন নিজের মাকে অসুন্দর দেখেছে? মুখে মেচেতার ছাপ, না ফরসা না কালো, মাথার চুলগুলি সামনের দিকে উঠন্ত, থলথলে গড়নের মা তার জননীই তো! আর ভাই সেই আদরকাড়া বল-খেলুনেটা! লম্বা চওড়া, একমাথা চুল এখন, কিন্তু কুচকুচে খসকা কালো, মুখময় ব্রণর দাগ এক মুরারি ওকে কি কোনোদিন কুরূপ বলে সে জেনেছে! এতদিনে জানল—বাবা মা, ঠাকুরদা ঠাকুমা, সে নিজে সবাই কুরূপ। তবু সে হয়তো এই এদেরই মধ্যে একটু খোলতাই। কে জানে হয়তো যৌবনের গুণে। তার হ্যাঁ ওই, মা বলেছে আরেকটু দেখনসই হতে সে পারত যদি ক্রিম...ট্রিমের দৌলতে আরেকটু চকচকে হওয়ার চান্স পেত, পার্লারের গুণে সরু ভুরু, একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করে দলমলে ঢলঢলে। তা সেও তো তোমরা দিতে পারছ না। তবে রাগটা কীসের, ঝালটা কার উপর ঝাড়ছো? নিজে যে রোজগার করে নেব—তাতেও তো বাদ সাধছ!

কিন্তু যেদিন জানালা দিয়ে লম্বা সুঠাম চেহারার ব্যাকব্রাশ চুল শ্যামকান্তি যুবকটিকে দেখে তার নিজেরই খুব পছন্দ হয়ে গেল, সেদিনই হল তার আসল মুশকিল। সে দিনেই মন দিয়ে হালকা কমলা রংয়ের সরু জরিপাড় শাড়িটা সে পরেছিল। মুখটি মেজে ঘষে, চুলগুলি খুলে দিয়েছিল। কপাল ঢেকে কান ঢেকে পড়েছিল চুলের গোছা। ছোটো তার পছন্দসই টিপ ছিল কপালে। টান টান করে শাড়ি পরা ফিগারে তনুশ্রী যতদূর খোলবার খুলেছিল। ঠোঁট ভালো করে ঘষে সামান্য একটু ভেসলিন দিয়ে চকচকে করে নিয়েছিল। আর বুকের খাঁজে লুকিয়ে নিয়েছিল একমুঠো শুভ্র কুন্দকুসুম। মৃদু সুগন্ধে চারদিক মাত হয়ে থাকবে।

যুবকটি ভদ্রভাবে নমস্কার করে বলল, 'আপনি সত্যি কথা পছন্দ করেন তো?'—সে কী বলবে? সত্যেরও যে তেমন কোনো অ্যাবসলিউট নেই সে তো জীবন দিয়েই জানে।

.দেখুন, আমি রাইটার্সের এইচডিসি। যতই চাই আমার ভাগ্যে যে হুরিপরি জুটবে না সে আমি জানি। আমার মা যিনি এতদিন আমাকে ভাত রেঁধে খাওয়ালেন দুঃখ ধান্ধা করে বড়ো করলেন, তিনিই দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। আমি একজন ভদ্রঘরের রাঁধুনি-কাম-নার্স-কাম আয়া খুঁজছি স্ত্রীর মধ্যে। টানাটানির ঘরে একজন এইরকম রোগীকে সেবাশুশ্রূষা করে আর যাবতীয় যা করার যদি করতে রাজি থাকেন, তাহলে আপনার রূপ আমার চলবে।

চাঁছাছোলা কথাগুলি বলে ছেলেটি তার চোখের দিকে সোজা চেয়েছিল। অলকার কী যে হল, যেন ভেতরটা দারুণ গরম হয়ে উঠছে, সে যেন আর নিজেতে নেই। সে নমস্কার করল, তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে, পেছনে ফিরে চলে এল।

'কী ব্যাপার, কী হল?'—যুবকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা তারাপ্রসাদও তাই। 'কী হল? হলটা কী?'

মা তার বন্ধঘরের দরজায় ঘা দিতে দিতে ক্রমাগত কাঁপা গলায় বলতে থাকলেন, 'কী রে অলি? তুই কি হ্যাঁ বললি, না, না বললি? হ্যাঁ বললি, না, না বললি!'

সে বন্ধ ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল, কীরকম অসাড় দেহমন নিয়ে, কোনো জবাব দেয়নি। যুবকটি শেষে বলেছিল, 'আমার কথা বোধহয় ওঁর পছন্দ হয়নি।'

সে সারারাত দরজা খোলেনি।

না, খুলেছিল। মাঝ নিশীথে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে যথাসম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলে বাগানে চলে গিয়েছিল ধীর পায়ে। সৃষ্টি ছাড়া বটল পামটির শুভ্র সুগোল কাণ্ডটি জড়িয়ে ধরেছিল। গাল বেয়ে চোখ ছুঁইয়ে, নাক ছুঁইয়ে মনে মনে বলেছিল, 'বৃক্ষ যদি তুমি সত্যিকারের বৃক্ষ হও তাহলে আমাকে আশ্রয় দাও।' পরদিন ওই গাছের তলাতেই তাকে পাওয়া যায়—জ্ঞানহীন। এবং কপাল ফিরতেই সে রক্ত চোখে চারপাশে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোরা অপবিত্র, আমার এ পূতাঙ্গ ছুঁস'না। যা স্নান করে আগে পবিত্র হয়ে আয়। আমার পেটিকায় পাটের কাপড় আছে। তারা-মালা, পলা আছে নিয়ে আয় পরি। হ্রীং শ্রীং স্ত্রীঃ ফট।'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে শিহরিত তারাপ্রসাদ ও সর্বাণী চুপ। তারাপ্রসাদ ছাড়া কেউ জানেনেই না মায়ের পেটিকায় কী কী বস্তু আছে। শ্যাম শুনল না, শশব্যস্তে ডাক্তার ডাকল। তানা না না করে তিনি যখন এলেন তখন চান করে ভরপেট ফলাহার করে কেশের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে মা তারা বগলামুখী নিবিড় ঘুম ঘুমোচ্ছেন। লাল চওড়া পাড় তসরের শাড়ি পরনে। হাত ভরতি লাল পলা, গলার থেকে লম্বা তারা তারা সোনার মালা লুটিয়ে আছে বুকের উপর। তারাপ্রসাদ ঘরের সামনে প্রহরায়।

'উনি ঘুমোচ্ছেন, ছোঁবেন না।'

শ্যাম বলল, 'বাবা আপনি কী পাগল হলেন? একটু দেখতে দিন।'

হ্যাঁ দর্শন। একবারমাত্র দর্শন করুন, তারপর চলে যান।

সামান্য ফাঁক দরজা দিয়ে শয়ান মূর্তিটি দেখে সভয়ে ডাক্তার বললেন, 'অন্য সময়ে জাগলে, বুঝলে শ্যামাপ্রসাদ!' ব্যাগ গুটিয়ে ভদ্রলোক পালিয়ে গেলেন।

প্রথম ক-দিন সে এইরকম গভীরভাবেই রইল। ভোরবেলায় উঠে স্নান সেরে কোরা লাল পাড় শাড়ি পরে সেজেগুজে ছাতে যায়, ঘুরে ঘুরে গাছগুলির উপর আশীর্বাদের হাত রাখে। আপন মনেই বীজমন্ত্র বিড়বিড় করতে করতে ঘোরে। নীচে আসে রোদ কড়া হয়ে উঠলে। তখন বাবা তাকে ঠাকুরঘরে ঢুকতে বললে, সে স্থির চোখে তাকায়। নিজের কোণের ঘরটিতে চলে যায়। যথাসময়ে পবিত্রভাবে প্রস্তুত তার ভোগ আসে। খাওয়া দাওয়া সারা হলে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। পড়ে, পড়ে, পড়ে। বিকেল হলে আবার বেরিয়ে পবিত্র হয়ে বাগানে যায়। এই শ্বেত কাঞ্চন গাছটি তার বিশেষ প্রিয় ওই যূথী গাছটি তার বড়ো ন্যাওটা, সে না এলে কেমন ঝিমিয়ে থাকে। অনন্য মনে সে পরিচর্যা করে গাছগুলির, তাদের মৃদু অভিমান বোঝে, আদর করে, ফুলগুলি আহ্লাদে ফেটে পড়ে। তারপর পড়ন্ত সন্ধেয় নীচে নেমে সে সোজা ঠাকুরঘরে চলে যায়, আসন পেতে পদ্মাসনে বসে।

সে জানে না কখন সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। ডানহাতে যেন খড়্গ ধরা, বামহাতে কপাল, কোন সুদূরে তার চোখ নিবদ্ধ মুখে প্রশান্তি। আবার কখনও তেজ। সে জানে না কখন সে বসেছে। মুখ দিয়ে অস্ফুট ধ্বনি বেরোচ্ছে—কোনো মন্ত্র কিন্তু এদের বোধের অতীত। বোঝেন অনুমান করতে পারেন একমাত্র তারাপ্রসাদ। তিনি বিহ্বল হয়ে প্রণাম করেন বারবার। সে দেখেও না, তার খেয়ালের মধ্যেই তখন থাকে না ঠাকুরঘরে শুধু প্রণত মাথার গাঁদি লেগেছে. যখন জ্ঞান হয় দেখে

তার গলায় আজানুলম্বিত রক্তজবার মালা। আশেপাশে ঝুড়িতে ফলফুল মিষ্টান্ন, শাড়ি, কয়েনে কয়েনে ছয়লাপ, যে যা পেরেছে, পাঁচটাকা, দু-টাকা এক টাকা। নোটের তাড়া। ক্রমে ক্রমে বেনারসি, সিল্ক শাড়ি, মাকে প্রদত্ত সোনার গহনা। আরও বড়ো নোট, আরও বড়ো।

কোনোদিকে তাকায় না উঠে দাঁড়ায় সে। সসম্ভ্রমে সবাই পথ করে দেয়। সে চলে যায় কোণে নিজের ঘরে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো সময়ে মা ঘুম ভাঙিয়ে নিজে হাতে খাইয়ে যান। এবং আরও রাতে চুপিচুপি শ্যামা ভাই তার ওষুধের গুলি ঠোঁট ফাঁক করে খাইয়ে দেয়। যতই ঠাকুরবাড়ির ছেলে হোক শ্যামা আজকালকার ছেলে। বাবাকে লুকিয়ে দিদির সাধ্যমতো চিকিৎসা সে করাবেই। এবং চিকিৎসাতেই কিনা কে জানে ফল হয়। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তার নিজের ছাপা শাড়ি পরে অলকা রান্নাঘরে গিয়ে চা করে, রুটি তরকারি করে। পিছন থেকে মা এসে হতবাক।

'ওরে তুই কেন? আমি তো আসছি।'

সামান্য অবাক সামান্য বিরক্ত হয়ে সে একবার তাকায় তারপর চায়ের কাপ মায়ের হাতে তুলে দেয়। বাবা আর ভাইয়ের চা নিয়ে চলে যায় বইয়ের ঘরে যেখানে সবে সকালের কাগজ এসে পৌঁছেছে, দুজনে দু-খানা পাতা নিয়ে দু-দিকে বসে আছে। দুজনেরই মুখ কাগজে ঢাকা। শাড়ির খসখস শব্দ। তারাপ্রসাদ বললেন, 'বুঝলে এবার রান্নাবান্নার জন্যে দেখে শুনে একজন বামনি রাখো। এখন তো আর...'

অলকা বলল, 'বাবা চা নিন।'

কাগজ হাত থেকে খসে গেল। তারাপ্রসাদ ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইলেন, অবশেষে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কোনোক্রমে বললেন, 'মা, তুই?'

শ্যামাও চমকে উঠেছিল, সামলে নিয়ে বলল, 'আরে দিদি, তোর চা-টাও দিয়ে নিয়ে আয়। একসঙ্গে...।'

অলকা শান্ত মুখে বাবার দিকে একবার তাকাল, ভাইয়ের দিকে একবার। মুখে কী মৃদুর চেয়েও মৃদুতর হাসি? হাসি না আর কিছু!

সকলের কাজকর্ম সারা হলে অলকা চিরদিনের অভ্যাসমতো সামান্য একটু পাড়া বেড়াতে বেরোয়। তার কাছাকাছি বয়সি কোনো বউ বা মেয়ে, পাড়াপড়শি, ছেলেবুড়ো, পিপলস ক্লাব বা বন্ধুসংঘর ছেলেরা যারা এখনও তেমন কোনো কাজকর্ম পায়নি, চারদিকে ঘুঁটির মতো ছিটিয়ে থাকে। চলতে চলতে কথা বলতে বলতে সে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যায়। শীত পড়ছে, রোদে তেমন ঝাঁঝ নেই। আকাশের রং সাদাটে। সবাই চলতে চলতে কেমন সম্ভ্রম মিশ্রিত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চায়। সে খেয়াল করে না। বড়ো বাড়ির আধখোলা সবুজ ফটক আলতো ঠেলে সে ডাকে, রুবি বউদি, আসব?

চমকে উঠে বউদি বলে, 'ওম্মা অলকা! এসো এসো।' পড়িমরি করে সে একখানা তোলা আসন এনে চেয়ারের উপর পেতে দেয়, —বস।

হঠাৎ 'তুমি?' —অলকা হেসে ফেলে। রুবি বউদিদের সঙ্গে তার বরাবর তুই-তোকারির সম্পর্ক। প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হয়ে কথা বলে, তারপর সহজ হয়ে যায় বউদি, তুমুল গল্প করে। এইরকমই অরুণা, মাধুরী, শীলাদের সঙ্গেও তার গল্প জমে যায় কোনো কোনো বিকেলবেলা।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ যেটাকে মনে করেছিল হোমিও-আরোগ্য, এবং তার বাবা মনে করেছিলেন দৈবী অন্তর্ধান, অচিরেই দেখা গেল সে জিনিসটা স্বল্পস্থায়ী। সেই বিশেষ বিশেষ বার অর্থাৎ শনি, মঙ্গলবারেই এখন মায়ের ভর হয়। কখন হবে কেউ জানে না, কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ অলকা

চুপ হয়ে যায়। তারপর অচেনা ভঙ্গিতে ওঠে, ঢুকে যায় ঠাকুরঘরে। বেরিয়ে আসে। পরনে লাল পাড় পাটের শাড়ি, গলায় তারা-মালা, হাত ভরতি লাল রুলি। বেরিয়ে আসে আরও অচেনা ভঙ্গিতে। তার কেমন একটা ঘোর লাগে। শাঁ শাঁ করে সে যেন এক মায়াবী পথ দিয়ে ক্রমাগত ওপরে আরও ওপরে উঠতে থাকে। চলে যায় এক আলোময় ভিন্ন জগতে যেখানকার চলাফেরা বোধ বোধগম্যতা সবই অন্যরকম। সে পাক খায় এক অস্তিত্বহীন অন্য চরাচরে। কণ্ঠ আর এই কণ্ঠ থাকে না। হাত পা চলে অন্যকোনো নির্দেশে—এর চেয়ে বেশি আর কিছু সে জানে না।—এটুকুও সে অনেক চেষ্টায় মনে করে বলে অনেকবার জিজ্ঞাসার পরে, শুধুমাত্র তার ভাইকেই। তাই শেষপর্যন্ত তারাপ্রসাদকে ডিঙিয়ে শ্যামাপ্রসাদই দেবীর সেবায়েৎ হয়ে যায় এবং পট্টবস্ত্র পরা, তারা-মালা গলায়, লাল পলা পরা হাত দুটি যখন খড়্‌গধারী পদ্মকোরক মুদ্রা রচনা করে তার কোলের উপর এসে থামে প্রবল হুড়োহুড়ির মধ্যেও জনতা টুঁ শব্দ করে না, সেবায়েতের চোখের নির্দেশে কিউ করে, পুজো দেয় এবং সকাতরে প্রশ্ন করে—

প্রশ্ন ১। মা আমার চাকুরে ছেলে কেমন উড়ু-উড়ু। আলগা হয়ে যাচ্ছে মা, বড়ো কষ্ট করে মানুষ করেছি।

উত্তর : তোমার ছেলের ভিনজাতের প্রেমিকা, সত্বর মেনে নাও, নইলে ছেলে হারাবে—অলৌকিক স্বর বলে।

প্রশ্ন ২। মা ভাড়াটে কিছুতেই উঠছে না, মামলা করেছি, জিত হবে তো?

উত্তর : কিছুমাত্র সত্য যদি তোমার পক্ষে থাকে তবেই।

প্রশ্ন ৩। মা, স্বামী ইদানীং অফিসের কাজ বলে হপ্তায় দু-দিন বাড়ি ফিরছে না, সব সময়ে দুর্ব্যবহার করে।

উত্তর : লোকটি চরিত্র হারিয়েছে। দুরারোগ্য রোগ হবে। মার পায়ের কাছে নিয়ে আসতে পারলে রক্ষা হতে পারে।

এবং প্রণামি পড়ে। প্রণামির পাহাড়। দেশবিদেশ থেকে পত্র আসে, দুঃখ আসে, প্রশ্ন আসে। জবাব যায়। আশীর্বাদ যায়। প্রসাদি ফুল ও ফল বিতরণ হয় অকাতরে। এতদিনে বাড়িটি প্রকৃতই ঠাকুরবাড়ি হয়। দোতলা ওঠে। সেখানে বসবাস। নীচে মন্দির। সেখানে অধিষ্ঠিত দেবপ্রসাদের নিজ হাতে গড়া তারামূর্তি। পেছনে মায়ের বসনভূষণ সমেত পেটিকা। সেই পেটিকার তত্ত্বাবধায়ক তারাপ্রসাদ তারই মধ্যে একদিন আবিষ্কার করেন পিতার জীর্ণ ডায়েরিটি। কপালে ঠেকিয়ে পড়েন—মায়ের অষ্টমূর্তি—তারা, নীলসরস্বতী, ভদ্রকালী এবং কামেশ্বরী। মূল মূর্তি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে স্তন্যপানরত মহালক্ষ্মীর। এভাবেই তিনি নীলকণ্ঠের বিষ দূর করেছিলেন। শিলাময় সেই স্বয়ম্ভু মূর্তিকে নাটোরের মহারানি ঢেকে দেন লোকরঞ্জিনী লোকপালিনী মূর্তি দিয়ে।

বিবর্ণ অক্ষরমালা, স্থানে স্থানে কালি ম্লান হয়ে গেছে, উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। অনেক চেষ্টায় সেইসব বর্ণ উদ্ধার করেন একদিন তারাপ্রসাদ এবং বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। সাধক বলছেন, —ইনি ব্রহ্মের পরাশক্তি। পঞ্চ মহাশূন্যে বিরাজ করতেন, আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্যাকাশ। আমি তাঁকে তারা মূর্তিতে দেখেছি, গড়েছি, প্রতিষ্ঠা করেছি। তিনি প্রসন্না কিন্তু রক্তাভ বদনা, তাঁর জিহ্বা অগ্নিশিখার ন্যায়। চতুর্ভুজা ডান হস্তদ্বয়ে খড়্‌গ কর্তরী ধারণ করে আছেন, বামহস্তদ্বয়ে কপালপাত্র ও পদ্মকোরক। কিন্তু মায়ের যে ধ্যান মূর্তি আমি দেখি তাতে পিঙ্গল জটা। কাল সূর্যের ন্যায় প্রখর ত্রিনয়ন। প্রজ্বলিত চিতাবহ্নি থেকে উত্থিতা হন তিনি। মহালক্ষ্মী মূর্তি দিয়ে সেই দুঃসহ ধ্যান মূর্তিকে আবৃত করলাম। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য মা যে-কোনো মুহূর্তে উগ্রা, উগ্রতারা, মহাউগ্রতারা হতে পারেন। বস্তুত শক্তির অষ্টরূপের এই অষ্টাঙ্গী মাতৃমূর্তি আমি দর্শন

করেছি। যদি সত্য সাধক হই তো কোনো না কোনোদিন লোকপালিনী, লোকশাসনা এই মহাশক্তি আমার এই সাধনক্ষেত্রেই প্রকাশিত হবেন।... পাঠ শেষ করেই স্থাণু হয়ে থাকেন তারাপ্রসাদ। মুখময় বিন্দু বিন্দু স্বেদ।

· যেদিন শনিবারের সন্ধ্যারাত্রে জ্যান্ত মা দুশ্চরিত্র লোকটির গালে প্রবল চপেটাঘাত করলেন এবং সে তাঁর পায়ে পড়ে 'মা মা' করে কাঁদতে লাগল, সেদিনই তারাপ্রসাদ ছেলেকে এবং স্ত্রীকে ডেকে পিতৃডায়েরির সেই পরম অর্থময় অংশগুলি পড়ে পড়ে শোনালেন।

শীতের বিকেল সন্ধেয় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। বৃহস্পতিবার। চারদিকে শাঁখ বাজছে। চুলে দীর্ঘ আলগা বিনুনি ঝুলিয়ে তার ফেভারিট চুনে হলুদ রংয়ের তাঁতের শাড়িটি পড়ে, গলায় সরু হার, কানে ছোটো মাকড়ি, হাতে বালা, সে বেরিয়ে আসে। পায়ের বাসি আলতা সাবান ঘষে ঘষেও তুলতে পারেনি। পিছনে পড়ে থাকে মন্দির, প্রণামি, সেবাইত, সে নির্বাধ বেরিয়ে পড়ে। কেউ বলে না, 'কোথায় যাচ্ছিস?' কেউ বলে না, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

ক্লাবে ক্যারাম খেলতে খেলতে কর্কশকান্তি তরুণের দল জানলা দিয়ে দেখতে পায়, শশব্যস্তে বেরিয়ে আসে, অলকাদি, একটু খেলা দেখে যাবে না? অলকাদি।

সে মৃদু হাসে, বলে, —কাল আসব এখন, আজ যাই। রুবি বউদি, মণি বউদির বাড়ি লক্ষ্মীপুজোর নেমতন্ন আছে।

আশ্চর্য! এতগুলি আমন্ত্রিত মানুষ, অচেনা, আত্মীয়স্বজন রুবি বউদি মণি বউদির বাড়িতে। কেউ তো বলে না, এতবড়ো মেয়ে, বিয়ে হয়নি?

কেউ বলে না, কাদের বাড়ির মেয়ে? কী করে? কী পাস?

শুধু সসম্ভ্রম বিহ্বলতায় এ ওকে শুধোয়, কে? কে? কে? এ কে গো?